বঙ্গীয় জীবনীকোষ

প্রথম খণ্ড

আদি - অষ্টাদশ শতাব্দী

প্রিয়নাথ জানা

মাতৃভাষা পরিষদ

বঙ্গীয় জীবনীকোষ

প্রথম খণ্ড

আদি—অষ্টাদশ শতাব্দী

বঙ্গীয় জীবনীকোষ

প্রথম খণ্ড

আদি—অষ্টাদশ শতাব্দী

প্রিয়নাথ জানা

মাতৃভাষা পরিষদ

কলকাতা

Bangiya Jibanikosh: A Bengali Biographical Dictionary, compiled by Priyanath Jana. Published by Bimalendu Bhattacharyya, Matri Bhasa Parisad, Calcutta-37, 1955. The Parisad gratefully acknowledges the financial assistance received from the Government of India.

প্রথম প্রকাশ
খ্রীষ্ট জন্মদিবস
১৯৫৫

প্রকাশক
বিমলেন্দু ভট্টাচার্য
মাতৃভাষা পরিষদ
এম. আই. জি. হাউসিং এস্টেট – সি/২
৩৭, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭

মুদ্রক
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণি, কলি-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে

দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

পরিশেষে শ্রীপ্রিয়নাথ জানার সুদীর্ঘ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল 'বঙ্গীয় জীবনীকোষ', প্রথম খণ্ড, প্রকাশ সম্ভব হল। মাতৃভাষায় বহু আকাঙ্ক্ষিত একখানি তথ্য-সন্ধানী আকর গ্রন্থের অভাব পূরণ হল। এই সুবৃহৎ কোষ-গ্রন্থ প্রকাশনের সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা অতি অবশ্যই ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ডিপার্টমেণ্ট অব্ কালচারেরই প্রাপ্য। মাতৃভাষা পরিষদ স্বল্পবিত্ত-সম্পন্ন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক একটি প্রতিষ্ঠান। সহৃদয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্য না পেলে প্রায় বিত্তহীন এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরূপ মূল্যবান একখানি গ্রন্থের প্রকাশ কখনোই সম্ভব হত না। সেজন্য সর্বাগ্রে ভারত সরকারকে পরিষদের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও মিত্রতা প্রায় তিন দশকের। প্রথম যখন পরিচয় হয়, তখন তিনি থাকতেন ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়ীর অদূরে অতি জরাজীর্ণ এক পোড়ো মেস বাড়ীর স্বল্প-পরিসর এক নির্জন কক্ষে। আকৃতি প্রকৃতির একান্ত প্রতিকূল পরিবেশে কক্ষটি একমাত্র জেলের সেলের সঙ্গেই তুলনীয়।

সপ্তাহান্তে প্রতি শনিবারে তাঁর এই কক্ষে আমাদের মাতৃভাষা পরিষদের (তৎকালীন নাম 'গ্রন্থবাণী পাঠচক্র') সাপ্তাহিক সাহিত্য-বাসর বসত। অভ্যাগত সভ্যদের তিনি কুকারে স্বহস্তে প্রস্তুত বিচিত্র খাদ্যসম্ভার সহাস্যে পরিবেশন করতে করতে মাতৃভাষায় 'কোষগ্রন্থ' প্রণয়নের সম্ভাবনাময় পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করতেন। তারই অন্যতম সার্থক রূপকৃতি এই জীবনীকোষ। একটি বিশেষ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে তিনি অধিষ্ঠিত। কর্মের অবসরে দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে তিনি এই কোষগ্রন্থ প্রণয়নে সক্ষম হয়েছেন। প্রণয়নশেষে প্রকাশনের জন্যও দীর্ঘদিন ধরে তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। অবশেষে সরকারের সহায়তায় তাঁর সে প্রয়াস সার্থক হল।

লেখক বীরভূমি মেদিনীপুরবাসী স্বাধীনতা-সংগ্রামী। তিনি তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ গৌরবময় ছাত্রজীবন মাতৃভূমির মুক্তি-কামনায় শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম

উনিশশো বিয়াল্লিশ-এর ঐতিহাসিক আগষ্ট বিপ্লবে উৎসর্গ করে দীর্ঘ কারাবরণ করেছিলেন। এজন্য তিনি একটি তাম্রপত্রও পেয়েছেন। যৌবনের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। কিন্তু তাঁর আরব্ধ সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকায় মাতৃভূমির মুক্তির পর তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন মাতৃভাষার সেবায়। সম্প্রতি আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রের নানা অবক্ষয়ের যুগে তিনি শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানোন্নয়নে ব্রতী। তাঁর সম্পাদিত 'গ্রন্থবাণী' মাতৃভাষা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধপঞ্জী পত্রিকা। জাতীয় জীবনে জাতীয়তাবোধ সংবর্ধনে এবং বলিষ্ঠ ও আদর্শ ছাত্র-যুবজীবন গঠনে তাঁর লেখা যথাক্রমে 'জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা', 'ছাত্রজীবন সংগঠন', 'মনীষীদের ছাত্রজীবন' ও 'আমাদের বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি অপরিহার্য গ্রন্থ।

বিশেষ আনন্দের বিষয় সরকার 'বঙ্গীয় জীবনীকোষ' প্রকাশনে মাতৃভাষা পরিষদকে অনুদান প্রদান করে প্রকারান্তরে সাহিত্য ও সংস্কৃতানুরাগী একজন নিষ্ঠাবান স্বাধীনতা সংগ্রামীকেই সম্মানিত করলেন।

পরিষদের পক্ষ থেকে এই 'বঙ্গীয় জীবনীকোষ' গ্রন্থ প্রকাশনের সুযোগ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রয়োজনীয় তথ্য-সন্ধানী গ্রন্থাদি প্রণয়নের মাধ্যমে মাতৃভাষার মান-নির্ণয় ও উন্নয়নে পরিষদের একাধিক প্রকল্প আছে। সরকার ও দেশবাসীর সময়োচিত সহৃদয় সহায়তা পেলে সে-সবের রূপায়ণে পরিষদ সকল প্রকারে প্রয়াসী হতে সক্ষম হবে।

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য

সভাপতি, মাতৃভাষা পরিষদ

ভূমিকা

বঙ্গীয় পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রিয়নাথ জানা তাঁর 'জীবনীকোষ গ্রন্থে'র ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করে আমাকে অশেষ আনন্দ ও সম্মানের অধিকারী করেছেন। 'গ্রন্থবাণী' নামক গ্রন্থাগার-বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক-রূপে বহুদিন আগে শ্রীজানা যখন আমার কাছে আসতেন, তখন তাঁকে 'ডিক্সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' বা 'চেম্বার্স বায়োগ্রাফিকাল ডিক্সনারী'র আদর্শে বাংলা ভাষায় একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীকোষ সংকলনে পরামর্শ দিই। উপদেশ ও পরামর্শ বিলান বয়সের ধর্ম এবং কনিষ্ঠদের বিপদ এই যে কান পেতে তা শুনে যেতে হয় প্রতিবাদ না করে, যদিও কার্যক্ষেত্রে তা অনুসরণ করেন না বড় একটা কেউই। কিন্তু চমকিত হলাম যখন জানলাম যে দীর্ঘ ও একনিষ্ঠ শ্রমে শ্রীজানা সত্যই বাংলা ভাষায় একখানি জীবনীকোষ রচনা করেছেন এবং আমার অনুপ্রেরণায় এ কাজে হাত দিয়েছিলেন বলে, আমাকেই এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছেন দেখে পুলকিতও হলাম। আজকের এই সর্বগ্রাসী অশ্রদ্ধা ও অস্বীকৃতির পরিবেশে সমস্ত মূল্যবান জিনিসের মতো শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতাও দুর্লভ হয়েছে বলেই শ্রীজানার এই সহৃদয়তা মুগ্ধ করেছে আমাকে। সেইজন্যেই অভিধানের মতো গ্রন্থে ভূমিকা লেখার মানুষ আমি নই জেনেও কাজটি করতে সম্মত হয়েছি বিনা আপত্তিতে।

জীবনীকোষ বাংলা ভাষায় আগে কোনদিন লেখা হয়নি, একথা অবশ্য সত্য নয়। বহুপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের চরিতাভিধান। এছাড়া, সুবলচন্দ্র মিত্রের বৃহৎ অভিধানেও আছে উল্লেখযোগ্য ও গণনীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও। জীবনী সংগ্রহ এবং শতজীবনী পর্যায়ের বইও বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে কিছু কিছু। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। তাছাড়া, বেশীর ভাগই কালক্রমে বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অধুনা প্রকাশিত পাঁচ খণ্ড ভারতকোষেও কিছু কিছু জীবনী সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু তাও পূর্ণাঙ্গতার দাবী করতে পারে না। কাজেই একখানি সার্থক এবং ষোল আনা

একালীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা জীবনীকোষের প্রয়োজন ছিলই এবং শ্রীজানা সেই কাজটি যথোচিত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করে বঙ্গভাষাভাষী মাত্রেরই প্রভূত উপকার করলেন, নিজেও অম্লান যশের অধিকারী হলেন। কুশলী কলম ও কিছুটা সজীব কল্পনার পুঁজি থাকলেই গল্প, উপন্যাস এবং রম্য নিবন্ধ লেখা যায় বলে, এইসব পথেই লেখকজনতার ভীড় হয় সবচেয়ে বেশী। অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও শ্রমসাধ্য কাজ করার মানুষ সব দেশেই কম। গ্রীষ্ম ও বর্ষা-বিড়ম্বিত আমাদের দেশে তো তা আরোই কম। তাছাড়া, ভারী কাজের কদরও সরকারী-বেসরকারী সব মহলেই অল্প। তবে সুখের কথা যে শ্রীজানা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্য পেয়েছেন এই বইয়ের জন্যে। আশা করছি সামাজিক আনুকূল্যও অপ্রাপ্য হবে না তাঁর।

গত কয়েক বছরের ব্যবধানে বাংলা ভাষায় পর পর অনেকগুলি উল্লেখ্য অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় অভিধান তিনটি প্রশংসনীয় প্রয়াস হিসাবে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই পথে বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা-বিদ্যা-সংক্রান্ত অভিধানও সংকলিত হতে পারে। এছাড়া, কামিনীকুমার রায়ের দু-খণ্ডে প্রকাশিত লৌকিক শব্দকোষ এবং হরেন্দ্রকুমার পালের বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দের অভিধান বই দুটি নিরতিশয় নিষ্ঠা ও তৎপরতার সঙ্গে সংকলিত হয়েছে, এ যে কোনো জিজ্ঞাসু ব্যক্তিই, বিশেষ করে ভাষা সন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। শ্রীজানার বই এই দু-খানির পাশে তৃতীয় একটি সংযোজন-রূপেই সম্মানিত আসন নেবে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, গবেষক, সকল মহলেই অপরিহার্য আকর গ্রন্থরূপে এর উপযোগিতা স্বীকৃত হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর যেহেতু আধুনিকতম তথ্যাদির ভিত্তিতে ও সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলায় এর সম্প্রবেশকগুলি আহৃত হয়েছে, তাই সংক্ষেপে হলেও, এ থেকে সংগৃহীত সংবাদগুলি প্রামাণ্য বলে গণ্য করতে পারবেন প্রত্যেকেই। সাধারণতঃ সাবেকী ধারণা ও অসম্পূর্ণ তথ্যজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এসব কাজ করা হয় বলে, আমাদের অনেক উচ্চ অভিপ্রায়সম্ভূত কাজও আশানুরূপ ফলদায়ী হয় না। প্রিয়নাথ জানাকে ধন্যবাদ যে তিনি কার্পণ্য বা আলস্যবশে কোন তথ্যকেই আনুপূর্বিক যাচাই করতে কুণ্ঠিত হন নি।

বইটি প্রায় আদ্যোপান্ত পড়েই একথা বলছি। দু-একটি ছোট-খাট বিচ্যুতি যে চোখে পড়েনি তা নয়। যেমন প্রকাশানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে লেখা হয়েছে যে তিনি দশনামী সাধু সমাজের মধ্যে সর্বপ্রধান সরস্বতী সম্প্রদায়ভুক্ত, চৈতন্য

সমসাময়িক কাশীবাসী বৈদান্তিক পণ্ডিত। এটুকুর মধ্যে অসঙ্গতি কিছু নেই, কিন্তু পরে যে তিনি চৈতন্যপ্রভাবে এসে ভক্তিবাদী বৈষ্ণব হয়েছিলেন এবং চৈতন্য-চন্দ্রামৃত নামক স্তুতিবাক্য রচনা করেছিলেন, এটুকুও উল্লেখিত থাকলে ভালো হত এই সঙ্গে। কারণ, বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ব্যাপারে এ তথ্যের অনস্বীকার্য প্রাসঙ্গিকতা আছে। কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত মিলবে হয়ত দু-একটাই। আদি থেকে অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘ পটভূমি পরিক্রমা করার মতো বিরাট কাজ যিনি এককভাবে নিষ্পন্ন করেছেন, যা করা কোনদিন আমার সাধ্যে কুলাত না, তাঁর ভুলভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা খোঁজার চেষ্টা করছি দেখে অনেকে হয়ত কৌতুকবোধ করবেন। বস্তুত এ যে আমার আন্তরিক ও অকপট প্রীতিরই অভিব্যক্তি, তা শ্রীজানা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন। আমার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রয়াসের মধ্যে মূর্ত হয়েছে, তাই এ বইয়ের সঙ্গে আমি নিজেকেও একাত্ম করে দেখছি। সবশেষে জানাই যে সমগ্র বইয়ের এটি প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে আধুনিক কাল, যার সূচনা উনিশ শতকে। সে গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ হয়ত দেখে যাবার অবসর হবে না আমার। তাই এখান থেকেই প্রথমের মত দ্বিতীয় খণ্ডকেও স্বাগত জানিয়ে রাখছি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পূর্বাভাষ

বাঙালী হিসেবে পরম সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয় আমাদের "মাতৃসম মাতৃভাষা" বাংলা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং বিশ্বের বরেণ্য ভাষাসমূহের অন্যতম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ-হেন সমৃদ্ধ ভাষায় রেফারেন্স বা তথ্য-সন্ধানী গ্রন্থের প্রকাশ আশানুরূপ নয়। অথচ কোন ভাষার মাননির্ণয় ও উন্নয়নে এবং উন্নত পঠন-পাঠনে আকর গ্রন্থ একান্ত অপরিহার্য। দু-দশকের অধিককাল একটি মহাবিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে কর্মরত থেকে এবং যৎসামান্য সাহিত্য সেবায় ব্রতী হয়ে অহরহ অনুভব করি যে উপযুক্ত সংখ্যক নির্ভরযোগ্য তথ্য-সন্ধানী গ্রন্থ ব্যতিরেকে প্রকৃত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা ও সাহিত্যাদি রচনা অসম্ভব। মাতৃভাষা বাংলা তথা ভারতের অপরাপর মাতৃভাষার ক্ষেত্রে একথা অধিক প্রযোজ্য।

আশার কথা সম্প্রতি বাংলা ভাষায় কিছু কিছু অভিধান ও কোষ-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু জীবনীকোষ গ্রন্থের একান্ত অভাব আছে। বিশেষতঃ বাঙালী জাতির সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি জীবনীকোষ গ্রন্থের অভাব স্বতঃই অনুভূত হয়। এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে সুদীর্ঘ শ্রমসাধ্য প্রয়াসে ও নিষ্ঠায় যথাসাধ্য গভীর অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের পর একটি বাংলা জীবনীকোষ গ্রন্থ প্রণয়নে সক্ষম হয়েছি। এতে বাংলার ইতিহাসের আদি যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আধুনিক বাঙালী সমাজ গঠনের প্রাক্কালে সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, সংগীত, ভাস্কর্য, ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রভৃতির সর্বক্ষেত্রে যে-সব বাঙালী বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন ও খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং যাঁদের অবদান বাঙালীর জাতীয় জীবনে অনস্বীকার্য, সেইসব ঐতিহাসিক যুগমানবদের জীবনধারার কথা স্বল্প পরিসরে বিবৃত হয়েছে।

উনবিংশ, বিংশ শতাব্দীর এই বর্তমান যুগের স্মরণীয় বাঙালীর জীবনকথা সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য। কিন্তু তৎপূর্ব যুগের জীবনকাহিনী আহরণ

এক অতি দুঃসাধ্য বিষয়। বহুদিন ধরে বহু প্রয়াসে ছোট বড় বহু গ্রন্থাগারের অসংখ্য গ্রন্থ অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করে প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহের প্রয়াস করেছি এবং বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ উপদেষ্টামণ্ডলীর নির্দেশানুসারে প্রাচীন যুগের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জীবনীকোষ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। ইহা পৃথক পৃথক ভাবে দু-খণ্ডে প্রকাশের বাসনা ছিল। কিন্তু বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে প্রকাশন-ব্যয় সীমিত করার উদ্দেশ্যে এক খণ্ডে প্রকাশিত হল। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনী সংগ্রহের পথে। ইহা স্বতন্ত্র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিতব্য। ব্যবহৃত গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারের নিকট সর্বাধিক ঋণী। এঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা না পেলে গ্রন্থ-প্রণয়ন অসম্ভব হত।

এই জীবনীকোষ গ্রন্থে স্মরণীয় প্রতিটি ব্যক্তির সম্ভাব্য প্রাপ্ত জন্মস্থান, জন্মকাল (যেখানে সঠিক তারিখ সংগ্রহ দুঃসাধ্য, সেখানে শতাব্দীর উল্লেখের প্রয়াস করা হয়েছে), সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী ও লেখক হলে রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে এই কোষ গ্রন্থে ২৮৩৬ জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে।

নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিচিত্র বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাব প্রতিবেশী প্রদেশসমূহে এমন কি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের উপর কম নয়। তাই বৃহৎ বঙ্গই আলোচ্য বঙ্গীয় জীবনীকোষের ভৌগোলিক সীমারূপে সুনির্দিষ্ট। প্রাচীন মিথিলা, বিহার উড়িষ্যা, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং পূর্ববঙ্গ বা অধুনা সৃষ্ট বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রায় সমগ্র পূর্বভারত এর অন্তর্ভুক্ত। প্রখ্যাত প্রবাসী বাঙালী অর্থাৎ ভিন্ন প্রদেশে বা দেশে বসবাসকারী কৃতি বাঙালীর নাম এতে প্রদত্ত হয়েছে। এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী দেশ-দেশান্তরাগত অবাঙালী বিশিষ্ট বিদেশী যাঁরা বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাঁদের নামও এই কোষগ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। এক কথায় বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি, সুখ-দুঃখ ও উত্থান-পতনের সঙ্গে যাঁরা কোন-না-কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট, ইহা তাঁদেরই কর্মকথার কোষগ্রন্থ।

জীবনীসমূহের তথ্যাদি প্রথম শ্রেণীর উপকরণ থেকেই সংগৃহীত এবং কোষ-গ্রন্থ প্রণয়নের সর্বাধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রথিত।

গ্রন্থ প্রণয়নে ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুশীলকুমার দে, প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র-

জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন প্রবক্তা শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দিক্‌পালদের উপদেশ ও পরামর্শাদি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। এজন্য শ্রম ও দূরদৃষ্টি সমানভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। আমার যতদূর ধারণা এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এরূপ কোন জীবনীকোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এই 'বঙ্গীয় জীবনীকোষ'ই বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম বাঙালীর পূর্ণাঙ্গ জীবনীকোষ।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনে বহু সুহৃদ্ ও সুধীজনের অকুণ্ঠ সহায়তা অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। অগ্রজসমান, সাহিত্যপ্রাণ শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত তাঁর নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সমগ্র গ্রন্থের পরিমার্জন ও ভুল সংশোধন করে প্রকাশন প্রমাদমুক্ত হতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে অসংখ্য গ্রন্থ সরবরাহ করেছেন। বিশেষ সাহায্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিক্ষা-সচিবালয়ের অন্যতম আধিকারিক শ্রীব্যোমকেশ সিংহ ও জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীকামিনীকুমার নাথ মহাশয়দ্বয়। নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন অগ্রজপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র (কানুদা)। প্রখ্যাত পেপার-মার্চেণ্ট রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স-এর শ্রীগৌরলাল দত্ত নিদারুণ কাগজ-সঙ্কট সময়ে প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করেছেন। তুষার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীনিশিকান্ত হাটই মুদ্রণে বিশেষ সাহায্য করেছেন। মাতৃভাষা পরিষদের সভাপতি সুহৃদ্-প্রবর শ্রীবিমলেন্দু ভট্টাচার্য গ্রন্থ প্রকাশনের দুরূহতম দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছেন। এঁদের সকলের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। গ্রন্থ প্রণয়নের আদি প্রেরণা-দাতা প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত দয়া করে ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই মহামান্য ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের ডিপার্টমেণ্ট অব্ কালচারকে যাঁরা এই গ্রন্থের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করে অনুদান প্রদানে গ্রন্থ প্রকাশনের পথ প্রশস্ততর করে দিয়েছেন।

বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ ও পরামর্শাদি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করে আমার জ্ঞান, বিদ্যা ও নিষ্ঠানুযায়ী এই কোষগ্রন্থ যথাসাধ্য নির্ভুল করার সর্বপ্রকার প্রযত্ন সত্ত্বেও যদি কিছু প্রমাদ পরিদৃষ্ট হয় এবং কোন উল্লেখযোগ্য নাম পরিত্যক্ত হয়েছে মনে হয়, সহৃদয় পাঠক তার উল্লেখ করলে বিশেষ অনুগৃহীত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়াস করব।

সুদীর্ঘ প্রয়াসে প্রণীত এই বঙ্গীয় জীবনীকোষ গ্রন্থখানি বাঙালী জাতি ও

বিদেশী বাংলা সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিদের প্রয়োজন সাধনে কিছুমাত্র সমর্থ হলে আমার সকল পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক জ্ঞান করব।

প্রিয়নাথ জানা

বঙ্গীয় জীবনীকোষ

অকিঞ্চন—এঁর প্রকৃত নাম রঘুনাথ রায়। পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। বর্ধমানের অন্তর্গত কালনার নিকটবর্তী চুপি গ্রামে ১৭৫০ সালে রঘুনাথের জন্ম হয়। এঁর পিতা বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। রঘুনাথ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দিল্লীর সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট ইনি সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন। কিছুদিন দেওয়ানের কাজ করে পরমার্থ চিন্তায় মন দেন। ইনি শ্যামা ও কৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁর সঙ্গীতসমূহ অকিঞ্চন ভণিতাযুক্ত। ১৮৩৬ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী—অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম চণ্ডীমঙ্গল। এঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র। কাব্যের ভণিতায় অনেকস্থলে ইনি কেবল এঁর উপাধিটি ব্যবহার করেছেন। কবির নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা পরগণায়। কবির বংশধরগণ আজও এই বরদা পরগণার বেঙ্গরাল নামক গ্রামে বসবাস করছেন। কবির তিন পুত্রের নাম—রামচাঁদ, রামদুলাল ও শিবানন্দ। কবীন্দ্র অকিঞ্চন এঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদের সমসাময়িককালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচনা সম্পন্ন করেছিলেন। পুঁথিখানির নাম কবি এক জায়গায় 'পার্বতীর সঙ্কীর্তন' বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র সর্বদাই ইনি এটিকে চণ্ডীর 'নূতন মঙ্গল' বলে নির্দেশ করেছেন। কাব্যের বিষয়বিন্যাসে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রভাব এবং ভাষায় শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এ ছাড়া 'শীতলা-মঙ্গল' কাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন। এঁর এই শীতলা-মঙ্গল কাব্য শীতলা পূজা উপলক্ষে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে আজও গীত হয়ে থাকে। অনেকে শীতলা-মঙ্গলখানিকে কবির প্রথম রচনা বলে মনে করে থাকেন। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তিনি 'গঙ্গামঙ্গল' ক্ষুদ্র-কাব্য রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইহাই এঁর সর্বশেষ রচনা। আরও জানা যায় অকিঞ্চনই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি। কবির পিতা ও পিতামহের নাম যথাক্রমে পুরুষোত্তম ও হরিনারায়ণ।

অকিঞ্চন দাস—ইনি ছিলেন 'বিবর্ত-বিলাস' নামক সহজিয়া গ্রন্থ রচয়িতা। রসিকচাঁদ ও বিহারী যথাক্রমে এঁর দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। রঘুনাথ ছিলেন এঁর গুরুর

গুরু। রঘুনাথের নিকট থেকে ইনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর অকিঞ্চন নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনের পর তৃতীয় দিনে রঘুনাথ এঁকে স্বপ্নে 'বিবর্ত-বিলাস' রচনা করতে উপদেশ প্রদান করেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

অকিঞ্চন দাস—ইনি 'শ্রীচৈতন্য ভক্তিতত্ত্ব বিলাস' ও 'শ্রীচৈতন্য ভক্তি রসাত্মিকা' গ্রন্থের রচয়িতা। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রশ্নোত্তর-ছলে রচিত। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

অকিঞ্চন দাস—অকিঞ্চন দাস খুব সম্ভব শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। ইনি রামানন্দ রায়ের সংস্কৃত ভাষায় লেখা সমগ্র জগন্নাথবল্লভ নাটকটি বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। 'ভক্তি রসালিকা', 'ভক্তি রসাত্মিকা' ও 'ভক্তি রসচন্দ্রিকা' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্বনিবন্ধগুলি অকিঞ্চন দাসের রচনা বলেই অনুমিত হয়। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর কবি।

অক্টার্লনী, স্যার ডেভিড—জাতিতে ইংরেজ। মেজর জেনারেল স্যার ডেভিড অক্টার্লনী ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল আর্মিতে যোগদান করেন। ক্যাডালোর অবরোধকালে ইনি জেনারেল কুটের অধীনে ছিলেন এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী হয়ে ১৭৮৪ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লেকের অধীনে পাঞ্জাবের দোয়াবে একটি সৈন্যদল পরিচালনা করেন। তারপর ইনি দিল্লীর রেসিডেন্ট হন এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে হোলকারের আক্রমণ থেকে দিল্লী রক্ষা করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শতদ্রুতীরে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত হন। নেপাল যুদ্ধে একজন কম্যাণ্ডার রূপে ইনি শত্রুদের পরাস্ত করেন। ১৮১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিণ্ডারি-মহারাষ্ট্র যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করেন। পরে ইনি রাজপুতানা, দিল্লী ও মালবের রেসিডেন্ট হন। দুর্জনলাল যখন ভরতপুরের শিশুরাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, তখন অক্টার্লনী ভরত-পুরকে সাহায্য করেন। তদানীন্তন গভর্নর লর্ড আমহার্স্ট এঁর কার্যে সন্দেহ প্রকাশ করায় ইনি কার্য থেকে পদত্যাগ করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই ইনি মিরাটে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পর এঁর প্রিয়তম বন্ধু মেট্‌কাফের সভাপতিত্বে কলকাতায় একটি সাধারণ সভা হয়। এরই ফলে এই শহরের গড়ের মাঠে এঁর নামে অক্টার্লনী মনুমেণ্ট স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। বর্তমানে এই নাম পরিবর্তিত শহীদমীনার হয়েছে।

অক্রুর—ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। গোপীবল্লভপুরে এঁর শ্রীপাঠ বিদ্যমান। এঁর অন্য কোন পরিচয় পাওয়া

যায় না। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

অক্ষচন্দ্র—ইনি ছিলেন বাংলা দেশের চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। তিব্বতীয় বৌদ্ধভিক্ষু লামা তারানাথের মতে অক্ষচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। এর পুত্রের নাম জয়চন্দ্র।

অগ্নি মিত্র—মগধের গঙ্গারাঢীরাজ পুষ্প মিত্র ও পট্ট মিত্রের পর অগ্নি মিত্র খ্রীঃ পূঃ ১৮৫-৭৫ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করে ভারত শাসন করেন। এঁর পরই মগধে গুপ্তবংশের আবির্ভাব হয়।

অচ্যুত দাস (অচ্যুতানন্দ)—ইনি একজন বৈষ্ণব কবি। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে রাজা প্রতাপরুদ্র-দেবের শাসনকালে উড়িষ্যায় যে ছ'জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়েছিল অচ্যুত দাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এঁর রচিত প্রধান গ্রন্থ শূন্য সংহিতা। এঁর অপর গ্রন্থ নিরাকার সংহিতা। এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে ইনি প্রথমে সনাতন গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব হয়েও ইনি বুদ্ধের উপাসনা করতেন বলে এঁর প্রতি অনেকে বিরূপ ছিলেন। অনাদি-সংহিতা নামে অচ্যুতের অপর এক-খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অচ্যুত দাস—উড়িষ্যাবাসী হলেও ইনি ছিলেন বাঙালী। শূন্য-সংহিতায় শত্রু দমনের জন্য ইনি বুদ্ধদেবের পুনর্জন্মের কথায় ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। এঁর রচিত আর একখানি গ্রন্থ ভাগবতের অনুবাদ 'কৃষ্ণলীলা'।

অচ্যুত পঞ্চানন—সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম রাঢীয় গ্রহবিপ্রকুল পঞ্জিকা।

অচ্যুত পট্টনায়ক—রসিকানন্দ প্রভুর পিতা।

অচ্যুত পণ্ডিত—অভিরাম দাসের "পাটপর্যটন" মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। কোটরা গ্রামে এঁর শ্রীপাট বিদ্যমান। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

অচ্যুত সেন—রাজা বল্লাল সেনের বংশধর। বগুড়া জেলার সেরপুরের নিকটবর্তী স্থানের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। এঁর সময় (১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ) এই রাজ্য মুসলমান অধিকারে আসে এবং বংশ লোপ পায়।

অচ্যুতানন্দ—ইনি ছিলেন প্রভু অদ্বৈত আচার্যের পুত্র। এঁর মাতার নাম সীতাদেবী। "অদ্বৈতপ্রকাশ" গ্রন্থ অনুযায়ী অচ্যুতের ছয় ভাই—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, বলরাম ও যমজ ভ্রাতাদ্বয় স্বরূপ-জগদীশ। আনুমানিক ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অচ্যুতানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন একদিন অদ্বৈতপ্রভু এক সন্ন্যাসীকে প্রসঙ্গক্রমে কেশবভারতীকে

গৌরাঙ্গের গুরু বলায় বালক অচ্যুত প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে জগৎগুরু চৈতন্যের কোন গুরু থাকতে পারে না। যৌবনে ইনি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ লীলাকালে গৌরাঙ্গ তাঁর মাঝে মাঝে অদ্বৈতগৃহে আসতেন। অচ্যুত সম্ভবত সেই সময় তাঁর নিকট কিছু কিছু বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষাগ্রহণ করে অল্পকালের মধ্যে সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। ইনি ক্রমে সংসারবিরাগী হয়ে উঠেন এবং এঁর প্রতি গৌরাঙ্গের সস্নেহ দৃষ্টি পড়ে। মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের কিছুকাল পরে অচ্যুতানন্দ সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু সকাশে উপস্থিত হন। ভাগবত গ্রন্থের প্রতি এঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাই বোধহয় বিখ্যাত ভাগবত-পাঠক গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, অচ্যুতানন্দ নৃত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রথযাত্রাদি উপলক্ষে ইনি সম্প্রদায় নৃত্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করতেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ইনি শান্তিপুরে ফিরে এসে বাস করতে থাকেন। ইনি অদ্বৈত-সীতাদেবীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের মৃত্যুর পর মাতা সীতা-দেবীর নিকট অবস্থান করেছিলেন। ভক্ত-সমাজে অচ্যুতানন্দের প্রাধান্য সর্বাধিক। হরিচরণদাস দাসকে ইনি 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনার প্রেরণা জুগিয়ে-ছিলেন। খেতরির ষড়্‌বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসবে অচ্যুতানন্দ উপস্থিত থেকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন।

অচ্যুতানন্দ রাজা—ইনি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রসিকানন্দ ও মুরারির পিতা। সুবর্ণরেখা নদীতীরে রয়নীতে এঁর শ্রীপাঠ বিদ্যমান। ইনি উক্ত অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। ইনি শ্যামানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

অজিত ন্যায়রত্ন—অবস্থিতি-কাল অষ্টাদশ শতাব্দী। রচিত কাব্য-গ্রন্থ 'বকদূত'।

অজিত সিংহ—ইনি ছিলেন মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশের রাজা। এই বংশের বিখ্যাত রাজা পিতা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর অজিত সিংহ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৪৮ খ্রীঃ)। ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বারপুরুষ। ইনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কঠোর হস্তে রাজ্য শাসন করতেন। রানী ভবানী ও রানী শিরোমণি নামে এঁর দুই মহিষী ছিলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অজিত সিংহের মৃত্যু হয়। রাজা অজিত সিংহই কর্ণগড় রাজ্যের শেষ রাজা।

অর্জুন বিশ্বাস—ইনি ছিলেন নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। গুরু সেবায় ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

অর্জুন মিশ্র—বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের চম্পাহিটীয় কুলে অর্জুন মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার

নাম ছিল ভারতাচার্য পাঠক ঈশান মিশ্র। টীকাকার হিসাবে এঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। মহাভারতের প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে অর্জুন মিশ্র অন্যতম। এঁর টীকার নাম 'মহাভারতার্থসংগ্রহপ্রদীপিকা'। আবার শুধু 'মহাভারতার্থদীপিকা' ও 'ভারতার্থদীপিকা'ও বলা হয়েছে। অর্জুন মিশ্র হরিবংশকে মহাভারতের অংশবিশেষ বলে মনে করতেন, তাই ইনি হরিবংশেরও টীকা লিখেছেন। এছাড়া, ইনি পুরুষসূক্তের টীকাও রচনা করেছিলেন। অর্জুন মিশ্র শ্রীমান্দত্ত সত্যবান নামক এক ব্যক্তির আশ্রয়ে থেকে গৌড়েন্দ্র মহামন্ত্রী শ্রীমদ্বিশ্বাস রায়ের আদেশে মোক্ষধর্মার্থ-দীপিকা লিখেছিলেন। কুলপঞ্জিকার মতে অর্জুন মিশ্র ভট্টনারায়ণ থেকে পঞ্চবিংশ অধস্তন পুরুষ। এঁর নিবাস ছিল গঙ্গাতীরস্থ পাঁচপাড়া সম্ভবতঃ রাজশাহী জেলার গঙ্গাতীরস্থ চারঘাট থানার অন্তঃপাতী পাঁচপাড়া গ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। কারুর কারুর মতে ইনি পঞ্চদশ শতকের লোক। সংহিতা উপনিষদ শাস্ত্রে এঁর গভীর জ্ঞান ছিল।

অর্জুন মিশ্র—নবদ্বীপ সমাজের অগ্নিবেশ্য গোত্রীয় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। মিথিলার ঝাঝারপুর গ্রামে ছিল এঁর আদি নিবাস। অর্জুন মিশ্র তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে সস্ত্রীক মিথিলা থেকে বার হয়ে নানা তীর্থ পরিক্রমা করেন এবং অবশেষে নবদ্বীপে এসে বাস করতে থাকেন। পরে এঁর এই বংশে বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও স্মার্তের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

অর্জুনী—নৈহাটী গ্রাম নিবাসী। এঁর বাড়াতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ সহ তিনটি মহোৎসব করেছিলেন।

অতীশ—দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান দ্রঃ

অদ্বয়বজ্র—পালরাজ প্রথম মহীপালের সময়ের একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত। অনেক ক্ষেত্রে ইনি 'অবধূতপাদ' নামেও পরিচিত। এঁর অপর দুই নাম 'অদ্বয়গুপ্ত' ও 'অতুল্যবজ্র'। ইনি উত্তরবঙ্গের 'দেবীকোটে' বাস করতেন। এঁর আর এক নাম বা উপাধি ছিল মৈত্রীপাদ। ইনি সরোহের 'অধিষ্ঠান মহাকাল সাধনের তিব্বতীয় অনুবাদ করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ সরোহের বংশধর। সংস্কৃতে এঁর একুশখানি ছোট ছোট গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। কতকগুলি গ্রন্থের ইনি তিব্বতী অনুবাদ করেন।

অদ্বৈতপ্রভু বা অদ্বৈতাচার্য—ভক্তবৈষ্ণব ছিলেন। ইনি প্রথমে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাউড়ের অধিবাসী ছিলেন, পরে শান্তিপুরে বসবাস করেন। ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর

জন্ম হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের সময় এঁর বয়স ছিল ৫২ বছর। মধ্যযুগের বিখ্যাত হিন্দুরাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন অদ্বৈতের পূর্বপুরুষ। অদ্বৈতের প্রকৃত নাম ছিল কমলাক্ষ বা কমলাকর ভট্টাচার্য, অদ্বৈত তাঁর নাম নয় উপাধি। অদ্বৈতপ্রভুর পিতা কুবের (তর্কপঞ্চানন) পণ্ডিত লাউড়ের রাজা কৃষ্ণদাসের সভাসদ ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু পাঠ সমাপ্ত করে প্রথমে শান্তিপুরে এবং পরে নবদ্বীপে আগমন করেন। শান্তিপুরেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শান্তিপুরে বাসস্থান নির্মাণ করলেও তিনি নবদ্বীপে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। শান্তিপুরে শান্তাচার্য নামক এক অধ্যাপকের নিকট তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

অদ্বৈতপ্রভু নরসিংহ ভাদুড়ী নামক এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সীতা ও শ্রী নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ও অসীম ভক্তির জন্য সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাহ হয়েছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা হ'ত। কিন্তু ভক্তির অভাব দেখে অদ্বৈতপ্রভু ব্যথিত হতেন। তাঁর নিকট ভক্তিহীন জ্ঞানের কোন মূল্য ছিল না। তৎকালে নবদ্বীপবাসিগণের ধারণা জন্মেছিল যে ভগবানের নিকট অদ্বৈতপ্রভুর ঐকান্তিক প্রার্থনার ফলেই ভক্তিহীন বাংলাদেশে ভক্তির বন্যা বইয়ে দেওয়ার জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। অদ্বৈতপ্রভুর উৎসাহ ও উপদেশে বিশ্বরূপ (চৈতন্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা) ও বিশ্বম্ভর (চৈতন্য) সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে চৈতন্য-জননী শচীদেবী অদ্বৈতপ্রভুর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। শ্রীবাসের আঙিনায় শ্রীচৈতন্যের হরি সংকীর্তনে অদ্বৈতপ্রভু যোগ দিতেন। চৈতন্য পদস্পর্শে শ্রীবাস অঙ্গনের ধূলিকে তিনি অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞানে সংগ্রহ করতেন। যবন হরিদাস অদ্বৈতপ্রভুর অতিথি হওয়ায় সামাজিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈতপ্রভু দেহত্যাগ করেন। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ও ভক্তি ধর্ম প্রচারে শ্রীচৈতন্যের উপর অদ্বৈতপ্রভুর প্রভাব সর্বাধিক। অদ্বৈতপ্রভু প্রতি বছর রথের সময় মহাপ্রভুর দর্শনলাভের জন্য পুরী যেতেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময় হ'ত। এবং এই ভাবেই মহাপ্রভু তাঁর মাতা ও স্ত্রীর সংবাদ পেতেন। অদ্বৈতপ্রভু জগদানন্দের মারফৎ মহাপ্রভুকে শেষ সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তার অল্পদিন পরেই মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। ষড়দর্শন পাঠ করে তিনি কিছুকাল অদ্বৈতপন্থী হয়েছিলেন। সেই থেকেই সম্ভবতঃ তাঁর নাম হয়েছে অদ্বৈত আচার্য। বেদে অভিজ্ঞতার জন্য তিনি 'বেদপঞ্চানন' উপাধিলাভ করেন।

অদ্বৈতাচার্য—অদ্বৈতপ্রভু দ্র°

অদ্ভুতাচার্য—অদ্ভুতাচার্য সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্যের অনুবাদক। এই রামায়ণখানি এক সময় বাংলাদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। অনেক স্থানেই এই প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। অদ্ভুতাচার্য নাম নয়, উপাধি। কবির আসল নাম "বড়ু" নিত্যানন্দ বা নিত্যানন্দ আচার্য। পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্য (মতান্তরে কাশী আচার্য), মাতার নাম মেনকা দেবী। পাবনা জেলার সোনাবাজু পরগণায় বড় বাড়ি বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে অদ্ভুতাচার্যের জন্ম হয়। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে নিত্যানন্দের সাত বছর বয়সে স্বয়ং রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ে তাঁকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দেন ও তদুস্থিত শরাগে জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখে দেন। এই মহাশক্তির প্রভাবে নিত্যানন্দ অত্যন্ত অল্প বয়সে সমগ্র মহাকাব্য রচনা করে সমাপ্ত করেন এবং এই অদ্ভুত কৃতিত্বের জন্য তাঁর নূতন খ্যাতি হয় 'অদ্ভুতাচার্য'। কোন কোন পণ্ডিতের মতে নিত্যানন্দ বিশেষভাবে সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন বলে কবির নাম হয় অদ্ভুতাচার্য। কবি নিত্যানন্দের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন পণ্ডিত অদ্ভুতাচার্যকে আকবরের সমসাময়িক ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য সাঁতোলির রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন বলে অনুমিত হয়।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ মহাকাব্য কালজয়ী মহিমা অর্জন করেছে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু অংশ অদ্ভুতাচার্যের রচনাদর্শে প্রভাবিত। ইহা পরবর্তীকালেরই প্রক্ষেপ। অদ্ভুতাচার্য সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'রঘুবংশ' ইত্যাদি বিভিন্ন বিচিত্র রাম কাহিনী থেকে যথেচ্ছ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি কেবল বিচিত্র কাহিনীর সংগ্রাহক মাত্র নন, নিজ কল্পনা প্রভাবে নিত্য নূতন গল্প-রচনাও করেছেন নিজে। ফলে তাঁর গল্পাবলী স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এবং তাঁর কাব্য বাঙালীর সজীব জীবন-গাথায় পরিণত হয়েছে।

অধিসেন—প্রাচীন বঙ্গের শাকদ্বীপের গুপ্তবংশের যুবরাজ। কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় অশোক এঁকে রাজপুতানার গঙ্গানগরে নির্বাসিত করেন। পরে ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। অধিসেনের বংশের বহু রাজা দীর্ঘদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেছিলেন।

অনঙ্গমোহিনী দেবী—ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথমা কন্যা। রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী 'কণিকা', 'শোক গাথা' এবং

'প্রীতি' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

অনন্ত—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ইঁহাকে কৃত্তিবাসের পরেই রামায়ণের প্রাচীনতম কবি মনে করেছেন। ইনি সম্ভবতঃ কামরূপের অধিবাসী ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি কবি 'অনন্ত কন্দলী' নামে আসামে পরিচিত। এঁর অপর নাম রাম সরস্বতী। ইনি আসামের শঙ্করদেবের শিষ্য ছিলেন। কবি অনন্ত বাল্মীকিকে আশ্রয় করে তাঁর রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

অনন্ত আচার্য—পরম বৈষ্ণব ও গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই-এর শিষ্য। ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সেবাধিকারী হয়েছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িককালে জীবিত ছিলেন।

অনন্ত আচার্য—একজন প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার। এঁর পিতার নাম লক্ষ্মীধর। ইনি 'বেদার্থ দীপিতা' নামক যজুর্বেদের ভাষ্য এবং 'বেদার্থচন্দ্র' নামক মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

অনন্ত দাস—অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য। পদকর্তা হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। অনন্ত দাস ভণিতায় একুশটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া গেছে। অনন্ত দাস নামেও একাধিক কবির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনন্ত দাস—উড়িষ্যার একজন প্রাচীন ভক্তকবি। উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্র দেবের রাজত্বকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে গমন করে তথায় অবস্থান করেন ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নীলাচলে যান। উৎকলের বহু পণ্ডিত ও ভক্ত মহাপ্রভুর অনুগামী হন। যে পাঁচ জন ভক্তের নিষ্ঠাতে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হয়ে সঙ্গীদের আপত্তি ও অভিমান সত্ত্বেও তাঁদের সখারূপে সাদরে গ্রহণ করে "পঞ্চ সখা" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, অনন্ত দাস সেই পাঁচজনের মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ইনি ছিলেন পরম প্রিয়।

অনন্ত দীক্ষিত—ইনি ছিলেন একজন স্মার্ত পণ্ডিত। এঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ এবং অপর নাম যজ্ঞোপবীত। ইনি ১৭৫০ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ 'প্রয়োগরত্ন' বা 'স্মার্তানুষ্ঠান পদ্ধতি', 'মহারুদ্র পদ্ধতি' ও 'সপ্তসংস্থা প্রয়োগ' পাওয়া যায়।

অনন্ত দৈবজ্ঞ—নবদ্বীপের একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। ইনি জন্ম-পত্রিকা-প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

অনন্ত পণ্ডিত—পরম বৈষ্ণব। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে শান্তিপুর থেকে নীলাচলে যাবার পথে আটিসারা গ্রামে অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এঁর

রচিত কোন পদ আছে কিনা জানা যায় না।

অনন্ত পুরী—শ্রীঅভিরাম দাসের "পাট পর্যটনে" এঁর নামের উল্লেখ আছে। শ্রীপাট—বড় বেলুন (বর্ধমান)। শ্রীমান্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই ইনি শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর সেবা প্রচলিত করেন। আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দী। এক অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমীতে এঁর তিরোভাব হয়।

অনন্ত মাণিক্য—ধন মাণিক্যের বংশধর। ১৫৮৯ সালে আকবরের সঙ্গে সন্ধি করে সন্ধিবদ্ধ স্বাধীন রাজারূপে বাস করেন।

অনন্ত মিশ্র—কবি অনন্ত মিশ্র সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। ইনি ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারত রচনা করেছিলেন।

অনন্ত রায়—ইনি ছিলেন একজন বৈষ্ণব-পদকর্তা। ইনি শ্যামানন্দ-প্রভুর শাখাভুক্ত। শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ, রসিকানন্দের শিষ্য অনন্ত রায়। পদকল্পতরু ও গৌরপদ তরঙ্গিণীতে এঁর রচিত পদ আছে।

অনন্ত সেন—ইনি ছিলেন দ্রব্য-গুণের বিখ্যাত টীকাকার শিবদাস সেনের পিতা। ইনি গৌড়েশ্বর বারবক শাহের "অন্তরঙ্গ" অর্থাৎ চিকিৎসক ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ—বাঙালী, সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত রাজবংশ সম্ভূত। উড়িষ্যার গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা। উৎকল রাজ্য জয় করে ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এক সময় গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের উপর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি উড়িষ্যার পুরীর মন্দির ও কোণারকের সূর্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ইনি হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃত ও তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। অনন্তবর্মা চোড়-গঙ্গের বংশধর গঙ্গবংশীয়গণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছিলেন।

অনন্তরাম—প্রাচীন বাঙালী কবি। রচিত গ্রন্থের নাম ক্রিয়াযোগসার।

অনন্তরাম দত্ত—'ক্রিয়াযোগসার' এর অনুবাদ করেছিলেন। ইনি জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। পিতার নাম রঘুনাথ, মাতামহ রামদাস এবং বড় ভাই রামকৃষ্ণ। কবির নিবাস ছিল ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পারস্থিত সাহাপুর গ্রাম। কবির পিতামহের নাম কবি দুর্লভ। কবি 'বিশারদ' উপাধিবিশিষ্ট কোন লোকের শরণ নিয়ে 'ক্রিয়াযোগসার' লিখেছিলেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। ময়মনসিংহ জেলায় ইনি বিশেষ পরিচিত।

অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ—বিখ্যাত স্মার্ত। ইনি 'সহমরণবিবেক

ও 'বিবাদচন্দ্রিকা' নামে দু'খানি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

প্রথম গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক বাক্যে অনন্তরাম মহামহোপাধ্যায় রামচরণ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

অনাদিবর সিংহ—এই অনাদিবর সিংহ থেকেই কান্দী রাজবংশের উৎপত্তি।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত চম্পাহট্টি নামক স্থানের অধিবাসী। ইনি সেনরাজ বল্লাল সেনের গুরু ছিলেন। এঁর কাছে পুরাণ ও স্মৃতিশিক্ষা লাভ করেন। অনিরুদ্ধের দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হারলতা ও পিতৃদয়িতা। এই গ্রন্থদ্বয়ে অশৌচ, শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুর বিবিধ অনুষ্ঠানের ও নিত্যকর্মের বিস্তৃত আলোচনা আছে। অনিরুদ্ধ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি মীমাংসক কুমারিল ভট্টের মতবাদে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকরণিক। চম্পাহাটি গ্রাম ইনি দান হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে ইনি গঙ্গাতীরবর্তী বিহারপট্টক নামক গ্রামে বাস করতেন। বল্লাল সেন তাঁর 'দানসাগর' গ্রন্থে বলেছেন, "বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের গুরু, অনিরুদ্ধ তেমনি তাঁর গুরু ছিলেন।"

অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী—কোচবিহারের কামতাপুরের রাজা নরনারায়ণের রাজসভাপণ্ডিত। রাজার আদেশে ইনি রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের পদ পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। কবির পিতা ছিলেন ভীমসেন "কবিচূড়ামণি", বড় ভাই কবিচন্দ্র। এঁর নিবাস ছিল কামরূপে চমরিয়া (বা পাটচওরা) গ্রাম। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর ইনি রাজা শুক্লধ্বজের সভাপণ্ডিত হন। রাজসভায় পুরাণ পাঠক ও কবিদের মধ্যে অনিরুদ্ধ ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এঁর উপাধি ছিল "রামসরস্বতী"। ইনি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। এঁর পুত্র "পাঠক" গোপীনাথ দ্রোণপর্ব অনুবাদ করেছিলেন।

অনু—বৈদিক যুগে চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি তাঁর পুত্র অনুর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বঙ্গের দুর্গম স্থানে নির্বাসিত করেন। অনু সর্বপ্রথম বঙ্গে বসতি স্থাপন করে সমগ্র দেশে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম তাম্রলিপ্তে রাজধানী স্থাপন করেন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় অনুই বঙ্গের প্রথম রাজা। পরে এই অনুর বংশে শত শত রাজা জন্ম গ্রহণ করেন।

অনুপ বা অনুপম—শ্রীরূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কুমারদেবের পুত্র এবং শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। এঁর নাম "শ্রীবল্লভ" এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রদত্ত নাম "অনুপম"; কিন্তু সাধারণতঃ

ইনি "অনুপ" নামে পরিচিত। ইনিও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে প্রয়াগে গমন করলে "শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা।" বল্লভ ছিলেন রাম-ভক্ত। এঁর ভক্তির আধিক্য দেখে মহাপ্রভু এঁকে "অনুপম" নাম দিয়েছিলেন। ইনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের অধীনে টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। এঁর অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দী।

অনুপচন্দ্র—বাঙালী কবি। এঁর রচিত একখানি মনসার ভাসান পাওয়া গিয়েছে।

অনুভবানন্দ—শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী। "অনুভবানন্দ! কৃপা করহ আপুনি গাই যেন গৌর অবতার শিরোমণি।"

অনুভূতি স্বরূপাচার্য—আনন্দগিরির বিদ্যাগুরু। ইনি সারস্বত সূত্রের সারস্বত প্রক্রিয়া নামক এক ব্যাকরণ, গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্য ভাষ্যের টীকা, ন্যায়দীপাবলীর উপর চন্দ্রিকা টীকা এবং প্রমাণমালার উপর নিবন্ধ টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

অনুশূর—প্রাচীন বাংলার শূর-বংশীয় রাজা। এঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার সিংশব (বর্তমান সিঙ্গা) নামক স্থানে। সম্ভবতঃ ৯৩৬-৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি—আবির্ভাবকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। ইনি বেদান্তসূত্রের 'সমঞ্জসা-বৃত্তি' রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণগোপীর লীলা অবলম্বনে 'আমোদ' নামক পনের সর্গে বিভক্ত একটি কাব্যও ইনি প্রণয়ন করেন।

অন্ধুক ভট্ট—একজন বাঙালী জ্যোতিষ-নিবন্ধকার।

অবনীশূর—আদিশূরের পৌত্র ভূশূরের পুত্র। ইনি পালরাজাদের কাছ থেকে হৃত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

অভয়ঙ্করগুপ্ত—বাংলার পাল রাজত্বকালে ইনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। উড়িষ্যার ঝাড়িখণ্ডে এঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন ক্ষত্রিয়, মাতা ছিলেন ব্রাহ্মণী। শৈশবে সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়নের পর যৌবনে বেদবেদান্তে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ অর্হতের সাহচর্যে এসে ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কয়েক বছর নালন্দায় অবস্থান করে ইনি বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পরে ইনি বিক্রমশীলায় প্রধান আচার্য নিযুক্ত হন।

বিক্রমশীলায় অধ্যাপনার সময় ইনি প্রজ্ঞাপারমিতার এক মূল্যবান টীকা রচনা করেন। প্রজ্ঞাপারমিতার জন্য ইনি শাক্যমতালঙ্কার, অভিধর্মের জন্য লোকসংক্ষেপ, বিনয়ের জন্য ভিক্ষু

বিদ্যাতিলক এবং মধ্যমিকার জন্য মধ্যমামঞ্জরী রচনা করেন। আরও বহু গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন। তিব্বতী বৌদ্ধদের কাছে ইনি তাসি লামার অবতার।

ইনি প্রায় বিশখানি বজ্রখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে অন্তত চারখানার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান। যোগাবলী, মর্মকৌমুদী, বোধিপদ্ধতি ইত্যাদি এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রথমের দিকে ইনি ওদন্তপুরী বিহারের মহাযান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী। রামপালের রাজ্যাবসানের পূর্বেই এর মৃত্যু হয়।

অভয়া দেবী—"শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" রচয়িতা লোচনদাস ঠাকুরের মাতামহী। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

অভয়াকর গুপ্ত—ইনি সাধারণতঃ অভয়ঙ্কর গুপ্ত নামে পরিচিত। অভয়ঙ্কর গুপ্ত দ্র°।

অভিনন্দ—সংস্কৃত কাব্যে একাধিক অভিনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। সোড্‌ঢলের 'উদয় সুন্দরী কথা' (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের প্রথমার্ধ) নামক গ্রন্থে অভিনন্দ নামক এক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এই অভিনন্দ পালবংশীয় যুবরাজ হারবর্ষের (দেবপাল) সভাকবি ছিলেন। সম্ভবত ইনি নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ 'রামচরিত' ও 'কাদম্বরী-কথাসার'। 'কাদম্বরী-কথা সারে' অভিনন্দ জয়ন্তভট্টের পুত্র বলে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু 'রামচরিত' থেকে মনে হয়, কবির পিতার নাম শতানন্দ। এই থেকে এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা অভিন্ন কিনা, সে সম্বন্ধে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

অভিনন্দের ৫টি শ্লোক 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে,' ২২টি 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' ৬টি জল্হনের 'শুক্তিমুক্তাবলী'তে, একটি পদ্যাবলীতে এবং 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' ও 'সুভাষিতাবলী' প্রভৃতি কোষকাব্যে উদ্ধৃত হয়েছে।

'রামচরিত' কাব্যের উপজীব্য রামায়ণ কাহিনী। ৪০ সর্গে কাব্যটি রচিত। কাব্যটি প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ও সাবলীল।

'গৌড়' অভিনন্দের নামে 'যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ' নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থের সমগ্র বিষয়বস্তু ৬ প্রকরণ এবং ৪৬ সর্গে বিন্যস্ত। এই অভিনন্দ ন্যায় শাস্ত্র এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি "কেবাদীশ্বর সাহিত্যাচার্য গৌড়মণ্ডলালঙ্কার" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

অভিরাম (রামদাস)—বৈষ্ণব-

সমাজে দ্বাদশ-গোপাল নামে যে বার-জন ভক্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, রামদাস অভিরাম বা অভিরাম গোঁসাই ছিলেন তাঁদের মধ্যে সব-প্রধান। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলায় যোগদান করেছিলেন। ইনি একবার শ্রীখণ্ডে গিয়ে নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র বালক রঘুনন্দনের সঙ্গে নৃত্য করে যান এবং তাঁর বিশেষ শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। অভিরামের এক পত্নী ছিলেন। তাঁর নাম মালিনী। এবং অভিরাম কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। ইনি ছিলেন বিরাট শক্তিধর পুরুষ। বত্রিশজন লোকের বহনযোগ্য কাষ্ঠকে বংশীরূপে হস্তে ধারণ করেছিলেন। ইনি নাকি একবার এক দৌড়ে বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। আরও জানা যায় ইনি নাকি দণ্ডবৎ দ্বারা বহু বিগ্রহ ফাটিয়েছিলেন। 'অভিরাম লীলামৃত' ও 'অভিরাম গোস্বামীর বন্দনা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে অভিরাম সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে জানা যায় যে অভিরামের দেহে তিনমাস ব্যাপী কৃষ্ণাবেশ বর্তমান ছিল। ইনি সর্বদা ঈশ্বরভাবে কথা বলতেন। জয়ানন্দের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রামদাসের গৃহে ছ'মাস অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য থেকে নীলাচলে ফিরে এলে রামদাস গিয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করতে থাকেন। মহাপ্রভু এঁকে নিত্যানন্দের অন্যতম সঙ্গী হিসাবে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় গৌড় পথে সর্বপ্রথম রামদাসের দেহে গোপালভাব প্রকাশ পায়। তারপর ইনি পানিহাটি পৌঁছে নিত্যানন্দের একজন সঙ্গী হিসাবে তাঁর নৃত্যকীর্তনে যোগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়াতে থাকেন। জয়ানন্দ বলেছেন যে তিনি স্বয়ং অভিরাম গোঁসাইর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম নীলাচল গমনের পূর্বে খানাকুল কৃষ্ণনগরে গিয়ে অভিরাম ও মালিনার আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। 'মুরলীবিলাস' থেকে জানা যায় যে অভিরাম বাঘ্নাপাড়াতে গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্বীয় অসাধারণ শক্তি প্রভাবে অভিরাম বহু ব্যক্তিকে বশীভূত করে শিষ্যে পরিণত করেছিলেন। পদকর্তাগণ নানাভাবে অভিরামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন। 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থে পানিহাটি এবং খানাকুল-কৃষ্ণনগর উভয় গ্রামেই অভিরামের শ্রীপাট নির্দেশিত হয়েছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

অভিরাম কবীন্দ্রশেখর—বৈদ্যকুল-প্রদীপ অভিরাম কবীন্দ্রশেখর ছিলেন প্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং রাজা সীতারামের রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি রাজা সীতারামের নিকট হতে 'মহামহো-

পাধ্যায় উপাধি পেয়েছিলেন। পিতার নাম ছিল মধুসূদন কবিরাজ। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন অভিরামের উত্তর পুরুষ। সীতারাম অভিরামকে যে ভূমিবৃত্তি দান করেছিলেন তা আজও 'কবিরাজের তালুক' নামে পরিচিত।

অভিরাম গোস্বামী—শ্রীমহাপ্রভুর শাখা, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীদাম। শ্রীনিত্যানন্দ পারিষদ। 'রামদাস', 'রাম', 'অভিরামঠাকুর' ইত্যাদি নামে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ইনি শ্রীদাম সখা ও রামলীলায় ইনি ভরত ছিলেন। এঁর পত্নীর নাম মালিনীদেবী।

অভিরাম দত্ত (দাস)—'গোবিন্দ বিজয়' বা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। বৈষ্ণবীয় রীতিবশতঃ দুই এক স্থলে কবি নিজেকে 'দাস' বিশেষণেও চিহ্নিত করেছেন।

অভিরাম দাস—'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল। চৈতন্য-বন্দনা করে অভিরাম গ্রন্থারম্ভ করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কোথাও কোথাও 'গোবিন্দবিজয়' নামেও পরিচিত। কবি যে নিত্যানন্দের অনুচর অভিরাম গোসাঞি নন তা বোঝা যায় কাব্যের আরম্ভে দ্বাদশ গোপালের বন্দনা থেকে। কবির বিশিষ্ট ভণিতা, "গোবিন্দ পদার বিন্দ মধুলুব্ধ মতি অকিঞ্চন অভিরামদাসের ভারতী।" অভিরাম দাস ছিলেন মল্লভূমের অধিবাসী। এই অঞ্চলেই এঁর পুথি পাওয়া যায়।

অভিরাম দাস—'পাট-পত্তন' বা 'অভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়' নামক গ্রন্থরচয়িতা। এই গ্রন্থখানি 'পাট-নির্ণয়' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

অভিরাম দ্বিজ—এঁর রচিত রামায়ণের "অশ্বমেধ পর্ব" রচয়িতা। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে অবস্থিত ছিলেন। এঁর রচনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

অমর মাণিক্য—বাংলার বার-ভূঞার অন্যতম লক্ষ্মণ মাণিক্যের পুত্র। ইনি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। অমর রচিত নাটকের নাম 'বৈকুণ্ঠ বিজয়'। ইহা বানাসুরের কন্যা উষার কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

অমর মাণিক্য—ত্রিপুররাজ দেব মাণিক্যের পুত্র। ১৫৯৭-১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। অমর মাণিক্যের প্রধান কীর্তি "অমর সাগর" নির্মাণ। ইনি যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ও পদমর্যাদাসম্পন্ন রাজা ছিলেন তা এঁর দীঘি খনন কালেই বুঝা যায়। দীঘি খননকালে শ্রীপুরপতি চাঁদ রায় ৭০০, বাকলার বসুরা ৭০০, গোয়াল-পাড়ার গাজিরা ৭০০, ভাওয়ালের

রাজারা ১০০০, চট্টগ্রামের জমিদার ৫০০, ঈশা খাঁ ১০০০, ভুলুয়ার রাজা ১০০০ জন লোক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। অমর মাণিক্যই ইসা খাঁকে 'মছলন্দী' উপাধি দেন—আকবর দেন নি। অমর মাণিক্য নিজে পণ্ডিত ছিলেন এবং এঁর সভায় দু'শত ভট্টাচার্য সর্বদা শাস্ত্রালোচনা করতেন।

অমোঘ পণ্ডিত—শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। সাবভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা। ইনি মহাপ্রভুর অত্যধিক ভোজন বিষয়ক নিন্দা করে বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হলে প্রভু এঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

অম্বিকাচরণ—অবস্থিতিকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'পিকদূত'।

অযোধ্যারাম গোস্বামী—আঁজু গোঁসাই দ্রঃ

অযোধ্যারাম মিত্র—বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ব-পুরুষ। ইনি বাংলার নবাবের অনুগৃহীত দেওয়ান ছিলেন। নবাব এঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। অবস্থিতিকাল - অষ্টাদশ শতাব্দী।

অযোধ্যারাম রায়—কাশিমবাজার ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি হটু রায় নামে বিখ্যাত ছিলেন। মহারাজা আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ থেকে আনিয়েছিলেন, দক্ষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অযোধ্যারাম সেই দক্ষের অধস্তন দ্বাবিংশতিতম বংশধর। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দ্র—'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'র রচয়িতা। দক্ষিণ রাঢ়ের লোক। এঁর পাঁচালীতে সদাগরের নাম রত্নাকর, কন্যা সুশীলা, জামাই কাটোয়া নিবাসী সদানন্দ নাগ। বাণিজ্য যাত্রায় অনেকগুলি স্থানের নাম আছে। রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ।

অযোধ্যারাম সেন—ঢাকা জেলার পয়গ্রাম নিবাসী। সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৭৬ সালে ঢাকা জেলার বিখ্যাত ব্যক্তি লালা রামপ্রসাদ সেনের বিদুষী কন্যা আনন্দময়ীর সঙ্গে বিবাহ হয়। আনন্দময়ী অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন।

অয়াহিদ (আবদুল)—শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ গ্রামের অধিবাসী। এঁর রচিত ছেচল্লিশটি গান-সম্বলিত 'তত্ত্বকুলিয়া প্রেমের মিঠাই' ১৩৩২ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের একাধিক সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে।

অরুণ দত্ত—বাগ্ভটের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ের' 'সর্বাঙ্গসুন্দরা'খ্যা টীকা ও সুশ্রুতটীকা রচনা করেছিলেন। এঁর পিতার নাম মৃগাঙ্ক দত্ত। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে বিজয় রক্ষিত অরুণের মত খণ্ডন করেছেন।

সর্বানন্দের 'টীকা সর্বস্ব' (১১৫৯ খ্রীঃ) ও রায় মুকুটের 'পদার্থচন্দ্রিকা'য় (১৪৩১ খ্রীঃ) গ্রন্থকার ও তাঁর পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

শাব্দিক এক অরুণ দত্তের নাম পাওয়া যায়। বৈদ্য অরুণ দত্ত ও শাব্দিক অরুণ দত্ত একই ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন।

অহিপাল—কুমার পালের (১১২০ খ্রীঃ) পুত্র অহিপাল দ্বাদশ শতাব্দীতে মাহেশ থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গার উভয় পারের রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর রাজধানী চক্রদ্বীপ ত্রিবেণীর নিকট অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ শহরে পরিণত হয়েছে।

আ

আইনদ্দিন—ইনি সম্ভবতঃ 'সাহা আকবর' নামক জনৈক ফকিরের শিষ্য ছিলেন। এঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলার পনেরটি পদ পাওয়া গেছে। অপরাপর বিষয় অজ্ঞাত।

আউলচাঁদ — বাংলাদেশে "কর্তাভজা" ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর আত্মপরিচয় অজ্ঞাত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দশকে এঁর জন্ম হয়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামের মহাদেব দাস ছিলেন এর পালক পিতা। এঁর বাল্য নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র। বাল্যকাল থেকেই ইনি ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে আউলচাঁদ উলা গ্রাম ত্যাগ করে শান্তিপুরের ফুলিয়া গ্রামে আসেন এবং ঐখানে বলরাম দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণান্তে গুরুর সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্যটন করে কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী বজরা গ্রামে বাস করেন। এঁর ধর্মভীরুতা ও ত্যাগ দেখে লোকে বিস্মিত হয়ে যেত। এঁর উপদেশে বহু অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়েছে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আউলচাঁদ দেহত্যাগ করেন।

আউলিয়া ঠাকুর—গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কর্তৃক অনুষ্ঠিত রাস মহোৎসবে ইনি অনুচরগণ সহ যোগ দিয়েছিলেন।

আকবর আলি [সৈয়দ] ইনি একজন বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। শ্রীহট্ট জেলার 'গুবরাইল' পরগণার 'মামদপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁর পূর্ব নিবাস ছিল হবিগঞ্জের 'তবক'। এঁর পিতার নাম ছিল আবদুল আজিম। এঁর নাম ছিল 'সরপউদ্দিন', কিন্তু পরে ইনি 'আকবর আলী' নামে প্রসিদ্ধ হন। কবি প্রত্যেক গানের ভণিতায় নিজেকে 'ছাবাল আকবর আলী' বলে অভিহিত করেছেন। কবি শ্রীহট্টের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাধক কবি 'ছৈয়দ শাহনূরের' পুত্র 'শাহজহুর আলীর' শিষ্য ছিলেন। এঁর রচিত 'এস্কে দেওয়ানা', 'ফানায়ে জন' ও 'যৌবন বাহার' নামক

তিনখানি গ্রন্থ আছে। এই সব গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক মোট ২১টি গান আছে।

আকবর, ম হ ম্ম দ—"তমিম-গোলাল-চৈতন্য সিলালের" পুঁথি রচয়িতা। এতে তমিম গোলাল ও চৈতন্য সিলালের প্রেমকাহিনী বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ।

আকবর (সাহা)—এর ভণিতা যুক্ত একটি পদ 'গৌরপদ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। অনেকে অনুমান করেন ব্রজবুলি ভাষায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে রচিত এই পদটি সম্রাট আকবরের রচনা। সম্রাট নাকি সভক্ত শ্রীচৈতন্যের হরিসংকীর্তন চিত্র দেখে বিহ্বল হয়ে এই পদটি রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন কবি আকবর একজন ফকির ছিলেন।

আখণ্ডল ভট্টাচার্য বা **হলধর ভট্টাচার্য**—ইনি কুলপতি আখণ্ডল নামেও অভিহিত হতেন। ইনি নলডাঙা রাজবংশের পূর্বপুরুষ। ইনি এই বংশের প্রধান বলে এর নাম কুলপতি আখণ্ডল হয়েছিল। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত তেলিহাটী পরগণার এলাকাধীন ভাবরামর গ্রামে বাস করতেন। এঁর তিন পুত্র তপন, প্রিয়ঙ্কর, সন্তোষ। এই তপনের বংশেই নলডাঙার রাজগণের অভ্যুদয় হয়। আখণ্ডলের অপর নাম ছিল হলধর।

আ গ র ও য়া লি—পদকর্তা। ভণিতা দর্শনে এঁকে একজন মুসলমান কবি বলে মনে হয়। এঁর একটিমাত্র পদ পাওয়া যায়। এই একটিমাত্র কবিতাই এঁর বৈষ্ণবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য যে একজন মুসলমান কবির অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে এঁকে বিমোহিত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভিখারী করেছিল—এই কবিতাটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং ইহাই এই কবিতার বিশেষত্ব।

আগল পাগল—ইনি অদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য ছিলেন। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য ইনি বৈষ্ণবসমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

আচার্যপ্রভু—শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সংজ্ঞা। (অদ্বৈত আচার্য দ্র°) ২। উত্তরকালে শ্রীনিবাস আচার্যকেও এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।

আ চা র্য র ত্ন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতৃস্বসার স্বামী চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর আচার্য দ্র°।

'আচার্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর।'
এঁর ঘরে মহাপ্রভু দেবীভাবে নৃত্য করেন।

আচার্যশেখর—চন্দ্রশেখর দ্র°

আজম খাঁ—কাসেম খাঁ যোবানির মৃত্যুর পর আজম খাঁ ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইনি সুচারুরূপে দেশ শাসন করতে না পারায় রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা

উপস্থিত হয়। দিল্লীশ্বর সাজাহান এই সংবাদ পেয়ে আজম খাঁকে পদচ্যুত করেন। এঁর সময় ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি পান এবং পিপলি বন্দরে (বালেশ্বরে) তাঁদের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয়।

আলাউদ্দীন ওযান খাঁ—বাংলার অন্যতম পাঠান শাসক। ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি বাংলা শাসন করেন। ওযান খাঁ ত্রিহুতের রাজার নিকট থেকে সবলে কর আদায় করে উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু যাজপুরের রাজা এঁকে উড়িষ্যা থেকে তাড়িয়ে দেন।

আজিম ওস্মান—সম্রাট আরঙ্গজেবের পৌত্র। দুর্বলচেতা সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে অপসারিত করে আরঙ্গজেব পৌত্র শাহজাদা আজিম ওস্মানকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার গদিতে অভিষিক্ত করেছিলেন (১৬৯৭ খ্রীঃ)। এঁর সময়েই বিদ্রোহী পাঠান রহিম খাঁ ও শোভা সিংহ পর্যুদস্ত হয়েছিল। আজিম ওস্মান বর্ধমানে একটি জুমা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং হুগলীতে আপন নামানুসারে শাহগঞ্জ অথবা আজিমগঞ্জ নামক একটি স্থানের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানেও সে অঞ্চল রয়েছে। শাহজাদা আজিম ওস্মান বিদ্বান, কীর্তিমান ও সদ্বংশজ ব্যক্তিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। ইনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও আমীর ওমরাহগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে হদিস, মসনবি, মৌলানা রুমির কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করতেন। রাজ্যের উন্নতি বিধানে এঁর উদ্যম উৎসাহ দেখা যেত। ইনি বাংলাদেশে ইংরেজদের বাণিজ্যের কিছু সুবিধা করে দিয়েছিলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আজিম ওস্মান বাংলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আজিম ওস্মান ষোল হাজার টাকার পরিবর্তে কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের জমিদারী ক্রয় করবার অধিকার ইংরেজদের দিয়েছিলেন। তৎকালে পাটনা শহর এঁর নামে আজিমাবাদ নামে খ্যাত হয়।

আজিমন্নেসা—জিন্নতুন্নিসা দ্রঃ।

আজু গোঁসাই—বিশদ বৃত্তান্ত অজ্ঞাত। এঁর প্রকৃত নাম অযোধ্যারাম গোস্বামী বা রাজু গোস্বামী। ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। রামপ্রসাদের সমসাময়িক এবং স্বগ্রামবাসী। আজু গোঁসাই ছিলেন অত্যন্ত পরিহাসরসিক এবং প্রয়োজন মতো সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই উভয়কে একত্র করে উত্তর-প্রত্যুত্তর উপভোগ করতেন। তবে আজুর পরিহাস-মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে চাইলেই তিনি থামিয়ে দিতেন। উত্তরমূলক গান ছাড়া আজু গোঁসাইর অন্য ধরনের গান পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদ আজুকে কখনো আক্রমণ করেছেন বলে শোনা যায়নি। আজু গোঁসাইকে

লোকে পাগল বলত। কিন্তু সত্য সত্যই ইনি পাগল ছিলেন না। ইনি পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। কেউ কেউ বলেন এঁর নাম ছিল অক্রূর গোস্বামী, অচ্যুতানন্দ গোস্বামী অথবা রামচন্দ্র গোস্বামী। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

আজাউদ্দিন মোহাম্মদ শিরাণ খিল্‌জী—বঙ্গবিজয়ী পাঠান বীর বক্তিয়ার খিল্‌জীর একজন প্রধান সামন্ত। বক্তিয়ার খিল্‌জী চীন বিজয়ে অসমর্থ হয়ে বিপুল সৈন্য সহ প্রতিকূলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে পীড়িত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় আজাউদ্দিন তাকে বধ করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু মাত্র আট মাস রাজত্ব করার পর আলামর্দান খিল্‌জী কর্তৃক নিহত হন।

আতাউল্লা খাঁ। বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর ভ্রাতা হাজী আহম্মদের জামাতা। ইনি নবাব আলীবর্দীর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইনি বারবার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। নবাব এঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন।

আত্মারাম—আত্মরাম ভণিতায় একটি ও আত্মারাম দাস ভণিতায় দুটি পদ পাওয়া গিয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে পদগুলি নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত আত্মারাম দাসের রচনা।

আত্মারাম দাস—নিত্যানন্দ দাসের পিতা। এঁর পত্নীর নাম সৌদামিনী। শ্রীখণ্ডে বৈদ্য পরিবারে এঁর জন্ম হয়। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে আত্মারাম দাসের দু'টি পদ পাওয়া যায়। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

আদি গাঞি, ওঝা—ভট্ট নারায়ণের পুত্র। রাজা ধর্মপাল এঁকে গঙ্গাতীরে ধামসার নামক গ্রাম দান করেছিলেন।

আদিত্য রাম—"স্যমন্তক মণিহরণ" বা "কৃষ্ণ বিজয়" নামক আখ্যান কাব্য রচয়িতা। গ্রন্থ মধ্যে দ্বিজবর খাঁর ভণিতাও দৃষ্ট হয়। গ্রন্থের এক স্থানে জাম্ববানের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মণি নিয়ে যুদ্ধ বর্ণিত আছে।

আদিদেব রাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামবাসী ভবদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৌত্রের পৌত্র। আদিদেব বঙ্গরাজের বিশেষ বিশ্বাস ভাজন মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও সান্ধি বিগ্রহিক ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী। বিখ্যাত পণ্ডিত ও হরিবর্মার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট আদিদেবেরই পৌত্র।

আদিমল্ল— রঘুনাথ বা আদিমল্ল দ্রঃ।

আদি রূপরাম—ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যে ময়ূর ভট্টের নামের সঙ্গে আর একজন কবির নাম উল্লেখ আছে, তাঁর নাম রূপরাম। এ রূপরাম আমাদের পরিচিত রূপরাম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

ব্যক্তি এবং তাঁর অনেক পূর্ববর্তী। মানিকরাম এঁকে আদি রূপরাম বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভণে ধর্মগুণ গান।"

এই রূপরাম প্রাচীনতর বলেই এঁকে আদি বলেছেন। নাম-সামঞ্জস্যের জন্য আদি রূপরামের অনেক রচনা পরবর্তী রূপরামের নামে চলে গিয়েছে। আদি রূপরামের অন্য কোন পরিচয় বর্তমানে জানবার উপায় নেই।

আদিশূর—কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সামন্ত দরদ্ দেশাগত কবিশূরের পৌত্র এবং মাধবশূরের পুত্র। ইনি ছিলেন গৌড় রাঢ়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীন কুলীন নৃপতি। কান্যকুব্জরাজ চন্দ্রদেবের কন্যা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ইনি ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃ-পিতামহ প্রতিষ্ঠিত রাঢ়ের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই দেখলেন যে দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সদাচারের যথেষ্ট অভাব এবং দেশ শাসনের উপযোগী যোগ্য লোকও নেই। তাই এঁর রাজত্বের চতুর্দশ বছরে ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কান্যকুব্জের কোলাঞ্চ প্রদেশ থেকে রাঢ়ের ধর্মজীবন উন্নয়নের জন্য পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং রাজ্য পরিচালনার জন্য পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। তাঁদের আগমনে রাঢ়ের সমাজ জীবনে নূতন [illegible] হল। [illegible] রাজ সংস্কারের জন্য আদিশূর বাঙালীর হৃদয়ে চির জাগরূক হয়ে আছেন।

আনন্দচন্দ্র দাস—শ্রীচৈতন্যের এক ভক্ত জগদীশ-পণ্ডিতের জীবনী 'জগদীশ চরিত' বা 'জগদীশ বিজয়' লিখেছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে। ইনি ছিলেন জগদীশ পণ্ডিতের প্রশিষ্য ভাগবতানন্দের শিষ্যের প্রশিষ্য, অর্থাৎ শিষ্য পরম্পরায় পঞ্চম পুরুষ। ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশেই আনন্দচন্দ্র 'জগদীশ চরিত' রচনা করেছিলেন।

আনন্দচাঁদ গোস্বামী—বীরভূম জেলার সুপুর গ্রামের অধিবাসী। ইনি একজন মহাপণ্ডিত, পবিত্রচেতা, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন ইনি কঠোর ব্রহ্মচর্য দ্বারা জীবন-যাপন করতেন, ব্রত, উপবাস এবং দেবার্চনা এঁর জীবনের প্রধান কায ছিল। মহা বিপদে পড়লেও ইনি অধীর না হয়ে সমাহিতচিত্তে সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্বক তা থেকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করতেন। ইনি বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় ছিলেন। এঁর বর্ণ এত সুন্দর ও গৌর ছিল যে, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করবার সময় এঁর স্বচ্ছ গলনালীর মধ্যে তা দৃষ্টিগোচর হত। গোস্বামী প্রভুর অনেক শিষ্য ছিলেন। তাঁরা এঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। তৎকালীন বৈষ্ণবদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আনন্দচাঁদ বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক গৌরাঙ্গদেবের অবতার বিশেষ ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। মহাত্মাটীর

বর্গী দস্যুদের অত্যাচারের হাত থেকে ইনি এর নানা অলৌকিক শক্তিবলে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

আনন্দ দাস—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পঞ্চম অধস্তন। ইনি ঐ পণ্ডিতের অনুশিষ্য শ্রীভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে ১৭৪০-৫০শকে শ্রীজগদীশ চরিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

আনন্দপুরী—গৌরাঙ্গ ভক্ত। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। 'শ্রীআনন্দপুরী! প্রাণনাথ হৌক্ সে। নিরন্তর বৃন্দাবনে বিলসয়ে যে।'

আনন্দবন—স্মৃতিকার। এঁর রচিত গ্রন্থ 'রামার্চনচন্দ্রিকা'। গ্রন্থ সমাপ্তিসূচক বাক্যে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য মুকুন্দবনের শিষ্য বলে আনন্দবনের পরিচয় আছে। গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রামাণ্য।

আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক—১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বর্তমান ছিলেন। ইনি ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণ-মালা, ন্যায়-দীপাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করে অদ্বৈত মতের সমর্থন করেন। ইনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের একখানি টীকাও রচনা করেছিলেন।

আনন্দ ভট্ট—দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড় বংশীয় অনন্ত ভট্টের কুলোদ্ভব। ইনি নবদ্বীপাধিপতি বুদ্ধিমন্ত খানের সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। আনন্দ ভট্ট ১৪৩২ শকে অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে 'বল্লাল চরিতম্' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইনি গোপাল ভট্টের বল্লাল চরিত অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে জনশ্রুতি হতে সংগ্রহ করা বহু গল্পের বর্ণনা আছে।

আনন্দময়ী—রামগতি সেনের বিদুষী কন্যা। এঁর মাতার নাম সুমতা দেবী। পিতামহের নাম লালা রামপ্রসাদ সেন। খুলনা জেলার পয়োগ্রাম নামক গ্রামের অধিবাসী পণ্ডিত অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে আনন্দময়ীর বিবাহ হয় (১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে)। রাজনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিদেব বিদ্যালঙ্কারের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন করে এবং রাজা রাজবল্লভকে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আনন্দময়ী বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ইনি হরিদেব বিদ্যাবাগীশের পিতা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের ছাত্রী ছিলেন। খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেনের সঙ্গে ইনি "হরিলীলা" পাচালী কাব্য রচনা করেন (১৭৭২ খ্রীঃ)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

আনন্দরাম চক্রবর্তী—শ্রীহট্টের ছাতক নিবাসী। ইনি আনন্দী কবি নামেও খ্যাত। সম্ভবতঃ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থ পদ্মপুরাণ।

আনন্দী—প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কর্তৃক বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকার। এঁর ব্যাখ্যানকৌশল অতি প্রশংসনীয়। ১৬৪০ শকাব্দে ইনি "শীঘ্রবোধ" নামে ব্যাকরণ রচনা করেন

এবং এই গ্রন্থ 'নীলাদ্রৌ' 'বঙ্গসাগরে' শেষ হয়। ইনি একজন নৈষ্ঠিক গৌর ভক্ত ছিলেন। শীঘ্রবোধ ব্যাকরণের উদাহরণগুলি প্রায়ই শ্রীগৌর পক্ষে দেওয়া।

আনাসহিদ, পীর—বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামার সময় পীর সাহেব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে-ছিলেন। বীরভূমের রামপুরহাটের নলহাটীতে আনাসহিদ পীরের সমাধি আছে।

আপজন—ইনি ব্যাণ্ডওয়ালা ওয়েকম্যানের দলে বাঁশি-বাদকরূপে এদেশে আসেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলকাতা শহরের একখানি নক্সা প্রস্তুত করেছিলেন।

আফজল আলী- চট্টগ্রামের অধিবাসী, বাঙালী মুসলমান কবি। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি কিছু কিছু বৈষ্ণব পদ ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। ইনি 'নসিয়ৎ-নামা' শীর্ষক ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ও নীতি শাস্ত্রবিষয়ক একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন।

আবদুর রহিম খান— মুসলমান বৈষ্ণব কবি। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

আবদুল আলীম—সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম "হানীফার লড়াই।" এতে কারবালা প্রান্তরে হজরত ইমাম হোসেনের "শাহাদত্" বা ধর্মযুদ্ধে আত্মাহুতির পরে তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হানীফার সঙ্গে দুর্মতি এযীদের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল গফুর—অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। হিন্দু মুসলমান দেবতত্ত্বের অদ্ভুত সমন্বয়ে ইনি কাব্যরচনা করেছিলেন।

আবদুল নবী— সপ্তদশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা মুসলমান কবি। ফারসী "দাস্তানে আমীর হামজা" অবলম্বন করে ইনি ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর "আমীর হামজা" নামক একখানি বিরাট কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি আবদুল নবী চট্টগ্রাম জেলার ছিলপুর নামক স্থানে সিদ্দীকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন স্বভাব কবি।

আবদুল বারী [সৈয়দ]— বৈষ্ণবভাবাপন্ন একজন মুসলমান কবি। ইনি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাড়িয়া কাজিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত ৮৪টি গান 'আবেগ' নামক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গীতগুলি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক।

আবদুল মজিদ—অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। রাঢ়-উড়িষ্যা প্রান্তনিবাসী। রচিত গ্রন্থ 'রজবাহার'।

আবদুল মালীক [হেকিম] —একজন বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। ইনি শ্রীহট্ট শহরের অধিবাসী ছিলেন। এঁর রচিত ৮টি গান-সম্বলিত 'প্রেমের দেওয়ানা' প্রকাশিত হয়েছে।

আবদুল হাকীম—ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর একজন কবি। জানা যায় বর্তমান নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত সন্দীপের সুধারামে এঁর নিবাস ছিল। এঁর পিতার নাম আবদুর রজ্জাক। কবি শাহাবুদ্দীন নামক কোন পীরের চরণধ্যান করে "নূর নামা", "লালমতী সয়ফুল মূলুক" এবং "ইউসুফ জোলেখা" নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কবির ভাষা আলাওলের অনুসারী হলেও বেশ প্রাঞ্জল। সরল পয়ারে ইনি অনর্গল লিখতে পারতেন।

আবু রায়—বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি জাতিতে কপূর ক্ষত্রিয়। আবু রায় পঞ্জাব থেকে বাণিজ্য করতে এসে বর্ধমানে বসবাস স্থাপন করেন। অতঃপর ইনি ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পরগণার ফৌজদারের অধীনে চৌধুরী ও কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত হন। ইনি বহু অর্থের অধীশ্বর হয়েছিলেন। এঁর মৃত্যুর পর এঁর পুত্র বাবু রায় এঁর বিস্তৃত ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হন।

আবুল হুসন (মোহাম্মদ)—বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন একজন মুসলমান কবি। এঁর নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার 'পাগলা'র অন্তর্গত 'রাহির চর'। এঁর রচিত গ্রন্থ ১৬টি সঙ্গীত সম্বলিত 'পিরিতের ঢেউ'। এই গ্রন্থের ৬টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক। কবি 'দুলালী' পরগণার অন্তর্গত 'খাসিকাহন' নিবাসী 'সাহা জানউল্লা' পীর সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

আমান- অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবভাবাপন্ন বাঙালী মুসলমান কবি। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ-রচয়িতা।

আমিচাঁদ বা উমিচাঁদ—নবাব আলিবর্দীর সময়ে কলকাতার দেশীয় বণিকদের মধ্যে স্বনামধন্য আমিচাঁদ ছিলেন প্রধান। আলিবর্দীর সৈন্যদলের সঙ্গে ইনি বিহার থেকে বঙ্গদেশে আগমন করেন। আলিবর্দীর প্রসাদে উত্তরোত্তর ধনশালী হয়ে ইনি কলকাতায় বাণিজ্য কার্যালয় স্থাপন করে তথায় বাস করছিলেন। তাঁর কলিকাতাস্থ সুরম্য আবাস ও বৃক্ষবাটিকা লক্ষ্য করে সমকালীন ইংরেজ লেখকগণ এঁকে রাজাবিশেষ বলে গিয়েছেন। বঙ্গ-বিহারের প্রধান প্রধান স্থানে এঁর কাজ চলত। নবাব দরবারে আমিচাঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায় ইংরেজ কোম্পানী অনেক বিপদে এঁর সাহায্যে মফঃস্বলে দাদন দিয়ে কোম্পানীর বাণিজ্য লক্ষপ্রসর হয় রাজবল্লভের সঙ্গে এঁর বিশেষ পরিচয় ছিল।

আমিনা বেগম—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ নবাব আলিবর্দী খাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার জননী। এঁর স্বামীর নাম জইনউদ্দীন আহম্মদ খাঁ। চরিত্র সম্বন্ধে তৎকালীন লোক-

সমাজে তাঁর নানা কলঙ্কজনককাহিনী প্রচলিত ছিল। সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার পরে তাঁর ছিন্ন-ভিন্ন দেহ যখন হস্তীপৃষ্ঠে করে মুর্শিদাবাদ নগরী পরিভ্রমণ করান হয়, তখন আমিনা বেগম পুত্রের এই শোচনীয় পরিণাম দেখে অন্দরমহল থেকে রাস্তায় বার হয়ে আসেন এবং উন্মাদিনীর ন্যায় পুত্রের বিচ্ছিন্ন দেহের উপর পড়ে চীৎকার করে কাঁদতে থাকেন। এই সময় গুণ্ডা লাগিয়ে লাঠির গুঁতা মেরে এঁকে জোর করে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আমিনা বেগম-সাহেবাকে হত্যা করার জন্য জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঘসেটী বেগমের সঙ্গে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। এঁদের হত্যা করার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মীরজাফর তনয় মীরণ। ঢাকায় একটি নৌকায় চড়িয়ে এঁদের নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। আসন্নকাল বুঝে ঘসেটী বেগম কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু আমিনা বেগম বললেন, "দিদি, কাঁদিয়া কি হইবে? আমরা উভয়ে ভগবানের কাছে অশেষ অপরাধে অপরাধী। এইভাবে তিনি যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন, তাহা তাঁহার দয়া। মীরণের উপর বজ্রাঘাত হউক।" এর পরে উভয় ভগিনী একবার নমাজ পাঠ করেন। এবং একখানি কোরাণ শরিফ বগলে নিয়ে উভয়ে গলাগলি করে অতলজলে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করেন। শুনা যায় সেইদিন রাত্রেই মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল (১৭৬০ খ্রীঃ)।

আমীর জৈনুদ্দীন হরুউয়ি—পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন মুসলমান কবি। এঁর নাম একজন কবি হিসাবে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর 'শরফ্‌নামা'তে উল্লিখিত আছে। ফারুকী এঁকে "মালেকুশ শোয়ারা" বা রাজকবি বলেছেন। এতে মনে হয়, ইনি বারবক শাহ ও তাঁর পরবর্তী সুলতানদের সভাকবি ছিলেন।

আয়জদ্দিন মুন্সী—বাংলার মুসলমান কবি। এঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রাম। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'গোল আন্দাম'।

আরকুম—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন একজন মুসলমান কবি। শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'খিত্তা' পরগণার 'ধরাধরপুর' গ্রামে কবির নিবাস ছিল। ইনি ফকিরী গ্রহণ করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। এঁর মুর্শিদের নাম ছিল 'সাহা আবদুল লতিফ'। এঁর রচিত গন্থ ৯৪টি সঙ্গীত সম্বলিত 'হকিকত সিতারা'। উক্ত গ্রন্থের বহু পদে রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ আছে।

আরাব আলী বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ। নবাব এঁকে মুঙ্গের দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু এঁর বিশ্বাসঘাতকতায় মুঙ্গেরের দুর্গ শত্রু হস্তগত হয়।

আরিফ—অষ্টাদশ শতাব্দীর

বাঙালী মুসলমান কবি। রচিত গ্রন্থ 'লালমনের কেচ্ছা'। এই গ্রন্থে সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ইহা আরবী ও ফার্সী শব্দ মিশ্রিত বাংলাভাষায় রচিত। ইনি ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের লোক। নিবাস ছিল দেশড়ার নিকট তাজপুর গ্রামে।

আরিমত্ত—জিতারি নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বংশের কোনও এক শাখা হতে উদ্ভূত। আরিমত্ত ছিলেন শক্তিশালী রাজা। ইনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করতেন। ধর্মপাল নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজাকে আরিমত্তের পূর্বপুরুষ বলা হয়ে থাকে। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবত একাদশ শতাব্দী।

আর্যক্ষেমীশ্বর—বাংলার পাল রাজবংশের রাজা প্রথম মহীপাল দেবের সময়ে আর্যক্ষেমীশ্বর "চণ্ডকৌশিক" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। উহা ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

আর্যদেব—সিদ্ধাচার্য। ইনি ছিলেন সরহপাদের শিষ্য নাগার্জুনের শিষ্য। এঁর অবস্থিতিকাল নবম শতাব্দীর শেষার্ধ। প্রাচীন বাংলায় ইনি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' এঁর একটি পদ পাওয়া যায়।

আলমচাঁদ—বাংলার নবাব সুজাউদ্দীন খাঁর অধীনে সামান্য মোহরারের পদে কাজ আরম্ভ করেন। পরে রাজকার্যে ক্রমশ কৃতিত্ব দেখিয়ে দেওয়ান ও খালসা দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বাদশাহী দরবার থেকে এঁকে রায় রায়ান উপাধি ও এক হাজারী মনসবীর সনন্দ আনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেওয়ান হয়ে ইনি অধিকতর কার্যকুশলতা প্রদর্শন করেছিলেন। ইনি সরকারী আয় পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি করেছিলেন। ইনি নবাব সুজা খাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। নবাব অনেক সময় বিলাসে মত্ত থাকতেন। তাই আলমচাঁদ রাজ্য শাসনের অনেক কাজই সম্পন্ন করতেন।

আলাউদ্দীন আলীশাহ—পূর্ব নাম ছিল আলী মুবারক। তিনি লখনৌতির (লক্ষ্মণাবতী) শাসনকর্তা কদর খানের অধীনে সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতা ছিলেন। সোনারগাঁওর শাসনকর্তা ফকরুদ্দীন কর্তৃক কদর খান নিহত হলে (১৩৩৯ খ্রীঃ) মুখলিশ লখনৌতির শাসনকর্তা হন। কিছুদিন পরে মুবারক মুখলিশকে নিহত করে নিজে লখনৌতির শাসনকর্তা হন। 'তারিখ-ই মুবারক শাহী' থেকে জানা যায় যে আলী মুবারক বীর, নিঃস্বার্থপরায়ণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। আলাউদ্দীন আলী শাহের সমস্ত মুদ্রা ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশাল থেকে তৈরী হত।

আলাউদ্দিন এসলাম্ খাঁ—জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের তৃতীয় বছরে এসলাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমন এবং পাঠান ওসমান

খাঁকে শায়েস্তা করার জন্য এঁর উপর সম্রাটের বিশেষ নির্দেশ ছিল। বাংলাদেশে এসলামের শাসন সম্বন্ধীয় সুবন্দোবস্তের বিষয় অবগত হয়ে সম্রাট বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং একে পঞ্চ সহস্র সৈন্যের মনসবী পদ প্রদানে পুরস্কৃত করেন। এঁরই নবাবী আমলে দুর্ধর্ষ পাঠান ওসমান খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। ইনি মগদের দমনের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে এসলাম খাঁ বাংলাদেশে মানবলীলা সংবরণ করেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সুবে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইনি রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করে ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রেখেছিলেন। ঢাকা থেকে ইনি নানা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে বারভূঞা ও অন্যান্য রাজাদের বশীভূত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ

[দ্বিতীয়]—নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর (১৫৩২ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর রাজত্ব স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। ইনি মাত্র ন মাস রাজত্ব করেছিলেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এঁর খুল্লতাত ঘিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ফিরোজ শাহের নাম সুপরিচিত। কারণ সর্বপ্রথম বাংলা কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য এই ফিরোজ শাহেরই আজ্ঞায় রচিত হয়েছিল। এর লেখক ছিলেন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ। তিনি ফিরোজ শাহকে তাঁর কাব্যের মধ্যে "রাজা শ্রীপেরোজ সাহা" এবং "ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ" বলেছেন। যৌবনে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলা ভাষায় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং পিতার রাজত্বকালে তিনি যখন চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা, তখন শ্রীধর কবিরাজকে দিয়ে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়েছিলেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ—

বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বের পর হাবসী খোজারা বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করে কিছুকাল রাজত্ব করে। হাবসী রাজত্বে বাংলার জীবনে দেখা দিয়েছিল বিরাট বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খল সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, হত্যা এবং প্রজাসাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার – এই ছিল হাবসী রাজত্বের ধারা। বাঙালীর একজন সুশাসকের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। এমন সময় আলাউদ্দীন হোসেন শাহ হাবসী সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফর শাহকে হত্যা করে বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৯৩ খ্রীঃ)। তাঁর পূর্ব নাম ছিল সৈয়দ হুসেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নাম ধারণ করেন। রাজা হয়েই তিনি রাজ্যের অশান্তির মূল কারণ হাবসীদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

বহু হাবসী নিহত হল। অবশিষ্ট সমস্ত হাবসীকে নির্বিচারে বঙ্গের বাইরে নির্বাসিত করলেন। উচ্চ রাজপদে তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করেন। হুসেন শাহের সঠিক পরিচয় কিছু জানা যায় না। এ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন হোসেন আরবের মরুভূমি থেকে বাংলায় এসেছিলেন। আবার অনেকের মতে তিনি বাংলারই সন্তান। অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজ যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা বলে বঙ্গাধিপ হয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই হোসেন শাহ নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ও প্রজাদের আস্থা অর্জন করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করেন এবং দেশ সুশাসন করেন।

১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিকন্দর লোদীর সঙ্গে হোসেন শাহের বিহার সীমান্তে সংঘর্ষ হয়। রাজ্যবিস্তার মানসে হোসেন শাহ আসাম, উড়িষ্যা ত্রিপুরা ও আরাকানে যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিলেন। প্রায় সমগ্র বাংলা, এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এছাড়া, কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

রাজ্য সুশাসনের জন্য তিনি যোগ্য লোকই নিযুক্ত করতেন। সেখানে তাঁর ধর্মের কোন গোঁড়ামি ছিল না। সেজন্য বহু জ্ঞানী, গুণী ও কৃতি হিন্দু তাঁর রাজ্যে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যের উজীর ছিলেন পুরন্দর খান বা পুরন্দর বসু, গৌর মল্লিক ছিলেন তার সেনাপতি, রূপ ও সনাতন দুই ভাই ছিলেন তাঁর আমাত্য ও সচিব। মুকুন্দ দাস ছিলেন তাঁর প্রধান চিকিৎসক, তাঁর দেহরক্ষী ছিলেন কেশবছত্রী, অনুপ ছিলেন মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ। তাছাড়া, যশোরাজ খান, দামোদর ও কবিরঞ্জন প্রভৃতি কবিরা হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খুব আদর করতেন, বহু পণ্ডিতকে দান দিতেন এবং বহু বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করে চলেন বিপ্রদাস পিপিলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাদের কাব্যে হোসেন শাহের রাজ্যশাসনের প্রশংসা করেছেন। হোসেন শাহের রাজ্য কালের সর্বপ্রধান ঘটনা নবদ্বীপে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও মানবধর্ম প্রচার। এই সময় বাংলা সাহিত্যে শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।

যশোরাজ খান রচিত একটি গীতে :
"শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ,
সেই এহি রস জান।।" অন্যত্র :
"নৃপতি হুসেন শাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি।"

দীর্ঘ ২৬ বছরকাল রাজত্ব করে হোসেন শাহ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা

যান। মোগল-পূর্ববর্তী যুগে বাংলা দেশে যে সমস্ত স্বাধীন সুলতানের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহই সবচেয়ে বিখ্যাত। 'হুসেন শাহের আমল' কথাটি শুনলেই বাঙালীর মনে একটি অত্যুজ্জ্বল গরিমাময় আলেখ্য ফুটে ওঠে। 'হোসেন শাহের আমল' বলতে বাঙালী এমন এক কালের কথা বোঝেন, যখন এদেশের মানুষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—সব দিক দিয়েই উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদিপর্ব হ'তে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

"নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।"

চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা হোসেন শাহের রাজত্বকালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইজন্য চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গের সঙ্গে হোসেন শাহের নাম বাঙালীর স্মৃতিতে স্থায়ী আসন লাভ করে আছে।

আলাওল—আলাওল ছিলেন চট্টগ্রাম রোসাঙ্ রাজসভার দ্বিতীয় বিখ্যাত কবি। প্রথম ছিলেন দৌলত কাজী। কবির জন্মস্থান ছিল "মুলুক ফতেহাবাদ"-এর জামালপুর গ্রামে। গ্রামটি খুব সম্ভব বর্তমানের ফরিদপুর জেলায়। আলাওলের পিতা ছিলেন ঐ মুলুকের নবাব সমসের কুতুবের সভাসদ। যৌবনে একদিন পিতার সঙ্গে জলযাত্রাকালে পথে হার্মাদ অর্থাৎ পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। যুদ্ধ করে পিতা নিহত হন। আলাওল বহু দুঃখ ভোগের পর রোসাঙে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি প্রথমে অশ্বারোহী রাজসৈনিকের কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু আলাওলের বিদ্যোৎসাহিতা ও নাম যশ বেশী দিন গোপন রইল না। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি। আরবী-ফারসী-সংস্কৃত-বাঙ্গালায় তাঁর যেমন অধিকার সঙ্গীত, নাট্যকলায়ও তেমনি দখল ছিল। তাঁর এই অসামান্য গুণপনার কথা শীঘ্রই রোসাঙের রাজার প্রধান অমাত্য মাগনঠাকুরের কানে উঠল। মাগন অচিরেই আলাওলের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হলেন। মাগনঠাকুরের বিশেষ অনুরোধে কবি মীর মহম্মদ মালিক জায়াসি-রচিত 'পদুমাবৎ' বা 'পদ্মাবৎ' হিন্দী কাব্যের বঙ্গানুবাদ করেন। ইহা ঠিক মূলানুবাদ নয়। বহুস্থানে কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই অনূদিত কাব্যের নাম 'পদ্মাবতী'। আলাওলের রচিত কাব্যের মধ্যে এই 'পদ্মাবতী'ই শ্রেষ্ঠ। আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল'। এই কাব্যখানির রচনা সুরু হয় মাগন ঠাকুরের অনুরোধে। কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বে মাগন লোকান্তরিত হওয়ায় কবি তখন রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার অমাত্য-শ্রেষ্ঠ

সোলেমানের আশ্রয় লাভ করেন। এই সোলেমানেরই অনুরোধে তিনি দৌলৎ কাজীর অপূর্ণ কাব্য 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করেন। এর পর আলাওলের জীবনে দেখা দিল দারুণ দুর্বিপাক। শাজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংগ্রাম শুরু হলে শাহ্‌-সুজা ঔরংজীবের ভয়ে রোসাঙ রাজ-সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময় কবির সঙ্গে সুজার হৃদ্যতা স্থাপিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সুজা রোসাঙ্‌ রাজের বিরাগভাজন হয়ে সপরিবারে বিতাড়িত হন। ঐ সময় মৃজা নামে এক দুষ্ট বুদ্ধি লোকের মিথ্যা কারসাজিতে আলাওল কারারুদ্ধ হন। কিন্তু দুরভিসন্ধি ধরা পড়ায় তিনি পঞ্চাশ দিন পরে মুক্তি পান। এর পর রোসাঙের কাজী সৈয়দ মামুদ শাহার আশ্রয় লাভ করেন। আলাওলের রচিত অন্যান্য কাব্য: সপ্ত বা হপ্ত পয়কর, 'দারা সেকেন্দর নামা', 'তোহ্‌ফা' প্রভৃতি।

আলাওল রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কিছু কিছু পদ-কবিতাও রচনা করে ছিলেন। ইনিও সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। এঁর জন্ম সাল খুব সম্ভব ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

আ লি ব র্দী খাঁ—বাংলার সুবিখ্যাত নবাব। ইনি ছিলেন তুর্কী বংশীয়। এঁর পূর্ব নাম ছিল মির্জা মহম্মদ আলী। এর পিতামহ বাদশা আওরঙ্গজেবের 'দুধভাই' বলে, বাদশাহ-সরকারে এঁরা সুপরিচিত ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার নবাব, তখন সুজাউদ্দীন খাঁ ছিলেন উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম। আলিবর্দী তখন সুজা উদ্দীনের অধীনে একশত টাকার একটি চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজকার্যে এঁর প্রখর বুদ্ধি ও যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা দেখে সুজাউদীন এঁকে অবিলম্বে এক বিভাগের ফৌজদারের পদে অধিষ্ঠিত করেন। আলিবর্দীর কার্যকুশলতায় সুজার শাসনকার্যের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় তিনি আলীর উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। মুর্শীদকুলীর মৃত্যুর পর সুজাউদ্দীন বাংলার নবাব হ'লে আলিবর্দীকে তিনি বিহারের শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়েই এর আলিবর্দী খাঁ উপাধি ও মনসর্বা (সেনানায়কত্ব) প্রাপ্তি ঘটে।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত ক'রে বাংলার মসনদে সমাসীন হন। সিংহাসনে আরোহণ করেই আলিবর্দী শত্রুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। এজন্য তাঁকে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয়েছিল। এবং প্রতিটি যুদ্ধেই ইনি জয়লাভ করেছিলেন। বাংলার বীর নবাবদের মধ্যে আলিবর্দী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। আলিবর্দীর রাজত্বের প্রধান ঘটনা মারাঠা-দস্যু বা বর্গীদের দ্বারা বাংলা আক্রমণ। ভাস্কর পণ্ডিত প্রভৃতির

নেতৃত্বে বর্গীরা বাংলা দেশে এসে গ্রাম নগর লুট-পাট করত এবং বাংলার নবাবের কাছ থেকে রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দাবী করত। শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আলিবর্দীকে বর্গীদের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। বর্গী নেতা ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দী কর্তৃক কৌশলে নিহত হন। আলিবর্দী উদার হৃদয়, ন্যায় বিচারক ও প্রজানুরাগী নবাব ছিলেন। ইনি এঁর অগাধ ঐশ্বর্য মুক্ত হস্তে দান করতেন। এঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ঘসেটী ও আমিনা বেগম এঁর দুই কন্যা। আমিনার গর্ভজাত দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকে ইনি প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করতেন। এই সিরাজদ্দৌলাকেই ইনি বাংলার মসনদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী পদে মনোনীত করেছিলেন। সিরাজের প্রতি আলিবর্দী এমন স্নেহান্ধ ছিলেন যে তাঁর শত অপরাধও ইনি উপেক্ষা করে যেতেন। আলিবর্দীর অত্যধিক আদরেই সিরাজ পরবর্তীকালে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলেন।

এদেশে ইংরেজ বণিকদের ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আলিবর্দী বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাই ইনি তাদের সুনজরে দেখতেন না। এবং যাতে ইংরেজরা ক্ষমতাশালী হতে না পারে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সর্বজনপ্রিয় নবাব ১৬ বছর রাজত্ব করে পরলোক গমন করেন।

নবাব আলিবর্দীর চরিত্রে রাজোচিত সদ্গুণের ভাগ সবিশেষ পরিস্ফুট। মনস্বিতার উৎকর্ষ ও চরিত্রগুণে তিনি ঐতিহাসিক যুগের প্রধান নরপতিগণের মধ্যে এক উচ্চতর আসন পাওয়ার যোগ্য। চিরদিন একমাত্র পরিণীতা পবিত্রতা ধর্মপত্নীতে অনুরক্ত থেকে ইনি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায়, মুসলমান—মুসলমান কেন, সবদেশীয় চরিত্রহীন রাজকুলের মধ্যে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাঁর প্রাত্যহিক রাজকার্য ও ধর্মালোচনা আদর্শ স্থানীয়। তিনি অবসরকালে গুণী পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে সদালাপে সংপ্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত করতেন। শান্তির সময় প্রজাসাধারণের সব প্রযত্নে মঙ্গল সাধনের বিষয়ে মনোনিবেশ করতেন। এক ঐতিহাসিকের মতে "বঙ্গদেশের সৌভাগ্য যে বিপ্লবের দিনে সরফরাজের মতো দুর্বলচিত্ত লোকের হস্ত হইতে রাজদণ্ড নবাব আলিবর্দীর মত লোকের হস্তে পাড়য়াছিল।"

আলিমদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। এঁর রচিত একটিমাত্র পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

আলিমর্দন—বক্তিয়ার খিলজির অধীনস্থ নারানকোই স্থানের শাসনকর্তা। অনেকের ধারণা

বক্তিয়ার তিব্বত জয়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে আলিমর্দন তাঁকে হত্যা করেন (১২০৫ খ্রীঃ)। বক্তিয়ারের মৃত্যুর পর মহম্মদ শিরাণ বঙ্গদেশের রাজা হয়ে আলিমর্দনকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কারারক্ষককে ঘুষ দিয়ে আলিমর্দন কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে দিল্লীশ্বর কুতুবুদ্দিনের অনুগ্রহ লাভ করেন। এর ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শিরাণকে নিহত করে দিল্লীশ্বরের সনদ নিয়ে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হন (১২০৮–১২১১ খ্রী)। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর আলিমর্দন স্বেচ্ছাচার পূর্বক নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলে ঘোষণা করেন। এরপর তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল। শেষে তিনি অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। শুধু হিন্দুদের নয়, খিলজিবংশীয় অনেক বড় লোককে তিনি অবিচারে হত্যা করেন। তার সর্দারগণের চক্রান্তে তিনি ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন।

আলিমহম্মদ—অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় মুসলমান কবি। ইনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। বাসস্থান ছিল সম্ভবত চট্টগ্রামে।

আলিমিঞা—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। ইনি চট্টগ্রাম জেলার সুলতানপুর গ্রামের অধিবাসী। এঁর রচিত একটি মাত্র পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

আলিমেচ—উত্তরবঙ্গের মেচ জাতীয় একজন প্রধান ব্যক্তি। পাঠান বিজয়ের প্রাক্কালে ইনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করে 'আলিমেচ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বক্তিয়ার খিলজীর তিব্বত অভিযানের সময় ইনি তার পথ প্রদর্শক রূপে গড়শালেপের কীর্তিযুক্ত আবর্ধন নগরের নিকট তাকে সসৈন্যে নিয়ে যান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বর্তমান ছিলেন।

আলিরাজা—চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত ওশাইন গ্রামের অধিবাসী। ইনি সাধারণতঃ 'কানুফকির' নামেই প্রসিদ্ধ। এর গুরুর নাম ছিল 'কেয়ামুদ্দিন'। এর রচিত প্রত্যেক গ্রন্থে এবং বহু সংগীতে গুরুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। এর রচিত গ্রন্থগুলির নাম ধ্যানমালা, সিরাজ কুলুপ, জ্ঞানসাগর, যোগ কালন্দর, ষটচক্রভেদ। কবিরচিত ১৬টি রাধাকৃষ্ণলীলাপদ ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। তাছাড়া, আরও কয়েকটি পদ 'আলো', 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' স্থান পেয়েছে। এর রচিত দুটি শ্যামাসঙ্গীতও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

আলেকজাণ্ডার সোমা দ্য করোসী— করোসী, আলেকজাণ্ডার সোমা দ্য দ্রঃ।

আসমান তারা—বাংলার নবাব নশরৎ শাহের কন্যা। রাজা গণেশের পুত্র যদুর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।

আ স র ক আলী—বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'আখালিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁর রচিত ৩৬টি গান-সম্বলিত 'সমছুল ইছলাম আসিকে বারাম' গ্রন্থ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়।

আস্কর খাঁ—ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন

ই

ইক্রার খাঁ—বাংলার নবাব বারবক শাহের রাজত্বকালে দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকুটের শাসনকর্তা ছিলেন। পরে সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা হন। সেই সময় ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে ইনি একটি ভজনালয় নির্মাণ করে দেন।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন: বখতিয়ার খিলজী—জাতিতে তুর্কী, বংশে খিলজী এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তাঁর পিতৃভূমি ছিল সিস্তানের পূর্ব সীমান্তবর্তী ঘুর এবং গরমশীর অঞ্চল। সুতরাং বসাতিতে তিনি ছিলেন আফগান। তার পিতৃ পরিচয় বা বংশ গৌরব কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং দুর্জয় সাহসী। তিনি গজনীতে উপস্থিত হয়ে শিহাবুদ্দীন ঘুরীর অধীনে সৈন্য বিভাগে কর্মপ্রার্থী হন। ইখতিয়ার উদ্দীন ছিলেন খর্বাকৃতি দীর্ঘবাহু। এই দুটি লক্ষণ তুর্কী সমাজে অকল্যাণের ইঙ্গিত ছিল। তাই তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়। তখন তিনি ভারতের দিকে অগ্রসর হন। দিল্লীতে তখন কুতুবুদ্দীন শিহাবুদ্দীন ঘুরীর প্রতিনিধি। কিন্তু সেখানেও তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। এতেও হতোদ্যম না হয়ে ইখতিয়ার উদ্দীন পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। এবং বদায়ুনের শাসনকর্তা হিজবরউদ্দীনের অধীনে বেতনভোগী সৈনিকের পদে নিযুক্ত হলেন। অল্পকাল পরেই তিনি বদায়ুন পরিত্যাগ করে অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসাম উদ্দীনের অধীনে পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত হন (১১৯৭ খ্রীঃ)। তাঁর সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে হুসামউদ্দীন তাঁকে বর্তমানে মির্জাপুর জেলার পূর্ব দক্ষিণ কোণে ভাগবত এবং ভুইলী নামক দুটি পরগণার জায়গীর প্রদান করেন। ক্রমে এই ভাগবত এবং ভুইলী মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের শক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠল। প্রথমেই তিনি গাহড়বালের সামন্ত রাজাদের পরাজিত করলেন এবং তারপর মুনের ও বিহার অঞ্চলের বহুস্থান লুঠ করলেন। বৎসরাধিককাল

এইভাবে হিন্দুরাজ্য, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করে ইখতিয়ারউদ্দীন প্রচুর অর্থ ও ধনসম্পদ সংগ্রহ করে এক সেনাদল গঠন করলেন। এই সেনাদল নিয়ে তিনি ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে মগধের পাল রাজবংশের শেষ রাজা গোবিন্দ পালদেবকে আক্রমণ, পরাজিত ও নিহত করলেন। মুসলমান সেনাবাহিনী নালন্দা, ওদন্তপুর ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারগুলি বিধ্বংস করল। এই সব বিহারে সংরক্ষিত বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি জ্বালিয়ে দিল। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দেই হানা বা গাদেশ—ত।। নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। বঙ্গরাজা বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ছেড়ে পলায়ন করলে বক্তিয়ার প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। পরে বারেন্দ্রার পাল রাজবংশের সামন্তদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করে একে একে সমগ্র উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন এবং তথায় বারেন্দ্রের ব্রাহ্মণদিগকে জায়গীরদার নিযুক্ত করে বিশেষ শক্তিশালী হন এবং তাদের সাহায্যে বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবন এই সময় বক্তিয়ারকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বক্তিয়ার মেচ জাতীয় এক নায়ককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে তাকে 'আলি' উপাধি দেন। আলি মেচের উপদেশে বক্তিয়ার দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে তিব্বত জয়ের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর জীবন সংশয় দেখা দেয়। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগত হন। প্রথম স্বাধীনতা অপহরণকারী বিদেশী দস্যুরূপে বক্তিয়ারের নাম বঙ্গ-ইতিহাসে চিরকলঙ্কিত হয়ে থাকবে। অনেকের ধারণা বক্তিয়ারের অধীনস্থ এক শাসনকর্তা আলিমর্দান রোগশয্যায় শায়িত বক্তিয়ারকে হত্যা করেছিলেন।

ইচ্ছাময়ী দেবী—ইনি "ইচ্ছা" নামেও অভিহিত। ইনি ছিলেন শ্যামানন্দ প্রভুর বিখ্যাত ভক্ত মুরারির পত্নী। ইনি অত্যন্ত গুণবতী ও ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

ইন্দুমুখী দেবী—ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যা। বিষ্ণুপুরের রাজসভাপণ্ডিত শ্রীনিবাস শিষ্য শ্যামাদাসাচার্যের পত্নীই ইন্দুমুখী দেবী। ইঁহার জাত পুত্রই শ্যামাদাস আচার্য বা চক্রবর্তী।

ইন্দ্রদ্যুম্ন পাল—মুসলমান বিজয়ের সময়ে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে ইন্দ্রদ্যুম্ন পাল নামে পালরাজবংশের এক রাজা মগধের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। মুঙ্গের জেলায় কতকগুলি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। লোকের ধারণা ঐগুলি ইন্দ্রদ্যুম্নের স্মৃতি।

ইন্দ্রপাল—একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে

(আসাম) রাজত্ব করতেন। এর পিতামহ ছিলেন রত্নপাল এবং পিতা পুরন্দর পাল। এর তাম্রশাসনের শিববন্দনাটি বড় সুন্দর।

ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র—বাঙালী বৈষ্ণব কবি। ইনি 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি জয়ানন্দের আত্মীয়।

ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি—উত্তরবঙ্গের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। এঁর কন্যা মানিনী দেবী পরম বিদুষী ও স্মৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্না ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত চন্দ্রমঙ্গল ন্যায়লঙ্কার মানিনী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ইবন হোসেন—ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ একজন নৌ সেনাপতি। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সন্দ্বীপ বিজয়ে ইনি অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী—এর আদি নিবাস ছিল জোনপুরে। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন সুলতানের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। ইনি 'ফরঙ্গ ই ইব্রাহিমী' নামে ফার্সী ভাষার একটি শব্দকোষ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি 'শরফনামা' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত।

ইব্রাহিম খাঁ—শায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি সুবাদারী লাভ করে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকায় গমন করে শাসন সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হন। ইনি উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত ব্যক্তিদের নিকট দয়া ও ন্যায়পরতার দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। ইনি এত দয়ালু ছিলেন যে একটি পিপড়েকেও উৎপীড়িত হতে দিতেন না। এঁর সময়ে ইংরেজরা আবার এদেশে বাণিজ্য করার বিশেষ সুবিধা পায়। ইব্রাহিম মাদ্রাজ থেকে চার্নক সাহেবকে এদেশে এনে পুনরায় বাণিজ্য করার আমন্ত্রণ করলেন। ইব্রাহিমের সময়ের প্রধান ঘটনা বর্ধমানের অন্তর্গত চিতোয়া ও বারদার জমিদার শোভা সিং ও আফগান দলপতি রহিম খাঁর সম্মিলিতভাবে বাংলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ। ইব্রাহিমের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা বাংলার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই ঘটনা জানতে পেরে ইব্রাহিম খাঁকে অপসারিত করে তার পৌত্র আজিম ওসমানকে বাংলা বিহার-উড়িষ্যার গদিতে অভিষিক্ত করেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইব্রাহিম বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ—মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাংলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগ খাঁকে উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করে নিজে জাহাঙ্গীর

নগরে (ঢাকা) অবস্থান করে বঙ্গদেশের শাসন-সংরক্ষণ করতেন। ইনি আজীবন দিল্লীশ্বরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। শাজাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বঙ্গদেশ অধিকার করলে ইব্রাহিম খাঁ শাজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

ইব্রাহিম মালেক-উল-উলমা—শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের মুসলমান শাসনকর্তা মুসাফিরের চতুর্থ পুত্র। ইনি বিদ্যাবত্তার জন্য 'মালেক-উল উলমা' উপাধি প্রাপ্ত হন। বার ভূঁইয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ ইসা খাঁর পিতা কালিদাস গজদানী (সুলেমান) এঁরই নিকট মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।

ইব্রাহিম শুকুকর শাহ—বাংলার বর্ধমান জেলার একজন সাধক ফকির। ইনি প্রথম জীবনে জল বাহকের কাজ করতেন। তারপর সুফী সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষদের নিকট ধর্ম বিষয়ক উপদেশ লাভ করে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হন। পরে কাব্য ও ধর্মগন্থ সকল রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইম্পে, এলিজা—স্যার এলিজা ইম্পে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাংলার প্রথম প্রধান বিচারপতি হয়ে আসেন এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ম্যাডাম্ এণ্ড ফ্রান্সিসের মোকদ্দমায় বিচারপতি হাইড ও চেম্বারের সঙ্গে ইনি একত্র বিচার করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের বিচারেও ইনি সভাপতিত্ব করেন এবং ফাঁসির হুকুম দেন।

ইয়ার লতিফ—নবাব সিরাজ উদ্দৌলার অন্যতম সেনানায়ক নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ইনি একজন ষড়যন্ত্রকারীর প্রথমে স্থির করেছিল যে সিরাজের পরিবর্তে তারা ইয়ার লতিফকে নবাব করবে। লতিফ ইংরেজদের সাহায্য লাভের জন্য গোপনে দূত পাঠিয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফরের ন্যায় ইয়ার লতিফও সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিলেন। ইনিও এঁর অধীনস্থ সৈন্যদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেননি।

ইয়েট্স্, উইলিয়ম—উইলিয়ম ইয়েটস ছিলেন একজন বিশিষ্ট পাদ্রী বা মিশনরী, একজন প্রসিদ্ধ ভাষা তত্ত্ববিদ এবং প্রাচ্য ভাষাসমূহে খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থাদির অনুবাদক। তার শিক্ষক কেরীর পরেই তাঁর স্থান।

১৭৯২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডের লোবরা নামক স্থানে ইয়েট্স জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮০৫ সালে 'ময়রা' জাহাজে পাদ্রীরূপে তিনি কলকাতায় আসেন। এবং শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে শিক্ষানবীশি শুরু করেন। এ সময় তার প্রধান কাজ ছিল প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন। ১৮২০ সালে তিনি একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা এবং একটি সংস্কৃত শব্দকোষ সঙ্কলন করেন। হিতোপদেশ, নলোদয়

প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ সংস্করণও তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮২৫ সালে ইয়েট্স্ লোয়ার সার্কুলার রোড চার্চের কর্মাধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করে সমগ্র বাইবেল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাছাড়া, জন বানিয়ানের "Pilgrims Progress" এবং "Banters' call to the unconverted" তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও সম্পাদনে তিনি তৎপর ছিলেন। তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: পদার্থ বিদ্যাসার, জ্যোতির্বিদ্যা, সত্য ইতিহাস সার, প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়, সারসংগ্রহ, Introduction to Bengali Language.

ইরকান—বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। ইনি শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। এঁর রচিত একটি মাত্র পদ মোহাম্মদ আসরফ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ বাউল' প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

ইরপান সা [মোহাম্মদ]—বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। এঁর নিবাস ছিল কাছাড় জেলার লাঠি গ্রাম। এঁর রচিত গ্রন্থ ৩১টি সঙ্গীত সম্বলিত 'মারীকতি উদাস বাউল'। উক্ত গ্রন্থের ৫টি সঙ্গীত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক।

ইরেজ খাঁ—নবাব সিরাজ উদ্দৌলার শ্বশুর। ইনি নবাবের পরামর্শদাতাও ছিলেন। কিন্তু নবাবের বিপদকালে নবাবকে কোনও রূপ সাহায্য করেননি। পলাশী যুদ্ধের পর পলায়নের সময় নবাব আর্তিকাতরভাবে এঁর সাহায্য ভিক্ষা করেও বিফল মনোরথ হন। পরে ইনি মিরজাফরের সঙ্গে যোগদান করেন।

ইলাহি বক্স—একজন ঐতিহাসিক। মালদহ জেলার অধিবাসী। 'খুরসিদ জাঁহা' নামক ফার্সী ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইলিয়াস খাজা—সম্পূর্ণ নাম ইলিয়াস খাজা সামসউদ্দিন ভাঙ্গর। সিদ্ধি খেতেন বলে লোকে এঁকে ভাঙ্গরা উপাধি দিয়েছিল। ১৩১৩ ৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি বাংলার শাসন কর্তা ছিলেন। এঁর পুত্রই সেকেন্দর শাহ।

ইষ্ট, সার এডওয়ার্ড হাইড—(১৭৬৪-১৮৪৭) জামাইকা দ্বীপে জন্ম। ১৭৮৬ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। কিছুকাল পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন। ১৮১৩-২১ পর্যন্ত ইনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কলকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপনকর্তাদের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোক্তা।

ইসমাইল গাজী—পঞ্চদশ শতাব্দীতে রঙ্গপুরের দক্ষিণ কাঁটা-

তুখাবের নিকটে অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করতেন। সেখানে 'গাজীর দরগা' এখনো বিদ্যমান।

ইসলাম খাঁ তরিন—ইনি ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইনি ও এঁর কয়েকজন সহকারী মগদস্যুগণকে বিতাড়িত করে চাটগাঁ অধিকার করেন।

ইসলাম খাঁ মেসেদি নবাব—পূর্বনাম মীর আবদুল সলাম। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ইনি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিপতি ও বাংলার সুবেদার ছিলেন। বাংলাদেশে থাকবার সময় ইনি জাফর-উদ-দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইসলাম খাঁ—অপর নাম নবাব ইতিকাদ উদ্দৌলা। ইনি প্রসিদ্ধ শেখ সেলিম চিস্তির পৌত্র এবং আবুলফজলের ভগিনীপতি ছিলেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর এঁকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। ১৬১৩ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। ইনি বাংলার বিদ্রোহী আফগান সর্দার ওসমান খানকে পরাজিত ও নিহত করেন। এবং এই ওসমান খাঁর মৃত্যুতেই বাংলাদেশে আফগান শক্তি চিরতরে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়।

ইস্রাইল, সৈয়দ শাহ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের মুসলমান শাসনকর্তা সৈয়দ শাহ দাবক্সের পুত্র। ইনি বিদ্যাবত্তার জন্য দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক 'মুলুক উল উলামা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "মার্শেতে মদালেল ফওয়ায়েদ" নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

ঈ

ঈশা খাঁ—ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বার ভূঞাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঞা। অযোধ্যাগত রাজপুত বৈশ্য কালিদাস গজদানী ছিলেন এঁর পিতা কালিদাস দিল্লীর বাদশাহের সৈন্যদের নিকট পরাজিত ও নিহত হলে বালক ঈশা খাঁ ও এঁর ভ্রাতা ইসমাইল খাঁ তুরাণী বণিকদের নিকট বিক্রীত হয়েছিলেন। পরে পিতৃব্য কুতব খাঁ স্নেহবশে কৌশলে এঁদের বাংলাদেশে সোনার গাঁয়ে আনয়ন করেন। অল্পদিন মধ্যেই ঈশা খাঁ তাঁর নানা সদগুণের দ্বারা সকলের সুখ্যাতি লাভ করে পিতৃব্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ সোনার গাঁয়ের শাসনকর্তা হয়ে বসেন। কেউ কেউ বলেন তিনি প্রথমে বাংলার স্বাধীন সুলতান দায়ুদ খাঁর সেনাপতি ছিলেন দায়ুদের পর নিজ বাহুবল ও বুদ্ধি কৌশলে বাংলার একজন প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার বা ভৌমিক হয়ে ওঠেন। ক্রমে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা অঞ্চলে জমিদারী বিস্তার করে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করেন। তিনি সোনার গাঁ পরগণার খিজিরপুরে

দুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এবং দিল্লীর সম্রাটকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন। এবং বাদশাহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নানা রাজনৈতিক ছলচাতুরী খেলতেন। কয়েক বার অবাধ্যতায় অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বাদশাহ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তেজস্বী সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে বাংলায় পাঠালেন তাঁকে দমন করার জন্য। সাহাবাজ খাঁর কাছে প্রথমে পরাজিত হয়ে ঈশা খাঁ পলায়ন করেন। কিন্তু সুচতুর ঈশা খাঁ কৌশলে সাহাবাজকে বিপর্যস্ত করে আবার নিজ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এবার সাহাবাজের সাহায্যার্থে আসেন উজির খাঁ। উজির খাঁর মৃত্যু হলে অম্বররাজ মানসিংহ আসেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য। মানসিংহ ঈশা খাঁর রাজধানী খিজিরপুর অবরোধ করলেন। প্রথম যুদ্ধে মানসিংহ ঈশা খাঁর কিছুই করতে পারলেন না। বরং মানসিংহের এক জামাতা নিহত হলেন। তখন ঈশা খাঁ মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। মানসিংহ সম্মত হয়ে তরবারি হস্তে এগিয়ে এলেন। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি ভেঙ্গে গেল। তখন ঈশা খাঁ আপন তরবারি রাজা মানসিংহকে দিতে চাইলেন। কিন্তু মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশা খাঁর উদারতা, সাহস ও বীরত্বে খুসী হয়ে তাঁকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে আপ্যায়িত করে নানা উপহার প্রদান করেন। মানসিংহ তাঁকে 'সোনার গাঁ'র সর্বময় শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করলেন। ঈশা খাঁ নিরুপদ্রবে স্বাধীন-ভাবে রাজ্য শাসন করলেন। এই সময় দিল্লীর সম্রাট ঈশা খাঁকে "দেওয়ান" ও "মসনদ-ই-আলি" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বীর ঈশা খাঁ পরলোক গমন করেন। ঈশা খাঁ প্রকৃত বীর ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন। ঈশা খাঁ রাঙামাটিতে, এগার সিন্ধুতে, কলা-গাছিয়ায়, জঙ্গলবাড়ী এবং ত্রিবেণীতে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিবেণীর দুর্গ ছিল সবচেয়ে সুদৃঢ়।

ঈশা খাঁ মসনদ্-ই-আলি— ষোড়শ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার রসুলপুর-নদী তীরবর্তী হিজলীর শাসনকর্তা। এঁর পূর্ব নাম ছিল বাহাদুর খাঁ। রাজ্যের উন্নতি কামনায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ইনি সামরিক শক্তিতে বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় (কচুরায়) এই ঈশা খাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্য হিজলী আক্রমণ করে অধিকার করেন এবং ঈশা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন (১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

ঈশান—সনাতন গোস্বামী যখন গৌড়েশ্বরের বন্দিশালা থেকে পলায়ন করে বৃন্দাবন যাত্রা করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ঈশান নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। পাতড়া পর্বতের নিকট এসে সনাতন এক ভৌমিকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভৌমিক তাঁকে অত্যন্ত সমাদর করায় সনাতনের মনে সন্দেহ হয়। কারণ,—স্থানটি দস্যু তস্করের জন্য বিখ্যাত ছিল। সঙ্গী ঈশানকে তিনি গোপনে জিজ্ঞেস করলেন যে তার নিকট কোন অর্থ আছে কিনা। ঈশানের সঙ্গে সাতটি মোহর আছে শুনে সনাতন ঈশানকে তিরস্কার করেন এবং মোহর সাতটি নিয়ে ভৌমিককে প্রদান করেন। ভৌমিক বলল যে ঐ সাতটি মোহরের জন্য সেই রাত্রেই তাদের হত্যা করত। তারপর সেই রাত্রেই ভৌমিক লোক দিয়ে তাদের পর্বত পার করে দিল। পর্বত পার হয়ে সনাতন পুনরায় ঈশানকে জিজ্ঞেস করলেন, যে তার কাছে আরও মোহর আছে কিনা। ঈশান বললেন, 'আরও এক মোহর আছে।" সনাতন তখন সেই মোহর সহ ঈশানকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী বৃন্দাবনের পথে চললেন।

ঈশান—সেনবংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের মহামাত্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঈশান শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য দৈনিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দু'খানি 'পদ্ধতি' রচনা করেন। এঁর পিতার নাম ধনঞ্জয় ও মাতা উজ্জ্বলা। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম আহ্নিক পদ্ধতি।

ঈশান—বৃন্দাবনবাসী। শ্রীরূপ গোস্বামী যখন বিটলেশ্বরগৃহে শ্রীগোপালজিউকে দর্শন করতে গিয়ে সেখানে একমাস অবস্থান করছিলেন, তখন অন্যান্য বহু মুখ্য ভক্তের সঙ্গে এই ঈশানও তার সঙ্গে ছিলেন।

ঈশান দাস—শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বাসী গৃহভৃত্য। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করে গেলে ঈশান শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা শুশ্রূষ করতেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পরলোক গমনের সময়ও ইনি জীবিত ছিলেন। এঁর অবস্থিতি কাল পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী।

ঈশান দেব—ত্রিপুরার রাজা কেশবদেবের পুত্র। দাসবংশীয় কবি মাধবদাস এঁর সভায় অবস্থান করতেন। ঈশান দেবের অবস্থিতি-কাল ১১-১২ খ্রীষ্টাব্দ। মধুকোষের প্রবন্ধে এবং জ্বর নিদানের ১৩ সূত্রীয় ব্যাখ্যায় বিজয় রক্ষিত এঁর নামের উল্লেখ করেছেন। ঈশানকৃত কোনও গ্রন্থের নাম জানা যায় না। তবে জানা যায় যে তিনি চরক সংহিতার ও মাধব নিদানের টীকা লিখেছিলেন।

ঈশান নাগর—তিনি ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের লাউড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর

তখন তাঁর বিধবা মাতা তাঁকে নিয়ে শান্তিপুরে আসেন এবং অদ্বৈতপ্রভুর পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিরোধানের পূর্বে অদ্বৈতপ্রভু ঈশানকে জন্মভূমি লাউড়ে ফিরে গিয়ে চৈতন্যলীলা প্রচারের আদেশ দেন। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর আদেশে ঈশান ৭০ বছর বয়সে বিবাহ করেন। লাউড়ে বসেই কবি অদ্বৈতপ্রভুর জীবনী 'অদ্বৈতপ্রকাশ' কাব্য রচনা করেছিলেন। খুব সম্ভব ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়েছিল।

ঈশানেশ্বর সর্বাধিকারী—প্রখ্যাত সর্বাধিকারী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ্বর বসুর কনিষ্ঠ সহোদর। ঈশানেশ্বর দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ সাহের উজীর ছিলেন (১৪০৯)। ভারত সাম্রাজ্য শাসনে এঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

ঈশ্বর ঘোষ—আনুমানিক দশম বা একাদশ শতাব্দীতে মহা-মাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ উত্তর বঙ্গের সম্ভবতঃ দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্ত-রাজা ছিলেন। তিনি কামরূপ জয় করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। তাঁর প্রপিতামহ ধূর্ত ঘোষ রাঢ়দেশের অধিপতি ছিলেন। ঈশ্বর ঘোষের পিতার নাম ধবল ঘোষ, পিতামহ বাল ঘোষ এবং মাতার নাম সদ্ভাবা।

ঈশ্বর নাগ—ইনি বঙ্গাধিপ ভোজবর্মার তাম্রশাসন লিপিবদ্ধ করেন। এঁর পিতার নাম ছিল দত্তনাগ।

ঈশ্বর পুরী—কুমারহট্ট নিবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দর আচার্যের পুত্র। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। ঐ সময় ইনি এঁর দীক্ষাগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট অবস্থান করে তৎপ্রবর্তিত প্রেম ও ভক্তি ধর্মসম্বন্ধে সুশিক্ষিত হন। মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোধানের পর ঈশ্বরপুরী ছিলেন তাঁর যথার্থ উত্তরসাধক। মাধবেন্দ্রের শেষ জীবনে ঈশ্বর পুরী সর্বদাই গুরুর কাছে থেকে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতেন। এবং গুরুকে কৃষ্ণলীলা পাঠ করে শুনাতেন। মাধবেন্দ্র এঁকে বর দিয়ে বলেছিলেন, "কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন।" তাঁর এই আশীর্বাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনে সর্বাংশে সার্থক হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য যখন কিশোর তখন একবার ঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপে এসে অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে উঠেন। অদ্বৈত ও ঈশ্বরপুরী উভয়ে উভয়কে দেখে আকৃষ্ট হন। এই সময় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পথে একদিন গৌরাঙ্গের আলাপ হয়। ঈশ্বরপুরী কয়েক মাস নবদ্বীপে ছিলেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্য ও গদাধর পণ্ডিত প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন। ঈশ্বরপুরী গৌরাঙ্গের অন্তরের ভক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। পুরীর পাণ্ডিত্য ছিল যথেষ্ট। তবে প্রধানত তাঁর

প্রেম ও ভক্তিভাব দেখে গৌরাঙ্গদেব তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনিই শ্রীচৈতন্যকে উদার ধর্মের প্রতি প্রলুব্ধ করেছিলেন।

এরপর গয়াগমনকালে গয়াধামেই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় ঈশ্বর পুরীকে দেখে গৌরাঙ্গ অধীর হন এবং তাঁর নিকট দীক্ষামন্ত্র প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরপুরী তখন তাঁকে দশাক্ষরী গোপালমন্ত্র ও উপযুক্ত উপদেশাদি দান করে তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল গমনের অল্পকাল পরেই ঈশ্বর পুরীর তিরোধান হয়। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

ঈশ্বর বৈদিক—ইনি একজন কুলগ্রন্থ রচয়িতা। ইনি সেন বংশীয় রাজাদের কুলগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ 'সদ্বৈদিক কুল পঞ্জিকা'।

ঈশ্বর সেন—সিধো সেন বা সিদ্ধেশ্বর সেনের পুত্র। এঁর অবস্থিতিকাল ১১-১২ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি ভিষক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। এঁর রচিত কোন গ্রন্থের হদিস পাওয়া যায় না। তবে মধুকোষে উদ্ধৃত বচন থেকে বুঝা যায় যে তিনি অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতার টীকা লিখেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার—ভাগবতের কিয়দংশ অনুবাদ করেছিলেন। এই অংশের নাম "প্রভাস-খণ্ড।" গ্রন্থখানির রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী।

ঈশ্বরী দেবী—শ্রীনিবাস আচার্যের প্রথমা পত্নী এবং শিষ্যা। ইনি বর্ধমান জেলার জাজিগ্রাম নিবাসী জমিদার গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা। ঈশ্বরীদেবীর দুই ভ্রাতা, শ্যামদাস ও রামচরণ চক্রবর্তী। ঈশ্বরীর পূর্ব নাম ছিল দ্রৌপদী। দীক্ষা প্রদানের পর শ্রীনিবাস প্রভু এঁর নাম করণ করেন ঈশ্বরী। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

উ

উইলকিন্স, উইলিয়ম—ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী। ইনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ইংরেজীতে ইনি ভাগবদ্গীতার অনুবাদ করেন।

উইলকিন্স, স্যার চার্লস—প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রধান হোতা। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমরশেটশায়ারের ফ্রোম নামক স্থানে এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ছিল ওয়াল্টার উইলকিন্স। ১৭৭০ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করে রাইটাররূপে বাংলাদেশে—

কলকাতায় আসেন। এখানে সেক্রেটারির অফিসে দু বছর কাজ করে ইনি মালদহে কোম্পানীর কুঠিতে সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপে প্রেরিত হন। কোম্পানীর কর্মচারীরা তখন পর্যন্ত এদেশের ভাষা ও সাহিত্য শিখবার কোনই প্রয়োজন অনুভব করতেন না। দূরদর্শী উইলকিন্স সাহেবই সর্বপ্রথম এদেশের সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যগত আত্মীয়তা গড়ে তোলার কথা চিন্তা করে বাংলা, ফার্সী ও সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। উইলিয়াম জোন্সের পূর্বেই ইনি সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এবং জোন্সকে ইনিই সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করেছিলেন। ১৭৭৯ সালে সংস্কৃত ভাষায় ইনি একখানি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ইনি ছিলেন সুবিখ্যাত অনুবাদক। সংস্কৃত মহাভারতেরও অপূর্ব অনুবাদ করেছিলেন। ১৭৮৪ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠায় উইলকিন্সের অবদান অসামান্য। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-প্রণেতা হ্যালহেডের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুর অনুরোধে ইনি বাংলা টাইপ তৈরীর কাজে অভিনিবিষ্ট হন। নিজের হাতে ইস্পাত কেটে অক্ষর ও ছাঁচ তৈরী করেন। শ্রীরামপুরের পঞ্চানন নামক এক বাঙালী কর্মকারকে ছেনিকাটা ও হরফ-ঢালাইয়ের কাজে দক্ষ করে তোলেন। উইলকিন্স সাহেবকে বাংলার ক্যাক্‌স্টন (ক্যাক্‌স্টন অব বেঙ্গল) বলা হয়। ইনি নাগরী এবং ফার্সী হরফও তৈরী করেছিলেন।

দীর্ঘ ষোল বছর এদেশে অবস্থান করে উইলকিন্সের স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং ১৭৮৬ সালে স্বদেশে ফিরে যান। ১৭৮৭ সালে ইনি সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাছাড়া, মনুসংহিতার অংশবিশেষ এবং শকুন্তলা অনুবাদ করেছিলেন। ১৮০০-১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ইনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে বহাল ছিলেন। এই সময় ইনি অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। ১৮৩৩ সালে ইনি 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৮৩৬ সালের ১৩ মে লণ্ডনে এঁর মৃত্যু হয়।

উইলসন, হোরেস হেম্যান —(১৭৮৬-১৮৬০) প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ। সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮১৬-৩২ সাল পর্যন্ত কলকাতার টাঁকশালে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৮১১-৩৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছর রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর রচনাবলী য়্যাংলো সংস্কৃত ডিক্‌সনারী, থিয়েটার অব দি হিন্দুজ। তাছাড়া, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের মেঘদূত, মৃচ্ছকটিক, মালতী-মাধব, উত্তর রামচরিত, বিক্রমোর্বশী, রত্নাবলী এবং মুদ্রা-রাক্ষস ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন।

উছমান—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। এঁর নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'ঢাকা দক্ষিণ' পরগণার স্নানমপুর গ্রামে। এঁর রচিত ৫৮টি সঙ্গীত সম্বলিত গ্রন্থ 'হকিকতে মারিফত'। কবি তার আত্মপরিচয়ে বলেছেন:

"পিতার নাম মহাম্মদ আচিম জানিবার ॥
ঢাকা দক্ষিণ পরগণায় ঠিকানা আমার।
থানা গোপালগঞ্জ জান শ্রীহট্ট শহর ॥
স্নানমপুর মৌজায় জান গরিবের ঘর ॥"

উড, মার্ক—লেফটন্যান্ট কর্নেল মার্ক উড সুপ্রসিদ্ধ মানচিত্রকর আপজনের পূর্বে ১৭৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ কমিশনারের জন্য সমগ্র কলকাতা শহরের সার্ভে করে একখানি নক্সা তৈরী করেছিলেন। এই কাজ করতে দু'বছর সময় লেগেছিল এবং আটাশ হাজার টাকা খরচ হয়। এতে সহরের প্রত্যেকটি বাড়ী দেখান হয়েছে।

উত্তম দাস—রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্ন প্রকাশ' গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদক। সুপ্রসিদ্ধ বনবিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে ১৬৬১ শকে ইনি এই অনুবাদ শেষ করেন বলে অন্তিমবাক্যে প্রকাশিত।

উদয়নাচার্য—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও সমাজ-সংস্কারক। বৃহস্পতি আচার্যের পুত্র। ইনি কাশীতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন। ইনি বরেন্দ্রের অধিবাসী। এঁর জন্মস্থান ছিল বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার অধীন নিশিন্দারা গ্রাম। এঁর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী। কথিত আছে এঁর পিতা বৃহস্পতি আচার্য জিষ্ণনি নামক বৌদ্ধাচার্যের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। পুত্র উদয়ন পিতার অপমান ও অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে মৃত্যু পণ রেখে বৌদ্ধাচার্যের সঙ্গে বিচার আরম্ভ করেন। বিচারে এঁর জয়লাভ হয় ও তাতে বৌদ্ধাচার্যের প্রাণদণ্ড হয়। উদয়নাচার্য কাশী প্রবাসে কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, কণাদসূত্রের টীকা, আত্মতত্ত্ববিবেক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

উদয়রাজ—গৌড়ের অধিবাসী। স্বদেশ ত্যাগ করে ইনি দিল্লী ও আজমীঢ়ের চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজের সেনাপতি হন। 'হাম্মির মহাকাব্য' হতে জানা যায় মুহম্মদ ঘুরীর হাতে পৃথ্বীরাজ যখন বন্দী হন, তখন ইনি স্বীয় প্রভুকে উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে শত্রুসৈন্যের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। মুহম্মদ ঘুরী তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করেন। প্রভুর হত্যার পরে উদয়রাজ

শোকে উন্মত্ত হন এবং দিল্লী উদ্ধারের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

উদয়রাম বিশ্বাস, রায়—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সীতারামের পিতা। ইনি "ভীমাদাদা" নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি ও স্থূলকায়। ইনি ফৌজদার তাজর্খার দেওয়ানী করে জমিদারী লাভ করেন।

উদয়াদিত্য—বঙ্গের মহাবীর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বীর পিতার বীর পুত্র ছিলেন উদয়াদিত্য। মোগল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে ইনি অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

উদ্দাকা—বাংলার পালরাজ নয়-পালের রানী। উদ্দাকার ব্যয়ে 'পঞ্চরক্ষা' নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী।

উদ্ধব দাস—রচিত গ্রন্থ 'ব্রজমঙ্গল'। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের রচনা। গ্রন্থটির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় শাখাবর্ণন উপলক্ষে কবি-সাধক লোচন দাসের সঙ্গে নরহরি সরকারের এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মিলন ও কঙ্কণ নগরে স্থিতি।

উদ্ধব দাস—মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়া বৈদ্যপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি মালীহাটীর আচার্য বংশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য এবং বৈষ্ণবপদ রচয়িতা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। উদ্ধব দাস বিশুদ্ধ বাংলা ও ব্রজবুলীতে পদ রচনা করেছেন। এঁর ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি সুললিত। এঁর বর্ণনা-শক্তি ও কবিত্ব-শক্তি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে ইনি ছিলেন 'রসকদম্ব' রচয়িতা কবি বল্লভের গুরু।

উদ্ধব মিশ্র—বৈদ্যপ্রদীপ টীকা প্রণেতা। ১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দীয় নিশ্চলকর তাঁর রত্নপ্রভায় বৈদ্যপ্রদীপের নাম করেছেন। বৈদ্যপ্রদীপ সম্ভবতঃ ১১ খ্রীষ্টশতাব্দীয ভব্যদত্ত কর্তৃক প্রণীত হয়। উদ্ধব মিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী-কালের লোক।

উদ্ধবানন্দ—উদ্ধবানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। এঁর রচিত গ্রন্থ ভাগবতের অনুবাদ "রাধিকা-মঙ্গল"।

উদ্ধারণ দত্ত—পিতা শ্রীকর দত্ত, মাতা ভদ্রাবতী। সুবর্ণ বণিক। উদ্ধারণের পূর্বপুরুষ ভবেশ দত্ত অযোধ্যা থেকে বাণিজ্যের জন্য এসে ব্রহ্মপুত্র তীরে বাস করেন এবং তথায় কাঞ্জিলাল ধরের ভগিনী ভাগ্যবতীকে বিবাহ করেন। কাঞ্জিলালের পুত্রই লক্ষ্মণ সেনের সভাপতি উমাপতি ধর। উদ্ধারণের নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে,

তবে সম্ভবতঃ এঁর জন্মস্থান ছিল শান্তিপুর। নৈহাটির নিকটবর্তী দত্তঠাকুরের বাসস্থান 'উদ্ধারণপুর' নামে পল্লী আছে। কোন কোন মতে উদ্ধারণ নৈহাটিতে বসবাসকারী নৈরাজা নামক এক রাজার দেওয়ান ছিলেন। ইনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। নিত্যানন্দ কিছুকাল সপ্তগ্রামে উদ্ধারণের বাড়ীতে থেকে ত্রিবেণীর বণিকদের মধ্যে ধর্মপ্রচাব করেন। নিত্যানন্দের তীর্থপযটনকালে উদ্ধাবণ দত্ত তাঁর সঙ্গী হিসাবে সমস্ত ভ্রমণ করেছিলেন। সূযদাস দুহিতা জাহ্নবাদেবীব সহিত নিত্যানন্দেব বিবাহেব সময উদ্ধাবণ প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জানা যায উদ্ধাবণ ৪৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে নীলাচলে যান। সেখানে ৬ মাস অবস্থান করে বৃন্দাবনে আসেন। তথায় ৬ বছর বাস কবে বংশীবটের নিকট দেহরক্ষা করেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

উদ্ধারণ সেন—তত্ত্বচন্দ্রিকাদি প্রণেতা ১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দীয় শিবদাস সেনের পিতামহ। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ।

উপেন্দ্র মিশ্র—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পিতামহ। শ্রীহট্টে বড়গঙ্গা নামক স্থানে এঁর শ্রীপাট। এঁর পত্নীর নাম কলাবতী দেবী। এঁর সাত পুত্রের মধ্যে মহাপ্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ছিলেন পঞ্চম। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

উবট—জেজ্জটপুত্র। এঁর রচিত মন্ত্রভাষ্য নামে একখানা পুঁথি পাওয়া গেছে। উহা চতুর্দশ-শতাব্দীতে লিখিত এবং নোয়াখালি জেলায় প্রাপ্ত, বর্তমানে বরোদায প্রাচ্য বিদ্যামন্দির গ্রন্থালয়ে সংরক্ষিত।

উমানাথ "দ্বিজ"—রচিত কাব্যের নাম 'মাণিক্য মিত্রেব কথা'। রূপকথা বা বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা এটি একটি পুরানো ক্ষুদ্র কাব্য। কবি উমানাথ ছিলেন কোচবিহারের রাজা উপেন্দ্র নারায়ণের অনুচর। কাব্যটি রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

উমাপতি—খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর একজন বঙ্গীয় বৈদ্যক গ্রন্থকার। এঁর পরিচয় সম্বন্ধে চরক সংগ্রহেব 'রত্নপ্রভাব' টীকায় ১২-১৩ খ্রীষ্টশতাব্দীয় নিশ্চলকর লিখেছেন—'অন্তরঙ্গ উমাপতি'।

উমাপতিদেব—দক্ষিণরাঢ় নিবাসী। এঁর অপর নাম জ্ঞান শিবদেব। ইনি চোলদেশে বসবাস করেন এবং স্বামিদেবর এই নামে পরিচিত হয়ে রাজা ও প্রজা উভয়েরই শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হন। এঁর আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী। সাধনাবলে ইনি আধ্যাত্মিক জগতে অত্যন্ত উন্নত হয়ে উঠেন। কথিত আছে একবার সিংহলী সৈন্য পাণ্ড্যরাজ্য জয়

করে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে চোল-রাজ্য আক্রমণ করতে আসে। চোলবাসিগণ ভীতিবিহ্বল হয়ে উমাপতিদেবকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করলে ইনি শিবের উপাসনা করতে শুরু করেন। পুজোর আটাশ দিনের দিন সিংহলী সৈন্যরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। এইভাবে চোলরাজ্য বিনারক্তপাতে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

উমাপতি-ধর—সেন রাজসভার সভাকবি। ইনি বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তির রচয়িতা। এই প্রশস্তির চারটি শ্লোক সদুক্ত কর্ণামৃতে উদ্ধার করা হয়েছে। খুব সম্ভব বিজয়সেন হতে আরম্ভ করে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরে উমাপতি সেন-রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পলায়নের পরও উমাপতি-ধর জীবিত ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতি-ধরের নামে ৯১টি শ্লোক আছে। দেওপাড়া-লিপিতে বলা হয়েছে শব্দ জ্ঞান ও শব্দার্থবোধ দ্বারা উমাপতি-ধর পরিশুদ্ধ বুদ্ধি ছিলেন, আর জয়দেব বলেছেন, উমাপতি-ধরের লেখনীতে বাক্য যেন পল্লবিত হত (বাচঃ পল্লবয়তি)। ইনি দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

উমিচাঁদ—আমি চাঁদ দ্র°।

উম্মর আলী—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। এঁর নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত পরগণা 'বাদে কুমড়ি শাইলে'র (চুড়খাই) 'খারাভরা' গ্রামে। এঁর রচিত সঙ্গীত গ্রন্থ 'প্রেমের বাগান'।

এ

একদিল শাহ—কথিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে শাহনীর নামক এক সওদাগরের পত্নী আস-কস্তুরার গর্ভে জন্ম এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোটে মোল্লা আতার নিকট এঁর বিদ্যালাভ হয়। ইনি একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন এবং চট্টগ্রামের বিখ্যাত পীর শাহবদর এর দীক্ষাগুরু ছিলেন। এঁর জীবনের প্রধান কার্য ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ইনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

একরাম উদ্দৌলা—নবাব সিরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নবাব আলিবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগমের ইনি পালিত পুত্র।

এডমন্‌ষ্টোন, এন. বি. বা নীল বেঞ্জামিন এডমন্‌ষ্টোন—ইংরেজ। পার্লামেন্ট-সদস্য স্যর আর্চিবল্ড এডমন্‌-ষ্টোনের পুত্র—১৭৬৫ সালের ৬ ডিসেম্বর বিলেতে জন্ম হয়। ১৭৮৩ সালে ইনি সিবিলিয়ান হয়ে কলকাতায় আসেন। ১৭৯৮ সালে ইনি গভর্নর-জেনারেলের প্রাইভেট-সেক্রেটারী

নিযুক্ত হন। ১৮১২—১৮১৮ সাল পর্যন্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন এবং ১৮২০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ১৮৪১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলা-গদ্য সাহিত্যের ভিত্তিপত্তনে এঁর বিশেষ অবদান আছে। ১৭৯১-৯২ সালে ইনি একাধিক আইন গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। এঁর ভাষা ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পার্সীঘেঁষা।

এডাম্‌স, টমাস—ক্লাইবের সমসাময়িক। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গদেশে সৈন্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন। ইনি মীরকাশিমের সেনাপতিকে পরাজিত করেন। মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে অধিকার করেন।

এড়ু মিশ্র—লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের সভাপণ্ডিত।

এণ্টনি ফিরিঙ্গি—কবিওয়ালা, জাতিতে পর্তুগীজ। এঁর আবির্ভাব কাল ১৮-১৯ শতাব্দী। কোন এক ব্রাহ্মণ রমণীর প্রতি প্রেমে পতিত হয়ে, এণ্টনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং হিন্দু সামাজিক আচার ব্যবহার অভ্যাস করেন। হিন্দুর পূজা-পার্বণে তিনি আগ্রহভরে যোগদান করতেন। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি একটি কবির দলও বেঁধেছিলেন। হুগলীর গরিটীর নিকটে এণ্টনি ফিরিঙ্গির ভগ্ন বাগানবাড়ী এখনো বিদ্যমান। তিনি স্ত্রীর অনুরোধে কলকাতায় বহুবাজারে যে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা এখন ফিরিঙ্গি কালী নামে পরিচিত। কবিওয়ালা ঠাকুর সিংহ ও রাম বসুর সঙ্গে কবিগানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত।

এবাদোল্লা—বৈষ্ণব-পদকর্তা।

এর্শাদোল্লা—লেখক আলীরাজার পুত্র। চট্টগ্রামের বংশখালী থানার অন্তর্গত ওশখাইন নামক গ্রামে এঁর বসতি ছিল। পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা।

এসলাম্‌ খাঁ—এসলাম খাঁর শাসনকালেই বাংলার রাজধানী টাণ্ডা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই সময় পাদশাহের নামানুসারে ঢাকার নাম করণ করা হয়েছিল জাহাঙ্গীর নগর।

এসলাম্‌ খাঁ মুসেদি—সম্রাট সাজাহান কর্তৃক ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। ইনি শাসন কার্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। পদে নিযুক্ত হয়ে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে ইনি দেশের সর্বাঙ্গীণ শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া অবাধ্য আসামী কোচদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করে তাদের অবদমিত করেছিলেন। সাজাহান এঁকে পরে উজীরের পদ প্রদান করেছিলেন।

ও

ওয়াটস্ (কর্নেল)—১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ উদ্দৌলা যখন বাংলার নবাব হন, ওয়াটস্ তখন কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা ইংরেজ কুঠি লুণ্ঠন করে ওয়াটস্‌কে স্ত্রী-পুত্রসহ বন্দী করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যান এবং এঁকে আটক করে রাখেন। এঁর স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণকে আলিবর্দীর বৃদ্ধা বেগমের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। ওয়াটস্-পত্নীর সঙ্গে পূর্বে বন্ধুত্ব ছিল। ওয়াটস্‌কে পরে হুগলীতে পাঠান হয়। নবাব কলকাতা থেকে ফিরবার সময় ওয়াটস্‌কে মুক্ত করেন। পর বছর নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হলে ওয়াটস্ রেসিডেণ্টরূপে মুর্শিদাবাদে যান। পরে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যুদ্ধ বাধলে ইনি গোপনে পালিয়ে গিয়ে ক্লাইবের সঙ্গে পলাশীতে যোগদান করেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটস্ বিলাত যান এবং সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ওয়াট্‌সন্, চার্লস—১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লাইবের সময় ইনি সহকারী এড্‌মিরাল্‌রূপে ঘেরিয়া ও চন্দননগর আক্রমণ ও সিরাজের হাত থেকে কলিকাতার পুনরুদ্ধার কার্যে সহায়তা করেছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এদেশেই এর মৃত্যু হয়।

ওয়াট্‌সন্, হেনরি—ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় প্রধান ইঞ্জিয়ার ছিলেন। ইনি গভর্নমেণ্টের নিকট থেকে খিদিরপুর ডক্ নির্মাণের জন্য জমি পেয়েছিলেন এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে উহা নির্মাণ করেন। ইহাই কলকাতার প্রথম ও প্রধান ডক্।

ওয়ার্ড, উইলিয়ম্—১৭৬৯ সালে ২০ অক্টোবর ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তিনি মিশনরীরূপে বাংলা দেশে আসেন। শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস সম্পূর্ণ তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শ্রীরামপুরের কাগজ প্রস্তুতের কারখানাও নিজেই স্থাপন ও পরিচালনা করেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি প্রচার পুস্তিকা তিনি বাংলায় লিখেছিলেন। ১৮২৩ সালে শ্রীরামপুরে মৃত্যু হয়।

ওয়েষ্টন, চার্লস—হল্‌ওয়েলের সার্জন পদে নিযুক্ত থাকাকালে তার নিকট শিক্ষানবিশ ছিলেন এবং একবার তাঁর সঙ্গী হয়ে বিলাত গিয়েছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণকালে ইনি দেশরক্ষী সৈনিক রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লটারিতে ১৯৬০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি "টেরিটি বাজার" প্রাপ্ত হন। ইনি একজন বিশিষ্ট দাতা বলে খ্যাত ছিলেন এবং এঁর আয়ের সমস্তটাই দান করতেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টমাস দিনে ইনি মারা যান।

ওহাব [ফকির]—বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত 'হাওলা' গ্রামে বাস ছিল। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এঁর অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করেছেন।

ওহাব [মৌলবী শাহ আবদুল ওহাব]—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত বরায়া পরগণার ফুলবাড়ী গ্রামে ছিল কবির নিবাস। এঁর রচিত 'হাসর-তারণ' ও 'ভব-তারণ' নামক দু'খানি সঙ্গীত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। আবদুল কাদির নামক জনৈক পীরের ইনি শিষ্য ছিলেন।

ঔ

ঔর্ব ঋষি—ঋগ্বেদের যুগের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। ইনিই প্রথম গৌড়ে অগ্নি আবিষ্কার করেন।

ক

কংসনারায়ণ—তাহিরপুরের রাজা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার পাঠান আমলের হিন্দুরাজা গণেশের বংশধর। এঁর রাজত্বকাল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি সমাজপতি ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। পাঠান ও মোগল নবাবরা এর কাছ থেকে সব সময় খাজনা আদায় করতে পারতেন না। সুযোগ পেলেই ইনি খাজনা বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করতেন। রাজা কংসনারায়ণের রমেশ শাস্ত্রী নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর নানা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হত। রাজা কংসনারায়ণ একবার ন'লক্ষ টাকা খরচ করে সাড়ম্বরে দুর্গা পূজা করেছিলেন। পাঠান-মোগল যুদ্ধে তিনি মোগলদের পক্ষে থাকতেন বটে, কিন্তু কখনো মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেননি।

কংসারি ঘোষ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বাসুদেব ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

কুলাই গ্রামবাসী এক কংসারি ঘোষ ছিলেন শ্রীমন্ নরহরি সরকারের শিষ্য। ইনি শ্রীমহাপ্রভুর তিনটি বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়ে শ্রীসরকার ঠাকুরকে সমর্পণ করেছিলেন।

কংসারি মিশ্র—শালিগ্রাম নিবাসী। প্রসিদ্ধ গৌরীদাস পণ্ডিতাদির পিতাঠাকুর। পত্নীর নাম কমলাদেবী। দামোদর, জগন্নাথ, সূর্যদাস সরখেল, গৌরীদাস পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ-চৈতন্য নামক ছয় পুত্র।

কংসারি সেন—নিত্যানন্দ প্রভুর শাখার অন্তর্গত। বৈদ্য জাতীয়। ব্রজলীলায় রত্নাবলী সখীরূপে প্রখ্যাত। অনেকের মতে গুপ্তপল্লী (হুগলী) এঁর বাসস্থান ছিল। এঁর পুত্রের না

সদাশিব কবিরাজ, পৌত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস এবং প্রপৌত্র শ্রীকানু ঠাকুর। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। কুলপঞ্জি মতে এঁর নামান্তর শঙ্করারি।

কঙ্ক—শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কাব্যমধ্যে প্রদত্ত কবির আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায় কঙ্কের পিতার নাম ছিল গুণরাজ, মাতা বসুমতী। এঁর জন্মভূমি ছিল রাজেশ্বরী নদীর তীরবর্তী বিপ্রগ্রাম। এই বিপ্রগ্রাম ছিল মৈমনসিংহ জেলায়। কবি কঙ্ক জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কবি শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হলে তাকে দেখবার মতো কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না। এক চণ্ডালের গৃহেই তিনি মানুষ হতে লাগলেন। পালিকা চণ্ডালিনী মা তাই তাঁর নাম রাখেন কঙ্ক। চণ্ডালের নাম মুরারি এবং চণ্ডালিনীর নাম কৌশল্যা।

বাল্যে কবি গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখালের কাজ করতেন। গর্গের স্ত্রীর নাম ছিল গায়ত্রী। গর্গ ছিলেন সুপণ্ডিত। তারা কঙ্ককে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সমাজে তুলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজ তার বিরোধিতা করে। গর্গের কন্যা লীলার সঙ্গে কঙ্কের প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করে কবি রঘুসুত এক পালাগান রচনা করেছিলেন। 'কঙ্ক ও লীলা' নামে এই পালাগান মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কবি কঙ্ক বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্য কালিকার মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য নয়। কঙ্ক বিপ্রগ্রামবাসী এক পীরের আদেশে তার কাব্য রচনা করেন। কবি তাঁর কাব্যকে 'পীরের পাঁচালী' বলে উল্লেখ করেছেন। যথা—'গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী'। এই কাব্য সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। শ্রীচৈতন্যের প্রতি কবির বিশেষ আসক্তি ছিল। সম্ভবতঃ কবি বৈষ্ণব ছিলেন। কঙ্কের রচনা সরল ও মধুর, অনেক স্থলে বৈষ্ণব কবিতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল।

কঙ্কনপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য। এঁর গুরু ছিলেন কম্বলাম্বরপাদ। প্রাচীন বঙ্গভাষায় ইনি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' এঁর রচিত একটি চর্যাপদ পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

কচু রায়—বাংলার বার ভূঞার অন্যতম মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রতাপাদিত্য যখন বসন্ত রায় ও তার সন্তানদের হত্যা করতে থাকেন তখন বসন্ত রায়ের পত্নী এঁকে রক্ষা করার জন্য কচুবনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই থেকে এঁর নাম হয় কচু রায়। এঁর বাল্যনাম ছিল রাঘব। এঁকে প্রথমে হিজলীর জমিদার ঈশা খাঁর নিকট লুকিয়ে রাখা হয়। পরে ঈশা

খাঁ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হলে কচু রায়কে আগ্রায় মোগল সম্রাটের আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

কণাদ গুপ্ত—বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ ঋষির মতানুবর্তী একজন দার্শনিক পণ্ডিত। অবস্থানকাল সপ্তম শতাব্দী। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি এঁকে পরাস্ত করে স্বীয় মতে আনয়ন করেন।

কণাদ তর্কবাগীশ—নবদ্বীপের অন্যতম বিখ্যাত নৈয়ায়িক জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির পুত্র। ইনিও খ্যাতিমান নৈয়ায়িক ছিলেন। কণাদের জীবিতকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে বলে অনুমিত হয়। কণাদের রচিত গ্রন্থ: 'ভাষারত্ন' এবং 'তত্ত্ব চিন্তামণি'র অনুমান খণ্ডের টীকা। এছাড়া, 'তর্কবাদার্থমঞ্জরী' এবং 'অপশব্দখণ্ডনা' কণাদের রচিত বলে অনুমিত হয়। অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মতে কণাদ প্রথমতঃ বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট নবদ্বীপে পাঠ আরম্ভ করেন এবং বাসুদেব পুরী চলে গেলে নবদ্বীপেই পিতা জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির নিকট পাঠ শেষ করেন।

কর্ণওয়ালিস্, লর্ড—১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে পরাভূত সৈন্যাধ্যক্ষ, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের পাটামের নিকট টিপু সুলতানকে পরাজিত করেন। এঁর সময়েই বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের ভাইসরয় ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভারতে আসেন এবং সেই বছরই গাজীপুরে (উত্তর প্রদেশ) পরলোক প্রাপ্ত হন।

কর্ণদেব—দিগ্‌বিজয়ী ভূমিপাল চেদীপতি, পালরাজগণের সময়ে রাঢ়-দেশের অধিপতি ছিলেন। ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। যুবরাজ বিগ্রহ পালকে ইনি স্বকন্যা যৌবনশ্রীকে সম্প্রদান করে পাল সম্রাট নয়পালের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

কর্ণপূর (কবিরাজ)—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। বাহাদুরপুরে এঁর শ্রীপাঠ বিদ্যমান। এঁর রচিত শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনীর বিষয়-বস্তু গ্রন্থে জানা যায়। খেতুরীর মহোৎসবে ইনি উপস্থিত থেকে রঘুনাথ আচার্যাদির বাসগৃহের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এঁর অবস্থিতি কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

কর্ণভদ্র—পালরাজাদের রাজত্ব কালে প্রাচীন বাংলার একজন বিখ্যাত ভাস্কর্যশিল্পী। ইনি দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কর্ণসেন—ঢেকুর গড়ের সামন্ত-রাজ। এঁর রাজত্বকালে গোপশ্রেণীর সোমঘোষের পুত্র ইচ্ছাই ঘোষ শ্যামারূপার বরে অত্যন্ত প্রবল হয়ে

রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সেই বিদ্রোহ দমনকালে তাঁর ছয় পুত্র নিহত হয়। সেই শোকে রানী আত্মহত্যা করলে কর্ণসেন গৌড়েশ্বর ধর্মপালের নিকট যান। সেখানে তিনি গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ করেন। রঞ্জাবতী ধর্মের পূজারিণী ছিলেন। তিনি ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে লাউসেন নামক পুত্র লাভ করেন।

কর্দম মুনি—প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে বর্তমান বাংলার হুগলী ও হাওড়া জেলার অন্তর্গত প্রবাহিত সরস্বতী নদীর তীরে এক পর্ণকুটীরে মুনিবর কর্দম বাস করতেন। তাঁর পত্নী দেবাহুতির গর্ভে নয় কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রই মহর্ষি কপিল।

কনকপ্রিয়া দেবী—বিষ্ণুপুরের রাজসভা-পণ্ডিত ব্যাসাচার্যের কন্যা এবং কৃষ্ণবল্লভ আচার্যের ভগিনী। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীগতি গোবিন্দের শিষ্যা। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

বাংলার বারভূঞার অন্যতম রাজা চাঁদ রায়ের স্ত্রীর নামও ছিল কনকপ্রিয়া দেবী। স্বামীসহ ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

কন্দর্প নারায়ণ বসু রায়—বাংলার বার ভূঞার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। এঁর পিতার নাম জগদানন্দ এবং পিতামহের নাম পরমানন্দ বসুরায়। ইনি ছিলেন বরিশাল জেলার চন্দ্রদ্বীপ ও বাকলার রাজা। এই রাজ্য এঁর পিতামহ পরমানন্দ তাঁর মাতামহের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। পরমানন্দের মাতামহরা ছিলেন কায়স্থ কুলতিলক ও সমাজপতি দনুজমর্দনের বংশধর। কন্দর্প নারায়ণ তাঁর রাজধানী প্রথমে কচুয়াতে ও পরে মাধব পাশায় স্থানান্তরিত করেন। রাজা কন্দর্প নারায়ণ তার অসীম বীরত্বের দ্বারা চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের মহিমা বৃদ্ধি করেছিলেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্দ্বীপের যুদ্ধে ইনি যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। পরবৎসর মাসুম কাবুলীর সঙ্গে সাহাবাজ খাঁর যুদ্ধকালে কন্দর্পনারায়ণ সাহাবাজকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন বলে আইন-ই-আকবরী প্রণেতা এঁকে নারায়ণ ভৌমী (ভূঞা) নামে উল্লেখ করেছেন। মোসলমান সেনাপতি মহাবীর গাজিকে ইনি যুদ্ধে নিহত করেছিলেন। হোসেনপুর নামক নগর থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে সেখানে একটি শহর গড়ে তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন রেখে গেছেন। মাধব পাশায় এখনো পিতলের কামান রয়েছে। উহা তাঁর বীরত্বের পরিচায়ক। সপ্তগ্রামের পাঠান বীর মীরজা মজাদ খাঁ কতুল খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হলে কন্দর্প রায় তাঁকে সাহায্য করে রক্ষা করেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে গণেশের মৃত্যুর পর পাণ্ডুয়া ও সপ্তগ্রামের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হয়। স্বধর্ম

পরায়ণ রাজা কন্দর্পনারায়ণ মুসলমান-পন্থী যদুর অত্যাচার থেকে হিন্দুদের রক্ষাব জন্য পাণ্ডুয়ায় ছিলেন। তাঁর ভয়ে যদু সংযত হন। কন্দর্পনারায়ণ টাঁকশাল তৈরী করে রুপোব টাকা তৈরী করাতেন। মগদের সঙ্গে তাঁব বহু যুদ্ধ হয় এবং সব যুদ্ধেই তিনি জয় লাভ কবেন। তাঁর এক অক্ষৌহিনী সৈন্য ছিল। মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বারভূঞাব বিদ্রোহীদলেব সঙ্গে যো। দিবার অব্যবহিত পবেই তাঁব মৃত্যু হয়।

কপিল মুনি—বর্তমান হুগলী ও হাওড়া জেলাব মধ্য দিয়া প্রবাহিত সবস্বতী নদীব তীরে প্রায চাব হাজাব বছব পূর্বে কদম নামে এক মুনি বাস কবতেন। তাব পত্নী দেবাহুতিব গর্ভে নয় কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবে। সেই পুত্রই মহর্ষি কপিল। ইনি ছিলেন যেমন রূপবান্ তেমনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবব। পরবর্তীকালে তিনি যে নূতন দর্শনেব প্রবর্তন করেছিলেন তা আজও আমাদেব সমাজ জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত কবছে।

মহর্ষি কপিল ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে বস্তুর বিনাশ নেই—উৎপত্তিও নেই। সকল পদার্থই অবিনশ্বর। এই মহাবৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নেই। "প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ"—প্রমাণেব অভাবে তাঁকে সিদ্ধ করা যায় না। ফলে ঈশ্বরবাদীদের কোপদৃষ্টি এড়াবাব জন্য তাঁকে আসুরি প্রভৃতি শিষ্যসহ লোকালয় থেকে বহুদূরে সবে যেতে হয়েছিল। গৌড়ের শেষ প্রান্তে গঙ্গাসাগব সঙ্গমে তিনি আশ্রম রচনা করে বাস কবতেন। ষড়্ দর্শনেব অন্যতম দর্শন সাংখ্যসূত্র এখানেই প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। আজও প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে অসংখ্য নবনাবী সাগব সঙ্গমে সমবেত হয়ে সেই মহাজ্ঞানী মহর্ষি কপিলেব উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন কবে।

কপিলেশ্বর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুব শিষ্য।

কবচসেন—বাংলার সেন বাজবংশেব এক বংশধব ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবেব কুলুতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দশম উত্তরাধিকারী ছিলেন কবচ সেন। ইনি ঐ স্থানে কুলুরাজ কর্তৃক নিহত হন। এবং এঁব স্ত্রী শিবকোটে পলায়ন কবেন।

কবিকঙ্কণ—মুকুন্দবাম চক্রবর্তী দ্রং।

কবিকণ্ঠহার—বাধাকান্ত বৈদ্য কবিকণ্ঠহাব দ্রং।

কবিকর্ণপুর—প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচব শিবানন্দ সেনেব পুত্র, জাতিতে বৈদ্য। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটীর

নিকটবর্তী কাঞ্চনপল্লী বা বর্তমান (কল্যাণী) কাঁচড়াপাড়ায় পরমানন্দের জন্ম হয়। তিনি নাকি অতি অল্প বয়সেই সার্থক কবিতা রচনা করতে পারতেন। এজন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং তাকে কবিকর্ণপুর (কবিগানের কর্ণভূষণ) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। 'মুরারি গুপ্তর কড়চার' পরেই সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন ও প্রামাণ্য চৈতন্য চরিতগ্রন্থ হিসাবে কবিকর্ণপূরের তিনখানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য (চৈতন্য জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস) রচিত হয়েছিল ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের রচনাকাল ১৫৭২ খ্রীঃ। 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' কবিকর্ণপূরের তৃতীয় গ্রন্থখানি সমসাময়িক বৈষ্ণব দার্শনিক-চেতনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এটির রচনাকাল ১৫৭৬ খ্রীঃ। প্রথম গ্রন্থদ্বয়ই পরবর্তীকালে অধিকাংশ চৈতন্য জীবনীকারের উপজীব্য হয়েছিল। এসব ছাড়া, 'আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ', 'কেশবাষ্টক', 'অলঙ্কারকৌস্তভ', 'কৃষ্ণাহ্নিকৌমুদী' প্রভৃতি আরও কয়েকটি সংস্কৃত পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। কবিকর্ণপুরের নামাঙ্কিত 'পারিজাতহরণ' নামক একটি মহাকাব্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

কবি কৃষ্ণজীবন—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি। রচিত কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। কোন কোন স্থলে কবি এই কাব্যকে 'অম্বিকামঙ্গল'ও বলেছেন। নাটোরের ভূস্বামী প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রাজা রামকৃষ্ণের সভায় অবস্থান করে কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী রচনা করেন।

কবিচন্দ্র—মাধবদাস কবিচন্দ্র দ্রঃ।

কবিচন্দ্র—বাংলাদেশে একাধিক লেখকের নাম বা উপাধি 'কবিচন্দ্র' ছিল বলে মনে হয়। আলঙ্কারিক কবিচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন কবিকর্ণপুর ও কৌশল্যার পুত্র, বিদ্যাবিশারদের পৌত্র এবং কবিভূষণ ও কবিবল্লভের পিতা। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন 'দীঘাঙ্গ গ্রামনিবাসী' দত্তকুলোদ্ভব বৈদ্য। কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত গ্রন্থ 'চিকিৎসা রত্নাবলী' নামক বৈদ্যক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ। কবিচন্দ্রের রচিত অলঙ্কার গ্রন্থের নাম 'কাব্য চন্দ্রিকা'। 'সারলহরী' ও 'ধাতুচন্দ্রিকা' নামক তাঁর রচিত আরও দুটি গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখা যায়।

কবিচন্দ্র—এঁর প্রকৃত নাম অযোধ্যারাম (কিংবা নিধিরাম) মিশ্র (রায়, চক্রবর্তী)। পিতার নাম হৃদয় মিশ্র (গুণরাজ)। কবিচন্দ্র আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ—গঙ্গার বন্দনা, গুরু দক্ষিণা, সত্যনারায়ণ কথা প্রভৃতি।

ক বি চ ন্দ্র—"দ্বিজ"—"দ্বিজ" কবিচন্দ্র 'মনামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা।

এঁর এই কাব্যকে ইনি মাঝে মাঝে 'জগতী মঙ্গল' নামেও অভিহিত করেছেন। কবি "সাজাদা রায়" বংশীয় বলে প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসল নামটি একবারও বলেন নি। কাব্যে বর্ণিত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় কবির পুত্রের নাম রঘুবীর। নিবাস শ্যামদাসপুর। এঁর অবস্থিতি অষ্টাদশ শতাব্দী।

কবিচন্দ্র মিশ্র—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অগ্রজ। ইনিও একজন কবি ছিলেন। এঁর রচিত 'দাতাকর্ণ' ও 'কলঙ্ক ভঞ্জন' নামক গ্রন্থদ্বয় এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করে।

কবিতার্কিক—কবিতার্কিকের পিতার নাম বাণীনাথ। কবি বাংলার বারভূঁইয়ার অন্যতম। লক্ষ্মণমাণিক্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এঁর জীবনকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ। কবিতার্কিক রচিত একটি প্রহসনের নাম 'কৌতুক রত্নাকর'।

কবিবল্লভ—কবিবল্লভের পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। এঁর নিবাস ছিল বগুড়া জেলার "করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে আরোড়া গ্রামেতে।" উদ্ধব দাস ছিলেন এঁর গুরু। কবিবল্লভের রচিত গ্রন্থের নাম 'রসকদম্ব'। ইহা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য নয়, বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। তবুও এতে প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে। নরহরি সরকারের শিষ্য ব্রাহ্মণ 'মুকুট রায়' কবিবল্লভের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে রসকদম্ব রচিত হয়। রসকদম্ব-রচনা সমাপ্ত হয় ১৫২০ শকাব্দে বা ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

কবিবল্লভ রায়—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্টে জন্ম হয়। ইনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট এঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে এঁকে 'রায়' উপাধি প্রদান করে শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার পদে নিযুক্ত করেন।

কবিরঞ্জন—বিখ্যাত কবি। এঁর প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। ইনি বাংলার হুসেন শাহী রাজবংশের রাজকর্মচারী ছিলেন।

এঁর তিনটি উপাধি—কবিরঞ্জন, কবিশেখর ও বিদ্যাপতি। এই তিন ভণিতাতেই তিনি পদ রচনা করতেন। এঁর লেখা বহু পদ পাওয়া গিয়েছে। ইনি গোপাল চরিত মহাকাব্য, গোপীনাথ বিজয় নাটক, গোপাল বিজয় কাব্য এবং দণ্ডাত্মিক পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে মাত্র শেষ দুখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। ইনি হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৭ খ্রীঃ) বা নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) অধীনে রাজসেবী ছিলেন।

কবিরঞ্জন—রামপ্রসাদ সেন দ্রঃ।

কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বীরভূম প্রদেশে 'বিদ্যাপতি' উপাধিকারী কবিরঞ্জন নামক একজন প্রাচীন পদ-কর্তার উদ্ভব হয়েছিল।

তথায় প্রবাদ আছে যে, এই 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী কবিরঞ্জনই 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাংলা পদসমূহের এবং "চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন-ছান্দ" ইত্যাদি কোন কোন ব্রজবুলী পদের রচয়িতা। এরূপও নাকি প্রবাদ আছে যে, এই বিদ্যাপতি—কবিরঞ্জনের সহিতই গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাসের মিলন ও রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং খণ্ডগ্রামে এঁর বাস ছিল। ইনি কখনো 'কবি-রঞ্জন' ও কখনো 'বিদ্যাপতি' ভণিতায় পদ রচনা করতেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে নরোত্তম ঠাকুরের ভক্ত দীন চণ্ডীদাসের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সম্মিলন ঘটে থাকবে। কবিরঞ্জনের একটি পদ, "উদসল কুন্তল-ভারা"। অন্য একটি পদ "কহে কবিরঞ্জন শুন বর নারি। / প্রেম অমিয়া রসে লুবধ মুরারি"।

কবিরাজ পণ্ডিত—কবিরাজ পণ্ডিত গৌড়ের রাজসভার কবি (নবম শতাব্দী)। এঁর রচিত "রাঘব-পাণ্ডবীয় কাব্য" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর প্রত্যেক শ্লোকের রামপক্ষে ও পাণ্ডবপক্ষে অর্থ করা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিতের ন্যায় এঁর শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থবোধক।

কবিশূর—কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্যের সামন্ত। দরদ্‌দেশ থেকে গৌড়ে এসে ইনি গৌড়ের শাসনকর্তা হন এবং এখানে শূর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরই পৌত্র বাংলার বিখ্যাত আদিশূর। কবিশূরের গৌড়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

কবিশেখর (রায় শেখর)—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। ব্রজবুলি কবিতার প্রসিদ্ধ লেখক। এঁর 'দণ্ডাত্মিকা'ও বৈষ্ণব সমাজে চির-সমাদৃত।

কবিশেখর রায়—ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিশেখর রায়। এঁর অনেকগুলি পদ বিদ্যাপতির নামে চলে আসছে। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ পদ রচনায় কবিশেখর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'কবিশেখর রায়' এঁর ছদ্ম নাম। কাব্যের ও পদাবলীর ভণিতায় ইনি এই নামই—'কবি শেখর", "শেখর", "শেখর রায়', "রায় শেখর" ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করেছেন। এঁর আসল নাম দৈবকী-নন্দন সিংহ। এঁর পিতার নাম ছিল চতুর্ভুজ, মাতা হীরাবতী বা হারাবতী। কবিশেখর সুশিক্ষিত কবি। ইনি সংস্কৃতে ও বাংলায় কাব্য, নাটক, পাঁচালী ও পদাবলী রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখেন 'গোপাল চরিত' মহাকাব্য এবং 'গোপীনাথ বিজয়' নাটক, আর বাংলা ভাষায় লেখেন 'গোপালের কীর্তনামৃত' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ পদাবলী এবং 'গোপাল-বিজয়' পাঁচালী।

গোপাল বিজয়ের কাহিনী অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ। জানা যায় এঁর নাকি "কবিরঞ্জন" এবং "বিদ্যাপতি" প্রভৃতি উপাধিও ছিল। "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর"—এই বিখ্যাত পদটি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত থাকলেও ইহা কবিশেখরেরই রচনা। কবিশেখর ছিলেন শ্রীখণ্ড নিবাসী।

কবিশচন্দ্র—বিষ্ণুপুরেরমহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ (সিংহাসনারোহণকাল ১০০২ সাল) ও গোপাল সিংহদেবের (সিংহাসনারোহণ কাল—১১১২ সাল) সমসাময়িক। ইনি পয়ার ছন্দে বিরাট মহাভারত, রামায়ণ ও শিবমঙ্গল নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত রামায়ণ বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামে পরিচিত।

কবীন্দ্র—'গোরক্ষবিজয়' অথবা 'মীনকেতন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা একজন কবি। গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য গ্রন্থ রচিত হয়।

কবীন্দ্র চক্রবর্তী—"কবীন্দ্র" নাম নয় উপাধি। কবির আসল নাম সম্ভবতঃ নিধিরাম। এঁর রচিত কাব্য 'কালিকামঙ্গল' অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর কাব্য আকারে ছোট, ব্রতকথার মত। কবি ছিলেন দক্ষিণরাঢের অধিবাসী। কবির পিতা ও অগ্রজের উপাধি যথাক্রমে 'ঘটক-চক্রবর্তী' ও 'ঘটক-চূড়ামণি'। কবির পুত্রের নাম রামধন ছিল বলে মনে হয়, কারণ কবির কথায়, "শ্রীযুত কবীন্দ্র কহে জোড় করি পাণি। / কুশলে রাখহ মোহ বাছা রামধনি"॥

কবীন্দ্র চন্দ্র—ত্রিলোচন বৈদ্য কবীন্দ্রচন্দ্র দ্রঃ।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস—যতদূর জানা যায় পরমেশ্বর দাসই সর্বপ্রথম মহাভারত মহাকাব্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম ছিল 'পাণ্ডববিজয়'। ইহাই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ভারত-পাঁচালী কাব্য। এই গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিদ্যোৎসাহী বদান্য নবাব হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) জনৈক 'লস্কর' পরাগল খাঁ চাটিগ্রাম অর্থাৎ বর্তমান চট্টগ্রাম অধিকারের পর সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি মহাভারতের গল্প শুনতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই তাঁর সভাকবি পরমেশ্বর দাসকে 'দিনেকে' শ্রোতব্য একখানি সংক্ষিপ্ত মহাভারত-কাহিনী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করতে অনুরোধ করেন। তারই ফলে পরমেশ্বর পুলকিত চিত্তে পাণ্ডববিজয় প্রণয়ন করেন। এই কাব্য মহাভারতের মত আঠারো পর্বে বিভক্ত। বাহুল্য বর্জন করে শুধু কাহিনীরই অনুসরণ করা হয়েছে বলে কাব্যটি আকারে খুব বড় নয়। রচনা সহজ

সরল ও কাহিনীনিষ্ঠ। পরমেশ্বর দাস 'কবীন্দ্র' উপাধি ব্যবহার করতেন। এঁর রচিত মহাভারতে হোসেন শাহ ও পরাগল খানের সপ্রশংস বর্ণনা পাওয়া যায়। "নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর"। লস্কর পরাগল খান মহামতি। / লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া। / চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥ পুত্র-পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি। / পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥"

'কবীন্দ্র' ভট্টাচার্য—ইনি বর্ধমানের অদূরবর্তী তালিত গ্রাম নিবাসী। ইনি সংস্কৃতভাষায় 'উদ্ধবদূত' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন।

কমর আলী—বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। এঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত করুলডেঙ্গা গ্রামে। ইনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। এঁর স্বদেশবাসী হাড়িদের ইনি সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। এঁর অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়।

কমল খোজা—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি। প্রতাপাদিত্য আগ্রা থেকে যে সৈন্যদল সঙ্গে এনেছিলেন তার অধিনায়ক ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠান বীর—কমল খোজা। এঁর সম্পূর্ণ নাম খোজা কামাল বা সম্ভবত কামালউদ্দীন কিন্তু ইনি সাধারণতঃ হিন্দু ভাবাপন্ন কমল নামেই পরিচিত। প্রথমে ইনি প্রতাপের শরীররক্ষী সেনার অধিনায়ক ছিলেন। পরে উচ্চপদে উন্নীত হন। কমল অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পরাক্রমশালী ছিলেন। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে কমল নিহত হলে প্রতাপাদিত্য হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কমল খোজার মৃত্যুই প্রতাপের পরাজয়ের কারণ। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

কমললোচন দত্ত—রচিত রামায়ণ কাব্য 'রামভক্তি রসামৃত।' গ্রন্থরচনার সমাপ্তিকাল ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। কবির নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার সাহাপুর পরগণার অন্তর্গত কোলকুড্যা (কোনকুড়া) গ্রামে। কমললোচনের স্বহস্ত লিখিত অরণ্য, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরা কাণ্ডের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। উত্তরাকাণ্ডের শেষে কবি পরিচিতি ও রচনা সমাপ্তিকাল পাওয়া যায়।

"মাতা পদ্মাবতী পিতা কর্তারাম দত্ত,/কমললোচন নাম জাতিএকায়স্থ।/ গলংবস্ত্রে নিবেদএ সভার চরণে, / অনুগ্রহ করি সভে করহ শ্রবণে॥"

কমললোচন "দ্বিজ"—সপ্তদশ শতকে মার্কণ্ডেয়-পুরাণের চণ্ডী-সপ্তশতী অবলম্বনে যে দু'তিনখানি দেবীমাহাত্ম্য কাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে 'দ্বিজ' কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়' বা "চণ্ডিকামঙ্গল"ই প্রধান। কমল-লোচনের জন্মস্থান আধুনিক রংপুর জেলায়, আন্দুয়া পরগণায়, ঘাগট নদীর তীরে চরখাবাড়ী গ্রামে। পিতার নাম যদুনাথ। কবি বাস করতেন "দিল্লীশ্বর-

সুতের জাগীর"-এ। চণ্ডিকাবিজয়ের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। কবির পিতাও কাব্য রচনা করতেন। মধ্যে মধ্যে "দ্বিজ" যদুনাথের ভণিতাও আছে।

কমলশীল—শান্তিরক্ষিতের শিষ্য, লুই পা বা লুইপাদের সমসাময়িক। ইনি শান্তিরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থটির উপর "পঞ্জিকা" নামক একখানি টীকা রচনা করেন। এঁর জন্ম হয় ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে। কমলশীল তিব্বতের রাজা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিব্বতে যান। কিছু সময়ের জন্য ইনি নালন্দায় তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

কমলাকর (কান্ত) বা দ্বিজ কমলাকর (কান্ত)—শ্রীচৈতন্যশাখা, শ্রপরমানন্দপুরী নবদ্বীপে আগমন করে যখন শ্রবণ করলেন—মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে পুরীধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন তিনি এই কমলাকরকে সঙ্গে নিয়ে সত্বর পুরীতে প্রভুর দর্শনে গমন করেন।

প্রভুর এক ভক্ত, দ্বিজ কমলাকর (কান্ত) নাম।

তারে লঞা নীলাচলে করিলা গমন॥

কমলাকর জ্যোতিষী—নদীয়ার এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বংশের আদি পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী। এঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। কমলাকর-কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকখানি টীকা গ্রন্থ আছে। এঁর পুত্রের নাম সুধাকর। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলাকর দাস—জাতিতে বৈদ্য এবং প্রসিদ্ধ 'চৈতন্যমঙ্গল'-প্রণেতা শ্রীলোচন দাসের পিতা। আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দী।

কমলাকর পিপিলাই—সপ্তগ্রামে বাস করতেন। জয়ানন্দ বলেন যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কমলাকরকে পাণিহাটী গ্রাম দান করেছিলেন। ইনি রঘুনাথ দাসের দধি চিঁড়া-মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইনি দ্বাদশগোপালের অন্তর্ভুক্ত। 'নরোত্তম-বিলাস' থেকে জানা যায় জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে কমলাকর খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। আক্না-মাহেশ গ্রামে এঁর পাট নির্ণীত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।

কমলাকর বা কমলাক্ষ ভট্টাচার্য—অদ্বৈত আচার্যের বাল্য নাম। অদ্বৈত আচার্য দ্রঃ।

কমলাকান্ত—কারও কারও মতে ইনি মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন। মহাপ্রভু বিদ্যাভ্যাসকালে ছেলেবেলায় যাদের ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞেস করে পরাজিত করতেন, কমলাকান্ত তাদের একজন।

কমলাকান্ত দাস—ইনি 'পদরত্নাকর' নামে একটি পদাবলী গ্রন্থ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে সঙ্কলন করেছিলেন। এতে সংগৃহীত পদসংখ্যা

১৩৫৮। তার মধ্যে কমলাকান্তের রচনা কুড়িটি। পিতার নাম ব্রজকিশোর, অনুজ রুক্মিণীকান্ত। এঁরা ছিলেন শ্রীকরণ অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। নিবাস উত্তর রাঢ়ে সিউর গ্রামে। একটি পদের ভণিতা থেকে অনুমান করা যায় যে কমলাকান্ত গদাধর পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নটবরের শিষ্য ছিলেন।

কমলাকান্ত দ্বিজ—ইনি নবদ্বীপ থেকে পরমানন্দপুরীর সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন।

কমলাকান্ত পণ্ডিত—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ। অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দী।

কমলাকান্ত বিশ্বাস—অদ্বৈত মহাপ্রভুর শিষ্য এবং সম্ভবত শান্তিপুরেই বসবাস করতেন। একবার কমলাকান্ত নীলাচলে অবস্থানকালে অদ্বৈত প্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁর কিছু ঋণের জন্য প্রতাপরুদ্রকে পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্র মহাপ্রভুর হস্তগত হলে তিনি আদেশ দিলেন যে কমলাকান্ত যেন তাঁর কাছে না যায়। মহাপ্রভুর এই দণ্ডলাভ করে কমলাকান্ত ধন্য হলেন এবং একদিন মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভু তখন কমলাকান্তের উপর প্রসন্ন হয়ে উপদেশ প্রদান করেন। কমলাকান্ত পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কমলাকান্ত সর্বভৌম—একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। 'দ্বিগন্ত-রাজবংশম্' নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে বরিশালের নিকটবর্তী বায়োকাটী নামক স্থানের রাজা রুদ্রনারায়ণ সেনের বংশাবলী বর্ণিত আছে।

কমলাকান্ত সাধক রঞ্জন—বাংলা শাক্তপদসাহিত্যের একজন কবি ও সাধক। রামপ্রসাদ সেনের ন্যায় গৌরব লাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদের মতোই তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে, সাধনমার্গেও তিনি রামপ্রসাদের মতো সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর আদি নিবাস বর্ধমান জেলার কালনার অন্তর্গত অম্বিকা গ্রাম। পিতার নাম মহেশ্বর, মাতার নাম মহামায়া। অম্বিকা কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম হয়। তাঁদের কৌলিক উপাধি খুব সম্ভব বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর পিতা ও তিনি 'ভট্টাচার্য' উপাধির দ্বারাই পরিচিত হয়েছিলেন। কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় এখনো কমলাকান্তের বাস্তুভিটার চিহ্ন আছে। বাল্যকালে কবি স্থানীয় টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ঐ সময় তার পিতৃবিয়োগ হলে তিনি তার মাতার সঙ্গে মাতুলালয় চান্নাগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে বিশালাক্ষী বা বাসুলির মন্দির ও মূর্তি আছে। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে কবি এই মন্দিরেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

কমলাকান্তের মাতুলের নাম নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সাধক কবির সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধাপ্রীতির সম্পর্ক ছিল। মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানের নিকটবর্তী কোটালহাটে কবির জন্য একটি বাড়ী করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, বর্ধমান রাজসরকার থেকে তাঁকে নাকি মাসে দু'শত টাকা বৃত্তি দেওয়া হত। তেজশ্চন্দ্র তাঁকে সভাপণ্ডিতের গৌরবজনক পদও দিয়েছিলেন।

কমলাকান্ত বীরভূমে তারাপীঠে গিয়ে সস্ত্রীক কৌলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর গৃহে ফিরে এসে পঞ্চবটী বনে পঞ্চমুণ্ডি আসনে কুলাচার পদ্ধতিতে সস্ত্রীক সাধনা আরম্ভ করেন এবং ক্রমে সিদ্ধিলাভ করেন। রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার রচিত পদাবলী সাহিত্য। তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। প্রথম জীবনে কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। পরবর্তীকালে প্রায় তিন শত শাক্ত পদাবলী রচনা করেন। তাঁর রচিত পদাবলী সমূহ 'কমলাকান্ত পদাবলী', 'শ্যামাসঙ্গীত', 'সাধকরঞ্জন' প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিরোহিত হন।

কমলাক্ষ বা কমলাকর ভট্টাচার্য—অদ্বৈত আচার্যের বাল্য নাম। অদ্বৈত আচার্য দ্রঃ।

কমলাদেবী—শ্রীকংসারি মিশ্রের বণিতা। শ্রীসূর্যদাস ও গৌরী দাস পণ্ডিত প্রভৃতির মাতাঠাকুরানী। শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর পিতামহী।

কমলাদেবী, রানী—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্বকারী কাছাড়রাজ তুলসাধ্বজের পত্নী। পার্শ্ববর্তী প্রতাপগড়ের মুসলমান রাজা আফতাবউদ্দিন কাছাড় আক্রমণ করে পরাজিত হন। পরে কাছাড়পতি তুলসাধ্বজ প্রতাপগড় আক্রমণ করে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তখন রানী কমলাদেবী নিজেই সৈন্য পরিচালনা করে প্রতাপগড় আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে আফতাবউদ্দিন ও তাঁর কয়েকজন ভাই নিহত হন।

কমলানন্দ—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত। পূর্বে এঁর গৌড়ে শ্রীপাঠ ছিল। সেখান থেকে পুরীধামে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট বাস করেছিলেন।

গৌড়ে পূর্ব ভৃত্য মহাপ্রভুর প্রিয় কমলানন্দ।

কম্বলপাদ বা কম্বলাম্বর পাদ—প্রাচীন বাংলার একজন সিদ্ধাচার্য। প্রাচীন বাংলা ভাষায় ইনি কম্বল-গীতিকা নামে একটি দোহা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চর্যাচর্য বিনিশ্চয় গ্রন্থের একটি গীতির ইনি লেখক। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে ইনি হেরুক সাধন সম্বন্ধে অন্তত ছ'খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইনি নবম শতাব্দীর শেষার্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

করিমল্লা—'যামিনী বাহাল' নামক গ্রন্থ রচয়িতা। এই মুসলমান কবি সীতাকুণ্ডের নিকটবর্তী কোনো স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবস্থিতি কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। গ্রন্থমধ্যে মুসলমান কবি হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা বর্ণনা করেছেন।

করুণাদাস মজুমদার—করণ কুলোদ্ভব, আচার্য প্রভুর শিষ্য জানকারাম দাসের পিতা। আচার্যের পত্র লিখে ইনি 'বিশ্বাস' উপাধি পেয়েছিলেন।

করোসী, আলেকজাণ্ডার সোমা ডু—প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ একজন হাঙ্গেরীয় মনীষী। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সোমার জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম অ্যানড্রু, মার নাম ইলোনা। ইনি অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ও প্রতিভাধর ছাত্র ছিলেন। ইনি হাঙ্গেরী থেকে তিব্বতে এসে তিব্বতী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলকাতায় এসে রয়াল্ এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে লাগলেন। পরে ইনি সোসাইটির অনারারী সভ্য হলেন। ১৮৩৭ সালে সোমার তিব্বতী অভিধান ও ব্যাকরণ ছাপা হয়। কলকাতায় থেকে ইনি সংস্কৃত ও বাংলা শেখেন। তারপর বাংলা দেশকে ভাল করে জানবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং মালদহ, কিসেনগঞ্জ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি নানা জেলা পরিভ্রমণ করেন। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে ইনি এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। বহু-প্রাচ্যভাষাবিদ পণ্ডিত সোমা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন।

কলানিধি আচার্য—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বঙ্গদেশে স্থিতি হয়,
নাম কলানিধি। বিপ্রকুলে জন্ম তার আচার্য্য, উপাধি ॥ / তারে কৃপা কৈল প্রভু হঞা কৃপাবান্।

কলানিধি চট্ট—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাঠ—কাঞ্চন গড়িয়া।

তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম। / সদা হরি নাম জপে, এই তার কাম ॥ / প্রভু কহে—তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম। / লক্ষ নাম জপ তুমি কারয়া নিয়ম ॥

কলানিধি নরসুন্দর—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় ইনি নাকি ক্ষৌরকর্ম করেছিলেন।

কলানিধি রায়—শ্রীচৈতন্য শাখা। প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। পিতার নাম—ভবানন্দ রায়।

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ। কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ।

কলাবতী—মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পিতামহী—উপেন্দ্র মিশ্রের স্ত্রী। এঁর সাত পুত্র। তন্মধ্যে মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এঁর পঞ্চম সন্তান।

কল্যাণ বর্মা—রচিত গ্রন্থ সারাবলী। মল্লিনাথ, উৎপল এবং

আল্‌বেরুণী এই তিন জনই সারাবালী থেকে বচন উদ্ধার করেছেন। এই যুগের ইহাই একমাত্র জ্যোতিষগ্রন্থ। কল্যাণ-বর্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে 'ব্যাঘ্রতটীশ্বর' বলে বর্ণিত হয়েছেন। এঁর অবস্থিতি-কাল সম্ভবতঃ নবম-দশম শতাব্দী।

কল্যাণ মাণিক্য—ইনি স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা যশোধর মাণিক্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। যশোধর মাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৬২৫ সালে ইনি রাজা হন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বাহুবল সম্পন্ন নরপতি ছিলেন। ইনি ত্রিপুরার বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে একত্রিত করে সুশিক্ষিত করেন। বাংলার তৎকালীন নবাব সুলতান শাহ সুজা (১৬৩৯-৬০ খ্রীঃ) একবার ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করলে রাজা কল্যাণ মাণিক্যের বাহুবলে মোঘল সৈন্য পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরার রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। ইনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্যও বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। এঁরই সময়ে কল্যাণপুর দুর্গের কালীবাড়ী নির্মিত হয়েছিল। কল্যাণ সাগর এঁর অনন্যকীর্তি। পুত্র গোবিন্দকে যৌবরাজ্য প্রদান করার উৎসবে ইনি তুলাদান করেছিলেন এবং বৃন্দাবন, মথুরা, সেতুবন্ধ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। মগেরা "চন্দ্র গোপীনাথ" মূর্তি নিয়ে গিয়েছিল, ইনি তা আনয়ন করে পুনরায় স্থাপন করেছিলেন। ১৬৫৯ সালে ইনি পরলোক গমন করেছিলেন।

কল্যাণ রায়চৌধুরী—মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রাজা এবং তমলুক রাজ্যের সামন্ত নৃপতি। খুব সম্ভব ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এখানে রাজত্ব করতেন।

কল্যাণ স্বামী—চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর মধ্যাঞ্চলবাসী প্রবাসী বাঙালী শক্তিস্বামীর পুত্র। শক্তি-স্বামীর অসামান্য শক্তি দর্শনে কাশ্মীরের বিখ্যাত রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় তাঁকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন ফলে কল্যাণস্বামীও কাশ্মীর রাজসভায় অবস্থানের সুযোগ লাভ করেছিলেন। কল্যাণ স্বামীর অগাধ পাণ্ডিত্যে কাশ্মীরবাসিগণ এতদূর চমৎকৃত হয়েছিলেন যে তাঁরা এঁকে স্বয়ং যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে তুলনা করতেন। এঁর অবস্থানকাল সম্ভবত অষ্টম শতাব্দী।

কাকুৎস্থ সেন—তত্ত্বচন্দ্রিকা প্রণেতা ১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দীর শিবদাস সেনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ইনি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কাজী মুবক্কিল—সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সময়ে ইনি প্রধান কাজী বা ধর্মাধিকরণরূপে নিযুক্ত হন। কোন বিচারের ব্যাপারে বাদশাহের পত্নীর সঙ্গে এঁর বিবাদ উপস্থিত হলে ইনি

দিল্লী পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রামে আসেন এবং শেষজীবন এখানে অধ্যাত্ম-সাধনা ও ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন।

কাজী সাহেব—এঁড়িয়াদহ-নিবাসী। দাসগদাধর এঁর দ্বারা হরিনাম উচ্চারণ করিয়েছিলেন।

কাঞ্চনলতিকা দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠা কন্যা ও শিষ্যা। কাঞ্চন ঠাকুরঝি এবং যমুনা ঠাকুরঝি নামেও খ্যাত। এর স্বামীর নাম বা বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় না।

কানা হরিদত্ত—হরিদত্ত, কানা দ্রঃ।

কার্তিক কুণ্ড—বৃন্দ কুণ্ডের এক আত্মীয়। ইনি চরক-সুশ্রুতের টীকাকার। এঁর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী।

কাত্যায়নী (রানী)—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দির দেওয়ান প্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) স্ত্রী। লালাবাবু ত্রিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করলে তরুণী রানী কাত্যায়নী সমস্ত বিষয়কার্য নিজে পরিচালনা করতেন। ইনিও স্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। ইনি ছিলেন অতিশয় দয়াবতী ও দানশীলা। ইনি উত্তর কলকাতায় (কাশীপুর) গঙ্গার ধারে একটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

কানাই খুটিয়া—'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীক্ষেত্রে প্রথম বৎসরে কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দমহোৎসবকালে কানাই খুটিয়া নন্দর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়ানের পর শ্রীনিবাস এবং তারও পরে নরোত্তম নীলাচলে গিয়ে কানাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইনি নরোত্তমকে জগন্নাথ মন্দির দর্শন করিয়েছিলেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার কানাই খুটিয়া রচিত 'মহাভাব প্রকাশ' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। জগন্নাথ ও বলরাম নামে এঁর দুই পুত্র ছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কানাই গোপ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—ধারেন্দা। নিমু গোপ, কানাই গোপ, হাব গোপ আর। ধারেন্দা গ্রামেতে বাস হয় এ সবার।

কানাই ঠাকুর—'কানু পণ্ডিত' বা ঠাকুর কানাই নামেও খ্যাত। শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র। শ্রীখণ্ডে পাট। বৈদ্য। ইনি কাটোয়ার দাস গদাধরের বিখ্যাত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পিতা রঘুনন্দনের তিরোভাব উপলক্ষে তৎকালের সমস্ত মহান্তগণকে নিমন্ত্রণ করে মহোৎসব করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য উক্ত উৎসবে অধ্যক্ষতা করেছিলেন। কানাই ঠাকুর শ্রীখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইনি খেতরির মহোৎসবে মা জাহ্নবা ও বীরভদ্র প্রভুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। পদাবলী সাহিত্যে এঁর যথেষ্ট দান আছে। মধ্যে ইনি বোধখানায়

(ভাজনঘাটে) পাট স্থাপন করেন। ঠাকুর কানাই শেষ জীবনে বোধখানা থেকে মেদিনীপুরের গড়বেতায় উপস্থিত হয়ে একটি ভজন কুটিরে অবস্থানপূর্বক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে থাকেন।

কা না ই দা স—বৃন্দাবনবাসী উদাসীন বৈষ্ণব। 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাসলেশ' ও 'বৃহদভাগবতামৃতকণা' নামক (অনুবাদ) গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা।

কানুরাম চক্রবর্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য।

কানু দাস বা **কানুরাম দাস**—এঁর পিতার নাম পুরুষোত্তম দাস, পিতামহ সদাশিব কবিরাজ। বাল্যকালে এঁর নাম ছিল শিশু কৃষ্ণদাস। পরে ইনি কানুঠাকুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইঁনি ছিলেন নাকি 'সংকীর্তনে অদ্বিতীয় মদন গোপাল' এবং এঁর মুরলীর রবে সকলের চিত্ত-হরণ হলে জীব গোস্বামী এঁর 'কানাই' নামকরণ করেন। সেই থেকে ইনি কানুঠাকুর নামে অভিহিত হন। বীরচন্দ্রের খেতুরি থেকে বিদায় গ্রহণ-কালে কানাই ঠাকুর তাঁর সঙ্গী হিসাবে বর্তমান ছিলেন। কেউ কেউ এঁকে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মনে করেন। কানুঠাকুরও একজন পদকর্তা ছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কানু ফকির—মুসলমান কবি আলীরাজার অন্য নাম। আলীরাজা দ্রঃ।

কান্তবাবু—কাশিমবাজার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর পুরো নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। ইনি তৈলিক বা তিলি জাতীয়। কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠি ও রেসিডেন্ট সংলগ্ন স্থানেই এঁর একখানি সামান্য দোকান ছিল। সেই দোকানের আয় থেকেই সংসার-যাত্রা নির্বাহ হত। সে সময় সাধারণ লোকে এঁকে কান্তমুদী বলে ডাকত। এঁদের পূর্বনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের অধীন সিপীগ্রাম বা সিজনা। এঁর পূর্ব পুরুষরা রেশম ও সুপারীর ব্যবসা করতেন। কান্তবাবুর পিতার নাম ছিল রাধাকান্ত নন্দী। ইনি বাংলা, ফার্সী এবং সামান্য ইংরেজী জানতেন। প্রবাদ আছে যে কান্তবাবু দু'হাজার ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করেছিলেন। এঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং বাংলা হিসাবপত্র খুব ভাল জানতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস সিরাজের ভয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে যাবার সময় কান্তমুদীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কান্তমুদী তখন হেষ্টিংসকে নিজের বাসভবনের এক নিভৃত কোণে লুকিয়ে রাখেন। তাতে হেষ্টিংসের জীবন রক্ষা পায়। পরে হেষ্টিংস যখন গভনর হন, তখন তিনি পূর্ব উপকার স্মরণ করে কান্তবাবুকে ব্যক্তিগত দেওয়ান বা মুচ্ছুদ্দী বা বেনিয়ান পদে নিযুক্ত করেন। এখন থেকে কান্তমুদী, কান্তবাবু নামে অভিহিত হতে থাকেন

এবং হেষ্টিংসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হয়ে ওঠেন। কালক্রমে কান্তবাবু অগাধ ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হন। কাশিমবাজারের দাতা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই কান্তবাবুরই পৌত্র রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয়-রূপে অপুত্রক মাতুলের বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্তবাবু পরলোকগমন করেন।

কান্ত বিদ্যালঙ্কার—ইনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র শিবচন্দ্রের সময়ে রাজসভার অন্যতম প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

কান্তিদেব—বাংলার পাল রাজত্বকালে কান্তিদেব নামক জনৈক বৌদ্ধ পূর্ববঙ্গের হরিকেল অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এঁর পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ছিলেন সাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে রাজ্য স্থাপন করে অনতিকাল মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ এবং সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গেরও কিছুটা অংশ জয় করে নিজের রাজ্যসীমা বিশেষভাবে বাড়িয়েছিলেন। বিন্দুরাতি নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। এঁর রাজত্বকাল সম্ভবত ৮২০-৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। অনুমিত হয় হরিকেলের রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর।

কার্ভালো—ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বারভূঞাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা কেদার রায়ের বিখ্যাত নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। কার্ভালো ছিলেন পর্তুগীজ নাবিক। নৌযুদ্ধে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাজা কেদার রায়ের পক্ষে থেকে ইনি আরাকানরাজ ও মোগলদের বার বার পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে কার্ভালো অসীম বীরত্ব প্রকাশ করে মোগলদের হাত থেকে সন্দ্বীপ অধিকার করে নিয়েছিলেন। রাজা কেদার রায়ের অধীনে কার্ভালো ছিলেন সন্দ্বীপের শাসনকর্তা।

কামদেব—শ্রীহট্টের উত্তরাঞ্চল জয়ন্তিয়া রাজ্যের রাজা। একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। এঁর সভাপণ্ডিত কবিরাজ নামক এক কবি "রাঘব পাণ্ডবীয়" নামে এক কাব্য রচনা করেন।

কামদেব ঘোষ—কায়স্থকুলতিলক মহোপাধ্যায়। ইনি কাতন্ত্রমতে একজন প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন। এঁর রচিত ভট্টিকাব্যের টীকা 'পদকৌমুদী'। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দী।

কামদেব তার্কিক—বিখ্যাত সাধক। রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইনি ভূষণায় আসেন। এবং প্রথমেই রণরঙ্গিণীর মন্দিরে উপস্থিত হন। ইনি ও এঁর উত্তর সাধক যাদবেন্দ্র ঘোষ ভূষণার নিকটবর্তী চম্পকদহের তীরে নানাস্থানে সাধনাসন পেতে বহু বৎসর তপস্যা করেছিলেন।

পরে মাধব বিশ্বাসের উদ্যোগে মাধবের গুরু কালীশরণ ভট্টাচার্যের কন্যা রঙ্গিনী দেবীর সহিত কামদেবের বিবাহ হয়। এঁর বংশধরগণ বর্তমান মহীশালা ও কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে বাস করতেন। কামদেব কুমার নদের তীরবর্তী কয়ড়ায় কালীবাড়ীতে সিদ্ধিলাভ করেন। শেষ বয়সে কামদেব যখন জীবনের সাধনা শেষ হয়েছে বুঝলেন, তখন বৃহৎ জনতার সামনে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন।

কামদেব দত্ত—কামদেব দত্তের 'ব্রতমালা' রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে। এই ব্রতমালায় বহু পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলিত হয়েছে —খট্টাঙ্গের উপাখ্যান, গঙ্গামহিমা, পদ্মগন্ধা-কাহিনী, শিবরাত্রি ব্রতকথা, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী, শবরের কাহিনী, রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য, গয়াসুর-আখ্যান, সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলা, হরিনাম মাহাত্ম্য ইত্যাদি। কবি বলেছেন যে গ্রন্থ-রচনায় তিনি ব্যাসের মনন-তন্ত্র অবলম্বন করেছেন। কবির নামন্তর ছিল সৃষ্টিধর।

কামদেব নাগর—ইনি প্রথমে অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। প্রভুর আদেশ অমান্য করায় ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

কামদেব পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর শিষ্য। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—খড়দহবাসী। এঁর স্ত্রীর নাম রাধারানী।

কামদেব ব্রহ্মচারী—বঙ্গরাজ আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাবর্ণ গোত্রসম্ভূত বেদগর্ভ অন্যতম। তাঁর দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে হল নামধারী "গঙ্গ" গ্রাম দান প্রাপ্ত হন। এইজন্য হলের সন্তানরা গঙ্গোপাধ্যায় নামে আখ্যাত হন। এই হলের অধস্তন চতুর্দশ পুরুষে কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ভব হয়। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী পণ্ডিত ছিলেন। ইনি দিবারাত্র জপ-তপ ও শাস্ত্রচর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। সংসারের প্রতি এঁর ক্রমে ক্রমে উদাসীনতা দেখা দেয়। পত্নী পদ্মাবতী একদিন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে দেহত্যাগ করলে কামদেব সংসারের সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং বারাণসী ধামে গমন করেন। কঠোর তপস্যাব্রত অবলম্বন করে ইনি সাধনায় নিমগ্ন হন। কিছুদিন পরে কামদেবের যশোগৌরব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোক এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। এঁর ছিল সুদীর্ঘ দেহ, বিশালায়ত বাহুদ্বয়, আয়ত লোচন, স্রক্ চন্দন-শোভিত বিস্তৃত ললাট দেশ। গৈরিক-বসন-মণ্ডিত, ত্রিশূল-ধৃত, সেই সুদীর্ঘ মূর্তি—যে দেখত, সেই সসম্ভ্রমে ভূয়ে অবনত হয়ে প্রণাম

করত। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, দিল্লীশ্বর আকবরের সমসাময়িক। অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। মানসিংহ বঙ্গদেশে অভিযান কালে যখন বারাণসী হয়ে আসেন, তখন একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে কামদেবকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এবং এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর নির্দেশমত বঙ্গদেশ বিজযের পর মানসিংহ কামদেবের পুত্রকে খুঁজে বার করেন। পুত্রের নাম লক্ষ্মীকান্ত। মানসিংহ গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তকে বড়িশার পার্শ্ববর্তী নানাস্থানের জমিদারী এবং কয়েকটি পরগণা প্রদান করেন। লক্ষ্মীকান্তকে মানসিংহ রায়চৌধুরী উপাধিতেও ভূষিত করেন। সুতরাং কামদেব ব্রহ্মচারীই বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের আদি পুরুষ।

কামদেব মণ্ডল—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল। নিগূঢ় তাঁহার ভাব কে কহিতে পারে। রাধা-কৃষ্ণ-লীলা স্ফুরে যাহার অন্তরে॥ এঁর দুই পুত্র—রাধাবল্লভ দাস ও রমন দাস, দুই জনই ভক্ত।

কামদেব রায় চৌধুরী—যশোহর জেলার বেতুটিয়ার জমিদার। নবাব খাঞ্জে আলীর উজির স্বধর্মত্যাগী মোহাম্মদ তাহিরের পরামর্শে ইনি জাতিচ্যুত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। যশোহরের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী সিংহিকা গ্রাম ইনি জায়গীর প্রাপ্ত হন।

কামাভট্ট—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কারগুজার খাঁ—আলিবর্দি খাঁর অন্যতম দৌহিত্র পূর্ণিয়ার নবাব সওকত জঙ্গের অন্যতম সেনাপতি। সিরাজউদ্দৌলা আপন পিতৃব্যপুত্র অথবা আপন মাসীপুত্রকে দমন করবার জন্য সেনাপতি মোহনলাল, মীরজাফর খাঁ প্রভৃতির অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সওকত জঙ্গ ও তাঁর সেনাপতি কারগুজার খাঁ নিহত হন।

কালা নাজির—ত্রিপুরাধিপতি বিজয় মাণিক্যের (১৫২৮-১৫৭০ খ্রীঃ) প্রধান ও প্রিয় সেনাপতি ছিলেন।

কালা পাহাড়—বাংলার সুলতান সুলেমান কররানীর (শাসন-কাল ১৫৬৫-১৫৭২ সাল) সেনাপতি। হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং হিন্দুদের মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করবার জন্য ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। কিংবদন্তী আছে ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু এই কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নেই। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা', বদাওনীর 'মুন্তখব-উৎ-তওয়ারিখ' এবং নিয়ামতুল্লাহ্‌র 'মখজান-ই-আফগানি' হতে প্রামাণিক-

ভাবে জানতে পারা যায় যে, কালাপাহাড় জন্ম-মুসলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি ছিলেন সেকেন্দার সুরের ভ্রাতা। তাঁর নামান্তর "রাজু"; এই নাম হতে অনেকে কালাপাহাড়কে হিন্দু মনে করেন, কিন্তু "রাজু" নাম হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। এই কালাপাহাড ইসলাম শাহের রাজত্বকাল হতে শুরু করে দাউদ কররানীর রাজত্বকাল পর্যন্ত বাংলার সৈন্যবাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীর মৃত্যুর সাত বছর পরে ১৫৮৩ সালে মোগল রাজশক্তির সঙ্গে বিদ্রোহী মাসুম কাবুলীর যুদ্ধে কালাপাহাড মাসুমের হয়ে সংগ্রাম করেন এবং তাতেই নিহত হন।

আর একজন কালাপাহাড পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহ্‌লোল লোদী ও সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক এবং তাঁদের রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্গাদাস সান্যাল তাঁর 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে কালাপাহাড সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার— জন্মস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার ফুরশাইল (ফুল্লশালী) গ্রাম। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও পাঠক ছিলেন। ইনি ভাগবতের বহু শ্লোকের অভিনব ব্যাখ্যা করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করতেন। ইনিই 'কিশোরী ভজন' নামক একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

কালিক, মহাস্থবির— প্রাচীনকালে বৌদ্ধদের মধ্যে ষোলজন বিখ্যাত মহাস্থবির জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে কালিক ছিলেন একজন। ইনি ছিলেন বাঙালী। এবং তাম্রলিপ্তের অধিবাসী। এঁর জন্মস্থান ছিল সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তের কাছাকাছি কোন একটি গ্রামে। মহাস্থবির কালিকের আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

কালিদাস— খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি কালিদাস তাঁর মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, সে সমস্তই বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত। নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে কবি কেবলমাত্র বলেছেন:

কহে কবি কালিদাস, গৌড়দেশে যাঁর বাস, বিরচিল মনসা-মঙ্গল।

১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়। তাঁর রচনা অত্যন্ত সহজ ও সরল এবং লালিত্যপূর্ণ। তাঁর এই সুখপাঠ্য কাব্যখানি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। কালিদাস 'শনির

পাঁচালী' নামক একখানি পাঁচালীও রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

এঁর কাব্যে মৌলিকতার কোন পরিচয় নেই। এঁর কাব্যের ভণিতায় আগাগোড়া গোলকনাথের উল্লেখ দেখে মনে হয় গোলকনাথ হয় এঁর ইষ্টদেবতা অথবা গুরু।

কালিদাস—রঘুনাথ দাসের একজন জ্ঞাতি খুড়া। ইনি ছিলেন সপ্তগ্রামনিবাসী। কালিদাস 'মহা ভাগবত সরল উদার' এবং ইনি সর্বদা কৃষ্ণ-নামে তন্ময় হয়ে থাকতেন। এমনকি পাশাখেলার সময়ও ইনি 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করি পাশক চালায়'। এঁর একটি প্রধান সাধ ছিল বৈষ্ণব ভক্তদের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে ভোজন করা। একবার কালিদাস মহাপ্রভুর দর্শনলাভের জন্য নীলাচল গমন করেন এবং তাঁর পাদোদক ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে কৃতার্থ হন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

কালিদাস গজদানী বা সুলেমান—ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার বার ভূঞাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঞা ঈশা খাঁর পিতা। এই গজদানী ছিলেন রাজস্থানী বৈশ্য, অযোধ্যা থেকে বাণিজ্য ব্যপদেশে বাংলায় এসে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন এঁর নাম হয় সুলেমান। প্রথমে ইনি নারায়ণ-গঞ্জের প্রায় এক মাইল দূরে খিজিরপুর নামক এক গ্রামে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে সোনার গাঁর কাছে কিছু বিষয় সম্পত্তি করে বাস করতে থাকেন। কালিদাস অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। সোনার হাতী দান করতেন বলে ইনি গজদানী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় পুরুষ। ইনি প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে রাজকর বন্ধ করে দিতেন। এজন্য ক্রমান্বয়ে সোলিম খাঁ, তাজ খাঁ, তুবিয়ার খাঁ প্রভৃতি সেনাপতি-গণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু বার বার তাঁরা গজদানীর কাছে পরাস্ত হলেন। পরে এক ভয়াবহ যুদ্ধে গজদানী পরাস্ত ও নিহত হন। তাঁর দুই পুত্র ঈশা খাঁ ও ইসমাইল খাঁ তুরাণী বণিকদের নিকট বিক্রীত হয়।

কালিদাস চট্ট—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পূর্বে চাঁদ রায়ের দলে দস্যুবৃত্তি করতেন। শ্রীনরোত্তমঠাকুরের কৃপায় ইনি মহাবৈষ্ণব হন।

কালিদাস, দ্বিজ—ইনি ছিলেন কবি ও পণ্ডিত। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। এঁর রচিত কাব্য 'কালিকা-বিলাস' ও 'কালিকামঙ্গল'। কাব্যখানির নাম কালিকা-বিলাস হলেও কালিকা বা কালীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের নাম কালিদাস ছিল বলে এঁর কাব্যের এইরূপ নামকরণ হয়েছে। এঁর কাব্যে কবি রামপ্রসাদের প্রভাব অনুভূত হয়। এঁর কাব্যের বহু অংশ কালিদাস রচিত 'কুমার-সম্ভবম্'

কাব্যের ভাষানুবাদ বলে মনে হবে। তাছাড়া, সংস্কৃত পুরাণ হতেও বহু অংশ ইনি এঁর কাব্যমধ্যে অনুবাদ করে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থখানি আকারে বৃহৎ, রচনায় প্রাঞ্জল। ইনি ছিলেন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সমসাময়িক। সম্ভবতঃ এঁর নাম ছিল কালিদাস ভট্টাচার্য।

কালিদাস মিশ্র—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত। এঁর পিতার নাম দুর্গাদাস মিশ্র এবং পত্নীর নাম বিধুমুখী দেবী। এঁর পুত্র মাধব আচার্য ছিলেন কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা।

কালিদাস রায়চৌধুরী—মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ঢালী সৈন্যের সর্দার ছিলেন। মানসিংহের আক্রমণ কালে কালিদাস প্রতাপাদিত্যের একজন প্রধান সেনাপতিরূপে যশোহর দুর্গরক্ষায় ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রতাপের পতনের পরও ইনি জীবিত ছিলেন এবং যশোহর পরিত্যাগ করে জন্মভূমি সেথহাটি গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন।

কালিদাস সিদ্ধান্ত—ইনি ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের শিক্ষক। এঁরই নিকট রাজা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন।

কালী মির্জা—একজন খ্যাতনামা কবি ও সংগীতসাধক। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া মহাগ্রামে কালী মির্জার জন্ম হয়। এঁর প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম বিজয়রাম। বাল্যে ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইনি গুপ্তি পাড়ায় রামনিধি ভট্টাচার্যের টোলে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের পাঠ আরম্ভ করেন। ১৯-২০ বছর বয়সে কালিদাস বেদান্ত দর্শন শিক্ষা করার জন্য কাশী গমন করেন। এই খানেই তিনি সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। তারপর ইনি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে কিছুকাল সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুশীলন করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী হন। এই সময় পারসী এবং উর্দু ভাষাও শিক্ষা করেন। দীর্ঘদিন পশ্চিমে থাকার জন্য পারসী ও উর্দু ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। হিন্দুস্থানী আচারে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য ইনি কালীমির্জা বলে পরিচিত হন।

প্রায় বার বছর পরে কালিদাস গুপ্তিপাড়ায় ফিরে আসেন এবং এক রূপবতী ধর্মপরায়ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করে সংসারী হন। কলকাতায় এসে ইনি গোপীমোহন ঠাকুরের সভাসদ হন। কথিত আছে কালীমির্জার গানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গোপীমোহন ঠাকুর কালিদাসকে এককালীন দশ হাজার টাকা দান করে এঁর কাশী যাবার উপায় ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের উপায় করে দেন। ১৮২০ সালে কালীমির্জা কাশীতে দেহত্যাগ করেন। ইনি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের শিষ্য ছিলেন। কালীমির্জার সঙ্গীত-

সমূহ "সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুমে" প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া একটি সংগীতের গ্রন্থও আছে। এঁর প্রতিটি গানই অমূল্য।

কালী শিরোমণি—পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ দ্র°।

কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ—খাঁটুরার রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশীয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। জ্ঞাতি অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের একজন কৃতী ছাত্র। একবার শোভা-রাজার রাজবাটীতে কোনও ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে বিচারে জয়লাভ করে স্বীয় অধ্যাপকের সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন। সেকালে অধ্যাপকদের বেতন গ্রহণ করা অত্যন্ত নিন্দার বিষয় ছিল। একবার ইনি কোনোও সরকারী কাজে বেতন গ্রহণ করায় ম্লেচ্ছের অর্থ গ্রহণ অপবাদে স্বসমাজে অতিশয় নিন্দিত হয়েছিলেন। ইনি ১৭৫২ সালে বর্তমান ছিলেন। এঁর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। প্রত্যেক গ্রন্থে নিজ পরিচয় ও সন তারিখ দেওয়া আছে।

কালীকুমার দত্ত—চব্বিশ পরগণা জেলার খাঁটুরা গ্রামে ১৭৯১ সালে জন্ম। এঁর পিতা ফকিরচাঁদ দত্তের কলিকাতা চিনি পটিতে খুব বড় ব্যবসা ছিল। এবং বহু অর্থ উপার্জন করেন। কালীকুমার দত্ত সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিশেষ অতিথি সৎকারপরায়ণ লোক ছিলেন। একবার দুদিন কোনো অতিথি না আসায় ইনি সস্ত্রীক উপবাসে ছিলেন। এঁর সৎকর্মের কথা সার এসলি ইডেন অবগত ছিলেন এবং একবার এঁকে সাক্ষাতে খুব প্রশংসা করেছিলেন। ১৮৬১ সালে ইনি পরলোক গমন করেন।

কালীকুমার রায়—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলায় যখন মুদ্রাক্ষর নির্মিত হয়, ইনি তখন সুছাঁদ লিখতেন। তাঁরই লেখা দেখে বর্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হয়েছে।

কালীচরণ ঘোষ—বিখ্যাত প্রবাসী বাঙ্গালী বীর। কলিকাতা নিবাসী বাবু কালীচরণ ঘোষ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ সরকারের অধীনে সমর বিভাগে চাকরি গ্রহণ করে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যান। প্রথম ভরতপুর যুদ্ধের সময় ইনি সৈন্যদলের রসদসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন সেনাধ্যক্ষদের সংস্পর্শে থেকে যুদ্ধকৌশলাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি শত্রুপক্ষের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হলে নিম্নপদস্থ অন্যান্য সেনাপতিদের অনুরোধে ইনি নিহত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং এঁর সৈন্য পরিচালনার নৈপুণ্যে ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করে। যুদ্ধ শেষে প্রথমে বিনা অনুমতিতে সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচ্ছদ পরিধান করার অপরাধে সামরিক বিধানে এঁর অর্থদণ্ড হয়। কিন্তু পরে এঁর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বীরত্ব

ও রাজভক্তির জন্য এঁকে বহু সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হয়। উপরিউক্ত ঘটনার জন্য ইনি জেনারেল (অপভ্রংশ জাঁদরেল) কালু ঘোষ নামে পরিচিত হন।

মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করার অপরাধে ইনি স্বশ্রেণীর মধ্যে অপাংক্তেয় হয়েছিলেন।

কালীনাথ আচার্য—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু শ্রী শ্রী কে শ ব ভা র তী র পূর্বাশ্রমের নাম। কেশবভ বতী দ্র°।

কালীনাথ তর্করত্ন—শাকদ্বীপি দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। সংস্কৃত ভাষা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে এঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।

কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ—ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক আহূত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশজন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদিগের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পরে হ্যালহেড কর্তৃক Code of Gentoo Laws নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

কালীশঙ্কর রায়—ইনি নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানের কাজ করতেন। পিতার নাম রূপরাম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোরাধীপের ভূষণা জমিদারী কালীশঙ্করের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়। বাকী খাজনার দায়ে ১৭৯৫ সালে নাটোর রাজের পরগণা সকল নীলামে উঠলে, ইনি তার পাঁচটি খরিদ করেন ও পরে আরও ক্ষুদ্র কয়েকটি পরগণা ইনি ক্রয় করেন। ১৮০০ সালে রাজস্ব অনাদায়ের অভিযোগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোকদ্দমা করে কালীশঙ্করকে কারারুদ্ধ করেন। চার বছর পরে কালীশঙ্কর কিছু টাকা খাজনা বাবদ দিয়ে মুক্তি লাভ করেন ও তদবধি নড়াইলে বাস করেন। ১৮০৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব বাবরজঙ্গ কালীশঙ্করকে রায় উপাধি দান করলে, নড়াইলের দত্ত পরিবার রায়বংশ নামে খ্যাত হন। তারপর কালীশঙ্কর কাশীতে গমন করেন এবং সেখানেও কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করেন। ৯০ বছর বয়সে ১৮৩৩ সালে কাশীতে এঁর মৃত্যু হয়। বিবিধগুণ ও অসাধারণ প্রতিভাবলে কালীশঙ্কর মৃত্যুকালে স্বোপার্জিত বিপুল ভূসম্পত্তি রেখে যান।

কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ—বিক্রমপুরনিবাসী খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি বহু পত্রিকা রচনা করেছিলেন। সকল নৈয়ায়িকের মতে অগণিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে 'কালীশঙ্করী'ই সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁর পত্রিকাই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। কালীশঙ্কর মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার রাজা রাজসিংহের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস বিক্রমপুর সমাজের 'প্রাধান্য' রক্ষায়

অন্য দেশে থেকে অধ্যাপনা করতেন এবং বাকী ছয় মাস সুসঙ্গরাজবাড়ীতে গিয়ে পড়াতেন। কালীশঙ্কর ১৮১০-৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পত্রিকা রচনা করেছিলেন।

কালুপীর—নবদীক্ষিত মুসলমান সাধক গাজীর সহকর্মী ছিলেন এবং এই কালুর সঙ্গে বড় খাঁ। গাজী সবত্র ধর্ম-প্রচার করে বেড়াতেন। কালুর পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে নানা মত আছে, তন্মধ্যে একটি মত এই যে, কালু ঘোষ নামক জনৈক গোপ শাহ জালালের নিকট দীক্ষালাভ এবং ইসলামের প্রচার ব্রত অবলম্বন করেছিলেন। গাজী এবং কালুর দরগা বঙ্গের নানা স্থানে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গ, সুন্দর-বন এবং ত্রিবেণীতে গাজীর ও কালুর দরগা আছে। গাজী এবং কালুর প্রচার বৃত্তান্ত সুপরিচিত এবং গায়কদের দ্বারা দেশে দেশে তার বহুল বিস্তার হয়েছে। তার চরিত্রে শৌর্যবীর্য এবং করুণার আশ্চর্য রূপ সমাবেশ লক্ষিত হয়। এঁর অবস্থিতিকাল চতুর্দশ শতাব্দী।

কালু ভূঞা—তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের বর্তমান মাহিষ্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কালু ভূঞা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বহুকাল প্রচলিত একটি প্রবাদ অনুযায়ী কালু ভূঞা চার শত মাহিষ্য পরিবার সমভিব্যাহারে উড়িষ্যার কাকরা চোর অঞ্চল থেকে তাম্রলিপ্তে এসে তাম্রলিপ্ত অধিকার করেছিলেন। এবং স্বজাতি সহচরদের ভূসম্পত্তি দান করে বসতি স্থাপনে সাহায্য করেন।

কাশী মিশ্র—উৎকলবাসী। ইনি নীলাচলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবত ইনি উৎকল রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু। মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে এলে কাশী মিশ্র তাঁর চরণ শরণ করেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করে ফিরে এসে কাশী মিশ্রের গৃহেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। ফলে ইনি মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। ইনি জগন্নাথ মন্দিরের কার্যাধ্যক্ষ হিসাবে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। মহাপ্রভু এঁর আতিথেয়তায় বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। পরমানন্দ পুরী, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পরম ভক্তদের মিশ্র নিজ বাড়ীতে স্থান দান করেছিলেন। কাশী মিশ্রের জন্যই নীলাচলে মহাপ্রভুর মহামান্য অতিথি হিসাবে অবস্থান করা সম্ভব হয়েছিল। মহাপ্রভুর তিরোধানকালে কাশীমিশ্র জীবিত ছিলেন। এঁর অবস্থানকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

কাশীনাথ—কাশীনাথের রচিত গ্রন্থের নাম 'তারাভক্তিতরঙ্গিণী'। এই পুথির লিপিকাল ১৭৩৭ শকাব্দ। এতে কাশীনাথের পৃষ্ঠপোষক নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ আছে।

কাশীনাথ ঘোষ—কলিকাতার সিমুলিয়ার ঘোষবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

পিতার নাম রামলোচন। পিতামহ রামদেব ঘোষ ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান এবং নদীয়ার অন্তর্গত মনসাপোতা গ্রামনিবাসী। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ কাশীনাথের পৌত্র। ১৭৬৩ সালে কাশীনাথের জন্ম হয়। পিতার নিকট শিক্ষালাভ করে পরে নিজের চেষ্টায় ইনি ইংরেজী শিক্ষা করেন। লক্ষপতি রামদুলাল সরকারের অংশীদাররূপে ব্যবসায় করে ইনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। ইনি অতিশয় সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। ইনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৮৪৯ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—সিমুল্যানিবাসী খ্যাতনামা স্মার্ত পণ্ডিত ও বাংলা গদ্যের লেখক। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের সহকারী পণ্ডিতের পদে কাজ করেন। পরে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পরিশেষে চব্বিশ-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এঁর রচিত গ্রন্থ—পাষণ্ডপীড়ন, বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ, ন্যায়দর্শন, পদার্থ কৌমুদী, আত্মতত্ত্ব কৌমুদী, সাধু-সন্তোষিণী, ভাষা পরিচ্ছেদ, শ্যামা-সন্তোষণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এঁর জন্ম হয়।

কাশীনাথ তর্কভূষণ বা কাশীনাথ তর্কভূষণ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে ঠাকুর মহাশয়ের ও বৈষ্ণবগণের বড়ই নিন্দা করতেন। পরিশেষে শ্রীনরোত্তমের চরণে আত্ম-বিক্রয় করেন। ইনি পূর্বে নরসিংহ রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

কাশীনাথ পণ্ডিত—নবদ্বীপ-বাসী। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ পরিণয়ে ইনি ঘটকের কাজ করেছিলেন।

কাশীনাথ পণ্ডিত—যশোহর জেলার ব্রাহ্মণডাঙা গ্রামে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশীশ্বর বা কাশীনাথ পণ্ডিতের জন্ম হয়। এঁর পিতা বাসুদেব ভট্টাচার্য ছিলেন একজন ধনী বৈষ্ণব। এঁর মাতার নাম জাহ্নবা। বাল্যকালেই কাশীশ্বরের মনে বৈরাগ্যভাব উদয় হয় এবং ইনি সতের বছর বয়সে গোপনে গৃহত্যাগ করে নীলাচলে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। সেখানে ইনি ষোল বছর অবস্থান করেন। পরে স্বীয় জননীর চেষ্টায় ও মহাপ্রভুর আদেশে ইনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শ্রীরামপুর চাতরা গ্রামে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে আরাধনা করতে থাকেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাতার মৃত্যুর পর কাশীশ্বর পণ্ডিত গয়া হয়ে বৃন্দাবন গমন করেন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন।

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস—আইন্-ই আকবরী গ্রন্থে মোগল সম্রাট আকবরের রাজ্যাভিষেক কালে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ

পণ্ডিতদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। সেটির মধ্যে কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের নাম পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে বিদ্যানিবাসের নাম ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই সম্রাট-দরবারে ঘোষিত হয়েছিল। বিদ্যানিবাস জীবিত থেকে পণ্ডিতসমাজে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তা অতুলনীয়। কাশীর মুক্তিমণ্ডপে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি সামাজিক সভা হয়েছিল এবং তার নির্ণয়পত্রে নানা দেশীয় প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে 'বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য' প্রমুখ গৌড়ীয়ের স্বাক্ষর আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন টোড়রমল্লের সম্মুখে বিদ্যানিবাসের সঙ্গে নারায়ণভট্টের বিচার হয়েছিল। তাঁর জন্মকাল ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বলে অনুমিত হয়। এই হিসেবে তিনি প্রায় ১২৫ বছর জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেব, প্রতাপরুদ্রদেব ও মুকুন্দদেব তিনজনেরই যজ্ঞসভায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন এঁর পিতা। পিতামহ নরহরি বিশারদ ও প্রপিতামহ রত্নাকর। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থগুলির নাম— তত্ত্বচিন্তামণি-বিবেচন, দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতি, সচ্চরিত মীমাংসা প্রভৃতি। তন্মধ্যে প্রথম গ্রন্থখানি ন্যায় বিষয়ক, দ্বিতীয়টি 'দোলারোহণ পদ্ধতি' নামে পরিচিত, এবং তৃতীয়টি ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক রচনা।

কাশীনাথ মাহিতী—নীলাচলবাসী গৌরভক্ত। অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দী।

কাশীনাথ মাহিতী, জুড়াই মোর আঁখি। যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি যায়, গৌরময় দেখি।

কাশীনাথ রায়—ইনি কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের অভ্যুদয়ের পূর্বে নদীয়ার অন্তর্গত জলেশ্বরে বিপুল বিক্রমে রাজ্য-শাসন করতেন।

কাশীনাথ সামুদ্রাচার্য– সম্ভবতঃ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্ম হয়। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি হাত দেখে এমন কি চেহারা দেখে লোকের স্বভাব প্রকৃতি বলতে পারতেন। এঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাই ইনি শতাবধান নামে খ্যাত ছিলেন।

কাশীরাম দাস—কাশীরাম দাসই মহাভারত মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই এই মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। অনুলিখিত একটি পুথিতে আদিপর্ব সমাপ্তির কালজ্ঞাপক একটি শ্লোক আছে। তাকে অবলম্বন করে যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি সিদ্ধান্ত করেছেন ১৬০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশীরামের আদিপর্ব সমাপ্ত হয়। অন্য এক পুথিতে বিরাট পর্ব সমাপ্তির কাল উল্লিখিত হয়েছে ১৬০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দ। কাশীরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের উপাধি ছিল দেব। এঁরা বংশানুক্রমিক-

ভাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কাশীরামের এই বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ পেয়েছে দেব উপাধি স্থলে দাস ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে কবির পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার উত্তর অংশে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গি (বা সিদ্ধি) গ্রামে। কাশীরামের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহ সুধাকর এবং পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কাশীরামেরা ছিলেন তিন ভাই। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্যের রচয়িতা। কনিষ্ঠ গদাধর 'জগন্নাথমঙ্গল' বা 'জগৎমঙ্গল' নামে এক নীলাচল মাহাত্ম্য কাব্য রচনা করেছিলেন।

কথিত আছে, কাশীরাম দাস মেদিনীপুর জেলার আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থেকে পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও পুরাণ পাঠকারী পণ্ডিত আসতেন, তাঁদের মুখে তিনি মহাভারত প্রসঙ্গ শুনে এতে অনুরক্ত হন এবং এই অনুরাগের ফলেই কাশীরাম কর্তৃক মহাভারতের অনুবাদ। মহাভারত ছাড়া, কাশীরাম আরও তিনখানি ছোট কাব্য রচনা করেন, ১। স্বপ্নপর্ব, ২। জলপর্ব, ৩। নলোপাখ্যান। কৃত্তিবাসের মতো কাশীরামও বাঙালীর জাতীয় কবি। কৃত্তিবাসের মতো তিনিও সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালীর হৃদয় মন অধিকার করে আছেন। বাংলা মহাভারতের ইতিহাসে বাঙালীয়ানার ঐতিহ্যারোপ কাশীরাম প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী কাশীরামের রচনা অপূর্ণ ছিল, কিন্তু বাঙালীর ঘরে ঘরে সুসম্পূর্ণ কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রিত-অমুদ্রিত সংস্করণ আজও বিরাজ করছে। এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কত জ্ঞাত-অজ্ঞাত, খ্যাত-অখ্যাত নানা কবির রচনা যে মূল রচনাকেও বিকৃত করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবুও সম্পূর্ণ কাশীদাসী মহাভারতই আপামর বাঙালী জনসাধারণের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। কাশীরামের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মহাকবি মধুসূদন দত্তের ভাষায় বলা যায়,

"মহাভারতের কথা অমৃতসমান
হে কাশী কবীশদলে তুমি
পুণ্যবান্।"

কাশীরাম বাচস্পতি—কাশীরামের পিতা ও পিতামহের নাম ছিল যথাক্রমে রাধাবল্লভ ও রামকৃষ্ণ। ইনি রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্বের টীকা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মলমাসতত্ত্ব, 'তিথিতত্ত্ব, 'শুদ্ধিতত্ত্ব, 'উদ্বাহতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, জন্মাষ্টমী-তত্ত্ব ইত্যাদি।

কাশীশ্বর—এই কাশীশ্বর ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সতীর্থ। ইনি ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার সঙ্গী

হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন এবং তাঁর নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করেছিলেন। রূপ-গোস্বামীর পত্র পেয়ে মহাপ্রভু এঁকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর আজ্ঞাবাহীরূপে ইনি বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠার বিরাট দায়িত্ব বহন করেছিলেন। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপস্থ পার্শ্বচরদিগের মধ্যে ইনি প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। মহাপ্রভু নীলাচল চলে গেলে কাশীশ্বর ঈশ্বরপুরীর নিকট গিয়ে তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ঈশ্বরপুরীর তিরোধানের পর তাঁর অন্তিম নির্দেশমতো ইনি নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মহাপ্রভুর নির্দেশানুসারে ইনি কিছুদিন পরে বৃন্দাবন গমন করেন। ভক্তকাশী নামে এক ব্রাহ্মণ এবং রূপগোস্বামীর সঙ্গী যাদবাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী (গোস্বামী)—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ইনি ঈশ্বরপুরীর সেবা করতেন। ঈশ্বর পুরীর মৃত্যুর পর এবং তাঁর অন্তিম আজ্ঞানুসারে কাশীশ্বর পুরীধামে গিয়ে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হন। চৈতন্যপ্রভু ঈশ্বর দর্শনে গেলে ইনি ভীড় নিবারণ করার জন্য আগে আগে যেতেন। ইনি পূর্বলীলায় ভৃঙ্গার ও শশিরেখা ছিলেন।

কাসেম খাঁ—বাংলার নবাব এসলাম খাঁর ভ্রাতা। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে এসলামের মৃত্যুর পর কাসেম খাঁ বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হয়ে প্রায় পাঁচ বছর কাল বঙ্গদেশ শাসন করেছিলেন।

কাসেম খাঁ যোবানি—শাজাহান দিল্লীর সম্রাট হয়ে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে কাসেম খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেছিলেন। নবাব কাসেম খাঁ বঙ্গের শাসন ভার পেয়েই বিদেশী দস্যুদের অত্যাচারের হাত থেকে বাংলা দেশকে রক্ষা করার কাজে যত্নশীল হন। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাসেম খাঁ হুগলীর বন্দর আক্রমণ করে পর্তুগীজদের পর্যুদস্ত করেন। এই আক্রমণে প্রায় এক হাজার পর্তুগীজ হত এবং ৪৪০০ পর্তুগীজ ধৃত ও বন্দী হয়। এতে ইনি সম্রাট শাজাহানের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই ইনি পরলোক গমন করেন।

কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্য—একজন সিদ্ধাচার্য, জালন্ধর পাদের শিষ্য। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে কাহ্নপাদ ছিলেন বিদ্যানগর বা পাণ্ডনগরের অধিবাসী। আর অন্যমতে সোমপুরনিবাসী। 'হেবজ্র পঞ্জিকা'র রচয়িতা পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদই কাহ্নপাদ বলে কেউ কেউ মনে করেন। এঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কৃষ্ণাচার্যের নামে

৫৭ খানি বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ইনি দোহাকোষ ও ১৩টি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' এই পদগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া, 'কাহ্নুপাদগীতিকা' নামক একটি পদাবলী সঙ্কলন করেছিলেন।

কিড, রবার্ট—লেফটেন্যান্ট কর্নেল রবার্ট কিড বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের মিলিটারি সেক্রেটারি ও একজন উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর চেষ্টায় শিবপুরে (হাওড়া) বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিণ্ডার্সলে, মিসেস্—ইনি ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার একখানি সামাজিক চিত্র লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

কিয়ারন্যাণ্ডার—জাতিতে ইংরেজ। কিযারন্যান্ডার ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আসেন। ইনিই এখানকার প্রথম প্রটেষ্ট্যাণ্ট পাদরী। কলিকাতায় আসার অল্পদিন পরেই এঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে এবং কলকাতাতেই ইনি একজন ধনী ইউরোপীয় মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। বিবাহের পর ইনি এখানে অত্যন্ত বিলাসিতার সঙ্গে বাস করতেন। ইনি চৌঘুড়ী চাপতেন এবং আড়ম্বরের সঙ্গে ভোজ দিতেন। ইনি নিজ ব্যয়ে ওল্ড মিশন চার্চ নামক গির্জা ও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কিশোর—শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। মেদিনীপুর জেলার কাশিয়াড়ী নিবাসী।

কিশোর প্রসাদ—শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ীর উপর বিশুদ্ধ রসদীপিকা নামে টীকাকার। ইনি উজ্জ্বলনীলমণি, বৈষ্ণবতোষণী, আনন্দ বৃন্দাবন, বৃন্দাবন-শতক প্রভৃতি গ্রন্থের আলোকে এই ব্যাখ্যা করেছেন বলে অনুমতি হয় যে ইনি শ্রীরূপসনাতনাদির পরবর্তী অথচ শ্রীবিশ্বনাথ-বলদেবের পূর্ববর্তী গৌড়ীয় মহাজন।

কিশোরানন্দদেব গোস্বামী—রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইনি উৎকলীয় ভাষায় বেমূনা-বিবরণ 'শ্রুতিসার' রচনা করেন।

কিশোরী দাস—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। মতান্তরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য। পিতার নাম—রসময়। খুল্লতাতের নাম বংশীমথুরাদাস। "রসিক মঙ্গল" প্রণেতা গোপীবল্লভ দাস কিশোরী দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গোপীবল্লভ দাস দ্রঃ।

কিশোরী দাস—'শ্লোকার্থ সিন্ধুর বিন্দু প্রকাশ' নামক ক্ষুদ্র পুস্তক রচয়িতা। ১৭০২ শকে উহা রচিত হয়।

কীর্তিচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান—মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর নামক গ্রামে ১৭৩৯ সালে এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত। কীর্তিচন্দ্র ফার্সীভাষা শিক্ষা করে জঙ্গীপুরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠীতে

প্রথমে হাজিরানবিশের ও পরে দেওয়ানের পদে কাজ করেন। পরে ইনি বহু ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। বহু অর্থ সৎকার্যে দান করেন।

কীর্তিচাঁদ রায়—বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম রায়ের পৌত্র ও জগৎরাম রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা জগৎরাম ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হলে কীর্তিচাঁদ বর্ধমানের রাজা হন। ইনি বাদশাহ আলমগীরের নিকট থেকে সনন্দ পেয়েছিলেন। ইনি ছাতুয়ান, ভুরসুট, বরদা, মনোহরসাহী প্রভৃতি পরগণাসমূহ এঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ঘাটালের নিকট চন্দ্রকোণা ও বরদার রাজার সঙ্গে এঁর যুদ্ধ হয়। কীর্তিচাঁদ তাঁদের পরাজিত করে তাঁদের জমিদারী কেড়ে নেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরের নিকটবর্তী বলাগড়ের রাজার কয়েকটি জমিদারী ইনি অধিকার করে নিয়েছিলেন। জমিদারী লাভের উদ্দেশ্যে ইনি বিষ্ণুপুরের রাজার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বর্গীর আক্রমণ সম্মিলিতভাবে রোধ করার জন্য ইনি বিষ্ণুপুর রাজের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচাঁদের মৃত্যু হলে এঁর পুত্র চিত্র সেন রায় পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।

কীর্তিধর বা **ছেংথোম্পা**—ত্রিপুরার রাজা। ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর উপাধিধারী লক্ষ্মণসেনের কোন বংশধর সুবর্ণগ্রাম থেকে অভিযান করে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন। গৌড়েশ্বরের সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁ, ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী। দুর্বলচেতা কীর্তিধর ভীত হয়ে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু এঁর পত্নী মহারানী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বামীকে ভর্ৎসনা করেন এবং নিজে অগ্রসর হয়ে সৈন্যদের উৎসাহিত করেন। ফলে গৌড়সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। কীর্তিধরও অবশেষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কীর্তি নারায়ণ—চন্দ্রদ্বীপের রাজা বাংলার বারভূঞার অন্যতম রামচন্দ্র রায়ের পুত্রই কীর্তিনারায়ণ। ইনি ছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দৌহিত্র। কীর্তিনারায়ণ খ্যাতনামা যোদ্ধা ছিলেন। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও দীনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় জলদস্যুদের ইনি কঠোরহস্তে দমন করেছিলেন। এঁর রাজত্বকাল ১০৭১-১০৯৩ বঙ্গাব্দ। এঁর সময় চন্দ্রদ্বীপের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইনি সংস্কৃত ভাষার উন্নতির জন্য বহু চতুষ্পাঠী নির্মাণ করেছিলেন। ইনি নৌযুদ্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ইনি মেঘনা নদীর উপকূলে ভীষণ যুদ্ধ করে পর্তুগীজ দস্যুদের উক্ত প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। ঢাকা নগরীর মোগল শাসনকর্তা কীর্তি-নারায়ণের বীর্যবত্তায় মোহিত হয়ে এঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

কুক্কুরীপাদ—ইনি ছিলেন একজন সিদ্ধাচার্য। মীনপাদ ছিলেন এঁর শিষ্য। প্রাচীন বাংলা ভাষায় ইনি কয়েকটি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' এঁর রচিত তিনটি পদ পাওয়া যায়। ইনি অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বাংলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এঁর জন্ম হয়েছিল। ইনি প্রায় ছ'খানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কারুর কারুর মতে ইনি বজ্রযান সাধন সম্পর্কে আরও আটখানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে ইনি ডাকিনী দেশ থেকে মন্ত্রযান (হেরুক সাধন) এবং অন্যান্য তন্ত্রমত এনে এদেশে প্রচার করেছিলেন।

কুঞ্জবিহারী দাস—ইনি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর এক কবি—ফাসর্যার পালা কাব্যের রচয়িতা। ফাসর্যার পালার বিষয়বস্তু হল সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার। কবির পূর্বনিবাস ছিল তমলুকের অন্তর্গত কাশীজোড়া পরগণায়। পরে তমলুকের মামুদপুরে বসবাস করেন। কবিরা ছিলেন পাঁচ ভাই। কবি প্রথম জীবনে মুহুরিগিরি করতেন। ইনি জাতিতে ছিলেন মাহিষ্য। এঁর জীবিকা ছিল কৃষিকার্য। কবির একমাত্র পুত্রের নাম পরীক্ষিত। কবির কাব্যখানি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

কুতুবুদ্দিন খাঁ কোকলতাশ—১৬০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দিল্লীশ্বর কর্তৃক বঙ্গের নিজামতি পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর এঁকে পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করে গৌরবান্বিত করেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই কোকলতাশ শের আফগান উপাধিধারী আলী কুলীবেগের হস্তে নিহত হন।

কুবীর বা কুবীরচাঁদ গোঁসাই—রাঢ়ের বিখ্যাত বাউল ও সংগীত-রচয়িতা যাদুবিন্দুর গুরু। কুবীর কয়েকটি সুন্দর সঙ্গীত রচনা করেছেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। তাঁর একটি বিখ্যাত গান দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রিয়সঙ্গীত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে—'ডুব ডুব ডুব ডুব সাগরে আমার মন।'

কুবের পণ্ডিত—বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈতাচার্যের পিতা। ইনি ছিলেন ভরদ্বাজবংশজ, অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। কুবের পণ্ডিত নবগ্রামের নাড়িয়াল বংশজ মহানন্দ বিপ্রের কন্যা নাভাদেবীকে বিবাহ করেন। এঁর প্রথমে ছয় পুত্র ও এক কন্যা হয়। তৎপরে ইনি সস্ত্রীক শান্তিপুরে এসে গঙ্গাতীরে বাস করেন। এইখানেই সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র অদ্বৈতাচার্যের জন্ম হয়। কুবের পণ্ডিত রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী। এঁর আদিনিবাস ছিল শ্রীহট্টের লাউড় দেশ।

কুবের মিশ্র—'ভাস্বতি ব্যাখ্যা' নামক জ্যোতিষের এক করণগ্রন্থ রচয়িতা। ইহা ১৬৮৪ সালে রচিত হয়েছিল।

কুমার ঘোষ—গৌড়ের অধিবাসী। জাভার একটি প্রাচীন লেখা থেকে দেখা যায় যে জাভা-সুমাত্রার প্রবল পরাক্রান্ত শৈলেন্দ্ররাজ শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের গুরুদেব ছিলেন কুমার ঘোষ। এই 'গৌড়দ্বীপগুরু' কুমার ঘোষ ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জাভায় একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময় বঙ্গেশ্বর ছিলেন ধর্মপাল।

কুমার চন্দ্র—এঁর উপাধি ছিল 'অবধূত-আচার্য'। ইনি বিক্রমপুর বিহারে বাস করতেন। ঐ বিহারে ইনি দু'খানি তান্ত্রিক টীকা রচনা করেছিলেন এবং ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য লীলা-বজ্র এবং পুণ্যধ্বজ ঐ টীকা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। অবস্থিতি-কাল দশম শতাব্দী। এঁর রচিত টীকা দু'খানির নাম 'কৃষ্ণ যমারিতন্ত্র' ও 'বজ্রভৈরবতন্ত্র'। 'রত্নাবলী' টীকাও কুমার চন্দ্রের রচিত।

কুমার দেব—বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর পিতা। ইনি কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ। গৌড়ের রামকেলিতে কুমার দেব বসবাস করতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

কুমারদেবী—ইনি অঙ্গদেশের অধিপতি মদন দেবের কন্যার কন্যা ছিলেন। মদন দেবের কন্যা শঙ্কর-দেবীর গর্ভে কুমার দেবী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই কুমার দেবী একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কুমার পাল—রামপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমার পাল পালরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন, আনু-মানিক ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রাজত্বকালে দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কুমার পাল তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রধান অমাত্য বৈদ্যদেবকে দিয়ে বিদ্রোহীগণকে পরাজিত করেন। কামরূপের রাজা বিদ্রোহী হলে কুমার পাল বৈদ্যদেবকে দিয়ে কামরূপের রাজাকে পরাজিত করেন এবং বৈদ্য দেবকে কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কুমার পাল ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে কুমার পালের যে সকল গুণের উল্লেখ আছে তা পড়লে মনে হয় কোন দুর্ধর্ষ মহাকাব্য পাঠ করছি। তিনি সববিষয়ে সমুদ্রের সঙ্গে উপমিত হয়েছেন।

কুমারবজ্র—মহীপাল-নয়পালের সমসাময়িক। তাঁর জীবনকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী। তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুসারে কুমারবজ্র বৌদ্ধ কালচক্রযান সম্বন্ধে 'চক্রসম্বরমণ্ডল-বিধিতত্ত্বাবতার' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

কুমুদানন্দ (গন্ধর্ব)—বর্ধমান

জেলার দাঁইহাট গ্রামে শ্রীপাট। কোন কোন গ্রন্থে ইনি দশম গোপাল এবং কোন কোন গ্রন্থে উপ-গোপালরূপে বর্ণিত আছেন। আবার কুমুদানন্দ-স্থানে 'মুকুন্দানন্দ' পাঠও আছে। এঁর আদি বাসস্থান—চট্টগ্রামে। এঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরসিকরাজ বিগ্রহ বর্তমানে দাঁইহাট গ্রামের রামচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের বংশীয় গোস্বামিগণ দ্বারা সেবিত হন।

কুমুদানন্দ চক্রবর্তী—বৃন্দাবনস্থ যে সব গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' লিখতে আজ্ঞা করেছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সম্ভবত ইনি সুকণ্ঠ ছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কুমুদানন্দ ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈল। / প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হইল॥

কুল দত্ত—মহাযানের ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষ্য 'ক্রিয়াসংগ্রহ পঞ্জিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী।

কুলধর—গৌড়দরবারের একজন কর্মচারী। জাতিতে তিনি বণিক ছিলেন। সুলতান তাঁকে প্রথমে 'সত্য খাঁ' ও পরে 'শুভরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। গোবর্ধন পাঠক নামক এক ব্যক্তি দ্বারা তিনি পুরাণ ও স্মৃতি-বিষয়ক একটি সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলন করিয়েছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'পুরাণ সর্বস্ব'। এটির সংকলনকাল ১৪৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে কুলধর ছিলেন গৌড়বাসী গজপতির পৌত্র ও পুরুষোত্তমের পুত্র। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের বিবরণে বলেছেন যে, এতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্য শাসন ও পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণ হতে শ্লোক সংকলিত হয়েছে ও তাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কুল পাল—পালরাজ মহীপালের রাজত্বকালে (৯৭৫-১০২৫ খ্রীঃ অঃ) বাংলায় যে সকল সামন্ত নৃপতি রাজত্ব করতেন, ইনি তাঁদের অন্যতম। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে এঁর রাজ্য অবস্থিত ছিল। এঁর পুত্রের নাম হরি পাল। এঁরই নামানুসারে হুগলীর হরি পাল গ্রাম।

কুলশেখর—শ্রীবৈষ্ণব, রাজন্যবর্গ মুকুটমণি, ইনি ভক্তিরসোদ্দীপক 'শ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্র' রচনা করেন।

কুশল দাস—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভ্রাতা। কুবের পণ্ডিতের পঞ্চম পুত্র।

কুসুম বর, "ভৌমিক"—আসামের পরম বৈষ্ণব শঙ্করদেবের পিতা। এঁরই ঔরসে ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী আধুনিক নওগাঁ জেলার অন্তর্গত বড়দোয়া গ্রামের ভূস্বামী কায়স্থ রাজ্যধর দলই (অর্থাৎ দলপতি)

ছিলেন কুসুম বরের পিতামহ। এঁর পিতা ছিলেন সূর্য বর।

কূর্ম—মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে কূর্মক্ষেত্র বা কূর্মস্থানে গিয়ে কূর্ম নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে রাত্রি যাপন করেছিলেন। ভক্তিমান ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর অপূর্ব মূর্তি দর্শন করে বিমোহিত হন এবং বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক তাঁর সঙ্গে চলে যেতে চাইলে মহাপ্রভু তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেন এবং সেইস্থানে অবস্থান করে কৃষ্ণনাম জপ করতে আজ্ঞা দেন।

কূল্লুকভট্ট—জানা যায় যে তিনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তার পিতার নাম ছিল দিবাকর ভট্ট। কারুর কারুর মতে তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। কানের মতে কূল্লুক ১১৫০ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। 'মনুসংহিতা'র 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক টীকার রচয়িতা হিসাবে কূল্লুক সবিশেষ পরিচিত। এই গ্রন্থ তিনি কাশীতে রচনা করেছিলেন। তিনি 'স্মৃতি সাগর' নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

কৃত্তিবাস ওঝা—বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য যুগের সার্থক প্রতিভূ। এই যুগে তিনিই প্রথম রামায়ণ মহাকাব্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেন। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে রচিত তাঁর এই মহাকাব্য আজও প্রত্যেক বাঙালীর গৃহে অত্যন্ত সমাদরের সহিত পঠিত হয়। রামায়ণ ভিন্ন 'যোগাত্যার বন্দনা', 'শিবরামের যুদ্ধ', 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী' প্রভৃতি অপর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাসের জন্মস্থান নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে। তাঁর পিতামহের নাম মুরারি ওঝা, পিতার নাম বনমালী এবং মাতার নাম মানিকী (বা মেনকা)। কবিরা ছিলেন ৬য় সহোদর। কবির জন্মকাল সম্বন্ধে নানা বিরোধী মতবাদ দেখা যায়। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী রবিবারকেই কৃত্তিবাসের জন্মদিন বলে সমর্থন করেন। ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় অবধি কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন বলে কারুর কারুর অভিমত।

কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র হতে অধস্তন পঞ্চম ময়নাগড় রাজ। ময়নাগড়ের অধিপতি গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র পরলোকগমন করলে ইনি এই রাজ্য লাভ করেন। ১৭৪০ সালে কাশীযোড়ার রাজা নরনারায়ণ রায় কৃপানন্দকে যুদ্ধে পরাস্ত করে এঁর রাজ্যের কিয়দংশ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কৃপানারায়ণ রায়—তমলুকের রাজা। উক্ত রাজ্যের গঙ্গা বংশীয় রাজাদের আদি পুরুষ বিদ্যাধর রায়

হতে অধস্তন পঞ্চত্রিংশ পুরুষ। রাজা নরনারায়ণ রায় এঁর পিতা। ইনি রাজ্য মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেছিলেন। ১৭৫২ সালে রাজা কৃপানারায়ণ রায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলনারায়ণ তমলুকের রাজপদ লাভ করেন।

কৃপারাম—স্মার্ত। ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক গ্রন্থের সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত পণ্ডিত-গণের অন্যতম ছিলেন কৃপারাম। এই 'বিবাদার্ণব সেতু'বই ইংরেজী অনুবাদ Halhed's Gentoo Law নামে খ্যাত। কথিত আছে যে, বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসকালে, উক্ত হেষ্টিংস-এর বিচারের সময়ে, তাঁহার পক্ষে পার্লা মেন্টে দরখাস্ত দাখিলের ব্যাপারে কৃপারামই ছিলেন অগ্রণী।

কৃপারাম মিশ্র—জ্যোতিষী পণ্ডিত। ১৭০২ সালে 'শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী' নামক শাকুন গ্রন্থের 'পঞ্চপক্ষী প্রকাশ' নামে এক টীকা রচনা করেন। ইনি কেশবকৃত 'মুহূর্ততত্ত্ব' গ্রন্থেরও এক টীকা প্রণয়ন করেন। যন্ত্রচিন্তামণি উদাহরণ' এঁর রচিত। ইহা ভাস্কর কৃত লীলাবতীর উপরে 'লীলাবতী কৌতুক' নামে এক টীকা রচনা করেন। এছাড়া, ইনি বেঙ্কট শর্মা বিরচিত 'সর্বার্থ চিন্তামণি' নামক জাতকের এক টীকা প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণদত্ত—গোপালকৃত দ্রব্যগুণের উপর দ্রব্যগুণদীপিকা রচনা করে-ছিলেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কৃষ্ণ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্যের পরিবার, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অধিকারী। বৃন্দাবনবাসী।

কৃষ্ণপান্তী—কৃষ্ণপান্তী ১১৫৬ বঙ্গাব্দে নদীয়া জেলার রাণাঘাটে এক দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা সহস্ররাম পান্তী অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। কৃষ্ণপান্তার অপর দুই ভ্রাতার নাম শম্ভুচন্দ্র ও নিধিরাম। বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণ বিশেষ চতুর ছিলেন। কথিত আছে সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পিতৃবিয়োগ হলে কেবলমাত্র একটি আধুলী সম্বল করে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং নিজ অধ্যবসায় বলে ও লক্ষ্মীর কৃপায় বহু বিত্ত উপার্জন করে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি হয়েছিলেন। দানের জন্য কৃষ্ণপান্তী বিখ্যাত ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা শিবচন্দ্র কৃষ্ণপান্তীকে চৌধুরী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

কৃষ্ণভট্ট—'ঔষধ-প্রকার' প্রণেতা। সম্ভবতঃ ইনি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীয় কাশীবাসী কৃষ্ণভট্ট যিনি মঞ্জুষা নামক জাগদীশী টীকা এবং নির্ণয়সিন্ধুর দীপিকা নামক টীকা লিখেছিলেন।

কৃষ্ণভারতী—মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগুরু, কাশীবাসী বৈষ্ণব।

কৃষ্ণমণ্ডল—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পিতাঠাকুর।

কৃষ্ণ মিশ্র—এঁকে অনেকে বাঙালী বলেই মনে করেন। এঁর রচিত নাটক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'। ইনি সম্ভবতঃ ১১শ-১২শ শতকে অবস্থিত ছিলেন। নাটকের প্রস্তাবনায় যে গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি বাংলার পালরাজ গোপাল কিনা জানা যায় না। 'নাটকাভরণ' ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে গাং ভুবং পালয়তীতি গোপালঃ। এঁর নিবাস ছিল সম্ভবতঃ বর্ধমানে ভূরিশ্রেষ্ঠ (ভুরশুট) গ্রামে। এঁর রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকখানি 'গুলজার-ই-হাল' নামে পারসী ভাষায় সপ্তদশ শতাব্দীতে অনূদিত হয়।

কৃষ্ণকান্ত—উদ্ধবদাস পদকর্তার প্রকৃত নাম। টেঁঞা বৈদ্যপুরবাসী ও পদকল্পতরুকার বৈষ্ণবদাসের বন্ধু। ইনি সুললিত ব্রজবুলি পদ রচনায় সুপটু ছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী—কান্তবাবু দ্রং।

কৃষ্ণকান্ত ন্যায়ভূষণ—ইনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গদ্যে অদ্ভুত রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। এঁর জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ—নবদ্বীপবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক। তাঁর বংশধরদের প্রদত্ত কুলপরিচয় থেকে জানা যায় যে, তিনি 'মধুকর মিশ্রের সন্তান' মহাপ্রভুর জ্ঞাতিবংশীয় ছিলেন। তাঁর মা তারিণী দেবী জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশের কন্যা ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কোন খ্যাতি ছিল না। কিন্তু তিনি নানা শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন্—শক্তিসন্দিপনী, ন্যায় রত্নাবলী, ন্যায়রত্ন-প্রকাশিকা' তৃতীয় মণিদীপনী, পদার্থ-খণ্ডনের টীকা, সৌত্রসন্দীপনী, তর্কামৃততরঙ্গিণী, ন্যায়পত্রী। ন্যায় শাস্ত্রের এই সব গ্রন্থ ছাড়াও তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে 'দায়ভাগের টীকা' প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণকান্তের প্রথম রচনা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, রসসাগর—সঙ্গীত ও বিবিধ বিষয়ক কবিতা রচয়িতা। নবদ্বীপের অন্তর্গত বাগয়ানের নিকটবর্তী বাঁড়িবাকা নামক গ্রামে ১১৭৮ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকান্তের জন্ম হয়। ইনি রসিকতার জন্য সর্বত্র খ্যাত হন। এঁর এই সুরসিকতার জন্য নবদ্বীপরাজ গিরিশচন্দ্র রায় এঁকে "রসসাগর" উপাধি প্রদান করে নিজ আশ্রয়ে রেখেছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত মজুমদার—উদ্ধব-দাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। উদ্ধব দাস দ্রং।

কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার—ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক আহুত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশ জন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে

হিন্দুদের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পরে হ্যালহেড কর্তৃক Code of Gentoo Laws নামে ইংরাজীতে অনূদিত হয়।

কৃষ্ণকিশোর রায় বা **দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর**—উত্তর বঙ্গের অধিবাসী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। এঁর পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত, মাতার নাম জগদীশ্বরী, পত্নীর নাম রত্নমণি। এঁর আরও কয়েকজন ভাই ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইনিই সর্বকনিষ্ঠ। কবির পিতামহের নাম কৃষ্ণমঙ্গল রায় ও পিতামহী সর্বেশ্বরী। এঁদের গাঞীর নাম "কাল্যাই।" কোন এক রাজার অধীনে কবি কাজ করতেন। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর রচিত চণ্ডী কাব্যখানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ।

কৃষ্ণগতি—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দ্বিতীয় পুত্র ও শিষ্য। ইনি শ্যামসুন্দরপুরে গিয়ে তথায় শ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করতেন। ইনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান দ্বাদশ শাখার অন্যতম মহান্ত শ্রীকিশোরদেবের শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণগতি ছিলেন সুপণ্ডিত ও সুগায়ক। ইনি অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে অন্তর্ধান করেন। এঁর বংশধরগণ আজও শ্যামসুন্দরপুরে বাস করছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র—কাছাড়ের রাজা হরিচন্দ্র নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৭৩ সালে পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন। ১৭৯৯ সালে জনৈক মুঘল কতকগুলি লোক সংগ্রহ করে কাছাড় অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন গোয়াবাড়ী নামক স্থানে পালিয়ে যান। ইংরেজ সুবাদার আক্রমণকারীকে পরাস্ত করে বন্দী করলে কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় রাজধানীতে ফিরে আসেন। ১৮২৩ সালে কৃষ্ণচন্দ্র চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস—রঘুনাথ গোস্বামীর বিলাপবিবৃতিমালার অনুবাদ করেছিলেন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এঁর জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ ছিলেন শ্রীখণ্ডের রতিকান্ত ঠাকুর, গুরু লালবিহারী।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা—অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত নরপতি। মহারাজ ভবানন্দ মজুমদার ছিলেন এঁর পূর্বপুরুষ। এঁর পিতার নাম ছিল রাজা রঘুরাম। রাজা রঘুরাম দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাছাড়া, ইনি এঁর পদের উপযুক্ত নানা বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কালিদাস সিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র, কালোয়াৎ বিশ্রাম খাঁর

নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র এবং মুজাফার হুসেনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রঘুরামের মৃত্যু হ'লে অষ্টাদশ বর্ষীয় কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমনি গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তির প্রচুর সমাদর করতেন। এজন্য এঁর সভায় সদাসর্বদা প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের সমাগম হত। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় এঁর একটি 'পঞ্চরত্ন' সভা ছিল। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, গোপাল ভাঁড, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় ও রুদ্ররাম বিদ্যানিধি এই পাঁচ বিখ্যাত বিদগ্ধ ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্ন সভার সদস্য। তাছাড়া, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, শিবরাম বাচস্পতি, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি বহু বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যাতায়াত করতেন। বহু পণ্ডিতকে ইনি যথেষ্ট সাহায্য করতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'রায় গুণাকর' ও কবি রামপ্রসাদ সেনকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেছিলেন। হাস্যার্ণব গোপাল ভাঁড়ের জন্য আজও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলার আপামর জন সাধারণের নিকট সুপরিচিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে এহেন গুণী কৃষ্ণচন্দ্রের নাম বাংলার এক কলঙ্কময় যুগের সঙ্গে জড়িত আছে। বাংলার পরাধীনতার জন্য যাঁরা দায়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও ইংরেজদের সাফল্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শ ও সহায়তা কম কার্যকরী হয়নি। ক্লাইব তাঁর এই কৃত উপকারের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি ও পলাশীক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্বাদশটি কামান উপহার প্রদান করেছিলেন। মীরকাসিম বাংলার নবাব হলে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ছয় পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র ছিলেন পিতার ন্যায় গুণসম্পন্ন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়—কলকাতার বাদুড় বাগানের রায়বংশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান। এই বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব বঙ্গের অন্তর্গত বৃহৎ বাঙ্গালপাশ গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। তারপর তাঁর বংশধরেরা ক্রমে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেণীপুরে এসে বাস করেন। এই স্থানেই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম শ্রীবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লীর সম্রাট আরঙ্গজীবের সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন।

এই সময়ে ইনি রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর ইনি বর্ধমানরাজ জগৎরাম রায়ের একজন কর্মচারী হন। এই সময় ইনি মুসলমানদের অত্যাচারে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণ নগরে চলে আসেন। ইনি ধনশালী, দেবভক্ত ও পরোপকারী ছিলেন। ১৭৬৮ সালে ইনি পরলোকগমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম—ওয়ারেন হেস্টিংস্ কর্তৃক আহূত হয়ে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশ জন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পরে হ্যালহেড কর্তৃক Code of Gentoo Laws নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—ইনি জন-সাধারণের নিকট "লালাবাবু" নামে সমধিক পরিচিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এঁর পিতামহ। ১৮০৩ সালে ইনি উড়িষ্যার করদমহলসমূহের দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই সরকারী কর্মে তাঁকে বহু দিন থাকতে হয়। অবশেষে কর্ম পরিত্যাগ করে স্বীয় জমিদারীর সুব্যবস্থায় মনোযোগ দেন। একদিন জমিদারী পর্যবেক্ষণ করে এক রজকের বাড়ির পাশ দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন, এমন সময় শুনতে পেলেন রজক-কন্যা পিতাকে সম্বোধন করে বলছে—"বাবা বেলা তো গেল, বাসনায় আগুন দেও।" এই কথা শুনে কৃষ্ণচন্দ্রের বৈরাগ্য এল। তিনি ভাবলেন যে, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে তথাপি সংসারে পূর্ণ মাত্রায় আসক্তি রয়েছে। রজক-কন্যার "বাসনার আগুনে" কৃষ্ণচন্দ্রের আন্তরিক বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তিনি পূর্ণ যৌবনকালে ছত্রিশ বছর বয়সে সংসার-ত্যাগী হয়ে বৃন্দাবনে গমন করেন। তখন তাঁর পত্নী রানী কাত্যায়নী সংসারের ভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র সাধারণতঃ মথুরাতেই থাকতেন। বৃন্দাবনে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক প্রস্তরমন্দির নির্মাণ করে তাতে "কৃষ্ণচন্দ্রমা" নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই মন্দির "লালাবাবুর কুঞ্জ" নামে বিখ্যাত। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র° রানী কাত্যায়নী।

কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী—শ্রীনরোত্তম শাখা। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র। মাতার নাম—কনকলতিকা দেবী। রামকৃষ্ণ আচার্যের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর বিশেষ সখ্য ছিল। গঙ্গানারায়ণ অপুত্রক হওয়ায় বন্ধু রামকৃষ্ণের এই পুত্র কৃষ্ণচরণকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করে দীক্ষা প্রদান করেন।

কৃষ্ণচরণ দাস—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্যামানন্দপ্রকাশ'। এতে শ্যামানন্দের বৈরাগ্য ও পরবর্তী জীবনী অল্প কথায় বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার শ্যামানন্দের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। তাঁর

কাব্য রচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কৃষ্ণচরণ দাস লেখকের আসল নাম নয়। স্বপ্নে ব্রজধামে শ্যামানন্দ এঁকে অনুগ্রহ করে "কৃষ্ণচরণ" নাম দেন এবং "মঙ্গল" রচনা করে পরমগুরু নয়নানন্দকে দেখাতে বলেন। সেই সূত্রে এই গ্রন্থ রচনা।

কৃষ্ণজীবন—বাঙালী কবি। উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার বাহিরবন্দ পরগণার অন্তর্গত বজরাগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে মোদক ছিলেন। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। রানী ভবানীর দত্তক পুত্র সাধকপ্রবর মহারাজ রামকৃষ্ণের সভায় এই কাব্য রচিত হয়।

কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার—ওয়ারেন হেস্টিংস্ কর্তৃক আহূত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশ জন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পরে হ্যালহেড কর্তৃক Code of Gentoo Laws নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

কৃষ্ণজীবন বিদ্যাভূষণ—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামের মৌদ্গল্য বংশে কৃষ্ণজীবন বিদ্যাভূষণ বিদ্যমান ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ঐ অঞ্চলে ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন।

কৃষ্ণজীবন মজুমদার—মহারাজা রাজবল্লভের পিতা। জ্যেষ্ঠতাত রামচরণের কৃপায় ইনি প্রথমে নাওয়ার মহলের এহেতেমাস ও পরিশেষে খাসনবিসের পদে উন্নীত হয়ে পরে মজুমদারী পদ লাভ করেন। পরে কৃষ্ণজীবন নবাব সরকারের কার্য গ্রহণ করে স্বীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ইনি 'নবরত্ন' নামক সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন।

কৃষ্ণজীবন মুখোপাধ্যায়—উদয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কৃষ্ণজীবন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভগিনীকে বিবাহ করে মহারাজার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। সেই থেকে এঁর বংশ দেওয়ান মুখোপাধ্যায়ের বংশ বলে প্রসিদ্ধ। এঁরা নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরের অধিবাসী ছিলেন। কৃষ্ণজীবন বলবান, বিদ্বান ও সুপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে ইনি পাঁচ হাত দীর্ঘ ছিলেন।

কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র—মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপীর সুবর্ণ বণিককুলে সপ্তদশ শক শতাব্দীর প্রারম্ভে এঁর জন্ম হয়। ইনি পরম বৈষ্ণব ও মনোহর সাহী কীর্তন গায়ক ছিলেন।

কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস ছিলেন ময়মনসিংহবাসী। এঁর নিবাস ছিল ভিটাদিয়া গ্রামে। এঁর পিতার নাম ছিল ধর্মবুদ্ধ, মাতার নাম নিত্যময়ী। এঁরা ছিলেন জাতিতে বিশুদ্ধ ক্ষত্র কায়স্থ। বিখ্যাত ব্রজবল্লভ গোস্বামী

কবির শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন। কবি শ্রীমদ্বিষ্ণু পুরী কৃত সংস্কৃত "বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী"র অনুবাদ করেছিলেন। গ্রন্থে কবির স্বহস্ত লিখিত তারিখ ১০৮৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদাস—রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। এই কাব্য বস্তুতঃ ভাগবতের অনুবাদ নয়,—বিভিন্ন পুরাণ কথা থেকে আহৃত বিচিত্র কৌতূহলাবহ কাহিনীর সমষ্টি। এই কাব্য ষোড়শ শতকের শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রথমভাগে রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। কবির পিতার নাম ছিল যাদবানন্দ, মাতা পদ্মাবতী, বসতি "জাহ্নবী-পশ্চিমকূলে" অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম তীরে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে কৃষ্ণদাস মাধব আচার্যের 'সেবক ছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের সেবক। কৃষ্ণদাসের কাব্যের রচনা সবল ও তদ্ভব-শব্দবহুল। মধ্যে মধ্যে চমৎকার প্রবচন ও সূক্তির প্রয়োগ আছে।

কৃষ্ণদাস—গোপাল দাসের পুত্র এবং ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাস সুরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উভয়ে মিলে গোপাল দাস কৃত চিকিৎসামৃতের প্রতিসংস্কার করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী।

কৃষ্ণ দাস—নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্যদাস সরখেলের ভ্রাতা। এঁর বাড়ী ছিল বর্ধমানের অন্তর্গত অম্বিকানগর। নিত্যানন্দের বিবাহাধিবাসে কৃষ্ণদাস বড়গাছি থেকে শালিগ্রামে যান। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কৃষ্ণ দাস (কাশীরামের ভ্রাতা)—মহাভারতের প্রসিদ্ধ অনুবাদক কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এঁর রচিত ভাগবতের নাম "শ্রীকৃষ্ণবিলাস"। এঁর গুরু আজীবন ব্রহ্মচারী গোপাল দাস নামক জনৈক সাধু ব্যক্তি ছিলেন। পরমবৈষ্ণব ও ধার্মিক কৃষ্ণ দাসের গুরু দত্ত নাম "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর"। কৃষ্ণদাস তাঁর অনূদিত ভাগবত গ্রন্থের ভণিতায় অনেক স্থলে 'কৃষ্ণ কিঙ্কর' নাম ব্যবহার করেছেন।

কৃষ্ণদাস বা **রামকৃষ্ণ**—এঁর রচিত 'কণ্বমুনির পারণা' বা 'নারদ-সংবাদ'। এর পুঁথি পাওয়া গেছে। রচনাকাল ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, চিন্তাশীল তত্ত্ব-জ্ঞানী ও পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে যে কয়জন বৈষ্ণব গোস্বামী বৃন্দাবনে বসবাস করেছিলেন, কৃষ্ণদাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রাচীন ও মধ্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। কবির স্বরচিত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে ছিল তাঁর বাসভূমি। তাঁর পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতা সুনন্দা এবং এক মাত্র ভ্রাতার নাম ছিল শ্যামদাস। ইনি

জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। তাঁর জন্মকাল সম্ভবত ১৫১৭খ্রীষ্টাব্দ। কৃষ্ণদাস শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হন। এবং যৌবনে পদার্পণ করে বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। সম্ভবত রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের দীক্ষাগুরু। কেউ কেউ নিত্যানন্দকে তাঁর দীক্ষাগুরু বলে সিদ্ধান্ত করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণকে তিনি গুরু বলে স্বীকার করেছেন। তাঁদের অনেকের নিকট তিনি প্রণত হতেন। কবিরাজ গোস্বামী দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে গেলে তিনি তাঁদের অভিনন্দিত করেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচনা। এই মহামূল্য গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাস ন'বছর কঠোর পরিশ্রমের পর ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচনা সমাপ্ত করেছিলেন। বাংলা পদ্যে রচিত ইহা এক সুবিশাল জীবনী গ্রন্থ। চৈতন্যজীবনচরিতগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই 'চৈতন্য চরিতামৃত'ই সর্বাপেক্ষা সুলিখিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। মহাপ্রভুর শেষ বার বছরের চরিতকথা কেবলমাত্র এই গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে, এর পূর্বে রচিত অন্য কোন গ্রন্থে নেই। ষাটখানি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে তিনি নানাবিধ অমূল্য রত্ন উদ্ধার করে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। তাছাড়া, বয়োবৃদ্ধ বহু গোস্বামীর নিকট তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনকথা বিশেষ করে অন্ত্যলীলার কথা শুনেছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার উপাদান সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি অসামান্য অধ্যবসায় প্রদর্শন করেছেন। অথচ যখন তিনি গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ—'বৃদ্ধ জরাতুর'। তখন তাঁর হাত কাঁপছে, চক্ষু কর্ণ শিথিল হয়েছে—আর 'হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির'। এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। পূর্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'গোবিন্দ লীলামৃত এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা' প্রণয়ন করেছিলেন। তাছাড়া, 'ভাগবত শাস্ত্র গূঢ়রহস্য', 'স্বরূপবর্ণনা', 'বৃন্দাবন ধ্যান', প্রেমরত্নাবলী', 'বৈষ্ণবাষ্টক', 'রাগমালা' প্রভৃতি আরো কতকগুলি গ্রন্থ কৃষ্ণদাসের রচনা বলে জানা যায়। কবিরাজ গোস্বামী একজন পদকর্তাও ছিলেন।

কৃষ্ণদাস (কালা)—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নীলাচল থেকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন এই কালা কৃষ্ণদাস তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ফিরে আসার পর তাঁর অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণদাসকে গৌড়দেশে পাঠান হয়। তারপর এঁর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কৃষ্ণদাস (গায়ক)—এঁর নিবাস ছিল আকাইহাট। ইনি খুব ভাল

কীর্তন গাইতে পারতেন। খেতুরীর মহোৎসবে কীর্তন গানের জন্য জাহ্নবা দেবী, অচ্যুতানন্দ, কানু পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে এসে এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী—লাহোর-বাসী। অল্প বয়সে জন্মস্থান ত্যাগ করে বৃন্দাবনে আসেন। এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। চৈতন্যদেবের আদেশে ইনি মুলতান ও গুজরাটে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। মহাপ্রভু স্বকণ্ঠস্থিত গুঞ্জামালা এঁকে দেন বলে এঁর নাম হয় 'গুঞ্জামালী'। ইনি সিন্ধুদেশে বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করেছিলেন। ইনি আজীবন বৃন্দাবনে বাস করতেন।

কৃষ্ণদাস চট্ট—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। নদীয়া জেলার ফরিদপুর গ্রামে শ্রীপাট।

প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস। লক্ষ হরিনাম জপে, নামেই বিশ্বাস। তাঁহার সেবক যত নাহি তার অন্ত। সবে হরিনামে রত, সবে গুণবন্ত ॥

কৃষ্ণদাস ছাওয়াল—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত। ইনি চিরকাল বালকের ন্যায় ছিলেন, এজন্য এঁকে ছাওয়াল বা শিশু কৃষ্ণদাস বলে অভিহিত করা হত। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদাস ঠাকুর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণদাস দাস—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য বলে পরিচিত বৈষ্ণব কবি। ইনি চমৎকার-চন্দ্রিকা, মাধুর্য-কাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ভাগবতামৃতকণা, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু ও উজ্জ্বল নীলমণির পয়ারানুবাদ করেন। 'শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত' নামক 'স্মরণমঙ্গলের অনুবাদটিও এঁরই রচনা বলে অনেকে অনুমান করেন।

কৃষ্ণদাস দীন—ইনি বাংলার একজন প্রাচীন পদকর্তা। অনেকে এঁর রচিত পদগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদ বলে ভুল করে থাকেন।

কৃষ্ণদাস, দুঃখী বা দুঃখিনী—পদকর্তা এবং অদ্বৈত-তত্ত্ব, উপাসনা-সার-সংগ্রহ ও বৃন্দাবন পরিক্রম গ্রন্থ-রচয়িতা।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—মহাপ্রভুর নির্দেশানুযায়ী নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল থেকে গৌড়দেশে যাবার সময় যাঁরা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে "কৃষ্ণদাস পণ্ডিত" ছিলেন। ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সার সংগ্রহ করে অতি সংক্ষেপে এর কাহিনী বর্ণনা করেন। এঁকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক বলে অনুমান করা হয়। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত রামায়ণকে "পুরাণের সার" বলেছেন। কেউ কেউ এঁকে মহা-

ভারতের কবি কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস বলে মনে করেন।

কৃষ্ণদাস পঞ্জাবী—পাঞ্জাবের মূলতানবাসী। ইনি বৃন্দাবনে বাস করতেন এবং কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত হন। এঁর বহু শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে গোপাল ক্ষত্রিয়, বিষ্ণু দাস, রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গোবিন্দ অধিকারী ও মুকুন্দ গোস্বামী প্রধান। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদাস (প্রেমী)—রাজপুত ব্রাহ্মণ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বৃন্দাবনে যমুনার পরপারে বাস করতেন। ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণদাস হঠাৎ একদিন তাঁকে দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেন। ব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণকালে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন অবস্থানকালে ইনি কখনো তাঁর সঙ্গ ছাড়া হন নি। মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে জলে ঝাঁপ দিলে এই বলিষ্ঠ দেহ রাজপুত তাঁকে রক্ষা করেন। মহাপ্রভু নীলাচল চলে গেলে কৃষ্ণদাস তাঁকে ভুলতে পারেননি। বৃন্দাবনে গদাধর শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে মহাপ্রভুর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিত রচনা সময়ে ইনি তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদাস ঝাণী বা ঝাণী কৃষ্ণদাস—বৃন্দাবনবাসী। ব্রজধামে শ্রীবল্লভাচার্য-পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীশ্রীগোপাল দেবকে যবনভয়ে সেবাধিকারিগণ লুকিয়ে রাখলে শ্রীরূপ গোস্বামী যে সব বৃন্দাবনবাসী ভক্তসহ একমাস কাল দর্শন করেছিলেন, তার মধ্যে এঁর নাম পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ—সহজ বাংলা ভাষায় 'গুটিকা' রচনা করেন। এঁর সঙ্কলিত গ্রন্থ—'প্রার্থনামৃত' ও 'ভাবনাসার-সংগ্রহ'। ১৭৭০ শকে ইনি শ্রীনন্দীশ্বর চন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণদাস বিপ্র—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত। খেতুরী গ্রামে শ্রীপাট। এঁর মুখে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বাল্যে মহাপ্রভুর কাহিনী শ্রবণ করে শ্রীগৌরাঙ্গে দৃঢ় অনুরাগী হন। কেউ কেউ বলেন—ইনি ছিলেন তাঁর বিদ্যাগুরু।

কৃষ্ণদাস বেহারী বা বিহার দেশীয় কৃষ্ণদাস—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। ইনি নিত্যানন্দ-গতপ্রাণ ছিলেন। বেহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ-প্রভু-প্রাণ। শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন।

কৃষ্ণদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীনিবাস নরোত্তম

প্রভৃতির বৃন্দাবন গমনকালে কৃষ্ণদাস মদনমোহনের সেবা-অধিকারী ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদাস রাজপুত—যমুনা-পুলিনে অক্রুর স্থানের নিকট ইনি অবস্থান-করতেন। বৃন্দাবনেব প্রসিদ্ধ আমলি বৃক্ষ (তেঁতুল গাছ) তলে ইনি মহাপ্রভুব কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস (রাঢ় দেশী)—রাঢ দেশীয় বিপ্র। ইনি তৃতীয় বছরে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে গৌড থেকে নীলাচলে গিয়েছিলেন এবং রথযাত্রা উপলক্ষে নৃত্য-কীর্তনাদি করে 'বাপীতীরে' বিশ্রাম গ্রহণ করেন। নরহরি চক্রবর্তীর মতে দ্বিজবর কৃষ্ণদাস গদাধর প্রভুর তিরোধানতিথি মহোৎসব এবং খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেন। পরে জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রমা শেষ করে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একচক্রা পরিভ্রমণ করেন। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কৃষ্ণদাস (লাউড়িয়া)—লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে সমধিক পরিচিত। ইনি অদ্বৈতাচার্যের পুত্র। এঁরা প্রথমে শ্রীহট্টের লাউড়ের অধিবাসী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য নদীয়ায় শান্তি-পুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। কৃষ্ণদাস তৎপিতা অদ্বৈতাচার্যের এক-খানি জীবনী রচনা করেন। এতে অদ্বৈতাচার্যের বাল্যজীবন বর্ণিত আছে। পুথিখানির নাম 'বাল্যলীলা-সূত্র'। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ভাগবতের সার সংগ্রহ করে একখানি ভাগবত রচনা করেন। এঁর গ্রন্থখানির নাম 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' কৃষ্ণদাসের মাতার নাম সীতাদেবী এবং বিমাতা শ্রীদেবী। অদ্বৈত প্রভুর ও সীতাদেবীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণদাস সবজ্যেষ্ঠ।

কৃষ্ণদাস সরখেল—শালিগ্রাম নিবাসী সূর্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

কৃষ্ণদাস সার্বভৌম—কৃষ্ণদাস সার্বভৌম নবদ্বীপবাসী কিনা এ সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে মতদ্বৈত আছে। তাঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কৃষ্ণদাস রচিত গ্রন্থাবলী— প্রত্যক্ষদীধিতিপ্রসারিণী, অনুমানদীধিতিপ্রসারিণী, আখ্যাত-দীধিতিপ্রসারিণী, নঞ্‌বাদটিপ্পন, গুণদীধিতিটীকা, অনুমানালোক প্রসারিণী, ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী। এই কৃষ্ণদাস সার্বভৌমই ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ন্যায়গুরু ছিলেন। কৃষ্ণদাসের পিতার নাম শিবানন্দ, প্রপিতামহ নারায়ণ।

কৃষ্ণদাস সার্বভৌম ভট্টাচার্য—দুর্গাদাস চক্রবর্তীর পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ ১৮শ শতকে গুজরাটে বাস করতেন। কৃষ্ণদাস 'রামায়ণ সার' ও 'আনন্দ-তিলক' গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন।

কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত—রাজনগরের

মহারাজা রাজবল্লভের অন্যতম সভা-পণ্ডিত।

কৃষ্ণদাস স্বর্ণবেত্রধারী—উড়িষ্যাদেশবাসী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বেত্রধারী সেবক। ইনি জগন্নাথদেবের আগে আগে স্বর্ণবেত্র ধারণ করে গমন করতেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদাস হোড়—ইনি ছিলেন বড়গাছি-নিবাসী হরি হোড়ের পুত্র। এঁর পুত্র নবনী হোড়। কৃষ্ণদাস প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। পাণিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ-ক্রমে রঘুনাথ দাস যে চিঁড়া মহোৎসব দিয়েছিলেন তাতে কৃষ্ণদাস হোড়ও উপস্থিত ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদাসী—হরিদাস (যবন) ঠাকুরকে ধর্মভ্রষ্ট করার জন্য রামচন্দ্র খান যে বেশ্যাকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, সেই বেশ্যা হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণবী হন। তাঁরই নাম কৃষ্ণদাসী। অবস্থানকাল ষোড়শ শতাব্দী।

কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ—রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভের অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন।

কৃষ্ণদেব সার্বভৌম—"বেদান্তবাগীশ" নামেও পরিচিত। ১৬২৮ শকাব্দে জয়পুরে 'গলিতা' নামক পর্বত-সঙ্কুল প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যখন শ্রীচক্রবর্তীপাদ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ যাত্রা করেন, তখন ইনিই তাঁর সহচর ছিলেন। ইনিই শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত, শ্রীবিদগ্ধমাধব ও প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাকার।

কৃষ্ণদেবাচার্য—'নৃসিংহ পরিচর্যা' নামক বৈষ্ণব স্মৃতির রচয়িতা।

কৃষ্ণধর দেবশর্মা—গর্গ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ইনি ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখা অধ্যয়ন করেছিলেন। ইনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন শাসনের গ্রহীতা।

কৃষ্ণনাথ—অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'আনন্দলতিকাচম্পূ'। এই চম্পূকাব্যে মর্তদেহধারী প্রেমিক-প্রেমিকার রোমান্টিক আখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন—অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বাতদূত'। সীতা কর্তৃক বাতাসকে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণের বর্ণনা।

কৃষ্ণপাদ—ইনি মুসলমান আগমনের পূর্বের একজন বাংলা ভাষার লেখক। এঁর রচিত ২৭ খানা বই পাওয়া গিয়েছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ—বৈষ্ণব পদকর্তা। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য ছিলেন। সুবিখ্যাত 'পদামৃত সমুদ্র' সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণপ্রসাদেরই বংশধর।

কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ (লস্কর)—ইনি বহু বৈষ্ণব পদাবলী এবং একখানি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন। এঁর রচিত পদাবলীর অধিকাংশই লুপ্ত হয়েছে। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাতেণ্ডা গ্রামের উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ কুলে অনুমান ১৭৯৪ সালে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। লস্কর এঁর রাজদত্ত উপাধি। সিউড়ীর নিকটবর্তী দুর্গাপুরে বিবাহ করে কৃষ্ণপ্রসাদ বসতি স্থাপন করেন। ইনি উত্তমরূপে ফারসী ও কিছু নাগরী শিক্ষা করেন এবং কিছুকাল সিউড়ীতে করেস্‌ আমানের কাজ করেন। কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করে কৃষ্ণপ্রসাদ ধর্ম-শাস্ত্রালোচনা, সাধুসংসর্গ এবং তীর্থ পযটনেই জীবনেব অবশিষ্ট কাল অতি-বাহিত করেন। অনুমান ১৮৫৫ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর—রাধামোহন ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্যের বংশোদ্ভব যে জগদানন্দ ঠাকুর ছিলেন, তারই পিতার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্রে' 'কৃষ্ণপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত একটি পদ আছে "ভালই সময় ছিল যখন শিশু-মতি"। সম্ভবতঃ তাঁর গুরু জগদানন্দ ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণপ্রসাদই এই পদের রচয়িতা। কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

কৃষ্ণবল্লভ—ঢাকার সরকারী শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজবল্লভ অন্যায় উপায়ে বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। এবং ঘসেটি বেগমের সঙ্গে যোগ দিয়ে সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। পাছে নবাব তার এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এই ভয়ে রাজবল্লভ তাঁর পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে বহু অর্থসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কলকাতায় তখন ইংরেজদের অসীম প্রতিপত্তি। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কৃষ্ণবল্লভ তাঁর অপরিমিত অর্থ নিয়ে নিরাপদে রইলেন। নবাব গুপ্তচরদের মুখে এই সংবাদ পেয়ে ড্রেক সাহেবের নিকট কৃষ্ণবল্লভকে তাঁর অর্থসহ মুর্শিদাবাদে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখলেন। ড্রেক অস্বীকার করলে নবাব চটে গিয়ে কলকাতা আক্রমণ করেন। মীরজাফরের নবাবীকালে কৃষ্ণবল্লভ ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। মীরজাফর তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দিয়েছিলেন। পরে মীরকাশিম পিতাপুত্রকে হত্যার আদেশ দিলে কৃষ্ণবল্লভ পিতার অনুসরণে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন (১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী—বাংলার বার ভূঞার অন্যতম রাজা সীতারামের দীক্ষাগুরু। ইনি ছিলেন চৈতন্য-পরিকর দ্বিজ হরিদাসের পৌত্র এবং

গোকুলানন্দের পুত্র। এঁর জন্ম হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে। কৃষ্ণবল্লভ বাল্যাবস্থায় সম্ভবতঃ সাবিত্রী দীক্ষার সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপালাভ করেন, পরিণত বয়সে ইনি একজন পরম ভক্ত-সাধক হয়েছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার ভয়ে ইনি দেশত্যাগ করে মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্তী যশপুরে গিয়ে বাস করেন। টেঞা হতে যাবার পথে এঁর একমাত্র পুত্র কৃষ্ণবল্লভের মৃত্যু হয়। এঁর ঋষিকল্প মূর্তি দর্শন করে সীতারাম মুগ্ধ হন এবং দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর—কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীও বল্লভ ঠাকুর নামেও খ্যাত। শ্রীনিবাস আচার্যের সর্বপ্রথম শিষ্য। শ্রীপাট—বনবিষ্ণুপুরের নিকট দেউলি নামক গ্রামে।

কৃষ্ণবল্লভ শ্রীচন্দন পাল মাড়িরাজা—ইনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণগড়ের চতুঃবিংশতিতম নরপতি। ১৭৮৫ সালে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে অল্প বয়সে ইনি রাজা হন। একবার রানী অভয়া দেবী তীর্থভ্রমণে বার হয়ে বৃন্দাবন হতে "ব্রজ নারায়ণ" নামক একটি বিগ্রহ এনে স্বীয় ভবনে স্থাপন করেন। কৃষ্ণবল্লভ ১৮১৩ সালে পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণবিহারী সোম—চুঁচুড়ার জমিদার ঘনশ্যাম সোমের পুত্র। ১৭৭০ সালে এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে ওলন্দাজ সরকারে দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ইনি ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের কর্ম ত্যাগ করে ইংরেজ সরকারের অধীনে প্রথমে একটি সামান্য কাজ করে পরে মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হয়ে বহুকাল শ্রীরামপুরে উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর বংশ বহু সৎকর্মের জন্য বিখ্যাত।

কৃষ্ণমাণিক্য, মহারাজ—ত্রিপুরার রাজা। ১৭৬০ সালে ইনি রাজা হন। ইনি দাতা, দয়ালু ও স্বধর্মনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। কুমিল্লার সতের রত্ন মন্দির এঁর সময় নির্মিত হয়। এঁর সময়ের প্রধান কীর্তি চোদ্দ গ্রামের নমঃশূদ্র জাতীয় পাল্কীবাহকদিগকে একেবারে জল আচরণীয় শূদ্র জাতিতে উন্নীত করা। ১৭৮৩ সালে ইনি পরলোক গমন করেন। এঁরই রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময় মিঃ র‍্যালফ লীক ত্রিপুরার প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন—কৃষ্ণমোহন পশ্চিম বঙ্গের পূর্বস্থলী নিবাসী কায়স্থ। এঁর রচিত গ্রন্থ 'আগমচন্দ্রিকা'। এঁর রচিত আঠারটি গ্রন্থের মধ্যে 'নীতি-শতক' ও 'কমলোদয়' নামক গ্রন্থে কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য—জনৈক কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। ইনি অর্থের বিনিময়ে ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর প্রমুখ কবিওয়ালাদের গান রচনা করতেন। তাছাড়া, ইনি বৈষ্ণব সঙ্গীতও রচনা করতেন।

কৃষ্ণমোহন মজুমদার—ইনি ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে বিবিধ সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করে বিখ্যাত হন। ইনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর ব্রহ্মসভার জন্য বহু গভীর ভাবপূর্ণ ধর্ম সঙ্গীত রচনা করেন। কৃষ্ণমোহনের ইংরেজী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষ অধিকার ছিল।

কৃষ্ণরাম (কিষণরাম)—জয়পুরাধিপতি মানসিংহ কর্তৃক বঙ্গদেশ হতে আনীত শিলাদেবীর পুরোহিত, রত্নগর্ভ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা, রাজেন্দ্র চক্রবর্তীর পৌত্র এবং জয়পুরাধিপতি মহারাজ সওয়াই জয়সিংহের প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাধর চক্রবর্তীর মাতুল।

কৃষ্ণরাম তর্কসিদ্ধান্ত—ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কর্তৃক আহূত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশ জন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পরে হ্যালহেড কর্তৃক Code of Gentoo Laws নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

কৃষ্ণরাম দত্ত—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি 'রাধিকা মঙ্গল' নামে একখানি কাব্য লিখেছেন।

কৃষ্ণরাম দাস—জন্মস্থান কলকাতা উত্তর শহরতলীর বেলঘরিয়া স্টেশনের এক মাইল পূর্বে নিমতা গ্রামে। আনুমানিক ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থকুলে কৃষ্ণরাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। পুত্রের নাম নীলকণ্ঠ দাস। কৃষ্ণরামের লেখা চারটি ছোট-বড় কাব্য পাওয়া গিয়েছে,—ষষ্ঠীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল এবং শীতলামঙ্গল।

কৃষ্ণরামের প্রথম রচনা 'কালিকা-মঙ্গল'। তাঁর রচিত বিদ্যাসুন্দর এই কালিকামঙ্গলেরই অন্তর্গত। সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের এই বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ৪০।৫০ বছর পূর্বেই রচিত হয়েছিল। বৈশাখ মাসের প্রথমে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। দ্বিতীয় রচনা 'ষষ্ঠীমঙ্গল' লেখা হয় ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে ও তৃতীয় রচনা 'রায়মঙ্গল' ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই 'রায়মঙ্গলে' ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে এবং আনুসঙ্গিকভাবে কুম্ভীর দেবতা কালুরায়ের এবং পীর বড়-খাঁ গাজীর মহিমাও উল্লিখিত হয়েছে। কৃষ্ণরামের সর্বশেষ রচনা শীতলামঙ্গল। এর কাহিনী অনেকটা ষষ্ঠীমঙ্গলের মতো। এসব ছাড়া,

কৃষ্ণরাম "অশ্বমেধ পর্বের" একখানি অনুবাদও প্রণয়ন করেছিলেন।

কৃষ্ণরাম, দ্বিজ—মহাভারতের অন্তর্গত 'অশ্বমেধ পর্বের' অনুবাদক।

কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন—নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ - ইনি কামাখ্যাতে শাক্তধর্ম প্রচার করেন। অহোমরাজ রুদ্রসিংহ ছিলেন এঁর শিষ্য। কৃষ্ণরাম সেখানে বঙ্গ ও মিথিলা থেকে তান্ত্রিক সাধকদের এনে বসতি করান।

কৃষ্ণরাম বসু—হুগলী তাড়া গ্রামের দয়ারাম বসুর পুত্র। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। ইনি প্রথমে কলকাতায় লবণের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং তাতে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। পরে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলীর দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণরাম দান ও জনহিতকর কাজের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। ইনি কটক থেকে পুরী পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল পথের উভয় পার্শ্বে আমের গাছ রোপণ করেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য ইনি পুরীর বাইরে একটি বিরাট পুষ্করিণী খনন করে দেন এবং জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ তৈরী করে সেগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেন। শ্রীরামপুরে মাহেশের রথও তাঁরই কীর্তি। ইনি এঁর জন্মস্থান তাড়া থেকে মথুরাবাটী পর্যন্ত একটি পথ তৈরী করে দেন। উহা সর্বসাধারণে কৃষ্ণজাঙ্গাল নামে প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণরাম রায়—বর্ধমানের রাজা। এঁর পিতার নাম ঘনশ্যাম রায়। দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর কৃষ্ণরাম রায়কে একটি ফরমান দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চেতুয়া ও বরদার তালুকদার শোভা সিং আফগান সর্দার রহিম খাঁর সাহায্যে কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং এঁর জমিদারী আক্রমণ করে এঁকে নিহত ও এঁর পরিবারবর্গকে অবরুদ্ধ করেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম পলায়ন করে ঢাকায় উপস্থিত হন। শোভা সিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের এক সুন্দরী কন্যার সর্বনাশ করবার উপক্রম করলে সেই সাহসিকা কন্যা বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত এক ছুরিকা দ্বারা শোভা সিংহকে নিহত করেন।

কৃষ্ণরাম সিংহ—১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহানাদের কৃষ্ণরাম সিংহ 'পদ্মাবতী' নামে পারস্য ভাষায় পদ্মাবতীর উপাখ্যান রচনা করেন।

কৃষ্ণরাম সিংহ—রাজা যাদবেন্দু সিংহের পুত্র। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইনি 'মহাভারত' রচনা করেন।

কৃষ্ণরাম সেন—পিতার নাম রামেশ্বর সেন। জন্ম ১৬৮৮ সাল।

ইনি ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের দেওয়ানের কাজ করতেন। এঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে জয়নারায়ণ এঁকে বৃহৎ জমিদারী প্রদান করেন। এবং তৎকালীন নবাব এঁকে মজুমদার উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি 'মৈমনসিং' জেলার কীর্তিপাশার জমিদাররূপে খ্যাতি লাভ করেন। কৃষ্ণরাম ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিবলে বিপুল ভূসম্পত্তি, অর্থ ও যশের অধিকারী হন এবং বহু অর্থ সৎপাত্রে দান করেন। ১৭৫৯ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণহরি ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপী গ্রামে ষোড়শ-শক শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন মনোহরসাহী সঙ্গীতের বহুবিখ্যাত গায়ক।

কৃষ্ণহরি দাস—কৃষ্ণহরি দাসের রচিত 'সত্যপীর পাঁচালী' কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির পাঁচালী সুবৃহৎ রচনা। সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেখা। কৃষ্ণহরি দাস ছিলেন বাউল দরবেশ সম্প্রদায়ের সাধক। পিতার নাম রামদেব, মাতা পঞ্চমা, গুরু তাহের মামুদ সরকার। নিবাস পূর্বে ছিল বনগাঁও-শাখারিয়া, পরে মইপুর। কৃষ্ণহরি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন, আর শিষ্য হরনারায়ণ দাস তা লিখে নিতেন।

"হরনারায়ণ [দাসে] লেখে রচে কৃষ্ণহরি শিরে যার সত্যপীর কণ্ঠে বাকেশ্বরী।"

রঙ্গপুর-বর্ধনকুটীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কৃষ্ণহরি একটি কবিতা লিখেছিলেন।

কৃষ্ণাচার্য—কাহ্ন-পা দ্রঃ

কৃষ্ণানন্দ—'কৃষ্ণ-বিনতা সংবাদ' রচয়িতা।

কৃষ্ণানন্দ অবধূত—অভিরাম দাসের পাট পর্যটন-গ্রন্থে জানা যায়—ইনি দ্বীপাগ্রামে বাস করতেন। ঐ গ্রন্থমতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শাখা।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—মধ্যযুগীয় নবদ্বীপের ত্রিরত্নের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ অন্যতম "নব্যন্যায়ে রঘুনাথ শিরোমণি এবং নব্যস্মৃতিতে রঘুনন্দন যেমন যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন, কৃষ্ণানন্দও তেমনিই বঙ্গীয় তন্ত্রে যুগন্ধর পুরুষ। সাধারণতঃ তাঁকে শ্রীচৈতন্য-দেবের সমকালীন মনে করা হয়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে কৃষ্ণানন্দের জন্ম হয়েছিল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছা-কাছি সময়ে। দীনেশবাবুর মতে কৃষ্ণানন্দ জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-তপস্বী ওঝার অধস্তন সপ্তম পুরুষ এবং 'প্রাণতোষিণী' নামক তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ছিলেন কৃষ্ণানন্দের অধস্তন সপ্তম পুরুষ।

কৃষ্ণানন্দ-প্রণীত 'তন্ত্রসার' বিখ্যাত তন্ত্রনিবন্ধ। নিবন্ধটির একটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই তন্ত্রগ্রন্থের সার

লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমূর্তি নাকি কৃষ্ণানন্দই সর্বপ্রথম কল্পনা করেন এবং এই দেশে এর পূজা প্রবর্তন করেন। গ্রন্থখানি বাংলার বাইরেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে কৃষ্ণানন্দের নামাঙ্কিত একটি তন্ত্রগ্রন্থ আছে।

কৃষ্ণানন্দ দত্ত—রাজসাহী জেলার গোপালপুর নামক এক বৃহৎ পরগণার অধিপতি ছিলেন কৃষ্ণানন্দ দত্ত। ইনি ছিলেন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব। গোপালপুর মধ্যস্থ বোয়ালিযার উত্তর পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীরস্থ প্রেমতলী হতে উত্তর পূর্বাংশে অর্ধ ক্রোশ ব্যবধানে খেতুরী নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। এই কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণী দাসীব পুত্র নরোত্তম ঠাকুরের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম হয়।

কৃষ্ণানন্দ পুরী—শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ সন্ন্যাসী, মহিমাসিদ্ধি।

কৃষ্ণানন্দ বসু—কৃষ্ণানন্দ বসুর লেখা শান্তিপর্বের ও স্বর্গারোহণের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণানন্দ শিবভক্ত ছিলেন, তাই ভণিতায় বার বার বলেছেন,

"চন্দ্রচূড়-পদদ্বন্দ্ব বন্দিয়া সানন্দে,
পয়ার-প্রবন্ধে কহে বসু-কৃষ্ণানন্দে।"

কবি ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার মহানাদের অধিবাসী। পশ্চিম বঙ্গের বাইরে এঁর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। পুঁথির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি—নদীয়া জেলার চাপিলা গ্রামের অধিবাসী। ইনি একজন অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন। পুরশ্চরণ উপলক্ষে গ্রহণ গণনায় আশ্চয ক্ষমতা-প্রদর্শন করে রানী ভবানীর কাছ থেকে ইনি প্রচুর ব্রহ্মত্র ভূমি লাভ কবেছিলেন।

কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি—ইনি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭২৮—১৭৮২) সভাপণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি—কুলপঞ্জী থেকে জানা যায় কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি ছিলেন সার্বভৌমেব ভ্রাতা। ইনি 'কৃষ্ণ' নামেই অধিক পবিচিত ছিলেন। ইনিও ছিলেন নব্যন্যাযের গ্রন্থকার। এঁব পিতা প্রখ্যাত নৈয়ায়িক নরহরি বিশারদ।

কৃষ্ণানন্দ বৈদ্য—গৌরভক্ত ও প্রখ্যাত পদকর্তা জগদানন্দেব তৃতীয সহোদর।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর—সঙ্গীতশাস্ত্রে এঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ইনি রাজা রাধাকান্তদেবেব আশ্রয়ে ছিলেন এবং রাজা এঁর সঙ্গীতনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে এঁকে 'রাগসাগর' উপাধি দেন। রাধাকান্তের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে কৃষ্ণানন্দ 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' নামে এক প্রকাণ্ড সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ইহা প্রকাণ্ড চার খণ্ডে মুদ্রিত। বাংলা-খণ্ডটি (১৮৪৬ সালে) প্রকাশিত। এই সংকলনে বিবিধ রাগ-রাগিণীর সংগীত সন্নিবিষ্ট। তাছাড়া, বাংলা, হিন্দী, কর্ণাটী, মারাঠী, গুজরাটী, উড়িয়া, আরবী, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় বহু সংগীত সংগৃহীত হয়েছিল।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—একজন তান্ত্রিক বাঙালী সন্ন্যাসী। জন্মস্থান হাওড়া জেলায়। আজীবন কুমার থেকে ইনি তন্ত্রোক্ত সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইনি ভারতের বিশেষতঃ উত্তর ভারতের সমুদয় তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। ভারতের বহুতীর্থে বাঙালীরা সচরাচর আশ্রয় পেত না। এই অবস্থা দর্শনে এঁর হৃদয় বিগলিত হয়। ইনি অদম্য উৎসাহে এই অবস্থার প্রতিকার করতে কৃত-সঙ্কল্প হন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, বেলুচিস্তান, হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি বহুস্থানে ইনি ৩২টি কালীবাড়ী স্থাপন করে বাঙালী ও অন্যান্যদের থাকবার ও তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ করে দেন। এঁর বিশেষ চেষ্টায় পঞ্জাবে তান্ত্রিক মত প্রচার লাভ করে। এঁর জন্ম ১৭৯০ সালে ও মৃত্যু ১৮৮২ সালে।

কৃষ্ণানন্দাচার্য—একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। ইনি শ্রীনিবাস-কৃত শুদ্ধিদীপিকার 'প্রভা' নামে এক টীকা রচনা করেন।

কেতকাদাস বা **কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ**—ক্ষেমানন্দ দ্রঃ

কেদার খাঁ—গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক শাহের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সভাসদ। কবি কৃত্তিবাসের সংবর্ধনার সময় ইনি কৃত্তিবাসের মাথায় "চন্দনের ছড়া" ঢেলেছিলেন। অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

কেদার মিশ্র—দেবপালের (৮২০—৮৫৮ খ্রীঃ) প্রধান মন্ত্রী গর্ভপাণির প্রপৌত্র। ইনিও দেবপালের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। এঁরই বুদ্ধিবলের সাহায্যে দেবপাল উৎকল কুল ধ্বংস, হুনগর্ব খর্ব এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরনাথের দর্প চূর্ণ করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আসমুদ্র পৃথিবী উপভোগ করেছিলেন। নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে কেদার মিশ্র চতুর্বিদ্যা পযোধি পান করেছিলেন।

কেদার রায়—চাঁদ রায়, কেদার রায় দ্রঃ।

কেবলকৃষ্ণ বসু—ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে এঁর জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামনিধি বাচস্পতি মশায়ের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার জ্যোতিষ, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিশেষ কৃতবিদ্য হন। ইনি শৈব ছিলেন। সেজন্য শিব মাহাত্ম্য প্রচারার্থ স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত

কাশীখণ্ড পয়ারাদি ছন্দে রচনা করেন। এছাড়া, তাঁর রচিত একখানা সত্যনারায়ণের পাঁচালীও আছে।

কেবলরাম আচার্য—নবদ্বীপের নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। ইনি ১৬৯৯ সালে 'খেটিকা' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে স্ফুট গণনা ও পঞ্চাঙ্গসাধন বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে।

কেয়ামদ্দিন শাহ—একজন বিখ্যাত দরবেশ। চট্টগ্রামের বংশখালীর ওসখাইন গ্রামের বিখ্যাত ফকির আলী রেজা বা কানু ফকির এঁর শিষ্য ছিলেন। আলী রেজা তাঁর বহু গ্রন্থে কেয়ামদ্দিন শাহের উল্লেখ করেছেন।

কেরী, উইলিয়ম—একজন খ্যাতনামা ইংরেজ মিশনারী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক। ১৭৬১ সালের ১৭ আগষ্ট ইংলণ্ডের নরদাম্‌টনশায়ারের পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এড্‌মণ্ড কেরী নামক তন্তুবায়ের সন্তান। পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি অল্প বয়সেই প্রথমে জুতো-সেলাই ও পরে শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। পরে উভয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে পাদরিরূপে ধর্মযাজকের পদে অধিষ্ঠিত হন। পূর্ব ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য জন টমাসের সঙ্গে ১৭৯৩ সালের ১৩ জানুয়ারি যাত্রা করে ১১ নভেম্বর বাংলা দেশে কলকাতা বন্দরে পৌছান। কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। কলকাতা পৌছলে রামরাম বসু তাঁর বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃতসহ এদেশের আরও বহু ভাষা আয়ত্ত করেন।

এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই কেরী বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে ভাষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেরী এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইংরেজ শিক্ষানবিশী সিবিলিয়ানদের দেশীয়ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে (১৮০০) বাংলা বিভাগ স্থাপিত হলে উইলিয়ম কেরী মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে ১৮০১ সালে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কালই বাংলাভাষার গদ্য সাহিত্যের বোধন পর্বের কাল এবং এর সমগ্র কৃতিত্ব মহামতি উইলিয়ম কেরীর। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা সংক্রান্ত ব্যাকরণ, অভিধান ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও বাংলা ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং সংস্কৃত, মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ অভিধানও সঙ্কলন ও প্রকাশ করে-

ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যক্ষতা কালে তাঁরই প্রদত্ত প্রেরণা ও উৎসাহে রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনসী, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি তার অধীনস্থ বাংলা ভাষার পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যের পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হন। তাই বাংলা গদ্যের এই প্রথম যুগকে উইলিয়ম কেরীর যুগ বলা যায়। বাংলা গদ্যের পুরোধা হিসেবে তিনি বাঙালীর নিকট চিরকাল স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে রইবেন।

কেরীর আরও বহু কীর্তি আছে। তন্মধ্যে ভারতীয় কৃষি, ভূ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বহুবিধ গবেষণা উল্লেখযোগ্য। বাংলা হরফ সংস্কার এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফ তৈরি করে তিনি যথেষ্ট কীর্তি অর্জন করে গিয়েছেন। ১৮২৩ সালে তিনি লণ্ডন জিওলজিক্যাল সোসাইটি, রয়াল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য হন এবং ভারতবর্ষে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮৩৪ সালে কেরী পরলোক গমন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : নিউ টেষ্টামেণ্ট, বাংলা ব্যাকরণ, কথোপকথন, ওল্ড টেষ্টামেণ্ট, ইতিহাসমালা, বাংলা-ইংরাজী অভিধান। এছাড়া বাঙালীর জাতীয় গ্রন্থ কৃত্তিবাসের ও কাশীরাম দাসের মুদ্রিত রামায়ণ ও মহাভারত।

কেরী, ফেলিক্স—বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা মনীষী উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিলেতের মুলটনে ১৭৮৬ সালের ২০শে অক্টোবর ফেলিক্স কেরীর জন্ম হয়। মাতার নাম ডরোথি। ১৭৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর পিতার সঙ্গে তিনি কলকাতায় পৌছান। পিতার মুনশি রামরাম বসুর কাছেই তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। বাংলাভাষা তিনি ঠিক এদেশীয়দের মতো আয়ত্ত করেছিলেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি উইলিয়ম ওয়ার্ডের সহকারীরূপে শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ দেখার কাজ করতেন। পিতার ন্যায় তিনিও বহু ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তার বিশেষ জ্ঞান ছিল। কলকাতায় তিনি চিকিৎসাবিদ্যাও আয়ত্ত করেছিলেন।

ফেলিক্স কেরীর জীবন ছিল বিচিত্র। তিনি উদাসীন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর পারিবারিক জীবনে নানা বিপর্যয় ঘটেছিল। এজন্য মানসিক জীবনে শান্তি ছিল না। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভাষা শিক্ষায় কোন শৈথিল্য ছিল না।

বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ও অসাধারণ অনুরাগ। বাংলা

ছিল তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা। তাঁর ন্যায় বাংলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইউরোপীয়দের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না বা হননি। তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত বাংলা লেখা রেখে গিয়েছেন, আর কোনও বিদেশী লেখক সেরূপ পারেননি। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান রচনায় তিনি প্রথম পথিকৃৎ। অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার যে পরিভাষা তিনি তৈরী করেছিলেন তা বিস্ময়কর। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলা যায়। বাংলা ভাষায় পিতা উইলিয়ম কেরীর সাহিত্য কর্মে ফেলিক্স ছিলেন বিশেষ সহায়ক। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক 'দিগ্‌দর্শনে' তাঁর অনেক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

ফেলিক্সের সর্বপ্রধান কীর্তি 'বিদ্যাহারাবলী'। ইংরেজী 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'র পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ আরম্ভ করে তাকে বিদ্যাহারাবলী নাম দিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তাই অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা দিয়ে বিদ্যাহারাবলী আরম্ভ করেন। মোট ৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রথম গ্রন্থ অর্থাৎ 'ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা' সমাপ্ত হয়। বিদ্যাহারাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'স্মৃতিশাস্ত্র'। এর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। ১৮২২ সালের ১০ নভেম্বর মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে বিদ্যাহারাবলী প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্‌ প্রগ্রেসে'র অনুবাদ করেছিলেন দু খণ্ডে। শ্রীরামপুর কলেজের জন্য তিনি রসায়ন বিদ্যার একখানি বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কেশব—বাঘনাপাড়ার শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি 'কেশব-সঙ্গীত' নামে পদাবলী রচনা করেন।

কেশব কাশ্মীরী—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী। এঁর নিবাস ছিল কাশ্মীর দেশে। ইনি নবদ্বীপে আগমন করে মহাপ্রভুর সঙ্গে বিচার করতে গিয়ে পরাজিত হন এবং মহাপ্রভুর পদে আত্মসমর্পণ করেন। এঁর রচিত গ্রন্থ "লঘুকেশব"। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

কেশব খান—হুসেন শাহের কর্মচারী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যখন গৌড়দেশে শ্রীরূপসনাতনের উদ্ধারার্থ গিয়েছিলেন, তখন এঁকে রাজা হুসেন শাহ মহাপ্রভুর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ইনি মহাপ্রভুর মহিমা গোপন করে উত্তর দিয়েছিলেন।

কেশব ছত্রী—ইনি কেশব ছত্রী, কেশব বসু ও কেশব খান—এই তিন নামেই বিভিন্ন জায়গায় উল্লিখিত হয়েছেন। এঁর নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং রূপগোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীতে লেখা হয়েছে 'কেশব ছত্রী', কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও কুলজীগ্রন্থে

'কেশব বসু' এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ও জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে 'কেশব খান'। সম্ভবতঃ এঁর পদবী 'বসু' উপাধি 'খান' এবং রাজ-পদের নাম 'ছত্রী'। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে যে হোসেন শাহ্‌ যখন কেশবের কাছে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানতে চান তখন চৈতন্যদেবের যাতে অনিষ্ট না হয়, সেজন্যে তাঁর মহিমা লাঘব করে বলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এও লেখা আছে যে ইনি চৈতন্যদেবের কাছে ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে তাঁকে চলে যেতে বলেছিলেন। এই ব্যাপার থেকে বোঝা যায়, কেশব ছত্রীও চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁর লেখা একটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত হয়েছে। জনশ্রুতি অনুসারে কেশব ছত্রী হোসেন শাহের (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ) প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন।

কুলগ্রন্থের মতে কেশব ছত্রী মালাধর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। মালাধর বসুর উপাধি ছিল গুণরাজ খান। কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলে তিনি 'গুণরাজ ছত্রী' বলে উল্লিখিত হয়েছেন। সম্ভবতঃ মালাধর বসুও গৌড়েশ্বরের (বারবক শাহের) কর্মচারী ছিলেন এবং কেশব ছত্রীর মতো তাঁরও রাজপদের নাম ছিল 'ছত্রী'।

কেশব দাস—বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং শচীনন্দন ঠাকুরের পুত্র।

কেশব দীক্ষিত—বিশিষ্ট বাঙালী বেদজ্ঞ পণ্ডিত। ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের পুণ্ড্রবর্ধন নগর থেকে কেশব দক্ষিণে গমন করলে রাষ্ট্রকূটবংশীয় চতুর্থ গোবিন্দ এঁকে একখানি গ্রাম দান করেন। কেশবের পিতাও একজন বিশেষ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কেশব দেব—শ্রীহট্টের সন্নিকটে ভাটেরা নামক এক গ্রামে প্রাপ্ত এক তাম্রশাসন থেকে কেশব দেব নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। ইনি তুলাপুরুষ নামে এক যজ্ঞ করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। কেশব দেব হয়ত দেব-বংশীয় রাজা ছিলেন।

কেশবপুরী—শ্রীচৈতন্য-প্রেম-কল্পতরুর যে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি নবজন মূল ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিও একজন।

কেশব বিশারদ—নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ মৌদ্গল্য গোত্রীয় কমলাকর জ্যোতিষীর বংশধর রাজীব-লোচন বিদ্যাসাগরের পৌত্র ও প্রাণ-বল্লভের পুত্র। কেশব বিশারদ যে পঞ্জিকা গণনা করতেন, তা বহু স্থানে প্রচলিত ছিল।

কেশব বৈদ্য—প্রসিদ্ধ 'মুগ্ধবোধ' গ্রন্থ প্রণেতা বোপদেবের পিতা। ইনি 'সিদ্ধমন্ত্র' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন এঁর পুত্র বোপদেব 'সিদ্ধমন্ত্র রচনা' নামে তার এক টীকা রচনা করেন।

কেশব ভট্ট—বাংলার বার ভূঞার অন্যতম মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নকীব। মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ দূত মারফত একগাছি শৃঙ্খল ও একখানি তরবারি প্রতাপাদিত্যের দরবারে পাঠিয়ে দিলে প্রতাপের আদেশে নকীব কেশব ভট্ট দম্ভভরে তরবারি গ্রহণ করেন এবং শৃঙ্খল ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, উহা যেন দূত তাঁর রাজপুত প্রভুর চরণে পরিয়ে দেন। মোগলের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে মানসিংহ যে পতিত ও কলঙ্কিত হয়েছিলেন সে কথাও কেশব স্মরণ করিয়ে দেন।

কেশব ভারতী—চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ধর্মের দীক্ষাগুরু। ইনি নিজে ভারতী-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্বে কেশব-ভারতী তৎকালীন বিখ্যাত সন্ন্যাসীবৃন্দের সঙ্গে তীর্থাদি পর্যটন করেছিলেন। মুরারি গুপ্ত ও লোচনদাস প্রভৃতি এঁকে 'ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ' বা 'ন্যাসীবর' ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করেছেন। চন্দ্রশেখর আচার্যরত্নের গৃহে গৌরাঙ্গের অভিনয়ের ঠিক পরে অর্থাৎ গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের অল্পকাল পূর্বে কেশব ভারতী নদীয়ায় এসেছিলেন। এই সময় গৌরাঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ কার হলে ইনি নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করেন। সেই সময় কেশব গৌরাঙ্গকে ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করান। গৌরাঙ্গ এঁর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন। ভারতী শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে কণ্টকনগরীতে চলে যান। অল্পকাল পরেই এক মাঘ মাসের সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসের পূর্বদিন গৌরাঙ্গ কণ্টক নগরে উপস্থিত হলেন। তাঁর অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখে কেশবভারতী তাঁকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর দৃঢ়তা দেখে তিনি চমৎকৃত হন এবং তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষাদান করেন। ইনি গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস আশ্রমের নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। দীক্ষাদানের দিন রাত্রিতে গুরুশিষ্য উভয়ে একত্র নাচ-গান করেন। পরদিন কেশব ভারতী চৈতন্যের সঙ্গে কিছুদূর যাত্রা করে-ছিলেন। সম্ভবত কণ্টকনগরেই কেশব ভারতীর তিরোভাব ঘটে। পরবর্তীকালে গদাধর দাস 'ভারতীর স্থানে' একটি গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

কেশব মিশ্র—শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাণিয়াচঙ্গের প্রথম রাজা। ইনিই বাণিয়াচঙ্গ গ্রাম ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কেশব শিরোমণি—শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

কেশব সেন—বাংলার সেন রাজবংশের প্রখ্যাত রাজা লক্ষ্মণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কেশব সেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সেনের পরেই কেশব সেন

সেন-বংশের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাম্র শাসন থেকে জানা যায় কেশব সেন "অরিরাজ অসহ্য-শঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি 'সৌর' অর্থাৎ সূর্যের উপাসক ছিলেন। তিনি "যবনান্বয়-প্রলয়-কাল-রুদ্র" নামে তাম্র শাসনে অভিহিত হয়েছেন। তিনি যবন রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করে পূব ও দক্ষিণ বঙ্গ স্বীয় অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। আনুমানিক ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেনের মৃত্যু হয়।

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্ডির জমিদার বংশের স্থাপনকর্তা। এঁর পূর্ব নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায়। পিতার নাম শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্র আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে আসাম অভিযানে গমন করেছিলেন। ১৬২৮ সালে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কেশব-চন্দ্র দিল্লী গমন করেন এবং প্রচুর 'পেসকস' ও দু বছরের খাজনা অগ্রিম প্রদান করে কুণ্ডি পরগণার সনন্দ ও 'রায়চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই সময় বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন খুরম (পরে সম্রাট সাজাহান), ১৬২২-১৬২৬ সাল পর্যন্ত। কেশবচন্দ্র তাঁর কাছে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন।

কেশীব চাঁদ—একজন পাঁচালীকার। এঁর দ্বারা বঙ্গভাষার অনেক উপকার সাধিত হয়েছে।

কেশবনাথ রায়—বাংলার সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরু, অনন্তরাম ওঝার বংশধর, রাজা দেবী দাসের পুত্র। পরে ইনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কেশবাচার্য—শ্রীনিবাসাচার্য রচিত 'বেদান্ত কৌস্তভ'-এর টীকাকার। কেশবাচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক।

কেশবানন্দ—শ্রীশ্যামানন্দ-পন্থী শ্রীগৌরাঙ্গ দাসার অনুগত দুজন ব্যক্তি।

কেশোব নাই—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য।

কোরেশী মাগন বা মাগন-ঠাকুর—মাগন-ঠাকুর চট্টগ্রাম রোসাঙ্গ-এর রাজা "চাঁদেহু" বা "সাদউ-মংদার" অর্থাৎ যদো-মিনতারের (রাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২) কন্যার প্রধান ওমরাহ ছিলেন। মাগন রোসাঙ্গ রাজসভার মুসলমান কবি আলাওলকে গুরুবৎ মান্য করতেন এবং তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মাগনের অনুরোধে আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। এবং 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জমাল' লিখতে আরম্ভ করেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয়। ইনি ছিলেন অমুসলমান, মগ। হয়ত ইনি মুসলমান পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

কোলব্রুক, হেনরী টমাস—প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ। এঁর পিতা স্যার জর্জ কোলব্রুক সুদীর্ঘকাল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন ইংলণ্ডে কোলব্রুকের জন্ম হয়। ইনি কোন স্কুল কলেজে পড়েননি। বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করতেন। তাছাড়া, নিজে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। গ্রীক, রোমান, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে রাইটারশিপের কাজ নিয়ে কোলব্রুক ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলকাতায় এসে পৌছান। তিন বছর কলকাতায় থাকার পর ইনি কলেক্টর অফ রেভিনিউসের সহকারী হয়ে ত্রিহুতে যান। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আরও উচ্চপদে উন্নীত হয়ে ইনি ত্রিহুত থেকে পূর্ণিয়ায় যান। এখান থেকেই কোলব্রুক সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। গভীরভাবে সংস্কৃত অধ্যয়নের পর ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি এঁর গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। ইনি অনুভব করলেন যে ভারতবর্ষই আদি সভ্যতার ক্রীড়াভূমি। কিছুদিন পরে ইনি আপীল আদালতের বিচারপতি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক এই দুই পদেই নিযুক্ত হলেন। >১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুক এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। এবং যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, ততদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বেদ, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও হিন্দুদের জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেন। এঁর ভারতবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশের কলকাতা। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুক ইংলণ্ডে ফিরে যান। সেখানে গিয়েও প্রাচ্যতত্ত্ব প্রচার করেন। ইনি ইংলণ্ডেও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তুলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ ভারতপ্রেমিক কোলব্রুকের মৃত্যু হয়।

ক্যাব্রাল, ফাদার জন—একজন পর্তুগীজ জেসুইট মিশনারী। ইনি ১৬৩২ সালে বাংলায় ছিলেন। এই সময় সম্রাট সাজাহানের নির্দেশে হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশ আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। এই পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী ক্যাব্রাল এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন (১৬৩৩)।

ক্রমদীশ্বর—পণ্ডিত সমাজের অনেকের মতে ইনি বাঙালী। এঁর রচিত গ্রন্থ 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণ। উক্ত গ্রন্থের অষ্টমপাদের অন্তে গ্রন্থকারের যে আত্মপরিচয় আছে, তা থেকে জানা যায় যে তিনি পূর্বগ্রাম নিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন 'পূর্বগ্রাম' শব্দে তিনি পূর্ববঙ্গের কোন গ্রামকে বুঝাতেন। কিন্তু উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, 'পূর্বগ্রাম' দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

ক্লাইভ, রবার্ট—নিছক জাল জুয়াচুরী এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে

বাংলা তথা ভারতবর্ষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রধান কারণ ঘটিয়ে ছিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের স্রপ্‌সায়রে এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম ছিল রিচার্ড ক্লাইব। তিনি আইন ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। বালক ক্লাইব ভয়ঙ্কর দুষ্ট ও দুর্দমনীয় ছিলেন। তাঁর ভয়ে প্রতিবেশীরা সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকত। ক্লাইব অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন এবং সামান্য কারণেই ক্রুদ্ধ হতেন। ইনি কখনো গির্জার চূড়ায় উঠে বসে থাকতেন, আবার কখনো বা বদমায়েস ছেলেদের নিয়ে লুণ্ঠনকারী দল গঠন করে লুঠের ভয় দেখিয়ে দোকানদারদের কাছ থেকে বৃত্তি আদায় করতেন। অনেক স্কুলে এঁকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সর্বত্রই দুষ্ট ধুরন্ধর বলে অখ্যাতি রটলো। এঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পিতা রিচার্ড পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে যুক্তি করে রবার্টকে একটি কেরানিগিরির পদ দিয়ে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলেন। ১৮ বছর বয়সে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব মাদ্রাজে এসে উপস্থিত হন। এখানে সাত বছর ইনি কেরানিগিরি করেন। 'এই সময়ে এঁর প্রতিভার কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। বরং ঊর্ধ্বতন অফিসারদের প্রতি এঁর অসঙ্গত এবং ঔদ্ধত্য ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছিল। ইনি কলহপ্রিয়, ক্রোধী, জুয়াড়ী ও মাথাপাগলা। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের প্রতি অসঙ্গত ব্যবহারের জন্য ইনি কয়েকবার কর্মচ্যুতও হয়েছিলেন। ইনি দু' দু'বার পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলেন। যাইহোক এই অস্থিরমতি যুবক পরে কোম্পানীর অধীনে সৈনিকের কাযে নিযুক্ত হন। এবং শীঘ্রই প্রধান সেনাপতি মেজর লরেন্সের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন ও দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি যুদ্ধে ক্লাইব ইংরেজ পক্ষে জয় লাভ করেন। মাদ্রাজে এঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। তখন ইনি কলকাতায় চলে আসেন। এই সময় এঁর সঙ্গে ছিল ২৭৬ গোরা ও ১১০০ কালা সিপাহী। ক্লাইবের কলকাতা আসার তারিখ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর। এ সময় তিনি নবাবের অধিকৃত বজ্‌বজ্‌ অধিকার করলেন এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম উদ্ধার করলেন। তারপর উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, মীরজাফর প্রভৃতি দেশদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ক্লাইব ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পলাশী প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ নামমাত্র। দেশদ্রোহী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে এবং ক্লাইবের শঠতায় সিরাজের পরাজয় হয়। এইখানেই জালিয়াৎ ক্লাইব ইংরেজের হয়ে এক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাংলা ও ভারতবর্ষ থেকে ক্লাইব প্রভূত ধন সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যান এবং ইংলণ্ডে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। যদিও পরে

একে বাংলাদেশে জালিয়াতি, লুণ্ঠন, রাজ্য হরণ প্রভৃতির জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ জাতিকে ইনি যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করে দিয়ে গেলেন সেজন্য কোন শাস্তিও হয়নি। ক্লাইবের মধ্য দিয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর চরিত্রই সুপরিস্ফুট। ক্লাইব সারা জীবনই জাল করেছেন। জাল করে ইনি লর্ড উপাধি লাভ করেছিলেন। পদগৌরব, অর্থ কিছুই ক্লাইবকে সুখ দিতে পারেনি। তিনি খুরের সাহায্যে গলা কেটে আত্মহত্যা করেন (১৭৭৪ খ্রীঃ ২২ নভেম্বর)।

ক্লার্ক—১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ জাতির প্রথম প্রটেষ্ট্যান্ট মিশনারিরূপে ইনি বাংলায় আসেন।

ক্লেভারিং, জেনারেল স্যার জন—১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং য়্যাক্ট অনুসারে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন (১৭৭৪—১৭৭৭)। তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতিকূলে তার সহকর্মী ফিলিপ ফ্রান্সিসের পক্ষ অবলম্বন করতেন। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু তাঁকে ফাঁসি থেকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করেননি। ১৭৭° খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্ষিতিশূর—বঙ্গের স্বাধীন নরপতি আদিশূরের পৌত্র ও ভূশূরের পুত্র। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে ছাপান্নখানি গ্রাম এবং সপ্তশতি ব্রাহ্মণদিগকে আটাশখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেছিলেন।

ক্ষিতীশ—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূর কনোজ রাজসভা থেকে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ক্ষিতিশ ছিলেন তাদের অন্যতম। ইনি ছিলেন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ও বহু শাস্ত্রবিদ্। দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর, শংকর ও ভট্টনারায়ণ নামে ক্ষিতিশের পাঁচ পুত্র ছিলেন।

ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ—বর্ধমানের নিকটবর্ত্তী রায়াণ গ্রামবাসী দ্বিজ। ইনি শ্রীহরিভক্তি বিলাসের আধারে বঙ্গভাষায় 'বৈষ্ণবব্রতবিধান' নামে এক সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ করেন।

ক্ষেমানন্দ (ক্ষমানন্দ)—মনসামঙ্গল পাঁচালীর মধ্যে রচনা গৌরবে এবং প্রচার বাহুল্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সূচনা কাব্য। গ্রন্থোৎপত্তির প্রসঙ্গে ক্ষেমানন্দ যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে কবি-পরিচিতি পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার কাদড়া গ্রামে ক্ষেমানন্দের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন কায়স্থ। পিতার নাম শঙ্কর মণ্ডল, ভাই অভিরাম। জীবিতকাল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। নানা কারণে স্বদেশে অশান্তি দেখা দিলে তিনি দেশত্যাগ করেন। ফলে নানা পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর বাল্যশিক্ষা ঘটে। অবশেষে রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্লের নিকট কবি তিনটি গ্রাম দান-রূপে লাভ করেন। সেখানে বাস করবার সময়

এক সন্ধ্যায় খড় কাটতে গিয়ে মুচিনী বেশ-ধারিণী মনসা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কবি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। ক্ষেমানন্দ কাব্যে তাঁর ভণিতায় বার বার মনসাকে 'দেবী কেতকী' নামে অভিহিত করেছেন। যেমন,—'কিয়াপাতে জন্ম হইল কেতকাসুন্দরী'—ইত্যাদি। এই দেবী 'কেতকা'র ('কেতকা, আন্থ শক্তির নাম, পরে মনসার নাম হয়েছে) দাস হিসাবে কবি নিজ নামের সঙ্গে 'কেতকাদাস' অভিধা যুক্ত করেছিলেন। 'কেতকাদাস' ভণিতার মর্ম না বুঝে অনেকে ইহা স্বতন্ত্র কবির ভণিতা বলে মনে করতেন এবং এখনো করে থাকেন। ক্ষেমানন্দের পুস্তকখানি ২৬০০ শ্লোকে পূর্ণ এবং এর পদসংখ্যা ৬৬, তার মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের ভণিতাযুক্ত, এবং অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দ দাসের নামাঙ্কিত।

কেতকাদাসের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশ-ভঙ্গি, এবং সামাজিক রীতিনীতি ও ভৌগোলিক সংস্থানসমূহের বিশদ বর্ণনা। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথের যে বাইশটি ঘাট বা গ্রামের নাম আছে, তার মধ্যে চোদ্দটি ঘাট বা গ্রাম এখনো দামোদর ও তার শাখা বাঁকা নদীর এবং বর্তমান বেহুলা নদীর উভয় তীরে (হুগলী বর্ধমান জেলা) অবস্থিত। দেব-সভায় বেহুলার নৃত্যের যে-চিত্র ক্ষেমানন্দ অঙ্কিত করেছেন, তাতে প্রাচীনকালের নটী নৃত্যের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কেতকাদাসের, মনসামঙ্গলে পূর্ববর্তী শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও কাশীরাম যেমন যথাক্রমে শ্রীরাম পাঁচালী, চণ্ডীমঙ্গল ও ভারত পাঁচালী কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, ক্ষেমানন্দও তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। দক্ষিণ রাঢ়ে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্ষেমানন্দের পাঁচালী গানের আদর এখনো অক্ষুণ্ণ আছে।

ক্ষেমানন্দ (দ্বিতীয়)—ক্ষেমানন্দ নামের (বা নামান্তরে) ভণিতায় মনসামঙ্গলের আর এক কবির একটি ছোট মনসামঙ্গল পাঁচালী কাব্য পাওয়া গেছে। বিখ্যাত কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যের সঙ্গে এর আমূল পার্থক্য দেখা যায়। কাব্যটি নয়টি দীর্ঘ পদের সমষ্টি। একটির ছন্দ ত্রিপদী, বাকিগুলি পয়ারে লেখা। ভণিতায় সর্বত্র শুধু ক্ষেমানন্দ নাম পাওয়া যায়—কোথাও 'কেতকাদাস' অভিধা নেই। কাব্যের আদর্শ পুথি মানভূম জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থের ভাষা এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে ঐ অঞ্চলের ছাপ সুস্পষ্ট। কাব্যখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বলেই অনুমিত হয়।

ক্ষেমীশ্বর—সম্ভবত বাঙালী। ইনি ছিলেন একজন নাট্যকার। এঁর রচিত গ্রন্থ 'চণ্ডকৌশিক' নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক। পালরাজ মহীপালের

রাজ-সভায় নাটকটি রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। 'নৈষধানন্দ' এঁর আর একটি সপ্তাঙ্ক নাটক। অবস্থিতিকাল আনুমানিক দশম শতাব্দী।

খ

খঞ্জননাথ—চুরাশিজন নাথপন্থী সিদ্ধাচার্যের অন্যতম।

খড়্গ রায়—স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি ধন্যমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি।

খড়্গোদ্যম—বাংলার খড়্গ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে খড়্গোদ্যম সমতটে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

খণ্ডনাথ—চোদ্দজন নাথপন্থী গুরুর অন্যতম।

খতে খান—সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। ইনি বৈষ্ণব ঢঙে পদাবলী রচনা করেছিলেন।

খনা—খনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে বাংলা দেশের জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষকসমাজ খনার বচনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্যের বজির। তাঁর রচিত বচনগুলি কৃষি-সম্বন্ধীয়। এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলি অব্যর্থ। ভাষা ও ভাব দৃষ্টে মনে হয়, খনার বচনগুলি ৮০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। বাংলা সাহিত্যের এগুলি আদি সৃষ্টি। যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজাকারে পরিণত হয়েছে। কোন কোন মতে খনার পিতার নাম হয়ত অটনাচার্য ছিল। "আমি অটনাচার্যের বেটি।" জনশ্রুতি আছে যে ২৪ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার দেউলি গ্রামে খনার আবাস-স্থল ছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে খনা চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রমে চন্দ্রপুর নামক স্থানে বহুদিন বাস করেছিলেন। খনা বিদুষী নারী গ্রহাচার্য ও মিহিরের স্ত্রী বলে অনুমিত হয়।

খাঁ জাহান আলি—দিল্লীশ্বর ফিরোজশার পৌত্র নাবালক সম্রাট মামুদ তোগলকের এক উজীর। ইনি ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে খাঁ জাহান পালিত পুত্র ইব্রাহিমের উপর জৌনপুরের শাসন-ভার দিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পুণ্য কাযে শেষ জীবন অতিবাহিত করার জন্য বঙ্গদেশে আসেন (১৪০০ খ্রী)। এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাও এঁর ইচ্ছা ছিল। সঙ্গে ছিল বহু শিষ্য, সৈন্যসামন্ত ও ধনদৌলত। খাঁ জাহান ভৈরবকূলে মুড়লীতে একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। উহার নাম হয় মুড়লী-কস্‌বা। নানা বুজরুকী বা অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে ইনি বহু লোককে

মোহিত ও বশীভূত করেন। অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। ভৈরবকূল ধরে খাঁ জাহান পূর্বদিকে অগ্রসর হন। এবং যশোহর-খুলনার বিস্তৃত অঞ্চল এঁর অধিকারভুক্ত হয়। ইনি খলিফাতাবাদ বা বাগের হাটে রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি দেশ-মধ্যে অসংখ্য জলাশয় খনন করে জল-কষ্ট দূর করেন, সুপ্রশস্ত এবং ছায়া-বহুল রাস্তা নির্মাণ করে যাতায়াতের পথ প্রশস্ত করেন, নানা উপায় অবলম্বন করে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করেন। রাজস্ব আদায় করে ইনি কতক দান করতেন, কতক মসজিদাদি নির্মাণে ব্যয় করতেন। বাকী অর্থ মৃত্তিকাতলে গচ্ছিত রাখতেন প্রজাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য। পরে এই অর্থ লাভ করে বহু লোক উন্নতি করে। ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর সাধুপ্রকৃতির ঈশ্বর ভক্ত এই খাঁ জাহান আলি পরলোক গমন করেন। এঁর সমাধির উপর একটি অতি চমৎকার স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

খাঞ্জা খাঁ, নবাব—হুগলীর শেষ ফৌজদার। ইনি হুগলীর মোগল দুর্গের একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে বসবাস করতেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস হুগলীর ফৌজদারের পদ তুলে দিলে খাঞ্জা খাঁর আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়। তৎকালে বঙ্গদেশে এঁর ন্যায় বিলাসী ব্যক্তি আর কেহই ছিলেন না। আজও বাংলাদেশে কোনও ব্যক্তি অত্যধিক বাবুয়ানা করলে তাকে "নবাব খাঞ্জা খাঁ" বলে অভিহিত করা হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি ইনি দেহত্যাগ করেন। ইংরেজরা এঁর স্ত্রীকে একশত টাকা করে বৃত্তি দিতেন। খাঞ্জা খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল দুর্গের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত ধূলিসাৎ ও লুপ্ত করা হয় এবং দুর্গের ভগ্নস্তূপ পরে দু'হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। পূর্বে গোন্দলপাড়া তালুক খাঞ্জা খাঁর জমিদারীভুক্ত ছিল।

খান-ই আজম—দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহ কর্তৃক ইনি সুবে বাঙলার (গৌড়-বঙ্গের) সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। ঐ সময় ইনি মাসুম কাবুলীকে খুঁজে পরাজিত করেছিলেন।

খান জমান বাহাদুর—এঁর পূর্ব নাম খানজাদ খাঁ এবং প্রকৃত নাম মির্জা আমান উল্লা। ইনি মহাবত খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬২৫ সালে ইনি বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগেই ইনি পাঁচ হাজারী সেনাপতির পদ ও খান জমান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি 'মজমোয়া' নামক একখানা পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

খানাজাদ খাঁ—বাংলার স্বল্প-কাল স্থায়ী জায়গীরদার মহাবৎ খাঁর

পুত্র। পিতার ন্যায় ইনিও অল্প কিছুকাল বাংলার শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৬২৬ খ্রীঃ)।

খিজির খাঁ—দিল্লী অধিকার করে শের শাহ খিজির খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন (১৫৩৯ খ্রীঃ)। ইনি ভূতপূর্ব বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শাহের কন্যাকে বিবাহ করে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন এবং খুব রাজকীয়ভাবে চলাফেরা করেন। ইনি মহম্মদ শাহের আত্মীয় ও ওমরাহগণকে বশীভূত করতে থাকেন। এঁর হাবভাব বিশেষ সন্দেহজনক হওয়ায় শের শাহ স্বয়ং বাংলাদেশে এসে এঁকে বাংলার মসনদ থেকে অপসারিত করেন। এবং এঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

খিদ্ধর নাথ—নাথপন্থী সম্প্রদায়ের একজন গুরু। সাম্যবাদ প্রচার করতেন এবং 'শব্দ বিচার' উপদেশ দিতেন।

খুলেদি খাঁ—বাংলার সুবেদার মজফর খাঁ তির্বতীর সময়ে দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ নতুন রাজস্ব প্রথা প্রবর্তিত করেন। এতে জলেশ্বরের সামন্ত খুলেদি খাঁ ও ঘোড়া ঘাটের বাবা খাঁ বিদ্রোহী হন। সম্রাট বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।

খুসল চাঁদ জগৎ শেঠ—ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ধনকুবের মহাতাপচাঁদ জগৎ শেঠের পুত্র। সম্রাট সাহ আলমের নিকট থেকে ক্লাইব বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পর খুসলচাঁদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "সফর" তহবিলদার নিযুক্ত হন। ১৭৬৬-১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খুসলচাঁদ রাজ্যের একজন পরামর্শদাতা বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। খুসলচাঁদ বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে পরেশনাথ পাহাড়ের জৈন মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এঁর বহু সৎ কাজের কথা মুর্শিদাবাদে সুবিদিত। আয় হ্রাস এবং অত্যধিক ব্যয়ের ফলে এঁর সময়ই জগৎ শেঠ পরিবারদের অবস্থার অবনতি হয়।

খেলারাম চক্রবর্তী—ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। অনেকের মতে খেলারাম চক্রবর্তীর "গৌড় কাব্য" সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্মমঙ্গল। অবশ্যি ময়ূর ভট্টের পরেই খেলারামের স্থান। হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি হুগলি জেলায় আরামবাগ অঞ্চলে বদনগঞ্জের নিকট শ্যামবাজার গ্রামের এক জেলে পণ্ডিতের বাড়ীতে রক্ষিত পুথি থেকে খেলারামের রচনা-কাল জ্ঞাপক একটি পদ উদ্ধার করেছেন:

"ভুবনশকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন।"

অর্থাৎ খেলারামের গ্রন্থ রচনাকাল ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক মাস। শ্যামবাজারের অদূরবর্তী ভাবুরশে পশ্চিমপাড়া গ্রামে একখণ্ড পতিত ভূমি খেলারামের বাস্তু বলে এখনও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

গ

গর্গ—পালরাজ ধর্মপালের (৭৭০-৮২০ খ্রীঃ) মন্ত্রী। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ধর্মপালের বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্রাহ্মণমন্ত্রী গর্গ অন্যতম বিশেষ সহায়ক ছিলেন। তাঁর বংশধরগণ নারায়ণ পালের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় একশত বছর যাবৎ পালরাজাদের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহরা গ্রামে। ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা প্রচারকাযের সুবিধার জন্য শ্রীরামপুরে বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটররূপে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করে ছাপার কাজ শেখেন। তারপর কলকাতায় এসে পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেন। তিনি প্রথমে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপতে সুরু করেন। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য। ইহাই ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা গ্রন্থ। স্বরচিত দু'তিনখানি বই ছাড়া তিনি 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'লক্ষ্মীচরিত্র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'চাণক্য শ্লোক' এবং রামমোহন রায়ের কোন কোন বই প্রকাশ করেছিলেন। বই ছাপার জন্য তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তার নাম দেন 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস'। মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাকিশোর 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উহাই বাঙালী-প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোরের রচিত গ্রন্থ: A Grammer in English and Bengalee, দায়ভাগ, চিকিৎসার্ণব, দ্রব্যগুণ। তৎকর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ: অন্নদামঙ্গল, ভগবদ্গীতা।

এ পর্যন্ত গঙ্গাকিশোর সম্পর্কে যা জানা ছিল, তার পরে তাঁর সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দু-একজন সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মতে গঙ্গা কিশোরের আদি জন্মভূমি বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর নিকট বহরা গ্রামে। আর যাই হোক, গঙ্গাকিশোর একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। এ পর্যন্ত কেউই একখণ্ড 'বাঙ্গাল গেজেটি' বা অন্য কিছু সংগ্রহ করে কোন পাথুরে প্রমাণ উপস্থাপিত করেননি।

গঙ্গাগোবিন্দ পাল—(মহারাজা)—প্রাচীন বঙ্গের গঙ্গানগরের রাজা। কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় অশোক এঁকে বন্দী করে রাজপুতানার গঙ্গানগরে নির্বাসিত করেন। পরে ইনি আফগানিস্তানের উত্তান্তপুর সীমান্ত রক্ষী সামন্তরূপে প্রেরিত হন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—কান্দী রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। ইনি তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবান্

পুরুষ ছিলেন। ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাবপত্রে গঙ্গাগোবিন্দের যথেষ্ট অধিকার ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হয়ে গঙ্গা-গোবিন্দকে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কার্যদক্ষতা, প্রখর বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে ইনি হেস্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। ফলে গঙ্গাগোবিন্দ রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন। এবং তৎকালে সমগ্র জমিদারমণ্ডলীরও সর্বময় অধিকর্তা হয়েছিলেন। এঁর হাতেই জমিদারদের স্বত্ব-স্বামিত্ব নিভর করত। এজন্য ভূ-স্বামীরা গঙ্গাগোবিন্দকে ভক্তি না করে তাঁকেই বেশী ভয় করত। হেস্টিংসের বিশেষ অনুগ্রহে গঙ্গাগোবিন্দ বাংলা-দেশের বহু স্থানে বহু সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। জানা যায় গঙ্গাগোবিন্দ কর্মজীবনে অনেকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি দ্বারা নিজের বা সরকারের আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। এত লোককে দুঃখ দেওয়ার জন্য ইনি মনে নানা অশান্তি ভোগ করতেন। নিদ্রিত অবস্থায় নানা বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখতেন। শেষ জীবনে ইনি দান কার্য করেন। ইনি এঁর মাতৃশ্রাদ্ধে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। ইনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বৃত্তিদান করেছেন। ইনি মন্দির নির্মাণ করেন ও সদাব্রত খুলেন। এঁর পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশনে ইনি অগাধ টাকা দান করেছিলেন। ইনি প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা দানাদি কার্যে ব্যয় করে যান। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

গঙ্গাদাস বা গঙ্গাদাস বৈদ্য—রচিত গ্রন্থ 'ছন্দোমঞ্জরী'। এই গ্রন্থে মুরারির 'অনর্ঘরাঘব' হতে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের আত্মপরিচয়ে গঙ্গাদাস বলেছেন যে তাঁর পিতা ছিলেন বৈদ্য গোপালদাস এবং মাতা সন্তোষা। গঙ্গাদাসের অন্যান্য গ্রন্থ: 'অচ্যুত চরিত', 'কংসারি শতক,' 'দিনেশ শতক'। 'ছন্দোমঞ্জরী' বিবিধ ছন্দগ্রন্থের সারসংকলন। গঙ্গাদাস সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর লেখক।

গঙ্গাদাস দত্ত—নরোত্তম ঠাকুরের একজন ভক্ত-শিষ্য।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষাগুরু। 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায় যে ইনি একবার তৎ-কালীন যবন রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়ে সপরিবারে গঙ্গাপার হয়ে, অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। 'গৌরাঙ্গ-বিজয়' মতে গৌরাঙ্গের এই গুরুর নাম ছিল গঙ্গাদাস চক্রবর্তী। এঁর পত্নীর নাম ছিল সুলোচনা। গৌরাঙ্গ এঁর নিকট ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন। গৌরাঙ্গ যখন কিশোর, তখন একমাত্র গঙ্গাদাস ছাড়া নবদ্বীপে আর কেউ-ই তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় পেরে উঠতেন না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গয়া থেকে ফিরে এসে গঙ্গাদাসের গৃহে অধ্যাপনা আরম্ভ করেছিলেন। গৌরাঙ্গের শাস্ত্র ব্যাখ্যায়

গঙ্গাদাস বিস্মিত হয়ে যেতেন। মধ্যে মধ্যে গৌরাঙ্গ গঙ্গাদাসের গৃহে নানা-ভাবে লীলা করতেন। আবার গঙ্গাদাসও কখনো কখনো শ্রীবাসাদির গৃহে গিয়ে গৌরাঙ্গ লীলায় যোগ দিতেন। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে যে কৃষ্ণলীলা অভিনয় হয়, তাতে গৌরাঙ্গাদির সঙ্গে গঙ্গাদাসও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য সকল ঘটনাতেই গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে ইনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। চৈতন্য প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের পর গঙ্গাদাস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নীলাচলে যান এবং শ্রীবাসাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগন্নাথের সামনে নৃত্য ও কীর্তন করেন। তারপর ইনি নবদ্বীপে ফিরে এসে বাস করতে থাকেন। এবং শচীমাতা প্রভৃতির দেখাশুনা করতেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন কানাইর নাটশালা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে অবস্থান করেন, তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতই শচী-মাতাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুরে গমন করেন। ইনি মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়ে চৈতন্যদেবের দর্শন লাভ করতেন। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

গঙ্গাদাস রায়—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গঙ্গাদাস সুরি—গোপালদাসের পুত্র, কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা। রচিত গ্রন্থ ছন্দোমঞ্জরীর রচয়িতা হিসাবেও কেউ কেউ এঁর নাম করেন। ইনি ভ্রাতার সঙ্গে একযোগে চিকিৎসামৃতের প্রতি-সংস্কার করেন। ইনি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ছন্দোম-খাস্ত প্রণেতা পুরুষোত্তম ভট্ট ছিলেন এঁর গুরু।

গঙ্গাদাস সেন— মহাভারত কাব্যের রচয়িতা ষষ্ঠীবর সেনের পুত্র। [ষষ্ঠিবর সেন দ্র°] এঁর রচিত আদি ও অশ্বমেধ পর্ব পাওয়া গেছে। গঙ্গাদাস স্বরচিত অশ্বমেধ পর্বের ভণিতায় প্রায় সর্বত্রই পিতামহ এবং পিতার নামো-ল্লেখ করেছেন:

"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥

গঙ্গাদেবী—নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা। অভিরাম গোস্বামী এঁকে দ্বাদশ বার প্রণাম করলেও ইনি অক্ষত শরীরে ছিলেন দেখে অভিরাম এঁকে মহাশক্তিমতী জেনে এবং এঁর ঐশ্বর্য দেখে ২০ শ্লোকে 'শ্রীগঙ্গাস্তোত্র' প্রণয়ন করেন।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য—ইনি 'সঙ্গীত গৌরীশ্বর' রচনা করে ছিলেন গীতগোবিন্দের অনুকরণে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। গানগুলির ভাষা গীতগোবিন্দের পদের মতো। বর্ণনা অংশ পয়ারে লেখা। ইহাও দ্বাদশ সর্গে গ্রথিত। প্রথমেই আছে,

"জয়দেব-চরণ বন্দিব বারবার,
সংস্কৃত সঙ্গীত পথ যা হতে প্রচার।"

গঙ্গাধর দাস—গঙ্গাধর দাসের

'কিরীটীমঙ্গল' বৃহত্তর পাঁচালী কাব্য। কাব্যের রচনাকাল ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। গঙ্গাধর দাসের পিতা পঞ্চানন রায়। নিবাস বিনাইপুর। উত্তর রাঢ়ের প্রান্তে, আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলায় কিরীট কোনার কিরীটেশ্বরী দেবী সুপ্রসিদ্ধ দেবতা। কবি তাঁর কাব্যে এই কিরীটেশ্বরী দেবীরই মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। গঙ্গাধর বৈষ্ণব ছিলেন।

গঙ্গাধর পণ্ডিত—ইনি গোবিন্দাচার্য প্রণীত রস-সাবের উপব 'রসসার সংগ্রহ' নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। এঁর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বা চৈতন্যদাস—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাস আচার্যের পিতা। ভাগীরথী তীরবর্তী চাখন্দী গ্রামে ইনি বাস করতেন। এঁর পত্নীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন কণ্টকনগরে কেশব-ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন গঙ্গাধর দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ দেখে তিনি বিচলিত হন এবং তাঁর চৈতন্য নাম এঁকে আরও অস্থির করে তুলতো। ইনি তখন 'চৈতন্য' নাম উচ্চারণ করতে করতে উন্মত্ত অবস্থায় গৃহে ফেরেন। এঁর অবস্থা দেখে প্রতিবেশীরা কেউ কেউ এঁর নূতন নামকরণ করেন, 'চৈতন্যদাস'। সেই থেকে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য 'চৈতন্য' নামেই সমধিক পরিচিত। ইনি বহুদিন অপুত্রক ছিলেন। শেষে পুত্রকামনায় ইনি পত্নীসহ নীলাচল গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করেন। মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করে গ্রামে ফিরে এসে গঙ্গাধর সাধন-ভজন ও সংকীর্তনে মত্ত হন। কিছুদিন পরেই পুত্ররত্ন শ্রীনিবাস জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

গঙ্গাধর সেনরায়, কবিরাজ—ভারত বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-ব্রতী। পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ রায়। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কেবল খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন না, সংস্কৃতের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ষড় দর্শন, ব্যাকরণ, নাটক ও কাব্য, উপনিষদাদির ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারে প্রায় আশিখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'জল্পকল্পতরু' নামক চরক সংহিতার এক টীকাই এঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মুর্শিদাবাদ-বালুচরের অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ গাম্ভিলা (বর্তমান গামলা) গ্রামে ছিল এঁর নিবাস। ইনি পরম পণ্ডিত ও সমাজে বিশেষ গণ্য-মান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং বহু ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করতেন। গঙ্গা-নারায়ণ ঠাকুর নরোত্তমের নিকট দীক্ষালাভ করে তাঁর কাছে ভক্তি-

গ্রন্থাদি পাঠ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। ইনি সে-সময়ের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক ছিলেন। গঙ্গা-নারায়ণের স্ত্রী নারায়ণী দেবী ও বিধবা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এঁর নিকট দীক্ষা-লাভ করেছিলেন। এঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে দীক্ষা দান করে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ঠাকুর নরোত্তমের অন্তর্ধানের পর গঙ্গানারায়ণ কৃষ্ণচরণের উপর বিষয়-সম্পত্তির ভারার্পণ করে বিধবা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে ভজন-সাধন-গুণে ইনি বৃন্দাবনস্থ ভক্তদিগের বিশেষ প্রিয়-পাত্র হয়েছিলেন। গঙ্গানারায়ণ ছিলেন সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের শিক্ষাগুরু। এঁর অবস্থিতি-কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

গঙ্গানারায়ণ (রাম) চৌধুরী—রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখার চক্রপাণি চৌধুরীর পৌত্র।

গঙ্গানারায়ণ নস্কর—গঙ্গারাম নস্কর নামেও পরিচিত। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। পাঁচালী গান রচনায় ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে ইনি "পক্ষীর দলকে" পরাজিত করেছিলেন।

গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়—"ভবানী-মঙ্গল" কাব্য রচয়িতা। কাব্যটি "অষ্টমঙ্গলা" অর্থাৎ পাঁচালী কাব্য। এঁর নিবাস ছিল বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার উদয়পুর গ্রামে। কবি শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। কবির পূর্ব-পুরুষগণ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী মেটেরী গ্রামে বাস করতেন। গঙ্গারামের পিতা তিতুরাম মুখোপাধ্যায় বীরভূমে এসে হাতিকান্দা গ্রামে বসবাস করেন। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি 'দ্বিজ' গঙ্গানারায়ণ নামেও পরিচিত।

গঙ্গানারায়ণ সোম—চুঁচুড়ার বিখ্যাত সোম পরিবারজাত। এঁর পিতার নাম নৃসিংহ এবং পিতামহ বলভদ্র। গঙ্গানারায়ণ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। ইনি স্বীয় কার্যদক্ষতাগুণে ঐ কোম্পানীর নিকট থেকে "সরকার" উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮৬ বছর বয়সে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়।

গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক—কলকাতার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। এঁর পিতার নাম শ্যামসুন্দর মল্লিক। গঙ্গাবিষ্ণু ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের পিতামহ। ইনি অত্যন্ত পবিত্র-চরিত্র ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। আত্মীয় অনাত্মীয় বহু ব্যক্তিকে ইনি প্রতিপালন করতেন। বহু গরীবদুঃখী প্রত্যহ এঁর বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করত। নানাভাবে ইনি

পরের উপকার করতেন। কলকাতা তখন অত্যন্ত ব্যাধিসঙ্কুল ছিল। চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। গঙ্গাবিষ্ণুও বেতন দিয়া একজন বিখ্যাত কবিরাজকে ঔষধ প্রস্তুত কার্যে নিয়োজিত করেন এবং দুঃস্থ রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঐ ঔষধ বিতরণ করতেন। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রীঃ) বাংলায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় গঙ্গাবিষ্ণু সেই সময় কলকাতার বিভিন্ন স্থানে আটটি অন্নসত্র খুলে বহু লোককে অন্ন বিতরণ করেছিলেন। বৃন্দাবনেও ইনি একটি অন্নসত্র স্থাপন করেছিলেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি এঁর মৃত্যু হয়।

গঙ্গামণি দেবী—বিক্রমপুরে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক ও লেখক লালা রামপ্রসাদের কন্যা ও লালা জয়নারায়ণ ও লালা রামগতির ভগিনী। বিবাহকালে গাইবার উপযুক্ত বহু মঙ্গল গান রচনা করেছিলেন। এক সময় এঁর সঙ্গীতগুলি পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বিশেষ প্রচলিত ছিল। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। ইনি এঁর সুন্দর সুন্দর হস্তাক্ষরে "হরিলীলা" গ্রন্থ নকল করেছিলেন।

গঙ্গারাম দত্ত—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলিবর্দির রাজত্বকালে বাংলাদেশে যে মারাঠা-দস্যু বা বর্গীর হাঙ্গামা হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে গঙ্গারাম দত্ত একখানি কাব্য রচনা করেন। তার নাম 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'। সম্ভবতঃ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়েছিল। এঁর কাব্যে একটিমাত্র কাণ্ড বা অধ্যায় রচিত হয়েছিল, তার নাম 'ভাস্কর-পরাভব।' কেউ কেউ বলেন গঙ্গারাম রাঢের অধিবাসী। অন্যমতে ইনি যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের অধিবাসী। কোন বিশেষজ্ঞের মতে গঙ্গারাম ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধারীশ্বর গ্রামের অধিবাসী। গঙ্গারামের বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করতেন। তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে গঙ্গাবাম ইশা খাঁর বংশধর জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের অধীনস্থ একজন নাযেব ছিলেন। সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে বর্গীর আক্রমণের সময় ইনি এঁর প্রভুর দেয় বাজস্ব পরিশোধ করার জন্য মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন। এবং সেখানে বর্গীহাঙ্গামার সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে গঙ্গারাম এই আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেন।

গঙ্গাহরি দাস—নরোত্তম ঠাকুরেব শিষ্য।

গঙ্গেশ শিরোমণি—কেউ কেউ এঁকে গঙ্গেশ্বর শিরোমণি নামেও অভিহিত করে থাকেন। এঁর কর্মজীবন মিথিলায় অতিবাহিত হয়। সেখানে এঁর একটি টোল ছিল।

গঙ্গেশ শিরোমণি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কথিত আছে ইনি প্রথম যৌবনে আকাট

মূর্খ ছিলেন, কিন্তু পরে অলৌকিক উপায়ে দৈবকৃপা লাভ করে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এঁর রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণি' অসামান্য গ্রন্থ ন্যায়শাস্ত্রে চিন্তাশীলতার একটা নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে। এরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সে যুগে আর রচিত হয়নি। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইনি জীবিত ছিলেন।

গজভীম—স্বাধীন ত্রিপুরার প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বিজয় মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে হস্তী খেদার বহু সংখ্যক হস্তী এক সঙ্গে ধরেছিলেন বলে এই উপাধিপ্রাপ্ত হন। একবার মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে ইনি তাদের পরাজিত করেছিলেন।

গজেন্দ্র মথুরা দাস—রসিকানন্দের শিষ্য।

গঞ্জালিস—ইনি ছিলেন বাংলাদেশে অমানুষিক উৎপীড়নকারী পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান। পর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন্ নগরের অনতিদূরে সেন্ট এণ্টনি ডেল তোজাল নামক একটি অপরিচিত গ্রামে গঞ্জালেসের জন্ম হয়। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এদেশে আসেন। ইনি অতি উচ্চাভিলাষী, পরিশ্রমশীল লোক ছিলেন। ইনি এদেশে এসে প্রথমে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরে অর্থের লালসায় পূর্ব বাংলার নিভৃত অঞ্চল সন্দ্বীপে লবণের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই লবণের ব্যবসায় কিছু অর্থ সঞ্চয় হলে ইনি তা দিয়ে "পেলিয়া" নামক একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ ক্রয় করেন। এর দ্বারা সন্দ্বীপ থেকে লবণ নিয়ে চট্টগ্রাম ও ডায়েঙ্গা বন্দরে ব্যবসায় করতে থাকেন। কিছুদিন পরে গঞ্জালিস পর্তুগীজ জলদস্যুদের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হয়ে সন্দ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করলেন (১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে) এবং সন্দ্বীপের শাসনকর্তা হয়ে গঞ্জালিস পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের কিছু কিছু অংশও অধিকার করেছিলেন। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। পরে সন্দ্বীপের একজন স্বাধীন নৃপতি হয়ে বসেন। এঁর সময় সন্দ্বীপ পর্তুগীজ ও দেশীয় ফিরিঙ্গী দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। এঁর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ইনি ১০০০ পর্তুগীজ, ২০০০ সশস্ত্র বাঙালী, ২০০ অশ্বারোহী ও ৮০ খানি কামান-সজ্জিত জাহাজে পরিবৃত থাকতেন। এঁর শাসনকালে ইনি কি মোগল, কি আরাকানরাজ কাউকে কখনো কোন কর প্রদান করেন নি। এঁর অধীনস্থ প্রজাগণ ও কর্মচারীবর্গ অত্যন্ত সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন পরে গঞ্জালিসের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্দ্বীপে পর্তুগীজ ক্ষমতাও চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মগরাজ পর্তুগীজদের পরাজিত করে সন্দ্বীপ অধিকার করলে

গঞ্জালিস পলায়ন করেন। আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

গণপতি ঠাকুর—মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির পিতা। এঁর রচিত গ্রন্থ 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী'। এঁর পিতার নাম জয়দত্ত। গণপতি অসাধারণ পণ্ডিত ও ধার্মিক ছিলেন বলে যোগীশ্বর উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

গণপতি ব্যাস—ইনি ছিলেন কার্তিক কুণ্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁব পিতার নাম কবিসেন। ইনি 'বৈদ্যক-শাস্ত্রে 'যোগসার সমুচ্চয়' এবং বৈদ্যসার সমুচ্চয়' বা বৈদ্যশাস্ত্রীয় সারংসংগ্রহ প্রণয়ণ করেন। ইনি একখানি ঐতি-হাসিক কাব্যও রচনা করেন, নাম—'ধারাধ্বংস'। এঁর অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী।

গণপতি ভট্ট—জন্মস্থান মেদিনী-পুর জেলার বগড়ি কৃষ্ণগড়। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। জ্যোতিষে ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকা (শূলপাণির রচিত)। এঁরই পুত্র বিখ্যাত গোবিন্দা-নন্দ কবিকঙ্কনাচার্য।

গণেশ চৌধুরী—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গণেশ দাস—ইনি 'দ্রব্যাদর্শ' নামক বৈদ্যক গ্রন্থ-প্রণেতা। সম্ভবতঃ 'ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ইনি 'ষোড়শ পদার্থী' নামক একখানি ন্যায়-গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন।

গণেশ, রাজা—রাজা গণেশ ছিলেন উত্তর বঙ্গের 'ভাতুড়িয়া' নামক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদার। গণেশের জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে বা পূর্বপুরুষদের নাম সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিকদের কারুর কারুর মতে ইনি সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ কুলজাত এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বাংলার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার আগে গণেশ ইলিয়াস্ শাহী সুলতানদের অমাত্য ছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ রাজা শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ বা দ্বিতীয় শামসুদ্দীনকে নামে মাত্র রাজা খাড়া করে রেখে গণেশই সমস্ত শাসনকায পরিচালনা করতেন (১৪১০—১৩)। গণেশ অতি প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন কূটনীতিজ্ঞ ও প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। কূটনীতির জোরে ও সামরিক শক্তি বলে তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের উচ্ছেদ করেছিলেন। কথিত আছে নরসিংহ নাড়িয়াল নামক এক মন্ত্রীর কৌশলে গণেশ মুসলমান বাদশাহকে নিহত করেছিলেন। ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে আছে :

"যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহকে মারি নিজে
হৈল রাজা।"

শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে গণেশ 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজা কংস নামেও পরিচিত।

রাজা গণেশ প্রায় সমগ্র বাংলারই

শাসনকর্তা ছিলেন। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সবাই তাঁকে সমানভাবে ভালবাসত। যে সব মুসলমান তাঁর বিরোধিতা করেছিল তাদের তিনি নির্মমভাবে দমন করেছিলেন। গণেশ দক্ষ সুশাসক ছিলেন। ফিরিশ্‌তার মতে গণেশ "মাথায় রাজমুকুট ধারণ করে এবং ছত্র প্রভৃতি রাজকীয় প্রতীকচিহ্ন ভূষিত হয়ে পরিপূর্ণ প্রাধান্যের সঙ্গে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাত বছর রাজত্ব করেছিলেন। মধ্যযুগের অবিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসনের মধ্যে গণেশ যে সাত বছরের হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। দিল্লীর মসনদে তখন ফিরোজ শাহ তুঘলকের পর মামুদ শাহ তুঘলক আসীন (১৩৯২—১৪১২ খ্রীঃ)। এই সময় তুর্কী বীর তৈমুর লঙ দিল্লী আক্রমণ করেন।

গণেশ রায়—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গ তি গো বি ন্দ — শ্রীনিবাস আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গতিগোবিন্দ। এঁর আসল নাম গোবিন্দ আচার্য। ইনি মালিহাটী নিবাসী। ইনিই 'বীররত্নাবলী' নামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই নিবন্ধের বিষয় হচ্ছে, নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র কর্তৃক বিষ্ণুপুরে গুপ্ত-বৃন্দাবন অর্থাৎ বৃন্দাবনের অনুকরণে কুঞ্জমন্দিরাদি স্থাপন এবং বীর হাম্বিরকে শিক্ষা প্রদান। গতিগোবিন্দের অপর নিবন্ধ হচ্ছে 'অন্তপ্রকাশ খণ্ড'। গতিগোবিন্দ বীরভদ্রের শিষ্য এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। গতিগোবিন্দ ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীপদ্মাবতী ওরফে গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজাত। আনুমানিক ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়েছিল। ইনি একজন পদকর্তা ও পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর। ইনি রাধাকৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মূল কাব্যের কোন সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায়নি। এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে একখানি খণ্ডিত পুথি আছে দ্বিজ গোবিন্দের কৃষ্ণমঙ্গল নামে। ডঃ সুকুমার সেন এই পুথিখানির ভণিতা বিচার করে কাব্যটি গোবিন্দ আচার্যের রচনা বলে মনে করেন। কবি কর্ণপূর এঁকে ব্রজে পৌর্ণমাসীর অবতার এবং 'গীতপদ্যাদিকারক' বলেছেন। রাম গোপাল দাসের রসকল্পবল্লীতে শ্রীগোবিন্দ আচার্য ঠাকুরের লেখা কাব্য বা পদ থেকে এই চারি ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে।

"অথ চামালি কৃষ্ণপ্রিয়ানাম" শীর্ষকে,

"ঘন মেঘ বরিখয়ে বিজুরি চমকে
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে।
ছোড় ছোড় আঁচল নিলজ মুরারি
লাজ নাহিক তোর হাম পরনারী

গদাধর—বরেন্দ্র ভূমি বা উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত তড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নানা বিষয়ে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে গদাধর "গৌড়ের মুকুটমণি" নামে স্বদেশবাসীর নিকট পরিচিত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে ইনি স্বদেশ ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে যান এবং 'কার্তিকেয় তপোবন' নামক স্থানের সামন্ত রাজা হন। এঁর রাজধানী ছিল কোলাগুল্লা। এঁর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী।

গদাধর—গৌড়ের অধিবাসী। চন্দেলরাজ পরমার্দি (১১৬৭-১২০২ খ্রীষ্টাব্দ) এঁর অনন্য সুলভ গুণের পরিচয় পেয়ে এঁকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করেছিলেন। অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ইনি শীঘ্রই রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে পরিচিত হন। গদাধরের বংশধরগণ ছয় পুরুষ যাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে এই রাজ্যের মন্ত্রীপদে কিংবা অনুরূপ কোন উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দী।

গদাধর—কলাপপঞ্জীকাকার ত্রিলোচনের পুত্র। এঁর রচিত গ্রন্থ বৈদ্যপ্রসারক। অবস্থিতিকাল একাদশ-দ্বাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দী। ইনি বঙ্গসেনের পিতা। শুনা যায় ইনি "চিকিৎসাসার-সংগ্রহ" নামে একখানি নিবন্ধ-গ্রন্থ লিখেন। ইনি সুশ্রুত এবং মাধবনিদানের ব্যাখ্যা লিখেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

গদাধর—'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্যের রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস ও মহাভারতের রচয়িতা কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁর জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণাস্থিত সিঙ্গিগ্রামে। এঁর পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। পিতামহ সুধাকর, প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর। জাতিতে কায়স্থ। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'জগন্নাথ মঙ্গল'। ইহা রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকের প্রথমের দিকে। উড়িষ্যাবাসকালেই গদাধর এই কাব্য রচনা করেন।

গদাধর দাস—আড্যাদহের (এঁড়িয়াদহ) শঙ্খবণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এঁকে মহাপ্রভুর এক বিশেষ ভক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি নবদ্বীপলীলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গৌরাঙ্গের গয়া গমনকালে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে গদাধর দাসও ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, "গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ"। মহাপ্রভুর সঙ্গে এঁর সম্বন্ধ ছিল অতি নিবিড়। প্রথম বারে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচল গমন করলে ইনিও তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। মহাপ্রভু গদাধরকে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে গিয়ে থাকবার নির্দেশ দান করলে ইনি তাঁর সঙ্গে গৌড়ে চলে আসেন।

মহাপ্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ে এলে গদাধর পাণিহাটিতে রাঘব-ভবনে গিয়ে তাঁর চরণ দর্শন করেছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর গদাধর নবদ্বীপে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবিতকালে গদাধর নবদ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও যান নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃত্যুর পর ইনি কণ্টকনগরে গিয়ে এক গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তা অবলম্বন করে মৃত্যু পযন্ত অপেক্ষা করেন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ—অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলা। ইনি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির নিকট অধ্যযন সমাপ্ত করে নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন। এঁর রচিত 'চিন্তামণি আলোক' ও 'দীধির টীকা' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

গদাধর পণ্ডিত—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নদায়াতে বৈশাখের এক 'কুহুদিনে' গদাধর পণ্ডিতের জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম মাধব মিশ্র। ইনি আবাল্য গৌরাঙ্গের সুহৃদ ও গৌরাঙ্গানুরাগী মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। পঠনে-ভ্রমণে, ভোজনে-শয়নে সদা সর্বদা গদাধর গৌরাঙ্গের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু-রূপে কাছে কাছে থাকতেন। শিশুকাল থেকেই গদাধর সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। এঁর পিতা মাধব মিশ্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য। সেই সূত্রে গদাধরও বৈষ্ণবসমাজ কর্তৃক বন্দিত হতেন। গদাধরের সহধর্মিণী রত্নাবতী ছিলেন পরমা ভক্তিমতী রমণী। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এলে গদাধরের ভক্তিভাব দেখে তিনি স্বরচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থখানি এঁকে পড়ান এবং এঁর মনকে কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি অধিকতর অনুরাগী করে তুলেন। তখন গদাধর বালক মাত্র। গৌরাঙ্গের সঙ্গে গদাধর অদ্বৈত গৃহে পাঠাভ্যাস করতেন। গৌরাঙ্গ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গদাধরেরও জীবনের পরিবর্তন ঘটে। গয়া থেকে ফিরে এসে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-প্রেমে অধীর হয়ে উঠেন, গদাধরও ভাবাবেগে বিভোর হন। একদিন চট্টগ্রাম হতে বৈষ্ণবশিরোমণি পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি নবদ্বীপে পৌছলে গদাধর গৌরাঙ্গের সম্মতি লাভ করে তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গৌরাঙ্গকে গদাধর ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। বিশেষ লীলাকালে ইনি গৌরাঙ্গপ্রভুকে তাম্বুলাদি যোগাতেন। রাত্রিতে ইনি গৌরাঙ্গ-শয্যান্তিকে শয্যা রচনা করে নিদ্রা যেতেন। গদাধর মরমী পত্নীর মতো গৌরাঙ্গের ভাবজগতের সঙ্গী হয়েছিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলা নাটকা-ভিনয়ে গৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করে মর্মসঙ্গী গদাধরকে রুক্মিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছিলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর গদাধর পণ্ডিত ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে যান। এবং সমুদ্রতীরে যমেশ্বর টোটাতে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে ইনি গোপীনাথ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নীলাচলে গদাধরের প্রধান কাজ ছিল গোপীনাথ-সেবা আর ভাগবতপাঠ। ইনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং এঁর ভাগবতপাঠ ছিল অপূর্ব। ইনি মহাপ্রভুকে ভাগবত পাঠ শুনিয়ে তৃপ্তি দান করতেন। গদাধর সুপাচকও ছিলেন। ইনি স্বহস্তে রান্না করে মহাপ্রভুকে খাওয়াতেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছুকাল পরে গদাধর দেহরক্ষা করেন। বৈষ্ণব সমাজে ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়।

গদাধর ভট্ট—শ্রীরঘুনাথ ভট্টের শিষ্য। 'মোহিনীবাণী' নামক পদাবলী রচয়িতা। এঁর রচনা রসাল ও ভাব গম্ভীর। কথিত আছে যে এঁর একটি পদ আস্বাদন করেই শ্রীজীব গোস্বামী আনন্দে অধীর হয়ে এঁকে শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন করবার জন্যে একটি শ্লোক লিখে দুজন বৈষ্ণব এঁর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামি প্রিয় ভট্ট গদাধর।
স্ফুরাহ্ শ্রীভাগবত অর্থ মনোহর।

গদাধর ভট্টাচার্য—অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ও বিচক্ষণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত বলে খ্যাত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম জীবাচার্য এবং বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় গ্রামে ছিল এঁর আদি নিবাস। ইনি বাল্যকালে নবদ্বীপে এসে তৎকালীন প্রধান নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ঐ স্থানেই অধ্যাপনা করেন। ইনি জগদীশ তর্কালঙ্কারের সমসাময়িক। গদাধর ভট্টাচার্য অনেক টীকা প্রণয়ন করে-ছিলেন—সাধারণতঃ সেই সমস্ত টীকা "গাদাধরী টীকা" ও "গাদাধরী পাতড়া" নামে সুপরিচিত। ইনি "ব্রহ্মনির্ণয়" নামক একখানি বেদান্তভাষ্য, কুসুমাঞ্জলীর ব্যাখ্যা, মুক্তাবলীর টীকা, এবং তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি ও তত্ত্ব-চিন্তামণ্যালোকের 'গাদাধরী' নামক সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গদাধর ভট্টাচার্য খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী—গদাধর সপ্তদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ নৈয়ায়িক। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এঁর আবির্ভাব হয়। পক্ষধর মিশ্রের 'আলোক' গ্রন্থের উপর গদাধর 'শব্দ-মণ্যালোক টীকা' 'প্রত্যক্ষালোকটীকা' ও 'অনুমানালোকটীকা' রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি শিরো-মণির কতক গ্রন্থের উপরও টীকা রচনা করেন। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে গদাধর ৬৪টি বাদগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'শক্তিবাদ', 'মুক্তিবাদ', 'বুৎপত্তি বাদ', 'বিষয়তাবাদ' ও 'বিধিস্বরূপ'

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। গদাধরের পিতা ছিলেন বামাচারী তান্ত্রিক। গদাধর স্বয়ং মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন।

গন্ধর্ব পাল—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড়ের প্রথম রাজা। ৬৭১ বঙ্গাব্দে গন্ধর্ব পাল উড়িষ্যার গঙ্গা-বংশীয় রাজাদের অধীনে এই রাজ্য সংস্থাপন করেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গড অমরাবতীর নিকটবর্তী দিক্ নগর গ্রামে এঁর জন্ম হয়। ইনি জাতিতে ছিলেন সদগোপ। উৎকল-রাজ গন্ধর্ব পালকে "শ্রীচন্দন" উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট সাজাহানও এঁকে "মাডিসুলতান" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। রাজার পত্নী রানী মধুমঞ্জুরী অতি সুশীলা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। ৭০৩ বঙ্গাব্দে রাজা গন্ধর্ব দেহত্যাগ করলে রানী এঁর অনুমৃতা হন। নারায়ণবল্লভ ও সদানন্দ নামে গন্ধর্ব পালের দুই পুত্র ছিলেন।

গন্ধর্ব রায়—গৌড়েশ্বর রুক-হুদ্দীন বারবক শাহের সভাসদ। কবি কৃত্তিবাস এঁকে "গন্ধর্ব অবতার" বলে অভিহিত করেছেন। ইনি সুপুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

গন্ধর্ব সিংহ—বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁর অন্যতম সেনাপতি। আলীবর্দী খাঁর সহিত সরফরাজ খাঁর যুদ্ধে ইনি স্বীয় প্রভুর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান না করে নিষ্ক্রিয় থাকেন। সরফরাজ খাঁ যুদ্ধে নিহত হলে ইনি আলীবর্দী খাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন।

গন্ধর্ববর খাঁ—প্রকৃত নাম গোবিন্দ বসু। গৌরভক্ত। নিবাস ছিল হুগলী জেলার শেয়াখালাতে। ইনি হোসেন সা বাদশাহের উচ্চ রাজ-কর্মচারী ছিলেন। হোসেন সার উজীর পুরন্দর খাঁ এঁর ভ্রাতা।

গবুচন্দ্র—হবুচন্দ্র রাজা এবং গবু-চন্দ্র মন্ত্রী দ্র°

গয়দাস মহাচার্য—বঙ্গাধিপতি মহীপালের বৈদ্য। সুশ্রুতের উপর ইনি বৃহৎপঞ্জিকা বা ন্যায়চন্দ্রিকা বা চন্দ্রিকা প্রণয়ন করেছিলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট প্রমাণপুরুষ। এঁর অবস্থিতিকাল দশম-একাদশ শতাব্দী। মধুকোষে গয়দাসের নামের উল্লেখ আছে।

গয়ী সেন—এঁর অবস্থিতিকাল একাদশ-দ্বাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দী। ইনি বঙ্গীয় বিষপাডাবাস্তব্য এবং সুশ্রুত-ব্যাখ্যাকার।

গরীব খান—সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। ইনি বৈষ্ণব ঢঙে পদাবলী রচনা করে-ছিলেন।

গরীবুল্লা—এঁর রচিত গ্রন্থ 'জঙ্গনামা'। অধিকাংশ 'জঙ্গনামা'য় হজরৎ মুহম্মদের খুল্লতাত-পুত্র ও জামাতা আলীর পুত্র হাসন-হুসেন-হানীফের কাহিনী আছে। ইনি 'আমীর হামজা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের

রচয়িতা। গরীবুল্লার জীবৎকাল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণ রাঢ়ের মুসলমান কবিদের মধ্যে গরীবুল্লা বোধ হয় সবচেয়ে পুরনো কবি। পরিচয়ঃ
"আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লা নাম
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম।"

গরীবুল্লার অপর রচনা 'ইউসুফ-জেলেখা'।

গরীবুল্লা (ঢাকা নিবাসী)—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। এঁর রচিত কাব্য 'দিলারামের পুথি'। গ্রন্থটি একটি হিন্দি কাহিনীর স্বাধীন বঙ্গানুবাদ।

গরুড় পণ্ডিত—গৌড়বাসী গোবিন্দ ও গরুড় দুই ভাই ছিলেন। 'চৈতন্য ভাগবত' ও 'চৈতন্য চরিতামৃত' উভয় গ্রন্থেই আছে যে নামের প্রভাবে সর্পবিষও তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনি মূলস্কন্দ-শাখাভুক্ত ও গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার প্রায় প্রতিটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নীলাচলে গিয়েও মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতেন। গরুড় পণ্ডিত পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

গরুড়ধ্বজ—প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ময়ূরবংশীয় রাজা। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ ও হংসধ্বজের পরে গরুড়ধ্বজ তমলুকের রাজা হন।

গরুড়নাথ—নাথপন্থী সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধপুরুষ।

গাজীপীর—গাজীপীরের নাম বাংলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। 'গাজী' একটি উপাধি, উহার অর্থ ধর্মবীর। এই উপাধিবিশিষ্ট পৃথক-পৃথক অনেক মুসলমান প্রচারক বঙ্গদেশে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়ের বাদশাহগণের মধ্যেও অনেকে গাজী উপাধি ধারণ করতেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এক গাজী মিঞার নাম প্রসিদ্ধ আছে, কথিত আছে যে, তিনি সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভাগিনেয় ছিলেন। গাজী, কালু ও চম্পাবতী পুঁথিতে দারাবউদ্দীন গাজীর যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহা ইতিহাসসম্মত নহে। ইতিহাসে যে বড় খাঁ গাজীর নাম আছে, তিনি জাফর খাঁ গাজীর পুত্র ছিলেন এবং ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। জাফর খাঁ গাজীও একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীতে তিনি বাস করতেন। কথিত আছে যে, পূর্বস্থলীর রাজা মুকুট রায় উক্ত গাজীর শ্বশুর ছিলেন।

গাজীবাবা—চব্বিশ পরগণার ঘুটিয়ারী-শরীফের বিখ্যাত ফকির। এঁর পুরো নাম শহেদ সাহ মোবারক গাজী। পিতার নাম চন্দন সাহ বাদশা, নিবাস বেলে আদমপুর। গাজীবাবা সামান্য কিছুদিন বাদশাগিরি করার পর দুটি পুত্র রেখে সংসার ত্যাগ করেন। চব্বিশ পরগণার পাইকহাটি

অঞ্চলে এক আলমের কাছে আরবী ও ফারসী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইনি ছিলেন সে যুগের এক উদারচেতা, সেবাপরায়ণ মহামানব। মুসলমান সমাজে জন্ম হলেও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি হিন্দু দেবদেবীরও দর্শনলাভ করেন বলে আখ্যাত আছে। এঁর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রতি বছর ১৭ শ্রাবণ এঁর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে ঘুঁটিয়ারী শরিফে (২৪ পরগণা) এক বিরাট মেলা বসে। এঁর জীবিতকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ—ইনি ছিলেন বঙ্গেশ্বর শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পৌত্র এবং সিকন্দর শাহের পুত্র। সোনারগাঁয়ে গিয়ে গিয়াসুদ্দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সিকন্দর বিদ্রোহ দমনের জন্য যান। গিয়াসুদ্দীনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিকন্দর মারাত্মকভাবে আহত হন, পরে তার মৃত্যু হয়। পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা করে গিয়াসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে)। শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরতার সঙ্গে রাজত্ব করতেন। তিনি সুশাসক ছিলেন এবং ইস্লামিক আইনের বিধি-নিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে সর্বজন-পরিচিত একটি কাহিনী আছে। একদিন তাঁর একটি তীর অজ্ঞাতসারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এক বিধবার পুত্রকে আহত করে। বিধবা কাজীর নিকট বিচার প্রার্থনা করলে, কাজী সিরাজুদ্দীন অনেক বিচার-বিবেচনার পর নবাবের উপর সমন জারি করবার জন্য একজন পেয়াদা পাঠালেন। পেয়াদা নবাবের উপর সমন জারি করতে ভয় পেয়ে অসময়ে মসজিদে আজান দিতে লাগল। নবাব পেয়াদাকে ডেকে পাঠিয়ে অসময়ে আজান দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পেয়াদা কাজীর আদেশ পালনে লঙ্ঘনের কথা বলল। তখন নবাব গিয়াসুদ্দীন ক্ষুদ্র একটি তরবারি গোপনে কটিবাসে নিয়ে আদালতে উপস্থিত হলেন। কাজী নবাবকে কোনরূপ সম্মান না দেখিয়ে তার আসনে বসে রইলেন এবং বিধবার ছেলেকে আহত করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। নবাব তা স্বীকার করলে কাজী বিধবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ নবাবকে বহু অর্থদণ্ড করলেন। নবাব সেই অর্থ দিয়ে দিলে কাজী তাঁর আসন থেকে নেমে এসে নবাবকে যথোচিত সম্মান করলেন। নবাব বললেন, "ভাগ্যে আপনি সুবিচার করেছেন, নতুবা এই তলোয়ার দিয়ে আপনার মাথা কেটে ফেলতাম।" কাজী বললেন, "আপনি আদালতে যদি আমার অবাধ্য হইতেন, তবে এই বেত্র দ্বারা আপনার পৃষ্ঠদেশ

ক্ষতবিক্ষত করতাম।" কাজীর ন্যায়-বিচার, ধর্মভীরুতা এবং সাহসিকতা দেখে নবাব তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

গিয়াসুদ্দীন কাব্যপ্রেমিকও ছিলেন। পারস্যের সিরাজে বিখ্যাত কবি হাফেজের কাছে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীন বঙ্গে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেশবিদেশের রাজা, মহারাজার নিকট দূত ও উপহার পাঠাতেন। তিনি চীনের সম্রাটের কাছে একাধিকবার দূত ও উপহার পাঠিয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হিন্দু জমিদার গণেশের চক্রান্তে গিয়াসুদ্দীন নিহত হন।

গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ—বাংলার শাসনকর্তা আলিমর্দনের হত্যার (১২১১ খ্রীঃ) পর হুসামউদ্দিন ইউয়জ নামক বক্তিয়ার খিলজির পারস্যবাসী কোন প্রিয় সেনাপতি "গিয়াসউদ্দিন" উপাধি ধারণ করে গৌড়ের মসনদ অধিকার করেন, এর আগে তিনি গঙ্গোত্রীর শাসনকর্তা ছিলেন। কথিত আছে পারস্য দেশের দুই দরবেশ এঁর ভাবী সৌভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে এঁকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। ইনি সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে কামরূপ, ত্রিহুত ও পুরী জয় করেন। এঁর রাজত্বে ইনি অধিকাংশ সময়ই লোকহিতকর কার্যে ব্যয়িত করেছেন। ইনি গৌড়ে অনেক সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। সেখানে অতি মনোজ্ঞ ও বিশাল এক মসজিদ, একটি বড় বিদ্যালয় ও অতিথিশালা প্রস্তুত করে বীরভূম হতে দেবকোট পর্যন্ত এক বিস্তৃত রাজপথ নির্মাণ করেন। ১২১১-১২২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি শান্তির সঙ্গে শাসন করেছিলেন এবং ধনী, দরিদ্র সর্বশ্রেণীর প্রতি সমানভাবে ন্যায়পরতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু ইনি দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাতেন না। তখন দিল্লীশ্বর আলতামাস ক্রুদ্ধ হয়ে বঙ্গে অভিযান করেন। আলতামাস নির্বিবাদে বিহার অধিকার করে যখন বাংলার দিকে অগ্রসর হন, তখন গিয়াসউদ্দিন গঙ্গার সমস্ত জলযান দখল করে সম্রাটের আসবার পথ রুদ্ধ করে দেন। শেষে একটা সন্ধি হয়। তাতে বঙ্গেশ্বর গিয়াসউদ্দিন দিল্লীশ্বরকে ৩৮টি হাতী এবং বহু লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। আল্‌তামাস মূলক্ আলাউদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াসউদ্দিন সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে বিহার অধিকার করে বিদ্রোহী হলেন। আল্‌তামাসের পুত্র যুবরাজ নাসিরুদ্দিন অযোধ্যা হতে এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করে তাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বার বছর রাজত্ব করার পর ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন নিহত হন। তিনি অতি উদার ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। এমন কি আলতামাস পর্যন্ত বলেছিলেন, "ইনি প্রকৃতই সুলতান হবার যোগ্য।"

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ—বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আঠারো জন পুত্রের একজন এবং নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের ভ্রাতা। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলার রাজা হন (১৫৩২ খ্রীঃ)। কিন্তু অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে নিহত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন (১৫৩৩ খ্রীঃ)। ১৫৩৩-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছর মাহ্‌মুদ শাহ বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। এই পাঁচ বছর রাজত্বকালেব মধ্যে অতি অল্পদিনই তিনি নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করতে পেরেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তেরঞ্জিত সিংহাসনে আরোহণ করলেন বটে, কিন্তু সে সিংহাসন তাঁব পক্ষে কণ্টক-আসন হয়েছিল।

মাহ্‌মুদ শাহ ছিলেন অস্থিরবুদ্ধি, ভীরু, কাপুরুষ, অদূরদর্শী এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত। তাঁর হারেমে নাকি দশ সহস্র নারী ছিল। মাহ্‌মুদ পিতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বা ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের কোন গুণের অধিকারী ছিলেন না।

মাহ্‌মুদের স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্ব অত্যন্ত ঘটনাবহুল। তাঁর রাজত্বকালই মুঘল রাজত্বের প্রারম্ভ যুগ। হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাসারামের জায়গীরদার শের শাহের অভ্যুত্থান হয়। মাহ্‌মুদের অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতার ফলে শের শাহের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। প্রথম আক্রমণে পরাজিত হয়ে ১৩ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তিনি শের শাহের সঙ্গে সন্ধি করেন। বার্ষিক নজরানা না দেওয়ার অজুহাতে দ্বিতীয়বার শের শাহ গৌড় আক্রমণ করে লুণ্ঠণ করেন এবং ষাট মণ সোনা হস্তগত করেন। এই সময় গৌড় শহর জালিয়ে দিয়েছিলেন। উপায়ন্তর না দেখে মাহ্‌মুদ শাহ হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হুমায়ুন সসৈন্যে গৌড়ে এগিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে শের শাহের পুত্র জালাল খাঁ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল গৌড় জয় করেন এবং মাহ্‌মুদ শাহের পুত্রদের বন্দী করেন। মাহ্‌মুদ শাহ আহত হয়ে পলায়ন করেন। শোন ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হুমায়ুনের সঙ্গে মাহ্‌মুদের যুদ্ধ হয়। এর পরই মাহ্‌মুদ মারা যান। হুমায়ুন বিনা বাধায় ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গৌড় অধিকার করেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এদেশে বিদেশীদের—পর্তুগীজদের বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন। ইতিপূর্বে হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫৩২ খ্রীঃ) পর্তুগীজরা এই বিষয়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু অদূরদর্শী মাহ্‌মুদ শাহ তাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা করে দেন।

শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার বিনিময়ে তিনি পর্তুগীজদের চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করতে দিলেন। এই ভাবে পর্তুগীজরা অনেক জায়গা জমির অধিকার পায়, হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের উপর আধিপত্যের সুযোগ হয়। বাংলায় ইহাই প্রথম বিদেশী-অনুপ্রবেশ।

গি রি ধ র দাস—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। ইনি "পরকীয়ারস-স্থাপন সিদ্ধান্ত সংগ্রহ" নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

গিরিধর দাস—গিরিধর যথা-সম্ভব সুন্দরভাবে জয়দেবকৃত 'গীত-গোবিন্দে'র অনুবাদ করেছিলেন। গিরিধরের অনুবাদই বঙ্গভাষায় গীত-গোবিন্দের প্রাচীনতম অনুবাদ। এঁর এই কাব্যের রচনাকাল ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

গিরিধরের অন্যান্য রচনা খুব সম্ভব "মনঃ শিক্ষা" এবং "নন্দোৎসব"।

গিরিধর দ্বিজ—প্রাচীন বাঙালী পাঁচালীকার। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন। এঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার ভারুহা গ্রামে। ইনি সত্যপীরের একখানি পাঁচালী রচনা করেছিলেন।

গুজরাণ খাঁ—বাংলার সুলতান দাউদ খাঁর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহের সেনাপতি মৈনাম খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ইনি যখন মুঘলদিগকে বাংলা দেশ থেকে বিতাড়িত করবার উদ্যোগ করছিলেন, তখন কপালে তীর বিদ্ধ হয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান। এঁর মৃত্যুতে দাউদ খাঁর পরাজয় হয়।

গু ণ্ড রী পা দ—সিদ্ধাচার্য ও সরহপাদের অধস্তন চতুর্থ শিষ্য। ইনি প্রাচীন বঙ্গভাষায় কয়েকটি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' এঁর রচিত একটি পদ আছে। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

গুড়রী—নাথপন্থীদের অন্যতম সিদ্ধাচার্য। এঁর রচিত চর্যাপদ বা কীর্তনের গান আছে।

গুণবিষ্ণু—বাংলার প্রখ্যাত বেদ ভাষ্যকার ভট্টগুণবিষ্ণু ছিলেন মহারাজ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ। ইনি সম্ভবতঃ বাঙালী অথবা মৈথিলী। এঁর পিতার নাম দামুক। ইনি ছিলেন হলায়ুধের (খ্রীঃ ১২শ শতকের শেষার্ধ) পূর্বগামী। সুতরাং গুণবিষ্ণু দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, সেন রাজত্বকালে। গুণবিষ্ণুর প্রধান গ্রন্থ 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য'। ইহা সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রের প্রায় ৪০০ মন্ত্রের সুবিস্তৃত টীকা। এ গ্রন্থ ছাড়া গুণবিষ্ণু 'মন্ত্রব্রাহ্মণভাষ্য' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইহা সামবেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণের একখানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। 'পারস্কর গৃহ্যভাষ্য' নামক একটি গ্রন্থও গুণবিষ্ণুর রচনা বলেই মনে করা হয়। বিখ্যাত বেদভাষ্যকার সায়ণ গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য' ব্যবহার করে-

ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, সায়নাচার্যের কালে (খ্রীঃ ১৪ শ শতক) গুণবিষ্ণুর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

গুণমঞ্জরী—রূপ গোস্বামীকৃত স্মরণমঙ্গলের ব্রজভাষার অনুবাদক।

গুণরাজ খান—'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ রচয়িতা মালাধর বসুর উপাধি। মালাধর বসু দ্র°।

গুণানন্দ গুহ (মজুমদার)—বঙ্গজ কায়স্থ কুলতিলক মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের পিতা। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীমদন মোহনের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। শেষ জীবন ইনি বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ—ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গুণবিবৃতিবিবেক, বৌদ্ধাধিকার-দীধিতিবিবেক, অনুমানদীধিতিবিবেক, লীলাবতীদীধিতিবিবেক, শিরোমণি রচিত কয়েকটি গ্রন্থের টীকা। এ ছাড়া, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ—প্রত্যক্ষমণি টীকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতাৎপর্যবিবেক, শব্দালোকবিবেক।

গুণানন্দ ভরদ্বাজ গোত্রীয় 'ডিং সাই' গাঞি রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর নিবাস ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুবর্ণপুর ও সিমহাট গ্রামের সংলগ্ন 'গাঙরিয়া' গ্রামে।

গুণ্ডক নারায়ণ—অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য।

গুরগণ খাঁ—ইনি আর্মিনিয়ান বণিক খাজা পিক্রর ভ্রাতা। খাজা পিক্র ব্যবসায় বুদ্ধির চেয়ে রাজনৈতিক কূট বুদ্ধিতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। গুরগণ খাঁর প্রকৃত নাম খাজা গ্রেগরী। ইনি নবাব মীর কাশিম আলী খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের যুদ্ধকালে মীর কাশিমের পক্ষ পরিত্যাগ করে ইংরেজ পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মীর কাশিম আলীর প্রেরিত গুপ্তচরের হস্তে ইনি নিহত হন।

গুরব মিশ্র—পাল রাজবংশের রাজা নারায়ণ পালের (আ ৮৫১-৯০৮খ্রী) মন্ত্রী। তিনি বেদ, আগম নীতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও বেদের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। গুরব মিশ্র ধর্মপালের প্রধান মন্ত্রী গর্গের বংশধর।

গুরুচরণ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নীর শিষ্য এবং তাঁরই আদেশে ইনি 'প্রেমামৃত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

গুরুদাস—ইনি ছিলেন মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র। পিতার অন্যায় ও অকাল মৃত্যুতে গুরুদাস শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। পিতার ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন না হলেও ধীর, গম্ভীর, দয়া দাক্ষিণ্যাদি-সম্পন্ন এবং ধর্ম-পরায়ণ ছিলেন। গুরুদাস সাহ আলম বাদশাহের নিকট থেকে 'রাজা গৌরপদ

উপাধি, তিন সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র পদাতিক ও ঝালরদার পাল্কী রাখার সনন্দ লাভ করেছিলেন। ইনি পুত্রনির্বিশেষে প্রজা পালন করতেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসের মৃত্যু হয়।

গুরুদাস ভট্টাচার্য—বৈদিক ব্রাহ্মণ। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—গোপালপুর। এঁর একটি টোল ছিল, তাতে বহু ছাত্রকে ইনি বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। ঐ সময়ে নরোত্তমের মহিমা বিস্তৃত হতে থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে থাকায় গুরুদাস ভট্টাচার্য অতীব ক্রোধান্বিত হন এবং নরোত্তমের উদ্দেশ্যে বহু নিন্দাবাদ করতে থাকেন। কিছুদিন পরে গুরুদাসের কুষ্ঠব্যাধি হয়। দৈবাদেশে নরোত্তমের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাঁর রোগ আরোগ্য লাভ করে। এবং আজীবন নরোত্তমের পরম ভক্ত হয়ে থাকেন।

গেয়াস খান—সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। ইনি বৈষ্ণব ঢঙে পদাবলী রচনা করে ছিলেন।

গোকুল চক্রবর্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

গোকুল দাস—পঞ্চকোট-সেরগড়নিবাসী একজন কবি ও পদ-কর্তা। "ভক্তি রত্নাকরে" ইনি "কবীন্দ্র" আখ্যায় অভিহিত।

গোকুলদাস বৈরাগী—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোকুলদাস মোহান্ত—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। রাজা বীর হাম্বীরের সমসাময়িক। শ্রীপাট—বিষ্ণুপুর।

গোকুলানন্দ—ইনি ছিলেন কাঞ্চনগড়িয়া নিবাসী ও চৈতন্যপার্ষদ দ্বিজ হরিদাসাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীদাস ছিলেন এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীনিবাসের ইচ্ছানুযায়ী গোকুলানন্দ শাস্ত্রানুশীলনের জন্য যাজিগ্রামে বাস করতেন। ইনি খেতুরি ও বোরাকুলির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বুধরি এবং কণ্টক নগরেও এঁকে মাঝে মাঝে দেখা যেত। বীরচন্দ্রপ্রভু যাজিগ্রামে এলে এঁরা দুই ভাই তাঁকে সংবর্ধিত করেন। গোকুলানন্দ 'মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণ-সেবা করি'তেন। 'ভক্তি রত্নাকরে' এঁকে গোকুলানন্দ চক্রবর্তীও বলা হয়েছে। ইনি পদকর্তাও হতে পারেন। এঁর পুত্রের নাম কৃষ্ণবল্লভ। গোকুলানন্দ ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

গোকুলানন্দ বিদ্যামণি—ইনি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ সুবুদ্ধি শিরোমণির প্রপৌত্র। গোকুলানন্দ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বৃত্তি লাভ করে নবদ্বীপবাসী হন। এই অসাধারণ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত একটি উৎকৃষ্ট ঘটিকাযন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন।

তখনো বিদেশী ঘটিকা যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি। এর সাহায্যে দণ্ড, পল প্রভৃতি নিশ্চিতরূপে নির্ণিত হত। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

গোকুলানন্দ সেন বা **বৈষ্ণব দাস**—জাতিতে বৈদ্য। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়ার-বৈদ্যগ্রামে এঁর জন্ম হয়। এঁর গুরুদত্ত নাম বৈষ্ণব দাস, মালীহাটীর বিখ্যাত রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব পদকর্তা বলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কীর্তন গানেও ইনি সুদক্ষ ছিলেন। এঁর সুর এখনো "টেঁয়ার ঢপ" নামে অভিহিত হয়। এঁর সঙ্কলিত পদাবলী সংগ্রহের নাম "পদকল্পতরু"। "গুরুকুলপঞ্জিকা" নামে গোকুলানন্দের আর একটি পদগ্রন্থ আছে। ইনি "বৈষ্ণবকুণ্ড" ও "ঠাকুর পুষ্করিণী" নামে দুটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গোঁজলা গুঁই—কবি-গান রচয়িতা। ইনি আধুনিক কবি-গান রচয়িতাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

গোজর খাঁ, নবাব—আলীবর্দী খাঁর জামাতা আহম্মদ খাঁ দৌলতজঙ্গের নায়েব নাজির।

গোপচন্দ্র—একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে গোপচন্দ্র গৌড়ের রাজাধিরাজ ছিলেন। তাঁর রাজত্ব-কালে বারিক মণ্ডলে নাগদেব মহা-প্রতিহার ব্যাপবাস্ত ধৃতমূল ক্রিয়ামাত্য উপরিখ এবং বৎস্য স্বামী বিষয়পতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দী।

গোপাল—৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বঙ্গরাজ মহাসামন্ত শশাঙ্কর মৃত্যুর পর প্রায় একশত বছর ধরে বাংলাদেশে অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দেশের রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হয়েছিল। সমগ্র দেশে মাৎস্যন্যায় বিরাজ করছিল। এই চরম দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভের জন্য বাংলাদেশের প্রবীণ নেতারা স্থির করলেন যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করবেন। সমগ্র দেশবাসী সানন্দে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশের রাজপদে নির্বাচিত করা হয়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ আনুমানিক প্রায় ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল বাংলার রাজ-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গোপালের প্রধান কীর্তি এই যে প্রায় একশত বছরের অরাজকতার পরে সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁর শাসনাধীনে এসেছিল এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশবাসীর জীবনে বহুদিন পরে সুখ, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। গোপালের বংশ-পরিচয় বিশেষ কিছু

পাওয়া যায় না। তবে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে গোপাল বরেন্দ্র-ভূমির অধিবাসী ছিলেন। পালরাজ-গণের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু 'সববিদ্যাবিশুদ্ধ' ছিলেন এবং গোপালের পিতা বপ্যট শত্রুর দমন এবং বিপুল কীর্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর পিতা যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং গোপালও সম্ভবত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রবীণ ও সুনিপুণ যোদ্ধা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। গোপাল ও তাঁর বংশধরগণ সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল সমগ্র আর্যাবর্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গোপালের রাজত্বকাল সম্বন্ধে নানা মতবিরোধ আছে। তবে খুব সম্ভব তিনি ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেছিলেন। গোপালের পত্নী দেদ্দদেবী অত্যন্ত গুণবতী রমণী ছিলেন। গোপাল বিনয়ী ও মহত্তাবাপন্ন রাজা ছিলেন। তাই তিনি সর্বজনপ্রিয় হতে পেরে-ছিলেন। গোপালের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। দেবপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে গোপাল সমাজ-সংস্কার করে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে স্ব স্ব কর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গৌড়মণ্ডলের রাজারা যুগে যুগে যে সমাজ-সংস্কার করেছেন, গোপালই তাঁর অন্যতম আদি পথ-প্রদর্শক।

গোপাল (ক্ষত্রীয়)—মূলতান-বাসী, গৌরাঙ্গভক্ত।

গোপাল (তৃতীয়)—কুমার পালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপাল পালরাজবংশের রাজা হন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ১১২৫—১১৪০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর রাজত্বকালের কোন ঘটনাই জানা যায় না।

গোপাল আতা—ইনি ছিলেন শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবের শিষ্য। ইনি 'জন্মযাত্রা' নামক নাটক রচনা করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

গোপাল গুরু—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য, পূর্ব নাম মকরধ্বজ পণ্ডিত—মুরারি পণ্ডিতের পুত্র।

গোপাল চক্রবর্তী—ইনি হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) আরিন্দা অর্থাৎ কর-আদায়কারী ছিলেন। ইনি গৌড়ে থাকতেন এবং রাজকোষে বার লক্ষ টাকা জমা দিতেন। চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

"গোপাল চক্রবর্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥"
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে
আরিন্দাগিরি করে।
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে॥

ইনি হিরণ্য মজুমদারের ঘরে

সমবেত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের সামনে হরিদাসের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন। তার ফলে এঁকে ধিক্কৃত হতে হয়। কারুর কারুর মতে এই গোপাল চক্রবর্তী গৌড়েশ্বরের কর্মচারী নন, হিরণ্য মজুমদারেরই কর্মচারী। হিরণ্য মজুমদার ছিলেন সপ্তগ্রাম মুলুকে হোসেন শাহের রাজস্ব আদায়কারী।

গোপাল চক্রবর্তী—তদ্ রচিত 'চণ্ডী'র টীকায় তাঁর আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন গয়-ঘর বন্দ্যঘটীয় বংশোদ্ভব এবং তাঁর পিতার নাম ছিল দুর্গাদাস। তাঁকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক বলে মনে করা হয়।

গোপাল 'অমর কোষে'র একখানি টীকা রচনা করেছিলেন। তাঁর অপর গ্রন্থ জ্যোতিরত্ন।

গোপাল দত্ত—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোপাল দাস—কেশব দাসের পুত্র এবং ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গা দাস সূরির পিতা। ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি চিকিৎসামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জানা যায় ইনি 'সুধাবিন্দু' নামক একখানি 'বৈদ্যক কোষ' গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন।

গোপাল দাস—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শিষ্য এবং পীতাম্বর দাসের পিতা থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এঁর নিবাস ছিল সৈদাবাদের পরপারে কাঞ্চনগেড়িয়া পল্লীর বুধইপাড়ায়। গোপাল দাস একজন বৈষ্ণব পদকর্তা ও বিখ্যাত কীর্তন গায়ক ছিলেন। ইনি খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। বৈষ্ণব দিগ্দর্শন মতে গোপাল দাস মুকুন্দ দাস গোস্বামীর নির্দেশে "রাধা-কৃষ্ণরসকল্পলতা" নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থখানি ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে রচিত হয়।

গোপাল দাস—"ভক্তি-রত্নাকর" নামক গ্রন্থ রচয়িতা। ইহা ১৫৯০ সালে রচিত হয়।

গোপাল দাস—'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক গ্রন্থ রচয়িতা। গুরু দত্ত 'শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর' নামেও পরিচিত।

গোপাল দাস—'রসরতিমঞ্জরী' 'রতিশাস্ত্র' রচয়িতা।

গোপাল পাল—বাংলার পাল বংশীয় শেষ নৃপতি। ইনি তৃতীয় গোপালদেবের পুত্র। মদন পালদেবের মৃত্যুর পরে ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

গোপাল বল্লভ—নিত্যানন্দ-প্রভুর জামাতা মাধবাচার্যের পুত্র। ইনি জগদীশ পণ্ডিতের কন্যা রসমঞ্জরীকে বিবাহ করেন।

গোপাল ভট্ট—ইনি সেন বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় বল্লাল সেনের শিক্ষক ছিলেন। ইনি রাজার আদেশে ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল চরিত নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

গোপাল ভট্ট—একজন প্রসিদ্ধ

জ্যোতির্বিজ্ঞ পণ্ডিত। 'গোপাল রত্নাকর' নামক জাতক গ্রন্থ এঁরই রচিত।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী—বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ষড় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী। এঁর অবস্থিতিকাল ১৫০০-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী হলেও বাংলায় কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন। মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত গ্রন্থে আছে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে চৈতন্যদেব ত্রিমল্ল নামক শ্রীবৈষ্ণবপন্থী এক ভক্তের বাড়ীতে চার মাস ছিলেন। গোপাল ভট্ট এই ত্রিমল্লের পুত্র। সেই সময় বালক গোপাল শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়েছিলেন। মতান্তরে গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। যাহাই হোক, চৈতন্যদেবের নির্দেশানুসারে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে এসে রূপ-সনাতনের সঙ্গে বসবাস করেন। রূপ-সনাতনের তিরোধানের পর গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনের গুরুরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য গোপাল ভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নিকট বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

গোপাল ভাঁড়—অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হাস্যরসিক সভাসদ। ইনি নাকি নরসুন্দর বংশীয় ছিলেন। আবার কেউ কেউ এঁকে কায়স্থও বলে থাকেন। এঁর নিবাস ছিল শান্তিপুরে। গোপাল ভাঁড়ের নাম আজও বাংলার আপামর জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত।

গোপাল মিশ্র—বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈত প্রভুর তৃতীয় পুত্র।

গোপাল সিংহ দেব—অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা। ইনি পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। এঁর রাজত্বে কেউ হরিনাম সংকীর্তন না করলে ইনি তার দণ্ডবিধান করতেন বলে বিষ্ণুপুরবাসীমাত্রেই সন্ধ্যাকালে হরিনাম করাকে "গোপাল সিংহের বেগার" বলত। এজন্য আজও রাঢ় দেশের অনেকের মুখে এই কথা শুনতে পাওয়া যায়। যে কাজ না করলেই নয় লোকে তাকেই "গোপাল সিংহের বেগার" বলে। ইনি বিষ্ণুপুরে পাঁচটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁরই রাজত্বকালে মারাঠা সৈন্য (বর্গীরা) ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে। প্রবাদ এই যে, বিষ্ণুপুরের প্রধান দেবতা মদনমোহন দলমাদল দুইটি বিশালাকার কামান দেগে শত্রু সৈন্যকে দূরীভূত করেছিলেন। ঐ কামান আজও বিষ্ণুপুরে বিদ্যমান।

এঁর রাজত্বকাল ছিল ১৭১২-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর ভণিতায় রচিত একখানি কাব্য পাওয়া গেছে, তাতে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে পুরাণের রীতিতে এবং গোস্বামী গ্রন্থের অনুসারে। প্রথমে কৃষ্ণার্জুন সংবাদ তারপর রাধার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে

কাহিনীর সূত্রপাত। কাব্যটি পালায় বিভক্ত। পুঁথিটি খণ্ডিত, সুতরাং কাহিনীর সমাপ্তি কোথায় বলা যায় না। ভণিতায় গোপাল সিংহের বিবিধ বিশেষণ থাকায় কাব্যটি কোন সভাসদের রচনা বলে মনে হয়। যেমন,

"শ্রীগুরু চৈতন্যপদ-ভজন চতুর
নরেন্দ্র গোপালসিংহ গাইলা মধুর।"

ইনি একজন সুকণ্ঠ কর্তনীয়াও ছিলেন। কবিশ্চন্দ্র নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে পয়ারছন্দে বিরাট মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। গৃহী এবং রাজা হয়েও তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করতেন। তাই তাঁকে রাজর্ষি বলা হত।

গোপাল হোড়—গৌরাঙ্গভক্ত।

গোপালকৃষ্ণ পট্টনায়ক—ওড্রদেশীয় কবি, গৌরভক্ত। ইনি স্বরচিত 'গোপালকৃষ্ণ পদ্যাবলী'র মনঃশিক্ষায় শ্রীগৌরের অন্তর্নিহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীগৌর বন্দনাটি অতি সুন্দর।

গোপালকৃষ্ণ ভট্ট—এঁর রচিত গ্রন্থ রসেন্দ্র সারসংগ্রহ। ইহা বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে খুব জনপ্রিয় ছিল। এঁর অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী।

গোপালদাস অধিকারী (গোপাল গোসাঞি)—বৃন্দাবনবাসী। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। বীরভদ্র গোস্বামীকে বৃন্দাবনে ভক্তগণ যখন আগুবাড়িয়ে নিয়ে যান, তখন ইনিও ছিলেন।

গোপালদাস বাহাদুর—বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের পুত্র। পূর্ব নাম ধীর হাম্বীর বা ধাড়ী হাম্বীর। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী বীর হাম্বিরের নাম রাখেন 'গোপাল দাস'। ইনি ছিলেন পরম ধার্মিক। ধাড়ী হাম্বার দ্র০।

গোপালদাস বৈদ্য—সিদ্ধেশ্বর কবির পুত্র এবং এঁর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী। রচিত গ্রন্থ বৈদ্যসারসংগ্রহ, যোগামৃত নামক বৈদ্যক গ্রন্থ এবং তদুপরি 'সুবোধিনী' টীকা।

গোপাল দেব, দ্বিতীয়—পাল রাজ বংশের রাজ্যপালের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৯৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর অদৃষ্টে অব্যাহত শান্তি ছিল না। তাঁর রাজত্বের শেষভাগে বুন্দেলখণ্ডের রাজা চন্দেল্ল বংশীয় যশোবর্মা গৌড়দেশ আক্রমণ করেছিলেন।

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার—এঁর প্রকৃত নাম রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার। ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার একজন প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থসমূহ নির্ণয় শব্দান্ত—উদ্বাহনির্ণয়, আচারনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, দায়নির্ণয়, সম্বন্ধনির্ণয়, শুদ্ধিনির্ণয়, প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, দুর্গোৎসবনির্ণয়, অশৌচনির্ণয়, কালনির্ণয়, বিচারনির্ণয়, ব্যবস্থানির্ণয়, শ্রাদ্ধনির্ণয়, সংক্রান্তিনির্ণয়,

প্রভৃতি। এঁর অবস্থিতি কাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

গোপী কান্ত—ইনি ছিলেন একজন পদকর্তা, রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্যের পুত্র। ইনি পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং পিতার ন্যায়ই কবি ও পদকর্তা ছিলেন। গোপীকান্তের একটি পদে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর চরিত্রাস্বাদন আছে—

"কনক বরণ তনু প্রেম-মুরতি জনু
কণ্ঠহি তুলসিক মাল।
গৌর প্রেম-ভরে অহনিশি আঁখি ঝুরে
হেরি কাঁপয়ে কলি-কাল॥"

গোপীকান্ত দাস—একজন পদকর্তা—প্রার্থনা ও নগর-সংকীর্তন কাব্য রচয়িতা।

গোপীকৃষ্ণ দাস—'হরিনাম-কবচ' রচয়িতা।

গোপীচন্দ্র—কবি রামচন্দ্র রচিত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায় গোপীচন্দ্র প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তের রাজা ছিলেন। গোপীচন্দ্র ছত্রেশ্বরী দেবীর সম্মুখে ক্রোধে অধীর হয়ে এক ব্রাহ্মণের শিরচ্ছেদ করায় দেবী অধোমুখী হয়ে থাকেন। কিছুদিন পরে রাজা গোপীচন্দ্র গঙ্গাভূমিতে গিয়ে গঙ্গাসাগরের স্রোতে মন্ত্রেশ্বরের নিকটে জলে ডুবে যান।

গোপীচন্দ্র—গোবিন্দচন্দ্র দ্র°

গোপীচরণ দাস—উদাসীন বৈষ্ণব। শ্রীহরিনামামৃতের টীকা কালতোষণীর সংশোধক।

গোপীচাঁদ—গোবিন্দচন্দ্র দ্র°

গোপীজনবল্লভ দাস—মেদিনীপুর জেলার ধারন্দা বা ধারেন্দা গ্রামই গোপীজনবল্লভ দাসের জন্মস্থান। কবির পিতার নাম রসময়, দুই খুল্লতাত বংশী ও মথুরা দাস। কবিরা ছিলেন পাঁচ ভাই। জাতিতে গোপ। কবির মাতামহ ভীম-শ্রীকর অতি দুর্দান্ত জমিদার ছিলেন। গোপীজনবল্লভ দাস রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন। বাল্যকালে ইনি শ্যামানন্দেরও সেবা করেছিলেন। ইনি শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের একটি জীবনী রচনা করেন—নাম 'রসিকামঙ্গল'। রচনা আরম্ভের ও শেষের তারিখ, বার, তিথি ইত্যাদি সব দেওয়া আছে। গ্রন্থ রচনায় কত সময় লেগেছিল, তাও দেওয়া আছে, কিন্তু বৎসরের উল্লেখ নেই। তবে খুব সম্ভব গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল।

গোপীনাথ—চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের সখা ছিলেন।

গোপীনাথ—ভৈরবের পুত্র গোপীনাথ দীক্ষিত। গণেশ দৈবজ্ঞকৃত 'প্রতোদ বা তর্জ্জনি যন্ত্রের' টীকা রচনা করেন।

গোপীনাথ—কেশব মিশ্র বিরচিত (.২৭৫) তর্কভাষা গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার। এঁর টীকার নাম উজ্জ্বলা।

গোপীনাথ আচার্য—'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে এক বা ততোধিক

গোপীনাথের উল্লেখ দেখা যায়। গোপীনাথ, গোপীনাথ পণ্ডিত, গোপীনাথ সিংহ, গোপীনাথ আচার্য। প্রথমোক্ত, গোপীনাথ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থের একজন হতে পারেন, অথবা অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারেন। তবে জানা যায় ইনি গোপীনাথ সিংহ নন। গোপীনাথ আচার্যের বাল্যকাল সম্বন্ধে বা এঁর নবদ্বীপ-লীলায় অংশগ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঈশ্বর-পুরীর নদীয়া আগমনকালে গোপীনাথ নদীয়ায় উপস্থিত ছিলেন। 'ভক্তি রত্নাকর' মতে "গোপীনাথ প্রভু লীলা দেখে নদীয়ায়। নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায়।' আবার মুকুন্দ এঁকে 'নবদ্বীপ বিলাস বিশেষজ্ঞ' বলে অভিহিত করেছেন। অদ্বৈতপ্রভু নীলাচলে গিয়ে গোপীনাথকে বলে-ছিলেন, "জানামি ভবন্তং বিশারদস্য জামাতরং"। গোপীনাথই প্রতাপরুদ্রের নিকট গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন বিশারদের জামাতা এবং বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং বহু শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচলে যাওয়ার পূর্ব থেকে গোপীনাথ সেখানে ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নীলাচলে যে বাঙালী-উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল গোপীনাথই ছিলেন তার প্রথম ভিত্তি-প্রস্তরবাহী।

মহাপ্রভু নীলাচলে পৌঁছলে গোপীনাথ আচার্য তাঁর আহার, বাসস্থান ও ভক্তবৃন্দের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। ইনিই বাসুদেব সার্বভৌমকে চৈতন্যানুরাগী করে তুলেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বার হলে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে গোপীনাথ তাঁর আয়োজন সম্পন্ন করে আলালনাথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। এবং সেখানে মহাপ্রভুকে আপনার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়ে বিদায় দেন। রাজদরবারে ও জগন্নাথ মন্দিরে গোপীনাথের যথেষ্ট প্রভাব ছিল মহাপ্রভুর গৌড়গমনকালে গোপীনাথ আচার্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ইনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন এবং নীলাচলে অবস্থান করছিলেন। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

গোপীনাথ চক্রবর্তী—এঁর রচিত গ্রন্থ 'কৌতুক সর্বস্ব'—অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ প্রহসন পুস্তক।

গোপীনাথ ঠক্কুর—ইনি ছিলেন মিথিলার মহাঠক্কুর ভবনাথের পুত্র এবং রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মণিসার ও 'তর্কভাষা ব্যাখ্যা। এঁর অভ্যুদয়কাল সম্ভবত' ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ।

গোপীনাথ দত্ত (বা নন্দী)—মহাভারতের দ্রোণ ও স্ত্রী পর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে সিলেট অঞ্চলে। গোপীনাথ পাঠকের নামে সভা-পর্ব পাওয়া গেছে। ডঃ সুকুমার সেন দুই

ভণিতা একই কবির বলে মনে করেন। গোপীনাথ দত্ত ভণিতায় এক কৃষ্ণলীলা কাব্যের দুটি পুঁথি পাওয়া গেছে। একটি 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড', অপরটি 'পারিজাত হরণ'। পুঁথি দুটি একই কাব্যের অংশ বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

গোপীনাথ পট্টনায়ক (বড় জেনা)—মহাপ্রভুর নীলাচল অনুচর রায় রামানন্দের পঞ্চম ভ্রাতা ও উড়িষ্যাবাসী। দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হন। গোপীনাথ প্রতাপ-রুদ্রদেবের 'রাজবিষয়ী' ছিলেন। সেজন্য 'মালজাটা' দণ্ডপাটে (বর্তমান মেদিনীপুর) এঁর অধিকার ছিল। সম্ভবতঃ ইনি 'বড়জানা' উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যাই হোক, রাজার নিকট এঁর দু'লক্ষ কাহন কোড়ি বাকি ছিল। এই বাকী কোড়ির জন্য গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু অবশেষে মহাপ্রভুর হস্তক্ষেপে এঁর জীবন রক্ষা পায়। ইনি মহাপ্রভুর অপার করুণা লাভ করে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এঁর অবস্থিতি-কাল ষোড়শ শতাব্দী।

গোপীনাথ, "পাঠক"—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কামতা রাজ শুক্ল ধ্বজের শ্রেষ্ঠ সভাকবি অনিরুদ্ধের পুত্র, এবং ভীমসেন কবি চূড়ামণির পৌত্র। ইনিও কামতা রাজসভায় পুরাণ পাঠক ছিলেন। ইনি ঐ সময় দ্রোণপর্ব অনুবাদ করেছিলেন।

গোপীনাথ বসু—পুরন্দর খাঁর অপর নাম। পুরন্দর খাঁ দ্র°।

গোপীনাথ সান্ন্যাল—ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত সলপের জমিদার কালীচরণ সান্ন্যালের পৌত্র ও গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র। এঁর কর্মকুশলতায় সলপের জমিদারী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সময় মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয় কাল। ময়মনসিং জেলায় এই সময় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে ইনি নাটোর সেনাপতি হয়ে গমন করেন এবং সমূলে বিদ্রোহ দমন করেন।

গোপীনাথ সিংহ—শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বচর। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে ঃ

"গোপীনাথ সিংহ—এক চৈতন্যের দাস।
অক্রুর বলি প্রভু যাঁরে কৈলা পরিহাস॥"

গোপীমোহন দেব—শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ দেবের পৌত্র ও রামসুন্দর দেবের পুত্র। রামসুন্দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবকৃষ্ণ গোপীমোহনকে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। এঁরই পুত্র স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। গোপীমোহন ১৮৩৬ সালে ৭৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

গোপীরমণ—কবি ও পদকর্তা। এঁর রচিত একটিমাত্র পদ 'পদকল্প-

তরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। উদ্ধবদাসের সংকলিত পদগ্রন্থে উল্লেখ আছে :

"শ্রীগোপীরমণ নাম ভগবান
গোকুল খ্যান ভক্তিগ্রন্থ কৈলা পরকাশ॥"

অন্য একটি পদ :

"মো যদি কখন ঘুমের আলসে
শুতিয়ে সে তনু লাগি
মোর অঙ্গ-জল বসনে মোছয়ে
রজনী পোহায় জাগি॥"

গোপীরমণ চক্রবর্তী—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি বর্তমান ছিলেন। এঁর জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মাতীরস্থ বুধরী গ্রাম। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শিষ্য ও একজন বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন। 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে এঁর উল্লেখ আছে।

গোপেন্দ্রনাথ গোস্বামী—অবস্থিতিকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। রচিত গ্রন্থ—'পাপদূত'। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কর্তৃক গৃহপ্রাঙ্গণের নিম্ববৃক্ষকে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট দূতরূপে প্রেরণের বর্ণনা।

গোবর্ধন—বঙ্গরাজের বিশেষ বিশ্বাসভাজন মহামন্ত্রী আদিদেবের পুত্র। গোবর্ধন শস্ত্র ও শাস্ত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের সভায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। গোবর্ধনের পুত্রই বিখ্যাত পণ্ডিত ও বর্মনরাজ হরিবর্মার মহাসন্ধি বিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন।

গোবর্ধন আচার্য—আচার্য গোবর্ধন সেনরাজসভার লক্ষ্মণসেনের পঞ্চ সভাকবির অন্যতম খ্যাতনামা কবি। ভারতবিখ্যাত কাব্য আর্যা-সপ্তশতী তাঁরই রচনা। এই কাব্য থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল নীলাম্বর। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আচার্য উপাধি লাভ করে ছিলেন। আর্যা ছন্দে রচিত সপ্তশতীর কিঞ্চিদধিক সাতশত শৃঙ্গার শ্লোক আছে। জয়দেব বলেছেন, ত্রুটিবিহীন শৃঙ্গার কাব্য রচনায় গোবর্ধনাচার্যের কোন তুলনা ছিল না। গোবর্ধনাচার্যের জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক বলে মনে করা হয়। হালের 'গাথাসপ্তশতী' এবং হিন্দী কবি বিহারীলালের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সৎসই' গোবর্ধনাচার্যের অনুকরণেই রচিত।

গোবর্ধন দত্ত বৈদ্য—চক্রপাণি দত্তের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা বা বন্ধু এবং অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী। এঁর প্রণীত গ্রন্থ : কৌমুদী, তন্ত্রপ্রদীপটীকা, ন্যায়সারাবলী, পরিভাষাবলী', রোগ-প্রদীপ এবং চিকিৎসালেশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থ। এঁর অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী।

গোবর্ধন দাস—পদকর্তারূপে একাধিক গোবর্ধন দাসের নাম পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব রঘুনাথ দাসের পিতা। ইনি বাংলার নবাবের একজন পরাক্রান্ত ইজারাদার ছিলেন। এঁর বার্ষিক আয় ছিল বার লক্ষ টাকা। ইনিও বৈষ্ণব হয়েছিলেন এবং যবন হরিদাসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা

করতেন। গোবর্ধন কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

গোবর্ধন দাস—(জয়পুরী)—ইনি ছিলেন জয়পুর নিবাসী, হয়ত প্রবাসী বাঙালী। এই গোবর্ধন দাস ছিলেন জয়পুরের গোকুলচন্দ্র বিগ্রহের প্রধান কীর্তনিয়া ও একজন পদকর্তা। ইনি ১৭০০ শকাব্দের লোক বলে বিখ্যাত। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

গোবর্ধন দাস (ভাণ্ডারী)—ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। ইনি সুচারু রূপে ভাণ্ডারীর কাজ সম্পন্ন করতেন। নরোত্তমবিলাস গ্রন্থে আছে :

"জয় শ্রী ভাণ্ডারী গোবর্ধন ভাগ্যবান।
যেঁহ সর্বমতে কার্য্য করে সমাধান॥"

ইনি কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী

গোবর্ধন "দ্বিজ"—"দ্বিজ" গোবর্ধনের নামে গদা পর্বের পুথি পাওয়া যায়। পুথির লিপিকাল ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। কবির পিতার নাম বা উপাধি কবিশেখর।

"নিবাস সান্তনপুর জগজনে খ্যাত
শ্রীকবিশেখর তাহে লোকে অবদাত।
তাহার তনয় নাম দ্বিজ গোবর্ধন
গদাপর্ব রচিলেক আনন্দিত মন॥"

গোবর্ধন ভট্ট—গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি আনুমানিক সপ্তদশ শক শতাব্দীতে "মধুকেলিবল্লী" রচনা করেন। এতে হোরিকালীলাই প্রধানতঃ বর্ণিত হয়েছে। ইনি 'শ্রীরূপ সনাতন স্তোত্র' নামে যে ৪৩ শ্লোকে স্তোত্র রচনা করেছেন, তাতে শ্রীরূপ সনাতনের জীবনই আলোচ্য বিষয়।

গোবর্ধন মিশ্র—বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাভ মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ছাত্র এবং মহাপণ্ডিত বলভদ্র মিশ্রের পুত্র। এঁর আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি 'তর্কভাষা প্রকাশ' রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

গোবিন্দ অবিদ্ধাকর—বঙ্গরাজ দেবপালের সময় ৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের এক বৌদ্ধ রাষ্ট্রকূট-সম্রাট প্রথম অমোঘবর্ষের সামন্ত শিলাহার বংশীয় কপর্দিনের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের কোঙ্কণ দেশে গমন করে তিনি সেখানে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণগিরি মহাবিহারে শ্রমণদের জন্য বিরাট উপাসনাশালা নির্মাণ করিয়ে দিয়ে ছিলেন। এবং একশত দ্রম্ম (মোহর) দান করেছিলেন, যার সুদ থেকে তাঁর মৃত্যুর পর সেখানকার ভিক্ষুগণ পরিচ্ছদ পাবেন।

গোবিন্দ অধিকারী—মুলতান বাসী প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পঞ্জাবীর শিষ্য।

গোবিন্দ আচার্য—গতি গোবিন্দ দ্র০।

গোবিন্দ কবিশেখর—সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে গোবিন্দ কবি শেখর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি। এঁর 'কিরাতপর্ব' এর পুথি কোচবিহার

রাজদরবারের সংগ্রহে রক্ষিত আছে। এতে মহারাজা বীরনারায়ণের (রাজত্ব কাল ১৬২৭-৩২) উল্লেখ আছে।

গোবিন্দ ঘোষ—বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। [বাসুঘোষ দ্রঃ]। ইনি ভাল কীর্তন গান করতেন। মহাপ্রভুর ইনি বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তৎকালে গৌরাঙ্গ-সঙ্গী হিসাবে গোবিন্দ ঘোষ সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচল গমন করে গোবিন্দ সম্প্রদায-কীর্তনাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর 'উদ্দণ্ড নৃত্যে'ও যোগদান করে ছিলেন। ইনি পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। ইনিও একজন পদকর্তা ছিলেন এঁর রচিত দশ বারটি পদ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

গোবিন্দ চক্রবর্তী—বাঙালী বৈষ্ণব পদকর্তা। ইনি বিখ্যাত গায়ক ও ভাক্তমান ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য ইনি অনেক স্থলে ভাবুক চক্রবর্তী নামেও প্রসিদ্ধ হন। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র—পাল রাজাদের সমসাময়িক বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ-জাত রাজা মানিকচন্দ্রের পুত্র। মাতার নাম ময়নামতী। এঁর অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কথিত আছে দৈবাচার্যগণ নাকি বলেছিলেন যে উনিশ বছর বয়সে রাজকুমারের রিষ্ট ছিল এবং যদি দ্বাদশ বর্ষ তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করে দেশত্যাগী হন, তবেই এই রিষ্ট কেটে যেতে পারে। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ময়নামতীই ছিলেন দেশের শাসনকর্ত্রী। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গোবিন্দচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করলে রাজ্ঞী ময়নামতীর আদেশে তাঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করতে হয়। ইনি গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্বে গোবিন্দচন্দ্র সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বিদায়কালে অদুনার বিলাপ করুণ রসের নির্ঝরস্বরূপ। তার চেয়েও করুণ রসাত্মক দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের দৃশ্য। তাঁর অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণে দেশময় যে শোকের উচ্ছ্বাস বয়েছিল তা অবলম্বন করে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বোম্বাই পর্যন্ত সমগ্র দেশেই অসংখ্য পল্লীগীতি রচিত হয়েছিল। ত্রিপুরা, উড়িষ্যা ও বোম্বাইতে প্রাচীনদের মুখে এখনো "বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র" গানের ছড়া শোনা যায়। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্মা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসের একটি চিত্র এঁকে গিয়েছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘরে ঘরে বঙ্গরাজ গোপীচন্দ্রের ত্যাগ-মূর্তি সমাদৃত হয়েছে। গোপীচন্দ্র বা

গোপীচাঁদ গোবিন্দচন্দ্র নামেরই রূপান্তর। মাতৃ আজ্ঞায় গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ও বার বছর বন গমন রামায়ণে বর্ণিত দশরথপুত্র রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের মতোই চিরন্তন হয়ে আছে।

একত্রিশ বছর বয়সে গোপীচন্দ্র রাজ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন। গোপীচন্দ্র উড়িষ্যার রাজা রাজেন্দ্র চোলকে পরাজিত করে ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী—মুঘল রাজত্বের মধ্যভাগে উচ্চপদস্থ বাঙালী কর্মচারী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুমারকুলি গ্রামে এঁর জন্ম। আরবী ও ফারসী ইনি খুব সুন্দররূপে শিক্ষা করেছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে ইনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করতে করতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার 'ক্রোড়িয়ান' অর্থাৎ প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদ লাভ করেন। দীর্ঘকাল ঐ পদে নিযুক্ত থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।

গোবিন্দ দত্ত—গিরীশ্বর দত্তের পুত্র। সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী চৈতন্য, বল্লভ ও বাসুদেব দত্তের আত্মীয়। ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত গায়ক ও কীর্তনিয়া। উড়িষ্যা যাবার সময় চৈতন্যদেব এঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইনি সর্বদা মহাপ্রভুর নিকট থেকে কীর্তন গানে তাঁকে মোহিত করতেন। ইনি নিজেও অনেকগুলি সুন্দর পদ রচনা করেছিলেন।

গোবিন্দ দাস—শ্রীচৈতন্যদেবের বিরাশি বছর পরে রাজসাহীর বুধরী গ্রামে বৈদ্যকুলে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পদমালা নামক পদসমূহের সংগ্রহ পুস্তকের প্রণেতা।

গোবিন্দ দাস—ইনি 'গরুড় পুরাণ' ও 'গীতাসার' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেছেন। এঁর সময়ে বৌদ্ধ প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোবিন্দ দাস—বৃহৎ 'কালিকা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যটি পাঁচ অংশে বিভক্ত। শেষ অংশে আছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। অপর চার অংশে আছে (১) বৃত্রাসুর-বধ ও দেবরাজ্যে দেবী মাহাত্ম্য প্রচার, (২) ইন্দ্রের অহল্যাহরণ-পাপভোগ ও দেবীর কৃপায় নিস্তার লাভ, (৩) চণ্ডী-সপ্তশতী অনুযায়ী মহিষাসুর-বধ ও শুম্ভনিশুম্ভ-বধ এবং (৪) বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান অর্থাৎ ভোজ রাজকন্যা ভানুমতীকে বিবাহ এবং তাল-বেতাল সিদ্ধি। কাব্যে রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে সর্বত্র। ভাষা সহজ; সরল ও মধুর। ছন্দের বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গান ব্রজবুলিতে লেখা। কবি একখানি 'মনসামঙ্গল' কাব্যও রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। কবি ছিলেন ভক্ত মানুষ। ইনি ছিলেন চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামনিবাসী। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এঁর কাব্যের প্রচার

সীমাবদ্ধ ছিল। গোবিন্দ দাস সুপণ্ডিত ছিলেন।

গোবিন্দ দ্বারপাল—প্রথমে ঈশ্বর পুরীর 'পরিচারক', 'কৃষ্ণভক্ত, সকল বিষয়ে বৈরাগ্যবশতঃ বিশুদ্ধ হৃদয়।' ইনি ছিলেন অব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। সিদ্ধি-প্রাপ্তকালে ঈশ্বর পুরী আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর (ঈশ্বর পুরীর) মৃত্যুর পর গোবিন্দ যেন নীলাচলে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। পুরীশ্বরের বাৎসল্য দেখে চৈতন্যপ্রভু এই 'শূদ্র-সেবক' গোবিন্দকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। 'গুরুর কিংকর' বলে তিনি স্বীয় সেবাকাযে গোবিন্দকে নিয়োজিত করতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু শেষে গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে 'অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।' গোবিন্দও 'শুদ্ধদাস্য'ভাবে ভাবিত হয়ে চৈতন্য পরিচর্যায় আত্ম-নিয়োগ করেন। গোবিন্দ ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। দাস-হিসাবে ইনি নিয়ত মহাপ্রভুর পাশে থেকে তাঁর সেবা করবার যে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, সে সৌভাগ্য আর কারুর হয়নি। মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস এঁকে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর 'দ্বারপাল' রূপে আখ্যাত করেছেন। মহাপ্রভু যখন কারুর উপর ক্রুদ্ধ হতেন তখন দ্বার-রক্ষার ভার গোবিন্দের উপর পড়ত। গোবিন্দ ছিলেন মহাপ্রভুর ছায়াস্বরূপ। মহাপ্রভু গৌড় গমন করলে গোবিন্দও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পর গোবিন্দ নীলাচল ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে গিয়ে অবস্থান করেন। রূপ-সনাতন প্রভৃতির সঙ্গে এঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। বৃন্দাবনে সবাই এঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ইনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

গোবিন্দ মাস্কক—একজন রসাচার্য। এঁর জীবিতকাল একাদশ শতাব্দী। রসেশ্বর সিদ্ধান্তে এঁর নাম আছে।

গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ—বাসুদেব সার্বভৌমের বংশোদ্ভব। এঁর পিতার নাম রামকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার। গোবিন্দ নবদ্বীপের একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন। সার্বভৌম হতে গোবিন্দ অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ। নবদ্বীপাধিপতি রাঘব রায় গোবিন্দকে ভূমি দান করেছিলেন (সন ১০৬৭ তারিখ ১১ ফাল্গুন)।

গোবিন্দ পাল—মদন পালের পর গোবিন্দ পাল নামে এক রাজা গয়ায় রাজত্ব করেন (আনুমানিক ১১৫৫ খ্রীঃ)। এঁরও পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি পদবী এবং গৌড়েশ্বর উপাধি ছিল। ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য বিনষ্ট হয়। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং একখানি বৌদ্ধ পুথিকে "শ্রীমদ্‌গোবিন্দ পালদেবানাং বিনষ্ট রাজ্যে অষ্ট ত্রিংশৎ সম্বৎসরে" এইরূপ কালজ্ঞাপক পদ পাওয়া যায়। এই গোবিন্দ পালই মগধের শেষ বৌদ্ধ রাজা।

গোবিন্দ বারুড়ী বা ভাদুড়ী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে রাজা চাঁদরায়ের দলে দস্যুবৃত্তি করতেন। চাঁদরায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হলে তাঁর দলবল সকলেই ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সঙ্গে গোবিন্দ ভাদুড়ীও নরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে মহাবৈষ্ণব হন।

গোবিন্দ ভকত—বৃন্দাবনবাসী মহাপ্রভুর ভক্ত। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তগণসহ যখন বিটঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীশ্রীগোপাল দর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন ইনিও তাঁর সঙ্গী ছিলেন।

গোবিন্দ ভট্ট—শ্রীনাথ ভট্ট কবিশার্দুলের পুত্র। এঁর অবস্থিতি-কাল চতুর্দশ শতাব্দী। এঁর বৈদ্যক গ্রন্থের নাম জানা যায় না। ইনি রামায়ণের এবং ভোজ প্রণীত রামায়ণ-চম্পূর টীকা প্রণয়ন করেছিলেন।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য—রুদ্র ন্যায়-বাচস্পতির একমাত্র পুত্র ও ছাত্র। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'পদ্যমুক্তাবলী।' কাব্যটিতে একশত শ্লোকে সম্রাট শাহজাহানের প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর প্রশস্তি বর্ণিত হয়েছে।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী—নবদ্বীপ সমাজের একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির নাম সমাসতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ববিবেকটীকা, মুক্তিবিবেচন প্রভৃতি। ইনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

গোবিন্দ মাণিক্য—ত্রিপুররাজ কল্যাণমাণিক্যের পুত্র গোবিন্দ-মাণিক্য। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ত্রিপুরার রাজতক্তে সমাসীন হন। তাঁর সঙ্গে আরাকানরাজ সন্দসুধর্মের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সম্রাট কুমার সাহ সুজার সঙ্গে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হন। গোবিন্দ মাণিক্য কুমিল্লায় "সুজা বাদশাহের মসজিদ" ও "সুজাগঞ্জ" নগর স্থাপন করে তাঁর স্মৃতি তর্পণ করেছিলেন।

গোবিন্দ মিশ্র—কোচবিহারের কামতারাজ মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজসভা পণ্ডিত। ইনি শ্রীমদ্ভাগবদ্‌-গীতার পদ পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

গোবিন্দ সার্বভৌম—রচিত গ্রন্থ 'তন্ত্রপ্রকাশ'। গ্রন্থখানি দীক্ষা, পুনশ্চরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও তারা এবং ত্রিপুরার পূজা বিষয়ক।

গোবিন্দ দাস কবিরাজ—ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যোত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে গোবিন্দ দাস জন্ম-গ্রহণ করেন।' তাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা এবং মাতামহ সংগীত-দামোদর গ্রন্থের বিখ্যাত গ্রন্থ-কর্তা শ্রীখণ্ড নিবাসী দামোদর। বিখ্যাত সংস্কৃত কবি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ ছিলেন গোবিন্দদাসের অগ্রজ। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ

হওয়ায় দুই ভাই মাতামহের বাড়ীতে লালিত পালিত হন। পরে পৈতৃক-নিবাস কুমার নগরে এবং আরও পরে তেলিয়া-বধুরী গ্রামে গিয়ে বাস করেন। গোবিন্দের স্ত্রী মহামায়া, এবং একমাত্র পুত্রের নাম দিব্য সিংহ। দিব্য সিংহের পুত্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজ সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন। মাতামহ দামোদরের প্রভাবে গোবিন্দদাস প্রথম বয়সে শাক্ত ছিলেন। কথিত আছে—দুরারোগ্য গ্রহণী পীড়া থেকে মুক্তি লাভের জন্য দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পরও তিনি ছাত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি বৈষ্ণব সমাজের প্রীতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন। প্রেম বিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, সাবাবলী, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দদাসের জীবনপ্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের সমসাময়িক। ইনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণব হয়ে গোবিন্দ দাস রাধাকৃষ্ণলীলাগীতি রচনা করে-ছিলেন। এর পূর্বেও তিনি পদ রচনা করতেন। ইনি বাংলায় কোন পদ রচনা করেছিলেন কিনা জানা যায় না। এঁর প্রায় সব পদই ব্রজবুলিতে লেখা, সামান্য কিছু সংস্কৃতে। বিদ্যাপতির কবিতা থেকেই গোবিন্দ দাসের কাব্য-প্রেরণা আসছিল। ভাব ও ভাষায় বিদ্যাপতির সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল আছে। এজন্য তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলে অভিহিত করা হয়। গোবিন্দ দাস সাধারণতঃ অভিসারের কবি হিসাবেই বিখ্যাত। বিদ্যাপতির কিছু কবিতায় গোবিন্দ দাসের ভণিতা দেখা যায়। বিদ্যাপতির নামে এগুলি প্রচলিত থাকলেও এগুলি গোবিন্দ দাসেরই বচন। পদ রচনা ছাড়া গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় 'সঙ্গীত মাধব' নামক নাটক এবং 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা করেন। বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে এর পত্র ব্যবহার হত। এরূপ একখানি পত্র 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। এর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব একে 'কবীন্দ্র' অর্থাৎ 'কবিরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। গোবিন্দ দাসের কাব্যকলার নিদর্শনস্বরূপ একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

'নন্দনন্দন—চন্দচন্দন—গন্ধনিন্দিত অঙ্গ
জলদ সুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দি সিন্ধুর
ভঙ্গ।
প্রেম-আকুল গোপ গোকুল কুলজ
কামিনী কান্ত।
কুসুমরঞ্জন মঞ্জুবঞ্জুল কুঞ্জমন্দির সন্ত।

গোবিন্দ দাস (কর্মকার ?)—বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাস কর্মকারের পুত্র। মাতার নাম মাধবী। কথিত আছে পত্নী

শশীমুখী কর্তৃক 'মূর্খ', 'নির্গুণ' প্রভৃতি দুর্বাক্যে তিরস্কৃত হয়ে গোবিন্দ মনো-দুঃখে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় এসে তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মহিমা-কথা শুনেন এবং নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর ভৃত্য পদ গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে তিনি নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে আসেন এবং নীলাচল থেকে দাক্ষিণাত্যেও যান। এই ভ্রমণ সময়ে গোবিন্দ মহাপ্রভুর জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেখে ছিলেন। উহাই 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামে খ্যাত। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের দিনলিপি আকারে লিখিত একমাত্র ঐতিহাসিক পরিচয়-রূপে গোবিন্দ দাসের কড়চা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। এই কড়চার মধ্যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নানা তথ্য পাওয়া যায়। গোবিন্দ দাস ও তাঁর কড়চার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ দেখা যায়।

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী—গোবিন্দদাস কবিরাজের সমসাময়িক ষোড়শ শতাব্দীর কবি। শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন এঁর গুরু। এঁর নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার বোরাকুলি গ্রামে। সুগভীর ভগবত প্রেমিকতার জন্য ইনি 'ভাবক চক্রবর্তী' নামে আখ্যাত হন। এঁর পত্নীর নাম ছিল সুচরিতা। রাজবল্লভ, রাধাবিনোদ এবং কিশোরী দাস নামে এঁর তিন পুত্র ছিলেন। গোবিন্দদাস চক্রবর্তী বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করতেন। 'গোবিন্দ দাস' এবং 'গোবিন্দদাসিয়া' ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি প্রায় সবই এঁর রচনা বলে অনুমিত হয়। বাংলায় রচিত এঁর অনেক উৎকৃষ্ট পদ গোবিন্দ দাসের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব। এঁর রচিত একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"নয়নে নয়নে মিলল কানু
উপজল কত রসের বান
ও রসসায়রে গোবিন্দ ডুবল
কি দিব উপমা তায় রে।"

গোবিন্দদাস বিশারদ—'ভৈষজ্য রত্নাবলী' প্রণেতা এবং সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর লোক। এঁর এক কড়চায় অর্থাৎ ক্রোড়পত্রে নানা প্রাচীন সংবাদ পাওয়া যায়।

গোবিন্দদাস সেন—শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভের পুত্র, 'পরিভাষা প্রদীপ' নামক বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

গোবিন্দদেব কবি—উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণব, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পরিবার ভুক্ত। ইনি অষ্টাদশ সর্গযুক্ত 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য রচনা করে চিরযশস্বী হয়েছেন।

গোবিন্দদেব চক্রবর্তী—মহা-রাজা রাজবল্লভের পুরোহিত। ইনি রাজবল্লভ কর্তৃক কাশীতে প্রেরিত হন এবং সেখানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদির

মন্ত্রপ্রকরণপদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষা করে গ্রন্থাদিসহ স্বদেশে ফিরে আসেন। গোবিন্দের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি বহুকাল পর্যন্ত প্রামাণিক বলে আদৃত হয়ে আসছে।

গোবিন্দদেব রায়, রাজা—ইনি হুগলীর বাঁশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ রাজা রঘুদেব রায়ের পুত্র। রাজা রঘুনাথ রায় এক নৈশযুদ্ধে মারাঠাদিগকে পরাস্ত করে ১৭৪০ সালে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর নিকট 'শূদ্রমণি' উপাধি লাভ করেন। তাঁর পুত্র গোবিন্দদেব ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ বিঘা জমি দান করে পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়—ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি। এঁর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী বলে অনুমিত হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ইনি ময়ূর ভট্টের পদ হতে সাহায্য নিয়েছিলেন। কবি গোবিন্দরামের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায়নি। ১০৭১ বঙ্গাব্দ (১৬৬৫ খ্রীঃ) তারিখযুক্ত ও কয়েকখানি পত্রযুক্ত একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে মাত্র।

গোবিন্দরাম মিত্র—১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতার ইংরেজ ফ্যাক্টরির গভর্ণর জব চার্ণকের নিকট কোম্পানী-সরকারে চাকরি গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র থেকে জানা যায়, ইনি অতিশয় দক্ষতা ও গৌরব সহকারে বহুকাল কাজ করে ছিলেন। ইনি কলকাতা দুর্গের নিকটবর্তী স্থান নিজ অধিকারভুক্ত করে তথায় স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। এঁরই নামানুসারে গোবিন্দপুরের নামকরণ হয়। ইনি "Mayor of Calcutta" এই নামে অভিহিত হতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণকালে এঁকে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করতে দেখে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা এঁকে উদ্ধার করে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রদান করেন।

ইনি অত্যন্ত দুর্দান্ত ব্যক্তি ছিলেন। লোকে বলত এঁর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন। ইনি যথেষ্ট ধনরত্ন সঞ্চয় করেছিলেন। এখনো চিৎপুর রোডে কুমারটুলী পল্লীতে এঁর প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দির বর্তমান। এই মন্দিরের চূড়া নাকি অক্টারলোনী মনুমেণ্ট অপেক্ষা উচ্চ ছিল। মন্দিরের উচ্চতা ছিল ১৬৫ ফিটেরও উপর। ১৭৩০ সালের ঝড়ে এই চূড়াটি ভেঙে পড়ে।

গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ—ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রামনিবাসী। এঁর রচিত গ্রন্থ "ধীররঞ্জিকা" নামক উৎকৃষ্ট কুমারসম্ভব টীকা (১৭৪১ খ্রীঃ), মহিমস্তোত্র টীকা (১৬৪২ শক), চণ্ডী (১৬৪৮ শক)।

গোবিন্দানন্দ—তাঁর গ্রন্থের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন বাগড়ি (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ব্যাঘ্রতটী) নিবাসী গণপতি ভট্টের পুত্র। গোবিন্দানন্দের উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কনাচার্য'। পণ্ডিতদের মতে গোবিন্দানন্দের জীবনকাল ছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে। গোবিন্দানন্দের রচিত গ্রন্থগুলি: (১) দানক্রিয়াকৌমুদী, (২) শুদ্ধিকৌমুদী, (৩) শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, (৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, (৫) তত্ত্বার্থ-কৌমুদী (৬) অর্থকৌমুদী। গোবিন্দানন্দ শূলপাণির 'শ্রাদ্ধ বিবেকের উপরেও একখানি টীকা লিখেছিলেন।

গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তী—চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। এঁর আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। এর নিবাস ছিল নবদ্বীপ। ইনি চণ্ডীদাসের আদর্শে কতকগুলি পদ রচনা করেছিলেন।

গোমুখ নাথ—নাথপন্থী সম্প্রদায়ের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ ও গুরু।

গোয়ী দেবী—শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের মাতাঠাকুরানী। স্বামীর নাম শ্রীনারায়ণ সরকার। এঁর তিনপুত্র—মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি।

গোরক্ষনাথ—নাথসম্প্রদায়ের গুরু এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। গোরক্ষ-নাথের শিষ্যসম্প্রদায় নাথ, যোগী, গোরক্ষনাথী, দর্শনী, কানফাটা, সিদ্ধ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত, সাধারণতঃ এঁরা 'যোগী' নামেই অভিহিত হন। এঁর জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত। গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে এঁকে 'ঈশ্বরসন্তান' বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ কবীরাদির ন্যায় কোন অখ্যাতনামা বংশে গোরক্ষনাথের জন্ম হওয়ায় এঁর জন্মবৃত্তান্ত অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। তথাপি এঁর চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র, এঁর চরিত্র মাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক্‌-নির্দেশক স্তম্ভ।

রানী ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে গোরক্ষনাথ বিদ্যমান ছিলেন। এঁকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতে এক সময় যে প্রবল ধর্মান্দোলন প্রবর্তিত হয় তার ফলে ভারতের প্রায় সর্বত্র গোরক্ষপন্থী মঠ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয় ও গোরক্ষনাথ কর্তৃক পুনঃপ্রচারিত নাথধর্ম 'নাথপন্থ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নেপালে সংস্কার আছে যে নাথেরা বৌদ্ধ, কিন্তু গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ-মত ত্যাগ করে শৈবমত গ্রহণ করে-ছিলেন। এঁর বৌদ্ধ নাম 'রমণবজ্র' বা 'অনঙ্গবজ্র'। নাথেরা যে বাংলা বা পূর্বভারতের লোক, তার প্রমাণ মীননাথের খাঁটি বাংলা পদ ও গোরক্ষ নাথের লীলাক্ষেত্র বাংলায় অধিক। বাংলাদেশের গীতি-সাহিত্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ গোরক্ষনাথ ও এঁর শিষ্য-

সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে পুষ্টিলাভ করে। 'চর্য্যাপদ ও দোহাকোষ'গুলিতেও গোরক্ষ-প্রচারিত যোগধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'গোরক্ষ-সংহিতা' 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত' ইত্যাদি পুস্তক গোরক্ষের নামেই প্রচলিত।

গোরাই কাজী—চাঁদকাজীর জনৈক কর্মচারী। ইনি নাকি হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করে প্রসিদ্ধ হন।

গোলকচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি—১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরের অন্তর্গত হন্তপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর কলাপ ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। দশ কর্মজ্ঞ পণ্ডিত বলেও এঁর খ্যাতি ছিল।

গোলকনাথ ন্যায়রত্ন—তাঁর চরিতকারের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরাম শিরোমণির নিকট পাঠ সমাপ্ত করে তিনি এক বৃহৎ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা বন্যায় ভেসে যায়। পরে শান্তিপুরের শিবচন্দ্রবাবু নতুন চতুষ্পাঠী করে দেন। অতি সত্বর ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা শুনে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিভাশালী ছাত্রমণ্ডলী তাঁর চতুষ্পাঠীতে যোগদান করেন। নদীয়ার সদর আমীন বিখ্যাত রামলোচন ঘোষের চেষ্টায় তিনি বিক্রমপুর সমাজে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানকার মহারথিগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে জয়ী হয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের দেবীপুরে এক বিচার সভায় শ্রীরাম শিরোমণি ও মাধব সিদ্ধান্ত তাঁর নিকট পরাভূত হয়েছিলেন। কলকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মহাসভায় পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী পরমহংস জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে গোলকনাথের পরম সাফল্য ও দেবভাষায় বক্তৃতা শক্তি তাঁকে 'জগদ্বিখ্যাত' করে তুলেছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গোলকনাথ বসন্ত রোগে দেহত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁর টোলে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০। নবদ্বীপের ইতিহাসে একমাত্র শঙ্কর তর্কবাগীশ ছাড়া অন্য কোন নৈয়ায়িকের এত ছাত্র ছিল না। গোলকের সকল ছাত্রই প্রবীণ ও চরম পর্যায়ের শিক্ষার্থী। ছাত্রসর্বস্ব গোলকনাথ নাকি গঙ্গাতীরস্থ হয়ে শেষ মুহূর্তে রামনামের পরিবর্তে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনবার আওড়াও, আওড়াও আওড়াও' উচ্চারণ করেছিলেন। গোলকনাথ বাল্যকাল থেকেই লিপিকুশল ছিলেন এবং তাঁর স্বহস্ত-লিখিত নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুলিপি নবদ্বীপে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে শঙ্করভাষ্য, বৈয়াকরণভূষণসার ও সংখ্যাসূত্রবৃত্তি উল্লেখযোগ্য।

গোলকনাথ শর্মা বা **গোলকনাথ মুখোপাধ্যায়**—বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত

মহীপালদীঘির কাছাকাছি কোনোও স্থানে তাঁর নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মিশনারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইনি ছিলেন কেরীর সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক। কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করে শ্রীরামপুরে আসেন, তখন গোলকনাথও তাঁর সঙ্গে এসে ছিলেন। টমাসের নির্দেশে গোলক নাথ ১৭৯৫ সালে সংস্কৃত গল্প-গ্রন্থ 'হিতোপদেশে'র বাংলা অনুবাদ করেন। ১৮০১ সালে উহা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কয়েকটি গল্প ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছিল। ১৮০৩ সালে গোলকনাথের মৃত্যু হয়।

গোলাম হোসেন খাঁ—মালদহের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' নামক বঙ্গদেশের একখানা ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ ১৭৮৩ সালে শেষ হয়।

গোলাম হোসেন খাঁ তবতবা, সৈয়দ—বাংলার মুসলমান রাজত্বের শেষভাগের একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী। ইনি কিছুকাল বাংলার নবাব মীর কাশিমের অধীনে কাজ করেন। মীর কাশিমের পতনের পর কিছুকাল ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে কাজ করেছিলেন। ইনি 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষারিণ' নামে একখানি প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গোসাঁই গোরাচাঁদ—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি, রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক। এঁর রচিত 'শ্রীশ্রীসংকীর্তন বন্দনা' নামক পাঁচালী পুঁথি ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোকাম ভূষণা নগরে সমাপ্ত হয়। ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অপূর্ব ভক্তিগ্রন্থ। খুলনা জেলার সোনাই নদীর কূলে কলাগাছি বা কেড়াগাছি গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে এঁর জন্ম হয়। সাধক যাদবেন্দ্র ঘোষ বা শ্রীযাদবানন্দ ছিলেন গোরাচাঁদের গুরু। পরে ইনি ভূষণার গোপীনাথের আখড়ার মোহন্ত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন অদ্বৈত-বংশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ভূষণা থেকে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘোপের ঘাট গ্রামে গোরাচাঁদের নিবাস ছিল।

গোসাঞি ভট্টাচার্য—বাংলার বারভূঞার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঞা কেদার রায়ের গুরু। ইনি সিদ্ধ শ্রোত্রিয় কুলোদ্ভব, তৎকাল প্রচলিত বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে নানা আশ্চর্য ও অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গোসাঞি ভট্টাচার্যের প্রকৃত নাম ছিল রত্নগর্ভ। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

গৌড়—ভোজ বংশীয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩০ অব্দে বর্তমান মালদহ জেলায় গৌড় নামে একটি নগর পত্তন করে এঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

গৌড়-গোবিন্দ—চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়, লাউড় ও

জয়ন্তীয়া, এই তিন অংশে বিভক্ত ছিল শ্রীহট্ট। উহার গৌড় অংশের রাজা ছিলেন গোবিন্দ। এই জন্য সেই রাজাকে বলা হত গৌড়-গোবিন্দ। হিন্দুরাজা গৌড়-গোবিন্দ গো-বধ নিবারণের জন্য জনৈক মুসলমানের ওপর অত্যাচার করলে সেই কথা দিল্লীতে পৌছায়। এবং শাহ জালাল নামক এক দরবেশ গৌড়ে আসেন। তখন বঙ্গের স্বাধীন রাজা ছিলেন সামসুদ্দিন ইলিযাস শাহ্। তাঁর পুত্র সেকন্দর ছিলেন শ্রীহট্টের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা। শাহ্ জালাল শ্রীহট্টে এসে নানা অলৌকিক ও ভৌতিক ব্যাপার সম্পাদন করে এক প্রকার বিনা রক্তপাতে গৌড-গোবিন্দকে পরাজিত করে রাজ্য অধিকার করেন এবং উহা নিজে গ্রহণ না করে সেকন্দর শাহকে দেন। গৌড়-গোবিন্দই শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা।

গৌড়পাদ—প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের পরম গুরু বা গুরুর গুরু। গৌড়ের অধিবাসী বলেই বোধ হয় তাঁকে এইরূপ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। সুরেশ্বরাচার্যের সাক্ষ্য অনুসারে গৌড়পাদের জন্মস্থান বঙ্গ দেশ। এঁর রচিত 'গৌড়পাদ কারিক'ায় ইনি গৌড়াচার্য বলেও উল্লিখিত হয়েছেন। গৌড়পাদ কারিকার রচনা-কাল আনুমানিক ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর সর্বাপেক্ষা সুবিদিত আগম-শাস্ত্র 'গৌড় পাদ কারিকা' নামে পরিচিত। এই কারিকার দার্শনিক মতবাদ প্রাক্ শঙ্কর বৈদান্তিক মত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদের সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ ও সাঙ্গীকরণ। সমগ্র গ্রন্থে ২১৫টি শ্লোক আছে।

উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও গৌড়পাদ আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—একটি ঈশ্বর কৃষ্ণের 'সাংখ্য কারিকা'র টীকা ও অপরটি 'উত্তর গীতা'।

গৌড় পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী—অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা বঙ্গীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত। রচিত গ্রন্থ—তত্ত্বমুক্তাবলী বা মাযাবাদ শতদূষণী, যোগবাশিষ্টসারটীকা ও শতদূষণী-যামুন।

গৌড় ব্রহ্মানন্দ—ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী দ্র°

গৌড় মল্লিক—গৌড়ের (বাংলার) নবাব হোসেন শাহের সেনাপতি। স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা ধনমাণিক্য চট্টগ্রাম থেকে মুসলমানদেব বিতাড়িত করে উক্ত অঞ্চল স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন। নবাব হোসেন শাহ সেনাপতি গৌড় মল্লিককে চট্টগ্রাম অঞ্চল জয় করবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ত্রিপুর বাহিনীর বুদ্ধি কৌশলে তাঁর অধিকাংশ সৈন্য কুমিল্লার নিকটবর্তী গোমতী নদীর খর-স্রোতে প্রাণ হারায়। অবশিষ্ট সৈন্য-সহ স্বয়ং সেনাপতি গৌড় মল্লিক অতি কষ্টে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করেন।

গৌড়ীয় শঙ্কর—শঙ্কর আগমাচার্য নামেও পরিচিত। শঙ্করের পিতার নাম কমলা কর, পিতামহ লম্বোদর।

শঙ্কর রচিত গ্রন্থ 'তারারহস্যবৃত্তি'। ইহা ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। এতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি সাধারণভাবে এবং তারা উপাসনার উপযোগী আচারাদি বিশেষভাবে বিবৃত আছে। শিবার্চন-মহারত্ন, শৈবরত্ন, কুলমূলাবতার, ক্রমস্তব প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও শঙ্করের নামাঙ্কিত।

গৌর দাস—একজন পদকর্তা। এঁর একটি পদের ভণিতায় আছে: "কহে যদুনন্দন দাসক দাস। গৌর দাস তহিঁ করু আশোয়াস।" এই থেকে অনুমিত হয় যে, ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্তা যদুনন্দন ঠাকুরের জনৈক ভক্ত ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিদ্যমান ছিলেন। গৌরদাসের পাঁচটি পদ 'পদ-কল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। চারটি পদ ব্রজবুলিতে লেখা।

গৌরস্বামী—একজন বাঙালী সন্ন্যাসী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৌরাষ্ট্র দেশে আবির্ভূত হয়ে বহু সিন্ধী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটি প্রভৃতি শিষ্য করেছিলেন।

গৌরগণ দাস—শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য। ইনি ব্রজভাষায় 'শ্রীগৌরাঙ্গভূষণ মঞ্জাবলী' নামে এক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন।

গৌর গুণানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের সরকারঠাকুর বংশীয়। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

গৌরগোপাল শিরোমণি—অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'কাকদূত'। বিরহিণী রাধা কর্তৃক একটি কাককে কৃষ্ণের নিকট দূতরূপে প্রেরণের বর্ণনা।

গৌরমোহন বা গৌরীমোহন দাস—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। 'পদকল্পলতিকা' নামে ইনি একখানি পদাবলী গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। সংকলনটি ছোট হলেও মূল্যবান।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—নাম 'স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক'। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ 'কবিতামৃতকূপ'।

গৌরসুন্দর দাস—'সঙ্কীর্তনানন্দ' বা 'কীর্তনানন্দ' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। ইনি বৈষ্ণবদাসের সমসাময়িক অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

কীর্তনানন্দে প্রায় ষাটজন কবির লেখা ছয়শত একান্নটি পদ আছে। তার মধ্যে অনেকগুলি 'পদকল্পতরু'তে পাওয়া যায় না।

গৌরহরি দাস—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ইনি চাণক্য শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

গৌরাঙ্গ দাস—গৌরাঙ্গ দাস রচিত ভাগবতের একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে। ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ

শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি।

গৌ রা ঙ্গ দা সী—শ্যা মা ন ন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী।

গৌরাঙ্গ 'দ্বিজ'—এঁর রচিত কাব্যের নাম 'গঙ্গামঙ্গল'। ইনি ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয়, নিবাস কাষ্ঠশালী গ্রাম। কবি ছিলেন রামভক্ত, তাই সংক্ষেপে রামকাহিনী দিয়া কাব্য শেষ করেছেন। কাব্যটি রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

গৌরাঙ্গ প্রিয়া—ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী। এঁর পিতা রাঘব চক্রবর্তী রাঢ় দেশের গোপালপুরনিবাসী বিপ্র ছিলেন. গৌরাঙ্গপ্রিয়ার বাল্য নাম ছিল পদ্মাবতী। শ্রীনিবাসের সঙ্গে এঁর বিবাহের পর শ্রীনিবাস এঁকে দীক্ষা দিয়ে এঁর নাম রাখেন গৌরাঙ্গ প্রিয়া। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

গৌরাঙ্গ সিংহ—এঁর সময় থেকেই কান্দী রাজপরিবারের নাম বিখ্যাত হয়। জন্ম হয় ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। পারসী ভাষা ও ভূমিরাজস্ব বিষয়েও গৌরাঙ্গের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তিনি ডাহাপাড়ায় কানুনগো মহাশয়দের অধীনে কায করতে আরম্ভ করেন। ইনি বহু অর্থ উপার্জন করে প্রচুর জমি ক্রয় করেন। ইনি কার্যে উন্নতি দেখিয়ে সম্রাট সাহ আলমের নিকট থেকে "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন।

গৌরী সেন—অসামান্য দানের জন্য তিন শতাধিক বছর ধরে গৌরী সেনের নাম বাংলা দেশে প্রবাদ বাক্যের মতো সুপ্রচলিত আছে। তাঁকে উপলক্ষ করেই "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি হয়েছে। এই প্রখ্যাত গৌরী সেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষে হুগলা শহরের অন্তর্গত বালি নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম গৌরীশঙ্কর সেন। জাতিতে তিনি ছিলেন সুবর্ণ বণিক। তাঁর পূর্বপুরুষ পুরন্দর সেন সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং সেখানেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। সপ্তগ্রামের পতনের পর পুরন্দরের অধস্তন বংশধর হলধর সেন হুগলীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। হলধরের প্রপৌত্র ছিলেন অনিরুদ্ধ সেন, অনিরুদ্ধের পুত্র নন্দরাম এবং নন্দরামের পুত্রই গৌরী সেন। নন্দরাম ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনি পুত্রের জন্য বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। গৌরী সেন সামান্য মূলধন নিয়ে তাঁদের বংশগত প্রথানুযায়ী আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং অতি সামান্য অবস্থা থেকে সাধুতা ও প্রখর বুদ্ধিবলে প্রভূত ধনসঞ্চয় করে অসাধারণ দানের জন্য বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জনশ্রুতি আছে যে শিবের কৃপায় নাকি গৌরী সেন বিরাট ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। যাইহোক, তাঁর সঞ্চিত সেই অগাধ অর্থ তিনি অকাতরে দীন-

দুঃখী-আতুর-অনাথদের মধ্যে দু'হাতে দান করতেন। যে-কোন ব্যক্তি অভাব-গ্রস্ত হয়ে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলেই তিনি তার দুঃখমোচন করতেন। লোকের কোন কাজে অর্থাভাব ঘটলে তাদের ভরসা ছিল যে গৌরী সেনের কাছে গেলেই প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাবে। যে-কোন জনহিতকর কার্য অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ থাকলে গৌরী সেন তা অর্থ দিয়ে সম্পূর্ণ করাতেন। তাই অর্থের সংগ্রহ না করেই তখন কেউ কোন কাজ আরম্ভ করত না, কারণ সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।" তিনি যে "গৌরীশঙ্কর মন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন তা আজও হুগলীতে বিদ্যমান। মন্দিরগাত্রে লেখা আছে "গৌরী সেন। বাংলা সন ১০০৬ সাল। ইংরাজি সন ১৫৯৯ সাল।" আনুমানিক ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গৌরী সেন ইহলোক ত্যাগ করেন। এঁর বংশধররা এখনো বিদ্যমান।

গৌরীকান্ত দাস বা কালিকা-প্রসাদ দাস—এঁর জন্ম হয় বৈদ্য পরিবারে। এঁর নিবাস ছিল কলকাতার অন্তর্গত প্রাচীন সুতানুটী গ্রামে এবং এঁর পিতার নাম ছিল মানিকরাম দাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি গৌরীকান্ত কবি ভারত চন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরের" আদর্শে "চন্দ্রকান্ত" কাব্য প্রণয়ন করেন। এঁর এই গ্রন্থ রচনার উৎসাহদাতা ছিলেন দেবী-চরণ নামক এক ব্যক্তি। "চন্দ্রকান্ত" গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের বিকৃত আদর্শের পরিচয় থাকলেও রচনা মাধুর্যে এক সময় এই গ্রন্থ প্রায় "বিদ্যাসুন্দর" গ্রন্থের স্থান অধিকার করেছিল।

গৌরীকান্ত, দ্বিজ—মহাস্থানের কবিতা রচয়িতা। বগুড়া জেলার অন্তর্গত ঝাড়ুলি গ্রামে এঁর নিবাস ছিল।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। রাজা রামমোহন রায় যখন রংপুর থেকে প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করতে থাকেন, তখন রংপুর জজ আদালতের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর বিরোধিতা করে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে এক পুস্তক রচনা করেন।

গৌরীকান্ত সার্বভৌম—তাঁর রচিত 'ভাবার্থদীপিকা' তর্কভাষার সর্বোৎকৃষ্ট টীকা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহা বিশেষ প্রচারিত ছিল। এক তাঞ্জোরেই গৌরীকান্তটীকার আঠারটি অনুলিপি আছে। গৌরীকান্ত দীক্ষাগুরু বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর ও বিদ্যাগুরু রামভদ্রের বন্দনা করেছেন। তিনি গোবর্ধনের ব্যাখ্যা 'গোবুদ্ধি' বলে খণ্ডন করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি কাশীতে বাস করতেন এবং তাঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। গৌরীকান্ত রচিত গ্রন্থরাজি— (১) বৈশেষিকভাষ্য বিবরণ, (২) মনিদীধিতি

বিবেচন, (৩) সদয়ুক্তি মুক্তাবলী (লিপিকাল ১৬৪২ খ্রীঃ), (৪) আনন্দ-লহরীতরি, (৫) বিদগ্ধমুখ মণ্ডনবীটিকা ইত্যাদি।

গৌরীদাস কীর্তনীয়া—বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে :

"গৌরীদাস কীর্তনীয়ায় কেশেতে
ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইল নিজশক্তি
দিয়া॥"

গৌরীদাস কীর্তনীয়া একজন পদ-কর্তাও ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

গৌরীদাস পণ্ডিত—নবদ্বীপের অদূববর্তী শালিগ্রাম নিবাসী, নিত্যানন্দ প্রভুর খুড়-শ্বশুর। 'সুবল মঙ্গলে'র বর্ণানুযায়ী গৌরীদাসের পিতার নাম কংসারি মিশ্র এবং মাতার নাম কমলা। এবং গৌরীদাসেরা ছ' ভাই। জ্যেষ্ঠ সূর্যদাস অনুজ কৃষ্ণদাস। 'প্রেম-বিলাস' মতে গৌরীদাস নিত্যানন্দের আজ্ঞাক্রমে শালিগ্রাম থেকে অম্বিকায় আসেন। 'ভক্তিরত্নাকর' থেকে জানা যায় যে ইনি এঁব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যদাসেব সম্মতি গ্রহণ করে অম্বিকায় বাস করেন। 'ভক্তি রত্নাকর' থেকে আরও জানা যায় যে একবার গৌরাঙ্গ শান্তিপুর থেকে প্রত্যাবর্তন-পথে হরিনদী গ্রামে নৌকায় চড়ে গঙ্গাপারে অম্বিকায় গমন করেন। যাবার সময় তিনি নৌকা থেকে একটি 'বৈঠা' সংগ্রহ করে নিয়ে যান এবং অম্বিকায় গৌরী-দাস পণ্ডিতের হাতে প্রদান করে বলেন :

"এই লহ বৈঠা—এবে দিলাম তোমায়॥
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।"

এই বলে তিনি পণ্ডিতকে নিয়ে নদীয়ায় গমন করেন এবং সেখানে তিনি 'পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত'। গৌরীদাস প্রভুপ্রদত্ত ও প্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত 'গীতাখানি' নিয়ে অম্বিকায় ফিরে এসে নির্জন নদীতীরে গৌরাঙ্গ আরাধনায় তন্ময় হয়ে যান। ঐ 'বৈঠা' ও 'গীতা' নাকি আজও অম্বিকা-পটে বক্ষিত আছে। গৌরী-দাসই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবা-পূজার প্রবর্তন করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌরীদাস মধ্যে মধ্যে নীলাচল যেতেন। অদ্বৈতপ্রভুর তিরোধানেব সময় গৌরীদাস শান্তিপুরে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। জয়ানন্দ 'গৌবীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী' ও 'তাঁহার সঙ্গীত প্রবন্ধে'র কথা বলেছেন। ডাঃ সুকুমাব সেন বলেন, "গৌরীদাস পণ্ডিতের রচিত একটিমাত্র নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে।" গৌরীদাস পণ্ডিতের স্ত্রীর নাম বিমলা দেবী এবং দুই পুত্রের নাম বড়ু বলরাম ও রঘুনাথ। হৃদয়ানন্দ ছিলেন গৌরী-দাসের শিষ্য। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে গৌরীদাস বিদ্যমান ছিলেন।

গৌরীনারায়ণ—সোনাগিরিপাল বা গৌরীনারায়ণ দ্র°।

গৌরীবর বিদ্যালঙ্কার—অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবদ্বীপের একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত।

গৌরীমোহন দাস—রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে বহু কবির প্রায় সাড়ে তিনশত পদ সংগ্রহ করে 'পদকল্প-লতিকা' নামে এক সংকলন গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ—১৭৯৯ সালে শ্রীহট্ট জেলার ইটা পরগণার পাঁচগাও নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য। সাধারণভাবে এঁকে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য বলা হত। নবদ্বীপে এসে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তর্কবাগীশ উপাধি লাভ করেন। রাজা রামমোহন যখন সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার কাজে ব্রতী ছিলেন, সেই সময় গৌরীশঙ্কর কলকাতায় এসে ঐসব কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইনি রামমোহন রায় সম্পাদিত 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', প্রেমচাঁদ রায়ের 'সংবাদ সুধাকর' ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ১৮৩৯ সাল থেকে গৌরীশঙ্কর নিজেই 'সংবাদ ভাস্কর' প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। গৌরীশঙ্কর নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, অপক্ষপাতী সম্পাদক ছিলেন। ইনি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে সরকারেরও সমালোচনা করতেন। সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন বলে প্রাচীনপন্থীরা এঁকে সহ্য করতে পারত না। স্পষ্টবাদীতার জন্য এঁকে কয়েক বার কারাগারে যেতে হয়েছে। ইনি সম্বাদ 'রসরাজ' (১৮৩৯) নামে আর একখানি পত্রিকাও বার করেন। পরে রসরাজ বন্ধ করে 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' নামে আর এক পত্রিকা বার করেন। এঁর রচিত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবদগীতার বঙ্গানুবাদ, জ্ঞান-প্রদীপ, ভূগোলসার, পাকরাজেশ্বর, নীতিরত্ন, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি।

গ্রহণকুণ্ড—ইনি বাংলার রামপাল রাজার সময়ে (১১০৬ খ্রীঃ) নালন্দায় অবস্থান করে মগধ বিষয়ে 'ভট্টারিকা প্রজ্ঞা পারমিতা' নামক একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

গ্রাঁপ্রে—ইনি ছিলেন একজন ফরাসী কর্মচারী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইনি কলকাতায় এসেছিলেন। ইনি বহু জ্ঞাতব্যপূর্ণ একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখে গিয়েছেন।

গ্রোস—ইংরেজ পরিব্রাজক। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'Travels of the East Indies' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ঘ

ঘনরাম চক্রবর্তী—ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও খ্যাতিমান কবি। কাব্যের ভণিতা থেকে ঘনরামের আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহ ধনঞ্জয়। মাতা সীতাদেবী ছিলেন রাজবংশ-সম্ভূত। মাতামহ রায়না-নিবাসী গঙ্গাহরি। ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। তিনি কাব্যমধ্যে কীর্তিচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করেছেন। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ ঘনরামের কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। কবি ছিলেন রামভক্ত এবং রামায়ণ গায়ক। কিন্তু স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর রচনাই প্রথম বহুল প্রচারিত ধর্মমঙ্গলকাব্য। তাঁর গুরুর নাম খুব সম্ভব শ্রীরামদাস। তরুণ বয়সেই তাঁর গুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ, ঘনরামই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম ও প্রধান কবি। ঘনরামের কাব্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যতাহীনতা। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যকলার অনুযায়ী অনুপ্রাসের ঘটা আছে। বেশীর ভাগ দ্বিতীয় চরণেই অনুপ্রাস দেখা যায়। কাব্যের সর্বত্র ঘনরামের উদারচিত্ততার পরিচয় আছে। তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় দেশাত্মবোধের আকুতি, "রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।" বেদ-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রে কবি ছিলেন বিশেষ পারঙ্গম। তাই নিতান্ত লোক-জীবন-সম্ভব লৌকিক কাহিনীর মধ্যে তিনি বেদ-পুরাণ-কথার বর্ণাঢ্য সুষমা বিস্তার করেছেন। সব দিক থেকে বিচার করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঘনরামের যথার্থ মহিমা কেবল ধর্ম-মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই নয়,—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-পৌরাণিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক-বাহক উদ্গাতারূপেও। তিনি পৌরাণিক নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায় উপেক্ষিত লোককাব্যকে পুরাণ-কথার মর্যাদা দান করছেন। ধর্মমঙ্গলের ইতিহাসে তাঁর দান অনস্বীকার্য। ঘনরাম একটি সত্যনারায়ণ-পাঁচালীও লিখেছিলেন। পাঁচালীটির নাম 'সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু'।

ঘনরাম দাস—একজন পদকর্তা। এঁর রচিত চোদ্দটি পদ পাওয়া গেছে।

ঘনশ্যাম—এঁর রচিত কাব্য কখনো 'হরিবংশ', কখনো 'ব্রহ্মবৈবর্ত', কখনো বা 'ভাগবত' এবং ক্বচিৎ 'কৃষ্ণসংকীর্তন' নামে উল্লিখিত হয়েছে। কাব্যের বিষয়বস্তু প্রধানত এই তিন পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। শেষের ভণিতায় কবির নামটি পাওয়া যায়ঃ

"বিরচিল ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
শঙ্খঘণ্টা হরিধ্বনি কর সর্ব নর॥"

কাব্য মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর" "কিঙ্কর", অথবা "কিঙ্কর দ্বিজ" ভণিতা পাওয়া যায়। ঘনশ্যাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি।

ঘনশ্যাম আচার্য—অদ্বৈতাচার্যের ভাগিনেয়, মাধবাচার্যের পুত্র। নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ইনি পরম বৈষ্ণব ও পিতৃভক্ত ছিলেন।

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী বা নরহরি দাস—এঁর পিতার নাম জগন্নাথ। জানা যায় পিতা-পুত্র উভয়েই নাকি সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। ঘনশ্যাম সম্ভবতঃ নদীয়ায় গঙ্গাতীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে ইনি হয়ত কাটোয়ায় বাস করতেন। 'ভক্তি রত্নাকর', 'শ্রীনরোত্তমবিলাস,' 'শ্রীনিবাসচরিত' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ঘনশ্যাম রচনা করেছিলেন। ইনি একজন পদকর্তাও। এঁর আবির্ভাব-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

ঘনশ্যাম দাস—গোবিন্দ দাস কবিরাজের পৌত্র দিব্যসিংহের পুত্র এবং শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গোবিন্দ-গতির (নামান্তর গতিগোবিন্দ) শিষ্য। ইনি একজন পদকর্তা। ইনি 'গোবিন্দ রতিমঞ্জরী' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি বৈষ্ণব রসালঙ্কার বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেন। এই গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙালী কবির সংস্কৃত কাব্য রচনার একটি বিশেষ নিদর্শন। কাব্যাত্মক নিবন্ধটি পাঁচ স্তবকে বিভক্ত। স্তবক-গুলির নাম যথাক্রমে গোবিন্দরত্নাঙ্কুর, গোবিন্দরতিপল্লব, গোবিন্দ-রতিকোরক, গোবিন্দরতিপ্রসূন, গোবিন্দরত্যামোদ। সংস্কৃত শ্লোক এবং এবং ব্রজবুলি পদ দুইয়েরই রচনায় ঘনশ্যাম নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তবে পদ রচনায় পূর্ববর্তীদের অনুসরণ খুব স্পষ্ট।

এঁর রচিত অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'। এতে কৃষ্ণলীলা আদ্যন্ত বিবৃত হয়েছে।

ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য—সতীদাহ নিবারণের সঙ্গে এঁর নাম জড়িত। বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলীর (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রী:) প্রাইভেট সেক্রেটারী, বিধবাদিগকে যাতে বলপূর্বক বেঁধে স্বামীর সঙ্গে দাহ করা না হয়, তার উপায় বিধান করবার জন্য তৎকালীন নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখেছিলেন। ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য তখন নিজামত আদালতের কোর্ট পণ্ডিত ছিলেন। এঁকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে ইনি বলেছিলেন—বিধবাকে পতির চিতার সঙ্গে বেঁধে পোড়ান শাস্ত্র ও সদাচার উভয় বিরুদ্ধ। ইহাই ছিল সতীদাহ নিবারণের প্রথম উদ্যম।

ঘনশ্যাম মিত্র—বীরভূম জেলার গোমতি নামক গ্রামের অধিবাসী। ইনি উত্তর রাঢ়ীর কায়স্থদের আচার ও ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একখানা কুলজী প্রণয়ন করেন।

ঘসেটি বেগম—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবিখ্যাত নবাব আলিবর্দী

খাঁর (১৭৪০-৫৩ খ্রীঃ) জ্যেষ্ঠা কন্যা। এবং পরবর্তী নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাসী। এঁর স্বামীর নাম ছিল নোয়াজিস্ মহম্মদ। ইনি ছিলেন অত্যন্ত দুশ্চরিত্রা রমণী। স্বামীর প্রিয় সুহৃদ হোসেন কুলী খাঁর সঙ্গে ইনি অবৈধ-প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা একরাম উদ্দৌলাকে ইনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ইনি কয়েকজন ওমরাহকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছিলেন। মীরজাফর প্রভৃতি এঁর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন। এঁর মতিঝিলের সুরম্য প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারী-দের প্রধান আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর এই দুশ্চরিত্রা, বুদ্ধিহীনা ও কুচক্রী মাসীকে বেশী বাড়তে দেননি। সিরাজ তাঁর বিপুল অর্থ ও মতিঝিল প্রাসাদ দখল করে নিয়ে ঘসেটি বেগমকে বন্দীবাসে প্রেরণ করেন। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণের লেখক গোলাম হোসেন লিখেছেন— এই দুশ্চরিত্রা বুদ্ধিহীনা রমণী যদি সিরাজকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন, তবে ভাল হত। সিরাজ উদ্দৌলার মৃত্যুর পরে মিরজাফরের পুত্র মীরণ ঘসেটি বেগম ও সিরাজ-জননী আমিনাকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। তাঁরই নির্দেশে বেগমদ্বয়কে নৌকায় চড়িয়ে পদ্মার জলে ডুবিয়ে মারা হয়। জানা যায় হত্যা করার পূর্বে দুই বোন নৌকায় আরোহণ করে দুই রেকাত নমাজ পাঠ করেন এবং কুক্ষিতলে কোরাণ শরিফ নিয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে জলে পতিত হন।

ঘুঘুনাথ—নাথসম্প্রদায়ের একজন সাধক ও গুরু।

ঘোষ খাঁ—ইনি ছিলেন বাংলার সুবাদার সরফরাজ খাঁর (১৭৩৯-৪০খ্রীঃ) অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি। আলীবর্দী খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে সপুত্র নিহত হন।

চ

চক্রধ্বজ—নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ, আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কোচবিহারের কামতাপুরের রাজা হয়েছিলেন। প্রবাদ আছে যে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'কামতেশ্বরী' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

চক্রনাথ—নাথপন্থী সম্প্রদায়ের চুরাশী জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম।

চক্রপাণি আচার্য—ইনি অদ্বৈত প্রভুর প্রেরণায় গুজরাট প্রভৃতি দেশে গিয়ে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর সহিত মিলিত হয়ে সেবা প্রকাশ করেন। ইনি ছোট গোড়ীয়া গাদির সংস্থাপক।

চক্রপাণি চৌধুরী—ইনি ছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত ও শ্রীখণ্ডনিবাসী। ইনি মহা-

প্রভু অপেক্ষা প্রায় বছর পনেরর কনিষ্ঠ ছিলেন। চক্রপাণির বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামগোপাল চৌধুরীই 'রস-কল্পবল্লীর রচয়িতা।

চক্রপাণি দত্ত—চক্রপাণি দত্ত তাঁর 'চিকিৎসা-সারসংগ্রহ' বা 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' গ্রন্থে নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ভানু এবং পিতার নাম নারায়ণ। এঁরা বৈদ্যজাতি হিসাবে পরিচিত। নারায়ণ ছিলেন গৌড়রাজ নয়পালের কর্মচারী ও রসবত্যাধিকারী বা রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক। তাঁরা ছিলেন লোধ্রবংশীয় কুলীন। তাঁদের নিবাস ছিল বীরভূমে। চক্রপাণির গুরু ছিলেন নরদত্ত। আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চক্রপাণি অবস্থান করছিলেন।

চক্রপাণির শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ 'চিকিৎসা সারসংগ্রহ'। এর আলোচ্য বিষয় রোগ নির্ধারণ ও ধাতব দ্রব্যের গুণাগুণ। চক্রপাণি ছিলেন চরক ও সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার। তাঁর রচিত চরকটীকার নাম 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' বা 'চরকতাৎপর্যদীপিকা' এবং সুশ্রুত টীকার নাম 'ভানুমতী'। চক্রপাণি রচিত অপর দুখানি গ্রন্থের নাম 'শব্দচন্দ্রিকা' ও 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ'। 'শব্দচন্দ্রিকা' ভেষজ গাছ-গাছড়া ও আকর দ্রব্যাদির তালিকা এবং 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' পথ্যাদি-নিরূপণ সংক্রান্ত পুথি। 'চিকিৎসাসার' বা 'গূঢ় বাক্য বোধক' এবং 'সর্বসারসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ দুটিও চক্রপাণির নামাঙ্কিত।

চক্রপাণি দাস—ইনি 'অভিনব চিন্তামণি' নামক বৈদ্যগ্রন্থ প্রণেতা।

চক্রায়ুধ—ইনি ছিলেন কান্যকুব্জের অধিপতি। গৌড়েশ্বর ধর্মপালের সাহায্যে ইনি সিংহাসন লাভ করেছিলেন।

চটশাহ—শ্রীহট্ট জেলার বিখ্যাত দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহজালাল এমনির অন্যতম অনুগত শিষ্য ও চিরকুমার ছিলেন।

চণক পাল—তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে ইনি ছিলেন বাংলার পালরাজ বংশের অন্যতম নরপতি। ৯৫২-৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

চণ্ডার্জুন—সঙ্কট গ্রামের অধিপতি চণ্ডার্জুন বাংলার পালরাজ বংশের নরপতি রামপালের অন্যতম সামন্ত নরপতি ছিলেন।

চণ্ডীদাস—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস নামটি এক সমস্যা-মূলক। বিগত কয়েক শতক ধরেই যে ক'জন চণ্ডীদাস আবির্ভূত হয়েছেন, বিদগ্ধ জনেরা নানাভাবে এঁদের বিষয়ে বলেছেন। এখনো চণ্ডীদাস সমস্যার মীমাংসা হয়নি।

চণ্ডীদাস, দ্বিজ—চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী রচয়িতা। এঁর নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। ইনিও বাসুলী দেবীর উপাসক ছিলেন। ছাতনা গ্রামে আজও বাসুলী দেবীর

মন্দির বিদ্যমান। এই চণ্ডীদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর রচিত পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এঁর শ্রেষ্ঠ পদগুলির অন্যতম :

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"।

জনশ্রুতি এই যে ইনি কীর্ণহারে পরলোক গমন করেছিলেন।

চণ্ডীদাস, (দীন)—শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার অধিকারী বড়ু চণ্ডী দাস ও দ্বিজ চণ্ডী দাস হতে ইনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি বহু পদ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, ইনি সম্ভবত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানি আখ্যান কাব্যের রচয়িতা। এঁর রচিত পদাবলীতে 'দীন চণ্ডীদাস' এবং 'দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস' ভণিতা পাওয়া যায়। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু এঁর কৃষ্ণলীলাবিষয়ক দু'খানি পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং তার সঙ্গে চণ্ডীদাসের কতকগুলি বিখ্যাত পদ যোগ করে 'দীন চণ্ডী দাসের পদাবলী' নামে দু'খণ্ডে প্রকাশ করেন।

চণ্ডীদাস, বড়ু—বিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যের রচয়িতা। এঁর জন্মস্থান বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রাম। এঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ ভবানীচরণ ও মাতা ভৈরবীসুন্দরী। পিতা স্বগ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসও শৈশবাবস্থা থেকেই ঐ কার্যে নিযুক্ত হন। আজও নান্নুরে বাশুলী দেবীর মন্দির বিদ্যমান।

বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দী। সম্ভবতঃ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' পুঁথি রচিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন বলে জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্য চরিতামৃতে' আছে :

(১) "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস
শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥"
(মধ্য লীলা)

(২) "বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের
গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥"
(আদি লীলা)

কথিত আছে মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহ গৌড় রাজ্য পরিদর্শনে এলে বিদ্যাপতি তাঁর সঙ্গে এসে বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস চিরকুমার ছিলেন। নান্নুর গ্রামের তিন ক্রোশ পূর্বে তেহাই গ্রামের সনাতন ও লক্ষ্মী নামক রজক দম্পতির কন্যা রজকিনী রামমণি বা রামতারা বা রামী এঁর সাধন সঙ্গিনী ছিলেন।

চণ্ডীদাস, সহজিয়া বা তরুণী রমণ—চণ্ডীদাস সমস্যায় বহু চণ্ডীদাসের মধ্যে সহজিয়া বা তরুণী রমণ এক স্বতন্ত্র সত্তা। মণীন্দ্রমোহন বসুর সংগৃহীত 'রত্নসার' পুঁথিতে এই সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাসকে পাওয়া যায়ঃ

"ইহা জানি চণ্ডীদাস তরুণীরমণ।
গীত-ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন।"

একটি ভণিতায় পাওয়া যায়ঃ

"তরুণি রমণ করে নিবেদন
মরিলে না যায় ছাড়া॥"

তরুণী রমণের লেখা বহু সহজিয়া পদ এবং 'সহজ উপাসনা তত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। রচনার ভাষা আধুনিক। তাঁর প্রখ্যাত একটি পঙ্‌ক্তি "শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়।

চণ্ডী সিংহ—আচার্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য।

চণ্ডী চরণ তর্কবাগীশ—বিখ্যাত পণ্ডিত। ১৭৬৮ সালে নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, জ্যোতিষ ও তন্ত্র শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এঁর কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৬২ সালে ৯৪ বছর বয়সে ইনি মারা যান।

চণ্ডীচরণ দেবরায়—নলডাঙা রাজবংশের প্রথম রাজা। এঁর জমিদারীর সুশাসনের কথা শুনে বাংলার তৎকালীন সুবাদার শাজাহানের পুত্র শাহ সুজা চণ্ডীচরণকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন (১৬৫৬)। নবাবের নিকট খেলাৎ ও রাজা উপাধি পেয়ে রাজা চণ্ডীচরণ নবাবকে বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ইনি নলডাঙায় জোড় বাংলা নামক মন্দির নির্মাণ করে তথায় বড় গোপাল ও জালিম গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চণ্ডী চরণ মুন্সী—১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চণ্ডীচরণ ত্রিশ টাকা বেতনে ঐ বিভাগে সার্টিফিকেট পণ্ডিতের পদ পান। তিনি ১৮০৮ সালের ২৬ নভেম্বর পরলোক গমন করেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের গঠমান যুগে চণ্ডীচরণের দান স্মরণীয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ তোতা ইতিহাস, ভগবদ্‌গীতা।

চণ্ডীপ্রসাদ রায়—পাবনা জেলার পোতাজিয়ার রায় জমিদার বংশের আদি পুরুষ। ইনি মানসিংহের ভ্রাতা ভানুসিংহের সঙ্গে সন্ধি করে জমিদারী প্রাপ্ত হন। ইনি বারেন্দ্র কায়স্থদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। এক সময় ইনি প্রসিদ্ধ চলন বিলের ডাকাত জমিদার বেণীমাধব রায়ের সহায়তায় বঙ্গের মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

চণ্ডেশ্বর—প্রসিদ্ধ মৈথিল কবি

বিদ্যাপতির খুল্ল পিতামহ। ইনি মিথিলেশ হরিসিং দেবের একজন মন্ত্রী ছিলেন এবং এঁর উপাধি ছিল "মহামত্তক সন্ধিবিগ্রহক।" ইনি ছিলেন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলি রত্নাকর নামে খ্যাত। চণ্ডেশ্বর ঠাকুর একাধারে রাজমন্ত্রী, সেনাপতি ও স্মৃতি সংগ্রহকার ছিলেন। ১৪১৪ শালে ইনি তুলাপুরুষ দান করেন। এঁর পিতার নাম বীরেশ্বর ঠাকুর।

চতুর্ভুজ—ইনি ছিলেন গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামনিবাসী। স্বর্ণরেখ নামক চতুর্ভুজের এক পূর্বপুরুষ বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ গ্রামে বাস করতেন। এই গ্রাম রাজা ধর্মপাল কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল। এঁব পিতামহ নিত্যানন্দ ছিলেন কবি ও স্মার্ত। প্রবাদ আছে যে চতুর্ভুজের জন্ম হওয়ামাত্রই নাকি তাঁর পিতা শিবদাস মধুসিক্ত স্বর্ণ সখনী দ্বারা তাঁর জিহ্বায় কতকগুলি শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন। এবং তারই ফলে চতুর্ভুজ পরবর্তীকালে কবিত্ব অর্জন করেন। চতুর্ভুজের 'হরিচরিত' পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাব্যটি তেরটি সর্গে বিভক্ত। জন্ম থেকে কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণের লীলা এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কাব্যরচনাকাল ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দ। চতুর্ভুজের জীবন কাল পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ।

চতুর্ভুজ পণ্ডিত—নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ, নবদ্বীপ-বাসী ভক্ত।

চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য—স্মার্ত পণ্ডিত। এঁর রচিত দু'খানি স্মৃতি গ্রন্থের নাম, 'অশৌচসংগ্রহ', 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। চতুর্ভুজ নিজের পরিচয় দিয়েছেন মহাচার্য বা আচার্য বলে। দ্বিতীয় গ্রন্থের লিপিকাল ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ বলে মনে হয়।

চন্দন—বাংলার নবাব হুসেন শাহের সময় চন্দন ছিলেন কামতাপুরের মারালাবাস নামক স্থানের স্বাধীন রাজা।

চন্দনদাস দত্ত—এঁর রচিত কাব্যের নাম 'অশ্বমেধপর্ব'। রচনাকাল ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ। কবির পদবী ছিল মণ্ডল। জাতি উগ্র-ক্ষত্রিয়। পিতা পুরুষোত্তম, পিতামহ নারায়ণ। নিবাস আকুরোল গ্রামে [বর্ধমান]।

চন্দ্রকলা দেবী—উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেবের পত্নী। মহাপ্রভুর অনুগতা।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (মহামহোপাধ্যায়)—সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী বেদব্যাখ্যাতা। অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দী।

চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পূর্বে ঠাকুরের নিন্দাবাদ করে বেড়াতেন। পরে তাঁর কৃপায় মহাভক্ত হন।

চন্দ্রকেতু—বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার অধীন দেউলিয়া গ্রামে রাজা চন্দ্রকেতু বাস করতেন। সেনবংশের রাজত্ব-

কালে এঁর পূর্বপুরুষরা এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। দেউনিয়া গ্রামের নিকট বালাণ্ডা গ্রামবাসী গোরাচাঁদ নামক এক ফকির রাজা চন্দ্রকেতুকে মুসলমান করার জন্য বহু চেষ্টা করেও অকৃতকার্য হয়। অবশেষে সে বালাণ্ডার শাসনকর্তা পীরসার সাহায্য নেয়। পীরসা চন্দ্রকেতুকে ডেকে পাঠায়। পীরসার কথায় মুসলমান না হওয়ায় পীরসা এঁর উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে। পীরসার নিকট যাওয়ার সময় চন্দ্রকেতু দুটি পায়রা সঙ্গে নিয়ে যান। বলে যান, পায়রা দুটিকে উড়ে আসতে দেখলে, পরিবারের লোকেরা সম্মান রক্ষার জন্য যেন প্রাণত্যাগ করে। পীরসা কর্তৃক বন্দী হয়ে চন্দ্রকেতু পায়রা উড়িয়ে দিলেন। পায়রা দুটিকে উড়ে আসতে দেখে পরিবারের লোকেরা জলমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। পরে চন্দ্রকেতু মুক্ত হয়ে এসে দেখলেন সমগ্র পরিবারের বিলুপ্তি। তখন ইনিও প্রাণত্যাগ করলেন। এঁর অবস্থিতি কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

চন্দ্রগোপাল পাল—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার প্রধান ও বহু বিখ্যাত বিদূষক। ইনি গোপালভাঁড় নামেই সমধিক পরিচিত। গোপাল ভাঁড় দ্র°।

চন্দ্রগোমী—চন্দ্রগোমী ছিলেন প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে এঁর জন্ম হয়েছিল। এঁর আবির্ভাব কাল পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী। জানা যায় তিনি নাকি শেষ জীবনে কোন কারণে নির্বাসিত হয়ে চন্দ্রদ্বীপে জীবন অতিবাহিত করেন। তিব্বতীয় ঐতিহ্য থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগোমী নালন্দা মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৌদ্ধশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নালন্দায় নাকি বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি নালন্দার আচার্যপদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি যোগাচার-মতবাদ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। চন্দ্রগোমীর রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'চান্দ্র ব্যাকরণ' প্রধানতঃ পাণিনি অনুসারী। পাণিনির আটটি অধ্যায়ের স্থলে চন্দ্রগোমী ছয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চন্দ্রগোমী রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'ন্যায়-সিদ্ধালোক' নামক দার্শনিক গ্রন্থ, বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান সাধনাগত ৩৬ খানি তন্ত্রশাস্ত্র, তারা ও মঞ্জুশ্রীর উপর কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র, 'লোকানন্দ' নাটক, শিষ্যের নিকট গুরুর পত্র হিসাবে রচিত 'শিষ্যলেখধর্ম' নামক একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ।

বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক ও তান্ত্রিক চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি কিনা এই নিয়ে

পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে। কেহ কেহ মনে করেন একই নামে একজন প্রাচীন ও একজন অর্বাচীন পণ্ডিত ছিলেন। কালক্রমে উভয় ব্যক্তিকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে।

চন্দ্রচূড় আদিত্য—সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। রচিত গ্রন্থ 'জগৎ মঙ্গল'। গ্রন্থ রচনার সমাপ্তিকাল ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থে আছে :

"পঞ্চদশ উত্তর শক অষ্ট নবতি
তখন হইল এই পুস্তক সমাপতি।"

চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি—জন্মস্থান নদীয়া জেলার ব্রহ্মশাসন গ্রাম। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র রাজা গিরীশচন্দ্রের সময়ে (১৮০২-৪২) এই নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ জগদ্ধাত্রী মাতার মূর্তি প্রচার ও তন্ত্র থেকে তাঁর পূজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। তারপর নদীয়া রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এঁর জন্ম হয়।

চন্দ্রদেব (রাজা)—অশোকের সময়ের সমবঙ্গের ভূষণার সমুদ্র বংশের রাজা। কলিঙ্গ যুদ্ধে অশোক কর্তৃক বন্দী ও রাজপুতানার গঙ্গানগরে নির্বাসিত হন। পরে ইনি কনৌজের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

চন্দ্রনারায়ণ—শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ইটার ব্রাহ্মণ রাজা সুবিদ নারায়ণের দ্বিতীয়পুত্র। ইনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর এঁর নাম হয়ে ছিল কামাল খাঁ।

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণায় 'ধানুকা' গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয় বংশে জন্ম হয়। চন্দ্রনারায়ণের পিতামহ রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত এবং পিতা কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার। চন্দ্রনারায়ণ পিতার নিকটই সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কৃষ্ণজীবন পুত্রকে মনোমত গড়ে তুলেছিলেন এবং সভায় সভায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মাথুরী, জাগদীশী ও গাদাধরীর উপর চন্দ্রনারায়ণ অনেক উৎকৃষ্ট পত্রিকা রচনা করেছিলেন। এই সকল পত্রিকা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রনারায়ণ কাশীতে ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ২০ বৎসর পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। চন্দ্রনারায়ণ ছিলেন ভারতের বিখ্যাত নৈয়ায়িক। কাশীতে চন্দ্রনারায়ণের এই অসামান্য প্রতিষ্ঠার কথা আজও শোনা যায়। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারপটুতা ছিল অসাধারণ। তিনি বিচারে কখনো পরাজিত হন নাই। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন, ইন্দ্রিয়ার্থবাদ, কাল খণ্ডনবিচার, কুসুমাঞ্জলি টিকা, চিন্তামণি টিপ্পনী, গৌতমসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি।

চন্দ্রপতি—বৈষ্ণব পদকর্তা। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

চন্দ্রপাল—একজন মহাপণ্ডিত। মহামতিশীলভদ্রের সময়ে ইনি

নালন্দার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

চন্দ্রবর্মা—ইনি ছিলেন গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের এক স্বাধীন রাজা। পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র, "চক্রস্বামী"-র অর্থাৎ বিষ্ণুর দাসশ্রেষ্ঠ চন্দ্রবর্মা। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে এঁর লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এঁর রাজধানী ছিল পুষ্করণা নগরী, সম্ভবত বর্তমানে দামোদরের তীরে পোখরনা গ্রাম। বাংলাদেশের প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসে সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মা প্রথম স্বাধীন রাজা। অবস্থিতিকাল সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দী।

চন্দ্রভারতী—খ্যাতনামা কবি। এঁর প্রকৃত নাম হরিচরণ। অনন্ত কন্দলি নামেও ইনি পরিচিত। ইনি আসামী ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। এঁকে আসামের কৃত্তিবাস বলা হয়।

চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ—চন্দ্রমণি ছিলেন চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের সগোত্র ও ছাত্র এবং ইদিলপুরনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সভা-পণ্ডিত ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। চন্দ্রমণির অপর নাম ত্রিলোচন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি পশ্চিমদেশীয় বহু ছাত্রসহ দেশে ফিরে অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকা 'মহাপ্রভা', 'ব্যাকরণকোটিপত্রং' এবং 'ন্যায়-সংকেত'। চন্দ্রমণি পত্রিকাও রচনা করেছিলেন।

চন্দ্রমুখী—কান্যকুব্জপতি চন্দ্রকেতুর কন্যা। ইনি ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ নরপতি আদিশূরের মহিষী। এঁরই চন্দ্রায়ণ ব্রত সম্পাদনের জন্য কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদাবিদ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেছিলেন।

চন্দ্রমুখী দেবী—শ্রীনিবাস আচার্যের মধ্যম পুত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী। ইনি ঈশ্বরীদেবীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

চন্দ্রমোহন বর্মণ—কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭৮০-১৮১৩ খ্রীঃ) কাছাড়ী জাতীয় কবি চন্দ্রমোহন বর্মণ নানাবিধ কবিতা বচনা করেন (বাংলা ভাষায়)।

চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (তর্করত্ন)—এঁর 'উদ্ভটচন্দ্রিকা' একখানি কোশকাব্য। এতে প্রধানতঃ অজ্ঞাতনামা কবিগণের শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। কতক শ্লোকে কবির নামোল্লেখ আছে।

চন্দ্রশেখর—চন্দ্রশেখর 'শূর্জন-চরিত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থের শেষ শ্লোক থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন 'গৌড়ীয়' ও বৈদ্য। এঁর পিতার নাম ছিল জিতামিত্র। ইনি কাশীতে গ্রন্থখানি রচনা করে-ছিলেন। শূর্জন ছিলেন সম্রাট আকবরের মিত্র। শূর্জনের পৃষ্ঠ-পোষকতায় গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল।

সুতরাং চন্দ্রশেখর আকবরের সমকালীন (অর্থাৎ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক) ছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

চন্দ্রশেখর আচার্য—আচার্যরত্ন বলে পরিচিত। এঁর নিবাস ছিল শ্রীহট্ট। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' থেকে জানা যায় যে গৌরাঙ্গজননী শচীদেবীর সঙ্গে চন্দ্রশেখর পত্নীর ভগিনী সম্বন্ধ ছিল। গৌরাঙ্গআবির্ভাবের পূর্বেই চন্দ্রশেখর নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। ইনি গৌরাঙ্গের জন্ম ও শৈশবলীলা প্রভৃতির প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবের একজন মহাভক্ত ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' থেকে জানা যায় যে ইনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে গয়া যাত্রা করেছিলেন। তারপর শ্রীবাস-গৃহে প্রাত্যহিক কীর্তনের সময় থেকে আরম্ভ করে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণকাল পর্যন্ত জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি বিশেষ ঘটনাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই এঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শ্রীবাস-গৃহের মতো চন্দ্রশেখরভবনও গৌরাঙ্গদেবের একটি প্রধান লীলাস্থলে পরিণত হয়েছিল। চন্দ্রশেখরভবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা বাংলা ভাষায় কৃষ্ণলীলা নাটক অভিনয়। এই অভিনব অভিনয়ে গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি অংশগ্রহণ করেছিলেন। চন্দ্রশেখর ও বিদ্যানিধি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ গায়কের কাজ করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের দিন গৌরাঙ্গদেব চন্দ্রশেখরকে কাটোয়ায় নিয়ে গিয়ে তাঁকেই স্বীয় জীবনের কঠোরতম কর্মসম্পাদনার প্রতিনিধি পদে নিয়োজিত করেন। মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌছলে চন্দ্রশেখর শচীমাতাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে আসেন। চৈতন্যদেব নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলে চন্দ্রশেখর কখনো একা, কখনো নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভু দর্শন করতে যেতেন এবং তাঁর নীলাচল-লীলায় অংশগ্রহণ করতেন। গৌরাঙ্গ-তিরোধানের পরেও ইনি জীবিত ছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী' ও 'পদকল্পতরু'তে ভণিতায় তিনটি পদ পাওয়া যায়। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

চন্দ্রশেখর ঘোষ, দেওয়ান—মেদিনীপুরের অন্তর্গত ধারেন্দার রাজপরিবারের দৌহিত্র-বংশে এঁর জন্ম হয়। ইনি ১৭৬৭ সালে ধারেন্দার রাজা কার্তিকরাম পালের সঙ্গে মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ জঙ্গল মহলে বিদ্রোহ দমনে লেফ্টেন্যান্ট ফারগুসান সাহেবকে সাহায্য করেছিলেন। দাতারূপেও পরিচিত ছিলেন বলে মেদিনীপুর অঞ্চলে 'দাতাচন্দু' (চন্দ্রশেখর) বলে তাঁর নাম কীর্তিত হয়েছিল। কথিত আছে ইনি একবার একলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছিলেন।

চন্দ্রশেখর দাস—একজন যাত্রাওয়ালা। যে কৃষ্ণ যাত্রা বাংলার

সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা স্বরূপ, বৈষ্ণব-কুলতিলক চন্দ্রশেখর দাস সেই যাত্রার স্রষ্টা। এঁর পূর্বে বাংলাদেশে যাত্রা ছিল না। চন্দ্রশেখর অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য এবং জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। এঁর রচিত প্রথম যাত্রার পালার নাম 'হরিবিলাস'। তারপর এঁর পালার সংখ্যা বেড়ে গেলে যাত্রাটি 'শেখরী যাত্রা' বলে প্রসিদ্ধ হয়। এঁরই শিষ্য জগদানন্দ হরিবিলাস পালায় 'রাই' সাজতেন।

চন্দ্রশেখর দাস—এঁর নামে তিনটি বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুটি চৈতন্য-বন্দনামূলক। খুব সম্ভব ইনি চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য অথবা চৈতন্য অনুচরের প্রশিষ্য ছিলেন।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি—চন্দ্রশেখর বাচস্পতি খ্যাতনামা বিদ্যা-ভূষণের পৌত্র। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি নবদ্বীপে বাস করতেন। চন্দ্রশেখর 'ধর্মদীপিকা' ও 'তত্ত্বসং-বোধিনী' নামে দু'খানা মীমাংসা শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চন্দ্রশেখর ছিলেন হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

চন্দ্রশেখর বৈদ্য—ইনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একজন ভক্ত ছিলেন এবং কাশীতে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। কাশীতে বসবাসকারী চৈতন্যদেবের আর এক শিষ্য তপন মিশ্রের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে ইনি দিন কাটাতেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনপথে চন্দ্রশেখরের কাছে কয়েকদিন অবস্থান করে-ছিলেন। বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথেও গৌরাঙ্গ চন্দ্রশেখরের গৃহে কয়েকদিন বাস করেছিলেন। এই সময় ভক্ত-শ্রেষ্ঠ সনাতন গোস্বামী গৌড় থেকে সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে এসে চন্দ্র-শেখরের গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভু ভক্তি-তত্ত্ব আলোচনা করতেন, আর প্রতিদিন কীর্তনগান চলত। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য—ইনি ছিলেন বিক্রমপুর নিবাসী দেবী কাত্যায়ণীর উপাসক। বাল্যকাল থেকেই ইনি সংসার বিরাগী ছিলেন। উপাস্য-দেবীর নির্দেশক্রমে ইনি বিবাহ করেন এবং বঙ্গপোসাগরস্থ নবোত্থিত একটি দ্বীপের অধিপতি হন। তাঁরই নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। কিন্তু সংসার ভাল না লাগায় ইনি ৬০৬ বঙ্গাব্দে এঁর দৌহিত্র শিষ্য দনুজমর্দনদেবকে চন্দ্রদ্বীপের অধিকার প্রদান করে হিমাচল প্রদেশে চলে যান।

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য—ইনি একজন খ্যাতনামা স্মার্ত। এঁর রচিত গ্রন্থগুলির নাম: ধর্মদীপিকা বা স্মৃতি প্রদীপিকা, স্মৃতি প্রদীপ, স্মৃতি দুর্গভঞ্জন বা দুর্গভঞ্জন, স্মৃতি সারসংগ্রহ, দ্বৈত নির্ণয়।

গ্রন্থগুলির প্রারম্ভিক শ্লোক ও

সমাপ্তিসূচক বাক্যগুলি থেকে জানা যায় যে, বাচস্পতি উপাধিধারী চন্দ্রশেখর নবদ্বীপের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলের বিদ্যাভূষণ উপাধিভূষিত একজন পণ্ডিতের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ ছিলেন।

চন্দ্রশেখর-শশিশেখর—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন চন্দ্রশেখর-শশিশেখর। অনেকের মতে এঁরা ছিলেন দুই ভাই। বর্ধমান জেলায় কাঁদড়া (বা পড়ান) গ্রাম নিবাসী গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র। চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের পদাবলী সংকলন গ্রন্থ 'নায়িকারত্ন'। চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের মান-ঘটিত পদাবলী এখনও কীর্তনের আসর জমিয়ে রাখে।

চন্দ্রশ্রী—ছিলেন একজন ভিক্ষু। ইনি আর্য অবলোকিতেশ্বরের স্তব ও তার ভুটিয়া তর্জমা করেন।

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ—ত্রিপুরার মহারাজা উদয় মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। ইনি কোনও যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে 'চন্দ্রদর্প' এই গৌরবজনক উপাধি লাভ করেছিলেন। মুঘল বাহিনীর সঙ্গে চট্টগ্রামের যুদ্ধে ইনি সেনাপতি রঙ্গনারায়ণের সহকারী ছিলেন।

চন্দ্র সেন—বঙ্গরাজ সমুদ্র সেনের পুত্র। কথিত আছে, ইনি মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চন্দ্র সেন—প্রসিদ্ধ নৃপতি ও দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই কালাঞ্জর দুর্গের নির্মাতা। এঁর রচিত গ্রন্থ: 'চন্দ্রসেন সিদ্ধান্ত' ও 'রসচন্দ্রোদয়' নামক রসগ্রন্থদ্বয়। জীবিতকাল আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দী।

চন্দ্রাবতী—ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা-কবি। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের সুবিখ্যাত কবি মৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রাম নিবাসী বংশীদাসের ইনি দুহিতা। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মৈমনসিংহ গীতিকার একটি কাব্যকাহিনীতে চন্দ্রাবতীর জীবনকথা উদ্ধৃত হয়েছে। চন্দ্রাবতীর জীবন একটি বিয়োগান্ত-কাব্য। ইনি পাতুয়ারী গ্রামের যে পাঠশালায় পড়তেন, সেই পাঠশালায় জয়চন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণ বালক তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বাল্যাবধি উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এঁরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে কবিতা লিখতেন। পরিণত বয়সে দু'পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চপলমতি জয়চন্দ্র এক মুসলমানীর প্রেমমুগ্ধ হন ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার পাণিগ্রহণ করেন। এই ঘটনায় চন্দ্রাবতী মর্মাহত হন। পূতচরিত্রা চন্দ্রাবতী আর বিবাহ না করে আজীবন কৌমারী ব্রত অবলম্বন করেন। বংশীদাস কন্যার ধ্যানধারণার জন্য একটি শিবমন্দির প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন

ফুলেশ্বরীর তীরে। আজন্মকুমারী চন্দ্রাবতী অনেক সময় ঐ মন্দিরে শিবারাধনায় সময় কাটাতেন। কিছুদিন পরে জয়চন্দ্র মোহমুক্ত হয়ে একদিন ঐ মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু চন্দ্রা মন্দিরদ্বার মুক্ত না করায় জয়চন্দ্র ফুলেশ্বরীর জলে আত্মবিসর্জন করেন। শোকাভিভূতা চন্দ্রাবতীও অল্প পরেই শিবারাধনায় দেহত্যাগ করেন।

পিতার নির্দেশেই চন্দ্রাবতী রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। এজন্য তিনি 'মহিলা-কৃত্তিবাস' নামে পরিচিত। তাঁর রামায়ণখানি কতকগুলি গানের সমষ্টি। এ ছাড়া, তিনি মনসা দেবীর গান এবং 'মলুয়া' ও 'কেনারাম' প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেছিলেন। চন্দ্রাবতী ছিলেন প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যমণিস্বরূপা। এঁর জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

চম্পতি রায় বা ঠাকুর—দাক্ষিণাত্য-নিবাসী গৌরাঙ্গভক্ত। বাংলা পদাবলী সাহিত্যে এঁর দান আছে। রচনা প্রায়ই ব্রজবুলিতে।

চয়চাগ রায়—ত্রিপুরার রাজা ধনমাণিক্যের (১৪৯০-১৫২০) প্রধান সেনাপতি। ধনমাণিক্যের সঙ্গে বাংলার নবাব হোশেন শাহের যুদ্ধ বাধলে সেনাপতি চয়চাগ রায় মুসলমান সৈন্যদের পরাজিত করেন। তাছাড়া, এঁর পরাক্রমে আরাকানের কিয়দংশ ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিবেশী পার্বত্য কুকিদেরও ইনি বশীভূত করেছিলেন।

চাঁদ কাজী—গৌড়ের বাদশাহের দৌহিত্র চাঁদ কাজী ছিলেন নবদ্বীপের শাসনকর্তা। গৌরাঙ্গদেব গয়া থেকে ফিরে এসে নদীয়াবাসিগণকে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে মাতিয়ে তোলেন। তাঁর নির্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে ও পথে ঘাটে সংকীর্তনের সাড়া পড়ে যায়, তখন কাজী তা শুনতে পেয়ে নবদ্বীপ নগরে সংকীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। যখন শাসকের অত্যাচারের আশঙ্কায় নগরে হরি-সংকীর্তন প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তখন গৌরাঙ্গদেব কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিরাট শোভাযাত্রা বার করে নিজে তার নেতৃত্ব করলেন। শোভাযাত্রাটি ছিল বিপ্লবাত্মক। বিরাট শোভাযাত্রা কাজীর বাড়ীর সম্মুখে পৌছলে গৌরাঙ্গদেব কাজীর ঘরবাড়ী ভাঙ্গার আদেশ দিলেন। ফলে কাজীর গৃহ ও উদ্যানাদি ভূমিসাৎ হয়ে গেল। কাজী পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। পরে কাজী অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে রেহাই পান। ইহা কাজীদলন নামে খ্যাত এবং ইহা গৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ লীলার একটি প্রধান ঘটনা। সেই থেকে কাজীর গৃহে গৌরাঙ্গ সেবার ব্যবস্থা হয় নবদ্বীপে 'বল্লালটিলা'র নিকট চাঁদ কাজীর সমাধি বিদ্যমান। চাঁদকাজী

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

চাঁদ গাজি—ইনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বার ভূঞাদের অন্যতম ও ভাওয়ালের গাজি পরিবার-ভুক্ত। স্থানীয় চাঁদপ্রতাপের শাসনকর্তা ছিলেন চাঁদ গাজি। চাঁদ গাজির নামেই স্থানটির নাম হয় চাঁদপ্রতাপ। ইনি নামে মাত্র মোগল সম্রাটের অধীন হলেও কাযতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। আজীবন এঁর প্রতাপ অক্ষুন্ন ছিল। খিজির পুবের বিখ্যাত ভূঞা ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুবের কেদার রায় তাঁদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মোগল সম্রাটের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে যে সংগ্রাম কবেছিলেন, প্রতিবেশী ভৌমিক এই চাঁদ গাজিও তাঁদের মতানুবর্তী হয়ে তাঁদের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়—চাঁদ রায ও কেদার রায় দুই সহোদর ভাই। এঁরা ছিলেন বাংলাব বার ভূঞাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর ও স্বাধীনতা-প্রিয় শাসনকর্তা। এদের পূর্বপুরুষ নিমু রায় দিল্লীর আকবর বাদসাহেব রাজত্বের প্রায় দেড়শ' বছর আগে কর্ণাট দেশ থেকে এসে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গে সেনরাজ-গণের রাজত্বকালে নিমু রায় রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে সেনরাজগণের পতন হলে তিনি বিক্রমপুর পরগণা আত্মসাৎ করেন। এই বিক্রমপুর পরে সম্প্রসারিত হয়। চাঁদ রায় ও প্রতাপ রায় হন তার প্রবল পরাক্রমশালী শাসক। রাজ্য রক্ষার জন্য বড় বড় দুর্গ তৈরী করালেন। বহু অস্ত্রশস্ত্র অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাংলার বার ভূঞাদের সম্মিলিত প্রয়াসে দিল্লীর মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাতৃভূমি বাংলাকে স্বাধীন করা। বাংলার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যও এঁরা বহু কল্যাণকর কাজ করেছিলেন। শ্রীপুরে এঁরা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বহুকাল ধরে আরাকানী মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা দেশের মধ্যে দারুণ অশান্তি সৃষ্টি করে আসছিল। কেউই তাদের দমন করতে পারেনি। চাঁদ রায় আর কেদার রায তাদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে রাজ্য নিরাপদ করেছিলেন। তারপর এঁরা মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলা স্বাধীন করার জন্য সমস্ত ভূঞাদের নিমন্ত্রণ করলেন শ্রীপুরে। সবাই এক হযে এঁদের মতে সায় দিলেন।

কিন্তু হঠাৎ এক অঘটন ঘটল। চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী বা সোনামণির সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের রাজার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু মেয়ে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এল। সোনামণি ছিল অসামান্য রূপসী। খিজিরপুরে আর এক প্রখ্যাত ভূঞা ঈশা খাঁর সঙ্গে চাঁদ রায় কেদার

রায়ের সৌহার্দ্য ছিল। একবার ঈশা খাঁ শ্রীপুরে এঁদের বাড়ীতে অবস্থান-কালে সোনামণিকে দেখে উন্মাদপ্রায় হয়ে গেলেন। বাড়ী এসে দূত হস্তে চাঁদ রায় কেদার রায়ের নিকট পত্র পাঠালেন—তাতে সোনামণিকে বিবাহের প্রস্তাব ছিল। ঈশা খাঁর স্পর্ধার সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য অসংখ্য জল ও স্থল সৈন্য নিয়ে ঈশা খাঁর কলাগাছিয়া দুর্গ আক্রমণ করলেন। ধ্বংস করে দিলেন সে দুর্গ। তারপর চাঁদ রায় ঈশা খাঁর রাজধানী খিজির পুর আক্রমণ করে তাঁর সমস্ত ধনভাণ্ডার লুট করে নিলেন। সর্বশেষে জলযুদ্ধে অদ্বিতীয় শক্তিধর কেদার রায়ের নেতৃত্বে ঈশা খাঁর সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ ত্রিবেণী আক্রান্ত হল। এই সময় আর এক বিপর্যয় ঘটল। রাজবাড়ীর পূর্ব গুরু শ্রীমন্ত খাঁ ব্যক্তিগত কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছিল। এবার সে তা চরিতার্থ করবার সুযোগ গ্রহণ করল। ঈশা খাঁর কাছ থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সোনামণিকে এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। চাঁদ ও কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে শ্রীমন্ত শ্রীপুরে এসে মিথ্যা করে বলে যে রাজভ্রাতাদ্বয় বন্দী হয়েছেন, ঈশা খাঁ শ্রীপুরের দিকে এগিয়ে আসছেন, সোনামণিকে হরণ করে নিয়ে যাবেন। দেওয়ান রঘুনন্দনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রানীর উদ্বিগ্নতায় শ্রীমন্ত সোনামণিকে চন্দ্রদ্বীপে তার শ্বশুরালয়ে নিরাপদে রেখে আসার ভাণ করে, সোনামণিকে নিয়ে গিয়ে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করে। এই কথা শুনে চাঁদ রায় কেদার রায়ের উপর যুদ্ধভার অর্পণ করে শ্রীপুরে ফিরে আসেন এবং অপমানে, ক্ষোভে মৃত-প্রায় হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় কেদার রায়কে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবার আদেশ দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অযথা লোকক্ষয় না করে কেদার রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্তিম নির্দেশানুসারে শ্রীপুরে ফিরে আসেন।

চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর কেদার রায় বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি প্রজাদের অবস্থার উন্নতির কাজে মন দিলেন। এবং রাজ্যকে নানাভাবে সুরক্ষিত করে তুললেন। এই সময় ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি মানসিংহ একবার তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন ও সন্দ্বীপ অধিকার করে নেন। তখন কেদার রায় জলযুদ্ধে সুনিপুণ পর্তুগীজদের স্বীয় দলভুক্ত করেন ও তাদের সাহায্যে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সন্দ্বীপ পুনরাধিকার করেন। পর্তুগীজদের সেনাপতি ছিলেন কার্ভালো। কেদার রায় কার্ভালোকেই সন্দ্বীপের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। এর পর আরাকান রাজের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। আবার মোগলদের সঙ্গে কেদার রায়ের সংঘর্ষ বাধে। কেদার রায় পরাক্রান্ত মোগল সেনাপতি মন্দা রায়কে যুদ্ধে নিহত করেন। ফলে মোগল রাজপ্রতিনিধি

রাজা মানসিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। আবার মোগল সেনাপতি কিলমক্ ও রাজা কেদার রায় কর্তৃক বন্দী হওয়ায় মানসিংহের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনি বাংলায় এসে রাজা কেদার রায়কে চিরাচরিত প্রথামত একটি শৃঙ্খল ও একটি তরবারি পাঠালেন। চিরউন্নত বীর রাজা কেদার রায় অবজ্ঞাভরে শৃঙ্খলটি ফেলে দিয়ে তরবারি গ্রহণ করেন। কেদার রায় তাঁর বড় বড় ৫০০ কোষা নামক রণতরী নিয়ে মানসিংহের সম্মুখবর্তী হলেন ও যুদ্ধে রাজা তাঁকে পরাজিত করলেন। কিন্তু অচিরেই কেদারের কীর্তির অবসান হল। একদিন রাজা কেদার রায় নির্জন মন্দিরাভ্যন্তরে চক্ষু মুদ্রিত করে দেবীর পূজা করছিলেন, এমন সময় এক গুপ্তঘাতক এসে কেদার রায়ের মস্তক ছেদন করে। শুনা যায় ভক্তবীর কেদার রায়ের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবার সময়ও "ছিন্নমস্তে নমস্তে, ছিন্নমস্তে নমস্তে" বল্‌তে বল্‌তে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুনা গিয়েছিল। এইরূপে বাংলার এক স্বাধীন হিন্দুরাজা কেদার রায়ের দেহাবসান ঘটে। শোনা যায় রাজা কেদার রায় এককোটি টাকা বেদিমূলে প্রথিত করে তার উপর একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এজন্য ঐ শিবলিঙ্গের নাম হয় কোটীশ্বর।

চাঁদ রায়, রাজা—রাজমহলের বিখ্যাত জমিদার ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পিতার নাম রামচন্দ্র রায়, ভ্রাতার নাম—সন্তোষ রায়। ইনি পূর্বে বড়ই দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। এঁর হাজার অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক সৈন্য ছিল। বাদশাহকে এক পয়সাও কর না দিয়ে এবং লুঠতরাজ করে অর্থ উপার্জন কবতেন। এঁর ন্যায় অত্যাচারী জমিদার কমই দেখা যায়। প্রতি বছর অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপূজা করে এত পশু বলিদান দিতেন যে রক্তের নদী বয়ে যেত। পরবর্তীকালে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পরম বৈষ্ণব হন ও সঙ্গে সঙ্গে এঁর জীবনের গতিবও পরিবর্তন হয়। দস্যুপতি হন পরম ভক্ত, পরস্বাপহারী হন পরম দাতা।

চাঁদ রায়—নদীয়া জেলার বাগ আচড়া গ্রামের জমিদার ও নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র রায়েব দেওয়ান ছিলেন। ইনি ছিলেন কীর্তিমান পুরুষ। রুদ্র রায়ের নির্দেশক্রমে ব্রহ্মশাসন গ্রাম স্থাপন করে বহু বিদ্বান ব্রাহ্মণ পরিবারের বাসস্থান স্থাপন করেছিলেন।

চাঁদ রায়—বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নবাব কাশিম খাঁর কর-সংগ্রাহক কর্মচারী ছিলেন। নবাবের কার্যে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে নবাবের অতি প্রিয়পাত্র হন এবং প্রভূত ধন উপার্জন করেন। প্রথমে নবাবের নিকট থেকে

রায়রায়াণ এবং পরে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

চাঁদ হালদার—খেতরীর মহোৎসবে সমাগত ভক্তদের অন্যতম।

চাই চাং—ইনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুররাজ ধন্যমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি এবং ত্রিপুরার অধিবাসী। ইনি দু'বার গৌড়াধিপতি হুসেন সাহের সেনাদলকে পরাজিত করেছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা-রাজ্যের অধীন হয় এবং বহুকাল ইহা তাঁদের অধীনে থাকে।

চাক্ষুষ—বৈদিক যুগের যযাতি-নন্দন প্রাচীন বঙ্গের কলিঙ্গরাজ অনুর পুত্র। ইনি শাকদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে তথায় রাজা হন।

চাপাল গোপাল—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। হরি-সংকীর্তনের প্রতি এঁর বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। তাই রাত্রিতে শ্রীবাস পণ্ডিতের বহির্দ্বারে ইনি মদ ও মাংসাদি রেখে আসতেন। অল্পকাল পরেই এঁর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ দেখা দিল। কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবের নিকট প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে ইনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন মহাপ্রভু এঁকে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণোদক পান করতে আদেশ করেন। অবশেষে শ্রীবাসের চরণোদক পান করে ইনি আরোগ্য-লাভ করেন।

চম্পাগাজী, পণ্ডিত—ইনি ছিলেন বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। এঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত 'ছতর পটুয়া' গ্রামে। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'রাগনামা', 'তালনামা' প্রভৃতি গ্রন্থে এঁর ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ পাওয়া গেছে। এঁর পিতার নাম ছিল আবদুল কাদের। আত্মপরিচয়ে আছে—'আবদুল কাদের সুত চম্পা-গাজী ভণে।'

চারু ভুঁইয়া—কামতাপুরের (বর্তমান কোচবিহার) অধীন আসামের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ইনি ছিলেন পরাক্রান্ত সামন্ত নৃপতি।

চাশনী পীর—শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ শাহ জালালের অনুগত অন্যতম অনুসঙ্গী ছিলেন। এঁর জন্ম-স্থান ছিল আরব দেশ।

চিং তুং খম্বা বা **ভাগ্যচন্দ্র**—ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মণিপুর রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শান্তিপুরের গোস্বামীরা রাজা চিংতুংখম্বাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে এঁর নাম রাখেন ভাগ্যচন্দ্র। সেই থেকে এঁরা মহাভারতোক্ত বভ্রুবাহনের বংশধর বলে পরিচিত হয়ে আসছেন।

চিত্র সেন—চন্দ্রকোণা প্রভৃতি অঞ্চলের রাজা কীর্তিচন্দ্রের পুত্র। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র পরলোক

গমন করলে চিত্রসেন রায় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক রাজগৌরবে বিভূষিত হন। বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও পঁচেটের রাজারা এঁর চিরশত্রু ছিলেন। শত্রু বিধ্বস্ত করবার জন্য ইনি যে প্রান্তদুর্গ নির্মাণ করেছিলেন আজও তা রাজগড নামে পরিচিত। আজও রাজগড়ের চল্লিশ ফিট উচ্চ প্রাচীর দর্শকের কৌতূহল উদ্দীপিত করে। আজও চিত্রসেনের নামসম্বলিত কামান বিদ্যমান।

চিত্র মতিকা দেবী—বাংলার পাল রাজবংশের শেষ রাজা মদন পালের পট্ট মহিষী। মহাভারত পাঠ শ্রবণ করে দক্ষিণাস্বরূপ চম্পাহিট্টি নিবাসী বটেশ্বর স্বামী শর্মাকে পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়েব কাষ্ঠগিরি গ্রাম দান করেছিলেন।

চিদানন্দ—গৌবাঙ্গ-পার্ষদ সন্ন্যাসী।

চিন্তামণি—বড়গ্রাম নিবাসী শ্যামানন্দ প্রভুব শিষ্য।

চিন্তামণি দাস—রসিকানন্দ-শিষ্য ও সঙ্গীত-বিশারদ।

চিন্ময় রায়, দেওয়ান—বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁব সময়ে তাঁর জায়গীরের সামান্য মোহরার কাজে নিযুক্ত হন। সাধুতা ও কর্মনৈপুণ্যের জন্য ইনি ক্রমে দেওয়ান আলম চাঁদের সহকারীর পদ প্রাপ্ত হন। আলীবর্দী খাঁ এঁকে রায় রায়ান উপাধি দিয়ে খালসার দেওয়ানী পদ (প্রধান রাজস্ব সচিব) প্রদান করেন।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য (শর্মা)—আবির্ভাব কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী। এঁর পূর্বপুরুষ আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কাব্যবিলাস'। চিরঞ্জীবের আসল নাম ছিল রামদেব বা বামদেব। এঁর পিতা ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী রাঘবেন্দ্র। পিতামহ কাশীনাথ সামুদ্রকাচার্য। চিরঞ্জীব পিতার কাছেই ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়েন। কাব্যবিলাসের প্রথমাভঙ্গির অন্তভাগে ইনি নিজ গুরু রঘুনাথ ভট্টাচার্যেব নাম করেছেন। কাব্য-বিলাসের প্রথমা ভঙ্গিতেই ইনি আশ্রয়-দাতা "গৌড়শ্রী যশোবন্তসিংহ নৃপতি"র কথা বলেছেন। কাব্যবিলাস ছাড়া চিরঞ্জীব কল্পলতা, শিবস্তোত্র, মাধবচম্পূ, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, শৃঙ্গার-তটিনী ও বৃত্তরত্নাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও লেখেন।

চিরঞ্জীবের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে। শুনা যায় মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাধবচম্পূর পুষ্পিকায় চিরঞ্জীব লিখেছেন নবদ্বীপে তাঁর জন্ম, কাশীতে তিনি অনেকদিন বসবাস করেছিলেন। বিদ্যাসাগর নামে কাশীবাসী এক গুরুব তি'ন ছাত্র। কাশীতে পিতার মৃত্যুর পর চিরঞ্জীব প্রখ্যাত অধ্যাপকরূপে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন।

চিরঞ্জীব সেন—ইনি শ্রীখণ্ড-

নিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা। গোবিন্দদাস কৃত 'সঙ্গীতমাধব' নাটকে প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, গোবিন্দ দাসের পিতা চিরঞ্জীব সেন 'গৌড়-ভূপাধিপাত্র' ছিলেন। খুব সম্ভব এই 'গৌড়ভূপ'ই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কারণ, চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের পার্ষদদের যে তালিকা দেওয়া আছে, তাতে শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের নাম আছে। সুতরাং চিরঞ্জীব সেন হোসেন শাহেরই সমসাময়িক (১৪৯৬-১৫১৯ খ্রীঃ)।

চিরাতদত্ত—৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পরম দৈবত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তদেবের রাজ্যকালে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে চিরাতদত্ত নামক উপরিক শাসনকর্তা ছিলেন। এই চিবাত দত্ত কর্তৃক নিযুক্ত বেত্রবর্মা নামক কুমারামাত্য তখন কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। বরেন্দ্রভূমির উত্তরাংশ তৎকালে কোটীবর্ষ নামে পরিচিত ছিল।

চিলা রায়—কুচবিহার রাজা নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁর আসল নাম শুক্লধ্বজ। এঁর বীরত্ব ছিল অসামান্য। ইনি নরনারায়ণের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। চিলের ন্যায় অতর্কিত আক্রমণে শত্রুশিবির অধিকার করে যুদ্ধে জয়লাভ করতেন বলেই এঁর নাম হয়েছিল চিলা রায়। শুক্লধ্বজ দ্রঃ।

চূড়ামণিদাস—চৈতন্যচরিতের উপর রচিত চূড়ামণি দাসের একটিমাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তারও আবার আদ্যন্ত খণ্ডিত। ভণিতায় কাব্যের কোন নাম নেই। কেবল একবার মাত্র আছে "ভুবনমঙ্গল",

"শচীর বাৎসল্যরস গৌরাঙ্গ প্রকাশ,
ভুবনমঙ্গল গায়ে চূড়ামণিদাস।"

এই থেকে ডঃ সুকুমার সেন কাব্যটির নাম 'ভুবনমঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন। ভণিতা থেকে কবির শুধু এইটুকু পরিচয় পাওয়া যায় যে তিনি নিত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কাব্যটি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়েই চূড়ামণিদাস কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। পুঁথিতে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়। কারুর কারুর মতে এঁর রচিত কাব্যের নাম "গৌরাঙ্গ বিজয়।"

চৈতন্য দাস—ভূগর্ভের শিষ্য, গোবিন্দপূজক। 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার আজ্ঞাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন' গ্রন্থ মতে এঁর অন্য এক নাম পূজারী গোঁসাই। ইনি গীতগোবিন্দের 'বালবোধিনী টীকা' এবং সম্ভবত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র 'সুবোধনী' টীকা

প্রণয়ন করেছিলেন। এঁর অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দী।

চৈতন্যদাস পণ্ডিত—নিত্যানন্দ প্রভু-পার্ষদ। ইনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় বাঘকেও ভয় করতেন না।

চৈতন্য দাস (বংশীবদন-পুত্র)—বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র। খেতরির শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে যোগদান করার জন্য জাহ্নবাদেবী খড়দহ হতে যাত্রা করলে পথে অন্যান্য বহু বিখ্যাত বৈষ্ণবের সঙ্গে চৈতন্য দাসও তাঁর সঙ্গে যোগদান করে খেতুরি গিয়েছিলেন। এঁর আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

চৈতন্যদাস বাবাজী—মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার ভাদবা গ্রামনিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ-রায়ের একমাত্র পুত্র। এঁর পূর্বনাম ছিল জগবন্ধু। পরে ইনি সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী নামক মহাপুরুষরূপে পরিচিত হন। ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীমন্দিরে অবস্থান করতেন এবং তাঁকে মধুরভাবে ভজনা করতেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

চৈতন্যদাস মুরারি—নিত্যানন্দ প্রভুর গণভুক্ত। এঁর সম্বন্ধে লেখা আছে :

"মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্পসনে খেলা।"

বৈষ্ণব বন্দনায় আছে :

"মুরারি-চৈতন্যদাস বন্দো সাবধানে।
আশ্চর্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ-সমানে॥"

বর্ধমান জেলার সর-বৃন্দাবনপুর গ্রামে মুরারি-চৈতন্যদাসের জন্ম হয়। নবদ্বীপধামের অন্তর্গত মাউগাছি গ্রামে এসে এঁর নাম শাঙ্গ (শারঙ্গ) মুরারি-চৈতন্যদাস হয়েছিল। এঁর আবির্ভাব কাল সপ্তদশ শতাব্দী।

চৈতন্য দাস—(শ্যামানন্দ শিষ্য)—শ্যামানন্দের শিষ্য। পূর্বে ইনি যবন ছিলেন। তখন এঁর নাম ছিল সের খাঁ। ইনি দস্যুবৃত্তি করতেন। পরিশেষে শ্যামানন্দের চরণে শরণ লন এবং তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে পরম বৈষ্ণব হয়েছিলেন, তখনই এঁর নাম হয়েছিল চৈতন্যদাস।

চৈতন্য দাস—(শিবানন্দ পুত্র) কুমারহট্ট বা বর্তমান হালি শহরনিবাসী শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কবি কর্ণপুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি প্রতি বছর পিতার সঙ্গে রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু দর্শনে নীলাচলে গমন করতেন। ইনি কৃষ্ণকর্ণামৃতের সংস্কৃত টীকা লিখেছিলেন। কেউ কেউ বলেন চৈতন্যচরিত মহাকাব্য এঁরই রচিত, কবি কর্ণপুরের নয়। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

চৈতন্য সিংহ—বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা। এঁর রচিত কিছু বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

চৌরঙ্গী নাথ—অন্যতম নাথ-সিদ্ধাচার্য এবং পাল রাজা তৃতীয় দেব পালের পুত্র। কথিত আছে বিমাতার

আদেশে চারি হস্তপদহীন হওয়ায় ইনি 'চৌরঙ্গী' নামে খ্যাত হন। মীনপাদ দেশ ভ্রমণকালে এঁকে দীক্ষাদান করেন। জনৈক রাখাল বালক এঁর সেবার ভার গ্রহণ করেন। এই বালকই ভবিষ্যতে 'গোরক্ষনাথ' নামে খ্যাত হন। চৌরঙ্গী দ্বাদশ বৎসর ধ্যানান্তে সিদ্ধিলাভ করলে এঁর হস্তপদ পূর্ববৎ হয়। ইনি ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের শিষ্য। ইনি নবম অথবা দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এই চৌরঙ্গীনাথের নামেই কলকাতায় চৌরঙ্গী রোড হয়েছে বলে জনশ্রুতি।

ছ

ছকড়ি চট্ট—বিখ্যাত পদকর্তা বংশীবদনের পিতা। তাঁর নিবাস ছিল নদীয়ার পাটুলি গ্রামে। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে ইনি পাটুলিগ্রাম থেকে কুলিয়া পাহাড়পুরে বাসস্থান পরিবর্তন করেন (১৫০৮।৯ খ্রীষ্টাব্দে)। ছকড়ি পরম বিজ্ঞ ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

ছত্রমাণিক্য—ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র। এঁর পূর্বনাম ছিল লক্ষ্মণ দেব। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ মাণিক্যকে পরাজিত করে ছত্রমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করে রাজা হন (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে)। এই সময়ে ফরাসী ভ্রমণকারী টাভার্নিয়ার ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ও ছত্রমাণিক্য সম্বন্ধে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। ছত্রমাণিক্য ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

ছাওয়াল শা—[ওরফে মহম্মদ রমজান আলী] ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'গদাছন নগর' পরগণার অন্তর্গত 'বাঘাপক' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ ৬১টি গীত সম্বলিত 'তরিকতে হকানী' প্রসিদ্ধ।

ছুটিখান—ইনি বাংলার হোসেন শাহী বংশের প্রথম দুই সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) ও নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) সমসাময়িক। এঁর পিতার নাম পরাগল খান (ইনি হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রামের লস্কর নিযুক্ত হন) এঁর প্রকৃত নাম নসরৎ খান। শ্রীকর নন্দী লিখেছেন, "ছুটি খান নাম নসরৎ মহামতি।" এই ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি-মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে বাংলা মহাভারত রচনা করেন। শ্রীকর নন্দী লিখেছেন যে ছুটি খান ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং ত্রিপুরার লস্কর পদে নিযুক্ত হন।

শ্রীকর নন্দী তাঁর মহাভারতে লিখেছেন,

"তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরা গড়েত গিয়া করিল সন্নিধান॥"

ছেঙ চাগ—এঁর অন্য নাম ধর্মধর বা ছেংকাচাগ। ত্রিপুরাপতি মেঘ রাজের পুত্র। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ত্রিপুরা শাসন করেন। ইনি নিধিপতি নামক একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা রাজধানী কৈলাস শহরে বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন।

ছেংথোম্পা—কীর্তিধর দ্র°।

ছেঙকনাই—নামান্তর নৃসিংহ বা সিংহ ফণী। ইনি ছিলেন স্বাধীন ত্রিপুরার নরপতি। এঁর পিতার নাম রাজা খারজ ফার।

ছোটপীর—একজন বিখ্যাত দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ জালাল এমনির অন্যতম অনুগত শিষ্য।

জ

জগৎমাণিক্য—ত্রিপুরার মহারাজা ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র। ইনি বাংলার নবাবের সাহায্যে ১৭৩২ সালে রাজা হন। এঁরই সময় ত্রিপুরাব সমতল ক্ষেত্র 'রোসনাবাদ' নাম প্রাপ্ত হয়ে জমিদারীতে পরিণত হয়।

জগৎ রায়—একজন বাঙালী কবি। আনুমানিক ১৫৬১ শকে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মহিষাডা পরগণার ভুলুই নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতাব নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভা দেবী। ইনি কবিতায় রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। দুর্গা 'পঞ্চরাত্রি' নামক এঁর অপর একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। এর শেষাংশ রচিত হবার পূর্বেই ইনি পরলোক গমন করেন। এঁর মৃত্যুর পর এঁর পুত্র রামপ্রসাদ অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন।

জগৎ সিংহ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড়ের উত্তরে জগৎ সিংহ নামে একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। এঁর নামানুসারে ঐ স্থান জগৎ সিংহগড নামে খ্যাত ছিল।

জগৎজীবন ঘোষাল, দ্বিজ—ইনি মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কবিব পিতার নাম ঘনশ্যাম, মাতা রেবতী, পত্নী পদ্মমুখী। নিবাস আধুনিক দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কোচ আমোরা। জগৎজীবনের কাব্য দুই খণ্ডে বিভক্ত—দেবখণ্ড ও বণিক খণ্ড। বণিক খণ্ডে বেহুলার কাহিনী। জগৎজীবনের কাব্যে গ্রাম্যতা দোষ আছে। কবি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। প্রাণনাথ ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন।

জগৎজীবন মিশ্র—শ্রীপাট—শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। ইনি মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র থেকে অষ্টম পর্যায়। ইনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী'র 'মনঃসন্তোষিণী' নামে অনুবাদ করে-

ছিলেন। রচনাটি সরল, পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই।

জগৎবন্ধু সুন্দর—মুর্শিদাবাদ জেলার ভাহাপাড়া নিবাসী। পিতার নাম দীননাথ ন্যায়রত্ন, মাতার নাম বামাসুন্দরী। জন্ম ১৭৯৩ শকাব্দে। রচিত গ্রন্থ 'শ্রীমতী সঙ্কীর্তন'।

জগৎবল্লভ—একজন বাঙালী কবি। এঁর রচিত একখানি মনসার ভাষান পাওয়া গেছে।

জগৎরাম ভাদুড়ী—বাংলাদেশে পূর্বে মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজার পদ্ধতি ছিল না। বারেন্দ্রভূমিব রাজা জগৎরাম ভাদুড়ী প্রথমে মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়ে নব রাত্রির ব্রত সমাধা করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও মাটির মূর্তি পূজার প্রবর্তক। প্রথম প্রথম লোকে একে আগমবাগীশী কাণ্ড বলত।

জগৎরাম রায়—ইনি বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চেতুয়া ও বরদার তালুকদার শোভা সিংহ বর্ধমান আক্রমণ করে কৃষ্ণরামকে নিহত ও তাঁর পরিবার-বর্গকে কারারুদ্ধ করলে জগৎরাম পলায়ন করে ঢাকায় উপস্থিত হন এবং ঢাকারশাসনকর্তার নিকট বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য সৈনিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজকন্যার হাতে শোভা সিংহের মৃত্যু ও তার সৈন্যদের পলায়নের সংবাদ শুনে জগৎরাম ঢাকা থেকে বর্ধমানে ফিরে আসেন এবং পিতৃসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। সম্রাট আলমগীর এঁকে সনন্দ প্রদান করে সম্মানিত করেন। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত ঘাতকের হাতে জগৎরাম রায়ের মৃত্যু হয়। এঁর দুই পুত্রের নাম যথাক্রমে কীর্তিচাঁদ রায় ও মিত্ররাম রায়।

জগৎরাম সিংহ রায়—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বন্দ্যঘটীয় জগৎরাম রায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামে দুখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। জগৎরামের অদ্ভুত রামায়ণ আট কাণ্ডে ও নয় খণ্ডে বিভক্ত: আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দরা-কাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, পুষ্করকাণ্ড, রামবাস ও উত্তরাকাণ্ড। জগৎ রাম প্রথমে সমগ্র কাব্য রচনা করেছিলেন, পরে পুত্রকে লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরা-কাণ্ড বিস্তার করতে বলেন। রামপ্রসাদ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে রচনা সমাপ্ত করেন। শ্রীরামের দুর্গোৎসব অবলম্বনে পিতাপুত্র কর্তৃক 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' রচিত হয়েছিল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। উভয়ের রচনা ছিল রস-সমৃদ্ধ।

জগৎরামের নিবাস ছিল রানীগঞ্জের নিকট দামোদরের দক্ষিণতীরে ভুলুই গ্রামে। কবির পিতার নাম রঘুনাথ, মাতা শোভাবতী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরামের নির্দেশে কবি কাব্যদ্বয় রচনা করেছিলেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা জগৎরামের আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য "আত্মবোধ" উৎকৃষ্ট রচনা।

ইহা বৈষ্ণবতন্ত্র গ্রন্থ। তফাৎ এই যে কৃষ্ণের পরিবর্তে রামের নাম আছে।

জগৎশেঠ—মধ্যযুগের নবাবী আমলের মুর্শিদাবাদস্থ নবাবদের নিযুক্ত রাজস্ব ও অর্থ বিষয়ক সচীব। ফতেচাঁদ জগৎশেঠ, মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠ ও খুসলচাঁদ জগৎশেঠ দ্র°।

জগদম্বা (রানী)—ইনি ছিলেন মহারাজ নন্দকুমারের পুত্রবধূ, গুরুদাসের সহধর্মিণী। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসের মৃত্যুর পর ইনি নন্দকুমারের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। ইনিও স্বামী ও শ্বশুরের ন্যায় দানশীলা ছিলেন। জগদম্বা স্বামীর বর্তমানেই এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শৈশবেই তার মৃত্যু হয়। গুরুদাসের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্র, সয়দাবাদনিবাসী জগচ্চন্দ্রের পুত্র রাজা মহানন্দ নন্দকুমারের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন। জগদম্বা সম্পত্তি হতে বঞ্চিতা হয়েও নীরব ছিলেন।

জ গ দা ন ন্দ—পূর্ণানন্দ গিরির অপর নাম। পূর্ণানন্দ গিরি দ্র°।

জগদানন্দ—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাটেহালি গ্রামে জগদানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ বটু জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত শাক্তক্রম, ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি" শ্যামারহস্য "তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিণী" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর নাম অক্ষয় করে রেখেছে। তাঁর গুরু ব্রহ্মানন্দ ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত। জগদানন্দের গুরুদত্ত নাম পূর্ণানন্দ। ব্রহ্মানন্দ পিতৃমাতৃ ও আত্মীয়-স্বজনহীন জগদানন্দকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েই কামাখ্যা পীঠের উত্তর সাধক হিসাবেই গড়ে তুলে-ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে জগদানন্দের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনিই পরে পূর্ণানন্দ পরমহংস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জগদানন্দ—ইনি ছিলেন একজন পদকর্তা। শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর পিতৃদেব শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড ত্যাগ করে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত আগরডিহি-দক্ষিণ খণ্ডে বাস করেন। জগদানন্দ এই গ্রাম ত্যাগ করে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার অধীন যোফলাই গ্রামে বাস করেন। সেখানে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। এঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে পঞ্চকোটের রাজা এঁকে আমলালা নামক মৌজা দান করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। ইনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। এঁর পিতামহের নাম ছিল পরমানন্দ। সর্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামে জগদানন্দের তিন সহোদর ছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জগদানন্দ পরলোক গমন করেন। এই উপলক্ষে এঁর বাসস্থান যোফলাই গ্রামে এখনো প্রতি বছর

একটি মহোৎসব হয়ে থাকে। কালিদাস সেন জগদানন্দের পদাবলী সঙ্কলন করেছিলেন। এই সঙ্কলনের ভূমিকায় জগদানন্দের জীবনী-বিষয়ক তথ্য সংগৃহীত আছে। ধ্বনি ঝঙ্কারে ও শব্দ-চিত্রে জগদানন্দ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। শব্দের উপর এঁর অদ্ভুত অধিকার ছিল। পদকর্তারা যাতে সহজে মিল খুঁজে পান, এই উদ্দেশ্যে জগদানন্দ 'ভাষাশব্দার্ণব' নামে একটি সমধ্বন্যাত্মক শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইনি 'গীতগোবিন্দে'র অনুবাদেও হাত দিয়েছিলেন। স্বপ্নাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্তি দর্শন করে 'দামিনীদাম' ও 'গৌরকলেবর' এই সুবিখ্যাত পদদ্বয় জগদানন্দ রচনা করেছিলেন। জগদানন্দের একটি শ্রেষ্ঠ রচনাংশ উদ্ধৃত হল :

"মঞ্জুবিকচ-কুসুম-পুঞ্জ
মধুপ-শবদ-গুঞ্জ-গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুল কুলনারী
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতী-ফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জনগতিহারী।"

জগদানন্দের লেখা তিনটি চিত্রগীত পাওয়া গেছে।

জগদানন্দ—সঙ্গীত-রচয়িতা। বাল্যকাল থেকেই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। চন্দ্রশেখরের "হরিবিলাস" যাত্রার পালায় ইনি রাই সাজতেন।

জগদানন্দ ঠাকুর—বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামের পাহুয়া গোপালের চতুর্থ অধস্তন। ইনি বাংলা ভাষায় ত্রিপদী ছন্দে শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় ও বহু কীর্তনপদ রচনা করেন।

জগদানন্দ দাস—একজন পদকর্তা। এঁর পাঁচটি পদ পাওয়া গেছে।

জগদানন্দ পণ্ডিত—ইনি ছিলেন গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার অন্যতম সঙ্গী। গৌরাঙ্গের কীর্তনারম্ভকাল থেকে কাজী-দলন, নগর-সংকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনায় এঁকে তাঁর সহচররূপে দেখা যায়। মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রাকালে অদ্বৈত-প্রভু ও নিত্যানন্দাদির সঙ্গে জগদানন্দ ও চৈতন্যের পথ-সাথী হিসাবে নীলাচল যাত্রা করেছিলেন। ইনি খুব ভাল রান্না জানতেন। পথে মহাপ্রভু ও সঙ্গীদিগকে রান্না করে খাওয়াতেন। নীলাচলে পৌঁছে ইনি মহাপ্রভুর সেবা ও পরিচর্যায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। মহাপ্রভুর গৌড়-যাত্রাকালে ইনিও সঙ্গে ছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন করলে জগদানন্দ তাঁর সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে বাস করেন। মধ্যে মধ্যে ইনি নদীয়ায় গিয়ে শচীদেবীর নিকট অবস্থান করতেন। মহাপ্রভুর ইনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুকে প্রায়ই ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করতেন এবং নানাদ্রব্য খাইয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। ইনি একবার

বৃন্দাবন দর্শনে গিয়ে সেখানে রূপ সনাতনের সঙ্গে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। চৈতন্যের মহাপ্রয়াণের পর ইনি নীলাচল ত্যাগ করেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—জগদীশ বাংলার নব্যন্যায়ে অত্যন্ত খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাঁর উপাধি ছিল 'জগদ্‌-গুরু'। এই থেকে তাঁর খ্যাতিব অনুমান করা যায়। কারণ, তৎকালে খ্যাতিমান পণ্ডিতদের নামেব সঙ্গেই উক্ত উপাধি যুক্ত হত। নবদ্বীপে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে জগদীশ বাল্যবস্থায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন এবং অধিক বয়সে লেখাপড়া আবম্ভ কবে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত শ্লোক উল্লেখযোগ্য :

"আদৌ জগা জগুঃ পশ্চাৎ জগচ্চ
তদনন্তবম্
ইদানীং গুণ সম্পত্ত্যাং জগদীশায়তে
জগা।"

অর্থাৎ জগদীশকে প্রথমে জগা, জগু ও জগৎ প্রভৃতি তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক নামে অভিহিত করা হত। কিন্তু সেই জগা জ্ঞান সম্পদে এখন জগদীশ হয়েছে।

জগদীশের রচিত মৌলিক গ্রন্থ সমূহ : শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, তর্কামৃত, ন্যায়াদর্শ 'ময়ূখ' নামে জগদীশ 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের চারি খণ্ডেরই টীকা রচনা করেছিলেন, যথা—প্রত্যক্ষ ময়ূখ, অনুমান ময়ূখ, উপমান ময়ূখ ও শব্দময়ূখ। শিরোমণির দীধিব উপর জগদীশের নিম্নলিখিত টীকা পাওয়া যায়: অনুমানদীধিতি টীকা, প্রত্যক্ষদীধিতি টীকা, লীলাবতী দীধিতি টীকা। 'প্রশস্তপাদভাষ্যে'র উপর জগদীশের টীকার নাম 'দ্রব্যসূক্তি'। 'গুণসূক্তি' নামেও তাঁর রচিত একটি টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর অপর গ্রন্থ রহস্যপ্রকাশ।

জানা যায় চৈতন্যমহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রের প্রপৌত্রই জগদীশ। জগদীশের পিতার নাম নৈয়ায়িক যাদব বিদ্যাবাগীশ, পিতামহ মাধব মিশ্র। পণ্ডিতদের মতে জগদীশের জন্মাব্দ ১৫৪০-৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

জগদীশ পণ্ডিত—পিতার নাম কমলাক্ষ, মাতা ভাগ্যবতী ও পিতামহ নাবায়ণ। তপন নামক এক ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা দুখিনীব সঙ্গে জগদীশের বিবাহ হয়েছিল। পিতামাতার মৃত্যুর পর জগদীশ পত্নী দুখিনী ও ভ্রাতা মহেশকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ মিশ্রেব বাড়ীর কাছে এসে বাস কবতে থাকেন। এই সময় গৌরাঙ্গদেবেব জন্ম হয়। কিছুদিন পরে বালক গৌরাঙ্গ একদিন একাদশীর উপবাসী জগদীশ পণ্ডিতের বিষ্ণু-নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন। ক্রমে জগদীশ গৌরাঙ্গের নৈশ-কীর্তন ও কাজীদলনাদি বিশেষ

ঘটনাগুলির সঙ্গে যুক্ত হন। যশড়া নামক স্থানে জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ইনি নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এঁকে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে প্রেরণ করেন। ইনি আজীবন মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। এঁর পুত্রের নাম রামভদ্র। এঁর কন্যার সঙ্গে নিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গাদেবীর পুত্র বল্লভের বিবাহ হয়। জগদীশ পণ্ডিত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

জগন্নাথ—(অতিবড়) পুরী জেলার কপিলেশ্বরপুরে ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথিতে জগন্নাথ জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম পুরাণ পাণ্ডা ও মাতার নাম পদ্মাবতী। জগন্নাথ অতিশয় মেধাবী ও প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কলাপাদি ব্যাকরণ এবং যজুঃ ও সামবেদ অধ্যয়ন করেন। ইনি সুকণ্ঠ ও রূপবান ছিলেন। এঁর মুখে সুন্দর ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করে মহাপ্রভু পরম প্রীত হতেন। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, জগন্নাথ শ্রীমদ্ভাগবতের এক ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা করেন, তাতে তত্ত্ববিরুদ্ধ কথা ছিল। এই ব্যাখ্যা শুনে মহাপ্রভু দুঃখিত হন এবং বলেন,—"জগন্নাথ, তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহা বড়লোকের মতো, সুতরাং তুমি অতি বড় লোক।" সেই থেকে জগন্নাথ 'অতিবড়' নামে পরিচিত হন। এঁর শিষ্যগণ 'অতিবড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ষাট বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ব্রহ্মাণ্ড-ভূগোল, প্রেমসাধন, দুতিবোধ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

জগন্নাথ আচার্য—চৈতন্য চরিতামৃত-'কার জগন্নাথ আচার্যকে মূলস্কন্ধ শাখাভুক্ত করে বলেছেন যে ইনি চৈতন্যের 'প্রিয়দাস' ছিলেন এবং তাঁরই আজ্ঞায় ইনি 'গঙ্গাবাস' করেন। জয়ানন্দের গ্রন্থে মহাপ্রভুর প্রথমবার নীলাচল-গমন-পথ সম্ভবত গঙ্গাতীরবর্তী এই জগন্নাথ আচার্যের গৃহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

জগন্নাথ চক্রবর্তী—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ও নরহরি চক্রবর্তীর পিতা।

জগন্নাথ থানেশ্বরী—মহাপ্রভুর পার্ষদ। মহাপ্রভু এঁকে কৃষ্ণদাস বলে ডাকতেন।

জগন্নাথ পড়িছা—গৌরাঙ্গ-ভক্ত।

জগন্নাথ কবিবল্লভ—অনেকের ধারণা কবি সম্ভবত আসামের অধিবাসী ছিলেন। এঁর 'বন-পর্ব' বৃহত্তর রচনা। আসাম অঞ্চলে এঁর পুথি পাওয়া গিয়েছে। শেষের ভণিতায় কবির নাম ও উপাধি দুইই আছে, "এতেকে হইল পূর্ণ বনপর্ব-গীত জগন্নাথ নাম কবিবল্লভে রচিত॥"

জগন্নাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সুদীর্ঘজীবী মহাপণ্ডিত। পিতার নাম রুদ্রদেব। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। জগন্নাথের পূর্ব পুরুষ দীননাথ ঠাকুর যশোহর থেকে এসে ত্রিবেণীতে বসতি স্থাপন করেন। বাল্যে জগন্নাথের মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বাঁশবেড়িয়াস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তার ন্যায়শাস্ত্রের গুরু ছিলেন রঘুদেব বাচস্পতি। ন্যায়শাস্ত্র আরম্ভ করার এক বছর পরে জগন্নাথ নবদ্বীপের রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করেন। চব্বিশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর জগন্নাথ অতি নিঃস্ব অবস্থায় টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল—ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার ও আয়ুর্বেদ। তাছাড়া, বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রেও তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন। কালক্রমে বর্ধমান রাজ, নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির পোষকতায় তিনি বাংলাদেশের পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নবদ্বীপকে ম্লান করে দেয়। এমন প্রতিভাধর পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তাঁর যৌবনে রচিত 'রাম চরিত' নাটক বর্তমানে বিলুপ্ত। নব্যন্যায়ের উপর তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাও দুষ্প্রাপ্য। শেষ জীবনে স্যার উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্র "বিবাদভঙ্গার্ণব" রচনা করে চিরযশস্বী হয়েছেন। এই বিরাট গ্রন্থে হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির বর্ণনা আছে। জগন্নাথের ৯৮ বছর বয়সকালে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছিল। রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে। এই অলৌকিক প্রতিভাধর ও অদ্ভুত মেধাবী পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সুদীর্ঘ নব্বই বছর অধ্যাপনা করেন, যা জগতের ইতিহাসে বিরল। এঁর সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩ বছর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জগন্নাথ অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। অনেকের মতে জগন্নাথের প্রামাণ্য-গৌরব প্রায় স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের সমান ছিল। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের ভাষায়,

"সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত।"

জগন্নাথ দাস—ইনি পদাবলীতে কিছুটা ধারাবাহিকভাবে ব্রজলীলা বর্ণনা করেছিলেন বলে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন। এঁর পদাবলীর পুথি বড় পাওয়া যায় না। একটি খণ্ডিত পুঁথিতে এক শত তেইশটি পদ ছিল।

এঁর চৈতন্য বিষয়ক পদগুলি হতে মনে হয় খুব সম্ভব ইনি শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

জগন্নাথ দাস—একজন বৈষ্ণব ও পদকর্তা। এঁর রচিত নয়টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে। একটি পদের ভণিতায় ইনি নিজেকে 'অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ' বলে পরিচিত করেছেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জগন্নাথ দাস—ময়মনসিংহ জেলার ধারিশ্বর গ্রামের ইনি ছিলেন একজন সাধক কবি। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম "দুর্গাপুরাণ।" এছাড়া, ইনি "নিগম", "হাডমালা" প্রভৃতি গ্রন্থও লিখেছিলেন। ইনি সস্ত্রীক সাধন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জগন্নাথ দাস—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ভক্তিচরিতামৃত'। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ইহা রচিত হয়। জগন্নাথ দাসের নিবাস ছিল গিলাবাড়ী নামক স্থানে। ইনি ছিলেন গৌরদাস বাবাজীর পিতা। জগন্নাথ দাস ঐ অঞ্চলে গুরুদাস নামে পরিচিত।

ভক্তিচরিতামৃত চারি খণ্ডে বত্রিশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ছন্দ আদ্যোপান্ত পয়ার। এতে অনেক নূতন কাহিনী আছে যা হিন্দী ভক্তমালে বা লাল দাসের কাব্যে [লাল দাস দ্রঃ) নাই। এতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাহিনী আছে।

জগন্নাথ দাস (কাষ্ঠকাটা)—গদাধর পণ্ডিতের শাখা-গণনায় এঁর নাম আছে। "জিতামিশ্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস"। মহারাজা লক্ষণ সেনের বিক্রমপুর রাজধানী সন্নিকটে কাষ্ঠকাটা (বর্তমান নাম কাঠদিয়া) নামক স্থানে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্যের বংশে বহু পুরুষ পরে রত্নাকর মিশ্রের জন্ম হয়। সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ নামে তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সর্বানন্দের পুত্রই 'কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস'। জগন্নাথ লোক মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর পরিকরবর্গের গুণগ্রাম ও মহিমা শ্রবণ করে মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হন। শৈশবে বিদ্যাভাস না করলেও দৈবশক্তি বলে ক্রমে ইনি মহাপণ্ডিত ও বিখ্যাত বক্তা হয়ে উঠেছিলেন। খ্যাতনামা প্রবীণ পণ্ডিতরাও এঁর সঙ্গে বিচারে পরাভূত হতেন। এঁর অবস্থিতি-কাল ষোড়শ শতাব্দী।

জগন্নাথ দাস—পদকর্তা ও 'রসোজ্জ্বল' নামক গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি উৎকল প্রদেশবাসী। শ্রীজগন্নাথ দেবের কীর্তন গায়ক ছিলেন।

জগন্নাথ, দ্বিজ—কবি, জগন্নাথ 'আক্ষটির পালা' কাব্যের রচয়িতা। সম্ভবতঃ তমলুকের রাজা নরনারায়ণের

রাজত্বকালে (১৭৩৮-৩৯) কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কাব্যের বিষয়বস্তু হরিভক্তি।

জগন্নাথ বণিক (বা বেনে)—কবিগান রচয়িতা। ইনি জগন্নাথ দাস বা জগাদাস নামে খ্যাত। ইনি বাগবাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিগান রচয়িতা ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

জগন্নাথ বিদ্যাপঞ্চানন—একজন বাঙালী পণ্ডিত। ইনি চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুশদহে মাটিকোমড়া গ্রামেব বিখ্যাত পণ্ডিত বামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের বংশধর ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামশরণ ন্যায়বাচস্পতির দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে এঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এর ব্যবস্থা ছিল অকাট্য।

জগন্নাথ বিপ্র—নারায়ণদেব বিবচিত 'পদ্মপুরাণ' গ্রন্থেব দু-এক স্থলে এঁর ভণিতা দৃষ্ট হয়।

জগন্নাথ বৈদ্য—এর পিতার নাম লক্ষ্মণ বৈদ্য। ইনি ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে যোগসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে রাবণকৃত কুমারতন্ত্রের রচনাদি পাওয়া যায়।

জগন্নাথ মল্ল—বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা। এঁর পিতার নাম ছিল দুর্গাদাস মল্ল। ইনি ১৭৫ মল্লাব্দ বা ৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। গোলন্দ সিংহের কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। রাজ্যারম্ভকালে ইনি রাধাবিনোদ বিগ্রহের মন্দির এবং একটি সুন্দর রাসমণ্ডপ নির্মাণ করেছিলেন। এঁর রাজত্বকালে বিষ্ণুপুর রাজ্যের বহু বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুর তখন অমরাবতীর ন্যায় শোভা ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। ইনি প্রাকার পরিবেষ্টিত দুর্গ ও সৈনিকাবাস নির্মাণ করেছিলেন। এঁর বিরাট অশ্ব ও হস্তীশালা এবং অস্ত্রাগার ছিল। বিষ্ণুপুর রাজধানী অতি মনোরম করে সজ্জিত করেছিলেন। নগরের নানা স্থানে গীত বাদ্যাদির আয়োজন হত। রাজা জগন্নাথ মল্লের সময় থেকেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীত চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়েছে। এঁর সময় বহু বিদেশী বণিক এসে বিষ্ণুপুরে বসতি বিস্তার করেন। ৩৬৬ মল্লাব্দে বা ১০৫১ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথমল্ল পরলোক গমন করেন। এঁর পুত্রের নাম ছিল অনন্তমল্ল।

জগন্নাথ মাহিতী—'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী শ্রীক্ষেত্রে প্রথম বৎসর কৃষ্ণজন্ম যাত্রা-দিনে নন্দমহোৎসবকালে জগন্নাথ মাহিতী ব্রজেশ্বরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পিতা। জগন্নাথ মিশ্রের

পিতা উপেন্দ্র মিশ্র ছিলেন শ্রীহট্ট নিবাসী। জগন্নাথ পিতার তৃতীয় পুত্র। ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলে উপেন্দ্র মিশ্র এঁকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য সুদূর নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে পরম পাণ্ডিত্য লাভ করে জগন্নাথ 'পুরন্দর' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীহট্টবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তী ইতিপূর্বে নবদ্বীপে এসে বসবাস করছিলেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যা শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথের বিবাহ হয়। জগন্নাথের আটটি কন্যা হয়ে নষ্ট হয়। তারপর এঁর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এঁর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করেন।

জগন্নাথ শর্মা—অভিধান সঙ্কলয়িতা। এই অভিধানখানি ১৮৩৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এঁর জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। অভিধানের শব্দ সংখ্যা ষোল হাজার।

জগন্নাথ সিংহ—কান্দী রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বনমালী সিংহের পৌত্র। ইনি দেশবিখ্যাত ছিলেন। রাজা গণেশের রাজত্বকালে জগন্নাথ সিংহ প্রধান বিচারকের পদ লাভ করে "সর্বাধিকারী" উপাধি পান এবং সমগ্র রাঢ় প্রদেশে সম্মান অর্জন করেন।

জগন্নাথ সিংহ শর্মা—'জগদ্ধাত্রী গীতাবলী' [illegible] রচয়িতা। ইনি ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের (১১৫৬-১২২৮ বঙ্গাব্দ) চতুর্থ পুত্র। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জগন্নাথ সেন—ইনি হিতোপদেশ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে। দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় প্রত্যন্তে ধলভূমে অম্বিকা-নগরবাসী শাহিজাদা উপাধিক রাজা গোপীনাথ ধবলের পুত্র অনন্ত ধবলের নির্দেশে জগন্নাথ সেন হিতোপদেশ পাঁচালী কাব্য রচনা করেছিলেন। জগন্নাথ সেনের পিতা ছিলেন বংশীবদন। এঁরা বংশানুক্রমে ছিলেন রাজসেবক।

জগন্মোহন গোসাঞি—অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বাঘাসুরা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর থেকে 'জগন্মোহিনী' নামে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হয়েছে।

জগবন্ধু ঘোষ রায়—চৈতন্যদাস বাবাজী দ্রঃ।

জগমোহন মিত্র—মনসা-মঙ্গল কাব্যের কবি। এঁর রচিত গ্রন্থের তারিখ ১৭৬৯ সাল। গ্রন্থে বর্ণিত কবির আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায় বালাণ্ডার অন্তর্গত গোহপুরে ছিল কবির নিবাস। এঁর পিতার নাম রামচন্দ্র। কবির রচনা থেকে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির বিনয় প্রকাশের ভঙ্গী দেখে

কেউ কেউ কবিকে বৈষ্ণব বলে অনুমান করেন। কবির নিজের ভাষায়,—

"নাম রাখিয়াছে সবে শ্রীজগমোহন।
অন্ধের যেমন নাম কমললোচন॥"

জ গা ই-মা ধা ই—নবদ্বীপের অধিবাসী ও ব্রাহ্মণ সন্তান। প্রথম জীবনে এঁরা ছিলেন মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল, ও পাপাচারী। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করে এঁদের চরিত্র সংশোধিত হয় এবং পরে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হয়ে উঠেন। জগাই ও মাধাই সম্ভবতঃ কোন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ লোচনদাস তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখেছেন যে তাঁরা ছিলেন নবদ্বীপের "ঠাকুর"।

"মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুই ভাই।
নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥"

ঠাকুর অর্থে কোটাল জাতীয় কোন রাজপদকে বোঝায়। হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সময় এঁরা হয়তো নবদ্বীপের কোটাল ছিলেন।

জটাধর—জটাধর সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। স্বীয় গ্রন্থে জটাধর 'চাটুগ্রাম' নিবাসী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এই চাটুগ্রাম সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম। 'অমর কোষের' নারায়ণ বিদ্যাবিনোদাচার্য-রচিত টীকা থেকে জানা যায়, জটাধর তাঁর পিতামহ। জটাধরের রচিত গ্রন্থের নাম 'অভিধানতন্ত্র' বা 'জটাধরকোষ'। এঁর পিতা ছিলেন রঘুপতি।

জ না র্দ ন ক র্ম কা র—মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত "জাহানকোষা" নামক সুবৃহৎ কামান-নির্মাতা। ১৬৩৭ সালে এই কামান নির্মিত হয়েছিল। এই কামানটি ছিল ওজনে ২১২ মন। এর দৈর্ঘ ১২ হাত ও ব্যাস ৩ হাতের বেশী। জনার্দন ছিলেন শ্রীহট্টের অধিবাসী। ঐ জেলার পাঁচগাও নামক স্থানের কর্মকাররা এখনো "জনার বংশ" বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

জনার্দন দাস রায়—কুলীন ব্রাহ্মণ, পিতার নাম শুভানন্দ রায়। শ্রীধাম নবদ্বীপ-নিবাসী। ইনি প্রসিদ্ধ ভক্ত জগাইয়ের খুল্লতাত এবং মাধাই-এর পিতা। ভ্রাতার নাম রঘুনাথ।

জনার্দন, দ্বিজ—একজন কবি। পূর্ব বঙ্গের বহুস্থান থেকে জনার্দনের চণ্ডী নামক ব্রতকথার একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গেছে। এই জনার্দনের আত্মপরিচয় বা আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে এঁর পুঁথির বহুল প্রচার দেখে মনে হয়, ইনি আধুনিক কালের কবি নন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবির একখানা পুঁথিকে প্রায় ২৫০ বছরের পুরাতন বলে উল্লেখ করেছেন। জনার্দনের চণ্ডীর দুটি অংশ—প্রথম অংশে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। উভয় কাহিনীই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

কেউ কেউ মনে করেন এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিই ক্রমে মাধব ও কবি কঙ্কণ প্রভৃতির হাতে পড়ে মঙ্গল কাব্যের রূপ লাভ করেছে। জনার্দনের রচনা বেশ সহজ ও সরল, কিন্তু কাব্যগুণ কিছু কম। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী।

জনার্দন মিশ্র—শ্রীহট্ট-ঢাকা দক্ষিণ নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র এবং মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের ভ্রাতা। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' আছে :

"জগন্নাথ-সেবক এই, নাম জনার্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন।"

জনার্দন শেঠ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দালাল। এই দালালী করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জনার্দন সেন—'সদ্বৈদ্য কৌস্তভ' নামক একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি মধ্যযুগীয় লোক।

জব্বার আলি খাঁ, সৈয়দ—মুসলমান শাক্ত কবি। কথিত আছে ইনি কালী পূজা করতেন। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জব চার্ণক—জাতিতে ইংরেজ। কলকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির প্রথম প্রবর্তক। ১৬৫৫ বা ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক কুড়ি পাউণ্ড বেতনে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে পাঁচ বছরের জন্য এদেশে আসেন। ইনি প্রথমে অল্পদিন বালেশ্বর ও রাজমহলের কুঠিতে কাজ করে পাটনার কুঠিতে নিযুক্ত হন। তখন এঁর প্রধান কাজ ছিল পাটনার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ থেকে সোরা খরিদ করে বিলাতে পাঠাবার জন্য মাদ্রাজে পাঠানো। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি পাটনায় অবস্থান করেন। তারপর ইনি কাশীমবাজার কুঠির অধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত হন। কৌন্সিলের দ্বিতীয় সদস্যের পদেও ইনি নিযুক্ত হন। কাশীমবাজারে জুনিয়ার মেম্বাররূপেও এঁর নাম পরিদৃষ্ট হয়। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর প্রধান এজেন্টের মৃত্যু হওয়ায় এঁকে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়। জব চার্ণকের হুগলীতে আসার পরই মোগল সৈন্যের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর হুগলী বাজারে তিনজন ইংরেজ সেনা মোগল সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরেজদের অবস্থা বিপজ্জনক দেখে চার্ণক মোগল তোপখানা আক্রমণের চেষ্টা করেন। প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরে চন্দননগর থেকে আগত ইংরেজ সেনার সাহায্যে ইনি তোপখানা দখল করতে সমর্থ হন। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন আরবুথনট মোগল শাসন-কর্তার আবাস অভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় চার্ণক হুগলীকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে ছদ্মবেশে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করেন। হুগলী ধ্বংস করায়

অভিপ্রায়ে সমস্ত রাত্রি ও পরদিন পর্যন্ত শহরের উপর অগ্নিবর্ষণ চলল। পরিশেষে ইংরেজরা জয়ী হলেন। উভয় পক্ষ থেকে যুদ্ধ স্থগিত করা হল। কিন্তু চার্ণক নিশ্চিন্ত হতে না পেরে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে এঁর ক্ষুদ্র জাহাজগুলিতে কোম্পানীর মালপত্র পূর্ণ করে কর্মচারী ও সেনাগণ-সহ গভীর রাত্রে হুগলী ত্যাগ করে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট সুতানুটিতে এসে উপস্থিত হন। এর পূর্বে আরও দু'বার এই স্থানে এলেও ইহাই এঁর কলকাতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। পাটনায় অবস্থানকালে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এক পঞ্চদশ বর্ষীয়া সহগমনোন্মুখ হিন্দু মহিলাকে উদ্ধার করে চার্ণক তাঁকে বিবাহ করেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে জীবনসঙ্গিনীরূপে রেখেছিলেন। এঁর সেই পত্নীর গর্ভে মেরী, ক্যাথরিন ও এলিজাবেথ নামে তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার সেণ্টজন্ গির্জাসংলগ্ন সমাধি স্থানে চার্ণক ও এঁর হিন্দু স্ত্রীর সমাধি আজও বিদ্যমান।

জয়কৃষ্ণ আচার্য—সম্ভবতঃ কাঞ্চনগড়িয়া নিবাসী চৈতন্য পার্ষৎ দ্বিজ হরিদাসাচার্যের পৌত্র এবং শ্রীদাসের পুত্র। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের প্রথমা পত্নী দ্রৌপদীর শিষ্য। জয়কৃষ্ণ ছিলেন একজন পদকর্তা। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে নানাবিধ পদ রচনা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য—প্রখ্যাত তার্কিক, সম্ভবতঃ নদীয়াবাসী। বহু গ্রন্থকারই ন্যায়মতে কারক-সমাসাদি ব্যাকরণের বিষয়সমূহের লক্ষণাদি বিচার করেছেন—তন্মধ্যে জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্যের 'সারমঞ্জরী' সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র। কোলব্রুক্ সাহেব এই গ্রন্থের যে বঙ্গাক্ষর প্রতিলিপি লণ্ডনে নিয়ে যান, তার পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের 'মহামহোপাধ্যায়' ও 'তর্কাচার্য' উপাধি লিখিত আছে। গ্রন্থটি এককালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জয়কৃষ্ণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

জয়কৃষ্ণ দাস—একজন কবি। হুগলী জেলার গড়বাড়ী নামক গ্রামের অধিবাসী। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী কবির জীবিতকাল। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম বৈষ্ণব-দিগদর্শন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির আদিতে যাঁদের দান অবিস্মরণীয় পণ্ডিত জয়-গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁদের অন্যতম। ১৭৭৫ সালের ৭ অক্টোবর নদীয়া জেলার বজরাপুর গ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশ) জয়গোপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কোলব্রুক সাহেবের বাংলাভাষা শিক্ষার পণ্ডিত ছিলেন। তারপর ১৮০৫-১৮২৩, এই দীর্ঘ আঠার বছর কাল শ্রীরামপুরের

উইলিয়ম কেরীর অধীনে চাকরি করেন। ঐ সময় তিনি কিছুদিন শ্রীরামপুর মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮১৮ সালের ২৩ মে জে. সি. মার্শম্যানের উদ্যোগে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান নামেমাত্র সম্পাদক ছিলেন। প্রথম থেকেই জয়গোপাল পত্রিকা-সম্পাদনের সমস্ত দায়িত্ব বহন করতেন। ১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে মাসিক ষাট টাকা বেতনে জয়গোপাল সাহিত্য-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং বাইশ বছরকাল অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনা-কার্য সম্পাদন করেন।

জয়গোপাল যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ঐ কলেজের ছাত্র। জয়গোপাল সুরসিক ও সুলেখক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অতুলনীয়। গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও বাংলা ভাষার জন্য তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা-ও শ্রমের অন্ত ছিল না। 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদনা করার সময় ভাষাকে সহজ সরল ও সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তোলার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং আশাতিরিক্ত সফলকাম হন। সংবাদ-পত্র মারফৎ জয়গোপালই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী করে তুলেন।' এজন্য বাঙালী জাতি তাঁর নিকট অশেষ ঋণী। তাঁর আর এক অসামান্য কীর্তি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতকে সহজ সুললিত ছন্দে পুনর্লিখিত করা। তৎ-কর্তৃক সম্পাদিত মহাকাব্যদ্বয় বাঙালীর নিকট অত্যন্ত সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

১৮৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল জয়গোপাল নবদ্বীপধামে পরলোক গমন করেন। রচনাবলী : শিক্ষাসার, বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোকাঃ, পত্রের ধারা, চণ্ডী, কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ সম্পাদন, কাশীরাম রচিত মহাভারত সম্পাদন, পারসীক অভিধান, বঙ্গাভিধান। তাছাড়া, তাঁর দ্বারা গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীমহাভারতে'র তৃতীয় খণ্ডেরও তিনি সম্পাদনা করেন।

জয়গোপাল দাস—ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভক্ত ও ভক্তিধর্ম প্রচারকদের মধ্যে জয়গোপাল দাস বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সম্ভবত কায়স্থ ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী ছিলেন। উচ্চ-নীচ জাতিভেদ ইনি মানতেন না। তাই রক্ষণশীল শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীনিবাস আচার্যপ্রমুখ বৈষ্ণব মহাত্মেরা এঁকে বর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর 'কৃষ্ণবিলাস'

লেখা হয়েছিল ১৫৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে। জয়গোপালের আর একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়—'ভক্তিভাবপ্রদীপ'।

শিষ্য ঘনশ্যামদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস' গ্রন্থের উপক্রমণিকায় গুরু জয়গোপালের বর্ণনা করেছেন,

"স্নিগ্ধ সুবলিত তনু রসে ঢল-ঢল জনু
শ্যামলবরণ অনুপাম
বদন বিমল ইন্দু বচন অমিয়া-বিন্দু
শ্রীজয়গোপাল দাস নাম।"

জয়গোবিন্দ দাস—জয়গোবিন্দ—সনাতন গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছেন। ইনি ছিলেন কায়স্থ। উপাধি বসুচৌধুরী। পিতার নাম গোকুলচন্দ্র। নিবাস বর্ধমান জেলার বেনাপুর। ১৭৬৪ শকের ২ চৈত্র জয়গোবিন্দ গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য সম্পন্ন হয়।

জয়দত্ত—দীপংকর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক। অর্থাৎ এঁর অবস্থিতি-কাল দশম শতাব্দী। দীপংকরের সঙ্গে ইনি অশ্ববৈদ্যক বা অশ্বায়ুর্বেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

জয়দেব—ইনি বৈদ্যক শাস্ত্রে 'ঈষৎতন্ত্র' বা 'রসাধ্যায়' নামক রসগ্রন্থ, কামশাস্ত্রে 'রতিমঞ্জরী' এবং ছন্দঃ শাস্ত্রে 'ছন্দঃসূত্র' প্রণয়ন করেন। এঁর অবস্থিতিকাল তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী। গীত গোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব থেকে ইনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

জয়দেব, কবি—লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি এবং সম-সাময়িক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক মধুর কোমলকান্ত পদাবলী কাব্য 'গীত গোবিন্দ' ভারতের সর্বজন সমাদৃত গ্রন্থ। এই কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা এবং পরবর্তী ও সমসাময়িক কালের অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ভাষা এক উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। জয়দেব ছিলেন যুগন্ধর ও সৃষ্টিধর কবি। তাঁর এই গীতগোবিন্দ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। অনুমান হয়, তিনি অন্য এক বা একাধিক কাব্যও রচনা করেছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে তাঁর একত্রিশটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর রচিত দুটি কবিতা শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ-সাহেবে স্থান পেয়েছে। তিনি ছিলেন পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। তিনি যোগমার্গ সাধনা এবং শৌর্য-বীর্য-যুদ্ধ-তুর্য-সংগ্রামের উপরও কাব্য রচনা করেছিলেন। জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতা রামাদেবী (পাঠান্তরে বামাদেবী, রাধাদেবী) স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তাঁর জন্মস্থান বীরভূম জেলার অজয় নদীতীরস্থ কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রাম।

জয়দেব—ইনি "গীতগোবিন্দ" প্রণেতা জয়দেব নন। ইনি "প্রসন্ন-রাঘব" রচয়িতা। এঁর পিতার নাম মহাদেব এবং মাতার নাম সুমিত্রা। এই জয়দেবের "চন্দ্রালোক" নামে

একখানি অলঙ্কারের গ্রন্থও আছে। অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ (?) শতাব্দী।

জয়দেব—কালিকাপুরাণরচয়িতা। ইনি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জয়দেব তর্কবিশারদ—রাজসাহীর অন্তর্গত সাঁতোড়ের রাজা রামকৃষ্ণ সান্যালের অন্যতম সভা পণ্ডিত। ইনি ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

জয়দেব তর্কালঙ্কার—নবদ্বীপ সমাজের আদি পত্রিকাকার। এই জয়দেব ছিলেন গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তীর ছাত্র। এঁর পিতার নাম দেবীদাস ভট্টাচার্য। জয়দেব জন্মস্থান বরেন্দ্রভূমি থেকে এসে নবদ্বীপে বসবাস করেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীবিত ছিলেন।

জয়দেব মিশ্র (পক্ষধর)—গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পরবর্তী একমাত্র মৈথিল মহানৈয়ায়িক। এঁর রচিত গ্রন্থ 'মন্থালোক'। জয়দেবের টীকা গ্রন্থ অবলম্বন করে মিথিলায় এবং বাইরে ভারতের বহু প্রদেশে নানা উপটীকা ও টিপ্পনী রচিত হয়ে অন্যূন দু'শ বছর ধরে নব্যন্যায়ের এক পৃথক্ ও প্রবল সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তিন খণ্ড 'আলোক' ব্যতীত ইনি বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের 'দ্রব্যপ্রকাশে'র টীকা, "লীলাবতীবিবেক" নামে "লীলাবতীপ্রকাশে"র টীকা এবং শশধরের ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন। এঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র বাসুদেব মিশ্রের চিন্তামণিটীকায় 'প্রমাণপল্লব' নামক অজ্ঞাতপূর্ব এক গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। প্রত্যক্ষখণ্ড ও অনুমানখণ্ডের প্রারম্ভে জয়দেব পিতৃব্য হরিমিশ্রকে স্বীয় অধ্যাপক বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে ইনি যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। জানা যায় যজ্ঞপতির পক্ষাবলম্বীদের সঙ্গে তাঁর ছাত্র অথচ তাঁর বিরোধী জয়দেবের পক্ষীয়দের মধ্যে কৌতুক-জনক বাদানুবাদ চলেছিল। পরিশেষে জয়দেবের দলই জয়ী হয়। দু'পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিথিলার সারস্বত জীবনে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। নব্যন্যায়ে মিথিলার অবনতির যুগে জয়দেবের গ্রন্থকে বাঙালীরাই শেষ পর্যন্ত টীকা-টিপ্পনী রচনা করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। জয়দেব কখনো নিজেকে 'পক্ষধর' নামে গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করেননি—সমকালীনদের মধ্যে প্রতিভাসূচক এই উপনাম প্রচার লাভ করে। জয়দেবের অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

জয়ন্ত—শক্তিস্বামীর প্রপৌত্র এবং কল্যাণস্বামীর পৌত্র। (শক্তিস্বামী ও কল্যাণস্বামী দ্র°)। জয়ন্ত কবি-প্রতিভা ও বাগ্মিতার জন্য সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বেদ-বেদাঙ্গ ও অন্য নানা শাস্ত্রে এঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। এঁর

অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী।

জয়ন্ত চন্দ্র—চন্দ্রবংশীয় রাজা। সুন্দরবনের 'জটার দেউল' নামে খ্যাত মন্দিরটি নাকি জয়ন্তচন্দ্র কর্তৃক ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

জয়ন্তশূর—কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্যের সামন্ত। ইনি আদিশূরের সমসাময়িক (অষ্টম শতাব্দী)। ইনি ছিলেন গৌড় পুণ্ড্র বর্ধনের শাসনকর্তা। অপুত্রক অবস্থায় জয়ন্তশূর মারা গেলে আদিশূরের পুত্র ভূশূর এঁর রাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন।

জয়নাগ—শশাঙ্কের পর মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে জয়নাগ নামে এক শক্তিশালী রাজা একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল সপ্তম শতাব্দী। ইনি মঞ্জুশ্রী উক্ত নাগবংশীয়।

জয়পাল—পালরাজ ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের পুত্র। ইনি ছিলেন দেবপালের (৮২০-৮৫৮ খ্রীঃ) সেনাপতি। এঁরই সাহায্যে দেবপাল শত্রু দমন করে বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং কতকগুলি নূতন রাজ্যও জয় করেছিলেন। ইনি ছিলেন দেবপালের অর্জুনতুল্য ভ্রাতা। এঁর বীরত্ব তৎকালে সুবিদিত ছিল। নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে —"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (দেবপাল) অনুজ্ঞা-ক্রমে বলবান্ জয়পাল দিগ্বিজয়ার্থে চতুর্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াই উৎকলের রাজা জয়পালের বশীভূত হইয়া অধীনত্ব স্বীকাররূপ মাল্য মস্তকে পরিয়া চিরকাল শান্তিতে অবস্থান করিয়াছিলেন।" প্রাগ-জ্যোতিষের (আসাম) রাজা জয়পালের আজ্ঞায় যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করে পালরাজের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

জয়পাল দীক্ষিত—মধুকোষের টিপ্পনীকার। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দী।

জয়বর্ধন—বাঙ্গলার এক প্রাচীন রাজা। গুপ্তবংশের অবসানের পর ইনি বঙ্গদেশে রাজত্ব করছিলেন বলে অনুমিত হয়।

জয়মঙ্গল—প্রসিদ্ধ টীকাকার। এঁর রচিত ভক্তি কাব্যের টীকা অতি প্রসিদ্ধ। ইনি টীকাকার মল্লিনাথের পূর্ববর্তী।

জয়মল্ল—বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ বা আদিমল্লের পুত্র। ৩৪ মল্লাব্দ বা ৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে আদিমল্ল পরলোক গমন করলে জয়মল্ল রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সূর্য-বংশীয় দিনু সিংহের কন্যাকে বিবাহ করে-ছিলেন। জয়মল্ল কয়েকটি অঞ্চল জয় করে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেছিলেন। ইনি ষট্‌চক্র-বিহারী নামক দেবতার মন্দির নির্মাণ

করেছিলেন। এঁর প্রধান কর্মচারীর নাম ছিল ভাগীরথী গোপ। ত্রিশ বছর রাজত্ব করে জয়মল্ল পরলোক গমন করেন।

জয়মাণিক্য—স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি উদয়মাণিক্যের পুত্র। ইনি মাত্র দেড় বছর (১৫৯৬-১৫৯৭) রাজত্ব করেন।

জয়রবি—১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'জয় পরাজয়' নামক একখানি বৈষ্ণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জয় সিংহ—রাজা রামপালের (১০৬১-১১০৩ খ্রীঃ) সামন্ত দণ্ডভুক্তির (মেদিনীপুরের দাঁতনের) রাজা। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতে' রাজা জয়সিংহের নাম পাওয়া যায়। অগস্ত্য যেমন সিন্ধুকে গ্রাস করেছিলেন, জয়সিংহও সেইরূপ উৎকল দেশের অধিপতি কর্ণকেশরীকে পরাভূত করেছিলেন বলে উল্লিখিত আছে।

জয় সেন—পীঠীপতি বুদ্ধসেনের পুত্র। ইনি "লক্ষ্মণসেনস্য অতীত রাজ্য-সম্বৎসর—৮৩" এই অব্দে বৌদ্ধ-গয়ার মহাবোধি বিহারকে একখানি গ্রাম দান করেন। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব করতেন।

জয়নারায়ণ ঘোষাল—কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের জমিদার পরিবারের পূর্ব-পুরুষ। ইনি ছিলেন কবি। এঁর পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র, পিতামহের নাম কন্দর্প এবং প্রপিতামহের নাম বিষ্ণুদেব। জয়নারায়ণের জন্ম হয় ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আশ্বিন। কবির পূর্বপুরুষ যদুনাথ পাঠক চব্বিশ পরগণা জেলায় প্রচুর ভূসম্পত্তি করে গিয়েছিলেন। কবি জয়নারায়ণ তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক তিনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জনসাধারণের নিকট তিনি রাজা জয়নারায়ণ নামেই পরিচিত ছিলেন। কাশীতে বসবাস কালে তিনি সেখানে কীর্তি রেখে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জয়নারায়ণ কলেজ এখনো বিদ্যমান। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তিনি "কাশীখণ্ড" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এই কাজে তিনি কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল। ছন্দ বৈচিত্র্য ও ভাষার সরলতায় গ্রন্থখানি সুন্দর ও সুখপাঠ্য। কবি জয়নারায়ণের অন্যান্য রচনা: (১) শঙ্করী-সঙ্গীত, (২) ব্রাহ্মণার্চ্চন-চন্দ্রিকা, (৩) জয়নারায়ণকল্পদ্রুম ও (৪) করুণানিধান-বিলাস।

জয়নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—'সর্বদর্শন সংগ্রহ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। ইনি সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ষড়্-দর্শনে ইনি তৎকালে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে অধ্যাপক কাউয়েল সাহেব এঁর নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের অভিপ্রায় জানালে

বিজাতীয় বলে ইনি সেই প্রস্তাবে সম্মত হন নি। জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

জয়নারায়ণ রায়—বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে সহকারী কানুনগো ছিলেন। ইনি নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

জয়নারায়ণ সেন (রায়)—ইনি লালা জয়নারায়ণ নামেও পরিচিত। এঁর নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও রাজনগরের নিকটবর্তী জপসাগ্রামে। ইনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি এবং তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। জয়নারায়ণের পিতার নাম ছিল লালা রামপ্রসাদ, মাতা সুমতি। রাম-প্রসাদের চারি পুত্রের মধ্যে জয়নারায়ণ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। পিতামহের নাম কৃষ্ণরাম ও প্রপিতামহ সুবিখ্যাত গোপীরমন সেন। জয়নারায়ণের আনন্দময়ী নামে এক বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। তাঁর সংস্কৃত শাস্ত্রে, বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর জ্ঞান ছিল। জয়নারায়ণ আনন্দময়ীর সহযোগিতায় "হরিলীলা" নামে একখানি সত্য-নারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। জয়নারায়ণ একখানি চণ্ডীকাব্যও প্রণয়ন করেন। এটির রচনাকাল ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্য মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয়।

জয়রাম তর্কালঙ্কার—উত্তর-বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিত। এঁর নিবাস ছিল পাবনা জেলায়। জয়রামের পিতা পুঁটিয়ারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

জয়রাম দাস—এঁর রচিত কাব্যের নাম 'গঙ্গামঙ্গল'। এটি একটি ক্ষুদ্র কাব্য, রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কবি ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। পিতার নাম রামচন্দ্র, নিবাস গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া)। কবি বলেছেন যে তিনি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুসরণ করেছেন।

জয়রাম দ্বিজ—বাঙালী কবি। এঁর রচিত একখানি মনসার ভাসান পাওয়া গেছে। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন—'ন্যায় সিদ্ধান্তমালা'র রচয়িতা। ইনি এঁর রচিত তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতির গূঢ়ার্থ বিদ্যোতন টীকায় বলেছেন যে ইনি ন্যায় রহস্যকার রামভদ্রের শিষ্য। কাশীতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এক ব্যবস্থা-পত্রে জয়রামের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। কাজেই ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় এঁর জন্ম। এঁর রচিত সাতখানি গ্রন্থ ও উনিশখানি পুস্তিকার তালিকা শাস্ত্রী ন্যায়সিদ্ধান্তমালার ভূমিকায় দিয়েছেন।

'জয়রামী' ও 'রহস্যদীপিকা' প্রভৃতি জয়রামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিষ্য জনার্দন ব্যাস কর্তৃক ইনি 'জগদ্গুরু' আখ্যায় অভিহিত হয়েছিলেন।

জয়ানন্দ মিশ্র—বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামনিবাসী "পরম-ভাগবত" সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র। কবির মাতার নাম ছিল রোদনী দেবী। এঁরা ছিলেন বন্দিঘাটী বংশীয় অর্থাৎ বাঁড়ুজ্জে বামুন। রোদনী দেবীর ছেলে হয়ে বাঁচত না। তাই জয়ানন্দের জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল—গুইঞা। নীলাচল থেকে গৌড়ে যাবার সময় পথে চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের অতিথি হন। সেই সময় তিনি গুইঞার নামকরণ করেন—জয়ানন্দ। অনেকের মতে জয়ানন্দের মন্ত্রগুরু ছিলেন অভিরাম গোস্বামী। আবার কেউ কেউ তাঁকে কবি গদাধর পণ্ডিতের সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় জয়ানন্দ চৈতন্যচরিত গ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে ১৫১১ থেকে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অনুমান অনুযায়ী চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়।

জয়াপীড়—কাশ্মীররাজ জয়াপীড় জজ্জা কর্তৃক পরাভূত হয়ে কিছুসংখ্যক অনুচরসহ বঙ্গদেশে আসেন এবং ক্রমে গঙ্গাতীরস্থ পুণ্ড্রবর্ধনে উপস্থিত হন। একদিন সন্ধ্যার পর জয়াপীড় এক কার্তিকের মন্দিরে কমলা নামে এক রূপসী নর্তকীর নৃত্য দেখেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রেমাবেশে আকৃষ্ট হন। নৃত্যশেষে জয়াপীড় কমলার বাড়ীতে গমন করেন। সেখানে এক বন্য সিংহকে বধ করে ইনি ঐ স্থান নিরুপদ্রব করেন। তখন চারিদিকে জয়াপীড়ের যশ ছড়িয়ে পড়ে। এই সব শুনে পুণ্ড্রবর্ধনরাজ "জয়ন্ত" জয়াপীড়কে সাদরে নিজ প্রাসাদে নিয়ে যান এবং নিজ দুহিতা কল্যাণীকে এঁর সঙ্গে বিবাহ দেন। বীর জয়াপীড় গৌড়ের পাঁচ ভাগ জয় করে শ্বশুরকে অর্পণ করেন এবং "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" উপাধিভূষিত করেন। সম্ভবতঃ ইনি ৭৭২-৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে-ছিলেন।

জয়েন উদ্দিন—বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর ভ্রাতা হাজী আহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র। আলীবর্দী তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমকে জয়েন উদ্দিনের সঙ্গে বিবাহ দেন। এঁদেরই পুত্র বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা। আলীবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হয়েই জয়েনউদ্দিনকে শৌকতজঙ্গ উপাধি ও বিহারের নবাবী পদ প্রদান করেন।

জয়েন খাঁ—মেদিনীপুরে ক

অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার জামাতা। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে এঁর শ্বশুর তাজ খাঁ পরলোক গমন করলে জয়েন খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জলধর পণ্ডিত—বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের পিতা। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট। সেখান থেকে নবদ্বীপে এসে সস্ত্রীক বাস করেন। এঁর পাঁচ পুত্র নলিন পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত, শ্রীকান্ত পণ্ডিত। নলিন পণ্ডিতের কন্যাই নারায়ণী দেবী, এঁরই পুত্র বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা।

জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য—ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' ও অন্যান্য রাঢ়ীয় কুল-গ্রন্থে বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র বলে এঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এঁর জন্ম আনুমানিক ১৪৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। জলেশ্বর পক্ষধর মিশ্রের 'শব্দালোক' গ্রন্থের উপর 'শব্দালোকোদ্দ্যোত' নামক টীকা রচনা করেন। বাহিনীপতি খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন কামদেব পণ্ডিতের পুত্র সুধাকরের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। গ্রন্থমধ্যে স্বরচিত মীমাংসাশাস্ত্রীয় একটি গ্রন্থের এবং 'দ্রব্যপ্রকাশটিপ্পনী'র নাম আছে। 'আলোকে'র বাঙালী টীকাকারদের মধ্যে জলেশ্বর প্রাচীনতম। জলেশ্বর ছিলেন মহানৈয়ায়িক।

জল্পেশ্বর—জিতারি নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সময়ে সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে 'জল্পেশ্বর' নামক জনৈক রাজা পশ্চিম কামরূপে কিছু খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কথিত আছে তিনি জলপাইগুড়ির বিখ্যাত জল্পেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী হয়তো তিস্তাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, জল্পেশ্বরের রাজধানী ছিল মন্দিরের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'পৃথু রাজার গড়ে।'

জাতখড়্গ—বাংলার খড়্গ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়্গোদ্যমের পুত্র। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে ইনি ছিলেন বাংলার সমতটের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। অবিরত রাজবিপ্লবে এবং পুনঃ পুনঃ বহিঃ শত্রুর আক্রমণে গৌড়-বঙ্গ যখন জর্জরিত হয়ে পড়েছিল, তখন জাতখড়্গের শাসনাধীনে পূর্ববঙ্গের প্রজাপুঞ্জ কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ শান্তিলাভ করেছিল।

জাতবর্মা—পাল রাজবংশের তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক, অর্থাৎ ইনি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন। এঁর বংশ ইতিহাসে বর্ম রাজবংশ নামে পরিচিত। এঁরা কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরের আদিমবাসী। কারুর কারুর মতে এঁরা দক্ষিণ রাঢ়স্থ সিংহাপুর বা বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুরের অধিবাসী। জাতবর্মা প্রবল পরাক্রান্ত রাজা

ছিলেন। ইনি নিজ ভুজবলে অঙ্গদেশে পালরাজ এবং বরেন্দ্র কৈবর্তরাজ দিব্যেব সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এবং দিব্বোককে পবাস্ত কবেন। তিনি কামরূপবাজ ও গোবর্ধন নামক বঙ্গ দেশীয় কোন এক বাজাকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তিনি বর্ণরাজ-কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ কবেন। জাতবর্মাব পিতার নাম ছিল বজ্রবর্মা।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণি—বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিবোমণির সমসামযিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে এঁর জন্ম হয নবদ্বীপে। তিনি নিজ গ্রন্থে দীধিতিকাব শিবোমণিব মতেব উল্লেখ কবেছেন। জানকীনাথ রচিত গ্রন্থসমূহ: ন্যাযসিদ্ধান্তমঞ্জবী, আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ—গৌতমসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়েব টীকা। জানকীনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে (১৪৯০-১৫১৫) গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন বলে অনুমিত হয। তাঁব 'ন্যাযসিদ্ধান্তমঞ্জর্বী' ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ কবেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই বাংলাদেশে এর বিরল প্রচাব। কাশী প্রভৃতি সমাজে নব্যন্যায়েব অধ্যাপনা এই গ্রন্থ দ্বারাই আরম্ভ হত। এবং তদুপরি বহু টীকা রচিত হয়ে পৃথক এক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাঁর রচিত আরও দু'খানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা: মণিমরীচি, তাৎপর্যদীপিকা।

জানকীরাম দাস—উপাধি বিশ্বাস। পিতার নাম করুণাকর দাস। বনবিষ্ণুপুর-নিবাসী। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। এঁর অপর ভ্রাতার নাম প্রসাদ দাস। দুই ভাইয়েব হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের যাবতীয় লিখনকার্য এঁরাই সম্পাদন করতেন।

জানকীরাম সোম (রায়) মহারাজা—চুচুড়ার সোম বংশ জাত। ইনি ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা কৃষ্ণবল্লভ উড়িষ্যার সুবেদাব নবাব সুজাউদ্দিনের কানুনগো ছিলেন। জানকীরাম মীর্জা মহম্মদ আলী নামে এক তহশীলদারেব অধীনে প্রথমে পেস্কাব নিযুক্ত হযেছিলেন। এই মীর্জা মহম্মদ আলী পবে নবাব আলীবর্দী খাঁ নামে পবিচিত হন। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দীন বাংলার সুবেদাব এবং আলীবর্দী বিহারেব নায়েব সুবেদাব নিযুক্ত হন। তখন আলীবর্দী জানকীরামকে সুবে-বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর আলীবর্দী বাংলাব নবাব অথবা সুবেদার নিযুক্ত হয়ে জানকীরামকে মুর্শিদাবাদে তাঁর দেওয়ান অথবা রাজস্ব মন্ত্রিপদে বহাল করেন। এরপর জানকীরাম সোম স্বীয় বুদ্ধিবলে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিহত করে মারাঠাদিগকে পরাজিত করলে ইনি "দেওয়ান-ই-তান" অথবা সেনাবিভাগে প্রধান দেওয়ানী পদে

উন্নীত হন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নবাব তাঁকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বিহারে নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করেন। ইনি নামেমাত্র সিরাজউদ্দৌলার অধীনে সুবেদার ছিলেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলী-বর্দী মারাঠাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করলে সিরাজউদ্দৌলা স্ব-সৈন্যে পাটনায় উপস্থিত হয়ে রাজা জানকীরামকে দুর্গ ত্যাগ করতে আদেশ দেন। জানকীরাম আদেশ অমান্য করলে সিরাজউদ্দৌলা এঁর প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করেন। জানকীরামও প্রত্যুত্তর দিলেন। এতে সিরাজ-সেনাপতি মেদী-নেসার যুদ্ধে নিহত হন এবং সিরাজউদ্দৌলা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। নবাব আলীবর্দী উড়িষ্যা থেকে ফিরে এসে উভয়পক্ষকে শান্ত করেন। বিহারে সুবেদার থাকাকালে জানকীরাম বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইনি বিদ্রোহী জমিদারদের আয়ত্তে আনেন এবং বিহারের জায়গীর সমূহের রাজস্ব আদায় ক'রে দিল্লীর সম্রাটের নিকট নিয়মিত প্রেরণ করতেন। সেজন্য দিল্লীর সম্রাট এঁকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করে ছ'হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। মহারাজা জানকীরাম ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একষট্টি বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

জাফর খাঁ—পাঠান সেনাপতি। এঁর প্রকৃত নাম বহরাম-ইৎ-গিন হুমায়ুন। জাফর খাঁ পরবর্তীকালে লব্ধ নাম। ইনি সপ্তগ্রামবিজয়ীরূপেই সমধিক খ্যাত। ইনি কিছুকাল দিনাজপুরের নিকটবর্তী দেবকোটেরও শাসনকর্তা ছিলেন। খুব সম্ভব ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সপ্তগ্রাম জয় করেন। সপ্তগ্রামে এখনো এঁর সমাধি মন্দির আছে।

জাফর খাঁ—এঁর প্রকৃত নাম মুর্শিদকুলি খাঁ। মুর্শিদকুলি খাঁ দ্র°।

জাফর খাঁ গাজী—ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-পাণ্ডুয়া-মহানাদ অঞ্চলে প্রথম যখন মুসলমান অভিযান হয়, তখন গাজী সাহেবরাই তাতে অংশ গ্রহণ করতেন। জাফর খাঁ গাজী তার মধ্যে আদি ও অন্যতম। ঐ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারে তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ভাগনে বা ভাইপো শাহ সুফীর। তখন ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের স্থানীয় হিন্দু রাজা ছিলেন মান নৃপতি ও ভূদেব নৃপতি। তাঁদের সৈন্যদলের সঙ্গে জাফর খাঁ ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মান নৃপতি নাকি পরাজিত হয়ে ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু ভূদেব নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধে জাফর খাঁ গাজী নিহত হন। ত্রিবেণীতে গাজীর সমাধির উপর ঐ সময় একটি মসজিদ্ তৈরী হয়েছিল। ঐ মসজিদ্ই বর্তমানে বাংলাদেশের সব-চেয়ে প্রাচীন মসজিদ্। শুনা যায়

সিংহবিক্রম জাফর খাঁ গাজী নাকি খড়্গ ও ভল্ল নিয়ে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। জাফর খাঁর সমাধির পূর্বদ্বারে পাথর সংলগ্ন একটি লৌহখণ্ড আছে, স্থানীয় লোকে বলে 'গাজীর কুড়ুল'। ইহা তাঁর সেই খড়্গ ও ভল্ল নিয়ে লড়াই করারই স্মৃতি বহন করছে। সিংহবিক্রম জাফর খাঁ নাকি গঙ্গাদেবীর মূর্তি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে কোরানের বদলে গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেছিলেন। কোরানের বদলে গঙ্গাস্তোত্র। ধর্মযোদ্ধা গাজী এইভাবে অবিশ্বাসীদের গঙ্গাদেবীকে বরণ করে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বরেণ্য হয়েছেন।

জাফর আলি খাঁ—সচরাচর মীরজাফব নামে পরিচিত। মীর-জাফর দ্র°।

জাবেদ আলী খোন্দকার—বাঙালী মুসলমান কবি। 'মধুমালার কেচ্ছা' নামক পুস্তক এঁর রচিত। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জামাল খাঁ—কতলু খাঁর তৃতীয় পুত্র। ইনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। উড়িষ্যা-যুদ্ধকালেই জামাল খাঁর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের পরিচয় হয়েছিল। এবং সম্ভবতঃ মোঘলের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পরই জামাল খাঁ যশোহর সরকারে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন।

জামাল খাঁ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত ইটার স্বাধীন ব্রাহ্মণ রাজা সুবিদনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্যনারায়ণ মুসলমান হওয়ার পর এঁর নাম হয়েছিল জামাল খাঁ।

জামির—সৈয়দ হিদায়ত আলা খাঁর কবিজনসুলভ নাম। ইনি বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীঃ) আত্মীয় ছিলেন। এঁর উপাধি ছিল নাসিরউদ্দৌলা বকসি্ উল মুল্ক আসাদ জঙ্গ বাহাদুর। ইনি কিছুকাল পাটনার সুবেদার ছিলেন। সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বের প্রারম্ভেই ইনি পরলোক গমন করেন।

জালন্ধরিনাথ বা হাড়িপা—নাথ সিদ্ধাচার্য। তিব্বতী ভাষায় লিখিত 'প্‌াগ্‌শামজোন্‌বজান' নামক গ্রন্থে আছে—বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র সিদ্ধা বালপাদকে (অপর নাম হাড়িপা বা জালন্ধর সিদ্ধ) জীবন্তে মাটিতে পুতে রাখেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে হাড়িপার শিষ্য কানফা সিদ্ধ (কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য) গুরুকে মুক্ত করেন। জালন্ধরিনাথের জন্ম হয় সিন্ধু-দেশে। ইনি জাতিতে ছিলেন শূদ্র, বাংলাদেশের ওড্ডিযানে থেকে ইনি যোগধর্ম শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও ঐন্দ্রজালিক শাস্ত্রে এঁর বিরাট অধিকার ছিল। সম্ভবতঃ গোরক্ষনাথ এঁর গুরু ছিলেন। রানী ময়নামতী ও তৎপুত্র গোপীচন্দ্র এঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এঁর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দী।

জালাল সাহ—বঙ্গেশ্বর বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর তাঁর কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় তাঁর ভ্রাতা জালাল সাহ বাংলার মসনদে বসেন.(১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু মাত্র তিন বছর বাংলা শাসনের পর ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। জালাল সাহের আমলের সর্বপ্রধান ঘটনা কালাপাহাড়ের আবির্ভাব। শোনা যায় কালাপাহাড় নাকি ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে জালাল সাহের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

জালালুদ্দীন—উত্তর বঙ্গের ভাতুড়িয়ার জমিদার ও পরে বঙ্গাধীশ্বর রাজা গণেশের পুত্র। এঁর পূর্বনাম যদুসেন। কারুর কারুর মতে যদু ছিলেন রাজা গণেশের কোন মুসলমান উপপত্নীর পুত্র। আবার অনেকের মতে ইনি ছিলেন গণেশের হিন্দু পত্নী ত্রিপুরা দেবীর গর্ভজাত। যদুর মুসলমান হওয়া সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন ইনি গণেশের মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত বলে মুসলমান হয়েছিলেন। আবার কেউ বলেন ইনি কোন মুসলমান সাধুর চর্বিত পান খেয়েছিলেন বলে জাতিচ্যুত হয়েছিলেন। কারুর কারুর মতে ইনি গণেশের মুসলমান উপপত্নীর কন্যা আসমান তারার প্রেমে পড়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজা গণেশ চারিদিকের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রাজ্য রক্ষার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শ্রেয় বলে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু নিজে অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাই পুত্রকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। পরে নাকি রাজা গণেশ শুদ্ধি করে পুত্রকে হিন্দু করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি আবার জালালুদ্দীন নাম ধারণ করে বাংলার রাজা হন। এবং হিন্দুদের উপর নাকি অমানুষিক অত্যাচার করেন। তাঁর প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে সুবর্ণধেণুব্রত অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাকি তিনি গো-মাংস খাইয়ে জোর করে মুসলমান করেছিলেন। জালালুদ্দীন সোনারগাঁও থেকে সুবিখ্যাত মুসলমান সাধু সেখ সাহেদকে আনিয়ে তারই নির্দেশমত সমস্ত রাজকার্য করতেন। জালালুদ্দীন চীন সম্রাট যং-লো, পারস্যের শাহ্, মিশরের সুলতান অাশরফ এবং দামাস্কাসের খলিফার কাছে দূত ও উপহারাদি প্রেরণ করতেন, যা বাংলার তৎকালীন ইতিহাসে ছিল অচিন্তনীয়। হিন্দু-বিদ্বেষী হলেও ইনি বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করে ছিলেন। জালালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন রায় রাজ্যধর। জালালুদ্দীন চাটগাঁ পর্যন্ত নিজের রাজ্যসীমা বিস্তার করেছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বহু

শিল্পকলা-বিশিষ্ট মসজিদাদি নির্মাণ করে ইনি প্রাচীন গৌড় নগর সুসমৃদ্ধ করেছিলেন। পাণ্ডুয়া ধনজন পরিপূর্ণ জনপদে পরিণত হয়েছিল। গৌড়ের ভগ্ন মসজিদ, অতিথিশালা, দীঘি প্রভৃতি "জালালী কীর্তি" বলে এখনো পরিচিত।

জালালুদ্দীন মহিন্তা-বংশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত এবং স্মৃতিরত্নহার, পদচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বৃহস্পতি মিশ্রকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করে ছিলেন এবং রায়মুকুট ও পণ্ডিত-সার্বভৌম উপাধি দিয়েছিলেন। কারুর কারুর মতে জালালই নাকি স্বীয় রানীর প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে কবি চণ্ডীদাসকে হস্তী পৃষ্ঠে বেঁধে বেত্রাঘাত করে হত্যা করেছিলেন। ইনি ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে চোদ্দ বছর রাজত্ব করার পর ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

জালালউদ্দিন তব্‌রেজী—মখদুম শাহ জালালউদ্দিন এদেশে মখদুম-পীর নামে বিখ্যাত। এদেশের অনেক গ্রাম এঁর নামানুসারে অভিহিত হয়ে থাকে। ইনি পারস্যদেশের তব্‌রেজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পারস্য থেকে প্রথমে দিল্লীতে আসেন। তারপর বাংলায় আগমন করেন। এদেশে জালালউদ্দিন প্রচুর সম্পত্তি উপার্জন করেছিলেন; কিন্তু সমস্তই ইনি দীন-দুঃখী ও ফকিরদের উৎসর্গ করে যান। ইনি পাণ্ডুয়ার সমস্ত হিন্দু দেবালয়ের ধ্বংস সাধন করেন। কোন প্রাচীন হিন্দু দেবালয়ের স্থানে এঁর দরগা নির্মিত হয়েছে। প্রতিবছর রজব মাসের ২২ তারিখে পাণ্ডুয়ার জালালউদ্দিনের ফাতেহা হয়ে থাকে। এঁর সম্পত্তিকে বাইশ-হাজারী বলে। ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়াতে তব্‌রেজীর মৃত্যু হয়েছিল।

জালালুদ্দীন ফতে শাহ—ইলিয়াস শাহী বংশের বঙ্গাধিপ শামসুদ্দীন ইউসুপ শাহের মৃত্যুর (১৪৮২ খ্রীঃ) পর তাঁর পুত্র সেকেন্দর শাহ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি উন্মাদ বলে তাঁকে তিন দিন পরে রাজ্যচ্যুত করা হয় এবং তার স্থানে হোসেন নামে এক রাজকুলজাত যোগ্য যুবককে সিংহাসনে বসান হয় (১৪৮২ খ্রীঃ)। ইনি জালালুদ্দীন ফতে শাহ নাম ধারণ করে রাজ্য শাসন করেন। তাঁর রাজ্যসীমা পূর্বে শ্রীহট্ট ও দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর নদ পযন্ত বিস্তৃত ছিল। জালালুদ্দীন ফতে শাহ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। ইনি পণ্ডিত ও জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই বিজয় গুপ্তের বিখ্যাত মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল। জালালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবি বিজয়গুপ্ত

তাঁর দেশের চতুঃসীমার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

"মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর ॥"

ফতে শাহের রাজত্বকালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এই সকল মসজিদের মধ্যে ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, শ্রীহট্ট ও সপ্তগ্রামের মসজিদ উল্লেখযোগ্য। ইলিয়াস শাহী রাজাদের রাজত্বকালে হাবসী যোদ্ধাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। তারা একদিন ফতে শাহকে হত্যা করল। রাজা জালালুদ্দীন ফতে শাহ ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হলেন।

জালালউদ্দিন মসুদ জানি—দিল্লীর সম্রাট নাসিরউদ্দিন (১২৪৬-৬৫ খ্রীঃ) এঁকে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। মাত্র এক বছর শাসন করে ইনি পদচ্যুত হন।

জালালউদ্দিন, শেখ—দরবেশ। জন্মস্থান পারস্যের অন্তর্গত তবরেজ নগর। ভ্রমণ ব্যপদেশে ইনি বাংলাদেশে আসেন। রাজা লক্ষ্মণসেন এঁর গুণ-গ্রামে মুগ্ধ হয়ে এঁকে বাইশ হাজার বিঘা নিষ্কর জমি মালদহ জেলায় প্রদান করেন। এই নিষ্কর পীরপাল ভূমি এখনো মালদহ জেলায় বর্তমান আছে। এই সাধুর বিবরণ নিয়ে প্রসিদ্ধ 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থ রচিত হয়।

জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ কাবুলী—১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক বিহারের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ বঙ্গের শাসনকর্তৃ-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁর পূর্ব নাম ছিল লালা বেগ। কিঞ্চিদধিক এক বছর কাল ইনি বঙ্গদেশের শাসন কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তারপর এঁর মৃত্যু হয়।

জাহান খাঁ—শ্রীহট্টের শাসন-কর্তা লোদী খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি নিজ নামে জাহানপুর নামে একটি গ্রাম স্থাপন করেছিলেন। ইনি খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন। ইনি ছিলেন দিল্লীর সম্রাট আকবরের সমসাময়িক।

জাহ্নবা দেবী—নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী এবং শালিগ্রাম-নিবাসী সূর্যদাসের কনিষ্ঠা কন্যা। ইনি 'জন্ম-বন্ধ্যা' ছিলেন। তাই নবদ্বীপের বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রামচন্দ্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই রামচন্দ্রকে ইনি আজীবন সঙ্গে রেখে-ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে ইনি বিপুল সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ইনি জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও সপত্নী বসুধা দেবীর সঙ্গে খড়দহে অবস্থান করতেন। ইনি খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেন এবং ঐ উৎসবে এঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চে। উৎসব শেষে ইনি ভক্তবৃন্দ-সহ বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছলে রূপ-সনাতন ও অন্যান্য গোস্বামীরা এঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানান। ইনি বোরাকুলি 'মহা-

মহোৎসবে'ও যোগদান করেছিলেন। 'প্রেমবিলাস' রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস এবং সুবিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস প্রভৃতি বহু ভক্ত জাহ্নবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতি-কাল ষোড়শ শতাব্দী।

জাহ্নবী দেবী, মহারানী—ইনি ত্রিপুরার মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের স্ত্রী। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণ মাণিক্য পরলোক গমন করলে জাহ্নবী দেবী প্রায় তিন বছর রাজ্য শাসন করেন। এঁর কোনো সন্তান ছিল না। কৃষ্ণ-মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমণির পুত্র রাজধরকে ইনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। জাহ্নবী দেবী কুমিল্লা নগরে একটি দীর্ঘিকা খনন করান। তা এখনো রানীর দীঘি নামে পরিচিত।

জিতারি বা **জেতারি**—কামরূপে পালরাজাদের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী) জিতারি নামক জনৈক বৌদ্ধসন্ন্যাসী মধ্যকামরূপে একটি রাজ্য স্থাপন করে-ছিলেন। জিতারি মুনি বরেন্দ্রভূমির সনাতন রাজার পুত্র এবং তিনি বিক্রম-শিলা সত্রের সংস্থাপক ছিলেন। জিতারি প্রথম মহীপালদেবের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং মহীপাল-দেবের নিকট (৯৭৮-১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ) 'পণ্ডিত' উপাধি ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, জিতারি মুনি গৌহাটীর নিকটস্থ কুবেরাচলে রাজপাট স্থাপন করে-ছিলেন। মতান্তরে, তিনি জলপাই-গুড়ির অন্তর্গত জল্পেশ্বরের নিকটে রাজত্ব করতেন। তিনি আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

জিতারি ছিলেন অতীশ দীপঙ্করের বাল্যগুরু। জিতারির গুরু ছিলেন ধর্মকীর্তি নামক এক পণ্ডিত। এঁর রচিত তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'সুগত-মত-বিভঙ্গ-কারিকা' অন্যতম।

জিতারি—(কনিষ্ঠ) ইনি ছিলেন বোধিভাগ্য লাবণ্যবজ্রের গুরু। ইনি একাদশ খণ্ড বজ্রযানী-সাধনের রচয়িতা। ইনি পাল রাজার অধীন সামন্তরাজ সনাতনের সভা পণ্ডিত ছিলেন।

জিতেন্দ্রিয়—জীমূতবাহন তদ্‌রচিত 'কালবিবেক', 'দায়ভাগ' ও 'ব্যবহারমাতৃক' গ্রন্থে জিতেন্দ্রিয়ের উল্লেখ ও বচন উদ্ধার করা দেখে মনে হয় জিতেন্দ্রিয়ও ঐসব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে থাকতে পারেন। জীমূতবাহনের ন্যায় খ্যাতিমান্ লেখক কর্তৃক এঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকে মনে হয় যে ঐ সময়ে জিতেন্দ্রিয় বঙ্গদেশে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক বলে গণ্য হতেন। জিতেন্দ্রিয়কে আনুমানিক নবম-দশম শতকের লেখক বলে ধরা হয়।

জিনমিত্র—ধর্মপালের সমসাময়িক। ইনি তিব্বত-রাজের অনুরোধে এক-খানা সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধান রচনা

করেছিলেন। ইনি 'অভিধর্মসমুচ্চয়-ব্যাখ্যা' নামে একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ দশম শতাব্দী।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি—এঁকে বাঙালী বলেই অনেকে মনে করেন। বিখ্যাত আলঙ্কারিক ভামহ এঁর উল্লেখ করেছেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক। জিনেন্দ্র নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন 'বোধিসত্ত্ব-দেশীয়াচার্য' বলে। কোন কোন পুথিতে তাঁকে 'স্থবিরবাজেন্দ্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তম অষ্টম শতাব্দী। ইনি বামন-জয়াদিত্য রচিত কাশিকাবৃত্তির ব্যাখ্যা করেছেন 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা' নামক গ্রন্থে। ইহা 'ন্যাস' নামে সমধিক পরিচিত। এঁর অন্য গ্রন্থ 'ধাতুপ্রদীপ' বাংলার বৈয়াকরণগণের মধ্যে জিনেন্দ্র বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ আসন লাভের অধিকারী।

জিন্নতুন্নিসা বা **আজিমন্নেসা**—নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র কন্যা। দাক্ষিণাত্যবাসী সুজাউদ্দিনের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। মুর্শিদকুলী সুজাউদ্দিনকে উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত করলে জিন্নতুন্নিসা তাঁর সঙ্গে উড়িষ্যায় গমন করেন। ইনি অত্যন্ত স্বামীভক্তিপরায়ণা ছিলেন। সুজাউদ্দিন ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁর চরিত্রদোষ ছিল। জিন্নতুন্নিসা স্বামীকে সৎপথে আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষে বিফল হয়ে মুর্শিদাবাদে পিত্রালয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু আজীবন ইনি পতিব্রতা ছিলেন।

জিয়াউদ্দিন খাঁ—বাংলার সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময় (১৭০৪-২৫ খ্রীঃ) ইনি হুগলীর স্বাধীন ফৌজদার ছিলেন।

জিষ্ণাণি—বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য। উদয়নাচার্যের পিতা বৃহস্পতি ভাদুড়ী এঁর নিকট বিচারে পরাজিত হয়ে প্রাণত্যাগ করলে উদয়নাচার্য ক্রোধে উদ্দীপ্ত হন এবং মৃত্যুপণ করে বৌদ্ধাচার্যের সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হন এবং জয়লাভ করেন। পণ অনুসারে বৌদ্ধাচার্য জিষ্ণাণির প্রাণদণ্ড হয়। জিষ্ণাণির অবস্থিতিকাল চতুর্দশ শতাব্দী।

জীকন—ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ', শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক', 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক', 'শ্রাদ্ধবিবেক', 'তিথিবিবেক', রঘুনন্দনের 'মলমাস তত্ত্ব', 'শুদ্ধিতত্ত্ব', 'তিথিতত্ত্ব' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে জীকনের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তিনি এই সব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রঘুনন্দনের মতে জীকন 'অনুমরণ বিবেক' নামক একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন। ইনি বালকেরও পূর্ববর্তী বলে অনেকে অনুমান করেন। পাল রাজত্বকালে সম্ভবতঃ নবম শতকে ইনি জীবিত ছিলেন। একমাত্র বাঙালী স্মার্তগণের গ্রন্থে এঁর

নামোল্লেখ দেখে এঁকে বাঙালী বলে অনুমান করা অসমীচীন নয়।

জীব গোস্বামী—এঁর জন্ম হয় ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে। জীব গোস্বামী রূপ ও সনাতনের ভ্রাতা অনুপমের পুত্র। ইনি বাল্যে পিতৃহীন হন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইনি সন্ন্যাস ধর্মের প্রতি আসক্ত হন। নবদ্বীপে নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জীব কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। পরে বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন এবং সেখানে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেন। বৃন্দাবনে তাঁদের নিকট জীব ভক্তিশাস্ত্রে শিক্ষা-লাভ করেন। জীব গোস্বামী, তাঁর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের চেষ্টায় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ভক্তিশাস্ত্র বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রসার-লাভ করেছিল। ইনি ছিলেন রূপ ও সনাতনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। জীব গোস্বামীর 'সঙ্কল্প কল্পদ্রুম' কাব্য কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট নিত্যলীলা অবলম্বনে রচিত। এতে কৃষ্ণকে কল্পবৃক্ষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। জীবের 'মাধবমহোৎসব' কাব্য নয় উল্লাসে রচিত। কৃষ্ণ'কর্তৃক রাধার বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক ও তদুপলক্ষে আনন্দোৎসব এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। তাঁর 'গোপালচম্পূ' ৭০ অধ্যায়ে রচিত ও পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ এই দু'ভাগে বিভক্ত বিরাট কাব্য। পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও উত্তরার্ধে মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রচলিত কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। জীবরচিত 'গোপাল-বিরুদাবলী' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বর্ণিত হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জীবের ছয়টি সন্দর্ভ বিশেষ প্রামাণ্য, যথা—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্টস্বরূপ জীব 'সর্বসংবাদিনী' নামক গ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন। জীব গোস্বামী পিতৃব্য সনাতনের আদেশে সনাতন-রচিত 'বৈষ্ণব তোষণী'র একটি সংক্ষিপ্তসার 'লঘুতোষণী' প্রণয়ন করেন।

জীব গোস্বামীর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: কৃষ্ণার্চাদীপিকা' (কৃষ্ণ অর্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি), 'গোপালতাপনী' (উপনিষদের টীকা), 'ব্রহ্মসংহিতার ব্যাখ্যা, 'পদ্মপুরাণে'র যোগসারস্তবের টীকা,'অগ্নিপুরাণে'র গায়ত্রী মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

জীব 'হরিনামামৃত' নামে একটি ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। ইনি স্বরচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্টস্বরূপ 'ধাতুসংগ্রহ' বা 'ধাতুসূত্রমালিকা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জীব-রচিত পঁচিশখানি গ্রন্থ বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য রত্নবিশেষ। চৈতন্য পরিকল্পিত বৃন্দাবন রচনায় জীব

গোস্বামীর দান অসামান্য। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে জীব গোস্বামী দেহত্যাগ করেন।

জীবন চক্রবর্তী বা **জীবন, "দ্বিজ"**—এঁর 'বিষ্ণু-মঙ্গল' বা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের খণ্ডিত পালার পুথিই পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ইনি সম্পূর্ণ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা খুব সম্ভব মল্লাব্দ। ইনি "দ্বিজ" জীবন নামেও পরিচিত।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয়—ইনি করতোয়া নদীতীরবর্তী লাহিড়ীপাড়া গ্রামের অধিবাসী। ইনি কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। সুতরাং ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর রচিত মনসা-মঙ্গল কাব্যের নাম "বিষহরী-পদ্মাপুরাণ।" রচনাকাল ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি একখানি শিবায়ণও রচনা করেছিলেন। কবির পিতার নাম অনন্ত, মাতা স্বর্ণলতা, পত্নী ব্রজেশ্বরী। জীবনকৃষ্ণের উপাধি ছিল "কবিভূষণ"। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবন মৈত্রের মনসা মঙ্গল রচিত হয়েছিল। কবি নিজেকে নাটোরের রানী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলে উল্লেখ করেছেন। কবির অবস্থা ছিল অত্যন্ত অস্বচ্ছল। কবির কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই ছিল বেশী।

জীবনধারণ পরমেশ্বর—গুপ্তবংশীয় রাজা আদিত্য সেন (৭ম শতাব্দী) যখন রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়ে পূর্ব ভারত জয় করছিলেন, তখন বাংলার রাজা জীবনধারণ পরমেশ্বর তাঁকে রাজ্যবিস্তারে বার বার বাধা দিয়েছিলেন।

জীমূতবাহন—রাঢ় দেশীয় পারিভদ্রকুলে জীমূতবাহনের জন্ম হয়েছিল। এঁর জীবিতকাল দ্বাদশ শতাব্দী বলেই অনুমিত হয়। জীমূতবাহন অসীম মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অন্ততঃ তিনখানা গ্রন্থ এঁর রচিত—কালবিবেক, ব্যবহারমাতৃকা এবং দায়ভাগ। হিন্দুদের আচরিত বিবিধ অনুষ্ঠানের কাল নিরূপণ করাই কালবিবেক গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ব্যবহার মাতৃকায় ব্রাহ্মণ্য আদর্শানুযায়ী বিচার পদ্ধতির আলোচনা আছে। দায়ভাগ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। হিন্দু সমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পত্তি-বিভাগ এবং স্ত্রী-ধন সম্পর্কে সুবিখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। আজও এই দায়ভাগ অনুসারে বাংলার উত্তরাধিকার, স্ত্রী-ধন প্রভৃতি বিধিগুলি পরিচালিত হচ্ছে। এঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় ইনি মহামহোপাধ্যায় ছিলেন।

এঁর বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে পঞ্চ-গৌড়ের অধীশ্বর বিজয়সেন একে অমাত্য ও প্রাড়্‌বিবাক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। জীমূতবাহনের পিতার নাম ছিল চতুর্ভুজ, পিতামহ হলধর, ভ্রাতা বিশ্বমঙ্গল।

জুমুর নন্দী—মুর্শিদাবাদবাসী।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি 'সংক্ষিপ্ত-সারের' টীকা রচনা করেন; এই টীকার নাম 'রসবতী'। এককালে ইহা বাংলার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। জুমুর-রচিত ব্যাকরণকে, কখনো কখনো 'জৌমর ব্যাকরণ' আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

জৈন খাঁ—মেদিনীপুর জেলার হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার জামাতা। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাজ খাঁর পরলোক গমনের পর ইনি হিজলীর নবাব হন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জৈনু-দ্-দীন—রচিত গ্রন্থের নাম 'রসুল বিজয়'। কাব্যটি 'নবীবংশ'-জাতীয়। খুব সম্ভব চাটগাঁ অঞ্চলের জমিদার ইউসুফ খানের নির্দেশে কাব্যটি রচিত হয়। এঁর অবস্থিতি কাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

জোন্স, স্যার উইলিয়াম—প্রখ্যাত প্রাচ্য তথা ভারতবিদ্যা বিশারদ ইংরেজ পণ্ডিত। ইনিই কলকাতায় সুবিখ্যাত 'এশিয়াটিক সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক উন্নত কৃষক পরিবারে এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতার নামও ছিল উইলিয়াম জোন্স। পিতা উইলিয়ম জোন্সও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মাতার নাম ছিল মেরিয়া। প্রথমে হ্যারোতে এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। এখান থেকেই ইনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জোন্সের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ পরিদৃষ্ট হতে থাকে। হ্যারোতেই ইনি হিব্রু শিখেন। ১৭৬৪ সালে ইনি অক্সফোর্ডে এসে আরবি ও পারসী শিখতে শুরু করেন। প্রথম জীবনে গৃহ শিক্ষকতার কাজ করতেন এবং অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পারসী ভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এঁর এশীয় ভাষাগুলির কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর "কমেণ্টরিস অন এশিয়াটিক পোয়েট্রি" ল্যাটিনে ছ' ভল্যুমে প্রকাশিত হয়। এই পণ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে বার্ক, শেরিডন, গ্যারিক, গিবন, জোশুয়া রেনল্ডস্ এবং স্যামুয়েল জনসন প্রভৃতি ইংলণ্ডের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইনি ছিলেন তীব্র সমর্থক। ইনি ক্রীতদাস প্রথারও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির পদ পেয়ে উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৩ সালের ৮ এপ্রিল কলকাতায় পৌছান। চাকরির অবসরে ইনি বিশাল ভারতের বিরাট সংস্কৃতির সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়ন করতেন। ইনি অত্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ জোন্স কলকাতার শিক্ষিত স্বদেশী সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লণ্ডন রয়াল সোসাইটির

অনুরূপ এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তুলেন। এবং ইনিই হন এর সভাপতি। এগার বছর ইনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ভারতবর্ষে বাস করে জোন্স গভীর শান্তি পেয়েছিলেন। এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও বিচিত্র জীবনকে ইনি গভীরভাবে ভালবেসে ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইনিই বিরাট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ইনিই বিশ্বের দরবারে সংস্কৃতের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৭৮৯ সালে জোন্স কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ করেন। এঁর এই অনুবাদ পড়ে জার্মানীর মহাকাব গ্যেটে ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন। এঁরই মাধ্যমে মহাকবি কালিদাস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সুপবিচিত হন। উইলিয়াম জোন্সের কর্মস্থল বা সাধনার স্থান ছিল বাংলাদেশ—কলকাতা। বাংলাদেশ ও বাঙালীর প্রতি এঁর একটা গভীর আকর্ষণ ছিল। বাংলাদেশে আসার আগে জোন্স 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বাংলা, তথা ভারতবর্ষ তথা এশিয়াকে জোন্স এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল ইনি বাংলার মাটিতে কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

জোফানি, জন—ইনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে পৌছান। ইনি রয়েল একাডেমির একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন। প্রথমে কয়েক বছর ইনি লক্ষ্ণৌয় অবস্থান করে সেখানকার অভিজাতবর্গের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পরে ইনি কলকাতায় আসেন। কলকাতায় বসবাস কালে ইনি "Last Supper" নামক একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। উহা কলকাতার সেণ্টজন গির্জাকে উপহার দিয়েছিলেন। চিত্রখানি এই গির্জায় এখনো রক্ষিত আছে।

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর—এঁর উপাধি ছিল কবিশেখরাচার্য। কারুর কারুর মতে ইনি বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ। জ্যোতিরীশ্বরের পিতা ধীরেশ্বর ঠাকুর এবং পিতামহ রামেশ্বর ঠাকুর। ইনি নাকি মিথিলার রাজা নরসিংহদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থঃ ধূর্তসমাগম, পঞ্চসায়ক, রঙ্গশেখর, বর্ণরত্নাকর। বঙ্গ সাহিত্যে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে স্থান, মৈথিল সাহিত্যে বর্ণ রত্নাকরের সেই স্থান।

"জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ" বাসুদেব—বাসুদেব "জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ" দ্র°।

জ্ঞানদাস—চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে পদকর্তা জ্ঞানদাস অন্যতম। এঁর বিস্তৃত পরিচয় আবিষ্কৃত হয়নি। তবে যতদূর জানা যায়—ইনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়াগ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি

নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবী ছিলেন এঁর গুরু। জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। খেতুরীর মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের একটি মঠ এখনো আছে। পৌষ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে প্রতি বৎসর মহোৎসব এবং সেই সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী মেলা হয়। বৈষ্ণব পদ রচনায় জ্ঞানদাস একাধারে বাংলা, ব্রজবুলি ও বাংলা-ব্রজবুলি বিমিশ্র ভাষার ব্যবহার করেছেন। তবে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলি ব্রজবুলি পদগুলির তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট। 'রূপানুরাগ', 'রসোদ্গার' এবং 'মাথুর' বিষয়ক পদগুলিতেই জ্ঞানদাসের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিদ্যমান।

জ্ঞানশিব দেব—গৌড় দেশের দক্ষিণ রাঢ় (লাট) বাসী। এঁর আর এক নাম উমাপতি দেব। উমাপতি দেবের শিবারাধনার বলে সিংহল থেকে আগত সৈন্যদল চোল রাজার বিরুদ্ধে কিছু করতে সক্ষম হয়নি। রাজা তাই তাঁকে দক্ষিণাস্বরূপ আর-পাক্কম গ্রামটি দান করেন। ইনি ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী।

জ্ঞানশ্রী মিত্র—দীপঙ্করের সমসাময়িক গৌড়বাসী বৌদ্ধ পণ্ডিত। ইনি বিক্রমশীল বিহারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান্ আচার্য ছিলেন। দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রার কিছু আগে বা পরে ইনি এই বিহারে এসে অধিষ্ঠিত হন। এঁর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী (৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)। দীপঙ্কর এঁর নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। জ্ঞানশ্রীর বৌদ্ধ ন্যায় সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি'। তার রচিত অপর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "প্রমাণ-বিনিশ্চয়-টীকা"।

জ্ঞানহরি দাস—বাঙালী বৈষ্ণব পদকর্তা। এঁর রচিত দুটি পদ আছে।

জ্ঞানোত্তম—বঙ্গেশ্বর বিজয়সেন বা বল্লালসেন অথবা উভয়ের গুরু ছিলেন জ্ঞানোত্তম। ইনি জ্যেষ্কর্ম-সিদ্ধির চন্দ্রিকা নামে টীকা রচনা করেছিলেন। তত্ত্বপ্রদীপিকার রচয়িতা চিৎসুক মুনি হলেন জ্ঞানোত্তমের শিষ্য। জ্ঞানোত্তমের আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দী।

ঋ

ঋভু ঠাকুর—হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশ বিঘার সন্নিকটস্থ 'ভূত-আকনা' নামক গ্রামে ঋভু ঠাকুরের নিবাস ছিল। ইনি ও এঁর স্ত্রী উভয়েই মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন।

ট

টমাস জন—একজন ইংরেজ—জাহাজে চিকিৎসকের চাকরি করতেন। পরে চাকরি ছেড়ে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন (১৭৮৭)। এজন্য তিনি বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। সুপ্রসিদ্ধ রামরাম বসু ছিলেন তাঁর বাংলাভাষার শিক্ষক। এই রামরাম বসুর সাহায্যে টমাস বাইবেলের বেশ কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। ভাবতে বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য এবং বাঙালী চরিত্রের মহত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি কেবা সাহেবের সঙ্গে ছিলেন এবং তাব সঙ্গে বাংলাভাষার চর্চা করতেন। ১৮০১ সালেব ১৩ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক পযায়ের বাংলা-গদ্যের ভিত্তি পত্তনে টমাসের অবদান আছে।

টলি, মেজর—একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার। ইনি গোবিন্দপুর খাল বা নালাকে কাটিয়ে নৌকা চলাচলের মত গভীর করে টোল আদায় করার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রথমে দশ বছরের জন্য ইনি এই অধিকার লাভ কবেছিলেন। পরে উহা বর্ধিত হয়ে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হয়। ইনি "বেল্‌ভিডিয়ার" ভবনটি ক্রয় করে-ছিলেন এবং এই নাম মেজর টলিরই প্রদত্ত। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

টলেমি—বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইনি বাংলার গঙ্গাবিডি অঞ্চলের বিশেষ সমৃদ্ধির কথা তার প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ কবে গিয়েছেন।

ঠ

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাতঃস্মরণীয় পরমপুরুষ বাংলাব যুগপরিচালক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতৃদেব। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথম পাদে। হুগলী জেলার বনমালীপুর গ্রামে পিতৃভূমি। প্রায় দশ বছর বয়সে মাতার সঙ্গে তিনি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বীরসিংহ গ্রামে মাতামহালয়ে বসবাস করেন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। সেই থেকে বীরসিংহ গ্রামের নামেই এঁদের পারিবারিক পরিচিতি গড়ে উঠছে। পিতা রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন ধার্মিক, উদারচেতা, স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক এবং মাতা দুর্গাদেবী ছিলেন ধৈর্যশীলা, দৃঢ়চেতা, গুণবতী রমণী। পিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আর সর্বযুগের, সর্বদেশের পরমারাধ্যা ভগবতী দেবী ছিলেন ঠাকুরদাসের আদর্শ সহধর্মিণী ও বাংলার আদর্শ মাতা ও রমণী।

নিতান্ত নিম্নবিত্ত বাঙালীর মধ্যেও যে প্রতিভার স্ফুরণ হতে পারে, অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে যে লৌহ-দৃঢ় নিখাদ চরিত্র গড়ে উঠতে পারে, তার একমাত্র জলন্ত নিদর্শন ঠাকুরদাস। তিনি তীব্র দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে জীবন আরম্ভ করে স্বীয় প্রতিভায় তাঁর পুত্র বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল জীবনাদর্শ স্থাপনা করেছিলেন, যা বাংলার সমসাময়িক ইতিহাসে বা পৃথিবীতেও দুর্লভ। ঠাকুরদাস ছিলেন বিদ্যাসাগরের 'টিচার' ও 'ট্রেনার'। তিনি পুত্রকে জীবন-সংগ্রামের সমস্ত কলাকৌশল হাতে ধরে শিক্ষা দিয়ে ছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে শির চির উন্নত রেখে কিভাবে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হয় সে শিক্ষা বিদ্যাসাগর পিতা ঠাকুরদাসের কাছ থেকেই পেয়ে ছিলেন। ঠাকুরদাস তাঁর জীবিত কালের মধ্যেই নিজহাতে গড়া আদর্শ পুত্রের যশ-গৌরব স্বচক্ষে দেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

ঠাকুরদাস বৈষ্ণব—উজ্জ্বল নীলমণির পদ্যানুবাদক।

ঠাকুর সিংহ—অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ শাক্ত কবিয়ালা। কবি এণ্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে তাঁর কবি-গানের লড়াই হত।

ড

ডাক—ডাক নামক জনৈক গোপ 'ডাকের বচন' প্রণয়ন করেছেন বলে কথিত আছে। সাহিত্যিকদের মতে ডাকের বচন বোধহয় বঙ্গ-ভাষা স্ফুরণের প্রাক্-প্রচেষ্টা। ভাষা ও ভাবদৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সকল বচন রচিত হয়েছিল, যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজাকারে পরিণত হয়েছে। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্র-তত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাতে মানব-চরিত্রের ব্যখ্যা বেশী। ডাক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বাংলা দেশের আপামর জনসাধারণ ডাকের বচনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত।

ডাকপুরুষ—এদেশে ডাকের বচন বলে যে সকল ছড়া (কবিতা) প্রচলিত আছে, সেসবের প্রণেতা এই ডাকপুরুষ। এঁর নিবাস ছিল কামরূপ জেলার বড়পেটা মহকুমার লেহিভেগরা গ্রামে। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

ডাঙ্গর ফা—নামান্তর হবি রায়। ইনি ত্রিপুরাধিপতি মোহনের (খিচুং ফা) পুত্র। ইনি রাজ্যের নানা স্থানে পুরী নির্মাণ করেছিলেন। অবস্থানকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী।

ডানকান, জোনাথান—প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এঁর বিশেষ অবদান আছে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ডানকান সাহেবের আইন বইটির অনুবাদ বাংলা

ভাষার ইতিহাসে একখানি মহামূল্য গ্রন্থ। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৫+৩১। যে-সকল আইন নন্দকুমার মামলার বিচারপতি বিখ্যাত স্যার ইলাইজা ইম্পে কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে 'ইম্পে কোড' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এ গ্রন্থ তারই অনুবাদ।

জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে বিলেতে জন্মগ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিলিয়ানরূপে ইনি ১৭৭২ সালে কলিকাতায় আসেন এবং ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। বাংলা ভাষায় এঁর অসাধারণ অধিকার দেখে ওয়ারেন হেষ্টিংস এঁকে 'ইম্পে কোড' অনুবাদে নিযুক্ত করেন। ১৭৮৮ সালে ইনি বারাণসীর রেসিডেণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট হন। ১৭৯৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮১১ সালের ১১ আগস্ট তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি বোম্বাই-এর গভর্ণর ছিয়লন।

ডিসুজা বা বেণ্টো ডি সেলভেস্ত্রে—ইনি সম্ভবত ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে কলকাতা ও বাণ্ডেলে এসে বাস করেন। কথিত আছে, ইনি প্রায় পনের বছর বাংলায় ছিলেন এবং এখানে অবস্থানকালে 'বুক অব কমন প্রেয়ার' ও 'ক্যাটিকিজম' পুস্তকের অনেক অংশ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেছিলেন। শোনা যায় তাঁর পুস্তক দুটি 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা' নামে রোমান অক্ষরে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়েছিল।

ডেকার্স—বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতার দুর্গ অবরোধ করেন তখন ইনি মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কেরানী ছিলেন। পরে ইনি কৌন্সিলের মেম্বার হন। কোম্পানীর জমিদারী লাভের পর কিছুদিন ইনি জমিদারের কাজও করেছিলেন। ইনিই গভর্নর ড্রেকের নিকট সর্বপ্রথম ভলেণ্টিয়ার সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

ডেভিস—আর্থার উইলিয়ম ডেভিস প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ড্রাফটসম্যানের কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলকাতায় আসেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নব নির্মিত সেণ্টজন গীর্জার সৌষ্ঠবসাধনে নিযুক্ত হন। তারপর কিছুদিন শান্তিপুরে থেকে বাংলার ব্যবসাদি বিষয়ক চিত্রাদি অঙ্কন করেন। টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধবিষয়ক কয়েকখানি চিত্রও ইনি অঙ্কিত করেছিলেন।

ড্রেক, রোজার—লর্ড ক্লাইবের সমসাময়িক। ইনি ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলায় আসেন। ১৭৫২-৫৮ সাল পর্যন্ত ইনি কলকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মন্ত্রণাসভার সভাপতি ও উক্ত কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী ছিলেন। ইনি কলকাতার দুর্গ সংস্কার দ্বারা নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্রোধ

উৎপাদন করেন। নবাব কলকাতা আক্রমণ করলে ইনি পলায়ন করেন (১৭৫৬)। ১৭৫৮ সালে কোম্পানীর ডাইরেক্টারেরা এঁকে পদচ্যুত করেন এবং সেই পদে হলওয়েল সাহেব নিযুক্ত হন।

ডোম্বী—ডোম্বী হেরুক নামে মগধের রাজা। ইনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং বজ্রযান ও সহজযান সম্বন্ধে পুস্তক লেখেন। ডোম্বীগীতিকা নামে এঁর সংকীর্তনের এক পদাবলী আছে। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

ডোম্বী-পা—একজন সিদ্ধাচার্য। জানা যায় যে ডোম্বীপা দারিক পার শিষ্যা সহজযোগিনী চিন্তার শিষ্য। এঁর জীবৎকাল নবম শতাব্দীর শেষার্ধ। প্রাচীন বাংলা ভাষায় ইনি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' এঁর রচিত একটি পদ পাওয়া যায়।

ডোম্বী হেরুক—মগধের রাজা। সন্ন্যাসী হয়ে প্রথমে আচার্য, পরে মহাচার্য, পরে সিদ্ধ মহাচার্য উপাধি পান। ইনি নামসংগীতি বৃত্তি, গুহ্যবজ্র তন্ত্ররাজের বৃত্তি, একবীর, নৈরাত্ম্য-যোগিনী পূজাপদ্ধতি লিখেন।

ত

ত ণ্ডি পা—একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য।

তথাগত রক্ষিত—এক কায়স্থ পরিবারে এঁর জন্ম হয়। তথাগত রক্ষিত সিততারা, নীলতারা, পীততারা, রক্ততারা ও হারীততারার উপাসনা প্রচার করেন এবং অনেকগুলি ভুটিয়া গ্রন্থের তর্জমা করেছিলেন।

তথাগতসার—প্রাচীন বাংলার একজন প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী। এঁর অবস্থিতিকাল ছিল নবম শতাব্দী।

তন্ কোম্মাং—চীনদেশীয় এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ইনি চীনদেশ থেকে জলপথে ভারতে আসেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ ও বৌদ্ধতীর্থ দর্শন এঁর উদ্দেশ্য ছিল। ইনি প্রথমে হরিকেল দেশে (পূর্ববঙ্গে) উপস্থিত হন। সেখানকার রাজা এঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই দেশেই ইনি পরলোক গমন করেন

তন্ত্র বিভূতি—উত্তরবঙ্গের অধিবাসী। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

তন্ত্রীপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য। জালন্ধরিপাদ এবং কাহ্নপাদ ছিলেন এঁর গুরু। প্রাচীন বঙ্গভাষায় ইনি চর্য্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্য্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' এঁর একটি পদ আছে। ইনি নবম শতাব্দীর শেষার্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

তপন মিশ্র—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইনি পূর্ববঙ্গে পদ্মা নদীর

তীরে বাস করতেন। ইনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব নির্ণয় কবতে না পেরে ইনি বহু দিন ধরেই মনে অত্যন্ত অশ্বস্তি বোধ কবছিলেন। এই অবস্থায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দেব কাছাকাছি কোন সময়ে গৌরাঙ্গদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান এবং পদ্মাপারের অধিবাসীদেব বিদ্যাদান করতে থাকেন। একদিন তপন মিশ্র তাঁর কাছে এসে মনের কথা ব্যক্ত করলেন। গৌরাঙ্গদেব তখন তাকে কৃষ্ণ-ভজনেব উপদেশ দিলেন এবং বললেন যে 'হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল।' এইভাবে তপন মিশ্র গৌরাঙ্গেব প্রথম শিষ্য হলেন বলা যায়। গৌরাঙ্গের নির্দেশমত তপন মিশ্র কাশী গিয়ে বসবাস করেন এবং কৃষ্ণ-কথায় দিন যাপন করতে থাকেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে কাশীতে উপস্থিত হন। সেখানে তপন মিশ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং কয়েকদিন তাব বাড়ীতে অবস্থান করেন। বৃন্দাবন থেকে ফেরাব সময়ও মহাপ্রভু দু'মাস তপন মিশ্রেব গৃহে অবস্থান করেন। এই সময় রূপ-গোস্বামীও তাব গৃহে মহাপ্রভুব সঙ্গে অবস্থান কবেন।

তরণি মিশ্র—নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের প্রাচীন গ্রন্থ 'রত্নকোষে'ব রচয়িতা। সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন মিথিলা নিবাসী। এঁর অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী।

তর্কবাগীশ—শিবরাম চক্রবর্তীর পুত্র। এঁর বচিত গ্রন্থ 'সাংখ্যবৃত্তি-প্রকাশ বা 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস'। কলকাতাব এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংবক্ষিত একটি গ্রন্থেব লিপিকাল ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

তাজউদ্দিন—শ্রীহট্টেব বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অনুগত অন্যতম শিষ্য। ধর্মযুদ্ধে ইনি নিহত হন।

তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলী—ইনি একজন আফগান মুসলমান। মেদিনীপুর জেলার রসুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগবে পতিত হয়েছে তাবই তীরে হিজলীতে একটি মুসলমান বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীব প্রথমার্ধের মধ্যে। ১৫০৫-৫৫ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে তাজ খাঁ বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন ইনি কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। আবাব অন্যেব মতে ইনি নাকি মুসলমান পিতাব ঔবসজাত হলেও এক অতি নীচ জাতীয় হিন্দু বমণীর গর্ভজাত। প্রথম বয়সে গো-পালনের কাজ করতেন। পবে ভাগ্যলক্ষ্মীব প্রসাদে বাজ্য লাভ করেন। ইনি অত্যন্ত ধার্মিক বাজা ছিলেন। ১০

তাজ খাঁ কররানী—সেলিম শাহেব একজন প্রধান অমাত্য ও সম্বলপুরের শাসনকর্তা। পরে ইনি

বঙ্গদেশে আসেন এবং ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ জয় করে প্রায় নয় বছর কাল এঁর শাসনকর্তা ছিলেন। সোলেমান কররানী এঁর ভ্রাতা। তাজ খাঁ বাংলা দখল করার পর মাত্র এক বছর জীবিত ছিলেন।

তাড়ক—একজন সিদ্ধাচার্য। এঁর রচিত চর্যাপদ বা কীর্তনের গান পাওয়া গেছে। এই সব গান মুসলমান আক্রমণের পূর্বে রচিত হয়েছিল।

তাড়ক পাদ—একজন সিদ্ধাচার্য।

তাড়াদেবী বা **তান্দ্রাদেবী**—বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের পত্নী। এঁর গর্ভে বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন নামে দুই পুত্র জন্মে।

তাতট—প্রাচীন বাংলার একজন সুদক্ষ শিল্পী। এঁর অবস্থিতিকাল নবম শতাব্দী।

তাতার খাঁ—দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন তোগলকের (১৩২১-২৫ খ্রীঃ) পালিত পুত্র। দিল্লীর সম্রাটের আদেশে ইনি পূর্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণগ্রামের বিদ্রোহী শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তারপর তাতার খাঁ সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্তার পদ লাভ করে বহরাম খাঁ উপাধি লাভ করেন।

তানসেন মিঞা—বিবিধ সংগীত ও 'সংগীতসার' নামক গ্রন্থ রচয়িতা। তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে আগরা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। আঠার বছর বয়সে কোন মুসলমান যুবতীর প্রেমে পড়ে তানসেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে বৃন্দাবনবাসী হরিদাস স্বামীর নিকট এবং ধর্মান্তরের পর গোয়ালিয়রের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ মহম্মদ দৌলত খাঁর নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সম্রাট আকবর বাদশাহের দরবারে গায়ক নিযুক্ত হন। বাদশাহ এঁর গানে মুগ্ধ হয়ে 'তানসেন' উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে ইনি এই নামেই পরিচিত। এঁর প্রকৃত নাম রামতনু পাঁড়ে। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

তাম্রধ্বজ—মহাভারতীয় যুগে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ময়ূরধ্বজের পুত্র প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবদের বিপক্ষে এবং কৌরবদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের যজ্ঞীয় অশ্ব ইনি ধরেছিলেন। ফলে যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে তাতে মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট পাণ্ডবপক্ষ প্রথমে পরাজিত হয়। যুদ্ধে কৃষ্ণার্জুন নাকি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। পরে তাঁরা ছলনার সাহায্যে যজ্ঞের অশ্ব উদ্ধার করেন। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী।

তারাচরণ দাস—এর রচিত

কাব্যের নাম 'মন্মথ কাব্য'। এই কাব্যে কলিঙ্গ রাজপুত্র মনোমোহন ও তার ছয় মন্ত্রীপুত্র সখার এড্‌ভেঞ্চার বর্ণিত হয়েছে। রচনাকাল ১৮৪১-৪২। কাব্যটি ভারতচন্দ্রের ছাঁদে রচিত এবং আদি রসের বাহুল্যে প্রায় অপাঠ্য। ভারতচন্দ্রের অনুসরণে লেখক ছন্দ-চাতুর্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কবিত্বের অভাবে কিছুই হয়নি। কবির বসতি ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বড়শোল গ্রাম। তাঁর পিতার নাম রাইমোহন দাস।

তারানাথ (লামা)—তিব্বতবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু। ইনি ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে বাংলা দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ইতিহাসও বর্ণিত আছে। ইনি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

তারাবা, মহারাজা—নশীপুর রাজবংশের আদিপুরুষ। ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বেজাপুরের শাসনকর্তা ছিলেন।

তারিণী ব্রাহ্মণী—এঁর রচিত একখানি 'সুবচনীর ব্রতকথা' পাওয়া গেছে। অন্য পরিচয় অজ্ঞাত।

তারিণীসেন—একজন বৌদ্ধ ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণেতা আচার্য। ইনি বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে গমন করেন।

তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশ—নবদ্বীপের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ পণ্ডিত। কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্র রায় ও রানী ভুবনেশ্বরীর সময়ে ইনি বর্তমান ছিলেন।

তারিণীচরণ মিত্র—আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার উত্তর সিমলা বা পুরাতন সিমলা অঞ্চলে তারিণীচরণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত দুর্গাচরণ মিত্রের পুত্র। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিণীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ জন্‌ গিলক্রাইষ্টের অধীনে মাসিক এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় মুন্সীর পদে নিযুক্ত হন। অসামান্য কার্যদক্ষতার বলে তিনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রধান মুন্সীর পদে উন্নীত হন। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৫৮ বছর বয়সে এক শত টাকা পেন্‌শনে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পরিচালক সমিতির তিনি নেটিভ সেক্রেটারী বা দেশীয় সম্পাদক ছিলেন। তৎকালে স্থাপিত ধর্মসভার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন তার যুগের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও খ্যাতনামা লেখক ইংরেজী, হিন্দী, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় তার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায়ও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থ: ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট, নীতিকথা।

তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়—প্রবাসী বাঙালী রাজকর্মচারী। এঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার খানিসানিতে। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ফরাক্কাবাদে গমন করেন। ইনি প্রথমে ডাক মুন্সীর কাজ করেন এবং পরে আলীগড় ডাক-ঘরে চাকরি পান। তখন প্রধানতঃ ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডাকের জন্য অশ্ব সরবরাহ করবার ঠিকা পান। ইনি আলীগড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শহরের এক স্থানে ইনিই প্রথম নীলকুঠী স্থাপন করেন। এছাড়, এঁর অন্য ব্যবসাও ছিল। পরে ইনি বিস্তীর্ণ জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৫৭ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

তালনাথ—নাথপন্থী চুরাশি জন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম।

তিতুমীর—একজন ধর্মোন্মত্ত মুসলমান। নিবাস ছিল তৎকালীন নদীয়া জেলার নিকটস্থ গোবরডাঙার বাদুড়িয়া থানার এলাকাধীন হায়দার গ্রামে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিতুর জন্ম হয়। বাল্য-কাল থেকে অত্যন্ত স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। পরে ঐ ধর্মনিষ্ঠা উৎকট ধর্মোন্মত্ততায় পরিণত হয়। প্রথম জীবনে স্থানীয় জমিদারদের অধীনে লাঠিয়ালের কাজ করতেন। ঐ সময় দাঙ্গাহাঙ্গামা করার জন্য এঁর কারাদণ্ড হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মক্কা যাত্রা করেন। সেখানে ওহাবী সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে এর পরিচয় হয়। দেশে ফিরে এসে তিতু নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে নানারূপ সংস্কার প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেন। ফলে তাদের উপর এর প্রভাব খুব বিস্তার লাভ করে। ঐ সময় মক্কা প্রত্যাগত একজন ফকিরও এর সঙ্গে যোগ দেন। এবং এদের উভয়ের চেষ্টায় বহু অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মুসলমান তিতুমীরের শিষ্য হয়। তিতু ধনী ব্যক্তি বিশেষ করে স্থানীয় হিন্দুদের গৃহ থেকে লুণ্ঠন করে অর্থসংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু জমিদারের কাছারি অথবা বাড়ী লুঠ করে বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। এক ব্রাহ্মণ দারোগা তিতুকে দমন করতে গিয়ে নিহত হন। এতে তিতুর সাহস আরও বেড়ে যায়। এর উপদ্রবে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তিতু নারিকেলবেড়িয়া নামক স্থানে বাঁশ ও মাটি দিয়ে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তিতুর উপদ্রব চরমে উঠলে ইংরেজ সরকার একবার সশস্ত্র বাহিনী পাঠান। দৈবক্রমে তারা তিতুর কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। তখন ১৮৩১ সালে একজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে কামানসহ একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। তিতুমীর সদর্পে এই সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হন। ইনি এর শিষ্যদের অভয় দিয়ে বলেন ধর্মবলে ইনি কামানের গোলাগুলি খেয়ে ফেলবেন। ইংরেজ সেনাপতি প্রথমে ভীতি প্রদর্শনের জন্য কয়েকবার

কামানের ফাঁকা আওয়াজ করেন। এতে কোনও অনিষ্ট না হওয়ায় তিতুর অনুচরবর্গ "হুজরত গোলা খা ডালা" বলে সদর্পে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু ইংরেজদের সর্বাত্মক আক্রমণে তিতুর বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়। বহু অনুচরসহ তিতু দুর্গমধ্যে নিহত হন। আদালতের বিচারে বহু লোকের ফাঁসি ও কঠোর কারাদণ্ড হয়। বর্তমানে তিতুকে 'জাতীয়বীর' আখ্যায় খ্যাত করার চেষ্টা হচ্ছে।

তিথিমেধা—মেধাতিথি দ্র০।

তিরমিনি খাঁ নবাব—দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবনের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বাংলার নবাব মগিসউদ্দিন তোগরল বিদ্রোহী হলে সম্রাট প্রথমে নবাব আমিন খাঁকে তার বিরুদ্ধে পাঠান। আমিন খাঁ পরাজিত হলে সেনাপতি তিরমিন খাঁকে তোগরলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ইনিও পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

তিলকচন্দ্র রায়—বর্ধমানের রাজা চিত্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। চিত্রসেন অপুত্রক অবস্থায় গতায়ু হলে তিলকচন্দ্র ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের রাজা হন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে সনন্দ ও মহারাজাধিরাজ উপাধি লাভ করেন। ইনি বীরভূমের রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রথমে পরাজিত করেন। কিন্তু পরে নিজে পরাজিত হয়ে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৭৭০ সালে ইনি পরলোক গমন করেন।

তিলকরাম—একজন জ্যোতিষী। ইনি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তন্তুবায় কুলজী' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ কুলজী গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

তিলকরাম দাস—তিলকরাম দাসের সংক্ষিপ্ত নাম রামদাস। ইনি অভিরাম দাসের স্বপ্নাদেশে 'অভিরাম লীলামৃত' রচনা করেছিলেন। গ্রন্থে নিত্যানন্দ-অনুচর অভিরাম দাসের অলৌকিক প্রচেষ্টা ও শিষ্যদের সহিত মিলনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনিবাস আচার্যের ও শ্যামানন্দের কথাও আছে। রচনাভঙ্গিতে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব প্রতীয়মান হয়। অভিরাম দাসের শিষ্য রামকানাই ছিলেন তিলকরাম দাসের শিষ্য। রামদাস লিখেছেন,

"ধন্য ধন্য প্রভু মোর শ্রীরামকানাই
শ্যামসুন্দর সনে দিলেন মিলাই।"

তিলকরাম দাসের নামে ক্ষুদ্র একখানি 'বৈষ্ণবকথা' পাওয়া গেছে।

তিলকরাম "দ্বিজ"—এঁর রচিত কাব্যের নাম 'গোবিন্দবিলাস'। ইহা বরাহ-সংহিতা অবলম্বনে লেখা। তিলকরাম বৃন্দাবনে রাধামদনমোহনের পূজারী ছিলেন। কাব্যের ভণিতায় কবি বলেছেন,

"শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সদা করি আশ
দ্বিজ তিলকরাম কহে গোবিন্দবিলাস।"

তিলিপ—একজন সিদ্ধাচার্য। এঁর রচিত 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' পাওয়া গেছে। ইনি সম্ভবতঃ নবম শতাব্দাতে বর্তমান ছিলেন।

তি ল্লো পা—সম্ভবতঃ ইনি চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং বাংলার পাল রাজবংশের রাজা মহীপালের সমসাময়িক। তিল্লোপা নাকি এক তিলপেষিকা যোগিনীর সঙ্গে যোগস্থ অবস্থায় সম্মিলিত হয়েছিলেন। তাই এঁর নাম তিল্লোপা। কারুর কারুর মতে ইনি বোধ হয় জাতি ব্যবসাযের দিক থেকে তৈলিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্যদের মতে ইনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। শুনা যায় ইনি বজ্রযানমত গ্রহণ করে 'প্রজ্ঞাভদ্র' নামে পরিচিত হন। ইনি অন্ততঃ চারখানি বজ্রযান গ্রন্থ এবং একখানি দোঁহাকোষ রচনা করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযান গুরু নাড়োপা তিল্লোপারই শিষ্য।

তিষ্যদেব—আসাম প্রদেশের একজন রাজা। ইনি বাংলার পালরাজ কুমারপাল দেবের সামন্ত নবপতি ছিলেন। কিন্তু ইনি কুমারপাল দেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলে, এঁকে দমন করার জন্য কুমারপাল তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি বৈদ্যদেবকে প্রেরণ করেন। বৈদ্যদেব তিষ্যদেবকে পরাজিত ও নিহত করে আনুমানিক ১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধীশ্বর হন।

তীসট বা তীসটাচার্য—ইনি চিকিৎসাসমুচ্চয় ও চিকিৎসাকলিকা প্রণেতা। ইনি দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

তীসটাচার্য—তীসট দ্র°।

তু গ র ল তু গা ন খান—বিহারের শাসনকর্তা। পরে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আওর খানকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার লখনোর থেকে বসনকোট পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। সুলতানা রাজিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার সময় তুগান খান দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে ছিলেন। রাজিয়া তুগান খানকে একটি ধ্বজ ও কয়েকটি চন্দ্রাতপ উপহার দিয়েছিলেন। তুগান সুলতানা রাজিয়ার নামে লক্ষনৌতির টাকশালে মুদ্রাও উৎকীর্ণ করেছিলেন। 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি মীনহাজকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। মীনহাজ প্রায় তিন বছর এদেশে ছিলেন এবং ঐ সময় বাংলার অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তার বিবরণ লিখে গেছেন।

তুলসীদাস—কে খ্রী য় বাংলার সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি। বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ যে পদাবলী-কীর্তনের প্রচলন করেছিলেন, তুলসীদাস তার অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন। ইনি

ছিলেন অম্বিকার হৃদয়ানন্দের শিষ্য এবং শ্যামানন্দের গুরু ভাই। ইনি সুগায়কও ছিলেন। এঁর গীত কয়েকটি প্রাচীন পদাবলী ছত্র 'রসিকমঙ্গলে' উধৃত আছে। তুলসী ছিলেন রসিক-মঙ্গল প্রণেতা গোপীজন বল্লভ দাসের সংকীর্তন গুরু। পিতার নাম রসময় দাস।

তেজচন্দ্র রায়—বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্রের পুত্র। ইনি ১৭৭০-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত রাজত্ব করেন। এঁরই সময় বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

তেলিপ বা তৈলিক পাদ—একজন সহজিযাচায।

তৈমুর খাঁ কিরাণ—এঁর পুরোনাম মালিক কমরউদ্দিন তৈমুর খাঁ-ই-কিবাণ। ইনি কাস্পিয়ান সাগরের উত্তবদিকস্থ কিচক প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। দিল্লীর সুলতান একে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রায় দাসরূপে ক্রয় করেন। সুলতানেব অনুগ্রহে ইনি উচ্চ হতে উচ্চতর পদে উন্নীত হন। তিনি প্রথমে অযোধ্যার শাসনকর্তার পদ পান। পরে ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তোগান খাঁর পরে বাংলার শাসন-কর্তার পদ প্রাপ্ত হন। মাত্র দু বছর রাজ্যশাসন করে ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

তৈমুরু আলামী—একজন বিখ্যাত দরবেশ। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির, অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন। ইনি শ্রীহট্টের গোধরালি পরগণার সালাম নামক স্থানে বাস করতেন।

তোগান খাঁ—তাতার দেশীয় লোক। এঁকে তরুণ বয়স্ক, সুশ্রী ও নানা গুণে ভূষিত দেখে আলতামাস এঁকে পছন্দ করতেন। তোগান খাঁ প্রথমে রোহিলখণ্ডে, পরে বিহারে এবং সর্বশেষে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখন আলতামাস বাদসাহের কন্যা রিজিয়া দিল্লীর মসনদ প্রাপ্ত হন, তখন তোগান খাঁ তাঁর নিকট অনেক উপঢৌকনসহ একজন বাগ্মী দূত প্রেরণ করেছিলেন। রিজিয়া তোগান খাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়ে তাঁকে ওমরাহগণের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ পদ দান কবেন এবং বাংলার মসনদে তাঁর আসন স্থায়ীরূপে স্বীকৃত হয়। রাজত্বের প্রথম দিকে ইনি ত্রিহুত জয় করেন। তারপর কারা-মানিকপুব বাংলার অধিকারভুক্ত করেন। তোগান খাঁ একবার কলিঙ্গ-রাজ নৃসিংহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। প্রতিশোধে কলিঙ্গরাজ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করে রাজভাণ্ডার লুট করেন। দিল্লীর সাহায্যে আর একবার কলিঙ্গরাজকে আক্রমণ কবেও তোগান ব্যর্থকাম হন। তোগান খাঁর বঙ্গে রাজত্বকাল ১২৩৩-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তোগান প্রাণত্যাগ করেন। কারুর কারুর ধারণা তোগান খাঁর রাজত্বকালে চেঙ্গিস্ খাঁ

৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে গৌড় আক্রমণ করেছিলেন।

তোড়রমল্ল—পাঠান নবাব বিদ্রোহী দায়ুদ খাঁকে দমন করার জন্য দিল্লীর সম্রাট আকবর তোড়রমল্লকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পাঠান। দায়ুদকে পরাজিত করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলে আকবর এঁর উপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট হন এবং এঁকে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করে রাজস্ব বিভাগের ভার অর্পণ করেন। পরে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তোড়রমল্লকে বাংলার নবাব নিযুক্ত করে পাঠান। ঐ সময় তোড়রমল্ল সমগ্র বঙ্গদেশ জরিপ করে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। এঁর এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আকবর এঁকে রাজা উপাধি দেন এবং দিল্লীর রাজস্ব বিভাগের প্রধান দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন।

তোতারামদাস বাবাজী—বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। এঁর পূর্বনাম রামদাস বাবাজী। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এঁকে "তোতারাম বাবাজী" নাম দিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব ভক্ত। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

তোতারাম সোম—রামচরণ সোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। তোতারাম ওলন্দাজ ট্রেডিং কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীর দেওয়ান ছিলেন। প্রধানতঃ তোতারাম কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে ইনি "বাবু" উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

গঙ্গেশোপাধ্যায়—মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। এঁর রচিত গ্রন্থ তত্ত্ব-চিন্তামণি। ইনি অনুমানখণ্ডের টীকা রচনা করেছিলেন। 'মকরন্দ'র টীকাও সম্ভবতঃ এঁর রচিত। এঁর অভ্যুদয়কাল ১৩৭৫-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ।

ত্রিগুণানন্দ—পূর্ব বাংলায় যাঁরা বৌদ্ধতন্ত্র প্রচার করেন ত্রিগুণানন্দ তাঁদের অন্যতম।

ত্রিবিক্রম—নারায়ণের পুত্র। ইনি ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 'ত্রিবিক্রম শতক' বা 'জাতক' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ত্রিবিক্রমদেব ভট্ট—'লৌহ-প্রদীপ' গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থে নানা খনিজ পদার্থের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার ছিলেন গৌড়ীয় রাজবৈদ্য। এঁর জীবিতকাল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী। চতুর্দশ শতাব্দীতে গোপালদাসকৃত চিকিৎসামৃতে এঁর নাম আছে।

ত্রিবিক্রমাচার্য—একজন খ্যাত-নামা জ্যোতির্বিদ। ইনি 'ব্রহ্মব্যবহার' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন।

ত্রিবিক্রমানন্দ দেব—রসিক-মুরারির ষষ্ঠ অধস্তন। ইনি উৎকল

ভাষায় শ্রীবৃন্দাবনপদকল্পতরু নামক গীতিকাব্য, শ্যামানন্দ শতকের পদ্যানুবাদ এবং চোদ্দটি পদ রচনা করেন।

ত্রিভুবন পাল—পাল রাজ ধর্মপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যুবরাজ ত্রিভুবনপালদেব ধর্মপালের রাজত্ব-কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাই ধর্মপালের মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দেবপালদেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

ত্রিমল্ল—একজন অয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিদ্। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'বৈদ্যক চন্দ্রোদয়'।

ত্রিমল্ল ভট্ট—দাক্ষিণাত্যবাসী। এঁরা ছিলেন তিন ভাই। এঁর অপর দুই ভাই-এর নাম বেঙ্কট ভট্ট ও প্রবোধানন্দ। গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী ছিলেন এই ত্রিমল্ল ভট্ট বা এঁর ভ্রাতা বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। চৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে উঠেন। এর পূর্বে ত্রিমল্লরা লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করতেন এবং নারায়ণকেই স্বয়ং ভগবান বলে মনে করতেন। মহাপ্রভু এসে পৌঁছলে তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সবংশে তাঁর পরিচর্যায় রত হন। এঁদের ঐকান্তিক অনুরোধে মহাপ্রভু বর্ষার চারমাস ভট্টগৃহে অতিবাহিত করেন। ঐ সময় তিনি প্রত্যহ ত্রিমল্ল, বেঙ্কট প্রভৃতি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের সমস্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় দিন কাটাতেন। মহাপ্রভু ভট্ট পরিবারকে স্বীয় প্রতিভার আলোকে আলোকিত করে তুলেন। এবং ভট্টরাও চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে কৃষ্ণস্বরূপ উপলব্ধি করে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেন। গোপাল-ভট্ট তখন ছিলেন বালক-মাত্র। মহাপ্রভুর কৃপায় গোপাল ও প্রবোধানন্দ পরম ভাগবত হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর নির্দেশমত তাঁর জীবদ্দশাতেই গোপালের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটলে গোপাল বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। ত্রিমল্ল ভ্রাতারা সকলেই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

ত্রিলোকচন্দ্র—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বাংলার রাজা ছিলেন। এঁর নামাঙ্কিত ১৬১০ ৫২ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা পাওয়া গেছে।

ত্রিলোচন—ত্রিপুর রাজ্যের প্রাচীন রাজা। কথিত আছে ইনি ছিলেন মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের সমকালিক এবং নিমন্ত্রিত হয়ে ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে নানা পার্বত্য জাতির বাসের জন্য দেশময় অনার্য-প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ত্রিলোচন সর্বপ্রথম ত্রিপুর সমাজে আর্য-আচার প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্র ছিলেন। ত্রিলোচনের এক পুত্রের সঙ্গে কাছাড়ের রাজা হেরম্বাধিপতির কন্যার বিবাহ হওয়ায় ত্রিলোচনের রাজ্যের সীমানা বেড়ে যায়।

ত্রিলোচন—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। ত্রিলোচনের ব্যক্তিগত পরিচয় কিছুই জানা যায় না। এঁর কাব্যের একটি শ্লোক থেকে কাব্যের রচনাকাল ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ বলে অনুমিত হয়। ত্রিলোচনের রচিত কাব্যের নাম 'তুলসীদাস'—সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এতে ছাপান্নটি শ্লোক আছে। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে বিরহানলে দগ্ধ গোপীরা বনে কৃষ্ণকে খুঁজে না পেয়ে তুলসীকে কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন—ইহাই কাব্যের বিষয়বস্তু।

ত্রিলোচন চক্রবর্তী—হুগলী জেলার মহানাদ-নিবাসী। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "মহাভারত" রচনা করেন।

ত্রিলোচন দাস—এঁকে দুর্গসিংহের 'কাতন্ত্রবৃত্তি'র পঞ্জিকাকার ত্রিলোচন দাস বলেই অনুমান করা হয়। 'অমর কোষে'র একটি টীকাও ত্রিলোচনের নামাঙ্কিত দেখা যায়। এঁর পিতার নাম মেঘ ও পুত্রের নাম গদাধর। ত্রিলোচনের জীবিতকাল সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী।

ত্রিলোচনচন্দ্র বৈদ্য কবীন্দ্রচন্দ্র—মাধবদাস কবিচন্দ্রের পুত্র এবং রাধানাথ কবিকণ্ঠহারের পিতা। ইনি 'রত্নাবলী' নামক বৈদ্য গ্রন্থ প্রণেতা। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি বরিশালে বাস করতেন।

ত্রিলোচনদাস বৈদ্যোপাধ্যায়—কাতন্ত্রপঞ্জীকাকার, কায়স্থ বৈদ্য বা 'বৈদ্য কায়স্থ, মেঘদাসের পুত্র এবং 'বৈদ্য প্রসারক' প্রণেতা গদাধর দাসের পিতা। এঁর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী। ইনি ছিলেন রাঢ়বাসী। রচিত গ্রন্থের নাম 'বৈদ্যসার'।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র—বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশজাত সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র। পালরাজত্বকালে একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইনি রাজত্ব করেন। ইনি চন্দ্রদ্বীপ অধিকার এবং হরিকেলে (পূর্ববঙ্গে) বিজয়ধ্বজা উত্তোলন করেন। 'গোরক্ষবিজয়' কাহিনীর রাজা গোপীচন্দ্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রেরই পৌত্র। এবং মাণিকচন্দ্র তাঁর পুত্র। এঁর রাজধানী বিক্রমপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলি তখন থেকে এক বিশিষ্ট জনপদে পরিণত হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ দেব—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। ২৪ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রাম নিবাসী। ইনি সে যুগে কাষ্ঠ খোদাই কাজে সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন। তখন এখনকার মতো হাফটোন ব্লক প্রচলিত ছিল না। ইনি এই শিল্পে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ইনি অতি সহজ সরল অমায়িক ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। ১৮২৮ সালে একাশি বছর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর খুল্লতাত।

ত্রৈলোক্যমোহন—ইনি একজন শিল্প বা বাস্তুশাস্ত্র প্রণেতা। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ত্রৈলোক্যমোহন-তন্ত্র'। গ্রন্থখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

থ

থ্যাকারে, উইলিয়ম—বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতামহ। বাংলাদেশে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'রাইটার' ছিলেন। পরে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ফ্যাক্টর' ও ঢাকার কৌন্সিলের সভ্য হন। ১৭৭২ সালে শ্রীহট্টের 'কলেক্টর' হন। সেই সময় কোম্পানীকে হাতী সাপ্লাই করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে ফিরে যান।

দ

দক্ষিণ নাথ—একজন সিদ্ধাচার্য।

দক্ষিণ রায়—দক্ষিণ বাংলায় সুন্দরবন অঞ্চলে মটুক নামে এক রাজা ছিলেন। তার গোঁসাই-এর নাম দক্ষিণ রায়। ইনি খুব বীরপুরুষ ছিলেন। এঁর ভক্তেরা এঁকে দেবতা স্থানে স্থাপন করে পূজা আরম্ভ করেন। পরে ইনি সব-সাধারণের পূজ্য দেবতা হয়েছেন।

দণ্ডপাণি—প্রাচীন বঙ্গের গঙ্গা-নগরের কলিঙ্গরাজ। দণ্ডপাণির ভগিনী মায়া দেবীর সঙ্গে শুদ্ধোধনের ও কন্যা গোপার সঙ্গে বুদ্ধদেবের বিবাহ হয়।

দত্তরাম—ইনি একজন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। এঁর রচিত বর্ষাচন্দ্রোদয়, নাড়ী দর্পণ, নাড়ী প্রকাশ, রসরাজমহোদধি প্রভৃতি গ্রন্থ খুব বিখ্যাত।

দনুজমর্দন দেব—চন্দ্রদ্বীপের প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমপুর নিবাসী ঋষিকল্প চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের শিষ্য এবং চন্দ্রদ্বীপের আদি কায়স্থ রাজা। এঁর আদি বাসস্থান ছিল গৌড়ে। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আপন ইষ্টদেব চন্দ্রশেখরের আহ্বানে বিক্রমপুরে আসেন এবং চন্দ্রশেখর এঁকে নবোত্থিত চন্দ্রদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ। উপাধি ছিল দেব। এঁর রমাবল্লভ নামে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এক পুত্র হয়। এই পুত্র অচিরে ক্ষমতাপন্ন হয়ে বর্তমান বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর জেলায় রাজ্য বিস্তার করেন। দনুজমর্দনের রাজত্বের শেষভাগে এঁর রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

দনুজ রায়—চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজা দনুজ রায় ছিলেন পূর্ববঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁর স্বাধীন নরপতি। গৌড়ের পাঠান নরপতি অথবা দিল্লীর সুলতান এঁকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন নি। এঁর প্রবল পরাক্রমের

কথা তখন বঙ্গের বাহিরেও সুপরিচিত ছিল। এঁর বহু রণতরী ছিল।

দনুজ মাধব দশরথ দেব—ঢাকা জেলার আদাবাড়ী নামক একটি স্থান থেকে একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাম্রশাসনখানি দনুজ মাধব দশরথ দেব নামক এক রাজার। এই দশরথ দেব বংশীয় বলে অনুমিত হয়। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দী।

দনুজারি দেব—একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কণ্টকদ্বীপ বা কাটোয়ায় স্থাপিত দেব বংশের রাজা। এই বংশের সুবিখ্যাত সুরদেব ছিলেন এঁর পিতা। ইনি নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। বটুভট্ট এঁকে লক্ষ্মণ সেনের মিত্র ও সামন্ত বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মণসেনের সময় রাঢ়ীয় কুলীনদের প্রথম ও দ্বিতীয় সমীকরণ হয়। দনুজারি দেবই এই সমীকরণের প্রবর্তক। এঁর অবস্থিতি কাল দ্বাদশ শতাব্দী।

দর্পনারায়ণ—সম্রাট আকবর কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার কানুনগো ভগবান রায়ের পৌত্র এবং হরিনারায়ণের পুত্র। হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর দর্পনারায়ণ উত্তরাধিকার-সূত্রে কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শীদকুলী খাঁ ঢাকা থেকে রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কর্মচারীসহ মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠিয়ে আনলে তাঁর সঙ্গে দর্পনারায়ণও মুর্শিদাবাদে আসেন। ইনি নবাব কেল্লার অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ডাহা পাড়ায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্যে দর্পনারায়ণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি বাংলার আয় দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত করে ছিলেন। ইনি বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। শেষ জীবনে মুর্শিদকুলীর সঙ্গে এঁর সদ্ভাব ছিল না। দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত, "কালীসাগর" নামক জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরাদি নির্মাণ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর—পাথুরিয়া-ঘাটা ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি প্রথম জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী কোম্পানীর অধীনে কাজ করতেন। পরে ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। এই উভয় কার্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। দর্পনারায়ণ তৎকালীন কলকাতাবাসী বাঙালীসমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

দর্পনারায়ণ রায়—বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর একজন রাজস্ব সচিব। এঁর পিতা হরিনারায়ণ রায়ও রাজস্ব সচিব ছিলেন। এঁদের কৌলিক পদবী মিত্র। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার পাজুটি গ্রামে এঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত

করলে দর্পনারায়ণও নতুন রাজধানীতে আগমন করেন। এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে ডাহাপাড়াতে বাসস্থান স্থাপন করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যে দর্পনারায়াণের গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। দর্পনারায়ণ রাজস্ব বিভাগের নানাবিধ উন্নতিসাধনপূর্বক অনেক আয় বৃদ্ধি করেন।

দবীর খাস—বাদশাহ হোসেন শাহ প্রদত্ত রূপগোস্বামীর নাম। রূপগোস্বামী দ্র০।

দর্ভপাণি—ধর্মপালের (৭৭০—৮২০ খ্রীঃ) ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গর্গের পুত্র। জানা যায় যে দভপাণির নীতি কৌশলে দেবপাল হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন দেবপালের প্রধানমন্ত্রী। বুদ্ধিতে ইনি ছিলেন বৃহস্পতিতুল্য। দেবপালের সাম্রাজ্য সংরক্ষণে এঁর দান অসামান্য। শুনা যায় যে সম্রাট দেবপাল স্বয়ং তাঁর মন্ত্রী দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁর দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দভপাণি অসামান্য প্রভাবশীল মন্ত্রী ছিলেন। তিনি চতুর্বেদে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

দময়ন্তী দেবী—পাণিহাটি নিবাসী চৈতন্য মহাপ্রভুর পরমভক্ত রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী। ইনিও মহাপ্রভুর প্রিয়দাসী ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রতি দময়ন্তী দেবীর অসামান্য নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। বার মাস ইনি মহাপ্রভুর সেবার জন্য নানাপ্রকার আহার্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। এবং সমস্ত দ্রব্য সুন্দর করে সাজিয়ে ঝালি ভর্তি করে ভ্রাতা রাঘবের সঙ্গে নীলাচলে পাঠিয়ে দিতেন। সারা বছরই ইনি সংগ্রহ বিষয়ে তন্ময় হয়ে থাকতেন। আজও 'রাঘবের ঝালি'র নাম নীলাচলে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

দয়ারাম দাস—অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি। এঁর রচিত কাব্য 'সারদা মঙ্গল' বা 'সারদা চরিত্র'। কবি দয়ারাম দাসের বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়া পরগণার কিশোরচক গ্রামে। ইনি 'সারদা মঙ্গল' ছাড়া আরও একটি বই রচনা করেছিলেন, তার নাম "লক্ষ্মী চরিত্র"। সারদা মঙ্গলের রচনা পাঁচালির লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রায় কাব্যগুণ বিবর্জিত। কবির পিতার নাম ছিল জগন্নাথ দাস, পিতামহ পরীক্ষিৎ, প্রপিতামহ রামেন্দ্রজিৎ। কবি কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে (১৭৫৬—১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) বর্তমান ছিলেন। এবং ইনি ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন। দয়ারামের 'সারদামঙ্গল' সেকালে ধনী-জমিদারদের বাড়ীতে পুত্রের বা কন্যার বিদ্যারম্ভের সময় গাওয়া হত। আবার সরস্বতীপূজা উপলক্ষেও গীত হত।

দয়ারাম রায়—বর্তমান দিঘা পতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

নাটোরের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের রাজ্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ইনি দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। রাজা সীতারাম রায়ের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতীকে দয়ারাম গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করান এবং পরে সীতারামকে পরাজিত ও বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে নিয়ে যান। অবস্থিতি কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

দয়াশঙ্কর—একজন জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'গ্রন্থদীপিকা'।

দয়িত বিষ্ণু—বাংলার পাল রাজবংশের প্রবর্তক। এঁর রাজা বা মহারাজা কোন উপাধি ছিল না। তবে দেখা যায় ইনি 'সর্ববিদ্যাবদাত' এই বিশেষণে বিশেষিত হতেন। এঁর পুত্রের নাম বপ্যট। পাল রাজবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব ছিলেন দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র।

দরঙ্গ শাহ—একজন বিখ্যাত দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ জালালের অনুসঙ্গী ছিলেন।

দরাফ খাঁ গাজী—ত্রিবেণী-নিবাসী বাঙালী মুসলমান কবি। ইনি সংস্কৃত ভাষায় যে গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেছিলেন, তা হিন্দুগণ এখনো ভক্তিভরে আবৃত্তি করে থাকেন। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

দরিয়া পীর—একজন বিখ্যাত দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালালের অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন।

দলীপ সামন্ত—ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর পরগণার একজন কোচ বংশীয় সামন্ত রাজা। পাঠান রাজ হোসেন সাহেব সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমাগন সেবপুর আক্রমণ ও অধিকার করেন। ঐ সময়েই ময়মনসিংহ প্রথম মুসলমান অধিকারে আসে (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)।

দাউদ কুরেষী—একজন বিখ্যাত দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ জালালের জ্ঞাতি ও অনুগত অন্যতম শিষ্য। ইনি শ্রীহট্টের বেজা পরগণার দাউদপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। এবং সেখানে এঁর সমাধি আছে।

দাউদ খাঁ—সোলেমান কররানীর এক পুত্র। সোলেমানের অপর পুত্র বাযাজিদ্ খাঁর হত্যাকারী হাঁসুকে হত্যা করে দাউদ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। সিংহাসন লাভ করেই দাউদ আকবর বাদশাহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেননি এবং নিজনামে মুদ্রা প্রচলন আরম্ভ করেন। এঁর চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী, সাড়ে তিন হাজার রণহস্তী, এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতিক, বিশ হাজার কামান এবং বহু সংখ্যক সুসজ্জিত রণতরী ছিল। এই সুপ্রচুর রণসম্ভার নিয়ে দাউদ মনে মনে দুনিয়ার মালিক

হওয়ার স্বপ্ন দেখলেন। ইনি শ্বেতচ্ছত্র, রাজদণ্ড এবং অপরাপর রাজচিহ্ন ধারণ করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। আকবরের সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ আক্রমণ করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। দাউদ প্রথমেই পদ্মার দক্ষিণ পারে গাজীপুরের কিছু উত্তরে জেমিনিয়া দুর্গ আক্রমণ করেন। আকবর সেনাপতি মনিয়মকে দাউদের বিরুদ্ধে পাঠান। দাউদের প্রধান মন্ত্রী লোডি খাঁয়ের সঙ্গে মনিয়াম পাটনার নিকট যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শীঘ্রই লোডির সঙ্গে মনিয়মের সন্ধি হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে বঙ্গেশ্বর সম্রাটকে নগদ দু'লক্ষ টাকা এবং এক লক্ষ টাকার রেশমের কাপড় ও মসলিনাদি দিতে স্বীকৃত হন এবং মনিয়মও বিহার থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজী হন। সন্ধির কথা শুনে দাউদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং "লোডি খাঁ তাঁর মস্তক হেঁট করে দিয়েছেন" এই অভিযোগ করে লোডিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে তার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন।

ওদিকে আকবরও মনিয়মের সন্ধি-শর্ত মোগলের পক্ষে গৌরবজনক নয় ভেবে তাঁর উপর বিরক্ত হন এবং দশ হাজার সৈন্যসহ তোড়রমল্লকে বিহারে মনিয়মের উর্ধ্বতন কর্মচারী করে প্রেরণ করেন। মনিয়ম দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান করলে দাউদ হাজি-পুরের শাসনকর্তা ফতে খাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান। ফতে খাঁর অসীম সাহস ও কৌশলে মোগল সৈন্য প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। এমন সময় আকবর নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করায় ফতে খাঁ পরাস্ত ও নিহত হন। দাউদ তেরিয়াগড়িতে পালিয়ে আসেন। মুনিম খাঁ ও তোড়রমল্ল তাঁর পশ্চাধাবন করেন। তখন দাউদ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে উড়িষ্যায় যান। এখানে মুনিম খাঁর সঙ্গে দাউদের প্রবল প্রতি-রোধ চলে। অবশেষে দাউদ সন্ধির প্রস্তাব করেন। দাউদ আর কখনো সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না এই শর্তে তিনি উড়িষ্যার শাসন অধিকার পান। বাংলা কিন্তু মুনিম খাঁর শাসনাধানে আসে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর বাংলায় আফগানগণ আবার হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পান। এই সুযোগে দাউদ খাঁও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করেন। মোগলের সঙ্গে লড়াইএ দাউদ শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও ধৃত হন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয় (১৫৭৬ খ্রীঃ)। প্রায় চার শত বছর ধরে বঙ্গদেশে যে পাঠান প্রাধান্য ছিল, দাউদ খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং দাউদ শাহ গৌড় রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন নরপতি। ইনি শের সাহ ও ইসলাম সাহের মুদ্রার অনুকরণে আরবী ও হিন্দী ভাষায়—রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন

করিয়েছিলেন। কালাপাহাড় দাউদের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

দাউদ শাহ—শ্রীহট্টের তরফ পরগণার লস্করপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ আউলিয়া সয়েফ মিন্নতউদ্দিন সৈয়দ শাহের প্রপৌত্র। ইনি নিজেও একজন বড়দরের আউলিয়া ছিলেন। এই দাউদ শাহের নামেই দাউদপুর পরগণা হয়েছে।

দাদাপীর—একজন বিখ্যাত পীর। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালালের অনুগত অন্যতম শিষ্য।

দানশীল—জন্মস্থান বাংলা দেশ। ইনি উত্তর বঙ্গের জগদ্দল বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। ইনি শাক্যশ্রীভদ্র নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হয়ে অভয়াকর গুপ্তের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি প্রায় ষাটখানা তন্ত্রগ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করেন। দানশীল 'পুস্তক পাঠোপায়' নামক একখানি মূল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং অপর পণ্ডিতগণের সঙ্গে যুক্তভাবে সংস্কৃত-তিব্বতীয় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন।

দামোদর—গোবিন্দ দাস কবিরাজের মাতামহ। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। গোপালদাস-রসিকদাসের শাখানির্ণয় কাব্য থেকে জানা যায় ইনি "রাজসেবী" ছিলেন।

"যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী॥"

খুব সম্ভব ইনি হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সরকারে কাজ করতেন বলে মনে হয়। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তি রত্নাকর' থেকে জানা যায়, এই দামোদর 'সঙ্গীত দামোদর' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

দামোদর দেব—রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষদিকে পূর্ববঙ্গে মেঘনা নদীর পূর্বতীরে মধুমথনদেব একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মধুমথন দেবের পৌত্রই দামোদর দেব। দামোদর দেবের পিতার নাম ছিল বাসুদেব। দামোদর দেব ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্ততঃ ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম নিয়ে এঁর রাজ্য গঠিত ছিল বলে অনুমিত হয়। দামোদর দেবের মৃত্যুর পর এ রাজবংশের আর কোন বিবরণই পাওয়া যায় না।

দামোদর দেব—আসামের একজন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আসামের নওগাঁ জেলার অন্তর্গত নলবা গ্রামে গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম সদানন্দ ও মাতার নাম সুশীলা দেবী। ইনি বাল্যকাল থেকেই

ধর্মানুরাগী ছিলেন। এবং চিরকৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করেন। ইনি শঙ্কর-দেবের চেয়ে প্রায় চল্লিশ বছরের ছোট। শঙ্কর দেবই এঁর নামকরণ করেন। উভয়ের ধর্মানুরাগের ফলে আসামে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিরানব্বই বছর বয়সে ইনি কোচবিহারের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে পরলোক গমন করেন। ভট্টদেব ছিলেন এঁর প্রধান শিষ্য। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে এর সম্প্রদায় 'দামোদরীয়া' নামে পরিচিত।

দামোদর পণ্ডিত—এঁর নিবাস ছিল নবদ্বীপে এবং ইনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এঁকে যথেষ্ট কৃপা করতেন। চৈতন্যদেবের নীলাচল গমনের কিছুকাল পরে দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতি শঙ্কর পণ্ডিতের সঙ্গে তথায় গিয়ে মিলিত হন। এর পর কোন এক সময় শচীদেবীকে দেখবার জন্য নবদ্বীপে গিয়েছিলেন। কোন এক রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে ইনি নীলাচলে গেলে মহাপ্রভু এঁকে শচীদেবীর বিষ্ণুভক্তি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ-ভাবে প্রশ্ন করলে ইনি সক্রোধে বলে-ছিলেন যে স্বয়ং শচীদেবী হতেই মহাপ্রভুর বিষ্ণুভক্তির উদয় হয়েছে, সুতরাং মহাপ্রভুর সন্দেহ অনুচিত। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার শেষদিকে দামোদর তাঁর সহিত মিলিত হয়েছিলেন। দামোদর পণ্ডিতেরা ছিলেন—পীতাম্বর, দামোদর, জগন্নাথ (?) শঙ্কর ও নারায়ণ। শঙ্করই ছিলেন দামোদরের সবচেয়ে প্রিয়। পীতাম্বর ছিলেন দামোদরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সম্ভবত গৌরাঙ্গপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুকাল পূর্বে দামোদর পণ্ডিত তার নবদ্বীপ লীলার সঙ্গে যুক্ত হন এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দিন ইনি নবদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন। চৈতন্যের নীলাচল গমনকালে ইনি তাঁর সঙ্গীরূপে গিয়েছিলেন। এই সময় থেকে দামোদর মহাপ্রভুর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। চৈতন্যের দক্ষিণ যাত্রাকালে ইনি তাকে এগিয়ে দেন। মহাপ্রভুর গৌড় যাত্রাকালে দামোদর তাঁর সঙ্গীরূপে গৌড়ে এসে পুনরায় তাঁর সঙ্গে নীলাচলে ফিরে গিয়েছিলেন। নীলাচলে বেড়া কীর্তনাদিকালে দামোদর যুক্ত হতেন। দামোদর ছিলেন ব্রহ্মচারী। তার চরিত্রবল অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। ইনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। এজন্য মহাপ্রভু এঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলতেন। মহাপ্রভু এঁর উপর শচীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে এঁকে নদীয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। ইনি মাঝে মাঝে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রাত্যহিক সেবার জন্য যে গঙ্গাজল প্রয়োজন হত দামোদর স্বহস্তে তা তুলে আনতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধানের পর দামোদর পরলোক গমন করেন।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

দামোদর যোগী—মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী নিবাসী। এঁর শিষ্য গোবর্ধন দাস। ইনি প্রথমে বৈদান্তিক ছিলেন। শ্যামানন্দ প্রভুর সহিত তর্কে পরাজিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দামোদর সরখেল—পিতার নাম কংসারি মিশ্র। শ্রীমতী জাহ্নবা ও বসুধা দেবীর খুল্লতাত।

দারিক—একজন চর্যাপদ রচয়িতা। খুব সম্ভব ইনি লুই পাদের শিষ্য ছিলেন। কালচক্র, কঙ্কালিনী, বজ্রযোগিনী, চক্রশম্বর প্রভৃতি মহাযান মতান্তর্গত দেবদেবী সম্বন্ধে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। এর একটি চর্যাপদে সংস্কৃত, সংস্কৃতমূলক, প্রাচীন বাংলা এবং কথ্য বাংলার শব্দ দেখতে পাওয়া যায়। দারিক পাবিম নামক নদীর কূলে বাস করতেন।

দিগম্বর ভট্টাচার্য—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। রাজা রামমোহন রায়ের সমকালবর্তী একজন কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। ইনি রামমোহনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

দিবাকর চন্দ্র—অদ্বয়বজ্রের শিষ্য, এবং পালরাজ নয়পালের রাজত্বকালে বাস করতেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী। কোন কোন গ্রন্থে ইনি 'মহাব্রাহ্মণ' বলে বর্ণিত হয়েছেন। ইনি ছিলেন আচার্য মৈত্রীপার শিষ্য। 'হেরুক সাধন' এঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ। এঁর কয়েকখানি অনুবাদ গ্রন্থ ছিল। 'সহস্রভুজ-নেত্রসাধন' নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তকের ইনি ভুটিয়া তর্জমা করেছিলেন।

দিবাকর দত্ত—উদ্ধারণ দত্ত-ঠাকুরের পূর্ব নাম। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর দ্র°।

দিবাকর পাণ্ডা—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ও তাঁর বংশধর বাহাদুর খাঁর সময় পর্যন্ত দিবাকর পাণ্ডা রাজস্ব সচিব ছিলেন। ইনি ছিলেন জলামুঠার রাজস্ব সচিব।

দিবাকরোপাধ্যায়—মিথিলা-নিবাসী খ্যাতনামা ন্যায়াচার্য। এঁর অভ্যুদয়কাল ১২০০—৫০ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি কিরণাবলীর টীকা রচনা করে-ছিলেন। এঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোত' অর্থাৎ উদয়নের তাৎপর্যপরিশুদ্ধির উপটীকা। অধিকন্তু দিবাকর খণ্ডনখণ্ড খাদ্যেরও টীকা রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইনিই খণ্ডনের প্রাচীনতম টীকাকার।

দিব্বোক—বাংলা পালরাজ বংশ যখন ক্ষীয়মান, অনাচার, অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, অন্তর্বিপ্লব ও দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ, তখন বরেন্দ্রভূমির (উত্তর বঙ্গ) অধিবাসিগণ বিদ্রোহ

ঘোষণা করে। বিদ্রোহীদের হাতে পালরাজ দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন এবং কৈবর্ত নায়ক দিব্বোক বরেন্দ্রের রাজা হন। ইনি নাকি প্রথমে মহীপালের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে রাজার অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। এঁর অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী। বিজয়োল্লাসে দিব্বোক দিনাজপুর জেলায় এক দীঘির উপর একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। তা এখনো বিদ্যমান।

দিব্যসিং—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় নামক স্থানে দিব্যসিং নামে এক স্বাধীন ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। এঁর রাজধানী ছিল লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে। সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের পিতা দত্তক-চন্দ্রিকা প্রণেতা কুবেরাচার্য দিব্যসিং-এর মন্ত্রী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী হলে দিব্যসিং সেখানে গিয়ে তাঁর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর নাম হয় কৃষ্ণদাস। ইনি সাধারণতঃ লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত। ইনি 'বাল্যলীলাসূত্র' নামে অদ্বৈতাচার্যের বাল্যকালের বিবরণ সম্বলিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া, সংস্কৃত 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' নামক গ্রন্থের ইনি পদ্যানুবাদ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া দ্র°।

দিব্যসিংহ—বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। এঁর লেখা একটি পদের কিয়দংশ,

"যব ধরি পেখলুঁ কালিন্দীতীর
নয়নে ঝরয়ে কত বারি অথীর।...
দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরামা
রাই-কাহ্ন একতনু দুই এক-ঠামা॥

দিমিত্রিঅস্ গালানস্—(১৭৬০-১৮৩৩ খ্রীঃ)। গ্রীসদেশ থেকে ভারতে, প্রথমে বঙ্গদেশে আগত এক বিরাট বিদ্বান ও মনীষী। এঁর জন্ম এথেন্স নগরীতে। মাতৃভাষা গ্রীকে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ১৭৮৭ সালে ইনি ভারতে আসেন, প্রধানত ভারতে বসবাসকারী গ্রীক-বণিক সন্তানদের গ্রীক-ভাষা পড়াবার জন্য। প্রথমে ইনি ঢাকায় পৌছান। পরে কলকাতায় আসেন এবং কলকাতায় গ্রীক ছেলেমেয়েদের জন্য স্থাপিত বিদ্যায়তনে গ্রীক ভাষা পড়াতে থাকেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালেই গালানস্ বাংলা, ফারসী এবং হিন্দুস্থানীও শেখেন। ১৭৯৩ সালে কলকাতা ত্যাগ করে কাশীতে উপস্থিত হন এবং একাদিক্রমে চল্লিশ বছর কাশীতে কাটিয়ে সেইখানেই ১৮৩৩ সালে দেহ-রক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইনি এদেশে ভারতীয় পণ্ডিতের মতো বেশভূষা পরিধান

করে মাথায় পাগড়ী পরে থাকতেন। ইনি গ্রীক ভাষায় ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ করেন। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র এবং ভারতীয় ইতিহাস পুরাণ বিষয়ক কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ইনি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। এঁর চাণক্যের অনুবাদ জার্মান পণ্ডিতদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। এঁরই মাধ্যমে নীতিশাস্ত্রবিদ্ চাণক্যের সঙ্গে ইউরোপের প্রথম পরিচয় হয়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরকাল এদেশে বসবাস করে বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে এঁর সম্বন্ধে গবেষণা কার্য চলছে।

দিলাল—সন্দ্বীপে দিলালের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এঁর প্রকৃত নাম দেলোয়ার খাঁ। ইনি সাধারণ্যে দিলাল রাজা নামে পরিচিত। দিলাল প্রতিভাশালী, রাজনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। মগ ও মোগল উভয় শক্তিকে ফাঁকি দিয়ে ইনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী সন্দ্বীপে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। এঁর পিতার নাম বোগদাদ-নিবাসী বরাহনদ্দিন এবং মাতার নাম কামিলা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে দিলালের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ইনি রাখালের কাজ করতেন। পরে নিজ বুদ্ধি, বিক্রম ও কৌশলের সাহায্যে সন্দ্বীপের শাসনকর্তা হন। এঁর সুদীর্ঘ শাসন-কাহিনী সন্দ্বীপের ঘরে ঘরে ঠাকুরমার রূপকথার ন্যায় আলোচিত হয়। ইনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে গুণের আদর করতেন। ইনি প্রবলের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে দীন দুঃখীদের কল্পতরুর ন্যায় দান করতেন। প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য একদিকে যেমন রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিতেন, তেমনি রাজস্ব আদায়ের সময় প্রজাপীড়ন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এঁর শাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর। ইনি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোকদের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এঁর নিজের চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক। স্বাধীনতা ছিল এঁর জীবনের লক্ষ্য। ইনি স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন বলি দিতে কুণ্ঠিত হননি। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এঁকে রবিন হুডের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলে মোগল হস্তে বন্দী অবস্থায় দিলালের মৃত্যু হয়। এঁর মৃত্যুর পরেই সন্দ্বীপ প্রথম মোগল করতলগত হয়।

দীনবন্ধু দাস—এঁর সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম 'সংকীর্তনামৃতম্'। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সঙ্কলিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এতে স্বলিখিত ২০৭টি পদসহ চল্লিশ জন বিভিন্ন কবির লেখা ৪৯১টি পদ আছে। তার মধ্যে দীনবন্ধু ভণিতার পদ সংখ্যা দু'শতের বেশী। সংকীর্তনামৃতে রসশাস্ত্রের লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। পদগুলি উদাহরণের মত দেওয়া হয়েছে। দীনবন্ধুর পিতার নাম বল্লভীকান্ত, পিতামহ নন্দকিশোর, প্র-পিতামহ হরিঠাকুর।

দীনবন্ধু রায়—কাশিমবাজার ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যারাম রায়ের পুত্র। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার রেশমকুঠীর দেওয়ান ছিলেন। ইনি নবাব সরকারের নিকট থেকে খেলাত ও রৌপ্যমণ্ডিত ছড়ি ব্যবহারের অধিকার লাভ করেছিলেন। এঁর দুই পুত্রের নাম জগবন্ধু রায় ও ব্রজমোহন রায়। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান অতীশ—বাঙালী বৌদ্ধ মহাচার্যদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তিনি ছিলেন বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত। বঙ্গল (বাংলা) দেশে বিক্রমণিপুরে গৌড়ের রাজপরিবারে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে দীপঙ্করের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তাঁর পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি প্রথমে জেতারি ও পরে রাহুল গুপ্তের নিকট নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে মহাসাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু তাঁর নামকরণ করেন 'দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান'। বার বছর পরে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু বলে গৃহীত হন। এই সময় স্বর্ণ দ্বীপের প্রধান বৌদ্ধ ধর্মাচার্য খ্যাতনামা চন্দ্রকীর্তির নিকট শিক্ষালাভ করার মানসে একটি বাণিজ্য জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করে স্বর্ণদ্বীপে (সিংহল) উপস্থিত হন। সেখানে বার বছর অধ্যয়ন করে তিনি সিংহল ভ্রমণ করে মগধে ফিরে আসেন। রাজা মহীপাল তাঁকে বিক্রমশীলা বিহারে নিমন্ত্রণ করেন এবং রাজা নয়পাল তাঁকে বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্যপদে বৃত করেন। তিব্বতের রাজা কর্তৃক সাদরে আমন্ত্রিত হয়ে দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে তেরো বছর বাস করে ৭৩ বছর বয়সে ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ভারতের বহু বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রায় দু'শত বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দীপঙ্কর অতীশ নামেও সুপরিচিত।

দুঃখী শ্যামাদাস—শ্যামাদাস, দুঃখী দ্র০।

দুর্গাকুমার ঘড়িয়াল—বাঙালী পালাগান রচয়িতা। ইনি ঠাকুরদাস দত্তের যাত্রার দলে অনেক দিন প্রধান গায়ক ছিলেন। পরে নিজেও একটি যাত্রার দল গঠন করেন। এঁর নিবাস ছিল কলকাতায়। ইনি প্রথম জীবনে ঘড়ির কাজ করতেন বলে 'ঘড়িয়াল' নামে পরিচিত হন।

দুর্গাদত্ত মিশ্র—একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম ন্যায়বোধিনী। এই ন্যায় ও বৈশেষিক মতসমূহ আলোচিত হয়েছে।

দুর্গাদাস করচৌধুরী—অতি সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় প্রতিভা ও

অধ্যবসায় বলে উন্নতি লাভ করে সমাজের অশেষ কল্যাণ করেছিলেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোদালে ১৭৫৬ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে মেদিনীপুরের মাজনা মুটার জমিদার যুগরাম রায়ের নিকট চাকরি গ্রহণ করেন। এরপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিমক মহলে চাকরি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। অচিরকাল মধ্যেই কয়েকটি জমিদারী ক্রয় করে বিশেষ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হন। দুর্গাদাস ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ পরম ধার্মিক। ইনি বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। কোনোও কোনোও স্থানে ইনি দেবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বদেশে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও জলাশয় খনন করে লোকপ্রিয় হন। ইনি গরীব ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল ছিলেন।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, মহাপ্রভুর ভক্ত এবং বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র। ইনি 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে'র ও কবি কল্পদ্রুমের টীকা রচনা করেছিলেন।

দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি প্রথমে নরোত্তমের নিন্দুক ছিলেন। পরে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পরম বৈষ্ণব হন।

দুর্গাদাস মিশ্র—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতামহ। পত্নী—বিজয়া। এঁর দুই পুত্র—সনাতন ও কালিদাস। সনাতনের কন্যার নামই বিষ্ণুপ্রিয়া—চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী।

দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি বা মুখোপাধ্যায়—এঁর রচিত 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' একখানি পুরো-পুরি 'অষ্টমঙ্গলা' পাঁচালী কাব্য। কবির বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামের খড়দহ পাড়া। পিতার নাম আত্মারাম, মাতা অরুন্ধতী। পত্নী হরিপ্রিয়া ছিলেন ভূকৈলাসের গোকুলচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কবিপত্নীকে গঙ্গাদেবী স্বপ্নাদেশ দেওয়ায় দুর্গাপ্রসাদ কাব্য রচনা করে-ছিলেন। এই কাব্য রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। গঙ্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী অষ্টমঙ্গলা কাব্য, গান করবার জন্য রচিত হয়েছিল। কলকাতা অঞ্চলে এর বেশ প্রচার ছিল। উহা শ্রেষ্ঠ কাব্য না হলেও প্রচলিত ধর্মাবলম্বীদের একটি অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ ছিল।

দুর্গারাম—ইনি একখানি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন সময় বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। দ্বিজ দুর্গারাম নামক এক কবি "কালিকা পুরাণে"র অনুবাদ করেছিলেন। অনেকের মতে উভয় দুর্গারাম সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

দুর্জন সিং—বাঁকুড়া জেলার রায়পুর থানার জমিদার। কোম্পানী আমলে তাঁর পৈতৃক জমিদারী হাত-ছাড়া হয়ে পড়ে। ১৭৯৮ সালে চোয়াড়রা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে দুর্জন

সিং তাদের নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে চোয়াড়রা অন্তত পক্ষে ৩০টি গ্রামের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। একবার দুর্জন সিংহকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁকে বিচারের জন্যে আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু তাঁর বিপক্ষে একটি লোকও সাক্ষী দিতে রাজী হয়নি। ফলে তাঁর বেকসুর খালাস হয়।

দুর্জয় দাশ—শ্রীখণ্ডের অধিবাসী বিশ্বম্ভর বৈদ্য দাশের পুত্র। এঁর রচিত 'বৈদ্যকুল পঞ্জিকা' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইনি শক্তি গোত্রীয় চক্রপাণি সেনের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

দুর্দানা বেগম—বাংলার সুবেদার নবাব সুজাউদ্দিনের কন্যা। মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। নবাব সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলি খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। এই নবাব-কন্যা ছিলেন অত্যন্ত বীর্যবতী রমণী। আলীবর্দী খাঁ তাঁর ভ্রাতা সরফরাজ খাঁকে বধ করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। পরে উড়িষ্যা আক্রমণ করলে মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথমে যুদ্ধ করতে অসম্মত হন। কিন্তু তাঁর বীর পত্নী দুর্দানা বেগমের উৎসাহে ইনি যুদ্ধ করতে সম্মত হন। এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সপরিবারে উড়িষ্যার দক্ষিণে পলায়ন করতে বাধ্য হন।

দুর্লভ ছত্রী—কেশব ছত্রীর পুত্র। বীরভদ্রের সম্মানে মালদহে ইনি বিরাট মহোৎসব করেছিলেন। মহোৎসব অন্তে দুর্লভ ছত্রী বীরভদ্রকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়েছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

দুর্লভ দ্বিজ—দুর্লভ রায় দ্র°।

দুর্লভ নারায়ণ—কোচবিহারের কামতাপুরের রাজা। এঁর পিতার নাম ছিল প্রতাপধ্বজ। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্লভ নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্বে বড়নদী (কামরূপ জেলার) পর্যন্ত এঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

দুর্লভ মল্লিক—একজন বাঙালী কবি। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম "গোবিন্দগীত"। বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম লোপের পর ইহা বাংলা ভাষায় বিরচিত হিন্দুত্বপ্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যোগ-সাধন দ্বারা লোকে যে অলৌকিক ক্ষমতা ও অমরত্ব লাভ করতে পারে ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।

দুর্লভ রায় বা দ্বিজ দুর্লভ—এঁর দুটি ভাল পদ পাওয়া গিয়েছে। পদ দুটি সপ্তদশ শতাব্দীর লেখা, রামলীলা বিষয়ক। প্রথম পদটি রাম নির্বাসনের,

"বাছা রাম খানিক দাণ্ডাইয়া থাক
মায়ের ম[রণ] দেখ
আস্ত চুম্ব খাই রে বদনে
মোর প্রাণ বাহির হৈআ
যাবে পথ দেখাইআ
তবে তুমি যাইবে কাননে।"...

দ্বিতীয় পদটি লক্ষ্মণ-শক্তিশেলের,
"লক্ষ্মণ পড়িল শেলে কপিগণ বলে
ধায়্যা আল্য প্রভু রামভাই কৈল
কোলে।"

দুর্লভরাম সোম (মহারাজা) —ইনি চুঁচুড়ার সোম বংশজাত। ইনি মহারাজা জানকীরাম সোমের পুত্র। এঁর জন্ম হয় ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি 'রায়দুর্লভ' নামে সমধিক পরিচিত। নবাব আলীবর্দী এঁকে সুবেদার আবদাস-সোভানের অধীনে উড়িষ্যার নায়েব সুবেদার পদে নিযুক্ত করে-ছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আবদাস সোভানের মৃত্যুর পর নবাব দুর্লভরামকে "রাজা" উপাধি দান করে উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করেন। অল্পকালের মধ্যে মারাঠারা হঠাৎ উড়িষ্যা আক্রমণ করে দুর্লভ-রামকে বন্দী করে। মারাঠা সর্দারকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে এঁকে মুক্ত করা হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়ে দুর্লভ রামকে নির্দেশ দেন নব নির্মিত ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটি ভেঙে ফেলতে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর মিষ্টার ড্রেক নবাবের আদেশ অমান্য করলে, নবাব দুর্লভরামকে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের কাশীমবাজারের কুঠী দখল করার হুকুম দেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুন কর্নেল ওয়াট সমগ্র কুঠী দুর্লভরামের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন নবাব কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি ইংরেজরা ঐ দুর্গ পুনরধিকার করে। তখন নবাব মীরজাফর ও রাজা দুর্লভরাম সেনাপতিদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা পুর্নযাত্রা করেন। কর্নেল ক্লাইবের জীবন তখন দুর্লভরামের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে থাকে। এবং ক্লাইব সন্ধির প্রস্তাব করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরকে ইংরেজরা সিংহাসন প্রদান করল এবং রাজা দুর্লভরাম "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি-ভূষিত হয়ে "দেওয়ান-ই-আলা" (প্রধানমন্ত্রী) নিযুক্ত হন। দুর্লভরামকে লর্ড ক্লাইব বিহারের নীটপুর নামক পরগণা 'জায়গীর' উপহার দিয়েছিলেন। যার বার্ষিক আয় ছিল ৮৭৫০০ টাকা। দুর্লভরামের পরামর্শেই লর্ড ক্লাইব দিল্লীর সম্রাট শা-আলমের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেছিলেন। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের পুরস্কারস্বরূপ দুর্লভরামকে ক্লাইব রংপুর জেলার অন্তর্গত 'পৈরাবন্দ-দিগার' নামক ছ'লক্ষ টাকা আয়ের এক জায়গীর দান করেছিলেন।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ রাজা দুর্লভরামকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা পেন্‌সন্ মঞ্জুর করেছিলেন। ইনি ইংরেজদের অভূতপূর্ব সাহায্য

করেছিলেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্লভরাম পরলোক গমন করেন।

দুর্লভেন্দ্র চন্তাই—ত্রিপুরার রাজবংশের কুলদেবতা 'চতুর্দশ দেবতার' পূজক ছিলেন। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস রাজমালা, মহারাজ ধর্মমাণিক্যের আদেশে প্রথমে এঁর দ্বারাই রচিত হয়। পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

দুলা মিস্ত্রা—বৈষ্ণবপদাবলী রচনাকারী একজন মুসলমান কবি। ইনি অনেকগুলি পদ রচনা করেছিলেন।

দুলাল তর্কবাগীশ—অবসর্থী চট্টবংশে দোকড়ি প্রকরণে আদি কুলীন বহুরূপের অধস্তন অষ্টম পুরুষ বিখ্যাত কুলীন বিদ্যাধর পাঠক হতে 'বিদ্যাধরী' মেলের উৎপত্তি। বিদ্যাধরের অধস্তন নবম পুরুষ দুলাল। দুলাল হতে যে পাণ্ডিত্য প্রতিভার উদ্ভব হয়, তা দীর্ঘকাল এই গোষ্ঠীতে চলেছিল এবং দুলাল ব্যতীত দু'একজন সংস্কৃত গ্রন্থকারও এই গোষ্ঠীতে জন্মেছিলেন। বহু মহাপুরুষের ন্যায় দুলালের বিদ্যার্জন ঘটেছিল অলৌকিকভাবে। বাল্যকালে তাঁর নিরক্ষরতা দূর করার অভিপ্রায়ে তাঁর মা স্বামীর নির্দেশ-ক্রমে অন্নে ছাই মিশিয়ে দিয়েছিলেন। বালক দুলাল তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করে তিন মাইল দূরে 'সোতলা' মাঠে এক নীলগাছের তলায় রাত্রি যাপন করেন। দেবী 'খর্পরচণ্ডী' প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দেন এবং একটি পুথি ও একটি বিশ্বফল তাঁকে প্রদান করেন। দেবী-দত্ত পুথির প্রভাবেই দুলাল অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন বলে জনশ্রুতি আছে। দুলালের জন্ম হয় ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

দুলালের প্রতিভা ছিল অসাধারণ। সাতগেছের দুলালের কীর্তি বিদেশী ছাত্রের দ্বারা বাংলার বাইরেও সুপ্রচারিত হয়েছিল। দুলাল তর্ক-বাগীশ বহু পত্রিকা বচনা করেছিলেন। এক সময় ঐ সকল পত্রিকা নবদ্বীপাদি সমাজে এবং বাংলার বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল।

দৃঢ়নাথ—একজন নাথপন্থী যোগাচার্য।

দে সুজা—দোমিনিক-দে-সুজা দ্র°।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়—রঘুনাথ রায়, দেওয়ান দ্র°।

দেদ্দ দেবী—বাংলার পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল দেবের প্রিয়তমা মহিষী এবং ধর্মপাল দেবের জননী। ইনি ছিলেন সম্ভবত সম-তটের রাজা রাজভট্টের বংশের দুহিতা।

দেবখড়্গ — খড়্গরাজবংশের জাতখড়্গের পুত্র। জাতখড়্গের মৃত্যুর পর দেবখড়্গ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই আসরফপুর তাম্রশাসন

দ্বয়ের প্রতিপাদয়িতা। সমগ্র পূর্ববঙ্গই ছিল এঁর রাজ্যসীমা। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে ইনি বর্তমান ছিলেন।

দেবগুপ্ত—যশোধর্মণের উত্তরাধিকারী, কর্ণসুবর্ণের মহাসামন্ত। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। নরেন্দ্রগুপ্ত ওরফে বঙ্গরাজ শশাঙ্কের জ্ঞাতি। রাজা শশাঙ্ক কণৌজে উপস্থিত হবার পূর্বেই দেবগুপ্ত কণৌজে উপস্থিত হয়ে গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। পরে তিনি থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন কর্তৃক পরাজিত হন।

দেবী সিংহ—নশীপুব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেবী সিংহের আদি বাসস্থান ছিল পাণিপথ। এঁরা ছিলেন জাতিতে আগরওয়ালা বৈশ্য। এঁদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল ব্যবসায়। দেবী সিংহ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথ থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন। পলাশী যুদ্ধের সময় ইনি ক্লাইভকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ব্যবসায়ে কিছু অর্থাগম হলে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁর কাছ থেকে পূর্ণিয়ার ইজারা ও শাসনভার হস্তগত করেন। ৯ লক্ষ টাকার স্থলে ইনি ১৬ লক্ষ টাকায় পূর্ণিয়ার ইজারা নিয়ে টাকা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতেন। ফলে দেবী সিংহের যথেষ্ট দুর্নাম ও কলঙ্ক রটে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁকে পদচ্যুত করেন। পুনরায় দেবীসিংহ মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নিযুক্ত হন। তারপর ইনি দিনাজপুর ও রংপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। তখনো এঁর স্বভাব পরিবর্তন হয়নি। এখানেও দেবী সিংহ প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার করতে থাকেন। প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে দেবীসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবশেষে কোম্পানীর হস্তক্ষেপে বিদ্রোহ মিটে যায়। ফৌজদারী আদালতে মহম্মদ রেজাখাঁর নিকট দেবী সিংহের বিচার হয়েছিল। রেজা খাঁর বিচারে দেবী সিংহ মুক্তিলাভ করেছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস্ দেবী সিংহকে চাকরি থেকে অবসর প্রদান করেন। প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে ইনি মুর্শিদাবাদের নসীপুরে বাস করেন। শেষ জীবনে ইনি নাকি বহু দান ও দেবসেবাদি সংকর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবী সিংহের মৃত্যু হয়।

দেবকীনন্দন দাস—ব্রাহ্মণ কুমার। এঁর নিবাস ছিল হালিশহরে। সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের ইনি ছিলেন মন্ত্রশিষ্য। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'বৈষ্ণববন্দনা'।

এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি ছিলেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইনি মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে ধন্য হন।

দেবনহুষ—অসুর বংশধব ও কলিঙ্গ রাজার সন্ধিবদ্ধ স্বাধীন রাজা। সূর্য বংশের রাজা 'সগব' বর্তমান সাগব দ্বীপে "সাংখ্য" প্রণেতা কপিল ঋষির আশ্রম আক্রমণ কবলে দেবনহুষ তাঁকে পরাজিত করেন।

দেবনাথ ঠক্কুর তর্কপঞ্চানন—মিথিলাবাসী নৈযায়িক। অলঙ্কার, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে ইনি মহাপণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। এঁব বচিত 'তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকপরিশিষ্ট' নামক টীকা নব্যন্যায়েব একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সংযোজন। ইনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ৪০০ লক্ষ্মণাব্দে দেবনাথ 'মন্ত্রকৌমুদী' রচনা কবেন এবং বার্ধক্যে কোচবিহারের রাজা মল্লদেব নরনাবায়ণের (১৫৫৫-৮৭ খ্রীঃ) বাজ-সভায় থেকে 'তন্ত্রকৌমুদী' রচনা কবে-ছিলেন। কাব্যপ্রদীপ ও পূজা প্রদীপকাব সম্ভ্রান্ত 'ঘুসৌত'-বংশীয় গোবিন্দ ঠক্কুরের ইনি ছিলেন পঞ্চম পুত্র। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেবনাথ 'আলোক পরিশিষ্ট' রচনা কবেছিলেন।

দেবনাথ দাস—শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ী। 'শ্রীগৌরগণাখ্যান' গ্রন্থের রচয়িতা।

দেবপাল—পাল বাজবংশের মহান্ ও বিরাট প্রতাপশালী রাজা ধর্মপালের পুত্র, রন্নাদেবীর গর্ভজাত। পিতৃ প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই ইনি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি বহুযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নূতন নূতন রাজ্যও জয় করেছিলেন। তাঁর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে তাঁর বিজয়বাহিনী দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত ও পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ অর্থাৎ কাশ্মীবেব সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। পিতৃব্য বাক্‌পালের পুত্র জয়পাল তাঁর সেনাপতি ছিলেন। এই জয়পাল ছিলেন তাঁর অর্জুনতুল্য ভ্রাতা এবং এঁরই সাহায্যে দেবপাল রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী ও মহিমান্বিত করে তুলতে সক্ষম হযেছিলেন। ধর্মপালের মন্ত্রী গর্গেব পুত্র দর্ভপাণি এবং প্রপৌত্র কেদার মিশ্র উভয়েই দেবপালেব প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কেদাব মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্রের লিপিতে বলা হযেছে যে দর্ভপাণিব নীতিকৌশলে দেবপাল হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপবত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী ভূভাগ কবপ্রদ করতে সমর্থ হযেছিলেন। বিজিত রাজগণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে দেবপাল উড়িষ্যা ও আসাম বাংলাব এই দুই সীমান্ত প্রদেশ জয় কবেন। তিনি হূণদেব পরাজিত করে তাদেব গর্ব খর্ব করেছিলেন। তিনি গুর্জর রাজেরও দর্প চূর্ণ করেছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যে, ধর্মপাল যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দেবপাল তার সীমান্তস্থিত কামরূপ, উৎকল, হূণদেশ ও কাম্বোজ জয় করেন এবং চিবশত্রু প্রতীহার রাজকে পরাজিত করেন। তিনি ৮২০-৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন বলে

অনুমিত হয়। তাঁর সময়ে পাল সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। পিতা ধর্মপালের ন্যায় দেবপালও পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। সমগ্র আর্যাবর্ত তাঁকে অধীশ্বর বলে স্বীকার করত। ভারতবর্ষের বাইরেও তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ও মলয় উপদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেব তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্ররাজ প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। তদনুসারে দেবপাল তাঁকে পাঁচটি গ্রাম দান করেন। দেবপাল নালন্দা বিহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে দেবপাল রাজ্যের উন্নতির জন্য বহু সৎ কর্ম করেছিলেন। বীরত্ব অপেক্ষা সাধুতাই ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। তিনি ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত-স্বভাব ও ধর্মানুরাগী মহান্ ব্যক্তি।

দেবপাল—ষোড়শ শতাব্দীতে নদীয়ার একজন বিখ্যাত ভূস্বামী। ইনি ছিলেন দেবগ্রামের কুম্ভকার বংশীয় রাজা। রাজা দেবপাল অমিত বলশালী ও ধনশালী ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে সামান্য অবস্থা থেকেই দেবপাল কুবের সদৃশ ধনশালী হয়েছিলেন এবং নিজনামেই গ্রামের নাম করেছিলেন দেবগ্রাম। রাজা দেবপাল অত্যাচারী মুসলমানদের কঠোর হস্তে দমন করতেন। এঁর তেজস্বিতা, উদারতা ও পুত চরিত্রে দিল্লীশ্বর মুগ্ধ হয়ে এঁকে মহারাজা উপাধি দিয়েছিলেন। দেবপাল সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে এঁর বিশাল সম্পত্তি কৃষ্ণনগরের ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাঘবের অধিকারভুক্ত হয়।

দেবমাণিক্য—ত্রিপুররাজ ধন্যমাণিক্যের পুত্র। ১৫২২ সালে ইনি ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর সময়ে বাংলার নবাব হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ তিনবার ত্রিপুরা আক্রমণ করে ব্যর্থ হন।

দেবরক্ষিত—পৌরাণিক যুগে তাম্রলিপ্তের রাজা। বিষ্ণুপুরাণে রাজা দেবরক্ষিতের নাম পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তাধিপতি দেবরক্ষিত কোশল, উড্র ও সমুদ্রতীরবর্তী জনপদসমূহেরও অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু রাজা দেবরক্ষিতের পূর্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষদের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বা তার কিছু পূর্বে দেবরক্ষিত বিদ্যমান ছিলেন।

দেবজ—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণের বংশধর। ইনি কৌলিন্য ব্যবস্থার প্রবর্তক রাজা বল্লালসেনের একজন

বিশিষ্ট সভাসদ্ ছিলেন। দেবলের পুত্রের নাম ছিল পণ্ডিত। এঁর অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী।

দেবসেন—প্রাচীন তাম্রলিপ্তের রাজা। বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিতে' দেবসেনের নাম পাওয়া যায়। ইনি সুহ্মেরও অধিপতি ছিলেন। এঁরই রাজত্বকালে ইউয়ান-চোয়াং ভারতবর্ষে এসেছিলেন। হর্ষচরিতে দেখা যায়, দেবসেনের মহিষী দেবকী দেবী তাঁর দেবরের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। তিনি বিষচূর্ণগর্ভ কর্ণোৎপল সাহায্যে স্বামী দেবসেনকে নিহত করেছিলেন।

দেবানন্দ খাঁ রাজা—প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্যের (বর্তমান নোয়াখালী) প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিশ্বম্ভর শূরের প্রপৌত্র। এঁর প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন।

দেবী চৌধুরানী—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলার এক বিখ্যাত স্ত্রীলোক ডাকাত। সমসাময়িক অপর বিখ্যাত পুরুষ ডাকাত ভবানী পাঠকের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ ছিল। দেবী চৌধুরানী নৌকায় বাস করতেন এবং এঁর বহু বেতনভোগী বরকন্দাজ ছিল। ইনি নিজে ডাকাতি করতেন এবং ভবানী পাঠক ডাকাতি করে যা আনতেন তার অংশও পেতেন। চৌধুরানী এই উপাধি থেকে মনে হয় দেবী চৌধুরানী একজন জমিদার ছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের "দেবী চৌধুরানী" উপন্যাসে দেবী চৌধুরানী অমর হয়ে আছেন।

দেবী দাস—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ও মৃদঙ্গ-বাদক। "কীর্তনীয়া দেবীদাস নানা শাস্ত্র জানে। মহাশয় দীক্ষামন্ত্র দিলা তার কাণে। জয় শ্রীঠাকুর দেবীদাস কীর্তনীয়া। বৈষ্ণব উন্মত্ত যাঁর কীর্তন শুনিয়া।"

দেবীদাস পণ্ডিত—একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কর্মবিপাকচিকিৎসামৃত সাগর'।

দেলাওর খতিব—একজন দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ জালালের অনুগত শিষ্য ছিলেন।

দৈখোরা [ওরফে **মুনির-উদ্দীন**]—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলিম কবি। ইনি শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 'বাহাদুর পুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি শ্রীহট্ট অঞ্চলে সাধক ও কবিরূপে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন। এঁর কতকগুলি পদ পাওয়া যায়।

দৈবকীনন্দন—এঁর পদবী ছিল "সিংহ" এবং উপাধি ছিল "কবিশেখর।" কবির আত্ম পরিচয় নিম্নরূপ :

"সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হবাবতী।
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি॥"

কবি দৈবকীনন্দন ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি। ইনি পদকর্তা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থাবলী (১) গোপালচরিত (মহাকাব্য), (২) কীর্তনামৃত (সঙ্গীত মালা), (৩) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বা গোপাল-বিজয় পাঁচালী ও (৪) গোপীনাথ-বিজয় (নাটক)। এঁর নিবাস ছিল মহানাদ। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

দৈ ব কী ন ন্দ ন—নিত্যানন্দ পরিবারভুক্ত একজন ভক্তকবি ও পদ-কর্তা। এঁর গুরু ছিলেন সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাস। বাংলা ভাষায় এঁর রচিত গ্রন্থ 'বৈষ্ণব বন্দনা'। এছাড়া, ইনি সংস্কৃত ভাষায় 'বৈষ্ণবাভিধান' গ্রন্থ রচনা করেন। এঁর নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিসহর।

দোদ্দয়াচার্য—একজন বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত। এঁর রচিত গ্রন্থ 'চণ্ডমারুত'। জন্মস্থান শোলিঙ্গর। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

দোনাগাজী চৌধুরী—সপ্তদশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম "সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল।" প্রসিদ্ধ কবি আলাওল-এর পদ্মাবতী কাব্যের মূল গল্প গ্রহণ করে সুদীর্ঘ বর্ণনায় দোনাগাজী তাঁর কাব্যখানি রচনা করেন। কাব্যখানি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিল।

দোম্ আন্তোনিও—পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ভূষণার রাজকুমার। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেরা এঁকে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যায়। কিন্তু জনৈক পোর্তুগীজ পাদ্রী টাকা দিয়ে এঁকে খালাস করে আনেন ও পরে ইনি খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে খ্রীষ্টান ধর্ম-গুরুদের নির্দেশ অনুসারে হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। দোম আন্তোনিও-এর আসল নাম পাওয়া যায় না। দোম আন্তোনিও-এর বই বাংলা দেশের পোর্তুগীজ পাদ্রীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার অন্তর্গত কোষাভাঙ্গা থেকে ঢাকার ভাওয়াল পরগণার নগরী গ্রামে পোর্তুগীজ পাদ্রীদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময় দোম্ আন্তোনিও-এর বইও নীত হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে দোম্ আন্তোনিও-এর বই মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য পোর্তুগালে পাঠানো হয়েছিল। মুদ্রণের উদ্দেশ্যে রোমান লিপিতে ঐ বইর অক্ষরান্তর করা হয়েছিল। পাদ্রী মানোএল্ তার আশয়ও পর্তুগীজ ভাষায় লিখেন, কিন্তু কোনও কারণে ঐ বই শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত

হয়নি, বইয়ের পাণ্ডুলিপি পোর্তুগালের এভোরা-নগরীর পুস্তকাগারে পড়ে ছিল। অবশেষে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই বইয়ের মূল বাংলার অধিকাংশ রোমান অক্ষরে বাংলা অক্ষরান্তরী-করণ সমেত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

দো মি নি ক-দে-সু জা—একজন পর্তুগীজ পাদ্রী। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইনি দু' একখানা খ্রীষ্টানী বই বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এর পূর্বে অন্য কোনও অনুবাদক বা পাদ্রী লেখকের কথা জানা যায় না। ইনি পর্তুগীজ জাতীয় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা দেশে এসেছিলেন।

দৌলৎ উজীর—এঁর রচিত গ্রন্থ 'লায়লি-মজনু'। এটি চাউগ্রাম অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট রচনা। আত্ম-পরিচয় অংশে কবি পূর্বপুরুষ হামিদ-খানের কেরামতি বর্ণনা করেছেন। দৌলৎ উজীরের গুরু ছিলেন আলাউদ্দীন। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

দৌলৎ কাজী—চট্টগ্রামের রোসাঙ্ রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'সতী ময়নামতী' বা "লোর চন্দ্রাণী'। দৌলৎ কাজীই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বাইরে লৌকিক কাহিনীর প্রথম কবি। কাব্য সমাপ্তির পূর্বেই কবি ইহলোক ত্যাগ করেন। অনেক কাল পরে রোসাঙ্ রাজসভার অন্যতম কবি আলাওল বাকি অংশটুকু লিখে কাব্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। রোসাঙের রাজা শ্রীসুধর্মা বা থিরিথু-ধর্মার সেনাপতি ("লস্কর উজীর") আসরফ-খানের অনুরোধে দৌলৎ কাজী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাজীর কাব্য রচিত হয়েছিল। দৌলৎ কাজীর কাব্য রচনাব মূলে কবি সাধন বচিত লৌকিক হিন্দী ("ঠেঠা চৌপাই") কাব্যের প্রভাব ছিল। কাজী ছিলেন নিষ্ঠাবান সুফী-সাধক।

দ্বা র কা দা স চৌধুরী—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার ও তাঁর বংশীয়দের রাজস্ব কর্মচারী। মাজনা মুটার রাজস্ব আদায়ের ভার এঁর উপর ছিল। এর বংশধররা পরে মাজনামুটার জমিদার হন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—১৭৯৪-১৮৪৬)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা। দ্বারকানাথের পিতার নাম রামমণি এবং মাতার নাম অলকা দেবী। দ্বারকানাথ বাল্যে পারসি ও ইংরেজী খুব ভালভাবে শিক্ষা করেছিলেন। বিখ্যাত কার-ঠাকুর কোম্পানী

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মারফত দ্বারকানাথ প্রভৃত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

তৎকালীন বহু জনহিতকর কার্য দ্বারকানাথের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, জমিদারসভা স্থাপন ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে দ্রুত ডাক বিনিময় ব্যবস্থা, সতীদাহ-নিবারণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বারকানাথ অগ্রণী হয়ে সাহায্য করেছিলেন। সকল প্রকার জন কল্যাণ ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান সহায়ক ছিলেন। তৎকালীন সামাজিক নানা কুসংস্কার থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৪২ সালে একবার এবং ১৮৪৪ সালে দ্বিতীয় বার বিলাত গিয়েছিলেন। প্রথমবার বিলাত থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন বিলাতের পার্লামেন্টের মেম্বর জর্জ টমসনকে। টমসন এ দেশে স্বাধীন রাজনীতি মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ১৮৪৬ সালে লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি যেরূপ বিলাস ও বৈভবের মধ্যে থাকতেন তাতে লোকে তাঁকে 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' বলতেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামে পাত্নুয়া বংশের ষষ্ঠ অধস্তন। ইনি 'শ্রীগোপী বল্লভ নাটক' রচনা করেন।

দ্বৈপায়ন দাস—প্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাসের পুত্র। ইনিও ক্ষুদ্রাবয়ব ভারত-কাব্য রচনা করেছিলেন। রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী। সংক্ষিপ্ত রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবি বার বার পিতার অতুল কীর্তির প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভণিতাংশে বহুবার পিতার দুর্লভ ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেছেন,

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥"
"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পাণ্ডবের স্বর্গ আরোহণ॥"

ধ

ধনঞ্জয় দাস—ইনি চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার ছাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—'বৈষ্ণবদিগ্-দর্শনী' গ্রন্থ মতে ধনঞ্জয়ের জন্মস্থান চট্টগ্রামের জাড়গ্রাম। এঁর পিতার নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী, স্ত্রী হরিপ্রিয়া। ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইনি ভাল মৃদঙ্গ-বাদক ছিলেন। যৌবনে সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রভুর চরণে

আশ্রয় করেন। নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় রঘুনাথ দাসের চিড়াদধি-ভোজদান কালে ধনঞ্জয় উপস্থিত ছিলেন। বর্ধমানের শীতল-গ্রামে ও ছাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে থেকে হরিনাম প্রচার করতেন। পরে বৃন্দাবন যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন করে বীরভূমের জলন্দী গ্রামে বিগ্রহ সেবা করেন। শেষ সময়ে শীতল গ্রামে গৌরাঙ্গ সেবা করেন। এই স্থানেই এঁর লীলাবসান হয়। ধনঞ্জয় পণ্ডিত দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

ধনঞ্জয় বিদ্যানিধি—মতান্তরে 'বিদ্যানিবাস' ও 'বিদ্যাবাচস্পতি।' ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের বিদ্যা-শিক্ষক।

ধনপাল—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উপাধ্যায়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়ান চাং-এর গুরু। এঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন চন্দ্রকীর্তি। ধনপালের রচিত গ্রন্থের নাম 'বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা সিদ্ধি শাস্ত্র'।

ধনরাম সিংহ—যশোহরের রাজা সীতারাম রায়ের অন্যতম সেনাপতি। সীতারামের পিতা ভীমরামের এক চণ্ডালিনী উপপত্নী ছিল। তার গর্ভে মেনারাম ও ধনরাম নামে দুই পুত্র জন্মে। এঁরা অতিশয় সাহসী বীর ছিলেন। সীতারাম এঁদিগকে মেনাহাতী ও ছাঁমলা বাঘ বলে ডাকতেন। ধনরাম সীতারামের সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

ধন্যমাণিক্য—ত্রিপুর রাজবংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী নরপতি। ধর্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপ মাণিক্য অত্যাচারী হয়ে উঠায় সেনাপতিরা তাঁকে হত্যা করে ধন্যমাণিক্যকে রাজা করেন। প্রধান সেনাপতির কন্যা ইতিহাস-বিশ্রুত কমলা দেবীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে গণ্য। পুরোহিত ছিলেন এঁর প্রধান মন্ত্রী। রাজা হয়েই ইনি প্রতাপশালী সেনাপতিদের হত্যা করেন। ধন্যমাণিক্যের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। ঐ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ইনি মেহেরকুল, পাটীকারা, গঙ্গামণ্ডল বাগসারি প্রভৃতি স্থান অধিকার করে রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেন। ধন্যমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন চযচাগ। ধন্যমাণিক্য মহাশক্তিশালী হয়ে বহু পার্বত্য রাজ্য এবং চট্টগ্রাম ও আরাকান অধিকার করেছিলেন। এঁর প্রধানকীর্তি গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সৈন্যকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করা ইনি যেমন বীর তেমনি রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। ইনি সর্বত্র জয়যুক্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। ইনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সাধারণের জন্য ইনি উৎকলখণ্ড পাঁচালি রচনা

করিয়েছিলেন। রাজ্য মধ্যে ইনি নৃত্যগীতের প্রবর্তন করেন। রাম নামক এক কবির দ্বারা রাজা "প্রেত-চতুর্দশী" নামক এক পুস্তক রচনা করিয়েছিলেন। এই কাব্যটি এঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ইনি "সুভাষা" বা বাংলা ভাষা প্রচারে উৎসাহ দিতেন। ধন্যমাণিক্য বহু দীঘি, মঠ ও দেবমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ইনি রাজ্য শাসন করেন। এই সময় এত বড় রাজা এদেশে ছিলেন না। ধন্য মাণিক্যকে এই যুগের "সমুদ্রগুপ্ত" বলা যায়।

ধরণী—একজন কবি ও পদ-কর্তা। এঁর চারটি পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। এই পদ চারটির প্রত্যেকটি বিশেষত্বপূর্ণ। যোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে ধরণীর আবির্ভাব হয়েছিল। এঁর রচিত "নবঘন পুঞ্জ-পুঞ্জ জিতি সুন্দর" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের রূপের পদটি রচনা-পারিপাট্যে সুন্দর।

ধরণীশূর—আদিশূরের প্রপৌত্র, অবনীশূরের পুত্র। এঁর রাজত্বকাল ৮৭০-৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি পালরাজাদের কাছ থেকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে-ছিলেন। এবং গঙ্গাতীরবর্তী সিংহেশ্বরে পুনরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ধরাশূর—আদিশূরের প্রপৌত্র ধরণীশূরের পুত্র। এঁর রাজত্বকাল ৯০৫-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর রাজ্যের সকল সীমান্ত সুরক্ষিত ছিল। তাই ইনি আদিশূর প্রবর্তিত সমাজ-সংস্কারের ধারা চালিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগী হন। শুচিতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিচারে রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণকে কুলাচল ও সচ্ছোত্রীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন নূতন কায়স্থ পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে রাঢ়ে বসতি স্থাপন করেন।

ধর্ম—অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার পালরাজা ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৮৫-৮৩৪ খ্রীঃ) উত্তর রাঢ় দেশে পরিতোষ নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরই পুত্রের নাম ধর্ম এই ধর্ম বৈদিক ক্রিয়ায় পরম জ্ঞানী ছিলেন।

ধর্মগুপ্ত—চতুর্দশ শতাব্দীর কবি। ইনি নেপাল রাজসভায় অবস্থান করতেন। ধর্মগুপ্ত 'বালবাগীশ্বর' নামে খ্যাত ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থের বাম 'রামাঙ্ক-নাটিকা'। এঁর পিতা রাজগুরু রামদাস ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। রামাঙ্ক-নাটিকা সংস্কৃতে-প্রাকৃতে লেখা। নাটিকাটি রচনার সময় নেপালের রাজা ছিলেন জয়ার্জুন মল্ল।

ধর্মদাস—'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। ভণিতা থেকে জানা যায় যে ধর্মদাস ছিলেন বেণে এবং তাঁর নিবাস ছিল বসর গ্রামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১৭০৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইনি এঁর কাব্য রচনা

করেছিলেন। ধর্মদাস তাঁর কাব্যকে ব্রতকথা বলেছেন,

"এতদূর নিরঞ্জন ব্রতকথা সায়
প্রভুর চরণে ধর্মদাস গীত গায়।"

রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় দেখা যায়,

"রচিল ধর্মের দাস বসরে যার স্থিতি
দ্বিজরূপে কৃপা যারে কৈল যুগপতি।"

ধর্মদাস—'বিদগ্ধমুখমণ্ডল' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটির রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়। সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে এর উল্লেখ আছে। এতে কয়েকটি প্রহেলিকা বা সমস্যা শ্লোক আছে যাতে প্রশ্ন ও উত্তর অথবা শুধু উত্তর অবহট্‌ঠে দেওয়া।

ধর্মদাস "মালী"—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি, সিলেট নিবাসী। এঁর রচিত নিবন্ধের নাম 'হুসেন পর্ব।'

ধর্মধর—(স্বধর্মপা বা ছেংকাবাগ) ত্রিপুরার এক রাজা। এর রাজধানী ছিল কৈলাসগড় (বর্তমান কৈলাস শহর)। ইনি একবার এক বিরাট যজ্ঞ করে বিশাল জনপদ দান করে-ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

ধর্মপাদ—একজন বাঙালী সিদ্ধাচার্য। এঁর অন্য নাম গুণ্ডরী-পাদ। এঁর রচিত অনেকগুলি গান আছে। ইনি সহজমতের প্রচারক ছিলেন। এঁর রচিত সঙ্গীতগুলি প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত।

ধর্মপাল—বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত রাজা গোপালের (খ্রীঃ ৭৫০-৭৮৫) পুত্র। আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপাল বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বীর, সাহসী ও রাজনীতিকুশল ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি সাম্রাজ্য-বিস্তার অভিলাষে পশ্চিমে বিজয়াভিযান করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। ফলে তিনি সার্বভৌম সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হন এবং গৌরবসূচক 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। তৎকালে আর্যাবর্তের রাজধানী বলে বিবেচিত কান্যকুব্জ অধিকার করে ধর্মপাল ক্রমে সিন্ধুনদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদভূমি পর্যন্ত জয় করেছিলেন। দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করেও তিনি সম্ভবত কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি নেপালের সিংহাসনও অধিকার করেছিলেন বলে স্বয়ম্ভুপুরাণে বলা হয়েছে। কান্যকুব্জে তাঁর এক বিরাট রাজ্যাভিষেক হয়। এই অভিষেক উৎসবোপলক্ষে আর্যা-বর্তের বহু সামন্ত নরপতি যেমন,—ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণ রাজদর-বারে উপস্থিত হয়ে ধর্মপালের অধিরাজত্ব স্বীকার করেছিলেন।

মৌখরাজগণের প্রাচীন রাজধানী

পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনা) ধর্মপাল সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কথিত আছে ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। পিতা গোপালের ন্যায় ধর্মপালও বৌদ্ধ ছিলেন। তিব্বত দেশীয় গ্রন্থে ধর্মপালের অনেক কীর্তিকলাপের উল্লেখ আছে। মগধে তিনি একটি বিহার বা বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। তাঁব বিক্রমশীল এই দ্বিতীয় নাম বা উপাধি অনুসারে ইহা 'বিক্রমশীলবিহাব' নামে অভিহিত হয। বরেন্দ্রভূমিতে সোমপুর নামক স্থানে ধর্মপাল আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠা কবেন। বাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে এব বিবাট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এত বড বৌদ্ধবিহাব ভারতবর্ষের আব কোথাও ছিল বলে জানা যায় নি। বিহাবের ওদন্তপুবেও ধর্মপাল সম্ভবত একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তিব্বতীয লেখক তারানাথেব মতে ধর্মপাল ধর্মশিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নিজে বৌদ্ধ হলেও ধর্মপাল হিন্দুধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন না। নারায়ণের এক মন্দিরের জন্য তিনি নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুশাসন মেনে চলতেন এবং প্রতি বর্ণের লোক যাতে স্বধর্ম প্রতিপালন করে তার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তারানাথের মতে ধর্মপালের রাজত্বকাল ৬৪ বৎসর। কিন্তু ঐতিহাসিকদেব মতে তিনি আনুমানিক ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। ধর্মপালেব মৃত্যুব পর রন্নাদেবীব গর্ভজাত পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আবোহণ কবেন।

ধর্মপাল—সম্ভবতঃ মেদিনীপুবের দণ্ডভুক্তির (বর্তমান দাঁতন) বাজা ছিলেন একাদশ শতাব্দীতে। 'ইনি গৌড়েশ্বর' আখ্যা লাভ করেছিলেন। কেউ কেউ এঁকে পাল বাজবংশসম্ভূত বলে মনে কবেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায় কর্ণসেন ধর্মপালেব মহাসামন্ত ছিলেন। ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষ তার বাজ্য আক্রমণ করলে ধর্মপাল তাঁকে স্বীয় বাজ্যেব অন্তর্গত ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত কবেন। ধর্মপাল তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে কর্ণসেনের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

ধর্মমাণিক্য—মহামাণিক্যের পুত্র ও ত্রিপুরার রাজা। এঁব বাজত্বকাল ১৪৩১-৬২ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম জীবনে ইনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। কাশীতে কৌতুক নামক এক বাজা ভবিষ্যৎবাণী করেন যে ইনি বাজা হবেন। তখন ইনি দেশে ফিরে আসেন এবং ত্রিপুরার রাজা হন। মহারাজ ধর্মমাণিক্যই ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' ত্রিপুর ভাষা থেকে বাংলা

পয়ারে অনূদিত করিয়েছিলেন। ইনি রাজ্যে বহু দীঘি খনন করান। এঁর প্রধান কীর্তি কুমিল্লার বৃহৎ "ধর্মসাগর" দীঘি খনন। ইনি বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেছিলেন।

ধর্মমাণিক্য (দ্বিতীয়)—ত্রিপুররাজ ধর্মমাণিক্য ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়েছিলেন।

ধর্মশ্রী মিত্র—একজন মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত। ইনি অনেকগুলি পুস্তক লিখেছিলেন। তন্মধ্যে বজ্র ভৈরব সাধন, কালযমারিসাধন, আযাচলসাধন ও জ্ঞান-সত্ত্বসাধন-পূজাবিধি পুস্তকসমূহ অন্যতম।

ধর্মাকর শান্তি—একজন বৌদ্ধ আচার্য। একাদশ শতকে ইনি বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

ধর্মাদিত্য—ইনি ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করে 'মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক' উপাধি ধারণ করেন। ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া ও ঘাঘরা-হাটীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ধর্মাদিত্য নাগদেব নব্যাব-শিকায়কে মহাপ্রতিহার ও গোপাল স্বামীকে বিষয়পতি নিযুক্ত করে-ছিলেন। অনেকের মতে ধর্মাদিত্য ছিলেন পুণ্ড্র রাজকুমার এবং পরে মালবের রাজা যশোধর্মণের পুত্র।

ধীমান—পালরাজত্বকালের খ্যাতনামা শিল্পী। অবস্থিতিকাল নবম শতাব্দী। ইনি ছিলেন বরেন্দ্রবাসী। গুপ্তযুগের শিল্প পদ্ধতির অনুকরণে ইনি ও এঁর পুত্র বীটপাল বা বীতপাল এক নূতন শিল্পধারার প্রবর্তন করেন। পিতাপুত্র সম্বন্ধে লামা তারানাথ লিখেছেন—প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি গঠনে এঁদের সমকক্ষ ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। এঁরা এমন সব শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করেছিলেন যা কেবল নাগগণের দ্বারা সম্ভব। চিত্র-শিল্পেও উভয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ধীমানের শিষ্যরা প্রাচ্য-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হত। ধীমান গোষ্ঠীর নির্মিত হেবজ্র, হেরুক' জম্ভল প্রভৃতি বৌদ্ধদেবতার এবং প্রজ্ঞাপারমিতা, পর্ণশবরী, আর্যতারা, বজ্রতারা, হারীতি প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবীমূর্তিগুলি আজও তাঁদের স্মৃতি বহন করছে।

ধীমানের শিল্পপ্রতিভা চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বত প্রভৃতি রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে হিমালয়ের উপত্যকায় ও তদুত্তরে এক বিশাল রাজ্যে শিল্পশাস্ত্রের এক নবযুগ আনয়ন করেছিল। ভাস্কর ধীমানই পালরাজ ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের গঠন পরিকল্পনা করেছিলেন।

ধীর হাম্বীর—বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের পুত্র। অপর নাম ধাড়ী হাম্বীর। ধাড়ী হাম্বীর দ্র°।

ধুয়ী বা ধোই—ধোয়ী কবিরাজ দ্র°।

ধেন্নুকর্ণ—মহাভারতীয় যুগে উপবঙ্গের রাজা। এঁর পুত্র কণ্ঠহার প্রবল পরাক্রান্ত বীর ছিলেন। তিনি পুষ্পমিত্রের সেনাপতিরূপে দিগ্বিজয় করে বঙ্গভূষণ উপাধি লাভ করেন। তাঁর এই উপাধি প্রাপ্তি চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য ধেন্নুকর্ণ তাঁর রাজধানীর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গভূষণা রাখেন। এই বঙ্গভূষণা থেকে ভূষণা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

ধোদপ—একজন সিদ্ধাচার্য।

ধোবী—একজন সিদ্ধাচার্য।

ধোয়ী কবিরাজ (বা ধোই, ধোয়ীক, ধুয়ী)—ধোয়ী কবিরাজ লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চ সভাকবির অন্যতম। এঁর রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য পবনদূত। কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে যত দূতকাব্য পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে, তারমধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে ধোয়ী সুকৌশলে তাঁর পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেনের স্তুতিবাদ করেছেন। লক্ষ্মণসেন নাকি দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন; সেখানে কুবলয়বতী নাম্নী এক গন্ধর্ব কন্যা তাঁর প্রতি প্রেমাসক্তা হন। দক্ষিণা মলয় বায়ুকে দূত করে বিরহিণী কুবলয়বতী লক্ষ্মণসেনের নিকট প্রেমবার্তা প্রেরণ করেন, ইহাই পবনদূতের বিষয়বস্তু। পবনদূত ছাড়াও ধোয়ী আরও একাধিক কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু সে সব কাব্য পাওয়া যায় না। সদুক্তিকর্ণামৃতে বিশটি ও সুক্তিমুক্তাবলীতে তাঁর ৩টি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে। খুব সম্ভব এগুলি তাঁর অন্যান্য কাব্যের প্রকীর্ণ শ্লোক। এর সম্বন্ধে জয়দেব বলেছেন, "বিশ্রুত শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষমাপতিঃ।"

ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী—শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীপাদের শিষ্য ও শ্রীগম্ভীরার সেবক ছিলেন। তদীয় গুরুর পদ্ধতি অবলম্বনে ইনিও একখানি 'শ্রীগৌরগোবিন্দার্চনপদ্ধতি' প্রণয়ন করেছেন।

ধ্রুবানন্দ—ধ্রুবানন্দ ছিল নয়নানন্দ মিশ্রের আদি নাম। নয়নানন্দ মিশ্র দ্র°।

ন

নওয়াজিস খান—(পূর্ববঙ্গের) সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমান কবি। এঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'গুলেবকাওলী'।

নজমউদ্দৌলা—মীর্জাফরের পুত্র। মীর্জাফরের অন্যতমা ভার্য্যা মণি বেগমের ইনি গর্ভজাত সন্তান। মীর্জাফরের জীবিত পুত্রদের মধ্যে নজমউদ্দৌলা জ্যেষ্ঠ বলে মুসলমান আইনানুসারে ইনি মীর্জাফরের মৃত্যুর পর বাংলার নিজামতী পদ প্রাপ্ত হন। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট

থেকে ৫৩৮৬১৩৭॥৶ বার্ষিক বৃত্তি লাভ করে নিজামত পদে উপবিষ্ট ছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ, রায় দুর্লভ ও জগৎশেঠ প্রভৃতিদের উপরই নবাবের কার্যভার অর্পিত হয়েছিল। নবাব নজমউদ্দৌলার কাবকালে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব দিল্লীশ্বর সাহ আলমের নিকট থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেছিলেন। দেওয়ানী গ্রহণের পর ক্লাইব সেনারক্ষার ক্ষমতাও কোম্পানীর হস্তে নিয়ে নেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মে নজমউদ্দৌলার মৃত্যু হয়।

নজিব আলী খাঁ, নবাব বাহাদুর—১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন।

নজির—বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলীম কবি। ইনি কাছাড়-অধিবাসী ছিলেন। এঁর রচিত দুটি গান মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-সঙ্কলিত 'বাগ-মারিফত' প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়েছে।

নটবর দাস—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের উল্লেখযোগ্য পদকর্তা। পদকল্পতরুতে নটবর ভণিতার দু'টি পদ সংকলিত আছে। এঁর পদ-সঙ্কলন গ্রন্থ 'রসকলিকা'। এতে বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বাসুদেব ঘোষ এবং শিবানন্দ প্রভৃতির দু'একটি করে পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

নন্দ পণ্ডিত—একজন জ্যোতিষ গ্রন্থকার। 'জ্যোতিষসারসমুচ্চয়' নামে ইনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

নন্দ মিশ্র—বলদেব বিদ্যাভূষণের শিষ্য। সিদ্ধান্তদর্পণের টীকাকার।

নন্দন—নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। পদকর্তা। এঁর বাড়ীতে নিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করেছিলেন।

নন্দন আচার্য—নবদ্বীপবাসী। ইনি শুরু থেকেই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এবং মাঝে মাঝে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে এসে প্রথমে নন্দন আচার্যের গৃহে উঠেছিলেন। এবং গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণসহ নন্দনের গৃহে গিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতকে দিয়ে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতপ্রভুকে শান্তিপুর থেকে ডাকিয়ে আনলে অদ্বৈতপ্রভুও এই নন্দন আচার্যের গৃহে কিছুক্ষণ লুকিয়েছিলেন। একবার গৌরাঙ্গদেবও অদ্বৈত আচার্যের উপর রাগ করে তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য স্বয়ং নন্দনের গৃহে আত্মগোপন করেছিলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নন্দনের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করতেন। কাজে-কাজেই এই প্রভুত্রয়ের সঙ্গে নন্দনের বিশেষ নৈকট্য ও আত্মীয়তা ঘটে। নন্দন আচার্যের অপর দুই ভ্রাতার নাম—বিষ্ণুদাস ও ও গঙ্গাদাস।

নন্দন দাস—একজন পদকর্তা।

নন্দনদাস ভণিতায় দুটি পদ 'পদকল্পতরু'-তে উদধৃত হয়েছে। এঁর "নিরমিল কো বিধি" ইত্যাদি রূপোল্লাস-বিষয়ক পদটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, কিন্তু বিচিত্র ব্রজবুলীর পদটি পদকর্তার উৎকৃষ্ট বর্ণনশক্তির পরিচায়ক। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী।

নন্দন মাইতি—উড়িয়া মহাপ্রভু-ভক্ত। ইান পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা কার্য করতেন।

নন্দকিশোর দাস—সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। এঁব রচিত গ্রন্থের নাম 'রসকলিকা' ধা 'রসপুষ্প কলিকা'। রসকলিকা ষোড়শ "দল" বা অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। এর একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে বসশাস্ত্রের বিচারে শ্রীচৈতন্যের জীবনী হতে দৃষ্টান্ত। বহু সংস্কৃত শ্লোক উদধৃত হয়েছে, তার মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থকারের স্বরচিত।

অভিবাম ঠাকুরের শাখা নির্ণয়ে চুনাখালীবাসী এক নন্দকিশোব দাসের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ এঁকেই বসকলিকার রচয়িতা বলে মনে করেন।

নন্দকুমার কবিরত্ন—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। এঁর 'কালীকৈবল্যদায়িনী' একটি বৃহৎ ও অভিনব দেবীমাহাত্ম্য কাব্য। এই কাব্যের বিষয় হচ্ছে রাবণের বাসন্তী পূজা, দুর্গসপ্তশতী কাহিনী, রামের শারদীয়া .পূজা ইত্যাদি। রচনা সমাপ্তিকাল ১২৬৮ বঙ্গাব্দ। নন্দকুমারের অপর রচনা হচ্ছে 'শুকবিলাস'। ইহা শুকসপ্ততি অথবা তুতিনামা অবলম্বনে লেখা। রচনা-সমাপ্তি কাল ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। কলকাতার জোড়াসাঁকো নিবাসী চুনিলাল দাসের অনুবোধে শুকবিলাস বচিত হয়েছিল। নন্দকুমারের নিবাস ছিলধুলুক পরগণার "শূদ্রমণি" হরিশ্চন্দ্র রায়ের জমিদারীতে। নন্দকুমার বসু পৌরাণিক গ্রন্থের গদ্যানুবাদ করেন। হিন্দুধর্মের ও আচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনমূলক 'সন্দেহ নিরসন' (১৮৬৫) এবং শিক্ষাবিষয়ক 'জ্ঞানসৌদামিনী' (১৮৬৪) নামক গ্রন্থদ্বয়ও নন্দকুমাবেব বচনা। নন্দকুমার তখনকাব গোঁড়া হিন্দুসমাজের একজন প্রধান লেখক ছিলেন।

নন্দকুমার বসু—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। চব্বিশ পরগণা জেলাব বহড়ু গ্রামের জমিদাব বংশেব প্রতিষ্ঠাতা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক সামান্য গোমস্তারূপে ইনি কর্মজীবন আরম্ভ কবে বিভিন্ন কুঠীর ভাবপ্রাপ্ত কর্মচাবী হন। পাটনার কুঠীব দেওয়ানী কালে এঁর ব্যবস্থাপনায় ঐ কুঠীর আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়। এই কর্মদক্ষতার জন্য ইনি বহু অর্থ পুরস্কার লাভ করেন। পরে ইনি কলকাতার শুল্ক বিভাগেও দেওয়ান হন। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে শেষ জীবনে ইনি বৃন্দাবনবাসী হন। ইনি বিশেষ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৩৫ সালে বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করেন।

নন্দকুমার, মহারাজ— আনুমানিক ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের গোত্র রাঢী শ্রেণীর কাশ্যপ। এঁর পিতার নাম পদ্মনাভ। নন্দকুমারের পিতার আদি, নিবাস ছিল জরুল গ্রামে। পিতামহের বিবাহের পর তাঁরা ভদ্রপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। বাল্যকাল থেকেই নন্দকুমার বুদ্ধিমান, সাহসী ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। ইনি বাংলা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। এর পত্নীর নাম ক্ষেমঙ্করী। নন্দকুমার পিতার নিকট বিষয়কার্য শিক্ষা করে-ছিলেন। ইনি পিতার অধীনে থেকে ফতে সিং, ঘোড়াঘাট ও সাতপাইকা পরগণার নাযেব নিযুক্ত হন। বাংলার নবাব সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে আলীবর্দী যখন বাংলার নবাব হন, তখন নন্দকুমারের বয়স ৩৫ বছর। নবাব আলীবর্দী নন্দকুমারকে মেদিনীপুর জেলার হিজলী ও মহিষাদল অঞ্চল সমূহের রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। কিন্তু বারবার বর্গীর আক্রমণে রাজস্ব আদায় দুরূহ হয়ে পড়ে। চিন্ময় রায় নামক জনৈক বাঙালী নন্দকুমারকে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য কর্মচ্যুত করে কারাগারে পাঠালেন। নন্দকুমারের পিতা এই টাকা দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন। নন্দকুমার অনন্যোপায় হয়ে হোসেন কুলী খাঁর নিকট কর্মপ্রার্থী হলেন। কিন্তু তাতেও চিন্ময় রায় বাধা দিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দী নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ান পদ প্রদান করেন। কিন্তু হুগলীর তৎকালীন ফৌজদার হেদায়েৎ আলীর সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব না হওয়ায় নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। কিছুকাল পরে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগের সময় নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় নন্দকুমার "দেওয়ান নন্দকুমার" নামে অভিহিত হন। কয়েক বছর পরে ইয়ারবেগ হুগলীর ফৌজদারী পদ ত্যাগ করে নন্দকুমারকে সঙ্গে নিয়ে হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদে গেলেন। নন্দকুমারের দেওয়ানী পদও গেল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল আলীবর্দীর মৃত্যু হলে সিরাজউদ্দৌলা হলেন বাংলার নবাব। এই সময় সিরাজ নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তখন ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের শত্রুতা, রাজদরবারেও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছিল। নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হয়েই হুগলীর প্রবেশ পথ রক্ষার ব্যবস্থা করেন। বজবজ দুর্গ সংস্কার করলেন, ইংরেজদের আগমন রোধ করার জন্য কলকাতার দক্ষিণ আলিগড়ে এক নূতন কেল্লা স্থাপন করলেন। এক কথায় কলকাতা প্রবেশের মুখে ইংরেজের গতিরোধ করবার জন্য নন্দকুমার সম্ভাব্য সমস্ত

পন্থা অবলম্বন করলেন। কিন্তু মানিক চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায় সবই ব্যর্থ হল। ক্লাইব কলিকাতা দখল করলেন। তখন সিরাজ নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য দিয়ে হুগলী রক্ষার জন্য পাঠালেন। হুগলীতে নন্দকুমারের দু'হাজার সৈন্য ছিল। সেই দিয়ে তিনি হুগলী সুরক্ষিত করতে লাগলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি ইংরেজরা হুগলী আক্রমণ করল। কাপ্তেন দুর্গ জয় করে ব্যাণ্ডেল লুঠ করতে গেলেন। নন্দকুমার এই স্থানে ইংরেজদের ঘিরে ফেলেন। তখন কুট কলকাতায় পালিয়ে যান। পরে সিরাজের সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয়। সিরাজ অমূলক সন্দেহবশে নন্দকুমারকে হুগলীর ফৌজদারের পদ থেকে পদচ্যুত করলেন। অথচ আর্মি সাহেব বলেছিলেন, "নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে ইংরাজ মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যাইতে পারিতেন না।" যাই হোক পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে নন্দকুমারের কোন সংস্রব ছিল না। নন্দকুমার পদচ্যুত হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু জগৎশেঠ ভবনে ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নবাব হলেন মীরজাফর। ক্লাইবের অনুমোদনে নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ান হলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তহশীলদার নিযুক্ত হন। এই সময় হেষ্টিংস ছিলেন বর্ধমানের রেসিডেণ্ট। তাঁর সঙ্গে নন্দকুমারের মনোমালিন্য ঘটে। এদিকে ইংরেজরা মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরকাশিমকে নবাব করল। তখন মীরজাফর নন্দকুমারের আশ্রয় নিলেন। কিছুদিন পরে মীরকাশিম পদচ্যুত হলে মীরজাফর পুনরায় নবাব হলেন। তখন নন্দকুমার বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান হন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি মীরজাফর দেহত্যাগ করলে নন্দকুমার বাদশাহের কাছ থেকে সনন্দ আনিয়ে নাজিমউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসান। দুর্নীতিপরায়ণ হেষ্টিংস্ মহারাজ নন্দকুমারকে এক মিথ্যা মকদ্দমায় জড়িত করায় বিনাপরাধে তাঁর ফাঁসি হয় (১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ আগষ্ট)! বর্তমানে যেখানে বিডন উদ্যান ঐ স্থানেই নন্দকুমারের প্রাসাদ ছিল। তিনি আজীবন পরোপকারী, উদারমতাবলম্বী, দেশসেবক ও দরিদ্র প্রতিপালক ছিলেন। দেশের ও দশের উপকারের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তাঁর ন্যায় অক্লান্তকর্মী খুব কম দেখা যায়। তিনি একবার এমন এক কাজ করেছিলেন যা আজ অবধি কেউ করতে পারেন নি তা হল লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ। তাঁর রাজোচিত প্রাসাদে লক্ষ ব্রাহ্মণকে

আহ্বান করে তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর নানা গুণের জন্য বাঙালীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে আছেন।

নন্দরাম—অদ্বৈতাচার্যের পত্নী সীতাদেবীর সেবিকা ও শিষ্যা জঙ্গলী-প্রিয়ার শিষ্য। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-চরিত্র' রচয়িতা।

নন্দরাম তর্কবাগীশ—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আত্মপ্রকাশিকা', 'সংখ্যা প্রকাশিকা' প্রভৃতি। সম্ভবতঃ ইনি 'স্বরূপাখ্য স্তবটীকা' প্রণয়ন করেছিলেন। 'ষট্‌চক্রনিরূপণে' ইনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে হরিবল্লভ রায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। নন্দরামের জীবিতকাল ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

নন্দরাম দাস—মহাভারত-অনুবাদক কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। এঁর পিতার নাম নারায়ণ। ইনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। নন্দরামের ভণিতাযুক্ত উদ্যোগ, দ্রোণ ও কর্ণপর্বের পুথি পাওয়া গেছে। এই পর্বগুলি কাশীরামের মৃত্যুর পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে রচিত হয়েছিল। অনেকের মতে কাশীরাম দাস সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করে যান। তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামকে আশীর্বাদ করে মহাভারতের অসম্পূর্ণ পর্বগুলি সম্পূর্ণ করার কথা বলে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন পুথিতে এর প্রমাণও পাওয়া যায়। নন্দরাম স্পষ্ট লিখেছেন,

"জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক-কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন
করি কোলে॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত-অমৃত তুমি করহ রচন॥"

এইসব থেকে মনে হয় অসম্পূর্ণ পর্বগুলি রচনা করে নন্দরাম কাশীরামের মহাভারত সম্পূর্ণ করেছিলেন।

নন্দরাম মিশ্র—একজন জ্যোতিষ পণ্ডিত। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'সঙ্কেত চন্দ্রিকা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

নন্দরাম সেন—কলকাতার একজন প্রাচীন অধিবাসী। ইনি কোম্পানীর প্রথম আমলে একজন ব্ল্যাক-ডেপুটি ছিলেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাল্‌ফ শেল্‌ডন্ কলকাতার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হলে নন্দরাম তাঁর সহকারি হন। পরবর্তী কালেক্টার বেঞ্জামিনবৌচার তহবিল তছরূপ অভিযোগে নন্দরাম পদচ্যুত হন। ১৭০৭ সালে নন্দরাম পুনরায় পূর্বপদে নিয়োজিত হন। তহবিল তছরূপ অপরাধে, কোম্পানী যে সময় এঁকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করেন, সেই সময় ইনি হুগলীর মুসলমান ফৌজদারের নিকট পলায়ন করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ হুগলীর ফৌজদারকে লিখে পুনরায় এঁকে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় কলকাতায় আনেন এবং কারারুদ্ধ করেন।

পরিশেষে নন্দরাম কোম্পানীর

দাবির টাকা দিয়ে কারামুক্ত হন। উত্তর কলকাতার শোভা বাজারের পশ্চিমে ভাগীরথী তীরের "রথতলা-ঘাট" এঁরই নির্মিত।'

নন্দলাল—লালচাঁদ নন্দলাল দ্র°।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন তান্ত্রিক সাধক। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি একটি 'পঞ্চমুণ্ডি' আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নন্দাই—রামাই, নন্দাই দ্র°।

নবকান্ত—একজন পদকর্তা। এঁর একটিমাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি ব্রজবুলীতে রচিত ও হরিলীলা-বিষয়ক। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী।

নবকিশোরী, রানী—সাতোড়ের রাজা অবনীনাথের কন্যা ও ভাতুড়িয়ার রাজা গণেশের পুত্রবধূ। গণেশের পুত্র যদুনারায়ণের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। যদু আজম শাহের কন্যা আশমান তারাকে বিবাহ করে মুসলমান হন। এবং জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। সেই থেকে যদুর মাতা রানী ত্রিপুরা নবকিশোরীর গর্ভজাত যদুর পুত্র অনুপনারায়ণকে নিয়ে সাতগড়ায় গিয়ে বাস করতে থাকেন। সেখানে অনুপনারায়ণ যদুর কুশপুত্তলিকা দাহ করে প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং রানী নবকিশোরী সেই হতে বৈধব্যবেশ ধারণ করেন। সধবার চিহ্ন জ্ঞাপক অলঙ্কার সমূহ যদুর রানীর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে কঠোর ব্রত উপবাসাদিতে রত হন।

নবকৃষ্ণ দেব, রাজা—কলকাতা শোভা বাজারের রাজা। ইনি ছিলেন দেওয়ান রামচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে (১১৩৯ বঙ্গাব্দ) নবকৃষ্ণ গোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পারস্য ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তাছাড়া, বাংলা, উর্দু, আরবি এবং ইংরেজী ভাষাতেও এঁর দখল ছিল। ষোল বছর বয়সে এঁর বুদ্ধির বিশেষ প্রাখর্য দেখা যায়। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে নবকৃষ্ণ ওয়ারেন হেষ্টিংসের পারস্য ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে মুন্সীগিরি পদে নিযুক্ত হন। তখন লোকে এঁকে "নবমুন্সী" বলে ডাকত। পলাশির যুদ্ধে নবকৃষ্ণ সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেন এবং ক্লাইবকে নানা গোপন তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সিরাজের পরাজয়ের পর মুর্শিদাবাদের ধনাগার লুণ্ঠনের যে অংশ ইনি লাভ করেছিলেন তার পরিমাণ ছিল প্রায় এক কোটি টাকা। একদিনেই ইনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। ইংরেজ অধিকারকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য নবকৃষ্ণ নানা-ভাবে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। এঁর বুদ্ধি ও সাহায্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট

হয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এঁকে প্রথমে "রাজা বাহাদুর" এবং পরে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। এবং এঁকে কোম্পানীর বঙ্গদেশ, বিহার ও উৎকলের দেওয়ানির রাজনৈতিক মুৎসুদ্দির পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস নবকৃষ্ণকে সুতানুটির তালুকদারী প্রদান করেন।

নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এঁর উৎসাহে অনেক অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কবি বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি কবিওয়ালাদেরও ইনি উৎসাহ দান করতেন। প্রাচীন সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় গ্রন্থসমূহ নকল করিয়ে নিজের গ্রন্থাগারে রেখেছিলেন। নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বদান্য ও দানশীল ছিলেন। এঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ইনি নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। যে কোন সৎকর্মে ইনি লক্ষ টাকার কর্ম খরচ করতেন না। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুরের মৃত্যু হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ছিলেন এঁর পালিত পুত্র গোপীমোহনের পুত্র।

নবচন্দ্র—একজন পদকর্তা। এঁর রচিত তিনটি পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। পদগুলি বাংলায় রচিত ও গোষ্ঠলীলোচিত সখ্য-রস-বিষয়ক। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস—একজন পদকর্তা। এঁর রচিত একটিমাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি নাম-সংকীর্তন বিষয়ক এবং বিশেষত্ব-শূন্য। সম্ভবতঃ ইনি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নবীনচন্দ্র ভাস্কর—মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত বাঙালী প্রস্তর-শিল্পী। রাঢ় অঞ্চলে এঁর নির্মিত অনেক পাথরের দেবমূর্তি পাওয়া গেছে।

নয়ন ভাস্কর—হালিশহর-নিবাসী বিখ্যাত ভাস্কর। খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি গিয়েছিলেন। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনের গোপীনাথ বিগ্রহের জন্য শ্রীরাধিকার মূর্তি নির্মাণ করতে নয়ন ভাস্করকে আদেশ দিয়েছিলেন।

নয়ন মিশ্র—নয়নানন্দ দাস বা নয়নমিশ্র দ্রঃ।

নয়নানন্দ—নয়নানন্দের 'কৃষ্ণ-ভক্তিরসকদম্ব' রূপ-গোস্বামী রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' অবলম্বনে লেখা। রচনাকাল ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ। নয়নানন্দের নিবাস ছিল উত্তর রাঢ়ে মঙ্গলডিহি গ্রামে। এঁর অপর নিবন্ধ হচ্ছে 'ভক্তি-মাধ্বীকণা' ও 'প্রয়োভক্তিরসার্ণব'। এটির রচনাকাল ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

নয়নানন্দ পাত্নুয়া গোপালের শিষ্য বংশের তৃতীয় অধস্তন।

নয়নানন্দ কবিরাজ—শ্রীখণ্ড-বাসী বৈদ্য। প্রসিদ্ধ পদকর্তা। ইনি রঘুনন্দন ঠাকুরেব শিষ্য।

নয়নানন্দ ঠাকুর—বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামনিবাসী। এঁর রচিত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব' ও 'প্রেয়োভক্তি রসার্ণব'।

নয়নানন্দ দাস বা **নয়ন মিশ্র**—গৌরাঙ্গ লীলা-সহচর গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বাণীনাথের পুত্র। ইনি গদাধর কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন। গদাধর তাঁকে স্বীয় বক্ষোদেশে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এবং মহাপ্রভুর হস্তলিখিত শ্লোক সম্বলিত একটি গীতা প্রদান করেন। গদাধরের মহাপ্রয়াণের পব নয়ন মিশ্র পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে রাঢ় দেশের ভরতপুরে বাস স্থাপন করেন। সম্ভবত এই নয়ন মিশ্র খেতরি মহা-মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' থেকে জানা যায় যে নয়নানন্দ বোরাকুলি মহামহোৎসবেও মিলিত হয়েছিলেন। নয়নানন্দ ভণিতায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট বাংলা এবং ব্রজবুলি পদ দেখা যায়। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর লিখিত পদগুলি সবই শ্রীচৈতন্য বিষয়ক। পদগুলিতে ব্যাকুল ভক্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম ঝঙ্কার আছে। যেমন:

"গোরা মোর গুণের সাগর
প্রেম তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর।
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী
হরিনাম সুধা তাহে ক্ষরে
দিবানিশি।"

নয়নানন্দ দেব—রসিকানন্দ প্রভুর পৌত্র ও দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত। আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শকাব্দ। ইনি একজন পদকর্তা। বঙ্গ, উৎকল ও মৈথিলী ভাষায় এ পর্যন্ত পনেরটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-রসার্ণব-প্রণেতা কৃষ্ণদাস নয়নানন্দের অন্তশিষ্য ছিলেন। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে নয়নানন্দের তিরোভাব হয়।

নয়পাল মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় পনের বছর (১০৩৮-১০৫৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষ্মীকর্ণের সহিত তাঁর সুদীর্ঘ কালব্যাপী যুদ্ধ। নয়পালের সময়েই বঙ্গদেশের নানাস্থানে শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল।

নরক—শ্রীরামচন্দ্রের সমকালিক এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন। হরিবংশ, ১২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"বাল্যে রাজর্ষি জনক নরককে প্রতিপালন করেন। ষোল বৎসর বয়সে নরক নিজ বীরত্বে প্রাগ্‌-জ্যোতিষে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নরক প্রথমে বেশ ভাল হইলেও ক্রমশঃ

বড় অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠেন। নরক দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। উপর আসামের বলি নামক জনৈক রাজার পুত্র বাণের সঙ্গে নরকের বড়ই সখ্য ছিল। বাণ অসুর প্রকৃতির, তাই নরকও ক্রমে মন্দ হইলেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারের ত্রুটি ছিল না। একদা বশিষ্টদেব কামাখ্যা দেবী দর্শনে আগমন করেন। নরক তাঁহাকে পুরে প্রবেশ করতে দিলেন না বরং বশিষ্টের উপর নানা অত্যাচার ও উপদ্রব হইল। বশিষ্ট নরককে শাপ দিলেন। নরকের চারি পুত্র ছিল। বশিষ্ট আর্যাবর্তে ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে অবস্থা জ্ঞাপন করেন। অচিরে শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণহস্তে নবক নিহত হন।" নরকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগদত্তকে সিংহাসনে বসিয়ে এবং নরকের বহু ধনরত্ন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে যান।

নরচন্দ্র ভট্টাচার্য—একজন তান্ত্রিক উপাসক ও শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা। বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত জম্বুকদহ বা জামদো নামক গ্রামে আনুমানিক ১৭৮৩ সালে এর জন্ম হয়। ইনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ইনি অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের ভাবপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে ছিলেন।

নরদত্ত—চক্রপাণির গুরু। এঁর রচিত গ্রন্থ 'বৃহৎতন্ত্রপ্রদীপ' বা 'তন্ত্র-প্রদীপ' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ। ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

নরদেব নাথ—নাথপন্থী সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষ।

নরনারায়ণ—কোচবিহারের কামতাপুরের রাজা মহারাজ বিশ্বসিংহের পুত্র। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করলে মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপ ও কামতা রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করেছিলেন। এঁর অভিষেককালে অধীন সামন্ত-রাজগণ যথাযোগ্য উপহার এবং কর প্রেরণ করে এঁর বশ্যতা স্বীকার করে-ছিলেন। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণের সৈন্যদল অহোমরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিলেন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অহোমরাজ আর একবার নরনারায়ণের বিরাট সৈন্য-বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। এবং পরে মহারাজকে প্রচুর উপঢৌকন ও কর প্রদান করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর মহারাজ নরনারায়ণ একে একে কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য জয় করে রাজ্য সীমা বর্ধিত করেছিলেন। কালা-পাহাড় কর্তৃক কামাখ্যা মন্দির ধ্বংসের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য মহারাজ নরনারায়ণ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করে-ছিলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর পরাজয়

ঘটে। মোগলদের সঙ্গেও নরনারায়ণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আকবরের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব স্থাপিত হয়। পশ্চিমে মিথিলা প্রদেশের সীমান্ত থেকে পূর্বে আসামের শেষ প্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে চট্টগ্রামের নিকটস্থ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি হয়েছিলেন মহারাজ নরনারায়ণ। তাঁর প্রচুর সৈন্যবল ও নৌবাহিনী ছিল। তিনি অনেকগুলি বড় বড় রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বহু দীঘি খনন করান। তিনি বিধ্বস্তপ্রায় কামাখ্যা মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভা সর্বদা পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা সুশোভিত থাকত। তাঁর সময় দেশে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। রাজসভায় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হত। ভূষণ দ্বিজ, পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীধর দৈবজ্ঞ, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীশঙ্কর দেব প্রভৃতি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। 'কণ্ঠভূষণ' উপাধিকারী এক পণ্ডিত রাজার গুরু ছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপে শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে 'কামরূপ বিক্রমাদিত্য' বলে অভিহিত করা হত। লোকে তাঁকে 'ধর্মরাজ' বলত। মল্লবিদ্যায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলে তিনি 'মল্লদেব' নামেও অভিহিত হয়েছিলেন। 'আইন-ই-আকবরী' মতে তিনি প্রজ্ঞাবান ও অত্যুৎকৃষ্ট গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নরনারায়ণের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

নরসিংহ বা **পরশুরাম**—উত্তরবঙ্গের মহাস্থান বা পৌণ্ড্রবর্ধনের শেষ নৃপতি। ইনি ছিলেন ভোজ গৌড় বংশীয়। রাজা নরসিংহ হিন্দুদের দ্বারা পরশুরাম নামেও অভিহিত হতেন। ইনি দ্বাদশজন পালবংশীয় সামন্ত নৃপতিব উপর আধিপত্য করতেন। ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরসাহ সুলতান বল্‌খ নিবাসী ইব্রাহিম-ইবনে-আবাম নামক ধর্ম্ম প্রচারকের সঙ্গে দরবেশ বেশে মৎস্যাকার নৌকায় আরোহণ করে কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে মহাস্থানে উপনীত হন। তথায় তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে রাজা পরশুরামের সেনাপতি চিহ্লনকে এবং বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন। ক্রমে রাজা পরশুরামের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ বাধে, এবং হরপাল নামক জনৈক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় মহাস্থান দুর্গ বিধ্বস্ত এবং যুদ্ধে রাজা পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হন। তারপর রাজকন্যা শীলাদেবী স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু পরে তিনি শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করে করতোয়ার জলে আত্মবিসর্জন করেন।

নরসিংহ দাস—কবি নরসিংহ দাস প্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস গোস্বামী রচিত সংস্কৃত "হংসদূত"-এর বাংলা অনুবাদ করেন। নরসিংহের রচনা কাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

নরসিংহ দেব (প্রথম)—চোড়গঙ্গবংশীয় রাজা (১২৩৮-৬৪ খ্রীঃ) কোণার্ক সূর্যমন্দির নির্মাতা।

নরসিংহ নাড়িয়াল—শ্রীহট্ট-বাসী শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতামহ। ইনি শ্রীহট্ট থেকে এসে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে থেকে সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন এবং উত্তরকালে রাজা গণেশের অমাত্য হন। এঁরই মন্ত্রণায় রাজা গণেশ (১৪০৭ খ্রীঃ) শামসুউদ্দীনকে নিহত করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নরসিংহ বসু—১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবির পিতার নাম ঘনশ্যাম, মাতার নাম নবমল্লিকা। লেখাপড়া শেষ করে কবি মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে বীরভূমের রাজনগরের নবাব আসফুল্লা খাঁর উকিল নিযুক্ত হন। খাঁর দেয় খাজনা নিয়ে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে এক ধর্মঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সন্ন্যাসী তাঁকে ধর্মমঙ্গল রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

নরসিংহ সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাব্যে কোথাও অহেতুক পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রয়াস পাননি। কবি সহজ, সরল ও গ্রাম্যতা দোষ-মুক্ত ভাষায় আগাগোড়া গ্রন্থ রচনা করেছেন।

নরসিংহ রায়, রাজা—পক্কপল্লী বা পাইকপাড়াতে এঁর রাজধানী ছিল। ইনি সস্ত্রীক শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

নরহরি উপাধ্যায়—মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের পুত্র এবং যজ্ঞপতির ছাত্র জয়দেব অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। এই পিতৃভক্ত মহাপণ্ডিত 'দূষণোদ্ধার' গ্রন্থে পিতৃবিরোধী মত খণ্ডন করেছিলেন। সম্ভবতঃ ১৪৭৫-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বাচস্পতি মিশ্রের বিরুদ্ধে নরহরি স্মৃতিশাস্ত্রে 'দ্বৈতনির্ণয়' রচনা করেন।

নরহরি চক্রবর্তী—এঁর অন্য নাম ঘনশ্যাম। বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর'-এর ইনি রচয়িতা। এই সুবৃহৎ গ্রন্থকে বৈষ্ণব ইতিহাসের বিশ্বকোষ বলা যায়। 'ভক্তিরত্নাকরে' মোট পঞ্চদশ তরঙ্গ আছে। তিন প্রভু, ছয় গোস্বামী এবং শ্রীনিবাস প্রভৃতি মহান্তদিগের বিষয়ে অনেক প্রামাণিক প্রসঙ্গ ছাড়াও ভক্তি রত্নাকরে বহু বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ব্রজপরিক্রমা ও নবদ্বীপ-

পরিক্রমা অংশ ছুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বললেও হয়। পঞ্চম আসলে একটি সঙ্গীত-শাস্ত্র বিষয়ক নিবন্ধ। ভক্তিরত্নাকরে নরহরির স্বরচিত এবং অপরের লেখা অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থাকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বচন উদ্ধারে। এই ভক্তিরত্নাকবে অধুনালুপ্ত কয়েকটি গ্রন্থের উদ্দেশ পাওয়া যায়।

নবহরি চক্রবর্তীব দ্বিতীয় জীবনী গ্রন্থ 'নরোত্তমবিলাস'। এতে প্রধানত নরোত্তম ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত আছে। নরহরির অপর জীবনী গ্রন্থ 'শ্রীনিবাস চরিত্র'।

তার গৌবাঙ্গ পদাবলীব সঙ্কলন গ্রন্থ 'গৌরচরিত্র চিন্তামণি'। নবহবি একটি বিরাট পদসঙ্কলনেও হাত দিযেছিলেন, নাম 'গীতচন্দ্রোদয'। নরহবিব অন্যান্য গ্রন্থ 'ছন্দ সমুদ্র' এবং 'পদ্ধতিপ্রদীপ'। তিনি অনেকগুলি পদও লিখেছিলেন। তাঁর রচনাগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমের দিকেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

নবহবির পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী ছিলেন বিখ্যাত জগন্নাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। নিবাস ছিল গঙ্গাতীরবর্তী সৈয়দাবাদ গ্রাম। নরহরি ছন্দোজ্ঞ এবং সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। প্রেমদাসের মত নরহরিও জীবনের প্রথমে কিছু কাল বৃন্দাবনে ঠাকুরবাড়ীতে পাচকের কাজ করেছিলেন।

নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম দাস)—মুর্শিদাবাদ জেলায় রেঙাপুর বা রেঙাগ্রামে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম হয়। এঁর পিতা প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ঠাকুরের শিষ্য—জগন্নাথ। নরহরি ছিলেন শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্তীর শিষ্য।

ইনি গোবিন্দজীর আদেশে ব্রজে গিয়ে তাঁর পাচকের কার্যে নিযুক্ত হন। এজন্য ইনি 'রসুইয়া পূজারী' নামে খ্যাত হন। এঁর রচিত গ্রন্থ: (১) ভক্তিরত্নাকর, (২) নরোত্তম বিলাস, (৩) শ্রীনিবাস চরিত্র, (৪) গীতচন্দ্রোদয়, (৫) ছন্দঃ সমুদ্র, (৬) গৌরচরিত-চিন্তামণি, (৭) নামামৃত সমুদ্র, (৮) পদ্ধতি প্রদীপ প্রভৃতি। ইনি একাধারে সুপাচক, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ, সুলেখক ও পরম ভক্ত ছিলেন।

নরহরি দাস—"অদ্বৈতমঙ্গল" গ্রন্থ প্রণেতা। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পরবর্তী ভক্ত।

নরহরিদাস সরকার—বাসস্থান ছিল শ্রীখণ্ডে। ইনি জাতিতে বৈদ্য। এঁর পিতার নাম নারায়ণ দাস। ইনি ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি মহাপ্রভুর একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। উত্তর রাঢ়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে এঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। ইনি একজন বিখ্যাত পদকর্তা। চৈতন্য সমসাময়িক কবিদের মধ্যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনায় নরহরি দাস সরকারই বোধহয় প্রাচীনতম। এঁর রচিত কতকগুলি পদ পরবর্তী

কালে চণ্ডীদাসের নামে চলে গিয়েছে। নরহরি গৌরাঙ্গ পূজার অন্যতম প্রবর্তক। এঁর রচিত শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত 'গৌরাঙ্গাষ্ট-মালিকা' নামে গৌরাঙ্গপূজাবিষয়ক একটি ছোট নিবন্ধ পাওয়া গিয়েছে। নরহরি দাস সরকার প্রসিদ্ধ লোচন-দাসের গুরু ও 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। নরহরি অনেকগুলি কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এছাড়াও আরও কয়েকটি সাধনা বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এগুলির ভাষা খুব সম্ভব সংস্কৃত।

নরহরি বিশারদ—'চৈতন্য-ভাগবতে' ইনি মহেশ্বর বিশারদ নামেও অভিহিত হয়েছেন। তবে নরহরি বিশারদ বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা ছিলেন, বহু পণ্ডিতের এইরূপ অভিমত। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর খ্যাতির কথা সমগ্র গৌড়দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণিটীকা'। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সার্বভৌমের পুত্র বাহিনীপতি বিশারদকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে বৃদ্ধ বয়সে কাশী গমন করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থানুসারে বিশারদ চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহাধ্যায়ী ছিলেন। এঁর পিতার নাম রত্নাকর।

নরেন্দ্রগুপ্ত—হর্ষচরিত থেকে জানা যায় যে নরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক রাজা পুণ্ড্রে রাজত্ব করতেন। রাজত্ব-কাল সপ্তম শতাব্দী। কেউ কেউ বলেন এই নরেন্দ্রগুপ্তই বাংলার বিখ্যাত বীর রাজা শশাঙ্ক। শশাঙ্ক দ্র°।

নরোত্তম দাস—চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকারদের মধ্যে নরোত্তম দাস অন্যতম। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে নরোত্তম দাস বৈষ্ণব ধর্মমতে, কীর্তনগানে ও গীতি-কবিতায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইনি নরোত্তম দাস, নরোত্তম দাস-ঠাকুর অথবা দাসঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধি-মান কায়স্থ জমিদার পরিবারে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কৃষ্ণদাস দত্ত, মাতা নারায়ণী। বাল্যাবস্থাতেই ধর্মানুরাগ প্রবল হওয়ায় নরোত্তম পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তের হাতে পৈতৃক সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এবং সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই বৃন্দাবনেই নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামা-নন্দের সঙ্গে মিলিত হন। এই ত্রয়ীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে স্তিমিত-প্রায় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নরোত্তম দাসের প্রেরণায় তাঁর জন্মভূমি খেতুরীতে ছয়টি দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট মহোৎসব হয়। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে ইহাই খেতুরীর মহোৎসব নামে খ্যাত। নরোত্তমের চরিত্র মাধুর্য ছিল অসাধারণ। নরোত্তম পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু এঁর রচনা ছিল সহজ সরল। নরোত্তম অনেকগুলি ছোট বড় সাধনভজন বিষয়ক নিবন্ধ লিখেছিলেন। যেমন—প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্য-প্রেমচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা, উপাসনাপটল, স্মরণমঙ্গল, স্বরূপ-কল্পতরু, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, ভক্তি সারৎসার ইত্যাদি। এসবের মধ্যে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক আদৃত। নরোত্তম জাতিতে কায়স্থ হলেও বহু ব্রাহ্মণ এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতাররূপে সমাদৃত হতেন।

নরোত্তম গঙ্গাতীরবর্তী গাম্ভীলাতে গিয়ে দেহরক্ষা করেন। 'প্রেমবিলাসে' নরোত্তমের একশত চব্বিশ জন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। নরোত্তম একজন বিখ্যাত পদকর্তাও ছিলেন। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই ইনি পদ রচনা করেন। তবে তাঁর প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলির অধিকাংশই বাংলাভাষায় লিখিত এবং এইগুলিতেই তাঁর কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাঁর শেষ-বয়সে রচিত কয়েকটি স্মৃতি-জাগানিয়া পদ বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী।

নলিন পণ্ডিত—শ্রীজলধর পণ্ডিতের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এই নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়।

নলিনী দেবী—রাজা চাঁদ রায়ের ভ্রাতা সন্তোষ রায়ের স্ত্রী। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা।

নশরত শাহ—বাংলার একজন মুসলমান শাসনকর্তা। ইনি নসিব শাহ নামেও পরিচিত। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর পিতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর ইনি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পর পর অনেকগুলি অঞ্চল অধিকার করে নিজ শাসনকর্তৃত্ব দৃঢ় করেন। ইনি গৌড়নগরে কয়েকটি ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমান সাধু হজরত মুকদমের সাদউল্লাপুরের সমাধিমন্দিরও ইনিই নির্মাণ করেছিলেন। এঁর মৃত্যুর পরে এঁর পুত্র ফিরোজ শাহ বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

নসরৎ খান—ছুটিখান দ্র°।

নসরুল্লা খান—'জঙ্গনামা' গ্রন্থের রচয়িতা প্রাচীন মুসলমান কবি। অধিকাংশ জঙ্গনামায় হজরৎ মুহাম্মদের খুল্লতাত পুত্র ও জামাতা আলীর

পুত্র হাসন হুসেন-হানীফের কাহিনী আছে। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। আর এক কবির পরিচয় পাওয়া যায় এই নামে। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'মুসার ছাওয়াল'।

নসরুল্লা খোন্দকার—সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। এঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'জঙ্গনামা'।

নসীর মামুদ—সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষের দিকের কবি। পদকল্পতরুতে এঁর একটি পদ পাওয়া যায়। এতে ভক্ত কবির হৃদয়ের স্পর্শ আছে। পদটির কিয়দংশ:

"চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাচনি কাচনি বেত্র বেণু মুরলি-
খুরলি গানরি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরুণিতনয়াতীরে কেলি
ধবলী শাঙলী আও রি আও রি
ফুকরি চলত কানরি।
বয়স কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু-চন্দ্রি গুঞ্জা-হার বদনে মদন-
ভানরি॥"

নাগবোধি—রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন পুণ্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণায় নিরত ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন নাগবোধি। কথিত আছে ইনি নাগার্জুনের শিষ্য ছিলেন। নাগবোধির বাসস্থান ছিল বরেন্দ্রের অন্তর্গত শিবসেরা গ্রামে। পাল রাজাদের রাজত্বকালে ইনি জীবিত ছিলেন।

নাগবোধি 'যমারিসিদ্ধ চক্রসাধন', 'আর্যনীলাম্বরধরবজ্রপাণিসাধন' প্রভৃতি তেরখানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

নাছির মোহম্মদ—এঁর নিবাস চাটিগাঁয়ে (চট্টগ্রাম) ছিল বলে অনুমিত হয়। ১৬৪০ শকাব্দ বা ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনিই "রাগমালা" বা গানের বই সঙ্কলন করেন।

"মঘী সন পরিমাণ হাজার ন আশী জন
শকাব্দা ষোল শ চল্লিশে
পৌষ মাস বহি গেল সংক্রান্তি
দিবস ভেল
বিংশ দণ্ড শনিবার দিবসে।"

এঁর লেখা একটি পাওয়া গিয়েছে।

নাজির আহম্মদ—বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই ব্যক্তি নবাবের নিষ্ঠুর আচরণের প্রধান সহায় ছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে নাজির আহম্মদ নবাবের অভিপ্রায় অনুসারে প্রজাপীড়ন করতেন। নবাব সুজাউদ্দিন এই ব্যক্তির সমুদয় কুকার্যের বিষয় অনুসন্ধান করতে আদেশ দেন। অনুসন্ধানে এঁর দোষ প্রমাণিত হলে এঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই আদেশ অনতিবিলম্বে প্রতিপালিত হয়েছিল।

নাজির মোহাম্মদ সরকার—একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি

বগুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। ১১৮৬ বঙ্গাব্দে এঁর রচিত গ্রন্থ 'সোনাই যাত্রা' প্রকাশিত হয়।

নাড়পাদ—বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু। তিব্বত দেশে এঁর নাম নারো। এঁর স্ত্রীর নাম জ্ঞানডাকিনী নিগু। এঁরা স্ত্রীপুরুষেই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন এবং হেবজ্রসাধনের অনেক পুস্তক লিখে গিয়েছেন। নাড়পাদ কাশ্মীর দেশের শ্রীপট্টিকেরক গ্রামের কনকস্তূপ মহাবিহারের ভিক্ষু বিনয় শ্রীমিত্রের অনুরোধে বজ্রপাদসারসংগ্রহপঞ্জিকা নামে এক গ্রন্থ লিখেন। নাড়পাদের উপাধি আর্য, শ্রী, আচার্য, মহাচার্য, মহাপণ্ডিত, মহাযোগিন্ প্রভৃতি ছিল। বজ্রগীতি নামে এঁর দুখানি গানের বই আছে।

এঁর স্ত্রীকে নাঢ়ী বলা হত। এঁর পত্নী নাঢ়ীও একজন মহাবিদুষী ছিলেন। পূর্বে এঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের বাংলাদেশে নাঢ়া নাঢ়ী বলা হত।

নান্যদেব—মিথিলার কর্ণাটক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গের সেন বংশীয় রাজা বিজয়সেনের সমসাময়িক। এই নান্যদেবকে বিজয়সেন পরাজিত করেছিলেন।

নাভা দেবী—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মাতাঠাকুরানী, শ্রীকুবের আচার্যের পত্নী। নাভাদেবীর পিতার নাম মহানন্দ বিপ্র। ইনি নবগ্রামের নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশজ। নাভাদেবীর সাত পুত্র। তন্মধ্যে অদ্বৈত আচার্য অন্যতম।

নারায়ণ—ইনি এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা গোন, পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। গোনের পুত্র নারায়ণও পুরাণ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এই পূতচরিত্র নারায়ণ প্রভাকরমত স্থাপন দ্বারা কীর্তি লাভ করেছিলেন। ইনিই ছান্দোগ্য পরিশিষ্টের 'পরিশিষ্ট প্রকাশ' নামক টীকা রচনা করেন। রাঢ়দেশীয় এই ব্রাহ্মণবংশ ভূমিপতিও ছিলেন।

নারায়ণ—গৌড়াধিপের পাত্র ও রসবত্যাধিকারী (অর্থাৎ রন্ধনশালার অধ্যক্ষ) ছিলেন। বৈদ্যক শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ 'নিদান' গ্রন্থের প্রণেতা মাধব নারায়ণের পুত্র। নারায়ণ পালরাজাদের রাজত্বকালে অবস্থান করেছিলেন। ইনি ছিলেন লোধ্রবংশীয় কুলীন।

নারায়ণ কবিরাজ—ইনি ছিলেন রাজা নৃসিংহদেব কবিরাজের ভ্রাতা। 'ভক্তিরত্নাকরে' নারায়ণ কবিরাজ 'কবিশ্রেষ্ঠ' বলে প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু আজ অবধি এঁর একটিও পদ পাওয়া যায়নি। এজন্য অনেকে অনুমান করেন যে ইনি সংস্কৃত ভাষায়ই কবিতা রচনা করতেন।

নারায়ণ দত্ত—বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন।

একখানি তাম্রশাসনে এঁকে মহাসন্ধি-বিগ্রহিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নারায়ণ দাস—ইনি একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম—চিকিৎসা-পরিভাষা।

নারায়ণ দাস—একজন সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণব। ইনি 'রসভাবান্ত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আবার দাস নারায়ণ নামে এক কবিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি 'সহজ উজ্জল' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

নারায়ণ দাস—ব্রহ্মদাস পুত্র কায়স্থ নারায়ণ দাস সিদ্ধ গোঁসাই, 'প্রশ্ন বৈষ্ণব বা অর্ণবল্লব' গ্রন্থ বচনা করেছেন।

নারায়ণ দাস—নারায়ণ দাস শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র (বা প্রপৌত্র) জগদানন্দের শিষ্য ছিলেন বলে অনুমিত হয়। ১৬২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রঘুনাথ দাসের 'মুক্তাচরিত্র' গ্রন্থ পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।

নারায়ণ দাস কবিরাজ—চিকিৎসাপরিভাষা নামক বৈদ্যবল্লভের সিদ্ধান্তসঞ্চয় নামক জ্বরত্রিশতীটীকা প্রণয়ন করেছিলেন। ইনি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণ দাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড-বাসী সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও পরম বৈষ্ণব। ইনি শ্রীগোপীনাথের সেবা করতেন। এঁরই ঔরসে মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। কেউ কেউ বলেন ইনি গীত-গোবিন্দের টীকা রচনা করেছিলেন।

নারায়ণ দাস ঠাকুর—আসামের এক বৈষ্ণব ভক্ত। প্রথমে ইনি খুব-সম্ভব সৌরসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। এঁব পূর্ব নাম ভবানন্দ। আসামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শঙ্করদেব এঁকে পূর্বনামের পরিবর্তে নারায়ণ নাম প্রদান করেন। তারপর ইনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচাবে ব্রতী হন। কুচবিহারের রাজা নরনাবায়ণ ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় শঙ্করদেবকে শাস্তি প্রদানে উদ্যত হন। কিন্তু এঁকে না পেয়ে অনুচরবৃন্দ-সহ নারায়ণ দাসকে রাজাব নিকট উপস্থিত করে। রাজা নরনারায়ণেব আদেশ অমান্য করে দুর্গা প্রতিমার সামনে প্রণত হতে অস্বীকার করায়, রাজা তাঁদের কারাগারে বন্দী করেন। কিন্তু কোনোও উপায়ে এঁদের মনোভাব পরিবর্তন কবতে না পেরে অবশেষে রাজা এঁদের মুক্তি দেন।

নারায়ণ দাস (সরকার)—প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত নরহরি দাস সরকারের পিতা। এর বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এঁর জন্ম হয়। জাতিতে ইনি ছিলেন বৈদ্য। নারায়ণ দাস ছিলেন রাজবৈদ্য এবং খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। এঁর অপর দুই পুত্রের নাম মুকুন্দ ও মাধব।

নারায়ণ দেব—পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম মনসামঙ্গল রচয়িতাদের অন্যতম হচ্ছেন নারায়ণ দেব। কানা

হরিদত্তের পরেই নারায়ণদেবের নাম উল্লেখ্য। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যেই কেবল একজন নন, তিনি এই কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিও বটে। তাঁর কবি-প্রতিভা পূর্ববঙ্গের সীমা অতিক্রম করে রাঢ়, এমনকি আসামের প্রত্যন্ত ভাগেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে তাঁর আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম নরসিংহ, মাতা রুক্মিণী, মাতামহ প্রভাকর। জাতিতে কায়স্থ। গোত্র মৌদ্‌গল্য। তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ রাঢ়দেশ ছেড়ে ব্রহ্মপুত্র তীরে বোরগাঁও-এ বা বোর-গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই বোরগ্রাম মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। তাঁর উপাধি ছিল "কবিবল্লভ।" "সুকবিবল্লভ রামদেব নারায়ণ" ইত্যাদি ভণিতা দেখে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে হয়ত কবির পুরা নাম ছিল রামনারায়ণ দেব। নারায়ণ দেবের রচিত 'কালিকা পুরাণ'-এর একটি পুঁথি পাওয়া যায়। কাব্যটি সম্ভবত মনসামঙ্গল কাব্যের পূর্বাংশ। কবির নামে পদ্মপুরাণ কাব্যও পাওয়া যায়। আসাম অঞ্চলে নারায়ণ দেবের কাব্যের অসমীয়া রূপান্তর পাওয়া যায়। মঙ্গল কাব্যের পরবর্তী বহু কবির উপর নারায়ণ দেবের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

কিংবদন্তী আছে যে নারায়ণ দেব বিদ্যার্জনে ব্যর্থ হয়ে প্রাণত্যাগের জন্য এক সরোবরের নিকট গমন করলে মনসা দেবী তাঁকে দেখা দেন এবং তাঁরই কৃপায় নারায়ণ দেব মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

নারায়ণ দেব—শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের প্রাচীনকালীন চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা।

নারায়ণ দেব——চট্টগ্রামের একজন প্রাচীন বাঙালী কবি। ইনি বিবিধ ছন্দে একখানি কালিকাপুরাণ প্রণয়ন করেন।

নারায়ণ দেব (দ্বিজ)—'সুকনান্নি' নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা। অনেকের অভিমত 'সুক'ব নারায়ণী' শব্দ ক্রমে সুকনান্নি রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

নারায়ণ দৈবজ্ঞ—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ও 'সুধারস সারণী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা অনন্ত দৈবজ্ঞের পুত্র। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'মুহূর্তমার্তণ্ড' নামক মুহূর্ত বিচার বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। নারায়ণের পুত্র গঙ্গাধরও একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গ্রহ লাঘবের উপর 'মনোরমা' নামক টীকা রচনা করেন।

নারায়ণ (দ্বিজ)—প্রাচীন বাঙালী কবি। কুচবিহারের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের অনুজ খড়্গনারায়ণের

আদেশে ইনি নারদীয় পুরাণ রচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

নারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন—বৈয়াকরণিক ও টীকাকার। ইনি 'ব্যাকরণ-দীপিকা' নামক একখানি টীকার পুঁথি রচনা করেন (আনুমানিক ১৫৩৩ শক)।

নারায়ণ পণ্ডিত—ইনি ছিলেন মহাপ্রভুর পরমভক্ত প্রসিদ্ধ দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা। ইনি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমবার নীলাচলে গিয়ে নারায়ণ পণ্ডিত মহাপ্রভু প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

নারায়ণ পাল—বিগ্রহপাল ও লজ্জাদেবীর পুত্র। তিনি সম্ভবতঃ ৮৬০ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্ব খুব নিরাপদে নির্বাহিত হয়নি। রাজত্বের প্রথম দিনে গৌড়ের পরম শত্রু গুর্জররাজ ভোজদেব মগধ আক্রমণ করেন। এবং নারায়ণ পাল পরাজিত হন। তাঁর রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষ পরে গুর্জরের দৌরাত্ম্যে পাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। নারায়ণ পাল উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকার থেকে অনেকটা বঞ্চিত হলেও এঁর দীর্ঘ রাজত্ব মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। এঁর সময়ে উচ্চশিক্ষা, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে দেশের খুব উন্নতি হয়েছিল। শান্তিপ্রিয়, দানবীর, প্রিয়ভাষী আদর্শ চরিত্র, নারায়ণ পাল উচ্চশিক্ষা ও চারু-শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা সুখে বাস করত। কবি তাঁর শুভ্র যশোরাশি শিবের হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নারায়ণ বল্লভ পাল—মেদিনীপুর জেলার নারায়ণ গড়ের রাজা। রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ব পাল ছিলেন এঁর পিতা। ১০৩ বঙ্গাব্দে গন্ধর্ব পাল পরলোক গমন করলে নারায়ণবল্লভ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অত্যন্ত তেজস্বী ও বলবান রাজা ছিলেন। রাজা নারায়ণবল্লভ প্রজানুরাগী ছিলেন। রাজধানী সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করে নিজ নামে তার নামকরণ করেছিলেন নারায়ণগড়। অত্যাচারী দস্যুদের ইনি কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। এঁর রাজত্বকালে দেশে কৃষি ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ৭২০ বঙ্গাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

নারায়ণ বন্দ্য—বৈয়াকরণ। ইনি ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ধাতুরত্নাকর ও সারাবলী নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন।

নারায়ণ বর্মা—গৌড়াধিপ ধর্মপালের একজন মহা-সামন্তাধিপতি।

নারায়ণ বাচস্পতি—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত। পূর্বলীলায় শৌরসেনী সাজতেন।

নারায়ণ বিদ্যাবিনোদাচার্য—পূর্বগ্রাম নিবাসী। এঁর পিতার নাম বাণেশ্বর ও পিতামহ জটাধর। নারায়ণের জীবনকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী। নারায়ণ 'অমর কোষে'র উপর 'শব্দার্থসন্দীপিকা' টীকা রচনা করেছিলেন।

নারায়ণ ভট্ট—ইনি 'কণ্ঠপ্রকাশ' এবং 'বৈদ্যচিন্তামণি' নামক বৈদ্যক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেছিলেন। শ্রীকণ্ঠকৃত কুসুমাবলীর উপর এঁর একখানি টিপ্পনী গ্রন্থ আছে। নারায়ণ গীতগোবিন্দের 'পদদ্যোতিনী' টীকা লিখেছিলেন। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণ ভট্ট—একজন জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। এর রচিত গ্রন্থ 'চমৎকার চিন্তামণি'।

নারায়ণ ভট্ট—ইনি সামুদ্রিক অমরসিংহ বিরচিত 'জাতক তন্ত্রসার' বা 'কর্ম প্রকাশ' গ্রন্থের 'কর্মপ্রকাশিকা সুধানিধি' নামক টীকা রচনা করেন।

নারায়ণ সর্বজ্ঞঃ—মিথিলানিবাসী ন্যায়াচার্য। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্বে এবং শ্রীহর্ষের পরে সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণী—'চৈতন্য মঙ্গল' রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের মাতা। এঁর পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীনলিন পণ্ডিত। কুমারহট্ট-বাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাসের সঙ্গে নারায়ণীর শুভ পরিণয় হয়। নারায়ণীর বয়স যখন চার বছর, তখন গৌরাঙ্গ-আজ্ঞায় ইনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে তার পরম স্নেহপাত্রী হন এবং তাঁর ভুক্তাবশেষ পান। পরে মহাপ্রভু নীলাচল গমন করলে শ্রীবাস ও শ্রীরাম কুমারহট্টবাসী হয়ে বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাসের হস্তে অতি অল্প বয়সে নারায়ণীকে সম্প্রদান করেন। কিন্তু বিবাহের পরেই নারায়ণী বিধবা হন। এবং সেই অবস্থায় মাত্র ৯।১০ বছর বয়সে নারায়ণীর একটি পুত্র হয়। সেই পুত্রই বৃন্দাবন। বৃন্দাবন চৈতন্য-জীবনী রচনা করে তার নাম দিয়েছিলেন 'চৈতন্য মঙ্গল'। কিন্তু পরবর্তী কালে লোচনদাস এই একই নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করায় নারায়ণী পুত্রের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে নাম দেন 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত'। নারায়ণীর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

নারায়ণী দাসী—এই ভাগ্যবতী রমণী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ধাত্রীমাতা ছিলেন।

নারো-পা বা **দ্বিতীয় কাহ্ন-পা**—একজন সিদ্ধাচার্য। ইনি জালন্ধর পাদের শিষ্য কাহ্ন-পা হতে ভিন্ন ব্যক্তি। এঁর নামে কোন চর্যাপদ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে ইনি জীবিত ছিলেন।

নাশির মামুদ—বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন অন্যতম মুসলিম কবি। এঁর পরিচয় কিছুই জানা যায় না। 'পদ-

কল্পতরু'তে এঁর একটি পদ স্থান পেয়েছে। ঐ পদ ব্যতীত আরও একটি পদ রমণীমোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'তে আছে। কারুর কারুর মতে ইনি বঙ্গের নরপতি হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ।

নাসিরউদ্দিন—একজন প্রাচীন মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা।

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ—বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র। মৃত্যুর পূর্বে হোসেন শাহ নসরৎ শাহকে বঙ্গ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের মৃত্যুর পর নসরৎ শাহ 'নাসিরুদ্দীন আবুল মুজাফর নসরৎ শাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নশরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন তাঁর পিতার রাজ্যের তুলনায় কম ছিল না বরং কোন কোন নূতন রাজ্য তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শোন নদীর উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বঙ্গের সীমানা বিস্তৃত হয়েছিল। নসরৎ শাহ ত্রিহুতও জয় করেছিলেন। নসরৎ শাহের রাজত্বকালের একটি প্রধান ঘটনা ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ। বাবর বঙ্গদেশ আক্রমণ করলে নসরৎ শাহ উপঢৌকনাদি পাঠিয়ে ও আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে নিরস্ত করেন। নসরৎ শাহের রাজত্ব কালে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তা করতে দেননি। ফতেহাবাদ হতে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। পিতার অনুকরণে পররাষ্ট্র ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পূর্বভারতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রাধান্য লাভ এবং মুঘল রাজ্য-বিস্তারের প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করা। নসরৎ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পরাগল খানের পুত্র ছুটীখানের আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। নসরৎ খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে উল্লেখ আছে: 'নসরত খান রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।'

তাঁর সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফতেয়াবাদে নসরৎ শাহের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজাদের মধ্যে নসরৎ শাহ অন্যতম। তেরো বছর রাজত্ব করার পর ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ এক খোজা কর্তৃক নিহত হন।

নাসিরুদ্দিন বগরা খাঁ, সুলতান—বাংলার একজন শাসনকর্তা।

দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবন তদানীন্তন বাংলার শাসনকর্তা তোগরল খাঁ বিদ্রোহী হলে তাঁকে নিহত করে স্বীয় পুত্র নাসিরুদ্দিনকে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও স্নেহপরায়ণ। ইনি দীর্ঘ ৪৩ বছর কাল বাংলা শাসন করে ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

নাসিরুদ্দিন মহমুদ—দিল্লীশ্বর আলতামাসের পুত্র। বঙ্গেশ্বর গিয়াসউদ্দিন বিহার অধিকার করে বিদ্রোহী হলে নাসিরুদ্দিন অযোধ্যা থেকে এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁকে নিহত করেন। তারপর তিনি বঙ্গের রাজা হয়ে শ্বেতচ্ছত্র ও রাজদণ্ড ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। ১২২৬-২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাসিরুদ্দিন বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। ১২২৮ খ্রীঃ তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ—রাজা গণেশের পৌত্র শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর পর বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানরা একমত হয়ে ইলিয়াস শাহী বংশের বংশধর নাসিরুদ্দীন মামুদকে বাংলার সিংহাসনে বসান (১৪৪২ খ্রীঃ)। ইনি ছিলেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের এক পৌত্র। নাসিরুদ্দীন বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। তাঁর সুশাসনে দেশের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। নাসিরুদ্দীন শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর রাজত্ব কালে গৌড়ে বহু মস্‌জিদ, খান্‌কা, তোরণ, সেতু, সমাধি ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। শান্তির সঙ্গে দীর্ঘ ১৭ বছর রাজত্ব করে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনের শেষ হয়।

নাসিরুদ্দিন, সিপা-হী-সালার, সৈয়দ—একজন দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ শাহ জালাল এমনির অনুগত শিষ্যদের একজন। ইনি শাহজালালের সেনাপতি ছিলেন। তাঁর আদেশে ইনি বহু সৈন্য ও দ্বাদশজন আউলিয়া-সহ তরফ বিজয়ে গমন করেন। সে সময় আরাক নারায়ণ নামে ত্রিপুর রাজার এক সামন্ত রাজপুর নামক স্থান শাসন করতেন। আরাক নারায়ণ নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। নাসিরুদ্দীন তরফের প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ এঁর কৃতকার্যতায় খুশী হয়ে এঁকে তরফের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। ইনি ১৩১৫-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তরফ শাসন করেন।

নাসিরুদ্দিন সুলতান—বাংলার একজন মুসলমান শাসনকর্তা। ইনি দিল্লীর সম্রাট ইল্‌তিমিসের পুত্র। ইনি পিতার নামে বাংলা বিহার শাসন করতেন। ইনি প্রায় চার

বছর সুনামের সঙ্গে রাজ্য শাসন করে ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নিকোলা-ডি-কণ্টি—একজন ইউরোপীয় পর্যটক। ১৪১৯-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি এদেশ পর্যটন করেন। ইনি এঁর বিবরণীতে গঙ্গা-তীরস্থ সারণোভ নামক স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আজও এঁর অবস্থান নির্ণীত হয়নি।

নিজামউদ্দৌলা—ইনি বাংলার নবাব মীরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৬৫ সালে ইনি বাংলার নবাব হন। ১৭৬৬ সালে পরলোক গমন করেন। ইনি বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার উপর রাজস্ব পেতেন। এঁর সময় লর্ড ক্লাইব দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন।

নিতাই বৈরাগী—(১৭৪৭-১৮২১)। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর একজন কবিওয়ালা।

নিতাইসুন্দর গোস্বামী—শ্রীশ্রীবসু-জাহ্নবা-জনক সূর্য দাস পণ্ডিতের বংশধর নিতাইসুন্দর গোস্বামী ছিলেন বর্ধমানের অন্তর্গত মূঢগ্রাম-নিবাসী। ইনি ১৬৭০-৮০ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যে এঁর বৈরাগ্যোদয় হয়। কিছুদিন নবদ্বীপে বাস করে ইনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং তথায় সিদ্ধিলাভ করে অল্প কালের জন্য একবার মূঢ়গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। মূঢ়গ্রামে কিছুকাল অবস্থিতি করে নিতাইসুন্দর পুনরায় বৃন্দাবন গমন করেন এবং তথায় দীর্ঘকাল ভজন-সাধন করে ধীর-সমীর কুঞ্জে শ্রীশ্রীগৌরী-দাস পণ্ডিতের বামে সমাধি গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন চিরকুমার।

নিত্যানন্দ—'হরিচরিত' প্রণেতা কবি চতুর্ভুজের পিতামহ। নিত্যানন্দও কবি ও স্মার্ত ছিলেন। তিনি 'কৃষ্ণানন্দ-কাব্য' ও 'স্মৃতি কৌমুদী' রচনা করেন। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে জীবিত ছিলেন।

নিত্যানন্দ অধিকারী—ইনি 'গৌরভক্তবিনোদিনী' নামে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শ্লোকমালার সংস্কৃতে টীকা প্রণয়ন করেন।

নিত্যানন্দ আচার্য—অদ্ভুতাচার্য দ্র°।

নিত্যানন্দ ঘোষ—ইনি ভারত পাঁচালী কাব্যের প্রণেতা। কাশীরাম দাসের কাব্যের তুলনায় এঁর ভারত পাঁচালী অনেক বেশী সংক্ষিপ্ত। নিত্যানন্দ ঘোষের কাব্যের রচনাকাল খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। কেউ কেউ এঁকে কাশীরামের পূর্ববর্তী কবি বলে মনে করেন,

"অষ্টাদশ-পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।"

কিন্তু পুথিগত প্রমাণে তা বলা চলে না। নিত্যানন্দের কাব্যের স্ত্রী-পর্ব, শান্তি-পর্ব ও অশ্বমেধ-পর্ব কাহিনীর

আদর সমধিক ছিল, তাই পর্বগুলির পুঁথিই বেশী পাওয়া গিয়েছে। নিত্যানন্দের উপাধি ছিল "কবীন্দ্র"—কহে ঘোষ-নিত্যানন্দ পদবী কবীন্দ্র সুশোভন।"

নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী, ক বি—মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়া পরগণার খয়রা কানাইচক গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সময়ে (১৭৫৬-৭০ খ্রীঃ) তাঁর সভাসদ ছিলেন। রাজসভায় এঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং রাজা এঁকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। সর্বশাস্ত্রবিশারদ ভবানী মিশ্র ছিলেন এঁর প্রপিতামহ। আর রাধাকান্ত মিশ্র ছিলেন পিতা। ইনি শীতলামঙ্গল, ইন্দ্রপূজা, সীতাপূজা, পাণ্ডব পূজা, বিরাট পূজা, লক্ষ্মীমঙ্গল, কালুরায়ের গীত প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ইনি এঁর লেখায় গ্রাম্য ভাষাদি প্রয়োগ করেছিলেন। এঁর লেখার মধ্যে ফার্সী, হিন্দী, উর্দু ও উড়িয়া ভাষার শব্দ পাওয়া যায়।

নি ত্যা ন ন্দ দাস—নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব নাম ছিল বলরাম দাস। এঁর রচিত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী ছিলেন বলরামের দীক্ষাগুরু আর নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। বলরামের মাতার নাম সৌদামিনী, পিতার নাম আত্মারাম দাস এবং তাঁর 'অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস।' পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বালক বলরাম একদিন স্বপ্নদর্শন করে খড়দহে জাহ্নবা-দেবীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে 'নিত্যানন্দ দাস' নাম প্রাপ্ত হন। ইনি বীরভদ্রের সঙ্গে বঙ্গ-গৌড়াদি পরিভ্রমণ করেছিলেন। ইনি খেতুরির উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। 'কৃষ্ণ-পদামৃতসিন্ধু'তে নিত্যানন্দদাসের রচিত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'র মতে ইনি 'গৌরাঙ্গষ্টক', 'রসকল্পসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত', ও 'হাটবন্দনা' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর জীবিত-কাল ষোড়শ শতাব্দী।

জাহ্নবা দেবীর আদেশেই নিত্যানন্দ প্রেমবিলাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রেমবিলাসে চৈ ত ন্য-নি ত্যা ন ন্দ অদ্বৈতের, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামা-নন্দের, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের এবং গৌড়ীয় মহান্তদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এতে গ্রন্থকার তাঁর 'বীরভদ্র চরিত'-এর উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্য জীবনীর ইতিহাসে গ্রন্থটি আদর্শ এবং প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী—বিখ্যাত কবিওয়ালা। ১৭৫১ সালে চুঁচুড়ার দক্ষিণ চন্দননগর গ্রামে কুঞ্জদাস বৈষ্ণবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি

কবিগানে সকলকে বিমুগ্ধ করতেন। এঁর দলে গোরাচাঁদ ঠাকুর ও নীলু ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। এঁর সঙ্গে "ভবানে বেনের" সংগীত যুদ্ধ ভাল হত। ১৮২১ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

ডাক নাম—নিতাই দাস। জাতি বৈষ্ণব। ছেলেবেলা থেকেই গান বাজনায় অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইনি যেমনই বাঁধনদার, তেমনই বাজনদার। নিতাইয়ের দলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—ভবানী বেনের দল। এই দুই দলের লড়াইকে লোকে বাঘে মহিষের লড়াই বলত।

নিত্যানন্দ প্রভু—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে চৈতন্যদেবের পরেই নিত্যানন্দ প্রভুর স্থান। এঁর জন্ম হয় ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। এঁর পিতার নাম মুকুন্দ বা হরাই ওঝা, পিতামহ সুন্দরমল্ল বা নকড়ি ভাদুড়ী। মাতার নাম পদ্মাবতী। এঁরা বীরভূম জেলার এক চাকা গ্রাম বা বর্তমানে গর্ভবাস গ্রামের অধিবাসী। নিত্যানন্দের আদি নাম ব্রহ্মানন্দ। ইনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। এবং বিশ্বাস করতেন যে ভক্তি থাকলে চণ্ডালও দ্বিজোত্তম হতে পারে। এ বিষয়ে ইনি মহাপ্রভুর মতই সমর্থন করতেন। খড়দহে আড়াই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুও ভিক্ষুণীকে ইনিই বৈষ্ণব সমাজে স্থান দেন। বাংলার বণিকসমাজ বিশেষ করে সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিক সমাজ নিত্যানন্দ প্রভুর চেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হয়। ইনি আচণ্ডাল সর্বশ্রেণীর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করতেন। সপ্তগ্রামের সুবর্ণ বণিক-কুলোদ্ভব উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি ধনী বণিকগণ নিত্যানন্দপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন।

নিত্যানন্দ নদীয়ায় চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে নগর সংকীর্তন কালে জগাই ও মাধাই (জগন্নাথ ও মাধব) নামে দুই ভ্রাতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। কথিত আছে তারা সংকীর্তনরত নিত্যানন্দের প্রতি লক্ষ্য করে একটি মাটির কলসী নিক্ষেপ করলে নিত্যানন্দের কপাল কেটে রক্তপাত হয়। নিত্যানন্দ এতে ক্রুদ্ধ না হয়ে ঐ পাষণ্ডদ্বয়কে কৃষ্ণপ্রেম কথা শুনান। তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবহারে জগাই মাধাই অনুতপ্ত হয় এবং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে।

প্রৌঢ় বয়সে নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস আশ্রম ভঙ্গ করে কালনার সূর্যদাস সরখেলের বসুধা ও জাহ্নবী নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি নাকি মহাপ্রভুর আদেশেই এই কার্য করেছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে জাহ্নবী দেবীর বিশেষ খ্যাতি হয়েছিল। জাহ্নবী দেবীর গর্ভজাত পুত্র ও কন্যা বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র ও গঙ্গাদেবী। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ বাসকালে নিত্যানন্দ তাঁর দ্বিতীয় কায়ার ন্যায় সর্বসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণের সংকীর্তন কালে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এর কেন্দ্ররূপে গণ্য হতেন। মহাপ্রভুর

পুরীবাসকালে নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে থাকতেন। কিন্তু তাঁদের অন্তরের বিচ্ছেদ কখনো হয়নি। বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে নিত্যানন্দের অবদান অসামান্য। চৈতন্যের আদর্শকে তিনিই সফল করে তুলেছিলেন।

নিধিরাম আচার্য, কবিরত্ন—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক একজন প্রতিষ্ঠাবান কবি। ইনি একখানি 'কালিকামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির পিতার নাম দুর্লভ আচার্য ও মাতার নাম লক্ষ্মী। আত্মপরিচয়ে কবি বলেছেন যে গণক বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, অর্থাৎ তিনি ছিলেন আচায ব্রাহ্মণ। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্যখানি রচিত হয়েছিল। নিধিরামের কাব্যে আলী আকবর নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। নিধিরামের উপাধি ছিল কবিরত্ন।

এঁর জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার চক্রশালা নামক গ্রাম।

নিধুবাবু—রামনিধি গুপ্ত দ্র°।

নিবারণ বিদ্যাবাগীশ—পক্কপল্লীর (বর্তমান পাইক পাড়া) রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত ও শেষে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হন।

নিমচাঁদ শিরোমণি—একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি অসাধারণ শ্রুতিধর পণ্ডিত বলেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এঁর জন্মস্থান কাঞ্চনপল্লী (বর্তমান কাঁচড়াপাড়া)। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। ইনি ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন।

নিমাই দাস—ভারত পাঁচালীকার। এঁর নামে কর্ণপর্বের পুঁথি তিনখানা পাওয়া গেছে। সবগুলিই মল্লভূমে লেখা। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। কবির মাতার নাম দৈবকী। ভণিতায় কবি প্রায়ই নিজেকে "দৈবকীনন্দন" বা "দৈবকীকোঙর" বলেছেন।

নিমাইচরণ মল্লিক—কলকাতার একজন ধার্মিক ও দানশীল ধনবান্ ব্যক্তি। ১৭৩৬ সালে বড়বাজারের বিখ্যাত দানশীল সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের কৌলিক উপাধি দে। মুঘলদের নিকট 'মল্লিক' উপাধি পেয়েছিলেন। ইনি ইংরেজী, বাংলা ও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দেশের দশের নানা সৎকার্যে ইনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। ১৮০৭ সালে একাত্তর বছর বয়সে মারা যান।

নিমাইচরণ মিত্র—একজন সঙ্গীত রচয়িতা। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু ছিলেন। এঁর রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতসমূহ এককালে ব্রাহ্মসমাজে গীত হত।

নিয়ানন্দ দাস—ইনি 'পদরসসার' নামক পদাবলী গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। সঙ্কলনকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। এতে ২৭০০ পদ আছে। তার মধ্যে প্রায় ৬৫০ পদ পদকল্পতরুতে

নেই। ইনি নিজেও পদরচয়িতা ছিলেন।

নিম্বার্ক, আচার্য—একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য। নিয়মানন্দ ও নিম্বাদিত্য এঁর অপর নাম। এঁর পিতার নাম জগন্নাথ। ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি নিমাৎ নামক বৈষ্ণব শাখার প্রবর্তক। ইনি বৃন্দাবনস্থ ধ্রুবপর্বতে সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রীনিবাস আচায এঁর মতোপজীবী। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ' নামক একটি উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন। এতে বাংলার বৈষ্ণবসমাজের ভেদাভেদবাদ সম্যকরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব এঁর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নিয়ামৎ খাঁ—সায়েস্তা খাঁর পরে ইব্রাহিম খাঁ যখন (১৬৯৬-১৭১২ খ্রীঃ) বাংলার নবাব ছিলেন, তখন নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন তাঁর অন্যতম সেনাপতি। এঁর জায়গীর ছিল হুগলী জেলায়। ইনি রহিম খাঁর নিকট পরাজিত ও নিহত হন।

নিশ্চলকর—ইনি বকুলকরের ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় রক্ষিতের শিষ্য। ইনি চক্রদত্তীয় চিকিৎসা-সংগ্রহের 'রত্নপ্রভা' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। দ্বাদশত্রয়োদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ছিলেন গৌড়রাজ রামপালের সমসাময়িক।

নীতিবর্মা—ভোজের 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে নীতিবর্মার কাব্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'কীচকবধ'। ইহা ১৭৭টি শ্লোকে পাঁচটি সর্গে বর্ণিত। মহাভারতের কীচকবধ নামক সুবিদিত উপাখ্যানই এই কাব্যের বিষয়বস্তু। এতে শ্লেষ, যমকালঙ্কার, কবির শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গির চাতুর্য পরিদৃষ্ট হয়। নীতিবর্মার জীবনকাল একাদশ শতকের মধ্যভাগ। সম্ভবত ইনি পালরাজ বিগ্রহপালের সভাকবি ছিলেন।

নীলকণ্ঠ রায়—মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির অন্তর্গত ফতেসিংহের বিখ্যাত ভূস্বামী। ইনি ছিলেন পশ্চিমাগত ও মানসিংহের সহকারী সবিতা রায়ের বংশধর। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সময় নীলকণ্ঠ বাদশাহকে নজরানা দিয়ে রাজা উপাধি লাভ করেছিলেন। ইনি মুক্তহস্তে দান করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইনি বহু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১১৯৭ বঙ্গাব্দের ১ চৈত্র নীলকণ্ঠ পরলোক গমন করেন।

নীলকণ্ঠ সুরি—মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি হরিবংশের টীকায় ঋঙমন্ত্র সমাবেশ করে শ্রীকৃষ্ণলীলার বৈদিকত্ব স্থাপন করেন। তাছাড়া, 'মন্ত্রভাগবতে'র চারিটি কাণ্ডে ২৫০টি ঋঙ্‌ মন্ত্রে ইনি শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রতিপাদনক্রমে 'মন্ত্ররহস্য প্রকাশিকা' নামে এক সুরসাল টীকাও রচনা করেন।

নীলধ্বজ—তাম্রলিপ্তের রাজা। সম্ভবতঃ ইনি মহাভারতের কর্ণের সামন্ত রাজা ছিলেন। সুতরাং এঁর অবস্থিতিকাল এখন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অশ্ব এঁর রাজ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ইনি কোন প্রতিরোধ করেননি বলে জানা যায়।

নীলধ্বজ—ইনি ছিলেন কামতা-পুরের রাজা। এঁর রাজ্যারম্ভকাল ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ। কথিত আছে নীলধ্বজ প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের রাখাল ছিলেন। ব্রাহ্মণ এঁর শরীরে রাজ-চিহ্ন দেখতে পেয়ে এঁকে ঐ হীন কার্য থেকে মুক্তি প্রদান করেন। নীলধ্বজের গোচারণ ক্ষেত্র বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত বলে প্রবাদ আছে। এঁর রাজ্যলাভ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একটি মত এই যে, নীলধ্বজ স্বনামখ্যাত হরচন্দ্রের উত্তরাধিকারী পাল রাজার রাজ্য জয় করেছিলেন, মতান্তরে ইনি এঁর ব্রাহ্মণ প্রভুর পরামর্শে পালবংশীয় অন্তিম রাজাকে গৌহাটীর নিকটে পরাজিত করে রাজা হয়েছিলেন। ইনি গৌহাটি থেকে রাজধানী কামতাপুরে স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং বহু সংখ্যক মৈথিল ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে স্থাপন করে স্বীয় রাজ্যের 'ব্রাহ্মণরাজ্য' নামকরণ করেছিলেন।

নীলমণি ঠাকুর, চক্রবর্তী—একজন কবি সঙ্গীত রচয়িতা। ইনি কলকাতার হেদুয়া অঞ্চলে বাস করতেন। ইনি একটি কবির দল গঠন করেছিলেন। ইনি ছাড়া কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, হরুঠাকুর প্রভৃতিও এঁর দলের জন্য গান রচনা করতেন।

ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রভৃতি এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১২২১ বঙ্গাব্দে সত্তর বছর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

নীলমণি মুখুটী—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে চাঁদ রায়ের দলে থেকে ডাকাতি করতেন। পরে নরোত্তম ঠাকুরের কৃপালাভে পরম বৈষ্ণব হন।

নীলরত্ন হালদার—সাহিত্য সেবক। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চুঁচুড়ায় জন্ম। পিতার নাম বাবু নীলমণি হালদার। সে যুগে 'বঙ্গদূত' নামে একখানি সাময়িক পত্র পরিচালনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁর রীতিমত অধিকার থাকায় তিনি বহু গান রচনা করে গিয়েছেন। ১৮৫৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ: কবিতা রত্নাকর, জ্যোতিষ, পরমায়ুঃ প্রকাশ, বহুদর্শন, দম্পতী শিক্ষা, সর্বামোদত-রঙ্গিণী, শ্রীশ্রীমহাদেব স্তোত্রং, শ্রুতিগান রত্ন, পার্বতী গীত রত্নং।

নীলাম্বর—চক্রধ্বজের পর নীলাম্বর কোচবিহারের কামতা রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। জানা যায় তিনি মৎস্য দেশ পর্যন্ত ভূভাগে

স্বীয় অধিকার বিস্তার করেছিলেন। তিনি রাজধানী কামতাপুর থেকে রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত চতুর্দিকে অনেকগুলি রাজপথ নির্মাণ করেন। রংপুরে উত্তরাঞ্চলের একটি পথ এখনো 'নীলাম্বরা সড়ক' বলে পরিচিত। রাজ্যের মধ্যে বহু দুর্গ নির্মাণ করে তিনি রাজ্য সুরক্ষিত করেছিলেন। রাজা নীলাম্বর কোচবিহার রাজ্যে বাণেশ্বর ও রংপুর জেলায় কোটেশ্বরের শিবমন্দিরদ্বয় নির্মাণ করেন। নীলাম্বরের রাজত্বকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

নীলাম্বর চক্রবর্তী—ইনি ছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য জননী শচীদেবীর পিতা। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। এঁর পূর্ব নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। পরে নবদ্বীপে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

নুরুদ্দিন, সৈয়দ—একজন মুসলমান গ্রন্থকার। চট্টগ্রামের হাট হাজারীর অধীন মির্জাপুর নামক গ্রামে এঁর বাসস্থান ছিল। ইনি ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি থেকে বাংলায় 'রাহাতুল কুল্লপ' নামক একখানা মুসলমান ধর্মগ্রন্থ এবং 'দাকায়েৎ' নামক একখানা মুসলমান সংহিতার বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন।

নুসরৎ শাহ—ছুটি খাঁ দ্রঃ।

নূরউদ্দিন নূর কুতুব আলম—একজন প্রসিদ্ধ পীর। পাণ্ডুয়ায় এঁর দরগা আছে। এই দরগাকে ছোট দরগা বলে। মখদুম সাহের দরগার নাম বড় দরগা। নূর কুতুব-আলম, আলাউল্ হকের পুত্র ও শিষ্য। ইনি রাজা গণেশের সময় বিদ্যমান ছিলেন। গণেশের পুত্র যদু এঁর নিকট মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কুতুব পরলোক গমন করেন।

নৃসিংহ—নৃসিংহ বা নরসিংহ নরোত্তম দত্তের শিষ্য ছিলেন বলে অনুমিত হয়। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের মানুষ। পদকর্তা নৃসিংহের একটি গৌরচন্দ্রিকা পদের নিদর্শন নিম্নরূপ,

"মধুর মধুর মধুর মঞ্জ
চারুবিমল কনককঞ্জ
ঝলমল বর উছল জ্যোতি
গৌর-বদন-ইন্দুয়া
বদন ছদন বিম্ব কাঁতি
নানা তুঙ্গ শুভগ ভাতি
রূপে জিতল ছদন কোটি
বচন অমৃত-সিন্ধুয়া।"

নৃসিংহ কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ভরতপুর কাঞ্চন-গড়িয়ার অধিবাসী। ইনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। বিখ্যাত খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

নৃসিংহ দেব—ইনি ছিলেন মানভূমের একজন রাজা এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইনি বাংলা ভাষায় কয়েকটি পদ রচনা করে কীর্তি অর্জন করেন। সারাবলী গ্রন্থে এঁর সম্বন্ধে লেখা আছে :

"আচার্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন।
মহাবিদ্বান্ কবি হরিভক্তিপরায়ণ॥
পূর্বপুরুষ হইতে মানভূমে স্থিতি।
পদকর্তা রাজা বলি সর্ব্বত্র যাঁর খ্যাতি॥"

এঁর কৌলিক উপাধি ছিল কবিরাজ। শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে ইনিও খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেন। 'পদকল্পতরু'তে এঁর রচিত দুটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ ইনি সংস্কৃত ভাষায়ও কবিতা রচনা করতেন।

নৃসিংহ পঞ্চানন ভট্টাচার্য—ইনি জানকীনাথ শর্মা বিরচিত 'ন্যায় সিদ্ধান্ত মঞ্জরী' গ্রন্থের 'ন্যায় সিদ্ধান্ত মঞ্জরীভূষা' নামে এক টীকা রচনা করেন। ইনি ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

নৃসিংহ ভাদুড়ী—অদ্বৈতপ্রভুর গৃহিণী সীতাদেবীর পিতা।

নৃসিংহ রায়—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের চন্দননগরের একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ও কবি সঙ্গীত রচয়িতা। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসডাঙার নিকটবর্তী গোন্দলপাড়া গ্রামে এঁর জন্ম হয়। ইনিও এঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা রাসু উভয়ে মিলে একটি কবির দল তৈরী করেন এবং শীঘ্রই খুব সুখ্যাতি অর্জন করেন। রাসু নৃসিংহ দ্রঃ।

নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর—কাটোয়ার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামের নিকটবর্তী রাজুব গ্রামের অধিবাসী। পিতার নাম কালীচরণ মিত্র। নৃসিংহ ছিলেন কীর্তনবিশারদ। ইনি যে সুরে কীর্তন করতেন, উহা মনোহরসাহী পরগণায় হয়েছিল বলে উহার নাম "মনোহরসাহী"। এঁর বংশে বহু খ্যাতনামা কীর্তন-গায়ক ও মৃদঙ্গ-বাদক জন্মগ্রহণ করেছেন।

নৃসিংহানন্দ—এঁর প্রকৃত নাম প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। ইনি শ্রীনৃসিংহ দেবের উপাসক ছিলেন বলে মহাপ্রভু এঁর নাম রেখেছিলেন 'নৃসিংহানন্দ'। ইনি মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী—আদি নাম 'প্রদ্যুম্ন'। মহাপ্রভু এঁকে এই নাম দিয়েছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর ভক্ত ও বিশেষ শক্তিধর পুরুষ ছিলেন।

নেয়াজ—চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

নোয়াজিস্ মহম্মদ—বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার জ্যেষ্ঠতাত এবং আলীবর্দী খাঁর জামাতা। আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগমের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়েছিল। ইনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। ইনি নামে মাত্র ঢাকার নবাব ছিলেন। এঁর এক প্রিয়পাত্র হোসেনকুলী খাঁই এঁর নামে ঢাকায় নবাবী করতেন। নোয়াজিসের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হোসেনকুলী এঁর গৃহের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন এবং ঘসেটি বেগমের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে

আবদ্ধ হন। নোয়াজিসের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একরাম্‌উদ্দৌলা নামক একজনকে পোষ্য নেন। তাঁর মৃত্যুতে ইনি সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন।

দুর্বলচিত্ত হলেও ইনি দাতা ও বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। আপামর সাধারণের নিকট তাঁর মতিঝিল প্রাসাদের বিরাট তোরণদ্বার উন্মুক্ত ছিল। ইনি ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত হন।

প

পক্ষধর মিশ্র—জয়দেব মিশ্র দ্র০।

পঞ্চানন কর্মকার—হুগলীর শ্রীরামপুর অঞ্চলের কর্মকার। উইল-কিন্স (চার্লস) সাহেব তাঁকে সীসা থেকে ছেনির সাহায্যে অক্ষর প্রস্তুত করবার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। এঁর নির্মিত মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলে তৎকালে বিশেষ আদৃত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে ইনি এই মুদ্রাক্ষর নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে পঞ্চানন এই কাজে দক্ষ হয়েছিলেন এবং এই পঞ্চানন ও তাঁর জামাই মনোহর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনেব সাহায্যে এদেশীয় বহু ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করেছিলেন। এখন পযন্ত বাংলাদেশে যে অক্ষর প্রচলিত তা পঞ্চানন ও মনোহর নির্মিত অক্ষরের আদর্শেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। মুদ্রণশিল্পের শুরুতে পঞ্চাননকে কেন্দ্র করে শ্রীরামপুরে একটি হরফ-কারখানা (টাইপ-ফাউণ্ড্রি) গড়ে উঠে।

পঞ্চানন দাস—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মজনু শাহ্‌ নামে উত্তর প্রদেশের এক ফকির বাংলায় এসে দলবল জুটিয়ে বাঙালী হিন্দুর উপর অত্যাচার করত। সেই ঘটনা নিয়ে পঞ্চানন দাস 'মজনুর কবিতা' নামক এক দীর্ঘ ছড়া রচনা করেছিলেন।

পট্টমিত্র—গঙ্গারাঢ়ীরাজ। পুষ্পমিত্রের পর পট্টমিত্র সমগ্র ভারতের অধিপতিরূপে মগধে রাজত্ব করেন। অবস্থিতিকাল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী।

পদ্মগর্ভাচার্য—ব্রাহ্মণ। উপাধি লাহিড়ী। ইনি মহাপ্রভুর মর্মিভক্ত শ্রীস্বরূপদামোদরের পিতৃদেব। নিবাস ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ভিটাদিয়া গ্রাম। ইনি "পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণভাষ্য" উপনিষদের দ্বৈতভাষ্য ও ক্রমদীপিকার টীকা প্রভৃতি রচনা করেছিলেন।

পদ্মনাথ দত্ত—পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি "সুপদ্ম" নামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন।

পদ্মনাভ মিশ্র—মহাপণ্ডিত বলভদ্র মিশ্রের পুত্র, মাতা বিজয়শ্রী। তিনি কাশীনিবাসী বাঙালী ছিলেন। এঁর অভ্যুদয়কাল ষোড়শ শতাব্দী। ভারতের সারস্বত ইতিহাসে এই মহা-

পণ্ডিতের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থে তাঁর সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যসূচক একটি বিশেষণপদ দৃষ্ট হয়,—

'সকল শাস্ত্রারবিন্দ প্রদ্যোতনভট্টাচার্য্য'

পদ্মনাভ মিশ্র রচিত গ্রন্থাবলী :

(১) কাব্যশাস্ত্রে 'বীরভদ্রদেবচম্পূ' —১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পৃষ্ঠপোষক বাঘেলবংশীয় মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ বীরভদ্রদেবের কীর্তিবর্ণনা। এছাড়া, তিনি আরও কয়েকটি কাব্য রচনা করেছিলেন।

(২) অলঙ্কারশাস্ত্রে 'শরদাগম'—জয়দেব-রচিত চন্দ্রালোকের উৎকৃষ্ট টীকা।

(৩) ধর্মশাস্ত্রে 'দুর্গাবতীপ্রকাশ'—গড়মণ্ডলের অধিরাজ্ঞী বীরাঙ্গনা রানী দুর্গাবতীর (১৫৪৮-৬৪ খ্রীঃ) নির্দেশে পদ্মনাভ সাত খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন।

(৪) বেদান্তে 'খণ্ডন পরাক্রম'।

(৫) ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের উভয় অংশ—প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়—পদ্মনাভের অদ্ভুত প্রতিভার বিলাসস্থল ছিল এবং তদ্বিষয়ে বহু টীকা ও নিবন্ধ রচনা করে তিনি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। (ক) ন্যায়কন্দলীসার (খ) কিরণাবলী ভাস্কর (গ) বর্ধমানেন্দু (ঘ) লীলাবত্যুন্নয়।

(৬). অনুমানমণি-পরীক্ষা, (৭) প্রত্যক্ষচিন্তামণি পরীক্ষা, (৮) শব্দ পরীক্ষা, (৯) ভূষণবিন্যাস, (১০) প্রত্যক্ষপক্ষধরোদ্ধার।

'দশকুমার চরিতে'র পরিশিষ্টের একটি অংশ পদ্মনাভের নামাঙ্কিত দেখা যায়। ঐ পদ্মনাভ এবং পদ্মনাভ মিশ্র একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না।

পদ্মসম্ভব—শান্তি রক্ষিতের ভগ্নিপতি বৌদ্ধ আচার্য। তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে ইনি শান্তি রক্ষিতের সঙ্গে তিব্বত গিয়েছিলেন। এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারে শান্তি রক্ষিতকে সাহায্য করেন। পরে পদ্মসম্ভব তিব্বত ত্যাগ করে অন্যান্য দেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

পদ্মাবতী—প্রসিদ্ধ কবি 'গীত গোবিন্দ'-রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর পত্নী।

পবনকুণ্ড—বাভটের টীকাকার। ইনি সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

পরমানন্দ কীর্তনীয়া—ইনি কাশীধামে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে থাকতেন এবং ভক্তগণকে কীর্তন শ্রবণ করাতেন। মহাপ্রভুর কাশী থেকে পুরীধামে গমন-সময়ে ইনি তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু এঁকে ঐ স্থানে থেকে কীর্তন করবার আজ্ঞা দিয়ে ঝারিখণ্ড পথে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

পরমানন্দ গুপ্ত—জয়ানন্দের

বর্ণনা থেকে জানা যায় যে পরমানন্দ গুপ্ত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইঁনি ছিলেন পরম কৃষ্ণ-ভক্ত ও নিত্যানন্দ-শিষ্য। নিত্যানন্দ এঁর গৃহে কিছুকাল বাস করেছিলেন। ইনি 'গৌরাঙ্গ বিজয় গীত' রচনা করেছিলেন। কবিকর্ণপুর জানিয়েছেন যে পরমানন্দ গুপ্ত 'কৃষ্ণস্তবাবলী' রচনা করেছিলেন। 'পরমানন্দ দাস'-ভণিতায় কয়েকটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া যায়। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের একজন সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে প র মা ন ন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গবিষয়ক কাব্যের অথবা পদাবলীর উল্লেখ আছে। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে "পরমানন্দ দাস" ভণিতার পদগুলি পরমানন্দ গুপ্তেরই হওয়া সম্ভব।

"পরশমণির সনে কি দিব তুল না রে
পরশ করিলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণ গাইয়া শুনিয়া রে
রতন হইল কত জানা॥"

পরমানন্দ চক্রবর্তী—'অমর কোষে'র টীকাকার। এঁর টীকার নাম 'মালা'। এঁর জীবনকাল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে বলেই অনুমিত হয়। ইনি ছিলেন ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণার সালিকনি গ্রাম নিবাসী।

পরমানন্দ চক্রবর্তীর নামে 'কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা' নামক গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। এঁর গুরুর নাম ঈশানাচার্য। ইনি 'অমর কোষে'র 'মালা' নামক টীকার রচয়িতা পরমানন্দ থেকে অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

পরমানন্দ পুরী—এঁর জন্মস্থান ছিল তিরোতে (ত্রিহুতে)। ইনি ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু পথে এঁর চরণ বন্দনা করেন। গৌরাঙ্গের গৌড় গমন কালে পরমানন্দ পুরীও তাঁর সঙ্গীরূপে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর অনুরোধে ইনি নীলাচলে এসে তাঁর সঙ্গে বাস করতেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও পরমানন্দপুরী নীলাচলে ছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। জয়ানন্দ পরমানন্দপুরীর লিখিত ৫ টি গ্রন্থের উল্লেখ করে জানিয়েছেন —"সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ গোবিন্দ বিজয়।" পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে পরমানন্দ বিদ্যমান ছিলেন।

পরমানন্দ ভট্টাচার্য—বৃন্দাবনে বসবাসকারী গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে পরমানন্দ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বৃন্দাবনে যতগুলি নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার মধ্যে গোবিন্দ, গোপাল এবং গোপীনাথের বিগ্রহই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পরমানন্দ ভট্টাচার্য। সনাতন গোস্বামীর নিজ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে ব্রজমণ্ডলে পরমানন্দের স্থান ছিল অতি উচ্চে। 'পরমানন্দ দাস' ভণিতায় যে সব ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায় তার কিছু কিছু এই পরমানন্দ ভট্টাচার্যেরই রচিত। পরমানন্দের এক সহযোগী ছিলেন। তাঁর নাম মধু পণ্ডিত। পরমানন্দ ছিলেন মধু পণ্ডিত অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ইনি তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

পরমানন্দ সেন—কবি কর্ণপূর দ্র°।

পরমেক্ষু—বৈদিক যুগের যযাতি-নন্দন প্রাচীন বঙ্গের কলিঙ্গরাজ অনুর পুত্র। ইনি সাগরদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে তথায় রাজা হন।

পরমেশ্বর দাস—নিত্যানন্দের শিষ্যবৃন্দের অন্যতম। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ নীলাচল ত্যাগ করে গৌড়ে গেলে পরমেশ্বর দাসও গৌড়ে যান এবং সেখানে তাঁর একজন প্রধান সঙ্গী হিসাবে অবস্থান করেন। পরমেশ্বর দাস প্রথমে পানিহাটি-খড়দহ অঞ্চলে বাস করতেন।

রঘুনাথ দাসের চিঁড়াদধি-মহোৎসব কালে ইনি যোগদান করেছিলেন। জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে খেতুরি মহোৎসবে যোগদান করার পর ইনি বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে পরমেশ্বর দাস দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বলে স্বীকৃত। ইনি পরম ভক্ত ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ইনি সম্ভবত তড়া-আটপুরে বাস করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইনি কয়েকটি পদের রচয়িতা।

পরমেশ্বর দাস—কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস দ্র°।

পরমেশ্বর মোদক—'চৈতন্য চরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে নদীয়াতে ইনি মোদক বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। গৌরাঙ্গ প্রভু বাল্যকালে তাঁর বাড়ীতে গেলে 'দুগ্ধখণ্ড মোদক দেন প্রভু তাহা খান'। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইনি একবার মুকুন্দার মাতাকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে চৈতন্য-দর্শনে গিয়েছিলেন। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

পরমেশ্বর রক্ষিত—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম গণাধ্যায়। ইহা একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ। জীবিতকাল সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী।

পরমেশ্বরী দাস—ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁর আদেশে "তড়াআটপুর" গ্রামে শ্রীরাধা-গোপীনাথ (শ্যামসুন্দর) বিগ্রহ স্থাপন

করেছিলেন। পরমেশ্বরী দাস জাতিতে ছিলেন বৈদ্য এবং তাঁর নিবাস ছিল কাউগ্রামে।

পরশুরাম—নরসিংহ বা পরশুরাম দ্র°।

পরশুরাম চক্রবর্তী—এঁর রচিত কাব্যের নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল'। এই গ্রন্থের কোন কোন পালার পুথি পশ্চিমবঙ্গে খুবই সুলভ। সম্পূর্ণ পুথি নিতান্ত দুর্লভ। একটি পুঁথি উত্তর বঙ্গের বগুড়া অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। "ঘবের ঠাকুর বন্দো শ্রীরঘুনন্দন"—থেকে মনে হয় কবি শ্রীখণ্ডের শিষ্য ছিলেন। কবি লিখেছেন যে তিনি স্বপ্নে ব্যাসের আদেশ পেয়ে কাব্য বচনা কবেছিলেন।

"দ্বিজ পরশুবামে গায় ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নেকৃপা কৈলযাবে ব্রাহ্মণেব বেশে॥"

কাব্যটিতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড কাহিনী আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো এখানেও রাধা চন্দ্রাবলী। পবশুবাম চক্রবর্তী "বিপ্র" পরশুবাম নামেও পবিচিত। গ্রন্থ বচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। ইনি বীরভূম অঞ্চলেব অধিবাসী ছিলেন।

অপর এক স্বতন্ত্র পবশুরামের নাম পাওয়া যায়। ইনি 'মাধব সঙ্গীত' গ্রন্থেব বচয়িতা। এই কাব্যেব পুঁথির লিপিকাল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই পরশুরামের নিবাস ছিল চম্পক-নগরী (বর্ধমানের পশ্চিম অংশে চাঁপাই নগর?)। পিতার নাম মধুসূদন রায়। এঁরাও ব্রাহ্মণ, তবে চক্রবর্তী নয়।

পরাগল খান—আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সমসাময়িক। ইনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচিত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর রচিত মহাভারতে লিখেছেন, পরাগল খান হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলের লস্কর নিযুক্ত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম জেলাব 'পরাগলপুর' নামে একটি গ্রাম এখনও এঁর স্মৃতি বহন করছে। হুসেন শাহেব নির্দেশে পরাগল খানের আজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কবেছিলেন।

পরাণ দাস—কবিব পূর্ণনাম প্রাণবল্লভ। এঁব রচিত 'রসমাধুরী' ব্রজলীলা বিষয়ক বৃহত্তম কাব্য। কাব্যেব রচনাকাল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। কবি ছিলেন ব্যাস-আচার্যের বংশধর বা শিষ্যবংশীয়। গ্রন্থশেষে কবি লিখেছেন:

'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বিদগ্ধমাধব
তাব ছায়া দেখি লিখি করি অনুভব।
মহাজনের গীতপদ্য দেখিয়া দেখিয়া
লিখিয়ে গোবিন্দলীলা আপন বুঝায়া।
শ্রীব্যাস-আচায ঠাকুব পাদপদ্ম ধ্যান
রসের মাধুরী কহে এ দাস-পরাণ।"

পরাণ শাহ—একজন অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন পীর। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল

এমনির অনুসঙ্গী অন্যতম দরবেশ ছিলেন। শ্রীহট্টের দক্ষিণস্থ কাছাড় পরগণার শাহপরাণ গ্রামে ইনি বাস করতেন।

পরীক্ষিৎ শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সুলতান, রাজা—ইনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণগড়ের দ্বাবিংশতিতম রাজা ছিলেন। ইনি ১৭৬১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত রাজত্ব করেন। এঁর সময় একদিকে মারাঠাদেব উপদ্রব অন্যদিকে চুয়াড জাতীয় ডাকাত গোবর্ধন দিকপতির উৎপাতে রাজ্যের অতিশয় ক্ষতি হয়েছিল।

পশুপতি—ব্রাহ্মণসর্বস্ব-প্রণেতা বিখ্যাত গ্রন্থকার, হলায়ুধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি 'পশুপতি পদ্ধতি' (শ্রাদ্ধাধিকৃত্য) নামে এক পুস্তক রচনা করেন। এই পশুপতি লক্ষ্মণসেনের শেষাবস্থায় মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বরচিত 'দশকর্মদীপিকা'র আরম্ভে পশুপতি রাজপণ্ডিত বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী। ইনি পাকযজ্ঞ সম্বন্ধেও একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

পাণ্ডু দাস—দশম শতাব্দীতে পাণ্ডু দাস ছিলেন ভূরশুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠীপতি। এঁরই আশ্রয়ে ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্য "ন্যায়কন্দলী" রচনা করেন। এই মহাসামন্ত কায়স্থ দাসবংশের খ্যাতিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অপর সকল নৃপতির গৌরব যেন মলিন হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ রাঢ়পতি যামিনীভানু তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠীপতি পাণ্ডুদাসের শাসনকালে দক্ষিণরাঢ়ে বহু পণ্ডিতের সমাগম হত। সেই সময় ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। চান্দেল্ল রাজকবি কৃষ্ণমিশ্র রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এই রাজ্যেব রাজধানীকে এক ঐশ্চযশালী নগরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দাস অধিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরী স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র চর্চার এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

পাণ্ডু বাসুদেব—লঙ্কা বিজয়া সিংহ বাহুব ভ্রাতুষ্পুত্র। সিংহ বাহুর মৃত্যুর পর ইনি লঙ্কার রাজা হয়েছিলেন।

পাথর হাজঙ্গ—ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর পরগণার অন্তর্গত পাহাড়িয়া অঞ্চলে গারো হাজঙ্গ প্রভৃতি অসভ্য জাতিদের বাস। ঐ অঞ্চলে পাথর হাজঙ্গের বাস ছিল। এঁর দেহ ছিল পাথরের মতো শক্ত, শক্তি ছিল অসীম। ইনি পুরীধামে গিয়ে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হন। নিত্যানন্দপ্রভু এঁর অভূতপূর্ব ভক্তির নিদর্শন দেখে এঁকে দীক্ষা প্রদান করেন এবং এঁর নাম রাখেন 'জগন্নাথ দাস'। অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

পান্নুয়া গোপাল (পর্ণিগোপাল)—বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামের ঠাকুর-বংশের আদি পুরুষ। চৈতন্য

মহাপ্রভুর পার্ষদ সুন্দরানন্দগোপালের শিষ্য। পাম্নুয়ার পূর্বনাম গোপালচন্দ্র। পান বিক্রয় করে ইষ্টদেবের সেবা করতেন বলে 'পান্নুযা' বা 'পর্ণিগোপাল' নাম। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

পাম হেইবা—মণিপুরের রাজা। এঁর অন্য নাম করিমনওয়াজী। ১৭১৪ সালে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের ইনি সমসাময়িক। যে সময় ধর্মমাণিক্য মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় সীমান্তবর্তী একদল ত্রিপুর সৈন্য পরাস্ত করে পাম হেইবা 'ত্রিপুরা বিজয়ী' উপাধি গ্রহণ করেন। এঁরই সময় শ্রীহট্টের গোঁসাইগণ মণিপুরে প্রবেশ করে মণিপুরীদিগকে মহাভারতোক্ত বভ্রুবাহনের বংশধর বলে প্রচার করেন। এরপর মণিপুরের রাজা এবং মণিপুরীরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

পামার, জন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জেনারেল পামারের পুত্র। সেকালের ইংরেজ ব্যবসাদারদের মধ্যে ইনি প্রধান ছিলেন। এঁর আবাসস্থান ছিল লালবাজারে। টাউন হলে এঁর একটি প্রতিমূর্তি আছে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়, আর মৃত্যু হয় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে।

পার্থ সারথি মিশ্র—বিখ্যাত মীমাংসা শাস্ত্রকার। ইনি জৈমিনি সূত্রের উপর 'শাস্ত্রদীপিকা' নামে একটি টীকা রচনা করেন। তাছাড়া, ইনি মীমাংসা বার্তিকের উপর 'ন্যায়রত্নাকর' নামে একটি টীকাও রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।

পার্বতী চরণ রায়—ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশীয় রাজা নরপতি রায়ের অধঃস্তন নবম পুরুষ ও মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পাঁচথুপীর রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি তৎকালীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করে প্রচুর ধন সম্পত্তি ও নবাব দরবার থেকে 'রায়' উপাধি পেয়েছিলেন। ইনি যথেষ্ট অর্থব্যয়ে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও জলাশয়াদি খনন করে সুনাম অর্জন করেন। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে অকালে দেহত্যাগ করেন।

পালকাপ্য (ঋষি)—মুনি সামগায়ন ও এক করেণুর গর্ভে এঁর জন্ম। হাতাই ছিল এর আবাল্য সঙ্গী—হাতীর সঙ্গে বেড়াতেন, হাতীর সঙ্গে খেতেন, হাতীর সেবা করতেন, অসুখ হলে চিকিৎসা করতেন। ইনি এক রকম হাতীই হয়ে গিয়েছিলেন। হাতীরাও এঁকে ভালবাসত। ইনি হাতীদের পালন করতেন বলে এঁর নাম পাল, আর কাপ্য গোত্রে এঁর জন্ম বলে এঁর আর এক নাম কাপ্য। লোকে বলত পালকাপ্য। পরবর্তীকালে ঋষি পালকাপ্য হস্তী চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। চম্পা নগরীতে অঙ্গ দেশের রাজা

রোমপাদের নিকট ইনি হস্তী পালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করতেন। ঐ সব আলোচনা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এঁর ঐ রচিত গ্রন্থের নাম 'হস্ত্যায়ুর্বেদ'। উহা চার খণ্ডে ও ১৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ঋষি পালকাপ্যের আশ্রম ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে গ্রন্থখানি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। অন্যান্যদের মতে ইহা খ্রীষ্টপর যুগে রচিত। অমরকোষ, অগ্নিপুরাণ ও কালিদাসের রঘুবংশে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

পিয়ার্স, ডবলিউ. রেভারেণ্ড—একজন পাদরী। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ইনি 'ভূগোল বৃত্তান্ত' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৮ সালে স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক উহা প্রকাশিত হয়েছিল। এতে পৃথিবীর আকার ও গতির বিবরণ এবং এশিয়া, ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সার সংগ্রহও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছিল। তাছাড়া, বাক্যাবলী, নীতিকথা প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ এঁর রচিত।

পীতাম্বর—ইনি কোচবিহারের রাজা সমর সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এঁর রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দেখতে পাওয়া যায়।

পীতাম্বরদাস চৌধুরী—'রসকল্পবল্লী'-রচয়িতা শ্রীখণ্ড-নিবাসী বৈদ্য রামগোপাল দাসের পুত্র এবং শ্যামরায়ের পৌত্র। পিতার রচিত 'অষ্টরস' অবলম্বনে ইনি বাংলায় অষ্টরস ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। পীতাম্বরের অপর নিবন্ধ হচ্ছে পিতার রসকল্পবল্লীর অষ্টম কোরক ("নায়িকা বিভাগ") অবলম্বনে 'রসমঞ্জরী'। ইনি সপ্তদশ শতাব্দের কবি। ইনি শচীনন্দন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ বা **কালী শিরোমণি**—বিখ্যাত বাঙালী বেদব্যাখ্যাতা। বেদমীমাংসা সম্বন্ধে ইনি অসংখ্য নিবন্ধ প্রণয়ন করেছেন। অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

পীতাম্বর মিত্র—ভারতের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ। ইনি ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব আলীবর্দীর রাজত্বকালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরিসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের একজন সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট একে রাজা উপাধির সঙ্গে দশসহস্র মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক করে দেন। এবং এলাহাবাদ শহরের নিকটস্থ "কড়ার" সুদৃঢ় দুর্গ ও নগর জায়গীরস্বরূপ দান করেন। অযোধ্যার

নবাব আসফউদ্দৌলার সঙ্গে রাজা পীতাম্বরের বিশেষ সখ্যতা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পীতাম্বর সামরিক কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন।

পীতাম্বর রায়—উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার পুঁটিয়ার জমিদার। এঁর পিতা ঋষিকল্প নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বৎসরাচার্য মোগলের সাহায্য করায় তাঁর প্রতি মোগল প্রতিনিধি বিশেষ খুশী হন এবং পুত্র পিতাম্বরকে "রায়" উপাধিতে ভূষিত করে পুঁটিয়ার জমিদারী দান করেন। সম্রাটের সহায়তায় পীতাম্বর ক্রমে বিশেষ শক্তিশালী বড় জমিদার হয়ে উঠেছিলেন। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা।

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ—প্রথমে গৌড় রাজসভার সভাপণ্ডিত, পরে কামতাপুরের প্রখ্যাত মহারাজা নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত হন। রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজ কর্তৃক ইনি গৌড় দরবার থেকে কামতাপুরে আনীত হয়েছিলেন। পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 'জগদ্‌গুরু' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং রাজা এঁকে রাজসভার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছিলেন। পীতাম্বর 'কৌমুদী' নাম দিয়ে অনেকগুলি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা এবং সংস্কৃত ভাষার বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এঁর বংশধরগণ আজও আসামের মঙ্গলদই মহকুমার অন্তর্গত 'সরাবাড়ী' নামক গ্রামে বাস করছেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ শ্রাদ্ধকৌমুদী, তিথিকৌমুদী, বিবাহকৌমুদী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

মহাভারতের নলদময়ন্তী-কাহিনী অবলম্বনে পীতাম্বর একটি পাঁচালী কাব্য 'নলদময়ন্তী চরিত্র' রচনা করেছিলেন।

পুণ্ডরীক—উড্ডিয়ানের একজন গ্রন্থাকার। ইনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলেও কথিত। 'আর্য-মঞ্জুনাম-সংগীতি-টীকা'র উপর ইনি 'বিমলপ্রভা' নামে একখানি টীকা রচনা করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী। এর নামান্তর ছিল জ্ঞানবজ্র।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার। গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের সঙ্গে এঁর বিশেষ সখ্য ছিল। ইনি নবদ্বীপে বাসস্থান নির্মাণ করেন। এবং মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষিত হন। এঁর পত্নীর নাম ছিল রত্নাবতী। পুণ্ডরীক মাঝে মাঝে নবদ্বীপে এসে বাস করতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা প্রকটের পর তথায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। পুণ্ডরীক মহাবিষয়ীর মতো অবস্থান করতেন। এঁর বেশভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছদ যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। ইনি সর্বদা দাসদাসী ও শিষ্যভক্তদিগের

দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন। কিন্তু এঁর দিন কাটত পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে। গদাধর পণ্ডিত দু'বার এঁর নিকট দীক্ষা লাভ করেছিলেন। গৌরাঙ্গ এঁকে 'প্রেমনিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্তনে এবং জগাই-মাধাই উদ্ধারেও পুণ্ডরীককে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণ-লীলা নাটকাভিনয়কালে পুণ্ডরীক একজন গায়নের কাজ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌছলে পুণ্ডরীক উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইনি প্রতিবছর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গৌরাঙ্গের নীলাচল লীলার সঙ্গে যুক্ত হতেন। নীলাচলের সমুদ্রতটে যমেশ্বর টোটায় পুণ্ডরীক অবস্থান করতেন। সেখান থেকে বন্ধু দামোদরের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যেতেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর—এঁর পিতা শ্রীকান্ত পণ্ডিত। এঁর পিতামহের নাম রত্নাকর। অনেকে এঁকে বাসুদেবের পিতৃব্যপুত্র বলে মনে করেন। এঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দী। পুণ্ডরীকাক্ষ তাঁর পিতার উপদেশ অনুসারেই গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কাতন্ত্রপ্রদীপে ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যায়, কারক প্রকরণে এবং ভট্টিটীকায় 'অস্মৎ পিতৃচরণাঃ' বলে তাঁর মত উদ্ধৃত হয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থকার পুণ্ডরীকাক্ষকে 'মহান্ত' বলে সম্মান দেখিয়েছেন। নব্যন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থগুলির নাম: চণ্ডীর টীকা, কাতন্ত্রপ্রদীপ, ন্যাসটীকা, কারককৌমুদী, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, কলাপদীপিকা, কাব্যপ্রকাশিকা, কাব্যাদর্শদীপিকা কাতন্ত্র পরিশিষ্টের টীকা প্রভৃতি রচনা করেছিলেন।

পুতলি—বঙ্গাল দেশীয় শূদ্র এবং চুরাশি সিদ্ধের অন্যতম। পাল রাজত্বকালে ইনি অবস্থান করছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় এঁর রচিত গ্রন্থ 'বোধিচিত্ত-বায়ুচরণ ভাবনোপায়' বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থটি তিব্বতীয় অনুবাদে রক্ষিত আছে।

পুরন্দর আচার্য—শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত পার্ষদ। মহাপ্রভু এঁকে 'পিতৃ' সম্বোধন করতেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

পুরন্দর খাঁ—বাংলার পাঠান-রাজ হোসেন শাহের একজন প্রধান মন্ত্রী। ইনি ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভব ও মাহীনগর সমাজের বসুবংশের উজ্জ্বল রত্ন। এঁর জন্মস্থান বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত, চণ্ডীতলা থানার অধীন সেয়াখালা গ্রাম। পুরন্দরের প্রকৃত নাম

গোপীনাথ। কিন্তু নবাব সরকারে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হয়ে পুরন্দর খাঁ নামে সুপরিচিত হন। এঁর পিতার নাম ঈশান এবং পিতামহের নাম সুবুদ্ধি খাঁ। পুরন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ (গন্ধর্ব খাঁ) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণবল্লভও (সুন্দরবর খাঁ) নবাব দরবারে উচ্চ পদ পেয়েছিলেন। পুরন্দরের আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ইনি তৎকালীন রাজভাষা পারসীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য সেবীদের ইনি সমাদর করতেন। কবিতা রচনায় পুরন্দর নিপুণ ছিলেন। ইনি উদারচেতা, দূরদর্শী, সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও রাজনীতিকুশল ছিলেন।

পুরন্দর পণ্ডিত—এঁর নিবাস ছিল সম্ভবত খড়দহে। ইনি ছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত। ইনি প্রথমবারে ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেছিলেন। নিত্যানন্দ বাংলাদেশে ফেরবার কয়েক মাস পরে খড়দহে 'পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে' নৃত্য-কীর্তন করেছিলেন। মহাপ্রভু রামকেলি থেকে কুমারহট্টে গিয়ে শ্রীবাস আলয়ে এবং পাণিহাটীতে গিয়ে রাঘব-মন্দিরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইনি মাঝে মাঝে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করতেন। পুরন্দর গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

পুরীদাস—কবি কর্ণপুর বা পরমানন্দ সেনকে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীদাস নামেও অভিহিত করেছিলেন। পরমানন্দ সেনের পিতা শিবানন্দ সেন এক রথযাত্রার সময় সস্ত্রীক নীলাচলে গমন করেন। তথায় শিবানন্দের পত্নী ঋতুমতী হলে শিবানন্দ মহাসমস্যায় পতিত হন। কেননা তীর্থস্থানে স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ অথচ ঋতুকালে রোগাদি প্রতিবন্ধক না থাকলে পত্নীর ঋতু রক্ষা না করারও প্রত্যবায় দেখা যায়। শিবানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েও লজ্জাহেতু শ্রীমহাপ্রভুর নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ চাইতে পারেননি। কিন্তু অন্তর্যামী মহাপ্রভু মনোগত সমস্যার বিষয় স্বয়ং অবগত হয়ে শিবানন্দের সন্দেহ দূর করার জন্য তাঁকে বলেন,

"এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিও তাহার॥"

পরমানন্দ সেন দ্র০।

পুরুষোত্তম—কবি পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত অপর নাম "প্রেমদাস"। এঁর পিতার নাম গঙ্গাদাস এবং নিবাস ছিল নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে। গঙ্গাদাস বৃন্দাবনবাসী হয়ে সেখানে গোবিন্দ মন্দিরের পৌরোহিত্য করতেন। পুরুষোত্তম কতকগুলি বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, "বংশীশিক্ষা" ও কবি কর্ণপূরের "চৈতন্যচন্দ্রোদয়"

নাটকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। "বংশীশিক্ষা" রচনাকাল ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ।

পুরুষোত্তম আচার্য—স্বরূপ দামোদরের পূর্বনাম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'রসরূপতা' প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে স্বরূপ-দামোদর নামে কথিত হন। স্বরূপ-দামোদর দ্রঃ।

পুরুষোত্তম তর্কালঙ্কার—ইনি পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি প্রণয়ন করেন। ঐ বৃত্তি 'ভাষাবৃত্তি' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি রাজশাহীর বুডীরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পুরুষোত্তম দত্ত—খেতুরির প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য নরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতাত। ইনি গৌড়ের রাজ সরকারে কাজ করতেন। এই পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্ত ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে খেতুরির প্রসিদ্ধ উৎসব হয়।

পুরুষোত্তম দাস—সদাশিব কবিরাজের পুত্র। পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম দাস, নাগর পুরুষোত্তম, নাগর পুরুষোত্তম দাস, পুরুষোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি এঁর অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন একজন পদকর্তা। এঁর অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।

'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে এঁকে 'বৈষ্ণব বন্দনা' রচয়িতা দেবকীনন্দনের গুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি নাকি সাত বছর বয়সে কৃষ্ণরূপ ধারণ করে সংকীর্তন করেছিলেন। নিত্যানন্দ সমক্ষে এঁর অভিষেক হয়েছিল। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর পুত্রের নাম কানু ঠাকুর। এঁর নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিশহর। ইনি জাতিতে বৈদ্য। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

পুরুষোত্তম দেব—বাঙালী বৌদ্ধ ও প্রসিদ্ধ শাব্দিক। এঁর রচিত প্রধান গ্রন্থ 'ত্রিকাণ্ড-শেষ'। এই গ্রন্থখানি অমরসিংহ বিরচিত অমরকোষ গ্রন্থের পরিশিষ্ট। অমর সিংহ ষষ্ঠ শতকে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পাঁচ শত বছর পরে অর্থাৎ একাদশ শতকে পুরুষোত্তমের 'ত্রিকাণ্ড কোষ' রচিত হয়। এই দীর্ঘ পাঁচ শত বছরের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে বহু নূতন শব্দ সংযোজিত হয়েছিল। ত্রিকাণ্ড শেষ গ্রন্থে পুরুষোত্তম তা সংগ্রহ করে অমরকোষ গ্রন্থকে তৎকালের উপযোগী করেছিলেন। পুরুষোত্তমের আর এক গ্রন্থ 'ভাষাবৃত্তি'। পাণিনির স্বরের ও বেদের সূত্রগুলি বাদ দিয়ে শুধু ভাষার যে সূত্রগুলি, সেই গুলির উপর লঘুবৃত্তি দিয়ে ভাষাবৃত্তি রচিত হয়েছে। বাংলার উত্তর অংশে বৌদ্ধ পালবংশীয় রাজাদের খুব প্রভাব ছিল। সেজন্য ঐ অঞ্চলে ভাষাবৃত্তি অনেককাল প্রভাব বিস্তার করেছিল। উহার অনেক টীকা-টিপ্পনী রচিত হয়েছিল।

সংস্কৃতের বানান ঠিক করে দিয়ে ইনি আর এক কীর্তি স্থাপন করেছেন।

এঁর রচিত বর্ণদেশনা দ্বিরূপ কোষ, একাক্ষর কোষ, সংবলিত 'হারাবলী' অভিধান অতি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থের এক এক অংশে এক একখানি পৃথক গ্রন্থ বলে প্রচারিত হয়েছে। এই হারাবলী অভিধান সংকলনে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বছর এঁকে নানাস্থানে ভ্রমণ করতে ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাছাড়া, 'জ্ঞাপক সমুচ্চয়' ও 'উণাদি বৃত্তি' নামে এঁর আরও দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে।

পুরুষোত্তম দেব—চট্টগ্রাম অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় এক হিন্দু রাজবংশের রাজা। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে রাজত্ব করতেন।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—খুব সম্ভব অদ্বৈত মহাপ্রভুর খ্যাতিমান শিষ্য। 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে পুরুষোত্তম পণ্ডিত অদ্বৈত প্রভুর বড়শাখা ছিলেন এবং কামদেব ছিলেন ছোট শাখা। গ্রন্থকার লিখেছেন:

"এই দুই শিষ্য প্রভুর নীলাচলে।
দুই বাহু দুইজন প্রভু তারে বলে॥"

এবং মহাপ্রভু নীলাচলে এঁদের শিক্ষাদান করেছিলেন। তারপর এঁরা চৈতন্য-আজ্ঞায় গৌড়ে পৌছলে অদ্বৈত প্রভু এঁদের তাঁর দুই হস্তস্বরূপ গ্রহণ করেন। কামদেব পরে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু পুরুষোত্তম পণ্ডিত এঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অদ্বৈত প্রভুর একান্ত অনুরাগী ভক্ত হিসাবে অবস্থান করেন। ইনি খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

পুরুষোত্তম (বড়জানা)—উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের বত্রিশ জন পুত্রের অন্যতম। প্রতাপরুদ্রদেবের জীবিতাবস্থাতেই পুরুষোত্তম পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন (সম্ভবতঃ ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে)। যথাবিধি মঙ্গলানুষ্ঠানসহ প্রতাপরুদ্র স্বয়ং একে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং প্রতাপরুদ্র, বাসুদেব সার্বভৌম ও রায়রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্য চরিত্র-কীর্তন ও কৃষ্ণ গুণগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভক্তের মতো নির্জনে দিন যাপন করতেন। সিংহাসনে আরোহণের পর পুরুষোত্তম পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজকর্ম পরিচালনা করতেন। মহাপ্রভু প্রথমে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দান করতে রাজী হননি। শেষে রায় রামানন্দের অনুরোধে পুত্রপুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলিত হবার প্রস্তাব করেছিলেন। মহাপ্রভুর যুক্তি ছিল: 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র'। পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেই রাজা উহাকে আপনার সঙ্গে মিলন বলেই অনুভব করতে পারবেন। মহাপ্রভুর সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পুরুষোত্তমকে তাঁর সামনে আনা হয়। পুরুষোত্তম কিশোর বয়স্ক ও রূপবান ছিলেন। পীতবস্ত্র পরিহিত নানা রত্নাভরণ-ভূষিত রাজপুত্রকে

সম্মুখে দেখে মহাপ্রভুর মনে কৃষ্ণ-স্মৃতি জেগে উঠে। তিনি কিশোরকে বাহু-বন্ধনে আলিঙ্গন দান করেন। পরে রাজপুত্রকে বক্ষে ধারণ করে প্রতাপরুদ্র জীবন সার্থক মনে করেন। পুরুষোত্তম আজীবন চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে মূর্তিমান ঈশ্বর-রূপে জ্ঞান করতেন।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ—ইনি বঙ্গের সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ-সেনের মন্ত্রী হলায়ুধের বংশধর জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি 'প্রয়োগ রত্নমালা', মুক্তিচিন্তামণি', বিষ্ণুভক্তি কল্পলতা', প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'প্রবোধ প্রকাশ' নামক গ্রন্থ প্রণেতা বলরাম এঁরই পুত্র। এঁর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর কোচবিহারের খাসবাগী থেকে কলকাতায় এসে বাস করেন। সাহেবরা এদের ঠাকুর বলত বলে এঁরা ঠাকুর নামেই খ্যাত হন। জোড়া সাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুর পদবীধারী ভূম্যধিকারীরা এঁরই বংশধর। পুরুষোত্তম প্রথমে গৌড়রাজের ও পরে কুচবিহার কামতাপুরের মহারাজা নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পুষ্পমিত্র—মৌর্য রাজগণের গঙ্গারাঢ়ী সেনাপতি। সমগ্র ভারতের গঙ্গারাঢ়িগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে পরাজিত ও নিহত করে মগধ অধিকার করেন। পরে গঙ্গারাঢ়িগণের বীরত্বপূর্ণ অভিযানে সমগ্র ভারত তাঁর করায়ত্ত হয়। অন্যান্য গঙ্গারাঢ়ি রাজাদের ন্যায় ইনিও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ইনি ছিলেন বঙ্গের শুঙ্গবংশোদ্ভূত।

পূর্ণচন্দ্র—ইনি বিক্রমপুরের চন্দ্র-বংশজাত। ইনি পালরাজাদের সময়ে (আঃ একাদশ শতাব্দী) রাজত্ব করতেন। ইনি ছিলেন আধুনিক রোটাস্ নগরের রাজা। 'গোরক্ষ বিজয়ে'র রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ এঁরই বংশধর। পূর্ণচন্দ্র বহু জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন এবং অনেক দেববিগ্রহের পাদপীঠে এঁর নাম উৎকীর্ণ ছিল।

পূর্ণবর্ধন—ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের সময়ে প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলার বৌদ্ধ বিহারে অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

পূর্ণ সেন—ইনি বররুচিকৃত যোগশতকের টীকাকার। কোন কোন মতে এঁর নাম জগদানন্দ সেন এবং মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করে কামাখ্যাতীর্থে পূর্ণাভিষেককালে ইনি 'পূর্ণানন্দ পরমহংস' নাম গ্রহণ করেন। এঁর যোগচিন্তামণি, শ্যামারহস্য ও ককারকূট অর্থাৎ ককারাদি কালীসহস্র নাম তান্ত্রিক

সম্প্রদায়ে সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের শিষ্য। ইনি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তী—গৌড় পূর্ণানন্দ নামেও পরিচিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ তত্ত্বমুক্তাবলী ও মায়াবাদ। এইগুলিতে তাঁর গভীর শ্রৌতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর গ্রন্থের কিয়দংশ চতুর্দশ শতাব্দীর সর্বদর্শন সংগ্রহে উদ্ধৃত হয়েছে। ইনি সম্ভবতঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক।

পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস পরিব্রাজক—একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণার অন্তর্গত কাটিহালী গ্রামে তাঁর আবির্ভাব হয়। এঁর অপর নাম জগদানন্দ। ইনি কামাখ্যাপীঠ উদ্ধার করেছিলেন। এঁর বংশ বর্তমানে পূর্ণানন্দ বংশ নামে খ্যাত। এঁর গুরু ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। এঁর সময়ে ময়মনসিংহ জেলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হয়। পূর্ণানন্দ "শাক্তক্রম", "শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি", "শ্যামারহস্য", "তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিণী" 'ষট্‌কর্মোল্লাস', 'কালীসহস্রনামস্তুতিরত্ন' টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত পূর্ণানন্দের স্বহস্ত লিখিত একখানা বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থও পাওয়া গিয়েছে। ইনি কিছুকাল মণিপুরে থেকে সে-দেশে তান্ত্রিক ধর্মের প্রচার করেন।

পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী, রাজা—মুর্শিদাবাদ জেলার পাকুড়ের অন্যতম ভূম্যধিকারী। এঁর পিতার নাম বৈদ্যনাথ। পৃথ্বীচন্দ্র 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। পুরাণের অনুকরণে রচিত। পাঁচখণ্ডে ও চারশো উনিশ অধ্যায়ে শেষ হয়েছে। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। এঁর রচিত অপর গ্রন্থ 'ভূষণ্ডী রামায়ণ'।

পৌণ্ড্র বাসুদেব—ইনি এখন থেকে সাড়ে-তিন হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ মহাভারতের যুগে বরেন্দ্রভূমি বা পুণ্ড্রের অধিপতি ছিলেন। ইনি নিষাদরাজ একলব্য ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ নরকের বন্ধু ছিলেন। ইনি দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণবাসুদেবের নেতৃত্ব অস্বীকার করায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধে। পৌণ্ড্রবাসুদেব আট সহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে দ্বারকার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর পত্নী সুতনুর গর্ভজাত পুত্র পুণ্ড্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—শ্রীশ্রী-চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বৈদান্তিক ও চৈতন্যদ্বেষী। ইনি দশনামী সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপশাখা 'সরস্বতী' সম্প্রদায়ভুক্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। কাশীধামে শিষ্যপরিবৃত হয়ে অদ্বৈততত্ত্বালোচনায় কালাতিপাত করতেন।

প্রগল্‌ভাচার্য—প্রগল্‌ভের

অপর নাম ছিল শুভঙ্কর এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পিতামহ অনিরুদ্ধেরও এক পৌত্র ছিলেন বিখ্যাত কুলীন 'শুভঙ্কর চক্রবর্তী'। সমকালীন কৃতী ভ্রাতৃদ্বয়ের অভেদাশঙ্কা দূর করার জন্য বোধ হয় প্রগল্‌ভ নামই অধিক প্রচারিত হয়েছিল। এঁর পিতার নাম ছিল 'নরপতি মহামিশ্র'। এই মহামিশ্রই ছিলেন প্রগল্‌ভের ন্যায়গুরু। তাঁর বেদান্তাধ্যাপক ছিলেন সন্ন্যাসী অনুভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ ছিলেন তাঁর পরমগুরু। সম্ভবতঃ প্রগল্‌ভ ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৪৫০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি কাশীতেই অধ্যয়নান্তে অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা করেছিলেন। কাশীতে তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি বহু শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল। কমলাকরের ন্যায় দাম্ভিক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের লেখায় বাঙালী প্রগল্‌ভাচার্যের নাম উপমান-রূপে গৃহীত হওয়া অপূর্ব কীর্তি সূচনা করে। প্রগল্‌ভাচার্যের রচিত গ্রন্থাবলী: তত্ত্বচিন্তামণিটীকা, প্রত্যক্ষপ্রগল্‌ভী, অনুমানপ্রগল্‌ভী, শব্দপ্রগল্‌ভী, দ্রব্য প্রগল্‌ভী, গুণপ্রগল্‌ভী, লীলাবতী প্রগল্‌ভী, উপমানসংগ্রহ, খণ্ডনদর্পণ প্রভৃতি।

প্রচণ্ডদেব—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইনি বর্তমান শান্তিপুর ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানের রাজা ছিলেন। ইনি রাজ্য ত্যাগ করে সিদ্ধাচার্য হয়েছিলেন এবং তারপর এঁর নাম হয়েছিল 'শান্তিকর'। এঁর এই শান্তিকর নাম থেকেই ঐ স্থানের নাম শান্তিপুর হয়েছে।

প্রজাপতি দাস—বৈদ্য কুলজাত জ্যোতিষী। তিনি পঞ্চসরা বা গ্রন্থ-সংগ্রহ নামে এক জাতক গ্রন্থ রচনা করেন। বঙ্গদেশে প্রচলিত খনার বচন এঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

প্রজাপতি নন্দী—রামপালের (১০৭৭-১১২০ খ্রীঃ) সান্ধিবিগ্রহিক। এঁর পুত্রই বিখ্যাত 'রামচরিত' কাব্য প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী। প্রজাপতি নন্দীর বাসভূমি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন।

প্রজ্ঞাকরমতি—বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও ভিক্ষু। ইনি বিক্রমশীলা বিহারের অন্যতম দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন। ইনি দক্ষিণ দ্বারে অবস্থান করতেন। ইনি খুব বিদ্বান ও জ্ঞানী ছিলেন। যে সকল ছাত্র বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যয়ন করার জন্য আসতেন ইনি তাঁদের পরীক্ষা করে উপযুক্ত মনে করলে বিহারে থেকে অধ্যয়ন করবার অনুমতি দিতেন। ইনি পালবংশীয় রাজা চণকের সময় (খ্রীঃ ৯৫৫-৮৩) বর্তমান ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি অভিসময়ালঙ্কারবৃত্তি পিণ্ডার্থ ও বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপণ্ডিত সুমতীকীর্তি এই দুই গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

প্রজ্ঞাবর্মা—বোধিবর্মনের শিষ্য

এবং বাংলার কাপট্যবিহারের একজন আচার্য। অবস্থান কাল পাল রাজাদের রাজত্বকালে দশম শতাব্দীতে। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ ছাড়া, ইনি 'উদানবগ্গে'র উপর ধর্মত্রাতের অসম্পূর্ণ টীকাটি সমাপ্ত করেছিলেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রের 'বিশেষস্তব টীকা' ও 'দেবাতিশয়স্তোত্রটীকা' নামক দুটি টীকা রচনা করেছিলেন।

প্র তা প ধ্ব জ—কামতাপুরের রাজা দুর্লভনারায়ণের পিতা। এঁর অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী। প্রতাপধ্বজ প্রথম জীবনে সিংহধ্বজ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। পরে ইনি প্রভুকে হত্যা করে স্বয়ং রাজা হন।

প্র তা প রু দ্র দেব—উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় শেষ নৃপতি। এঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭-১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৫০৪-৩২ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর এক বিস্তৃত রাজ্য ছিল। বাংলাদেশের হুগলী জেলার মান্দারণ দুর্গ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্র রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। প্রতাপরুদ্র ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা। এঁর রাজ্যে গুণী ব্যক্তির বিশেষ সমাদর ছিল। বাসুদেব সার্বভৌমকে ইনি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। রামানন্দ রায়ও এঁর দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত হয়েছিলেন। বাংলার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন উড়িষ্যার সমুদ্র-বেলায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন প্রতাপরুদ্র তাঁকে সাদরে বরণ করে নেন এবং তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেন। ইনি পুরীতে কাশী মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর নির্জনবাসের সমূহ সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সময় প্রতাপরুদ্র তাঁর নির্বিঘ্ন-গমনের সমুদয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে দেন। মহাপ্রভুকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য ইনি গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন এবং সযত্ন ও সতর্কভাবে তাঁর সেবার জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রেরণ করেন। মহাপ্রভুর গৌড় এবং বৃন্দাবন থেকে ফিরবার পর প্রতাপরুদ্র প্রতি বছর নীলাচলে এসে রথযাত্রা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করতেন। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। চৈতন্যভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রী অ দ্বৈ ত-প্রভুকে প্রতাপরুদ্র অশেষ ভক্তি প্রদর্শন করতেন। রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকলেও প্র তা প রু দ্র তাঁর দেহমন মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর জন্য ইনি এঁর রাজ্য, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন যে মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের অন্যতম প্রধান ছিলেন পরমভক্ত রাজা প্র তা প রু দ্র দে ব। কবি কর্ণপূর প্রতাপরুদ্রকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন যে রাজা যেন ছিলেন 'ভগবদ্ভাবস্বভাবঃ স্বয়মাবির্ভূত শান্তি-রসাবগাহনির্ধূতরজস্তমঃ'। মহাপ্রভুর জীবিতাবস্থায় প্রতাপরুদ্র পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বাসুদেব

সার্বভৌম ও রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যচরিত্র-কীর্তন ও কৃষ্ণ গুণগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভক্তের মতো দিন যাপন করতেন। কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) পর শ্রীক্ষেত্র শ্রীহীন হলে প্রতাপরুদ্র অন্যত্র অবস্থান করেন। কেবল রথ-যাত্রার সময় একবার করে নীলাচলে আসতেন। প্রতাপরুদ্রের নির্দেশেই কবি কর্ণপূর মহাপ্রভুর জীবন-সম্বন্ধীয় নাটক রচনা করেছিলেন। চৈতন্যভক্ত প্রতাপরুদ্র সম্ভবতঃ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

প্রতাপসিংহ দত্ত—একজন বাঙালী বীরপুরুষ। ইনি বাংলার স্বাধীন হিন্দু রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতিগণের অন্যতম ছিলেন।

প্রতাপাদিত্য, মহারাজা—বাংলার বার-ভূঞ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি। এঁর পিতার নাম রাজা বিক্রমাদিত্য। পিতামহ ভবানন্দ এবং প্রপিতামহ রামচন্দ্র গুহ। রাজা বসন্ত রায় ছিলেন এঁর খুল্লতাত। রাজা বিক্রমাদিত্যের দুই বিবাহ। প্রতাপ ছিলেন তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান। এঁর বৈমাত্র ভ্রাতার নাম মুকুটমণি। আনুমানিক ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে প্রতাপের জন্ম হয়। কথিত আছে, প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেই নাকি এমন বিকট শব্দে নিনাদ করে উঠেন, যাতে রাজপরিবারের সকলে ভীত হয়ে পড়েন। জ্যোতির্বিদরা কোষ্ঠী গণনা করে বলেছিলেন যে প্রতাপ পিতৃঘাতী হবেন। তখন বিক্রমাদিত্য নবজাত পুত্রকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হন, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত রায় ও তৎপত্নীর কাতরতায় অভিভূত হয়ে এই কর্ম থেকে বিরত হন।

প্রতাপ বাল্যে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন; সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষায় ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। আবার অন্যদিকে ছিলেন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও চঞ্চল। যুদ্ধ বিদ্যায়ও ইনি বিশেষ কৃতী হলেন। প্রতাপ আবাল্য স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেন। মোগলের অধীনতা পাশ থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। এ নিয়ে পিতার সঙ্গে তাঁর মতভেদ হত। প্রতাপের দুরন্তপণায় পিতা ও পিতৃব্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে তাঁরা স্থির করলেন প্রতাপকে দিল্লীতে মোগল রাজ-দরবারে পাঠিয়ে মোগলের শৌর্য ও ঐশ্বর্য দর্শনে তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্ন দূর হবে। কিন্তু ফল হল বিপরীত। প্রতাপ মোগল দরবারে থেকে তীব্র দৃষ্টিতে মোগলের কূটনীতি, হালচাল এবং শাসন পরিচালনার দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষ্য করলেন।

প্রতাপাদিত্য দিল্লী থেকে দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর

পূর্বে রাজা পুত্র প্রতাপকে দশ আনা ও ভ্রাতা বসন্ত রায়কে ছ' আনা জমিদারী ভাগ করে দেন। প্রথমে খুল্লতাতের সঙ্গে প্রতাপের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। বসন্ত রায়ের অভিমতে প্রতাপই রাজোপাধি গ্রহণ করেন। রাজা হয়েই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টিকারী আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ (ফিরিঙ্গী) দস্যুদের দমন করলেন। তারপর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে প্রস্তুত হতে লাগলেন। এই সময় বাহ্যত মোগলের বশ্যতা স্বীকার করার ভাব দেখালেন। কিন্তু ইত্যবশরে দুর্গাদি গড়লেন। উপযুক্ত জাহাজ, বজরা, পানসী প্রভৃতি প্রস্তুত করালেন। হাজার হাজার কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদ সংগ্রহ করলেন। সৈন্যও অসংখ্য সংগ্রহ করলেন। প্রথমে তিনি হিজলী আক্রমণ করে দখল কবেন। প্রতাপেব ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে মোগল সম্রাট প্রতাপেব বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যদল পাঠালেন সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁব অধীনে। প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধে মোগল সেনাপতি দু'দুবার পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। এবার মোগল সেনাপতি হয়ে এলেন আজিম খাঁ। তিনিও প্রতাপাদিত্যের সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। এই সময় খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে মনোমালিন্য দেখা দিল। ঐ মনোমালিন্য ক্রমে ধূমায়িত হয়ে গৃহ-বিবাদে পরিণত হল। একদিন বসন্ত রায় তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপাদিত্যকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। প্রতাপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। প্রতাপ শ্রাদ্ধের জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন, এমন সময় রাজা বসন্ত রায় তাঁর কোশার গঙ্গাজল ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন,—"গঙ্গাজল আন্ শীগ্‌গির"। কথাটা আব কিছুই নয়—শ্রাদ্ধের জন্য কিছুটা গঙ্গার জল। কিন্তু প্রতাপ অন্যরকম বুঝলেন। "গঙ্গাজল" ছিল রাজা বসন্ত রাযের তরবাবিরও নাম। প্রতাপ ভুল ভাবলেন যে তাঁব কাকা তাঁকে কাটবার জন্য তববারি আনতে বলছেন। প্রতাপ তখন ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত হয়ে নিজের তরবারির আঘাতে প্রিয় পিতৃব্যকে হত্যা করলেন। বাজা বসন্ত রাযেব একজন ছাড়া সকল পুত্র নিহত হল। প্রতাপের গৃহশত্রুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হল। এদিকে প্রতাপের প্রতাপ খর্ব করার জন্য মোগল সম্রাট অম্বররাজ সু-চতুর মানসিংহকে বঙ্গদেশে পাঠালেন। মানসিংহ বাংলায় এসে ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি প্রতাপাদিত্যেব প্রভাবশালী শত্রুদের হাত করলেন। ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করে মানসিংহ প্রতাপের কাছে দূত পাঠালেন। দূতের এক হাতে ছিল অসি আর হাতে শৃঙ্খল। প্রতাপাদিত্য

দূতকে বললেন, "তুমি দূত, তোমাকে আর কি বলব বল, সেই দেশদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহ যদি আজ এখানে আসতেন তাহলে এখানেই তাঁর ঐ অসির পরীক্ষা হত। আমি তোমার প্রভুর মস্তক ছেদনের জন্য ঐ অসিই নিলুম, ঐ শৃঙ্খল নিয়ে গিয়ে তুমি তোমার প্রভুর পায় পরিয়ে দিও।" যুদ্ধ বেধে উঠল। প্রতাপের সৈন্যগণ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল। কিন্তু ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি গৃহ শত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপাদিত্য শেষে পরাজিত ও বন্দী হলেন। মানসিংহ মহাবীর প্র তা পা দি ত্য কে লোহার খাঁচায় ভরে দিল্লী নিয়ে চললেন। পথে কাশীতে উপস্থিত হলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য চতুঃষষ্টি যোগিনীর বাড়ীতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালীর মূর্তি দর্শন করতে চান। অনুমতি পেয়ে দেবী দর্শন করতে করতেই তিনি মূর্ছিত হয়ে মারা যান। এই সময় ছিল ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ। রাজা প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে 'কল্পতরু' হয়ে যে যা চাইত তাই দান করতেন। বহু গুণী, জ্ঞানী ও সিদ্ধ পুরুষ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তাঁর নিকট রাজবৃত্তি পেয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে এসে যশোহরে বাস করেন। শঙ্কর চক্রবর্তী, সূর্যকান্ত গুহ, পর্তুগীজ রডা প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে যুদ্ধের সময় দেবী নাকি প্রতাপের হয়ে যুদ্ধ করতেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিখ্যাত তান্ত্রিক শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চাননের নিকট দীক্ষিত হয়েছিলেন। আর তাঁর পুরোহিত ছিলেন তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ভাই চণ্ডীবর ঠাকুর। অনেক ঐতিহাসিক প্রতাপের সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রতাপাদিত্য (রাজা)—কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় অশোক কর্তৃক ইনি বন্দী হন। ইনি ছিলেন পুণ্ড্রের বা গৌড়ের রাজা। কয়েকজন বৃদ্ধ মন্ত্রীসহ ইনি কাশ্মীরে নির্বাসিত হন। সেখানে অশোক এঁকে কাশ্মীরের সীমান্তরক্ষী সামন্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হয়ে কাশ্মীরে শিব ও বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেন। তার মধ্যে অশোকেশ্বর শিবের মন্দির প্রধান।

প্র দ্যু ম্ন মি শ্র—শ্রীশ্রীচৈ ত ন্য মহাপ্রভুর খুল্লতাত পুত্র এবং "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য উদয়াবলী" প্রণেতা। 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে আর এক প্রদ্যুম্ন মিশ্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন উড়িষ্যার অধিবাসী এবং পুরীর জগন্নাথের মহাসূপকার, প্রধান পাক-কর্তা। প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর নির্দেশে রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে ধন্য হতেন। এঁদের অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

প্রদ্যুম্ন সেন—বাংলার অন্যতম

স্বাধীন ক্ষত্রিয় সেনবংশীয় রাজা শুকদেব-সেনের পুত্র। ইনি আদিশূরের দৌহিত্র ছিলেন।

প্রবুদ্ধ ঘোষ—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষ বংশে প্রবুদ্ধ ঘোষ নামে এক বীর পুরুষ বা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। এঁর বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে, এঁরা বৌদ্ধাচারসম্পন্ন ছিলেন বলে সমাজে সমুচিত সম্মান পেতেন না।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী—এঁর সঠিক পরিচয় বিতর্কের বিষয়। 'হরি-ভক্তিবিলাসে'র প্রারম্ভে গোপাল ভট্ট প্রবোধানন্দের শিষ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে। আবার নিত্যানন্দ, মনোহর দাস ও নরহরির গ্রন্থে গোপাল ভট্টকে বলা হয়েছে প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবোধানন্দ-রচিত 'চৈতন্য চন্দ্রামৃতে'র টীকাকার আনন্দী প্রবোধানন্দকে পরিব্রাজকাচার্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে বিশেষিত করেছেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য প্রবোধ সরস্বতী 'গোপালতাপনী' উপনিষদের একখানি সংস্কৃত টীকা রচনা করেছিলেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামাঙ্কিত 'বিবেকশতক' নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এইসব গ্রন্থ একই প্রবোধানন্দের রচিত কিনা সঠিক বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন প্রকাশানন্দ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে চৈতন্যদেবের কাশীধামে সাক্ষাৎকার হয়। চৈতন্য তাঁকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর নূতন নামকরণ করেন 'প্রবোধানন্দ'। এইসব কাহিনী কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বলা যায় না। সম্ভবতঃ এঁর জীবনকাল ষোড়শ শতাব্দী।

প্রবোধানন্দের রচিত গ্রন্থ 'চৈতন্য-চন্দ্রামৃত'। ইহা বাংলা বৈষ্ণব স্তোত্র-সাহিত্যে প্রাচীনতম এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এতে ১৪৩টি শ্লোক ১২টি বিভাগে বিন্যস্ত আছে, শ্লোকগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত। চৈতন্যদেবের স্তুতি শ্লোকগুলির বিষয়বস্তু। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত প্রবোধানন্দের 'সঙ্গীতমাধব' নামক একটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ১৫ সর্গে রচিত। গীতিকবিতাগুলি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। 'বৃন্দাবনমহিমামৃত' নামক একটি বিশাল গ্রন্থ প্রবোধানন্দের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়।

প্রভাকর গুপ্ত—প্রভাকর গুপ্ত বাংলাদেশের সনক রাজার সময়ে (৯৮৩ খ্রীঃ) বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদ্বারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। ন্যায় সম্বন্ধে এঁর বহু গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে "প্রমাণ-বার্তিকালঙ্কার" ও "মহাবলম্বনিশ্চয়" প্রসিদ্ধ।

প্রভাকর রায়, রাজা—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ইনি রাজত্ব করতেন। এঁর পুত্রের নাম দক্ষিণ রায়। প্রভাকর সদাশিবের উপাসক ছিলেন। ইনি বিশ্বাস করতেন দক্ষিণ রায়কে ইনি

সদাশিবের বরে পুত্ররূপে লাভ করেছেন।

প্রভাকরোপাধ্যায়—মিথিলা-নিবাসী বাঙালী ন্যায়াচার্য। ইনি কিরণাবলীর টীকা রচনা করেছিলেন। ইনি ন্যায়নিবন্ধেরও একখানি টীকা রচনা করেন। ইনি ছিলেন দিবাকরোপাধ্যায়ের সমসাময়িক অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

প্রভাবতী (রানী)—ইনি বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম কেদার রায়ের অন্যতমা কন্যা। মুঘল সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করে কেদার রায়কে আক্রমণ করলে কেদার রায নিজ কন্যা প্রভাবতীকে মানসিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। রাজা মানসিংহের মৃত্যুর পরে প্রভাবতী সহমৃতা হন।

প্রভামিত্র—নালন্দাবিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙালী অধ্যাপক। ইনি চীনদেশে ধর্মচক্র (বৌদ্ধধর্ম) প্রবর্তন করেন।

প্রভুরাম পণ্ডিত—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। ইনি সূর্যপুত্র জীমূত-বাহনের ব্রতকথা বা জিতাষ্টমীর পাঁচালী রচনা করেছিলেন। প্রভুরামের রচনা পাওয়া যায় না। তবে 'জিতাষ্টমী পাঁচালী'র অন্য কবি শম্ভুরামের গ্রন্থে এঁর উল্লেখ আছে।

প্রভুরাম মুখুজ্জে—ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যায় নাই। তবে মহারাজা গোপাল সিংহদেবের নামোল্লেখ থেকে বুঝা যায় কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত হয়েছিল। প্রভু-রামের পিতার নাম জানকীরাম, পিতামহ গোবিন্দ এবং মাতা অন্নপূর্ণা। নিবাস মল্লভূমে আলিগুঠিন্যা গ্রামে। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ধর্মঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁকে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। দিগ্‌-বন্দনায় প্রভুরাম স্থানীয় এবং উড়িষ্যা প্রান্তের অনেক প্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য দেবতার উল্লেখ করেছেন।

প্রসাদ দাস—একজন কবি। এঁর নিবাস ছিল বিষ্ণুপুরে। ইনি শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। এঁর পিতার নাম করুণাময দাস (মজুমদার)। কবির উপাধি ছিল "কবিপতি"। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীজানকীরাম দাস। এঁরা শ্রীনিবাস আচাযের বাড়ীতে থেকে তাঁর সমস্ত লিপিকায সম্পাদন করতেন। এজন্য এঁদের 'বিশ্বাস' বলা হত। তৎপূর্বে এঁদেব কুলগত উপাধি ছিল 'মজুমদার'। প্রসাদ দাসের 'কবিপতি' উপাধি শ্রীনিবাস আচার্যেরই দেওয়া। 'পদকল্পতরু'তে এঁর ছ'টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ব্রজবুলিতে নিত্য-লীলার গোষ্ঠ-বিহারের "সবহুঁ মিলিত যমুনা-তীর" ইত্যাদি পদটি ব্যতীত প্রসাদ দাসের বাকি পাঁচটি পদই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক।

প্রাণকর—বাংলার পাঠান শাসনকালে ইনি মেদিনীপুর জেলার একজন স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন। এঁরই খ্যাতিমান পুত্র বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেদিনীকোষ'-প্রণেতা মেদিনীকর। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাণকর বিদ্যমান ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ, "দ্বিজ"—জয়দেবের পদাবলীর বঙ্গানুবাদক। তাঁর অনুবাদ কাব্যের নাম ছিল 'জয়দেব প্রসাদাবলী'। কবির পিতার নাম যুগলকিশোর। পদবী ব্রহ্মচারী। কবির নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের কাছে তেলিয়া গ্রামে। অবস্থিতি-কাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

প্রাণকৃষ্ণ সিংহ—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পুত্র। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মৃত্যুর পর প্রাণকৃষ্ণ অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হন। ইনিও পিতার সঙ্গে হেষ্টিংসের অধীনে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। এঁরও দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। প্রাণকৃষ্ণের পুত্রই সুধী ও ধার্মিকপ্রবর ভারত বিখ্যাত লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ)।

প্রাণচন্দ্র—একজন কবি। বর্ধমানরাজ তেজেশচন্দ্রের আদেশে 'হরিহরমঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যখানির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। দেব-মাহাত্ম্য রচনাই কাব্যখানির উদ্দেশ্য নয়, রাজপুত্র জয়সেন ও রাজকুমারী জয়ন্তীর প্রণয়কাহিনী বর্ণনাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এটি একটি সচিত্র মুদ্রিত গ্রন্থ।

প্রাণনাথ—একজন প্রখ্যাত নাথপন্থী যোগী। ইনি সকলের সঙ্গে প্রেমে ও প্রীতিতে মিলতে উপদেশ দিতেন।

প্রাণনাথ পণ্ডিত—একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। এঁর রচিত গ্রন্থ 'দৈবজ্ঞভূষণ'। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

প্রাণনাথ বিদ্যাভরণ—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সময়ে রাজ-সভার জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। ১৭৮৮ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

প্রাণনারায়ণ—কোচবিহারের কামতাপুরের রাজা বীর নারায়ণের পুত্র। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বীরনারায়ণ পরলোক গমন করলে প্রাণনারায়ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। ইনি তৎকালীন মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। মোগলসৈন্য বহুবার এঁর কাছে পরাজিত হয়। মহারাজ প্রাণনারায়ণ সবিশেষ শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। প্রাণনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এঁর একটি পঞ্চ-রত্ন পণ্ডিত সভা ছিল। এঁর রাজসভা

পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা সর্বদা পরিশোভিত ছিল। রাজা প্রাণনারায়ণ সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও এঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। কবিতারচনায় এবং গীতবাদ্যেও এঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

মহারাজ প্রাণনারায়ণ প্রজাদের মঙ্গলের জন্য নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন। এঁর রাজত্বকালে রাজ্যে শিল্পকার্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ প্রাণনারায়ণ পরলোক গমন করেন।

প্রাণবল্লভ ঘোষ—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। রচিত কাব্য 'জাহ্নবীমঙ্গল'। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের মাতার আদেশে ইহা রচিত হয়েছিল। প্রাণবল্লভের নিবাস ছিল অম্বিকানগর গঙ্গাতীরে (স্থানীয় নাম অম্বিকা-কালনা)।

প্রাণরাম চক্রবর্তী—এঁর উপাধি ছিল "কবিবল্লভ।" এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কালিকামঙ্গল'। এই কাব্যের রচনাকাল ১৬৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীই কালিকা মঙ্গলের বিষয়-বস্তু।

প্রিন্সেপ, জেমস—সুবিখ্যাত ভারতবিদ্যাবিদ্ ইংরেজ। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ অগষ্ট জেমস্ প্রিন্সেপের জন্ম হয়। এঁর পিতা জন প্রিন্সেপ পার্লামেন্টের সভ্য এবং লণ্ডনের অল্ডারম্যান ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই স্থাপত্য শিল্পের প্রতি জেমস্ প্রিন্সেপের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রিন্সেপ কলকাতায় আসেন ও এখানকার মিন্টের 'এসে' মাষ্টার হন। প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হোরেস হেমান উইলসনের প্রভাবে প্রিন্সেপ প্রাচ্য বিদ্যানুরাগী হয়ে উঠেন। এশিয়াটিক সোসাইটির কাজের সঙ্গে ইনি ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু এঁর প্রধান কাজ ছিল অতীত ভারতের প্রাচীন লিপি উদ্ধার। পাহাড়ে-পর্বতে, মন্দির গাত্রে, মুদ্রায় অতীত ভারতের যে ইতিহাস আত্মগোপন করেছিল তিনি তা উদ্ধার করলেন। এজন্য ইনি ভারত তথা বিশ্বের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এঁর লিপি পাঠ থেকে প্রিয়দর্শী অশোকের নানা ইতিহাস পাওয়া গেছে। অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়লে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিলেত যান। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল এঁর মৃত্যু হয়।

প্রিয়ম্বদা—ফরিদপুর নিবাসী রঘুনাথের পত্নী। এঁর পিতার নাম শিবরাম। প্রিয়ম্বদা-রচিত কাব্যের নাম 'শ্যামারহস্য'। ইনি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে জীবিতা ছিলেন।

প্রিয়াদাসজি—কবিরাজ মনোহর দাসের শিষ্য ও ভক্তমালের 'ভক্তিরসবোধিনী' নামে টীকাকার। এঁর অন্যান্য গ্রন্থ—অনন্তবোদিনী,

'চাহবেলী' 'রসিকমোহিনী' ভক্ত-স্মিরণী প্রভৃতি।

প্রেমদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ—এঁর আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। জাতিতে ব্রাহ্মণ। গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। এঁর দুই বড় ভাই ছিলেন গোবিন্দরাম ও রাধাচরণ। পিতা গঙ্গাদাস, পিতামহ মুকুন্দানন্দ, প্রপিতামহ জগন্নাথ মিশ্র। এঁরা কাশ্যপ গোত্রীয়। নিবাস বর্ধমান জেলায় মানকরের কাছে কুলনগরে। ষোল বছর বয়সে কবি বৃন্দাবনে পালিয়ে গিয়ে গোবিন্দ-মন্দিরের পাচক হন। কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। কবি স্বপ্নে শ্রীচৈতন্যের ও নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। ইনি কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের কাব্যানুবাদ করেন ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে। রচনা মূলানুগত ও সুললিত। এই কাব্যের প্রদত্ত নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'। প্রেমদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা'। রচনাকাল ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ। এটি আসলে বৈষ্ণব-তান্ত্রিক "রসরাজ" সাধনাবিষয়ক গ্রন্থ। বইটি চারি উল্লাসে সমাপ্ত। তার মধ্যে সাড়ে তিন উল্লাসে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বংশী-বদনকে শিক্ষাদান উপলক্ষে তত্ত্বকথা বলা হয়েছে। চতুর্থ উল্লাসের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ কাহিনী এবং বংশীবদন ও তাঁর পুত্র প্রপ্রৌত্রাদির বিষয়ে অনেক কথা আছে।

প্রেমানন্দ দাস—একজন কবি। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'চন্দ্রচিন্তামণি'।

প্রৌঢ়নাথ—নাথপন্থী চুরাশি জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম।

ফ

ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ—বাংলার সোনারগাঁও অঞ্চলের শাসন-কর্তা বহ্‌রাম খান ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করলে তাঁর তরবারি-বাহক ফকরুদ্দিন দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোনারগাঁও অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ নাম নিয়ে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এই সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন মুহম্মদ তুঘলক। ফকরুদ্দীন একে একে লখ্‌নৌতি এবং সাতগাঁও নামক বাংলার অন্য দুটি অঞ্চলও দখল করেছিলেন। জানা যায় তিনি চট্টগ্রাম জয় করে সেখানে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। অনেকের মতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাকি ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁও আক্রমণ করে ফকরুদ্দীনকে নিহত করেন এবং তাঁর রাজ্য অধিকার করে নেন।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে ঐ সময় বাংলাদেশ ধন-ধান্যে ভরা ছিল এবং জিনিসপত্রের দাম ছিল অত্যন্ত সস্তা। হিন্দুদের সঙ্গে তিনি খুব একটা উদার ব্যবহার করেননি। তাদের কাছ থেকে তিনি একাধিক কর আদায় করতেন। এ পর্যন্ত বাংলার সুলতানদের যত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে ফকরুদ্দীন মুবারক শাহের নির্মিত মুদ্রাগুলি খুব সুন্দর ছিল। ফকরুদ্দীনের নামাঙ্কিত সমস্ত মুদ্রাই সোনারগাঁও টাঁকশালে তৈরী হত।

ফকির চাঁদ—একজন কবি। চট্টগ্রামের অধিবাসী। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম "সত্যপীরের পাঁচালী"। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

ফকির মোহাম্মদ বা **ফকিরুদ্দীন**—অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। রচিত কাব্য 'সোনাভান কেচ্ছা' বা 'সোনাভানের পুথি' এবং 'ইমাম চুরির পুথি'।

ফকিররাম কবিভূষণ বা **"কবিরাজ"**—প্রাচীনতম 'অন্নদ-রায়বার' রচয়িতাদের অন্যতম। ইনি একটি সত্যনারায়ণ-পাঁচালী কাব্য লিখেছিলেন ১৭০১-২ খ্রীষ্টাব্দে। এতে কবিত্বের বিশেষ কিছু পরিচয় নেই। কবির মায়ের নাম দেবকী। ভণিতায় রামভক্তির পরিচয় আছে—"রামপদ-পঙ্কজে ফকিররাম কয়।" গ্রন্থ শেষে কবি ব্রাহ্মণ, মল্লরাজা ও রাজসভাসদ্-বর্গের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন।

ফকিরা মাছকাটা—রাজা সীতারাম রায়ের ঢালি সৈন্যের কর্তা। জাতিতে নমঃশূদ্র, মাছ কেটে বিক্রয় করাই ছিল এঁর পূর্বপুরুষের ব্যবসায়। শুনা যায়, ফকিরার বাড়ী পরগণা নলদীর বর্তমান সময়ে তরফ কালিয়ার অন্তর্গত কোন গ্রামে ছিল। এঁর বাহুবল দেখে সীতারাম এঁকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে সৈনিক করে তুলেন। অবস্থিতি কাল সপ্তদশ শতাব্দী।

ফজল গাজি—বাংলার বার-ভুঞাদের অন্যতম। ভাওয়ালের গাজি বংশজাত ফজল গাজি ভাওয়ালেরই শাসনকর্তা ছিলেন। এঁর পিতার নাম ছিল মাতাব গাজি। চাঁদ প্রতাপের চাঁদ গাজির ন্যায় ইনি স্বাধীনতালিপ্সু ও বীর ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য ইনি আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। ভূঞাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চাঁদ গাজির ন্যায় ইনিও খিজিরপুরের ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুরের কেদার রায়ের সঙ্গে মোগলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

ফজিলৎ, কাজী—দিল্লীর সম্রাট হবার পর শেরশাহ বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থা ভাল করার জন্য মনোযোগী হন। তিনি বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে এক একজন শাসনকর্তার অধীনে রাখেন

এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ প্রসিদ্ধ কাজী ফজিলৎকে সকলের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কাজী সাহেব বিভিন্ন শাসনকর্তাদের কাজের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করে তাঁদের কাযকুশলতা সম্বন্ধে শেরশাহকে জ্ঞাপন করতেন। এই সুব্যবস্থার ফলে শেরশাহের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে শান্তি বিগুমান ছিল।

ফতে খাঁ—ইনি বাংলার শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর (১৫৭৩-৭৬ খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট আকবর বাংলাদেশ অধিকার করার জন্য সেনাপতি খাঁ আলমকে হাজীপুর দুর্গের অধ্যক্ষ ফতে খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে ফতে খাঁ বহু পাঠান সৈন্যসহ নিহত হন।

ফতে গাজী শাহ—একজন বিখ্যাত দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শ্রীহট্টের তরফ পরগণার ফতেপুর নামক স্থানে বাস করতেন।

ফতে চাঁদ "জগৎ শেঠ"—বাংলা তথা ভারতের বিখ্যাত ধনকুবের। এঁর কথা বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদ বাক্যের মতো প্রচলিত। ইনি ছিলেন বিখ্যাত মাণিকচাঁদের ভাগিনেয়। মাণিক চাঁদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তিনি ভাগিনেয় ফতে চাঁদকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদের অগাধ ঐশ্বর্যের ইনি উত্তরাধিকারী হন। তাছাড়া, ফতেচাঁদ ভারতের বহুস্থানে হুণ্ডীর কারবার চালিয়ে সর্বত্রই যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। সে সময় এঁর ন্যায় অর্থ-নীতিকুশল ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ সাহের সঙ্গে দিল্লীতে ফতেচাঁদের সাক্ষাৎ হলে সম্রাট এঁকে "জগৎশেঠ" অর্থাৎ জগতের শ্রেষ্ঠ বণিক এই উপাধি প্রদান করেন। এক সময় দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহ বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে ফতেচাঁদকে নবাবী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু উন্নতমনা ফতেচাঁদ মুর্শিদকুলীর নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধথাকায় তা গ্রহণ করেননি। বরং মুর্শিদকুলী যাতে যাবজ্জীবন মুর্শিদাবাদে থাকতে পারেন সেজন্য সম্রাটের নিকট ইনি আবেদন করেন। সম্রাট এই ব্যাপাবে জগৎশেঠের উপর বিশেষ খুসী হয়ে, এঁকে জগৎশেঠ নামাঙ্কিত একটি মরকতমণি খেলাৎ প্রদান করেন।

মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দিনের শাসনকালে, ফতেচাঁদ জগৎশেঠ উক্ত নবাবের চার জন সদস্যের অন্যতম প্রধান সদস্যরূপে পরিগণিত হতেন। তৎকালে বাংলার রাজকোষ ফতেচাঁদ জগৎশেঠের হাতেই ছিল। নবাব সুজাউদ্দিন, জগৎশেঠের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ

করতেন না। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ মুর্শিদাবাদের নবাব হলে তাঁর সঙ্গে ফতেচাঁদের মানোমালিন্য হয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য সরফরাজের দেশ-বিদেশে দুর্ণাম হয়েছিল। ফতেচাঁদের পুত্রবধূর অসামান্য রূপ-লাবণ্যের সংবাদ পেয়ে সরফরাজ তাকে একবার দেখবার প্রয়াসী হন। অবশেষে জগৎশেঠের বাড়ী থেকে বলপূর্বক আনিয়ে দর্শনান্তে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এই ব্যাপারে জগৎশেঠ নিজ সমাজে বিশেষ অপমানিত হন। পরে উভয়ের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত কববার জন্য ফতেচাঁদও অন্যতম ষড়যন্ত্রকারারূপে আলীবর্দীর সঙ্গে মিলিত হন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার সময় জগৎশেঠের ধনাগার থেকে মহারাষ্ট্রীয়রা দু'কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছিল। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফতেচাঁদ পরলোক গমন করেন।

ফ তে শা হ—বাংলার নবাব ইউছুপ শাহের (১৪৭৪-৮২ খ্রীঃ) মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর সাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন বলে রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ অবিলম্বে তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতেশাহকে রাজপদ প্রদান করেন। এঁর পূর্ণনাম জালালউদ্দিন আবুল মুজাফর ফতেশাহ। ফতেশাহ বিবেচক ও বুদ্ধিমান শাসন-কর্তা ছিলেন।.

ফ তে সিং হ—ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লীশ্বর আকবরের সময় বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলায় এক হাড়ি রাজা বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল ফতে সিংহ। তাঁরই নামানুসারে ঐ অঞ্চলের নাম হয়েছিল ফতেসিংহ পরগণা। কান্দির দক্ষিণ-পশ্চিমে ফতেপুর গ্রাম ছিল হাড়ি রাজার রাজধানী। হাড়ি রাজা ফতেসিংহ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। মোগল সেনাপতি মানসিংহ বাংলার বিদ্রোহ দমনের জন্য (১৫৮৯ খ্রীঃ) যখন এই পথে যান, তখন হাড়ি রাজাকে দমন করেন। মানসিংহের সেনাধ্যক্ষ বা বক্শী সবিতা রায় হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করেন।

ফতেহ মাহমুদ, দেওয়ান—একজন বিখ্যাত পীর। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অন্যতম শিষ্য ছিলেন।

ফয়জউল্লা, শেখ—গোরক্ষ বিজয় নামক কাব্য এঁর রচিত। এঁর কাব্যের ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা।

ফরষ্টার, হেনরি পিটস্—একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সিভিলিয়ান। ইনি ট্যাকশালের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁর বাংলা ও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ এঁরই চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। সি. ই. বাক্ল্যাণ্ড এঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "প্রধানতঃ এঁরই চেষ্টায় বাংলা

সরকারী ও সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়েছিল।" এঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম কর্ণওয়ালিশ কোডের অনুবাদ। ইনি বাংলাভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান তৈরী করেছিলেন।

ফরহাদ খাঁ বাহাদুর, নবাব—১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শ্রীহট্টের শাসনকর্তা ছিলেন। ঐ বছর ইনি শ্রীহট্টের পূর্বদিকস্থ গোয়ালিছড়ার সেতু নির্মাণ করিয়ে দেন। এ ছাড়া, ইনি অনেক মস্জিদ, ইমারত ও সেতু নির্মাণ করিয়েছিলেন। শাহ জালালের দরগার মধ্যস্থিত বড় মসজিদ ইনি ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করান। ইনি অনেককে বহু ভূমিও দান করেছিলেন।

ফার্ণাণ্ডেজ বা **ফন্‌সেকা**—একজন পর্তুগীজ মিসনারী। বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ইনি ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। চট্টগ্রাম থেকে ইনি যশোরে এলে যশোররাজ রাজা প্রতাপাদিত্য এঁকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন। প্রতাপের সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে ফন্‌সেকা লিখেছিলেন, "এই হিন্দুরাজা যেরূপ সদাশয়তার সঙ্গে আমার প্রতি ব্যবহার করেছেন, এরূপ সদ্ব্যবহার আমি খ্রীষ্টান রাজার নিকট থেকে পেতাম কিনা সন্দেহ।" ফন্‌সেকার প্রার্থনা মতো প্রতাপাদিত্য তাঁর রাজধানীতে একটি খ্রীষ্টান গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। ইহাই বঙ্গদেশের সর্ব প্রথম গীর্জা। কিন্তু পরে এঁকে রাজরোষে পড়তে হয়। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কারারুদ্ধ হন। এবং সেই কারাগারেই এঁর মৃত্যু হয়। রাজাদেশে এঁর একটি চক্ষু অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ফা-হিয়ান—চীনদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পর্যটক। পঞ্চম শতাব্দীতে ইনি ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। ঐ সময় ইনি বাংলাদেশে বহু দিন অবস্থান করেন এবং বাংলার তৎকালীন অবস্থার এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান। ভারত ভ্রমণের শেষ দু' বছর (৪১১-৪১২ খ্রীঃ) ইনি তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করে বহু বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের প্রতিলিপি এবং দেবমূর্তির চিত্র গ্রহণ করেন। ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তের অধিবাসিগণকে পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সাহসী ও সমৃদ্ধিশালী বলে বর্ণনা করেছেন।

ফিক্, টমাস্—জাতিতে ইংরেজ। ইনি ছিলেন স্যামুয়েল ফিকের পুত্র। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি নোয়াখালির প্রধান বিচারপতি হন এবং ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার প্রধান কর্ম-কর্তারূপে নিযুক্ত হন।

ফিক্, স্যামুয়েল—জাতিতে ইংরেজ। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে বাংলায় আসেন। রবার্ট হেজেসের মৃত্যুর পর ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি ইনি ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর ও সভাপতি হন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি জন্ ডিকেন্‌কে কার্যভার প্রদান করে ফিক্ ইউরোপে ফিরে যান।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন, এবং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত থাকেন। তিনি তিন বার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটী চেয়ারম্যান্ ও দুইবার চেয়ারম্যান হন।

কে, এলিজা—মিসেস্ কে এলিজা ছিলেন একজন ব্যারিষ্টারের পত্নী। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলকাতায় আসেন। এখানে অবস্থানকালে ইনি বিলাতে এঁর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট ধারাবাহিকরূপে বহুসংখ্যক পত্র লিখেছিলেন। ঐ সব পত্রে এদেশ সম্বন্ধে বহু কথা আছে যা থেকে সে যুগের নানা বিষয় জানতে পারা যায়। হেষ্টিংসের পত্নী এঁর একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন।

ফেদাই খাঁ—নবাব মোকরম খাঁ জলমগ্ন হয়ে মারা গেলে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফেদাই খাঁকে বাংলার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে শাজাহান দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং ফেদাই খাঁকে পরিবর্তন করে কাসেম খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

ফেরিয়া-ই-স্তুজা—একজন পর্তুগীজ পর্যটক ও ঐতিহাসিক। বাংলার নবাব বারবক শাহের (১৪৬০-১৪৭৪ খ্রীঃ) রাজত্বকালে ইনি বাংলায় এসেছিলেন। এঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে বারবক শাহের আমলে বাংলার অবস্থা খুব ভাল ছিল। প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করত। রাজা ধার্মিক ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন।

ফেলুওস্তাগার—চব্বিশ পরগণার অধিবাসী। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'আজায়ের চার ইয়ার' নামে একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন।

ফৈজী বা **ফয়জান**—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী মোহনলালের ভগ্নী। ইনি নাকি দিল্লীতে নর্তকীর ব্যবসা করতেন। এঁর ন্যায় অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণী তৎকালীন ভারতে নাকি আর ছিল না। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে এঁর ওজন ছিল মাত্র বাইশ সের এবং ইনি এত সুন্দরী ছিলেন যে যখন ইনি পান খেতেন, তখন পানের লালরঙ গলা দিয়ে যাবার সময় এঁর কণ্ঠমধ্যে দেখা যেত। ফৈজীর রূপের কথা শুনে সিরাজউদ্দৌলা এঁকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। কিন্তু ফৈজী সিরাজের ভগ্নীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ায় সিরাজ এঁকে বারাঙ্গনা বলে তিরস্কার করেন। তখন ফৈজী সিরাজকে বলেছিলেন, "এইরূপ তিরস্কার আপনার মাকে করিলে শোভা পাইত।" সিরাজের মা আমিনা বেগম ও মাসিমা ঘসেটি

বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলী খাঁর অবৈধ প্রণয়ের কথা প্রচলিত থাকায় ইনি এইরূপ উত্তর করেন। কৈজীর কথায় সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এঁকে একটি ঘরে বন্ধ করে ঘরের দরজা ইট দিয়ে গেঁথে দেন। তিন মাস পরে ঘরের দরজা খোলা হলে কৈজীর কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়।

কৈজুল্লা—অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। রচিত কাব্য সত্যপীর পাঁচালী। নিবাস পশ্চিমবঙ্গের পাচনা গ্রাম।

ফ্রান্সিস, গ্ল্যাডউইন—একজন ইংরেজ পণ্ডিত। ইনি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করেন। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এঁর রচিত শব্দকোষ ১৭৮০ সালে মালদহ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৭৮৪ সালে ইনি ‘দি ক্যালকাটা গেজেট’ প্রেস স্থাপন করেন। গভর্নমেণ্টের যাবতীয় ছাপার কাজ এই ছাপাখানায় হত।

ফ্রান্সিস, স্যার ফিলিপ—গভর্নর হেস্টিংসের সময় ইনি কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর ইনি কলকাতায় আসেন। কথিত আছে এঁর আসার সময় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে হেস্টিংসের আদেশে সতেরটি তোপধ্বনি করা হয়। কিন্তু ইনি একুশটি তোপধ্বনির আশা করেছিলেন। এই নিয়ে প্রথম থেকেই হেস্টিংসের সঙ্গে এঁর মনোমালিন্য ঘটে এবং বিলেতে প্রত্যাবর্তনের পরও তা অটুট থাকে। ইনি ছিলেন হেস্টিংসের প্রধান শত্রু। এবং প্রতিপদে তাঁর কাজে বাধা দিতেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস মহারাজা নন্দকুমার দ্বারা হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংসের সঙ্গে এঁর দ্বৈরথ যুদ্ধ ঘটে এবং ইনি তাতে আহত হন। এই বছরই ইনি পদত্যাগ করে ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন।

ব

বংশীদাস—বংশীদাসের কাব্য প্রধানত গীতিমূলক, বর্ণনাত্মক নয়। পুথির আরম্ভে আছে, “অথ শ্রীভাগবতানুসারেণ গীত লিখ্যন্তে।” প্রথমে রাস, তারপর দ্বিজপত্নী উপাখ্যান, রাধাকৃষ্ণের বিবাহ, খণ্ডিতা, বিপরীত খণ্ডিতা, নৌকা-বিলাস ইত্যাদি। নৌকাবিলাস অংশে শেষ পদে গোবিন্দ দাসের ভণিতা। তারপর ছয়পদে “অথ শ্রীচৈতন্য-জন্ম রহস্য” শেষ করে কৃষ্ণলীলা পুনরারম্ভ হয়েছে। কবি ষোড়শ শতাব্দীতে অবস্থান করছিলেন বলে অনুমিত হয়। পুথির প্রথম পদের কিয়দংশ এইরূপ,

“শারদ শশধর রঞ্জিত রাতি
কিসলয় মল্লিকা ফুলে অলি মাতি।

সুখময় নেহারই কান
মোহন বেশ বনে করল পয়ান।"

বংশীদাস (বা বংশীবদন) চক্রবর্তী—"মনসামঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা হিসাবে বংশীদাসের নাম পূর্ববংগে সুপরিচিত। ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটবাড়ী (বা পাটওয়ারী, পাতুয়ারী) গ্রামে বংশীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতামহ হৃদয়ানন্দ, পিতা যাদবানন্দ, মাতা অঞ্জনা, স্ত্রী সুলোচনা। এঁরা ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটী গাঁই। কবির এক পূর্ব পুরুষ রাঢদেশ থেকে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বাস করেন। বংশীদাস দরিদ্র ছিলেন। তাঁর বৃত্তি ছিল মনসার "ভাসান" গীত গাওয়া। তিনি ষোড়শ শতকের কবি ছিলেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মনসামঙ্গল কাব্য বিরচিত হয় বলে অনুমিত হয়। ইনি দ্বিজ বংশীদাস নামেও পরিচিত।

প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় বংশীদাস অপূর্ব সুন্দর গান গাইতে পারতেন। তিনি সংকীর্তনের দল বেঁধে সর্বত্র স্বরচিত ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। একবার ভাসান-গান গাইতে যাওয়ার পথে 'জালিয়ার হাওর'-এ কবি কুখ্যাত নরহন্তা-দস্যু কেনারামের হাতে ধরা পড়েন। কেনারাম কবিকে বধ করতে উদ্যত হলে, কবি শেষবারের মতো একবার 'ভাসান-গান' গেয়ে নিতে চাইলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রাণের অফুরন্ত আবেগে বংশীদাস বেহুলার বেদনা-সংগীত গানে তন্ময় হয়ে গেলেন। তা শুনে নরহন্তা দস্যু কেনারামের পাষাণ হৃদয় অভিভূত হয়ে পড়ল। সে তৎক্ষণাৎ কবির চরণে লুটিয়ে পড়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কেনারাম নাকি বাকী জীবন কবির সহচররূপে ভাসান গান গেয়ে বেড়াত। এই বংশীদাসের কন্যাই চন্দ্রাবতী যিনি 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের 'মধ্যমণি স্বরূপ' এবং যিনি মনসাদেবীর গান, রামায়ণ গান, মলুয়া, কেনারাম প্রভৃতি কবিতা রচনা করে পূর্ববঙ্গে সুপরিচিতা হয়ে আছেন। বংশীদাস,—বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাস প্রভৃতির সমসাময়িক কবি। দ্র° চন্দ্রাবতী।

বংশীধর দত্ত—বাংলার সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের সান্ধি-বিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের বংশধর ভানুদত্তের পুত্র বংশীধর দত্ত। ইনি বাংলার নবাব সরকারের সেনাপতির কাজ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে নবাব এঁকে কর্ণ খাঁ উপাধি দান করেন। ঢাকার সাভারের অন্তর্গত ধলেশ্বরীর উত্তর তীরে এখনো কর্ণ খাঁর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

বংশীধর ভট্ট—বৈদ্যক বিদ্যা-পতির পিতা। এঁর আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতাব্দী। ইনি ঔষধপ্রকার, বৈদ্যকুতূহল, বৈদ্যকৌস্তুভ এবং বৈদ্যমন-

উৎসব নামক বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন।

বংশীবদন চট্ট (দাস ঠাকুর)—নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়াপাহাড়-গ্রামনিবাসী। এঁর পিতার নাম ছিল ছকড়ি চট্ট এবং মাতা চন্দ্রকলা। ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাসে বাসন্তী পূর্ণিমা দিবসে বংশীর জন্ম হয়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহারই আদেশে বংশীবদন কিছুকাল ধরে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবকরূপে নবদ্বীপে থাকতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। এঁর অনেক রচনা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য পদকর্তা বংশীদাসের রচনার সঙ্গে মিশে গেছে। ইনি বিল্বগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি এবং নবদ্বীপে ‘প্রাণবল্লভ’ নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পদাবলী ব্যতীত বংশীবদন ‘দ্বীপান্বিতা’ নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন। প্রেমদাস বলেছেন বংশী-বদনের একটি পদ মহাপ্রভুর সমক্ষে নীলাচলে গীত হয়েছিল। এঁর রচিত অপর এক গ্রন্থের নাম “দীপকোজ্জ্বল” এঁর দুই পুত্র—চৈতন্য ও নিতাই। এঁর কবিতা অতি মধুর—

“হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হতে মুই
ফিরাইলা আনিতে নারি আঁখি।”

বকুল আলী—একজন কবি। জন্মস্থান চট্টগ্রামের আনোয়ারার অন্তর্গত ভিঙ্গরোল গ্রাম। ইনি কবি হারিপণ্ডিতের পুত্র। ইনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেক পদ রচনা করেছেন।

বকুলকর—নিশ্চল করের পিতৃজ্যেষ্ঠ এবং ‘সারোচ্চয়’ নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর একে বিশেষ সম্মান দেখিয়েছেন। ইনি সম্ভবতঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

বকুলেশ্বর সেন—চরকের টীকাকার এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। বিজয় রক্ষিত রচিত মধুকোষে এঁর নাম পাওয়া যায়।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী। শ্রীবাস-চন্দ্রশেখরের গৃহ থেকে গৌরাঙ্গলীলার প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনায় ইনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইনি গৌরাঙ্গ পার্ষদদের বিশেষতঃ গৌরাঙ্গের নৃত্য-সঙ্গী। নবদ্বীপ-লীলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এর এই সনৃত্য সংকীর্তন। মুকুন্দ দত্ত যেমন দিনরাত্রি নামকীর্তন করে মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করতেন, বক্রেশ্বরও তেমনি ‘একভাবে চব্বিশ প্রহর’ নৃত্য করে তাঁকে পরিতৃপ্ত করতেন। এই নৃত্যের জন্য ইনি গৌরাঙ্গদেবের অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং এঁর নামও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাপ্রভু নীলাচল চলে গেলে বক্রেশ্বর একবার দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে অবস্থান

করেন। দেবানন্দ প্রথমে চৈতন্য বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বক্রেশ্বরের নৃত্য দর্শনে তিনি চৈতন্যানুরাগী হয়ে উঠেন। সংগীতবিশারদ মুকুন্দ দত্তের ন্যায় নৃত্যনিপুণ বক্রেশ্বর পণ্ডিত মহাপ্রভুর জীবনে একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। তাই নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু এঁকে তাঁর কাছে রেখে দেন। জগন্নাথমন্দিরে বেড়াকীর্তন, রথযাত্রা উপলক্ষে বিগ্রহ সম্মুখে সম্প্রদায় বিভাগে কীর্তন ও মহাপ্রভুর উদ্দান-নৃত্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বক্রেশ্বর বিশেষভাবে যুক্ত হতেন। মহাপ্রভু গৌড়ে গমন করলে বক্রেশ্বর তাঁর সঙ্গে গিয়ে রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন এবং চৈতন্যের সঙ্গে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর থেকেই ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থান করেন। নীলাচলে অবস্থান-কালে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে বক্রেশ্বর-গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করতেন। হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব দিবসে এঁকে তাঁর কর্তব্যকর্মে বিশেষ সক্রিয় দেখা গিয়েছিল। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পরও বক্রেশ্বর কিছুকাল নীলাচলে অবস্থান করছিলেন। বক্রেশ্বরের এক শিষ্য ছিলেন গোপালগুরু। বক্রেশ্বরের অবস্থানকাল ষোড়শ শতাব্দী।

এঁর নিবাস ছিল ত্রিবেণীর নিকট গুপ্তিপাড়া গ্রামে। কোন ব্রাহ্মণ কুলেই এঁর জন্ম হয়েছিল। অতি অল্প বয়সেই বক্রেশ্বর বহুশাস্ত্রে বিশারদ হন। ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠায় ইনি পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হন। যৌবনে সংসার-বিরাগী হয়ে বক্রেশ্বর শান্তিপুর গিয়ে অদ্বৈত আচার্যের নিকট যোগ শিক্ষায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং যোগসিদ্ধি লাভের পর মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করেন।

বখ্‌তাবর খাঁ—১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "মিরাৎ-ই-আলম" নাম একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তাতে মহানাদের রাজবংশকে অতি সুপ্রাচীন রাজবংশ বলে উল্লেখ করেছেন।

বখ্‌তিয়ার খিলজী—ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী দ্র০।

বখ্‌তিয়ার মৈস্থর—যে বারজন আওলিয়া বাংলার দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে মুসলমান ধর্মপ্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন, বখ্‌তিয়ার মৈস্থর তাঁদের অন্যতম। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সন্দীপে বাস করতেন। সন্দীপের রোহিণী নামক স্থানে এই ফকিরের আস্তানা আছে।

বজ্রদেব চান্দেল্ল—জেজাক ভুক্তির (বর্তমান বুন্দেলখণ্ড) চান্দেল্ল-বংশীয় যশোবর্মার পুত্র বজ্রদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অঙ্গ (বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব বিহার প্রদেশ) ও রাঢ়দেশ (পশ্চিম বাংলা) জয় করেছিলেন।

বজ্রবিনোদ—ইনি ছিলেন সম্রাট

আকবর কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার কানুনগো ভগবান রায়ের ভ্রাতা। ভগবানের মৃত্যুর পর বঙ্গবিনোদ ঐ কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন। ইনি বিশেষ যোগ্যতাব সঙ্গে উক্ত কার্য সম্পাদন করতেন। এঁর নামানুসারে মালদহে "বিনোদ নগর" ও ঢাকায় "রায়বাজার" প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁর কাযকালে ঢাকা ছিল বাংলার রাজধানী। সায়েস্তা খাঁব শাসনকালে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিনোদ পরলোক গমন করেন।

বঙ্গসেন—গদাধব সেনের পুত্র এবং একাদশ-দ্বাদশ শ তা ব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি কাঞ্জিকানগবে বাস কবতেন। এঁব রচিত 'চিকিৎসা-সারসংগ্রহ' এবং 'বঙ্গসেন' নামক বৈদ্যক গ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ। নিশ্চলকরের রত্নপ্রভায় বঙ্গসেন-সংগ্রহের উল্লেখ আছে। শুনা যায় ইনি 'আখ্যাত-ব্যাকরণ' নামে একখানি ব্যাকবণ রচনা কবেছিলেন। ইহা শিক্ষার্থীদের অপরিহায গ্রন্থ। এঁর নিবাস ছিল কাঞ্জিকা গ্রামে। কারুর কারুব মতে এই গ্রামই রাঢের কাঞ্জিবিল্লী গ্রাম।

বজাল—বাংলার নবাব নাসিরুদ্দিন হুমায়ুনেব সেনাপতি। ১৫৩২ সালে নাসিরুদ্দিন আসাম আক্রমণ করলে বজাল এই যুদ্ধে নিহত হন।

বজ্রগর্ভা ভৈরবী—বর্ধমানের পাণ্ডুয়া রেল ষ্টেশনের অদূরে যে পেঁড়োর মন্দির আছে ঐখানে এক সময় পাণ্ডুভূমি বিহার ছিল। সেই বিহাবে বহু বিদ্বান ও বিদূষী বৌদ্ধ বাস করতেন। বজ্রগর্ভা ভৈরবী তাঁদেব অন্যতমা। এঁর উপাধি ছিল বোধিসত্ব দশ ভূমীশ্বরী।

বজ্রদত্ত—মহাভারতের যুগে প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের রাজা। এঁব পিতার নাম ভগদত্ত এবং পিতামহ নরক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এঁরা দুজনে দুর্যোধনেব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বজ্রদত্ত কর্তৃক ধৃত হওয়ায় প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে। তাতে বজ্রদত্ত পরাজিত হয়ে পাণ্ডবদেব সামন্তশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন।

বজ্রপাণি বৈদ্য—বাংলার পাল-বংশীয় নরপতি নবপালদেবের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। এই বজ্রপাণি বৈদ্যই গদাধর মন্দিবের প্রশস্তি রচনা করে-ছিলেন।

বজ্রবর্মা—পা ল বা জ বং শে ব ভাঙ্গনের সময় ইনি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন। এঁর রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেব প্রথম দিক। ইনি অঙ্গদেশে প্রবল পবাক্রান্ত রাজা হয়ে উঠেছিলেন। এঁব রাজবংশ ইতিহাসে বর্ম রাজবংশ নামে খ্যাত। এঁরা উড়িষ্যার সিংহপুর অথবা দক্ষিণ-রাঢস্থ সিংহপুর বা বর্তমান হুগলী জেলার সিংহপুর বা সিঙ্গুরের আদি অধিবাসী। বজ্রবর্মা একাধারে বীর, কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। এঁর পুত্র

জাতবর্মা বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিলেন।

বটুদাস—বাংলার স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। এঁরই পুত্র বিখ্যাত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রণেতা শ্রীধর দাস।

বটু মিত্র—বাংলার সেন রাজবংশের রাজা বল্লালসেনের শ্বশুর। এঁরই কন্যা লক্ষ্মণাকে বল্লালসেন বিবাহ করেছিলেন।

বটেশ্বর স্বামীশর্মা—চম্পাহট্টবাসী কৌৎস গোত্রজ পণ্ডিত ভট্টের পুত্র। প্রখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত। অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী।

বড় খাঁ গাজী—মুসলমান ধর্ম প্রচারক পীর জাফর খাঁ গাজীর পুত্র। ইনিও মুসলমান ধর্ম প্রচার করতেন। ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে আঠার-ভাটির রাজা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় খাঁ গাজীর প্রথমে বিবাদ ও পরে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। বড় খাঁ গাজীর দুই পুত্র—রহিম খাঁ গাজী ও করিম খাঁ গাজী। ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে বড় খাঁ গাজীর মৃত্যু হয়।

বৎসাচার্য—এক সন্ন্যাসী এবং পুঁটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাগচি উপাধিধারী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশীয় কুলীন। টোডরমল্ল লস্করপুর পরগণা বৎসাচার্যের পুত্র পীতাম্বরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। বৎসাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বরই প্রথম 'রাজা' উপাধি পান।

বদর পীর—পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা ইসলাম ধর্ম প্রচারক। এঁর পুরা নাম বদর উদ্দীন আল্লামা। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। চট্টগ্রামের এক পাহাড়ের উপর ইনি চাটি জ্বালিয়ে বাস করতেন। বর্তমানে উহা 'বদর চাটি' নামে পরিচিত। এই বদরপীরের চাটি থেকেই নাকি 'চাটিগ্রাম' বা 'চাটগাঁও' নাম হয়েছে। পীর বদরের স্থানীয় ভক্তগণ এঁকে চট্টগ্রাম শহরের 'অভিভাবক দরবেশ' বলে থাকে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান মাঝি-মাল্লা বা নদীপথ পারাবারের সময় বদরপীরের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত জানায়। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় এঁর নামোল্লেখ আছে।

বদর শাহ—একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে ইনি এসেছিলেন।

বদিউদ্দিন—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম। ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত বাহুলী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'খোন্দকার ও কাজী' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত 'ফতেমার ছুরৎনামা' ও 'চিত্তইমান' নামক গ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায়। এঁর পুত্রের নমে আমান সাহ কাজী।

বদিওজ্জমান খাঁ—বীরভূমের অধিপতি। ১৭১৮ সালে এঁর পিতা আসাদুল্লা খাঁর মৃত্যুর পর ইনি

বীরভূমের রাজা হন। ইনি মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হতে 'রাজা' উপাধি ও একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইনি হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে দেখতেন। ইনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

বর্ধমান বা **মহাবীর**—জৈন ধর্মমতে জৈনধর্ম প্রবর্তক বর্ধমান বা মহাবীরের জন্মস্থান বর্ধমান। ইনি বৌদ্ধদেবের সমসাময়িক। বুদ্ধদেবের ন্যায় ইনিও অহিংসা মন্ত্রের প্রচারক ছিলেন। এঁরই নামানুসারে এঁর জন্মস্থানের নাম হয়েছে বর্ধমান। বর্তমানে বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার নাম।

বর্ধমানোপাধ্যায়—মিথিলার বিখ্যাত ন্যায়াচার্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র ও ছাত্র। এঁর টীকাসমূহের নাম 'প্রকাশ' হলেও নৈয়ায়িক সমাজে 'উপায়' নামে পরিচিত। সেজন্য ইনি 'উপায়কারক' পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ অপুত্রক ছিলেন। এঁর কন্যার বহু কন্যাসন্তান ছিল। এঁর অভ্যুদয়কাল ১৩৫০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর রচিত গ্রন্থ : 'অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ', 'গৌতমসূত্রের টীকা', 'ন্যায়নিবন্ধ-প্রকাশ', 'ন্যায়পরিশিষ্ট-প্রকাশ', 'কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ', 'লীলাবতী প্রকাশ', 'তর্কপ্রকাশ', 'মণিপ্রকাশ'। তাছাড়া, বর্ধমান 'স্মৃতিপরিভাষা', 'শ্রাদ্ধপ্রদীপ', 'আচার-প্রদীপ' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচনা করে মিথিলার একজন পরম প্রামাণিক স্মার্তগ্রন্থকার মধ্যে পরিগণিত হয়েছিলেন। নব্যন্যায়ে ইনি ছিলেন অতুলনীয়।

বনদুর্লভ বা **বনদুর্লভ**—একজন বাঙালী কবি। এঁর নিবাস সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম। এঁর রচিত গ্রন্থ 'দুর্গা বিজয়'। এই পুস্তকে ইনি সৃষ্টির পর গৌরীর জন্ম হতে গণেশের জন্ম পর্যন্ত দুর্গা চরিত্র বর্ণনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বর্তমান ছিলেন।

বনপাল—বাংলার পালবংশের একজন রাজা। সম্ভবতঃ ৮৩৭-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেছিলেন।

ব ন মা ল—আনুমানিক নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (বর্তমান আসাম) রাজত্ব করেন। ইনি ছিলেন মহারাজ হর্জর বর্মার পুত্র। এঁর অনুশাসন থেকে জানা যায় এরা নরক ও ভগদত্তের বংশীয় বলে দাবী করতেন। অনুশাসনে লিখিত আছে—"ক্রোধ বা হাস্যে তাঁহার মুখ-বিকৃতি কেউ দেখেন নাই, কোন নীচ বা অভদ্র কথা তিনি উচ্চারণ করেন নাই, সর্বদা হিতবাক্য তাহার মুখে শোনা যাইত। তাঁহার বিশাল ও অতুল্য প্রাসাদশ্রেণী নানা চিত্র সমন্বিত এবং প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ছিল।" সেই প্রাচীন আদর্শে এখনো আসামে রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকে।

বনমালী আচার্য—প্রাচীন বৈষ্ণবচরিত গ্রন্থগুলিতে ঘটক বনমালী আচার্য ছাড়া আরও দু'জন বনমালীর নাম পাওয়া যায়। একজনের বিষয়ে লোচন দাস বলেছেন যে তাঁর "বিপ্রকুলে জন্ম" এবং নিবাস ছিল 'পূর্বদেশ বঙ্গে'। তিনি 'দারিদ্র্য জ্বালায় দগ্ধ' হয়ে স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষুক বেশে এদেশে চলে আসেন। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অসামান্য রূপমাধুরী প্রত্যক্ষ করে তিনি তাঁকে স্বয়ং ভগবান জ্ঞানে মূর্ছিত হলে গৌরাঙ্গ নৃত্য সংবরণ করে সেই বিপ্রকে কোলে তুলে নেন। লোচন দাস আর এক বনমালীর কথা বলেছেন। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনিও একদিন সংগীত-নৃত্যরত গৌরহরিকে 'হলায়ুধ বেশে' প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই বনমালীর পণ্ডিত উপাধিও ছিল। আবার দেবকীনন্দন এঁকে 'ভিক্ষুক বনমালী' এবং কবি কর্ণপুর 'ব্রাহ্মণ বনমালী' বলে উল্লেখ করেছেন। 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যে বনমালী পণ্ডিতই নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করতেন।

গৌরাঙ্গ-বিবাহের ঘটক বনমালীকে সকল গ্রন্থকারই বনমালী ঘটক বা বনমালী আচার্য বলেছেন। কেউই তাঁকে বনমালী পণ্ডিত বলেন নি। কবি কর্ণপুরও তাঁর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে' উপরোক্ত তিনজন বনমালীরই পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি একজন চতুর্থ বনমালীরও উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাম বনমালী কবিরাজ।

বনমালী ওঝা—বাংলা রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার পিতার নাম বনমালী ওঝা ও মাতার নাম মালিনী।

বনমালী কর—শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের প্রাচীনকালের চন্দ্রবংশীয় রাজা ঈশানদেবের ইনি মন্ত্রী ছিলেন।

বনমালী ঠাকুর—ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য উপাধি প্রদানপূর্বক সমসের গাজী উদয়পুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লক্ষ্মণমাণিক্য দ্র°।

বনমালী মিশ্র—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিবাহের ঘটক। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

বনমালী সরকার—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। এঁর আদি নিবাস হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে। এঁর পিতা আত্মারাম সরকার ভদ্রেশ্বর থেকে কলকাতার কুমারটুলিতে এসে বসবাস করেন। বনমালী পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান এবং কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতার ডেপুটি মেয়র ছিলেন। ব্যবসায় ইনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করে-

ছিলেন। এঁর কুমারটুলির মন্দির ও বাড়ী সেকালে কলকাতার একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। ১৭৫৬ সালে উহা তৈরী হয়েছিল।

বণিজ মোহাম্মদ—প্রাচীন বাঙালী মুসলমান কবি। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ইমাম সাগর'।

বন্দী মিশ্র—একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। এঁর পিতার নাম জগদীশ মিশ্র। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম—'যোগসুধানিধি', এঁর গ্রন্থের মাত্র পশুচিকিৎসা প্রকরণটি পাওয়া গেছে।

বপ্যট—পালরাজবংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের পিতা এবং দয়িত বিষ্ণুর পুত্র। বপ্যটের কীর্তিমালা সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইনি বহু শত্রু দমন করেছিলেন।

বয়েজিদ সুলতান—চট্টগ্রামের একজন মুসলমান সাধক। যে সকল মুসলমান সাধক ধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন ইনি তাঁদের অন্যতম। কথিত আছে ইনি খোরাসানের অন্তর্গত বোস্তাম নামক স্থানের রাজার পুত্র ছিলেন। রাজপদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং ক্রমে চট্টগ্রামে আসেন। ইনি একটি মৃৎ-পাত্রে প্রদীপ জ্বেলে অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত করে রাখতেন। চট্টগ্রামে মৃৎপাত্রকে চাট বলে। কথিত আছে এই চাট শব্দ থেকেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়েছে।

বরদরাজ বা **বরদাচার্য**—একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁর পিতার নাম রামদেব মিশ্র। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম—ন্যায়দীপিকা, তার্কিকরক্ষা, ন্যায়-কুসুমাঞ্জলীর 'বোধিনী' নামক টীকা, বসন্ততিলক।

বরেন্দ্র শূর—বারেন্দ্র কুলাচার্য-গণের মতে বরেন্দ্র শূর নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি আদিশূরের অধস্তন পঞ্চম বংশধর। এঁরই নামানুসারেই নাকি পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর বঙ্গের নাম হয় বরেন্দ্র।

বরেন্দ্র সেন—বাংলার অন্যতম স্বাধীন ক্ষত্রিয় সেনবংশীয় রাজা শুকদেব সেনের পুত্র প্রদ্যুম্ন সেন ও বরেন্দ্র সেন। এঁরা ছিলেন আদিশূরের দৌহিত্র। এই বরেন্দ্র সেনের নাম অনুসারেই বরেন্দ্রভূমির নাম হয়েছে।

বলদেব দাস—একজন পদকর্তা। এঁর রচিত একটি মাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে উড়িষ্যায় বলদেব বিদ্যাভূষণের জন্ম হয়। 'বেদান্তস্যমন্তক' প্রণেতা রাধাদামোদর ছিলেন বলদেবের গুরু এবং উদ্ধবদাস ছিলেন তাঁর শিষ্য।

বলদেব রচিত গ্রন্থসমূহ—গোবিন্দ-ভাষ্য, প্রমেয়রত্নাবলী ও সিদ্ধান্তরত্ন বা

ভাষ্যপীঠক। তাছাড়া, বলদেব 'ভগবদ্গীতা'র ও দশোপনিষদের টীকা রচনা করেছিলেন। 'কাব্যকুস্তভ' নামক একখানি অলঙ্কার গ্রন্থের নাম বিদ্যাভূষণের নামের সঙ্গে দেখা যায়। মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশে'র উপর তিনি 'সাহিত্যকৌমুদী' নামে একখানি টীকা এবং এই টীকার উপর 'কৃষ্ণানন্দিনী' নামক একটি টিপ্পনী তিনি রচনা করেছিলেন।

ইনি প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন, পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থের কান্তিমালা নামক টীকায় লিখিত আছে যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্যামানন্দ গোস্বামীর শিষ্য মুরারির অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। কেউ কেউ বলেন এঁর প্রতিষ্ঠিত 'গল্‌তার গাদী' নামে একটি সম্প্রদায় জয়পুরে আছে।

বলবর্মা—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা বনমালের পৌত্র এবং এবং জয়মালের পুত্র। দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (বর্তমান আসাম) রাজত্ব করতেন।

বলভদ্র দাস (মহাপাত্র)—ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি মেদিনীপুর জেলার রসুলপুর নদী তীরবর্তী হিজলী অঞ্চলের ভূস্বামী, মালাজেটিয়া দন্তপাটের অধিপতি গোপীনাথ পট্টনায়েকের বংশধর। বৈষ্ণবাচার্য শ্যামানন্দ দেবের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ দেবের সঙ্গে বলভদ্র-দুহিতা ইচ্ছাদেবীর বিবাহ হয়েছিল। বলভদ্র দাসকে মেদিনীপুরে অবস্থিত বাদসাহের কর্মচারীর নিকট হিজলীর রাজস্ব দাখিল করতে হত। এক সময় এঁর নিকট লক্ষাধিক টাকা বাকী পড়ায় এঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। তখন রসিকানন্দের পিতা রাজা অচ্যুতানন্দ বলভদ্রের টাকার জামিন হয়ে বলভদ্রকে মুক্ত করেন। এঁরই বংশে তেজ খাঁ মসনদ-ই-আলার প্রধান সচিব ভীমসেন মহাপাত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য—মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্গী। গৌরাঙ্গদেব যখন কানাইর-নাটশালা হতে নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বলভদ্রাচার্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিছুদিন গৌরাঙ্গ প্রভু মথুরা-যাত্রা করলে বলভদ্র তাঁর সঙ্গে যান। বলভদ্র নিজে রান্না করে মহাপ্রভুকে খাওয়াতেন। মহাপ্রভু বলভদ্রের সেবা ও পরিচর্যায় সন্তোষ লাভ করে পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করতেন এবং বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতেন। বলভদ্র ছায়ার মত চৈতন্যপ্রভুকে অনুসরণ করতেন। ইনি পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বলভদ্র মিশ্র—মোগল সম্রাট আকবরের অভিষেক কালে যে ৩২ জন হিন্দু মহাপণ্ডিতের নামযশ প্রচারিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ১৫ জন তার্কিক-তাঁদের ষষ্ঠ নাম হল বলভদ্র মিশ্র।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বলভদ্র অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পদ্মনাথ 'সময়ালোকে'র পুষ্পিকায় তাঁর বিশেষণ-পদ দিয়েছেন 'পরম প্রতিষ্ঠিত' এবং 'কিরণাবলী ভাস্কর', 'খণ্ডণদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁকে 'জগদ্গুরু' পদে ভূষিত করা হয়েছে। বলভদ্রের অধ্যাপনার বিষয় ছিল তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য সাংখ্য, বৈশেষিক, বেদান্ত, মহাভাষ্য এবং কর্ম-কাণ্ড অর্থাৎ মমীংসা ও ধর্মশাস্ত্র। তাঁর জন্মকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। তাঁর পিতার নাম বিষ্ণুদাস, মাতার নাম মাধ্বী, পত্নীর নাম 'বিজয়শ্রী'। তাঁর তিন কৃতী পুত্রের নাম বিশ্বনাথ, পদ্মনাভ ও গোবর্ধন।

বলভদ্র বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন—সন্দর্ভ (শিবাদিত্য-রচিত সপ্তপদার্থীর টীকা), কৈভাষাপ্রকাশিকা, তার্কিকরক্ষাটীকা, প্রমাণমঞ্জরী টীকা, দ্রব্যপ্রকাশবিমল, বৌদ্ধাধিকারপ্রকাশ ব্যাখ্যা প্রভৃতি।

বলভদ্র শুক্ল—হুগলী জেলার মহানাদ-নিবাসী। ইনি কুণ্ডতত্ত্বপ্রদীপ রচনা করেন। ইনি ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ জয়সিংহ দীক্ষিতের নামে উৎসর্গ করেন। এঁর পিতার নাম স্থবির।

বলভদ্র সোম—গৌড়ের রাজার ও হুগলী-চুঁচুড়ার প্রাচীন জমিদার বংশের পূর্ব পুরুষ। গৌড়ের ঘোরী বংশীয় রাজ-পরিবারের প্রধান কর্মচারী গোপীচন্দ্র বসুর (পুরন্দর খাঁ) কন্যাকে ইনি বিবাহ করেছিলেন। বলভদ্র যশোহর জঙ্গলের পুরাতন রাস্তাটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

বলরাম—কলকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ। ইনি প্রয়োগরত্নমালা, মুক্তিচিন্তমণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের পুত্র। বলরাম প্রবোধ-প্রকাশ নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বলরাম কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। ইনি সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী। মুকুন্দরামের ন্যায় এঁরও উপাধি ছিল "কবিকঙ্কণ"। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর পুথির বন্দনা-পত্রে লিখেছেন, "গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।"। সুতরাং বলরাম হয়ত মুকুন্দরামের শিক্ষাগুরু ছিলেন। আবাব "গীতের গুরু" কথাটিতে বলরামকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবিও বোঝাতে পারে। এঁর রচিত চণ্ডী-মঙ্গল মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

বলরাম ঘোষ—কলকাতার উত্তর অঞ্চলের কাঁটাপুকুরের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের রামসন্তোষ ঘোষের পুত্র। ইনি পরে ফরাসী-চন্দন নগরে বাস করেন এবং বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। কথিত আছে, ফরাসী গভর্নর ডুপ্লে শাসন-সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে এঁর পরামর্শ

গ্রহণ করতেন। বলরাম ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। এঁর রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি ও শিবহরি নামে চারি পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রীহরিই স্বনামখ্যাত হরি ঘোষ।

বলরাম চক্রবর্তী (কবিশেখর)—অষ্টাদশ শতাব্দীর 'বিদ্যা ও সুন্দরে'র কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্যের অন্যতম প্রণেতা। রচিত কাব্যের নাম 'কালিকা মঙ্গল'। কবি সম্ভবতঃ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ের লোক। কবির পিতার নাম দেবীদাস আচার্য। পিতামহ চৈতন্য, মাতা কাঞ্চনী। তিনি ছিলেন বিষ্ণু দাসের বংশধর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সভাসদ্।

বলরামের কাব্যে গ্রাম্যতা দোষ নেই। তাঁর রচনা সহজ, সরল ও পাণ্ডিত্যবর্জিত। 'কবিশেখর' ছিল বলরামের উপাধি। ভণিতায় অনেক-স্থলেই তিনি নামের পরিবর্তে এই উপাধি ব্যবহার করেছেন।

বলরাম দাস—চৈতন্যোত্তর যুগের বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে বলরাম দাস অন্যতম। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার উত্তর পূর্বাংশে দোগাছিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বলরাম দাস নামে একাধিক বৈষ্ণব কবির উল্লেখ দেখা যায়। আলোচ্য বলরাম দাস ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং নিত্যানন্দ-শিষ্য। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় ইনি 'সংগীত কারক' বলরাম দাস নামে উল্লিখিত হয়েছেন। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। তার মধ্যে বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্টতর। পদকর্তাদের মধ্যে বলরাম দাস উচ্চ এবং স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। বাৎসল্য রসের কবি হিসেবেই বলরাম সুপরিচিত। এ বিষয়ে ইনি রামানন্দ বসুকে অনুসরণ করেছিলেন।

বলরাম দাস—একজন গ্রন্থকার। এঁর রচিত গ্রন্থ 'বৈষ্ণব বিধান'।

বলরাম দাস—একজন গ্রন্থকার। এঁর রচিত গ্রন্থ 'সারাবলী'।

বলরাম দাস—একজন পদকর্তা। দীনবলরাম নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন। এঁর রচিত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

বলরাম দাস—একজন পদকর্তা। ইনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কবাব পর ইনি পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের দোগাছিয়া গ্রামে বসবাস করেন। এঁর পিতার নাম সত্যভানু উপাধ্যায়। ইনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রবণ ছিলেন এবং দিবারাত্রি গৌরগুণগানে মত্ত থাকতেন। নিত্যানন্দপ্রভু এঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে স্বীয় শিরোভূষণ পুরস্কারস্বরূপ এঁকে প্রদান করেন। এঁর বংশধররা এখনো এই উপাধি

ধারণ করেন। পূর্বলীলায় বলরাম সুমন্দিরা সখী সাজতেন।

বলরাম দাস—'প্রেমবিলাস-রচয়িতা' নিত্যানন্দ দাসের পূর্বনাম ছিল বলরাম দাস। নিত্যানন্দ দাস দ্র°।

বলরাম পঞ্চানন—সম্ভবত বাঙালী। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এঁর রচিত একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'প্রবোধপ্রকাশ'। ইহা একটি শৈব ব্যাকরণ। এতে স্বরবর্ণের নাম 'শিব' ও ব্যঞ্জন বর্ণ-গুলিকে অভিহিত করা হয়েছে 'শক্তি' নামে।

'ধাতুপ্রকাশ' নামে একটি ধাতুপাঠ ও বলরামের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়।

বলরাম দাস মাধবী—রাণা-ঘাটের দু'ক্রোশ পূর্বে কাম্যষট্পুরের ভূম্যধিকারী শ্রীদাম তরফদারের ঔরসে ও কৃপাময়ীর গর্ভে এঁর জন্ম হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। পারসিক ভাষায় এঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। ইনি বাংলার নবাব হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন। চট্টগ্রামের উপর মগের আক্রমণকালে ইনি চতুর্থ সেনাপতি হয়ে অপূর্ব রণকৌশল দেখিয়ে পরাগল খানের প্রীতি উৎপাদনপূর্বক হুসেন শাহের কাছ থেকে 'খান' উপাধি ও একটি গ্রাম পান। পরে ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁর রচিত গ্রন্থ 'শ্রীপতিতপাবনাবতার'।

বলরাম রায়—ভুলুয়ার (বর্তমান নোয়াখালী) রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন। এঁর রাজত্বকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক।

বলরাম সিংহ—ব্যাস সিংহের পুত্র এবং কান্দী রাজবংশের পূর্বপুরুষ। ইনিই সর্বপ্রথম কান্দীর অরণ্যময় অংশকে জনপদে পরিণত করে গৃহাদি নির্মাণ পূর্বক বাস করতে থাকেন। এঁর অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী।

বলরাম হাড়ী—'বলরাম ভজা' নামে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৮৫ সালে বলরাম নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় এক হাড়ীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫০ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

বলাই দাস—একজন কবি ও পদকর্তা। 'বলাই দাস' ভণিতায় একটি মাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। "কোন্ বনে গিয়াছিলা ওরে রাম কানু" ইত্যাদি 'উত্তরগোষ্ঠবিষয়ক' এই পদটির অব্যবহিত পরেই বলরাম দাসের দু'টি পদ এবং উহার আগেও কয়েকটি পদ আছে। এ জন্য 'বলাই দাস' স্বতন্ত্র কোন পদকর্তা না হয়ে 'বলরাম দাস' নামেই প্রচলিত অপভ্রংশ রূপ বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি না থাকায় বলাই দাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে অনুমিত হন। এঁর অবস্থিতি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী

বলাই বৈষ্ণব—একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। হুগলীজেলার অন্তর্গত পিয়াসপাড়া গ্রামে সদ্গোপ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম রামকমল। তখনকার সুপ্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা বংশীবদন ছিলেন এঁর প্রপিতামহ। এই প্রপিতামহ সর্বত্র মান, মাথুর, গোষ্ঠ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলা গেয়ে বেড়াতেন। এজন্য ইনি বৈরাগী বা বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত হতেন। সেই থেকে বংশের এই বৈষ্ণব উপাধি। বলাই বৈষ্ণব ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালাদের সমসাময়িক।

বলি ভদ্রাচার্য—একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। ইনি মাধবকর রচিত নিদান গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেছিলেন।

বলি রাজা—হরিবংশের বিবরণ থেকে জানা যায় বঙ্গ, রাঢ় ও পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রের সমগ্র ভূভাগের উপর ইনি রাজা ছিলেন। তখন এই ভূভাগের নাম বঙ্গদেশ হয়নি। ভারত যুদ্ধের প্রায় পাঁচ শ' বছর আগে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ইনি রাজত্ব করতেন। আরও জানা যায় রাজা বলি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে ঊর্ধ্বরেতা হোলে বংশরক্ষার সমস্যা দেখা দেয়। একদিন গঙ্গাস্নানের সময় রাজর্ষি বলি অন্ধ মুনি দীর্ঘতমাকে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে দেখলেন। অনেক অনুনয় করে তিনি সেই মুনিকে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। মুনির ঔরসে রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্মক, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কুমারগণ যৌবনে পদার্পণ করলে মহারাজ বলি নিজ রাজ্য তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। বিভক্ত রাজ্য পাঁচটি রাজকুমারদের নামানুসারে অভিহিত হতে থাকে।

বল্লভ—সনাতন-রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও কৃপা লাভ করেন। কিন্তু পূর্ণ কৃপালাভ করার অল্পদিন পরেই এঁর মৃত্যু হয়। বিখ্যাত জীব গোস্বামী এঁর পুত্র। চৈতন্য চরিতামৃতে এঁর সম্বন্ধে লেখা আছে, "অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ"। সুতরাং এঁর প্রকৃত নাম বল্লভ এবং 'অনুপম মল্লিক' উপাধি। রূপ ও সনাতনের মতো বল্লভও হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সরকারে কাজ করতেন। ইনি রূপ ও সনাতনের সঙ্গে গৌড়েই বাস করতেন। ইনি ছিলেন রামভক্ত। ইনি রূপ গোস্বামীর সঙ্গে প্রয়াগে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে বল্লভ বা অনুপম মল্লিক 'অনুপ' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। তিনি সম্ভবতঃ গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বল্লভ—ব্যোমকেশ মুস্তফীর অনুমান অনুযায়ী কবি বল্লভ ছিলেন ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তীকালের। সম্ভবতঃ ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কবির কাব্যের নাম 'শীতলা-

মঙ্গল'। এঁর প্রদত্ত আত্ম পরিচয় থেকে জানা যায় এঁর পিতার নাম গোপাল, পিতামহ শ্যাম, প্রপিতামহ চৈতন্য, বৃদ্ধ প্রপিতামহ পুরুষোত্তম। কবি সম্ভবতঃ বসন্ত-চিকিৎসক গ্রহবিপ্র ছিলেন। ইনি এঁর কাব্যে চৌষট্টি প্রকার বসন্ত রোগের বর্ণনা দিয়েছেন।

বল্লভ ঠাকুর—শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা।

বল্লভ দাস বা বল্লভীকান্ত দাস, 'ভক্তিমূর্তি' ও 'ভক্তি-অধিকারী'—শ্রীনিবাস আচার্যের প্রিয়শিষ্য। বৈদ্য জাতি ও কবিরাজ উপাধিধারী চিকিৎসক। ঘনশ্যাম চক্রবর্তী বলেন যে, বল্লভ দাসের এতই ভক্তিবল ছিল যে, এঁকে দেখলে পাষণ্ডগণ ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হত। বল্লভ দাস কুলীন গ্রামবাসী ও শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে:

"বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর একান্ত ভক্ত॥"

আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। ইনি কতকগুলি পদ রচনা করেছিলেন। একটি পদে এই বলে খেদ করেছেন যে, ইনি শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র-গোবিন্দদাসের তিরোধানের পরও জীবিত ছিলেন।

বল্লভ দাস বা শ্রীবল্লভ—ইনি ছিলেন বিখ্যাত বংশীবদন দাসের প্রপৌত্র, চৈতন্যদাসের পৌত্র এবং শচীনন্দনের পুত্র। ইনিও একজন পদকর্তা ছিলেন। এই বল্লভদাস "বংশীলীলা" গ্রন্থে স্বীয় প্রপিতামহের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। ইনি ঠাকুর নরোত্তমের সমসাময়িক এবং তাঁর প্রতি এঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। একটি পদে লিখেছেন:

"নরোত্তম দাস চরণে বহু আশ
শ্রীবল্লভ মন ভোর।"

অন্য একটি পদে ইনি ঠাকুর মশায়ের রূপ বর্ণনা করেছেন। এইজন্য কারুর কারুর মতে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রাধা বল্লভই 'বল্লভ' ভণিতায় এই পদ-রচনা করেন। এঁর "রসকদম্ব" নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

বল্লভ ভট্ট বা বল্লভাচার্য—ত্রৈলঙ্গ দেশীয় লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি দাক্ষিণাত্যের বিজয়ানগরাধিপ কৃষ্ণদেবের সভাসদ্ স্মার্ত-ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেছিলেন। গোকুল, উজ্জয়িনী প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট স্থানগুলিতে ইনি মাঝে মাঝে বাস করতেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমনকালে বল্লভ ভট্ট প্রয়াগের নিকটস্থ আউলি-গ্রামে বাস করছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রয়াগে এলে বল্লভ-ভট্ট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে নিজ গৃহে নিয়ে যান। এবং সবংশে তাঁর পাদোদক গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুকে 'ইনি নূতন কৌপীন-বহির্বাস পরিয়ে

যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। পরে ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। এবং মহাপ্রভুর প্রভাবে ইনি কিশোর কৃষ্ণের উপাসক হয়ে উঠেন। এই বল্লভ-ভট্ট বা বল্লভাচার্যই বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইনি "সুবোধিনী" নামে ভাগবতের যে টীকা রচনা করেন, তাহাই বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ। বল্লভাচার্যের পুত্রের নাম বিত্তলনাথ। সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট বল্লভাচার্য শ্রীগোসাঁইজী নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

বল্লভা—লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠা মহিষী। ইনি ছিলেন অত্যন্ত অনুদার। ধর্মকর্ম অপেক্ষা রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতি তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল। নূরজাহানের মতো ইনিও প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে গৌড়ের শাসন ব্যাপারে দিবারাত্রি হস্তক্ষেপ করতেন। সুযোগ পেলে স্বামী লক্ষ্মণসেনের নামে নিজ হুকুম-নামাও জারী করতেন। এইভাবে রাজকাজে হস্তক্ষেপ করার জন্য সভাসদ্‌রা বিরক্ত হতেন। কিন্তু এই চতুরা রমণী তাঁদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতেন। এঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন চরিত্রহীন ভ্রাতা কুমারমিত্র। ভ্রাতা ও ভগ্নীর নীচ ব্যবহারে রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সপত্নী পুত্র বিশ্বরূপ সেনকে বল্লভা বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। কুচক্রী বল্লভা রাজ্যমধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে দেশে তুর্কী আক্রমণের পথ প্রশস্ত করেছিল।

বল্লভাচার্য—বল্লভভট্ট বা বল্লভাচার্য দ্র°।

বল্লভানন্দ শ্রেষ্ঠী—সুবর্ণবণিক শ্রেণীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। বাংলার সেন রাজবংশের রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক।

বল্লভীকান্ত দাস—বল্লভ দাস বা বল্লভীকান্ত দাস দ্র°।

বল্লালসেন—আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়সেনের মৃত্যু হলে বল্লালসেন পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'বল্লাল-চরিত' নামক দুখানি গ্রন্থ থেকে বল্লালসেনের কাহিনী জানা যায়। তিনি গৌড়রাজ গোবিন্দ পালকে পরাজিত করে মগধ জয় করেন। পিতা বিজয়সেনের জীবদ্দশায় ইনি মিথিলা জয় করে-ছিলেন। বল্লালসেন স্বীয় রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনি চালুক্যরাজকন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেন। পিতার অনুকরণে তিনি সম্রাটসূচক অন্যান্য পদবীর সঙ্গে 'অরিরাজ-নিঃশঙ্ক-শঙ্কর' এই নাম গ্রহণ করেছিলেন। বল্লালসেন যে কেবল রাজন্যবর্গের পরম মাননীয় ছিলেন তা নয়, তিনি বিদ্বানমণ্ডলীরও পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কারণ,

তিনি নিজে ছিলেন পরম পণ্ডিত ও জ্ঞানী পুরুষ। গুরু অনিরুদ্ধের নিকট তিনি বেদ-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি যাগ-যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানেরত প্রবীণ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। বল্লাল সেনই বাংলায় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক। বঙ্গীয় কুলজী গ্রন্থে কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তির সঙ্গে বল্লালসেনের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। খুব সম্ভব বল্লালসেনের একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। দুই তিন শত বৎসর পরেও ইহা বর্তমান ছিল। সমাজ সংস্কারের জন্যই তিনি বাঙালীর নিকট আজও বিশেষভাবে পরিচিত। সারাজীবন রাজ্যশাসন ও জ্ঞানচর্চায় অতিবাহিত করে বল্লাল বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্য-ভার অর্পণ করে শেষ জীবন সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক অতিবাহিত করেন। বল্লালসেন 'ব্রত-সাগর', 'আচার-সাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দান-সাগর', ও 'অদ্ভুত-সাগর' নামক পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে শেষের দুখানিই মাত্র পাওয়া যায়। প্রাচীন বহু ধর্মশাস্ত্র থেকে মত ও উক্তি উদ্ধৃত করে বল্লালসেন এই সকল গ্রন্থে হিন্দুর নানা আচার, প্রতিষ্ঠান, দান-কর্মাদি ও শুভাশুভাদি নানা নৈমিত্তিক লক্ষণ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

বসন্ত পাল—বাংলার পাল রাজবংশের রাজা প্রথম মহীপালের তৃতীয় পুত্র। বসন্তপাল ও তাঁর অগ্রজ স্থিরপাল বারাণসীতে ধর্মরাজিকা ও সাঙ্গ ধর্মচক্রের জীর্ণ সংস্কার এবং অষ্ট মহাস্থান শৈল বিনির্মিত গন্ধকুটী নতুন করে নির্মাণ করিয়েছিলেন।

বসন্ত রায়—কবি ও পদকর্তা। জন্ম: ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূরসুট পরগণায় স্বনামধন্য ভবানন্দ মজুমদার (রায়) এঁর পিতা। 'বসন্তকুমার' কাব্যগ্রন্থ এঁর রচিত। এছাড়া, এঁর রচিত অনেক পদও আছে। ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

বসন্ত রায়—একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ও পদকর্তা। "যতদূর জানা যায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথই "সাধনা" পত্রিকায় প্রথমে বসন্ত রায় সম্বন্ধে দু-তিনটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখে এঁর রচনার অপূর্ব ব্যঞ্জনা প্রদর্শিত করে বসন্ত রায়কে বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদিগের তুলনায় এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর কবি বলে নির্দেশ করেন। 'ভক্তিরত্নাকর' মতে বসন্ত রায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং ইনি শেষ বয়সে বৃন্দাবনবাসী হয়েছিলেন। গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত পদটি থেকে বসন্ত রায় যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা জানা যায়,—

"গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত
ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥"

বসন্ত রায়ের 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ', 'নিত্য রাস' ও রাসলীলান্তে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি উক্তি-প্রত্যুক্তি আত্ম-নিবেদনের পদগুলি

বিখ্যাত। বৈষ্ণবসমাজে ইনি অতিশয় সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন।

বসন্ত রায়—রাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু অনন্তরাম ওঝা সিন্দুরী ও শাখিনী গ্রাম গুরুদক্ষিণা পেয়েছিলেন। এঁরই বংশধর বসন্ত রায় আট পরগণার অধিকারী ছিলেন। এঁর পুত্র রাজীব রায় অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন।

বসন্ত রায় (রাজা)—ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বিখ্যাত বার-ভূঞার অন্যতম মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। ইনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের খুল্লতাত ভ্রাতা। এঁর পিতার নাম গুণানন্দ এবং পিতামহ রামচন্দ্র গুহ। এঁর বাল্য নাম ছিল জানকীবল্লভ। বসন্ত রায় বাংলার তৎকালীন নবাব সুলেমানের পুত্র দায়ুদের সহপাঠী ছিলেন। পারস্য ভাষায় এঁর বিশেষ অধিকার ছিল। দায়ুদ সিংহাসনে আরোহণ করে এঁকে বসন্ত রায় উপাধি দিয়ে অমাত্যপদে বরণ করেন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্য বিস্তার ও রাজ্যশাসনে বসন্ত রায় তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে ইনি পিতার অধিক স্নেহ করতেন। এঁর 'গঙ্গাজল' ছিল একখানি সুবৃহৎ খড়্গ। ইনিই ছিলেন প্রতাপাদিত্যের রণ-গুরু। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এঁর মনোমালিন্য ঘটে। একবার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বসন্ত রায় বহু গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করেন। প্রতাপাদিত্যও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রতাপ উপস্থিত হয়েছেন এমন সময় শ্রাদ্ধকার্যে উপবিষ্ট বসন্ত রায় গঙ্গাজল ফুরিয়ে যাওয়ায় ভৃত্যকে গঙ্গাজল আনতে আদেশ করলেন। প্রতাপ ভুল বুঝে মনে করলেন তাঁকে হত্যা করার জন্যই বোধহয় খুল্লতাত বসন্ত রায় তাঁর "গঙ্গাজল" খড়্গ আনতে আদেশ করছেন। জ্ঞানহারা হয়ে প্রতাপাদিত্য স্বীয় তরবারি কোষ-মুক্ত করে বসন্ত রায়কে হত্যা করলেন (১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

বসুদেব নারায়ণ—চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র ও রাজা প্রতাপাদিত্যের অন্যতম দৌহিত্র। রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তিনারায়ণ মুসলমান হলে তাঁর অনুজ সহোদর বসুদেবনারায়ণ রাজা হয়েছিলেন। ইনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় বীর ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এঁর রাজধানীতে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

বসুদেবী—বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের জ্যেষ্ঠা মহিষী। ইনি ছিলেন অনন্য-সাধারণ বিদুষী ও গুণবতী রমণী। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় যেসব সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হত, তাতে জয়দেব, উমাপতিধর প্রভৃতির সঙ্গে বসুদেবীও অংশ গ্রহণ করতেন। দানে ছিলেন মুক্তহস্ত। রাজকোষ থেকে যে বিপুল অর্থ এঁর জন্য বরাদ্দ

ছিল তা প্রায় সম্পূর্ণই ইনি সাধু সজ্জন ও দীনদুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এজন্য প্রজারা এঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। ইনিই শেষ গৌড়েশ্বরী। বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগিণী হলেও বসুদেবী সকল সম্প্রদায়ের ধর্মনেতাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন।

বসুধা দেবী—শালিগ্রামবাসী সূর্যদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং প্রভু নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠা পত্নী। নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবাদেবী ছিলেন এঁর কনিষ্ঠা ভগিনী। বসুধার একমাত্র পুত্রের নাম বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র ও কন্যার নাম গঙ্গাদেবী। ইনি খড়দহেই বসবাস করতেন। এঁর জীবিতকাল ষোড়শ শতাব্দী।

বহরম খাঁ (নবাব বাহাদুর)—১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন।

বহুলধ্বজ—মহাভারতীয় যুগে প্রাচীন তাম্রলিপ্তরাজ ময়ূরধ্বজ ও তৎপুত্র তাম্রধ্বজের সেনাপতি। তাম্রলিপ্তরাজারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগদান করলে বহুলধ্বজ তাঁদের হয়ে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণে ইনি রাজা তাম্রধ্বজকে সহায়তা করেছিলেন। এঁর অবস্থিতি কাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী।

বাক্‌পতি—একজন কবি। যশোধর্ম কর্তৃক লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের সময় ইনি তৎ কর্তৃক বন্দী হন। বন্দীশালায় বাক্‌পতি গৌড়বধ কাব্য রচনা করেন। অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী।

বাক্‌পাল—বঙ্গরাজ ধর্মপালের (৭৭০-৮২০ খ্রীঃ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সমগ্র উত্তর ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় বহুযুদ্ধে বাক্‌পাল ধর্মপালের সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে এঁর বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মপালের আর্যাবর্ত জয়ে বাক্‌পাল বিশেষ সহায়ক ছিলেন।

বাকর খাঁ, মির্জা—পারস্যের রাজবংশ সম্ভূত। ইনি বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যাকে বিবাহ করে তাঁর সেনাপতিরূপে কাজ করেছিলেন।

বাকলি—একজন চর্যাপদ রচয়িতা।

বাকিংহাম, জন সিল্ক—কলকাতায় অবস্থিত ইংরেজ সাংবাদিক। 'ক্যালকাটা জানার্লের' সম্পাদক ছিলেন। ইনি স্বাধীনভাবে শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করায় কর্তৃপক্ষ এঁকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। জীবিতকাল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী।

বাঁকুড়া রায়—ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার আরড়া

ব্রাহ্মণভূমির রাজা ছিলেন। এঁর পিতার নাম বীরমাধব রায়। ইনি সদাশয় ও দানশীল রাজা ছিলেন। এঁর রাজত্বকালের সর্বপ্রধান ঘটনা দামুন্যা গ্রামনিবাসী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এঁর আশ্রয় লাভ করে অমর চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরামকে রাজা বাঁকুড়া রায় তাঁর পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বাঁকুড়া রায় মুকুন্দরামকে ভূসম্পত্তি প্রদান করে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

বাগরাজ গোস্বামী—একজন সাধু পুরুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মেদিনীপুর জেলার পাথরবেড়া গ্রামে রঘুনাথজিউ নামক বিগ্রহ ইনি স্থাপন করেছিলেন।

বাগদার আলি শাহ—একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ জালাল এমনির অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন।

বাগ্‌ভট—স্বীয় নামানুসারে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

বাগরাজ—মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী গগনেশ্বর প্রভৃতি পরগণা প্রাচীন কাগজপত্রে 'বাগভূম' নামে পরিচিত। প্রবাদ আছে এই স্থানে প্রাচীনকালে বাগরাজ নামে জনৈক অনার্য রাজা রাজত্ব করতেন।

বাচস্পতি ঘটক—প্রাচীন কুল-পঞ্জিকাকার। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কুলপঞ্জিকা'।

বাচস্পতি বৈদ্য—একজন প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রকার। রুগ্‌-বিনিশ্চয় গ্রন্থের আতঙ্কদর্পণ নামক টীকা ইনি প্রণয়ন করেছেন।

বাচস্পতি মিশ্র—খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ অদ্বৈত-বাদী, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও ষড়দর্শনের টীকাকার। এঁর আবির্ভাব কাল অষ্টম-নবম শতাব্দী। ইনি ছিলেন গৌড়রাজ ধর্মপালের সম-সাময়িক। ধর্মপাল এঁকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিতেন। এর ফলে ইনি নিশ্চিন্তমনে ষড়দর্শনের টীকা প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এঁর স্ত্রীর নাম ভামতী। এই ভামতীর নামে ইনি যে ভামতী বেদান্ত-দর্শন রচনা করেছিলেন তা অমর হয়ে আছে। ইনি অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান আচার্য। ইনি একাধারে সাধক ও বিদ্বান্ ছিলেন। এঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 'ব্রহ্মতত্ত্ব সমাক্ষ', সাংখ্য-কারিকার টীকা 'তত্ত্বকৌমুদী', পাতঞ্জল দর্শনের টীকা 'তত্ত্ববৈশারদী', ন্যায় দর্শনের টীকা 'ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য' ও 'ন্যায়সূচা-নিবন্ধ', পূর্বমীমাংসাদর্শনে ভাট্টমতে 'তত্ত্ববিন্দু' ও মণ্ডনমিশ্রের বিধি-বিবেকের টীকা 'ন্যায় কণিকা।'

বাচস্পতি মিশ্র—মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত গ্রন্থকার। ন্যায়শাস্ত্রে ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থসমূহ: (১) ন্যায়তত্ত্বালোক, (২) ন্যায়সূত্রোদ্ধার, (৩) ন্যায়রত্ন-

প্রকাশ, (৪) প্রত্যক্ষনির্ণয়, (৫) অনুমান-নির্ণয়, (৬) শব্দনির্ণয়, (৭) খণ্ডণোদ্ধার, (৮) চিন্তামণিপ্রকাশ, (৯) লীলাবতী টীকা। বাচস্পতি বাৎস্য-গোত্র 'পলিবাড' বংশের 'সমৌলি' শাখায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইনি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃভক্তি-তরঙ্গিণী রচনা করেন।

বাচস্পতি মিশ্র—একজন প্রাচীন কুলপঞ্জিকাকার। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম—'কুলরাম'।

বাঞ্ছানাথ—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। ইনি 'ভাবদর্পণ' নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন।

বাণকুমারী—বৌদ্ধ যুগের শেষে এই মহিলা মন্ত্র ও যাদুবিদ্যায় সিদ্ধা ছিলেন এবং ভৈরবী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

বাণপাল—বাংলার পাল রাজ-বংশের এক রাজা। সম্ভবতঃ ইনি সপ্তগ্রামে রাজত্ব করতেন। জানা যায় যে রাজা অহীপালের পুত্র বিভাণ্ড বাণরাজের মন্ত্রী ছিলেন।

বাণসেন—বাংলার সেনরাজ-বংশের এক রাজপুরুষ বাহুসেন ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের কুলুতে এক উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দশম বংশধর কবচসেন কুলুরাজ কর্তৃক নিহত হলে তাঁর স্ত্রী শিব-কোটে পলায়ন করেন। এবং এখানে বাণসেন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বয়োপ্রাপ্ত হয়ে বাণসেন শিবকোটের রাজা হয়েছিলেন। এঁর বংশধর তিন শতাব্দী পরে মণ্ডি রাজ্য স্থাপন করেন।

বাণীকণ্ঠ—একজন প্রাচীন বাঙালী গ্রন্থকার। ইনি 'মোহমোচন' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

বাণীকণ্ঠ, দ্বিজ—এঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচরিত'। কাব্যে আদিরসের বেশ আমেজ আছে। ভাগবতের মতো কাব্যটির কাহিনীও "কহিছেন শুকদেব শুনে পরীক্ষিত।" বড়াই কাব্যের একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিছু পদও ইনি রচনা করেছিলেন। গোষ্ঠলীলার একটি পদাংশের নিদর্শন,

"যাব না গোঠে মা যাব না গোঠে
রাখিতে নারিব ধেনু বলাই দাদার হঠে।
সব দিগে যাএ মাগো সভাকার ধেনু
আমারে বলেন দাদা আন গিএ কানু।"

কাব্যে ও পদাবলীতে কবির অক্ষমতারই পরিচয় বর্তমান। সুকুমার সেনের মতে কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার লোক নহেন।

বাণীকৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস, বাণী দ্র°।

বাণীনাথ—মাধব মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গৌরাঙ্গলীলাসহচর গদাধর পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর। এঁর জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রামে। ইনি জগন্নাথ

নামেও অভিহিত ছিলেন। পরে ইনি পিতার সঙ্গে নবদ্বীপবাসী হন। এঁর পুত্র নয়নানন্দ বা নয়ন মিশ্র গদাধর কর্তৃক দীক্ষিত হন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে বাণীনাথ মিশ্র নীলাচলে থাকতেন। সম্ভবত গদাধরের তিরোভাবের পূর্বেই বাণীনাথ দেহরক্ষা করেছিলেন।

বাণীনাথ পট্টনায়ক—রায় রামানন্দের ভ্রাতা ও ভবানন্দের পুত্র। এঁরা পাঁচ ভাই। পিতাপুত্র সকলেই উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র-দেবের অধীনে কার্য করতেন। মহাপ্রভু নীলাচলবাসী হলে ভবানন্দ বাণীনাথকে তাঁর সেবা-কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

বাণীনাথ বিপ্র—নদীয়ার চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীনিবাসী। ইনি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। নরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে যে মহোৎসব করেছিলেন তাতে বিপ্র বাণীনাথ উপস্থিত ছিলেন বলে প্রকাশ। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বাণীরাম ঠাকুর—একজন পাঁচালীকার। 'নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী এঁর রচিত।

বাণেশ্বর, "দ্বিজ"—পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'মনসামঙ্গল'। কাব্যের রচনাকাল ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

"মনসামঙ্গল ভাবে প্রথম বৈশাখ মাসে
শকাব্দা ষোলশ একচল্লিশে
ভাবিয়া ভবানী-হর ভণে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল প্রকাশে।"

বাণেশ্বর পণ্ডিত—প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর পূর্বে বাণেশ্বর পণ্ডিত ত্রিপুরার 'রাজমালা' নামক ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এঁর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত ঠাকুরবাড়ী গ্রাম। ইনি ত্রিপুরার তদানীন্তন রাজা ধর্মমাণিক্যের (১৪৩১-৬২ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত শোভাকরের বংশধর। সুকবি বিষ্ণু-সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন বাণেশ্বরের পিতামহ। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক রামদেব তর্কবাগীশ। বাণেশ্বর বাল্যকালে অপূর্ব স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। পিতার নিকট অধ্যয়ন করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বাণেশ্বর সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। সেখানে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কলহের ফলে বাণেশ্বর ঐ স্থান পরিত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে নবাব আলীবর্দী খাঁর শরণাপন্ন হন। কিছুদিন পরেই তিনি সেখান থেকে বর্ধমানে চলে যান। বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেন তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। বাণেশ্বর বর্ধমান রাজসভায় ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ছিলেন। চিত্রসেনের মৃত্যুর পর

-বাণেশ্বর পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাশ্রিত হন। কিছুদিন পরে বাণেশ্বর কলকাতায় শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কাছাকাছি কোন সময়ে বাণেশ্বর জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। বাণেশ্বরের রচনাবলী: (১) চিত্রচম্পূ, (বর্ধমান-রাজ চিত্রসেনের পরিচয়), (২) বিবাদার্ণব-সেতু (ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর অনুরোধে হিন্দুদের বিবাদ মীমাংসার গ্রন্থ), (৩) রহস্যামৃত, (৪) খণ্ডকাব্য, (৫) চন্দ্রাভিষেক-নাটক, (৬) কাশীশতক।

বাণেশ্বর রায়—১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি বাণেশ্বর রায় মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁর কাব্য-মধ্যে তাঁর ঊর্ধ্বতন চার পুরুষের উল্লেখ করা হয়েছে—স'রামের পুত্র আত্মারাম, আত্মারামের পুত্র বংশী রায়, বংশী রায়ের পুত্রত্রয়—প্রতাপ, হরিনারায়ণ ও রঘুনাথ; হরিনারায়ণের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সদাশিব ও কনিষ্ঠ বাণেশ্বর। কবির বাসস্থানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—'নিবাস চম্পকপুরী জন্ম রাইপুরে। বাণেশ্বরের ভাষা সুন্দর ও রচনা সুসংবদ্ধ। তাঁর সৃষ্ট বেহুলা চরিত্রে নূতনত্বের আভাষ পাওয়া যায়।

বাতায়ন নাথ—নাথপন্থী এক সিদ্ধপুরুষ।

বাদরুল ইসলাম শেখ—শেখ মইনউদ্দিন আব্বাসের পুত্র। বাংলার স্বাধীন রাজা রাজা গণেশকে (১৪০৫-১৪ খ্রীঃ) রাজসভায় উপস্থিত হয়ে অভিবাদন না করার জন্য নিহত হয়েছিলেন।

বাবু রায়—বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবু রায়ের পুত্র। আবু রায়ের মৃত্যুর পর ইনি তাঁর বিস্তৃত ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হন। ইনিই বর্ধমানের জমিদারী ক্রয় করে প্রকৃত-পক্ষে বংশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রতিপত্তির বীজ বপন করেন। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

বামদেব ভট্ট—মহারাজ আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ থেকে আনীত ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ মৌনভট্ট বল্লালসেন কর্তৃক শ্রোত্রিয় গণ্য হন। মৌনভট্টের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ বামদেব ভট্ট (১৪২০ খ্রীঃ) তাহিরপুর রাজবংশের স্থাপয়িতা। ইনি অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নিজ নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল গঠন করেছিলেন।

বামাদাসী—একজন মহিলা 'ঝুমুর সঙ্গীত' রচয়িত্রী। এঁর সঙ্গীত-গুলি অশ্লীলতা বর্জিত।

বামাদেবী—বিখ্যাত কবি জয়দেবের জননী।

বায়াজিদ্ খাঁ—বঙ্গ-বিহার-শাসনকর্তা সোলেমান কররানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৫৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর বায়াজিদ্ গৌড় সিংহাসন

লাভ করেন। কিন্তু মাত্র দেড় বছর পরে ইনি এঁর পিতৃব্য পুত্র ও ভগিনীপতি হাঁস্থ কর্তৃক নিহত হন।

বায়াজিদ রাজা—শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড়ের মুসলমান রাজা। ইনি ছিলেন ত্রিপুরাধিপতি প্রতাপ মাণিক্যের সামন্ত রাজা। একবার কোনো যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ প্রতাপ স্বীয় কন্যা রত্নাবতীর সহিত বায়াজিদের বিবাহ দেন। বায়াজিদ ১৪৯১ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বায়ুমল্ল—ষোড়শ শতাব্দীতে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা। ইনি ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এঁর রাজত্বকালে পাঠান সেনাপতি কতলু খাঁর সেনাগণ রাজা মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাত্রে জাহানাবাদ থেকে বিষ্ণুপুরে ধরে নিয়ে যায়। বায়ুমল্লই তাঁর উদ্ধার সাধন করে জাহানাবাদে পাঠিয়ে দেন।

বারওয়েল, রিচার্ড—১৭৪১ সালের ৮ অক্টোবর কলকাতায় এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতা উইলিয়াম বারওয়েল সে সময় বাংলাদেশের গভর্নর ছিলেন। ১৭৫৮ সালে ইনি একজন কেরানীরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত হন। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং আইন অনুসারে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল হন এবং বারওয়েল প্রভৃতি তাঁর মন্ত্রণা সভার সদস্যপদ লাভ করেন। গবর্নর জেনারেলের সমর্থক প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যতম সদস্য ফ্রেবারিং-এর সঙ্গে ১৭৭৫ সালে এঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল। ১৭৮১ সালে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮০৪ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

বারবক শাহ—নবাব নাসির-উদ্দিন আবুল মুজাফর মামুদ শাহের (১৪৪২-৬০ খ্রীঃ) পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি রুকনুউদ্দিন আবুল মুজাহিদ বারবক শাহ। পিতার জীবিতকালে ইনি সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। ইনি ন্যায়পরায়ণ ও ধামিক রাজা ছিলেন। এঁর রাজত্বকালে প্রজারা সুখে ছিল এবং গৌড়নগর উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। ১৪৭৪ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

বারা খাঁ—দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত বর্ধমানের সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন। ইনি ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে বিশ বিঘা মৌরসী জমি দান করেছিলেন। বারা খাঁ এখন হিন্দু-মুসলমানের নিকট পীররূপে শ্রদ্ধালাভ করে আসছেন। ইনি অত্যন্ত সুশাসক ছিলেন।

বালক—ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' জীমূতবাহনের 'ব্যবহার-মাতৃকা' ও 'দায়ভাগ' শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' এবং রঘুনন্দনের

'ব্রততত্ত্ব' প্রভৃতি বাঙালী রচিত স্মৃতি গ্রন্থে স্মার্ত বালকের উল্লেখ আছে। ঐ সব গ্রন্থে বালকের বচনেরও উদ্ধৃতি দেখা যায়। কিন্তু কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্য কোন অঞ্চলের স্মৃতিনিবন্ধে বালকের উল্লেখ নেই। স্বভাবতঃই বালককে বাঙালী বলে অনুমান করা অসমীচীন নয়। পাল-রাজত্বকালে সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে বালক জীবিত ছিলেন।

বালকৃষ্ণ রায়—ইনি বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজসভায় একজন খুব বিশ্বাসী, ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত কর্মচারী ছিলেন। এঁরই বিশেষ সহায়তায় মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হতে পেরেছিলেন।

বালপুত্র দেব—সুবর্ণদ্বীপ বা যবদ্বীপের রাজা। ইনি নালন্দা বৌদ্ধ-বিহারের খ্যাতির কথা শুনে সেখানে বৌদ্ধ বিহার তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। নালন্দা বাংলার পালবংশীয় রাজা দেবপালের রাজ্যভুক্ত থাকায় ইনি পত্র পাঠিয়ে দেবপালদেবকে পাঁচখানি গ্রাম বৌদ্ধবিহারে দান করতে অনুরোধ করেছিলেন এবং সেজন্য মূল্যও প্রদান করেন।

বাল্লক সর্দার—রাজা সীতারামের নমঃশূদ্র জাতীয় অন্যতম সেনাপতি। প্রসিদ্ধ সেনাপতি মেনাধনার ইনি ভগ্নিপতি ছিলেন। সীতারামের পতনের পরও ইনি তিন বছর তাঁর রাজ্য রক্ষা করেছিলেন। অবশেষে নাটোরের রামজীবন রায় এঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে এঁকে তাঁর সেনাপতি হতে অনুরোধ করেন। উভয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে পরস্পরের মিত্র হন। বাল্লক সর্দার রামজীবনের সেনাপতি হয়েও যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। একবার এক টাকিয়ার রাজা রূপেন্দ্র নারায়ণ নাটোর আক্রমণ করেছিলেন। বাল্লক সর্দারের বীরত্বেই সেবার রামজীবনের রাজধানী নাটোর রক্ষা পেয়েছিল।

বাসুদেব—পৌণ্ড্ররাজ অর্থাৎ উত্তর বঙ্গের পুণ্ড্র জাতির রাজা। কথিত আছে ইনি মহাভারতীয় যুগে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাসুদেব—লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষদিকে পূর্ববঙ্গে মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে মধুমথনদেব একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মধুমথন দেবের পুত্রই বাসুদেব। মধুমথন-দেবের মৃত্যুর পর বাসুদেব ঐ রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। এঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। এঁর পুত্রের নাম ছিল দামোদর দেব। এঁর অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী।

বাসুদেব ঘোষ—এঁরা ছিলেন তিন ভাই। অপর দুই ভাই গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ। 'পাট পর্যটনে' এঁদের সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে,

"অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম।" কেউ কেউ বলেন শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে মাতুলালয়ে বাসু ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের পূর্বনিবাস ছিল কুমারহট্টে। পরে এঁরা নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। তিন ভাইই মহাপ্রভুর অনুরক্ত অনুচর ছিলেন। এঁরা কীর্তনীয়া হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাপ্রভুর 'মুখ্য কীর্তনীয়া' বা প্রধান গায়নরূপে তাঁর লীলাসঙ্গী হতে পেরেছিলেন। 'রাধিকাজনম চরিতা'দি গেয়ে এঁরা গৌরাঙ্গপ্রভুকে আনন্দ দান করতেন। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে বাসুদেব প্রভৃতি তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং সম্প্রদায়-কীর্তনাদিতে যোগদান করেছিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেবকে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে প্রেরণ করেছিলেন। তমলুকে বাসুদেব ঘোষের পাঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিন ভাই সকলেই পদ রচনা করতেন। এঁদের মধ্যে পদকর্তা হিসাবে বাসু ঘোষই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁর প্রচলিত পদগুলির সংখ্যা আশির বেশী। মহাপ্রভুর অন্য কোন অনুচর এত পদ লেখেননি। খেতুরির উৎসবানুষ্ঠানগুলিতে প্রথমেই বাসু ঘোষের গৌরলীলা গান দিয়ে আরম্ভ করা হত। বাসু ঘোষ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বা গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক পদে নিত্যানন্দসহ রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরদাসাদির যে লীলা বর্ণনা করেছেন তা থেকেই 'দ্বাদশ গোপালে'র ধারণার উদ্ভব হয়ে থাকবে। বাসুঘোষের সব পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক। ইনি ছিলেন জাতিতে কায়স্থ এবং দিনাজপুরের রাজবংশ গোবিন্দানন্দ ঘোষের বংশধর বলে কথিত। কিন্তু কেউ কেউ তাঁকে সদ্গোপ জাতীয় বলে মনে করেন। বাসু ঘোষের রচিত অসংখ্য পদের মধ্যে কয়েকটি ব্রজবুলি পদও আছে। এঁর আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

বাসুদেব জ্যোতিষব্রাহ্মণ—ইনি ভারত পাঁচালীকার। এঁর নামে স্বর্গারোহণ পর্বের যে পুঁথি পাওয়া যায় তা উত্তর বঙ্গের। মৈথিল ব্রাহ্মণ রামঠাকুর ছিলেন বাসুদেবের গুরু। কবি লিখেছেন, "রামঠাকুরের এক উপাসক ব্রাহ্মণ, স্বর্গ-আরোহণ পদ করিল রচন। নাম তার বাসুদেব গোবিন্দের দাস, বাসুদেব নৃপতির রাজ্যত নিবাস।"

রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

বাসুদেব তর্কালঙ্কার—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। ইনি 'কীর্তি দীপিকা' নামক একখানি জাতক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বাসুদেব তালুকদার—পাবনা জেলার তারাশের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতার নাম শ্রীরামদেব। বাসুদেব তালুকদার নারায়ণ দেবচৌধুরী নামেও পরিচিত

ছিলেন। ইনি ঢাকার নবাব সরকারে কাজ করতেন। এঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে নবাব ইসলাম খাঁ 'চৌধুরাই তারাশ' নামক সম্পত্তি এঁকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন।

বাসুদেব দত্ত—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বাসুদেব দত্ত চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত চৈতন্য-ভক্ত মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মুকুন্দের পরেই বাসুদেব চৈতন্য-সঙ্গ লাভ করেছিলেন। অম্বষ্ঠকুলজাত এই বাসুদেব দত্ত নবদ্বীপে এসে অদ্বৈতাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নবদ্বীপে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তবে মাঝে মাঝে চট্টগ্রামে যাতায়াত করতেন। ইনি ছিলেন সংসারী ও গৃহস্থ। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক পর বাসুদেব দত্ত তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ "চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী' গ্রন্থে চন্দ্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়ের বর্ণনায় বাসুদেবকে বেশকারী বলা হয়েছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু শান্তিপুরে উপস্থিত হলে বাসুদেব ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন এবং মহাপ্রভু নীলাচলে গেলে ইনি বছরে একবার সেখানে গিয়ে চার মাস করে কাটিয়ে আসতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের মতো বাসুদেব চৈতন্যের সংকীর্তন-সঙ্গী ছিলেন এবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে বিখ্যাত ও মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেবের প্রেমে তন্ময় হন। তিনি এঁর জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক দুটি অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনেন। বাসুদেব সম্ভবত মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান করতেন এবং রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট-চিত্তে তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদরূপে একমাত্র এই বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়েই বৃক্ষতলে নেচে-গেয়ে বেড়াতেন। সম্ভবত মহাপ্রভুর নির্দেশানুসারে বাসুদেব কুমারহট্টে শিবানন্দ সেনের বাড়ীর কাছে বাস স্থাপন করেন। মহাপ্রভুর বাংলাদেশে আগমনকালে একদিন তিনি এই বাসুদেবের গৃহে উঠেছিলেন। লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জানা যায় যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালে বাসুদেব নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব রচিত একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। এঁর অবস্থানকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

বাসুদেব সার্বভৌম—নব্যন্যায়চর্চার ইতিহাসে বাসুদেব সার্বভৌমের নাম সর্বপ্রথম আমাদের মনে উদয় হয়। এঁর যশও ছিল সার্বভৌম। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যে বাসুদেব জীবিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তাঁর

পিতার নাম ছিল নরহরি বিশারদ এবং মাতা ছিলেন ভাগীরথী। নবদ্বীপে তিনি পিতার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেছিলেন এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সময়ে নবদ্বীপে রাজভয়ের জন্য তিনি পুরী গমন করেন। পুরীতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর বেদান্ত-সংক্রান্ত বিচার হয় এবং তিনি চৈতন্য-মত স্বীকার করেন।

বাসুদেব সার্বভৌম দীর্ঘকাল উৎকলরাজ পুরুষোত্তম দেব (১৪৬৫-৯৭ খ্রীঃ) ও প্রতাপরুদ্র দেবের (১৪৯৭-১৫৩৯ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাসুদেব পুরী থেকে কাশী যান এবং শেষজীবন ঐ স্থানেই অতিবাহিত করেন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। বাসুদেব গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি'র উপর 'অনুমান-মণিপরীক্ষা' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। লক্ষ্মীধর-কৃত প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থের উপর সার্বভৌমের 'অদ্বৈতমকরন্দ' নামক টীকার গ্রন্থ পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় অনুমান করেন যে কাশীর সরস্বতী ভবনে 'শব্দমণি-পরীক্ষা' নামক যে গ্রন্থের পুঁথি সংরক্ষিত তাও বাসুদেব রচিত। তাছাড়া, বাসুদেবের নামে চৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও কতকগুলি স্তোত্র পাওয়া যায়।

নবদ্বীপের নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, তার্কিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এবং চৈতন্যদেব এই চারিজন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে বাসুদেবের নাম বিজড়িত। এঁরা নাকি বাসুদেবের টোলে অধ্যয়ন করেছিলেন। বাসুদেব মিথিলায় শিক্ষালাভ করতে গিয়ে পক্ষধর মিশ্রের নব্যন্যায় গ্রন্থ 'চিন্তামণি' এবং উদয়নাচার্যের 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'র শ্লোকাংশ সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ করে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন এবং টোল খুলে ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করেন। সম্ভবতঃ ইনি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

বাসুদেব সার্বভৌম (দ্বিতীয়)—নবদ্বীপবাসী। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ছিলেন গাঙ্গ্যবংশীয়। ন্যায়শাস্ত্রে এঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এই দ্বিতীয় বাসুদেব লক্ষ্মীধর-বিরচিত 'অদ্বৈত মকরন্দ' নামক বেদান্ত গ্রন্থের একখানি টীকা ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন।

বাসুদেব সেন—একজন প্রাচীন বাঙালী কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে এঁর কবিতা উদধৃত হয়েছে।

বাহাদুর খাঁ (প্রথম)—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলীর প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা সলিম খাঁর পুত্র। ইনিই প্রথম হিজলীর জমিদারী লাভ করেন। বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর (১৬১৮-২২ খ্রীঃ) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলে, ইব্রাহিম খাঁর কর্মচারী

কর্তৃক ইনি বন্দী হন। পরে ইব্রাহিম খাঁকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে ইনি পুনরায় জমিদারী লাভ করেন।

বাহাদুর খাঁ (দ্বিতীয়)—মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মসনদ-ই আলার পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিজলীর নবাব হয়েছিলেন।

বাহাদুর সাহ—মহম্মদ সাহ স্থরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খিজির খাঁ 'বাহাদুর সাহ' উপাধি গ্রহণ করে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের অধিপতি হন। কিন্তু ইনি দিল্লীর সম্রাট সৈন্যের সঙ্গে প্রবাসে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকার সময় সাহ বক্স নামক এক ব্যক্তি বাংলার মসনদ দখল করেন। বাহাদুর সাহ তাঁকে নিহত করে অচিরে সম্রাট মহম্মদ আদিলের সঙ্গে যুদ্ধাভিযান করেন। মুঙ্গেরের নিকট ঘোরতর যুদ্ধে সম্রাট নিহত হন এবং বাহাদুর বঙ্গদেশ ছাড়া জোয়ানপুরও নিজের অধিকারভুক্ত করে নেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর সাহ মারা যান।

বাহুসেন—বাংলার সেনবংশীয় রাজাদের বংশধর। মুসলমান আক্রমণের সময় বাংলার সেনবংশীয় রাজাদের কোন এক রাজা পঞ্জাবে শিমলা পর্বতের উত্তরে রাজ্য স্থাপন করেন। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজভ্রাতা বাহুসেন কুলুতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

ব্যাস চক্রবর্তী—ব্যাসাচার্য দ্রঃ।

ব্যাস সিংহ—কান্দী বা পাইকপাড়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ। ইনি নাকি বঙ্গের বিখ্যাত হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের প্রধান সচিব। নীচ কুলোৎপন্না কন্যার পাণিগ্রহণ অপবাদে ব্যাস বল্লাল-গৃহে ভোজন না করায় রাজা বল্লালের আজ্ঞানুসারে ব্যাসের দেহ করাত দ্বারা ছেদন করা হয়। সেই থেকে ইনি "করাতিয়া ব্যাস সিংহ" নামে সমধিক পরিচিত। ব্যাসের পিতার নাম ছিল লক্ষ্মীধর।

ব্যাসাচার্য বা ব্যাসচক্রবর্তী—বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বিরের রাজসভার পাঠক। এঁর পূর্ব নাম ছিল ব্যাস চক্রবর্তী। স্ত্রীর নাম ইন্দুমুখী পুত্রের নাম শ্যামদাস কন্যার নাম কণকপ্রিয়া। বীর-হাম্বীরের সঙ্গে ইনিও সপরিবারে শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষান্তে শ্রীনিবাস ব্যাস চক্রবর্তীকে 'ব্যাসআচার্য' নাম প্রদান করেন। বৈষ্ণব হিসাবে ইনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গী হয়ে ইনি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। খেতুরির মহামহোৎসবে ইনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

বিকু খাঁ, (নবাব বাহাদুর)—১৭৭৩ সালে ইনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন।

বিক্রমকেশরী—মেদিনীপুর

জেলার দণ্ডভুক্তির (বর্তমান দাঁতন) রাজা। দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত অমরাবতী পুরীতে বিক্রমকেশরী রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বিক্রমকেশরীর কন্যা সখীসেনা বা শশিসেনা ও জামাতা অহিমাণিক সম্বন্ধে নানা প্রণয়মূলক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই প্রণয়-কাহিনী অবলম্বন করে সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের কবি ফকিররাম 'সখীসেনা' নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। রাজা বিক্রমকেশরী সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বিক্রমসেন—বাংলার সেন-রাজবংশধর। এই বিক্রমসেন পূর্ব বঙ্গের অন্তর্গত ঢাকার বিক্রমপুর নগরের স্থাপয়িতা ও তাঁর নামেই স্থানটির নামকরণ হয়েছিল। ইহা সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘটনা।

বিক্রমাদিত্য (রাজা)—বাংলার বার ভূঞ্যার অন্যতম মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা। বিক্রমাদিত্যের পিতার নাম ছিল ভবানন্দ গুহ এবং পিতামহের নাম রামচন্দ্র। এঁর দুই খুল্লতাতের নাম ছিল গুণানন্দ ও শিবানন্দ। বিক্রমাদিত্যের বাল্য নাম ছিল শ্রীহরি। ইনি বাংলার তৎকালীন নবাব সুলেমানের পুত্র দাযুদের সহপাঠী ছিলেন। পারস্য ভাষায় এঁর বিশেষ অধিকার ছিল। সুলেমানের মৃত্যুর পর দাযুদ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করে বাল্যবন্ধু শ্রীহরিকে প্রধান অমাত্যপদে বরণ করে তাঁকে রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি প্রদান করেন। মোগল আক্রমণে দাযুদ খাঁ উড়িষ্যায় পলায়ন করলে রাজা বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে নানাস্থানে অবস্থান করেন। পরে মোগল প্রতিনিধি তোড়রমল্লের সঙ্গে সহযোগিতা করায়, তোড়রমল্ল সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে রাজকার্যে নিযুক্ত করেন এবং কয়েকখানা পরগণার আধিপত্য প্রদান করেন। দাযুদ খাঁ উড়িষ্যা পলায়নের সময় বহু মূল্যবান সম্পত্তি অমাত্য বিক্রমাদিত্যের হস্তে ন্যস্ত করে যান। সেই সব পেয়ে ইনি বেশ প্রতাপশালী হয়ে উঠলেন। গৌড় বা তার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করা নিরাপদ নয় বুঝে ইনি দক্ষিণবঙ্গে এক বিরাট অরণ্যময় স্থান পরিষ্কার করে তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। উহাই পরে যশোহর নামে খ্যাত হয়। হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম থেকে সাগর-দ্বীপ অবধি সারা দক্ষিণ বঙ্গ ও যশোহর ও খুলনার অর্ধাংশ ছিল এঁর রাজ্যভুক্ত। কলকাতার কালীঘাটও এঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। রাজ্যবিস্তার, রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন ব্যাপারে বিক্রমাদিত্যের প্রধান সহযোগী ছিলেন খুল্লতাত ভ্রাতা রাজা বসন্ত রায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের দুই বিবাহ ছিল। প্রথম পক্ষের পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং দ্বিতীয় পক্ষের মুকুটমণি। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বিগ্রহপাল (প্রথম)—কারুর কারুর মতে বিগ্রহপাল ধর্মপালের পৌত্র দেব পালের পুত্র। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বিগ্রহপাল ধর্ম পালের ভ্রাতা বাক্ পালের পৌত্র ও জয় পালের পুত্র। বিগ্রহপাল শূরপাল নামেও পরিচিত ছিলেন। যাইহোক, দেব পালের মৃত্যুর পর ইনি ৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি হৈ-হৈ রাজবংশসম্ভূতা লজ্জা নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। এঁর সময় গুর্জরাধিপতি ভোজরাজ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেন। তিনি যুদ্ধে বিগ্রহ পালকে পরাজিত করেছিলেন। বিগ্রহ পাল শান্তিপ্রিয় ও সংসারবিরাগী মানুষ ছিলেন। অল্পকাল (৮৫৮-৬০ খ্রীঃ) রাজত্ব করে তিনি পুত্র নারায়ণ পালের হাতে রাজ্যভার প্রদান করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

বিগ্রহ পাল (দ্বিতীয়)—দ্বিতীয় গোপালদেবের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। এঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ৯৬০-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর সময়ে গৌড়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রে বিদেশীয়গণের বড়ই উৎপাত চলছিল। একমাত্র কলাবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল, রাষ্ট্রশাসনে তাঁর কিছুমাত্র যোগ্যতা ছিল না। এই দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালেই পালগণের পৈতৃক রাজ্যের বিলোপ ঘটেছিল।

বিগ্রহ পাল (তৃতীয়)—১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল (তৃতীয়) বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। তিনি কলচুরিরাজ কর্ণকে পরাজিত করেছিলেন। এবং কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। বিগ্রহপাল রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

বিজয় গুপ্ত—মনসামঙ্গল কাব্যের কবি। এঁরই মনসামঙ্গলকাব্য সন-তারিখযুক্ত প্রাচীনতম পুঁথি। এই গ্রন্থের রচনাকাল কবিরই স্বরচিত দুটি পঙ্‌ক্তি থেকে পাওয়া যায়ঃ

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হোসেন শাহা নৃপতিতিলক।"

সংখ্যা বিচারে ১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়—ইহাই গ্রন্থ রচনার কাল। কবি বাংলার সুলতান হোসেন শাহের সমসাময়িক।

বর্তমান বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রাম কবির জন্মস্থান বলে অভিহিত। এই গ্রামে বিজয় গুপ্তের পূজিত বলে কথিত মনসাদেবীর মূর্তি আজও বিদ্যমান। কবির পিতার নাম সনাতন, মাতা রুক্মিণী—এঁরা বৈদ্যবংশ-সম্ভূত। বিজয় গুপ্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন বলে জানা যায়। বিজয় গুপ্তের অপর গ্রন্থ পদ্মপুরাণ বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম তথ্যের খনি।

বিজয় চন্দ্র—রোহটাসগড়ের ভূস্বামী সুবর্ণচন্দ্রের পৌত্র এবং

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ইনি ছিলেন রাজা। এঁর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী। দক্ষিণ থেকে সম্রাট রাজেন্দ্র চোল রাঢ় জয় করে বঙ্গে উপস্থিত হন। চোল বাহিনীর কাছে বিজয়চন্দ্র পরাজিত হলেও রাজ্যচ্যুত হননি।

বিজয়দাস আখরিয়া ব **বিজয়ানন্দ**—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্ত এবং নবদ্বীপবাসী। এঁর হস্তাক্ষর ছিল অতি সুন্দর। গৌরাঙ্গকে ইনি স্বীয় রত্নাক্ষর দিয়ে পুঁথি নকল করে দিতেন বলে গৌরাঙ্গ এঁকে 'রত্নবাহু' আখ্যা দিয়েছিলেন। এবং এই কারণে সাধারণ লোকেও এঁকে 'আখরিয় বিজয়' বলতেন। একদিন শায়িত অবস্থায় গৌরাঙ্গ বিজয় দাসের অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করায় এঁর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এঁর অবস্থিতি কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। ইনি সম্ভবতঃ পদও রচনা করতেন। 'বিজয়ানন্দ' ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে একটি মাত্র পদ উদধৃত হয়েছে। পদটি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক।

বিজয় পণ্ডিত—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। ঐ সময় তিনি একখানি মহাভারত রচনা করেছিলেন।

বিজয়পুরী—পূর্বনাম মহানন্দ পুরোহিত। অদ্বৈতপ্রভুর মাতুল। ইনি 'দুর্বাসা' নামে অভিহিত ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব লক্ষ্মীদেবীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থ-প্রণেতা হরিচরণ দাস এঁর নিকট অদ্বৈত প্রভুর জীবনী শ্রবণ করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নিবাস শ্রীহট্ট নবগ্রাম। অবস্থিতি-কাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

বিজয় মাণিক্য—ত্রিপুরার রাজা। ১৫২৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ত্রিপুরার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। রাজা হয়ে ইনি কয়েকটি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন এবং একাধিক অঞ্চল অধিকার করেন। ইনি কৈলা-গড়ে নদীর মত একটি সুবৃহৎ খাল কাটিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন 'বিজয়-নন্দিনী'। শ্রীহট্ট পর্যন্ত প্রশস্ত পথ নির্মাণ করে তার নাম দেন 'ত্রিপুরার জাঙ্গাল'। জিনারপুরে আর একটি খাল কাটিয়েছিলেন। তার নাম হয় 'ত্রিপুরার খাল'। রাজার পঞ্চাশ হাজার নৌকার এক নৌ-বহর ছিল। ইনি ব্রাহ্মণদিগকে বহু ভূমি ও স্বর্ণ দান করেছিলেন। সম্ভবতঃ সমগ্র পূর্ববঙ্গ এঁর দখলে ছিল। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল বিজয় মাণিক্যের নাম উল্লেখ করেছেন।

বিজয় মাণিক্য—শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় এক সময়ে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়মাণিক্য গৌড়ের রাজা ছিলেন। ১১১৩ শকের (১১৯১ খ্রীঃ) এঁর নামের একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। ইনি ব্রাহ্মণ

ছিলেন। এঁর লক্ষ্মী ও শ্রী নামে দুই স্ত্রী ছিল।

বিজয়রক্ষিত—বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের দৌহিত্র! এঁর অবস্থিতিকাল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী। ইনি মাধবনিদানের অশ্মরীপ্রকরণ পর্যন্ত মধুকোষ বা ব্যাখ্যা-মধুকোষ টীকা লিখে দেহত্যাগ করেন। শ্রীকণ্ঠদত্ত ও নিশ্চলকর এঁর শিষ্য ছিলেন। ইনি ছিলেন একটি আরোগ্যশালা অর্থাৎ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। এঁর উপাধি দেখা যায় 'আরোগ্যশালীয়'। বিজয় রক্ষিত মাধবনিদানের টীকা এবং 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ে'র উপর টীকা রচনা করেছিলেন।

বিজয়লস্কর—তাহিরপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বামদেব ভট্টের পুত্র। ইনিও পিতার ন্যায় সুবিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। বাংলায় বিদ্রোহ-দমন ব্যাপারে ইনি দিল্লীশ্বরের সবিশেষ সহায়তা করেছিলেন। সম্রাট বিজয়ের বীরত্বে সন্তোষ লাভ করে এঁকে "লস্কর" (সেনানায়ক) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং একটি পরগণা জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

বিজয়সিংহ—প্রাচীন বঙ্গাধিপ সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠপুত্র। কথিত আছে বিজয় সিংহ কুসঙ্গীদের সঙ্গে মিশে রাজ্যে নানারূপ অত্যাচার করতেন। পিতা সিংহবাহু তাঁর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় সিংহবাহু অবশেষে বিজয়কে তাঁর সাত শত সঙ্গীসহ এক জাহাজে চড়িয়ে নির্বাসিত করেন। সসঙ্গী বিজয় লঙ্কাদ্বীপে গিয়ে পৌছান। এবং সেখানে যক্ষগণকে পরাস্ত করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার নামেই বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপের নামকরণ করেন সিংহল। তদবধি সেই নামই চলে আসছে। খ্রীঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দে বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ হয়। এরই কাছাকাছি কোন সময়ে বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপ জয় করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। বিজয়সিংহ কর্তৃক সিংহল-বিজয় বাঙালীর ইতিহাসের একটি শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় ঘটনা। সমস্ত প্রাচীন পালি পুস্তকে বাংলার সিংহ-বাহু-তনয় বিজয়সিংহের বিজয়গাথা কীর্তিত আছে। বিজয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব সিংহলের রাজা হন। পাণ্ডুবাসুদেবের পর তৎপুত্র অভয় এবং অভয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগিনেয় পাণ্ডুকাভয় ৭০ বছর সিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডুকাভয়ের পুত্র মুতাশিব ৬০ বছর রাজত্ব করেন। মুতাশিবের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র তিষ্য সিংহলের রাজা হন। তাঁরই রাজত্ব-কালে খ্রীঃ পূঃ ৩০৭ অব্দে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং তাঁর কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারার্থে সিংহলে যান।

বিজয়সিংহ—শ্রীহট্টের একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা। ইনি শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জগন্নাথ পুরে এঁর রাজধানী ছিল।

বিজয়সিংহ—বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁর একজন প্রবল পরাক্রম-শালী সেনাপতি। ইনি নবাব আলীবর্দী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। পরিশেষে নিহত হন।

বিজয়সেন—বাংলার সেন বংশের প্রথম রাজা হেমন্ত সেনের পুত্র। হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পরেই বিজয় সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন (আনুমানিক ১১২৫ খ্রীঃ)। রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্যে অবনতি দেখা দিলে বিজয় সেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পান। তিনি শূরবংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করে প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ স্বাধিকারে আনয়ন করেন। তিনি পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাস্ত করে বহু স্থান দখল করেন। তিনি কামরূপরাজ ইন্দ্র পালকে পরাস্ত করেন এবং মিথিলার নান্যদেবকে পরাভূত করেন। তাছাড়া, বীর, রাঘব ও বর্ধন প্রভৃতি রাজারা এঁর নিকট পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। ইনি কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। বরেন্দ্রভূমির কিছু অংশও তিনি অধিকার করেন। পশ্চিম প্রদেশগুলি জয় করার জন্য তিনি বিরাট নৌ-বিতান প্রেরণ করেছিলেন। আর্যা-বর্তের পশ্চিমাংশেও বিজয়সেন কিছু স্থান অধিকার করেন। বিজয়সেনের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। তিনি বাংলায় ঐক্যবদ্ধ একটি সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সুশাসনে বাংলা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। তাঁর রাজত্বে বাংলায় নবযুগের সূত্রপাত হয়েছিল। বিজয়সেন পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এবং 'অরিরাজ-বৃষভশঙ্কর' এই গৌরবসূচক নামেও পরিচিত ছিলেন। বিজয়সেনের উদ্দেশ্যেই প্রসিদ্ধ কবি শ্রীহর্ষ-রচিত বিজয়-প্রশস্তি ও গৌড়োর্বীশ-কুল-প্রশস্তি লিখিত হয়েছিল। আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়সেনের মৃত্যু হয়।

বিজয়রাম—বাংলার পাল রাজবংশের রাজা রামপালের একজন সামন্ত নরপতি। ইনি নিদ্রাবলী নামক স্থানে রাজত্ব করতেন। এই নিদ্রাবলী বা নিদ্রাল রাজসাহী জেলার বোয়ালিয়া নগরের নয় মাইল দূরে ছিল। বর্তমানে উহা পদ্মাগর্ভে। এঁর রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

বিজয়রাম বিদ্যার্ণব—নদীয়া জেলার গৌতম গোত্র-সম্ভূত গণিতাচার্যের বংশ পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই বংশেই বিজয়রাম বিদ্যার্ণব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি

ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে কৃতী ছিলেন।

বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরী—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের একজন সেনাপতি। পিতার নাম যাদবেন্দ্র। বিরাট বপু এবং অদ্ভুত দৈহিক বলের পরীক্ষা দিয়ে প্রতাপের শরীররক্ষী সৈন্যদলের সর্দার হয়েছিলেন। ইনি দশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন বলে শুনা যায়। বিজয়রাম শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতাপ সৈন্যের অগ্রণী হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রতাপের পতনের পর বিজয়রাম চতুঃপার্শ্বস্থ বাজিতপুর পরগণা দখল করে বসেন এবং পরে নবাব সরকার হতে উহার জমিদারী সনন্দ এবং বংশানুক্রমিক চৌধুরী খেতাব লাভ করেন।

বিজয়রাম সেন বিশারদ—একজন কবি, জাতিতে বৈদ্য ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। তাঁর উপাধি ছিল বিশারদ। তাঁর নিবাস ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট বর্তমান মাজদিয়ায় (বাংলা দেশ)। বিজয়রাম অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি 'তীর্থ-মঙ্গল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে নানা তীর্থের ভ্রমণকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পলাশী যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কালে কবি খিদিরপুরের (ভূকৈলাশ) কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বিজয়রাম এই কাব্য রচনা করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

বিজয়ানন্দ—বিজয় দাস আখরিয়া বা বিজয়ানন্দ দ্রঃ।

বিজ্ঞানবতী—রানী বিজ্ঞানবতী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পুষ্যবর্মাবংশীয় রাজা মহাভূত বর্মার পত্নী ছিলেন। ইনি ছিলেন গুণবতী বিদুষী মহিলা।

বিজ্ঞানভিক্ষু—এঁর রচিত 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য' উল্লেখযোগ্য। 'সাংখ্যসার' নামক একখানি নিবন্ধ-গ্রন্থও বিজ্ঞানভিক্ষু রচনা করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর লেখক। বেদান্ত দর্শনে ইনি ছিলেন কীর্তিমান পুরুষ। ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত ব্যাখ্যার নাম 'বিজ্ঞানামৃতভাষ্য'। এতে তিনি বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্য মতবাদের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। এঁর মতে প্রেম-ভক্তি চরম গতির সহায়ক।

যোগদর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু 'যোগ-বার্তিক' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করে-ছিলেন।

বিট্‌ঠলনাথ ভট্ট—বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বল্লভভট্ট বা বল্লাভাচার্যের পুত্র। ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। এবং মহাপ্রভুর লীলা স্মরণ ও আলোচনা করে দিন যাপন করতেন। ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট বাস করতে থাকেন। তাঁর প্রতি এঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। রঘুনাথও এঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রূপ

গোস্বামী ও শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতি বিট্‌ঠলনাথের বাড়ীতে যেতেন এবং এঁকে স্নেহ করতেন। বিট্‌ঠলনাথের সাত পুত্র ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

বিত্তপাল—বাংলার পালরাজ বংশের রাজা রামপালের ইনি একজন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাস্ত করে রামপাল বন্দী করেন এবং এই বিত্ত পালের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করেছিলেন।

বি দ্যা ক র—সংস্কৃত ভাষায় 'সুভাষিত রত্নকোশ' নামক সংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন করে বিদ্যাকর গৌরব অর্জন করেছেন। উপলভ্যমান কোশকাব্যসমূহের মধ্যে 'সুভাষিত রত্নকোশ'ই প্রাচীনতম। পাল রাজত্বের শেষভাগের দিকে তিনি অবস্থান করছিলেন বলে অনুমিত হয়। তাঁর কোশকাব্যের সংকলনকাল দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ বলে অনেকে মনে করেন। বিদ্যাকর ছিলেন খুব সম্ভব বৌদ্ধ। পণ্ডিতগণের মতে সুভাষিত রত্নকোশ হয়ত বাংলাদেশের তদনীন্তন জগদ্দল বিহারে সংকলিত হয়েছিল। বিদ্যাকরের সংকলিত গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর আলোকপাত করেছে।

বিদ্যাধর—মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় রাজ্যের ত্রয়োদশ নরপতি রাজা শ্যামবল্লভের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

বিদ্যাধর চক্রবর্তী বা ভট্টাচার্য—জয়পুরবাসী একজন প্রবাসী বাঙালী। এঁর পিতার নাম সন্তোষরাম চক্রবর্তী। সন্তোষরাম ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা জয়সিংহের কাছ থেকে ৫১ বিঘা জমি প্রাপ্ত হন। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে সন্তোষরাম পরলোক গমন করলে পুত্র বিদ্যাধর ঐ জমির উত্তরাধিকারী হন। একদিন বালক বিদ্যাধর তাঁর মাতুল মহারাজ জয়সিংহের দেওয়ান কিষাণরামের সঙ্গে ছিলেন। জয়সিংহ কিষাণরামের সঙ্গে মতিমহল নামক একটি নূতন প্রাসাদের নির্মাণকার্য-পরিদর্শনকালে ছাদে উঠবার পথ না পেয়ে মিস্ত্রীদের একটি সিঁড়ি তৈরী করতে আদেশ দেন। কিন্তু তারা সকলেই একবাক্যে বলে যে সিঁড়ি তৈরীর কোন উপায় নেই। মিস্ত্রীদের এই কথা শুনে বালক বিদ্যাধর তাঁর মাতুলকে বললেন যে পাঁচ সের মোম পেলে তিনি বলে দিতে পারবেন যে ঐ প্রাসাদে সিঁড়ি তৈরী করা সম্ভব কিনা। কৌতূহল পরবশ হয়ে রাজা বালককে পাঁচ সের মোম দেবার আদেশ দিলেন। বিদ্যাধর সেই মোমে 'মোতি মহলে'র অনুরূপ বাড়ী তৈরী করে তার নিম্নতল থেকে দ্বিতল ভেদ করে ছাদ পর্যন্ত একটি পেঁচওয়া সিঁড়ি সংযোজিত করে রাজাকে দেখালেন। গুণগ্রাহী রাজা এই বালকের অপূর্ব শিল্প-কৌশল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং প্রতিভায়

পরিচয় পেয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেন। তিনি অল্প কাল মধ্যেই গণিত, জ্যোতিষ, পূর্ত-বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়ে উঠেন। বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে তিনি রাজপুতবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। অম্বরাধি-পতি জয়সিংহ তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন। কর্নেল টড্ তাঁর রাজস্থানের ইতিবৃত্তেবাঙালী বিদ্যাধরের বিবিধ গুণপনার উল্লেখ করেছেন। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়। "ব্রাহ্মণকুলপুঙ্গব পণ্ডিতবর বিদ্যাধর বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন। কি জ্যোতি-স্তত্ত্ব, কি ভূতত্ত্ব, কি ধর্মশাস্ত্র, কি স্মৃতিশাস্ত্র, কি পুরাণতত্ত্ব, সকল বিষয়েই বিদ্যাধর পারদর্শী ছিলেন। যে জয়পুর নগব আজি শোভা সৌন্দর্যে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহানুভব বিদ্যাধরই আঁকিয়া দিয়াছিলেন।"

বিদ্যানিবাস—বাসুদেব সার্ব-ভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র। মোগলসম্রাট আকবরের সংস্কৃত পণ্ডিতসভার অন্যতম সভ্য।

বিদ্যাপতি ঠাকুর—মিথিলার রাজসভার সভাপণ্ডিত ও সভাকবি। মিথিলার কবি হলেও মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব ছিল অসামান্য। সেজন্য তিনি বাংলার অতি আপনজন। অনেকের মতে বাংলার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল এবং সম্ভবতঃ উভয় দেশের ভাষাও অনেকাংশে ছিল এক। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির আসন শাশ্বত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। মিথিলা-বাসী হলেও বাঙালীর নিকট তিনি বাঙালী। খুব সম্ভব চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন এবং পরলোকগমন করেন পঞ্চদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক সংগীতেব প্রভাবই বাংলা সাহিত্যে সমধিক। শ্রীচৈতন্যদেব এঁর এইসব সঙ্গীত পাঠ করে বিমুগ্ধ হতেন। বিদ্যাপতির প্রতিভা ছিল বিচিত্র শক্তির আধার। ইনি একাধাবে স্মার্ত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং কবি ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইনি একাধিক বিষয়বস্তু নিযে গ্রন্থ রচনা কবেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি কবি—কেবলমাত্র বৈষ্ণব-কবি-চূড়ামণি-রূপেই বিখ্যাত। বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থ: কীর্তিলতা, ভূপরিক্রমা, কীর্তি-পতাকা, পুরুষপরীক্ষা' গঙ্গাবাক্যাবলী, শৈবসর্বস্বহার, বিভাগসার, দানবাক্যা বলী, দুর্গাপূজাতরঙ্গিণী, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, লিখনাবলী, বর্ষক্রিয়া প্রভৃতি। কথিত আছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসেব সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদ্যাপতি মিথিলার ব্রাহ্মণ রাজবংশের একাধিক শাসনকর্তা, এমনকি তাঁদের পত্নীদেরও অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। এঁর প্রথম গ্রন্থ 'কীর্তিলতা' কীর্তিসিংহের রাজত্ব-কালেই রচিত হয়েছিল। এঁর 'ভুপরিক্রমা' গ্রন্থ রচিত হয় দেব-সিংহের রাজসভায়। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদাবলী শিবসিংহের রাজ-সভায় রচিত হয়। রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম দান করেছিলেন। শিবসিংহের মৃত্যুর পর কবি শিবসিংহ-পত্নী রাজতী বিশ্বাস দেবীর আশ্রয়পুষ্ট হয়েই গঙ্গাবাক্যাবলী শৈবসর্বস্বহার রচনা করেছিলেন। পরে রাজা নরসিংহদেব ও রানী ধীমতি-দেবীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

কবি একাধিক দেবদেবীর প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। সাধারণভাবে ইনি ছিলেন শৈব ধর্মে বিশ্বাসী। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্তী যুগের কবি-শ্রেষ্ঠগণ বিদ্যাপতির ভাব-ভাষা অবলম্বন করে পদাবলী রচনা করেছিলেন। বিশেষভাবে বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ রচনা করার জন্য গোবিন্দদাস কবিরাজ 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় বিদ্যাপতি প্রধানত জয়দেব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। জয়দেবের মতো বিদ্যাপতিও 'বিলাসকলাকুতূহল' কবি,—তাই তিনি 'অভিনব-জয়দেব'। কবি বিদ্যাপতির কয়েকটি অনুপম রচনাংশ :

(১) "সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানি এ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নযন ন তিরপিত ভেল।
সে হো মধুবোল শ্রবণহি স্থনল
শ্রুতিপথ পরস ন ভেল॥
কত মধু জামিনি রভস গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তই হিয় জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রস আমোদঈ
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ-জুড়াএত
লাখে না মিলিল এক॥"

(২) "অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহ এ হিল্লোল॥
স্থন ভেল মন্দির স্থন ভেল নগরী।
স্থন ভেল দসদিস স্থন ভেল সগরী॥"

বিদ্যাপতি (বৈদ্যক)—বৈদ্যক বংশীধর ভট্টের পুত্র। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'বৈদ্যকুতূহলসংবলিত বৈদ্যরহস্য পদ্ধতি' এবং 'চিকিৎসাঞ্জন' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন।

বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী—শ্রীমদ্ভগবতগীতা গ্রন্থের পদ্যানুবাদক। গ্রন্থশেষে ইনি নিজেকে মুকুটি বংশজ ও গৌড়দেশবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যাবাচস্পতি—বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাই। গঙ্গার পশ্চিম তীরে কুলিয়ার কাছে ইনি বাস করতেন। সনাতনের ইনি অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন নীলাচল থেকে বাংলায় এসেছিলেন, তখন এঁর বাড়ীতে উঠেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে ইনি মাঝে মাঝে রামকেলি গ্রামে থাকতেন।

"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি
গ্রামে তাঁর স্থিতি॥"

হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) বিদ্যাবাচস্পতিকে খুব সম্মান করতেন।

বিদ্যুন্মালা দেবী—কমলাকর পিপলাইর কন্যা। 'শ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তারে' জানা যায়, পিপলাই মহাশয়েব কন্যাব সঙ্গে মাহেশনিবাসী সুধাময় চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। কন্যা-জামাতা পুরীধামে কিছুকাল অবস্থান কবেন। সেই সময় এঁর যে সন্তান হয়, তাঁর নাম নারায়ণী দেবী। নারায়ণীর সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্রের বিবাহ হয়।

বিধিচাঁদ—শিখ গুরু হরগোবিন্দ সিংহের শিষ্য। ইনি গুরুর আদেশে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এঁর আশ্চর্য জ্ঞান ও ভক্তিতে বহুলোক আকৃষ্ট হয়েছিল। কথিত আছে সুন্দর শাহ নামে এক ফকির এঁর সঙ্গে বিচার করতে এসে, পরাজিত হয়ে এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিধিচাঁদ দেবনগর নামক স্থানে কিছুকাল বাস করে দেশে ফিরে যান।

বিনায়ক সেন—চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত বঙ্গচিকিৎসক শ্রীহর্ষ সেনের পুত্র। ইনিও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। স্বীয় সুচিকিৎসা গুণে ইনি গৌড়ের মুসলমান রাজাদের কাছ থেকে সময়ে সময়ে গজ কনকছত্র ও ধনরত্ন লাভ করতেন।

বিনীতদেব—একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের সময়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ইনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ন্যায়বিন্দু টীকা, হেতুবিন্দু টীকা, বাদান্যায় ব্যাখ্যা, সম্বন্ধ-পরীক্ষা টীকা, আলম্বনপরীক্ষা টীকা, সন্তানান্তরসিদ্ধি টীকা প্রভৃতি। এঁর সমস্ত গ্রন্থই নানা পণ্ডিত কর্তৃক তীব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

বিপ্রদাস—একজন কবি ও পদকর্তা। 'পদকল্পতরু'তে এঁর একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী।

বিপ্রদাস ঘোষ—রানীহাটি (রেনেটি) পদ্ধতির কীর্তনগানের প্রচলন-কর্তা বলে খ্যাত। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। এঁর লেখা বাৎসল্য-

ঘটিত পদ দু-একটি পাওয়া যায়। যেমন :

"এ খীর নবনী দণ্ডে দণ্ডে খাও
তিলে তিলে লাগে ভোক-ছানি
খাইয়া মায়ের মাথা এত
বেলা ছিলে কোথা
অ মোর কুলের যাদুমণি ॥"

বিপ্রদাস পিপিলাই—বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের মনসা-মঙ্গলের কবি হিসাবে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর নামের উল্লেখ দেখা যায়। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'মনসাবিজয়'। বিপ্রদাসের কাব্যের দুখানি খণ্ডিত পুঁথি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির গভর্নমেণ্ট সংগ্রহে আছে। কাব্যের প্রথমেই কবির আত্মপরিচয় আছে, তা থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল মুকুন্দ পণ্ডিত। কবি সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, এঁদের গোত্র বাৎস্য, কৌথম শাখা, পঞ্চপ্রবর, পিপিলাই গাঁই। বহু দিন যাবৎ কবির পূর্বপুরুষগণ ছিলেন বাদুড়্যা বটগ্রাম নিবাসী। খুব সম্ভব ইহা চব্বিশ পরগণার উত্তর-পূর্বাংশে (বসিরহাট অঞ্চলে)।

বিভাণ্ড—বান রাজার মন্ত্রী। এঁর পিতার নাম অহিপাল। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশীধ্বজ সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন।

বিভূতিচন্দ্র—বঙ্গরাজ রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহারের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত। এঁর বংশ পরিচয় কিছু জানা যায় না। তবে ইনি নাকি ছিলেন কোন রাজপুত্র। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের কোন সময়ে বিভূতিচন্দ্র জীবিত ছিলেন। ইনি শান্তিদেব-রচিত বোধিচর্যাবতারের একখানি টীকা লিখে-ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বিভূতিচন্দ্র নাকি 'অমৃতকর্ণিকা' নামে 'নামসঙ্গীতি'র একখানি টীকা রচনা করেছিলেন।

বিমলচন্দ্র—নালন্দার রাজা। এঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ও পৌত্র ললিতচন্দ্র। এঁরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে বর্তমান ছিলেন।

বিমল দাস—প্রাচীন বাংলার একজন উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য-শিল্পী। এঁর অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী।

বিমলমতি—বিখ্যাত বৈয়া-করণিক। দশম শতাব্দীতে পাল রাজাদের রাজত্বকালে ইনি অবস্থান করছিলেন। শ্রীতিদত্তের কাতন্ত্র পরিশিষ্টে দেখা যায় ভাগবৃত্তিকারের নাম বিমলমতি। সুতরাং বিমলমতির রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থই 'ভাগবৃত্তি'। বিমলমতি জৈন ছিলেন।

বিমলাদেবী—মুক্তাগাছার জমিদার রঘুনন্দন আচার্যের দত্তক পুত্র গৌরীকান্তের সহধর্মিণী। গৌরীকান্ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হলে বিমলা দেবী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করে-ছিলেন। ইনি অত্যন্ত দয়াবতী ও ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। এঁর সুশাসনে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস

করত। নিজ পতি গৌরীকান্তের নামে ইনি কাশীতে গৌরীকান্তেশ্বর শিব স্থাপন করে বিরাট অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁর অন্নদান দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে কাশীর মানুষ এঁকে রানী বিমলা দেব্যা অন্নপূর্ণা বলে অভিহিত করত। বিমলা দেবী কালীঘাটের কালীমূর্তির গলায় স্বর্ণ নির্মিত মুণ্ডমালা প্রদান করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। শেষ বয়সে ইনি কাশীকান্তকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। শ্বশুর রঘুনন্দনের নামে রঘুনন্দনেশ্বর শিব ও নিজ নামে বিমলেশ্বর শিব মুক্তাগাছায় স্থাপন করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

বিয়াবানী, শেখ রাজা—বাংলার নবাব হাজি ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে (১৩৩৯-১৩৫৯ খ্রীঃ) শেখ রাজা বিয়াবানী নামে এক ফকির বাস করতেন। বিয়াবন শব্দের অর্থ জঙ্গল, বোধ হয় ইনি জঙ্গলে বাস করতেন বলে এঁর নাম বিয়াবানী হয়ে থাকবে। এঁর অন্য নাম ছিল খেরকা পোষ। নবাব ইলিয়াস শাহ এঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফকিরের মৃত্যু হয়।

বিরুআ—একজন সিদ্ধাচার্য। এঁর 'চর্যাপদ' বা কীর্তনের গান পাওয়া গেছে।

বিরুবাপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য। ইনি কাহ্নপার গুরু। প্রাচীন বঙ্গ ভাষায় ইনি কয়েকটি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' এঁর রচিত একটি চর্যাপদ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

বিলাসবজ্রা—একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। ইনি এবং আরও অনেক বিদুষী রমণী পালরাজগণের অধিকার-কালে গৌড়মণ্ডল উজ্জ্বল করেছিলেন।

বিলোলা—বঙ্গরাজ বিজয়-সেনের মহিষী বিলোলা দেবী (অন্য নাম মালতী) মল্লবর্মা ও শামলবর্মা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন।

বিশাখদত্ত—সম্ভবত বাঙালী, নাট্যকার। গ্রন্থ 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক। আনুমানিক অষ্টম-নবম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

বিশারদ—মহাভারতের অনুবাদক এঁর পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশারদ নাম না উপাধি তা জানবার কোন উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা উপাধি। রঙ্গপুর জেলা থেকে হরগোপাল দাসকুণ্ডু যে পুঁথিখানি আবিষ্কার করেছেন, সেটি কবির স্বহস্ত লিখিত বলেই মনে হয়। পুঁথিখানির তারিখ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ। কবির বিশেষত্ব ইনি মূল সংস্কৃত অনুযায়ী অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। ইনি "বিরাটপর্ব" অনুবাদ করলেও সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন কি না জানা যায় না।

বিশ্বনাথ—সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচয়িতা। নিবাস—শ্রীহট্ট।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

বিশ্বনাথ—'পদ্মপুরাণ' বা 'পদ্মার পাঁচালী' নামক গ্রন্থের অন্যতম রচয়িতা। নিবাস—সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ।

বিশ্বনাথ—নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের স্থাপনকর্তা। এঁর পিতার নাম কামদেব। ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে দিল্লীতে গিয়ে তোগলক.বংশীয় রাজাদের নিকট থেকে রাজোপাধি ও পৈতৃক অধিকার ব্যতীত নির্দিষ্ট কর-দানে সম্মত হয়ে অনেকগুলি গ্রাম পান।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। 'সাহিত্য দর্পণ' সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থের রচয়িতা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ছিলেন অলৌকিক প্রতিভাশালী, দেশমান্য পণ্ডিত, পদকর্তা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু দুরূহ বৈষ্ণব গ্রন্থের টীকাকার ও গ্রন্থ রচয়িতা। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নদীয়া জেলার দেবগ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা তিন সহোদর। জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ। বিশ্বনাথ ছিলেন কনিষ্ঠ। বাল্যে ইনি অধ্যাপক অধ্যুষিত দেবগ্রামেই ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদির পাঠ শেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার সৈদাবাদ গ্রামে আগমনপূর্বক সেখানে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বসবাস করতে থাকেন। অতি অল্প বয়সেই এক রূপবতী রমণীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। কিন্তু যৌবনে ইনি সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন। এবং সৈদাবাদের কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীর নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্বক গুরুগৃহে অবস্থান করে ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার ও টীকাদি প্রণয়ন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন এবং অবিলম্বে বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালেও বিশ্বনাথ সৈদাবাদ-নিবাসী রামকৃষ্ণ আচার্যের নিকট ভক্তি ও রসশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। ব্রজধামে বসবাসকালে বিশ্বনাথ গৌরবময় বৈষ্ণবধর্মের অধোগতি দেখে ব্যথিত হন। এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের সহায়তায় বৈষ্ণবধর্মকে পুনরায় স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। ইনি বৃন্দাবনে পরকীয়া মতের প্রবর্তন করেন। প্রায় আশি বছর বয়সে ইনি বৃন্দাবনধামে পরলোক গমন করেন। ইনি একাধারে প্রগাঢ় পণ্ডিত, দার্শনিক, পরমভক্ত, রসবিদ, শ্রেষ্ঠ কবি ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এঁর জীবনীতে বহু অলৌকিক শক্তির বর্ণনা আছে। বিশ্বনাথ রচিত গ্রন্থসমূহ: সারার্থদর্শিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), সারার্থবর্ষিণী ('ভাগবত গীতার টীকা), আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বল নীলমণির টীকা), কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-

চরিতামৃতের টীকা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার টীকা, বিদগ্ধমাধবের টীকা, গোপালতপনীর টীকা, হংসদূতটীকা, ব্রহ্ম সংহিতার টীকা, অলঙ্কারকৌস্তুভ টীকা, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, চমৎকারচন্দ্রিকা, গোপীপ্রেমামৃত, স্তবামৃত লহরী, প্রেমসম্পুট, গৌরাঙ্গলীলামৃত, স্বপ্নবিলাসমৃত, সাধ্যসাধনকৌমুদী, মন্ত্রার্থদীপিকা, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ঐশ্চর্যকাদম্বিনী, বৈষ্ণবভাগবতামৃত, রাধামাধবরূপচিন্তামণি, স্মরণক্রমমালা, অনুরাগবল্লী, রূপচিন্তামণি, সুরথকথামৃত, মাধুর্যকাদম্বিনী, ক্ষণদা গীতচিন্তামণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু প্রভৃতি প্রভৃতি।

হরিবল্লভ বিশ্বনাথের নামান্তর। বিশ্বনাথের রচিত পদাবলীতে এঁর হরিবল্লভ নাম দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন—নবদ্বীপবাসী বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়ের গ্রন্থ "ভাষা-পরিচ্ছদ" প্রণয়ন করেছিলেন।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ইনি নবদ্বীপের সুবিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি জয়রাম তর্কালঙ্কারের শিষ্য ও গদাধর ভট্টাচার্যের প্রশিষ্য ছিলেন। ইনি পরম বৈষ্ণব এবং জীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে ইনি গৌতমসূত্রের শিরোমণির মতানুসারী এক গবেষণাপূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন (১৬৫৪ খ্রীঃ)। তাছাড়া, ইনি 'ন্যায়তন্ত্রবোধিনী', 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি,' 'পদার্থতত্ত্বাবলোক', 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর টীকা' এবং 'ভাষা পরিচ্ছেদ' নামক ন্যায়শাস্ত্রের এক সংক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন।

বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার—বিশ্বনাথ ছিলেন নবদ্বীপবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও পত্রিকাকার। নবদ্বীপ ও অন্যত্র "বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার" রচিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখা যায়। ইনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এঁর জীবিতকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

বিশ্বনাথ মিশ্র—বলভদ্র মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পদ্মনাভ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এঁর আবির্ভাবকাল 'ষোড়শ শতাব্দী। ইনিও কতকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা।

বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন—'ভ্রমরদূত' রচয়িতা রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর রচিত কোশকাব্যের নাম 'সূক্তিমুক্তাবলী'। এতে ১২২টি শ্লোক আছে।

বিশ্বনাথ সেন—উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এঁর জীবিতকাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ 'শতাব্দী। ইনি বৈদ্যকশাস্ত্রে 'পথ্যা-

পথ্যবিনিশ্চয়' এবং চক্রদত্তীয় সর্বসার-সংগ্রহের 'সারসংগ্রহ' নামক টীকা প্রণয়ন করেন।

বিশ্বসিংহ—কোচবিহারের কামতাপুরের রাজা। এঁর অবস্থিতি কাল ১৪৫৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলে অবস্থিত ভৌমিক রাজ্যগুলি একে একে মহারাজ বিশ্বসিংহ অধিকার করে নিয়েছিলেন। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আহোমরাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর হোসেনশাহ কামতাপুর অধিকার করলে বিশ্বসিংহ আসাম রাজ্যে পলায়ন করেন। ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পুনরায় 'কামতেশ্বর' উপাধি ধারণপূর্বক রাজপদে অভিষিক্ত হন। ভৌমিকরা অনেকেই এঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। ভুটানের রাজা এঁর নিকট পরাজিত হয়ে করদানের অঙ্গীকারে এঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। গৌড়েশ্বর নসরৎ শাহ এঁর নিকট পরাজিত (১৫৩৩ খ্রীঃ) হয়ে পলায়ন করেছিলেন।

বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিখধর্মের আদি গুরু বাবা নানক কামরূপে আগমন করেছিলেন। পূর্বোত্তর ভারতে ইনি একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এঁর স্বাধীনতা ঘোষিত হবার সময় থেকে একটি অব্দ প্রবর্তিত হয়েছিল। কোচবিহারে তা 'রাজশক' নামে প্রচলিত। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করেন।

বিশ্বম্ভর দাস—ইনি উৎকলখণ্ড অবলম্বনে 'জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করে-ছিলেন। এই কাব্য রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে। শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশীয় ব্রজনাথ ছিলেন বিশ্বম্ভরের গুরু। কবির নিবাস ছিল হুগলি জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট। গ্রন্থশেষে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় :

"মাতা সতী শুদ্ধমতী রত্নমণি নাম
তাঁহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণনাম।
কানাই চরণ-দাস জনক আমার
বৈষ্ণব সমাজে সদা প্রশংসা যাঁহার।"

বিশ্বম্ভর রায় (শূর)—শূরবংশীয়, সম্ভবতঃ আদিশূরের বংশসম্ভূত। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড দর্শনে যাওয়ার সময় পথভ্রান্ত হয়ে মেঘনার চরে বাসস্থান মনোনীত করেন। এই ভ্রান্তির জন্য এই চরের নাম রাখেন "ভুলুয়া"। ইনি নিকটবর্তী স্থান অধিকার করে রাজ্য স্থাপন করে-ছিলেন। ইনিই নোয়াখালির ভুলুয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশে একাদশ পুরুষে বারভূঞা লক্ষ্মণ-মাণিক্যের জন্ম হয়।

বিশ্বরূপ—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বহু পুত্র মারা যাওয়ার পর বিশ্বরূপের জন্ম

হওয়ায় ইনি পিতামাতার অতি আদরের সন্তান ছিলেন। ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইনি অদ্বৈত আচার্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন এবং শাস্ত্রবিশারদ হয়ে উঠেন। এঁর ধর্মব্যাখ্যা শুনে সকলে বিস্মিত হত। শৈশবকাল থেকেই বিশ্বরূপ সংসারের প্রতি আসক্তিহীন ছিলেন। তাই পিতামাতার উদ্বেগের সীমা ছিল না। ষোল বছর বয়সে তাঁর বিবাহের উদ্যোগ চললে বিশ্বরূপ তা জানতে পেরে একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হয় শংকরারণ্য। এঁর আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

বিশ্বরূপসেন—আনুমানিক ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপসেন পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ইনি "অরিরাজ বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধিতে ভূষিত হতেন। ইনি 'সৌর' অর্থাৎ সূর্যের উপাসক ছিলেন। বিশ্বরূপসেনের রাজ্য-কালের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলা যে এঁর রাজ্যভুক্ত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বরূপসেন "যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" বলে তাম্রশাসনে অভিহিত হয়েছেন। ইনি যবনরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ স্বীয় অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিশ্বস্ফটিক—বাংলার ময়ূর বংশের রাজা ও ভারত-সম্রাট বিশ্বস্ফানির পৌত্র ও বিশ্বস্ফূর্জি পুরঞ্জয়ের পুত্র। ইনি মগধের ভারত-সম্রাটরূপে রাজসিংহাসনে আসীন হয়ে প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অনন্ত সামন্তচক্র গঠন করেছিলেন। অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দী।

বিশ্বস্ফানি—বাংলার ময়ূর বংশের রাজা খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলার বহু সামন্তরাজের সহায়তায় সামন্তচক্র গঠন করে প্রায় সমগ্র ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। এবং ভারত-সম্রাটরূপে পরিচিত হন। সমগ্র ভারতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১১৮টি সামন্ত রাজ্যে গৌড়দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ গৌড়-ব্রাহ্মণ প্রেরণ করে ভারতের বৌদ্ধধর্ম নির্মূল করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ভারতে এমন কোন জেলা নাই যেখানে বাংলার এই বিশ্বস্ফানি প্রতিষ্ঠিত গৌড়-ব্রাহ্মণের বংশধর নাই।

বিশ্বস্ফূর্জি পুরঞ্জয়—বাংলার ময়ূর বংশের রাজা ভারত-সম্রাট বিশ্বস্ফানির পুত্র। ইনিও ভারত-সম্রাট হয়ে ভারতের প্রতিরক্ষার শক্তি বৃদ্ধির জন্য দাক্ষিণাত্যে যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা বহু সামন্তচক্র গঠন করেন। এঁর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী।

বিশ্বেশ্বর শম্ভু বা শিবাচার্য—বাঙালী মহাপণ্ডিত ও গুরু। এঁর আদি নিবাস ছিল গৌড় রাঢ়ের অন্তর্গত পূর্বগ্রাম। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অন্ধ্রদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সেখানকার কাকতীয়, মাধব, কলচুরী ও চোল প্রভৃতি বংশীয় রাজারা তাঁর মন্ত্রশিষ্য। রাজা গণপতি ও তাঁর কন্যা রুদ্রাম্বা তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিবাচার্য তাঁর স্বদেশ দক্ষিণ রাঢ় থেকে ত্রিশ জন সামবেদী ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দেশে নিয়ে গিয়ে বসতি করান। তাছাড়া, তিনি অনেক বঙ্গদেশীয় আচার্য ও অধ্যাপককে সেই দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিবাচার্য রাজার কাছ থেকে বহু গ্রাম দানস্বরূপ লাভ করে "বিশ্বেশ্বর গোলকি" নামে অগ্রহার স্থাপন করেন।

বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য গ্রামগুলির আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করে এক একটি ভাগ এক-এক প্রকার সৎ কাজের জন্য দান করতেন। এক ভাগের আয়ে দীন-দুঃখীর জন্য অন্নসত্রের, এক ভাগের আয়ে আরোগ্যশালার ও আর এক ভাগের আয়ে প্রসূতিশালার ব্যয় নির্বাহ করা হত। ধর্মের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মঠের আয় হতে হাসপাতাল ও প্রসূতি-শালা স্থাপন করে তখনকার যুগে এই বাঙালী পণ্ডিত ও গুরু এক অপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন।

বিষ্ণু দাস—বিষ্ণু দাসের বংশধর রামরাম শর্মকৃত 'মনোদূত' কাব্য থেকে জানা যায় যে, বিষ্ণুদাস শ্রীচৈতন্যদেবের মাতুল ছিলেন। ইহা সত্য হলে বিষ্ণু দাসকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের লেখক বলে ধরা যায়। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'মনোদূত'। ইহা 'মেঘদূতে'র পরবর্তী শান্তরসাত্মক দূতকাব্যসমূহের মধ্যে প্রধান। বসন্ত তিলক ছন্দের ১০১টি শ্লোকে কাব্যটি রচিত। আত্মকৃত পাপের কথা চিন্তা করে কৃষ্ণভক্ত কবি কর্তৃক স্বায মনকে কৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনার্থে দূতরূপে প্রেরণ ইহাই কাব্যের উপজীব্য বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে কাব্যে যমুনা নদী ও বৃন্দাবনের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

বিষ্ণু দাস—সপ্ত দশ শতাব্দীতে বঙ্গের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হৃদযানন্দ বিদ্যার্ণবের পুত্র। রাজা রঘুরামের সময় ইনিও জ্যোতির্বিদ ছিলেন।

বিষ্ণুদাস আচার্য—'সীতাগুণ-কদম্ব' গ্রন্থ-প্রণেতা। এঁর পিতার নাম ছিল মাধবেন্দ্র আচায। ইনি ফুলিয়ার নিকটবর্তী বিষ্ণুপুর নামক স্থানে বাস করতেন। অদ্বৈতপ্রভু প্রথমে নবদ্বীপে এসে মাধবেন্দ্র গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করার ফলে বিষ্ণু দাস তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এবং তাঁর কাছে দীক্ষা লাভ করে তাঁর নিকট ভাগবত শিক্ষা করেছিলেন। ইনি নাকি পুনরায় অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর নিকট পুণর্দীক্ষিত হন। অদ্বৈতপ্রভুর তিরোভাবের পর সীতাদেবীর আজ্ঞায় বিষ্ণু দাস আচার্য কুলিন গ্রামে রামানন্দ

বসুর সঙ্গে একত্র বসবাস করতেন। 'মল্লিক রণছোড়', বসু চক্রবর্তী, গোকুল ও নন্দ ঘোষ প্রভৃতির ইনি ছিলেন দীক্ষাগুরু। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

বিষ্ণুদাস আচার্য 'সীতাগুণকদম্ব' নামে সীতাদেবীর একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। গ্রন্থখানির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৪৪৩ শকাব্দ বা ১৫২১-২২ খ্রীষ্টাব্দ।

বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি—সম্ভবতঃ বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা। ইনি হয়তো সনাতন গোস্বামীর অন্যতম গুরুও ছিলেন। ইনিও তত্ত্বচিন্তামণির উপর টীকা রচনা করেছিলেন। ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক।

বিষ্ণুদাস হাজরা—নলডাঙা রাজবংশের প্রবর্তক। শুভরাজ খাঁনের তৃতীয় পুত্র। সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে ইনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং যশোরের এক জঙ্গলে তপশ্চরণ করতে থাকেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাজা মানসিংহ নৌকাযোগে এই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাঁর লোক-জনের রসদ ফুরিয়ে যায়। সন্ন্যাসী বিষ্ণু হাজরা তা জানতে পেরে অলৌকিক যোগবলে সানুচর মান-সিংহকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন এবং তাদের সঙ্গে প্রচুর রসদ দিয়ে দেন। মানসিংহ সন্ন্যাসীর অসামান্য শক্তি দেখে বিস্মিত হন এবং সন্ন্যাসীর বিগ্রহ জালিম গোপালের সেবার জন্য সন্নিহিত পাঁচখানি গ্রাম দান করেছিলেন। ঐ থেকেই নলডাঙা রাজগণের জমিদারীর পত্তন হয়। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীমন্ত দেবরায়।

বিষ্ণু পাল—বিষ্ণু পালের নামে মনসামঙ্গলের একটি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিটি বীরভূম বা উত্তর-পশ্চিম বর্ধমানের। ঐ অঞ্চলের ভাষাই কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট। রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ।

কাব্যের প্রারম্ভে ধর্মঠাকুরের পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। এই হিসাবে বিপ্রদাসের কাব্যের সঙ্গে বিষ্ণুপালের কাব্যের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। রচনার রীতি অনেকটা মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের মতো। জনপ্রবাদ থেকে জানা যায় কবি জাতিতে ছিলেন কুম্ভকার। বীরভূম অঞ্চলে কবির কাব্যের বিশেষ প্রচার ছিল।

বিষ্ণুপুরী—বিষ্ণুপুরীর পূর্বা-শ্রমের নাম বিষ্ণু শর্মা। তাঁর নিবাস ছিল মিথিলার ত্রিহুতে তরৌণিগ্রামে। 'করমহ' বংশে তাঁর জন্ম। তিনি বেদজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডনিষ্ঠ ছিলেন। পত্নীর দুর্ব্যবহারে তিনি গৃহত্যাগপূর্বক গ্রামস্থ শিবালয়ে আশ্রয় নিয়ে একান্তচিত্তে মহাদেবের ধ্যান করতে থাকেন। কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি দার পরিগ্রহ করেন। এবং সপত্নী পুরুষোত্তম-

ক্ষেত্রে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি সমগ্র ভাগবত-সমুদ্র আলোড়ন করে 'রত্নাবলী' রচনা করেন। এর পর তিনি কাশীতে গিয়ে বসবাস করেন। জগন্নাথদেব একদিন রাজাকে ও পূজারী-দিগকে বললেন যে বিষ্ণুপুরীর নিকট যে রত্নমালা আছে, তা তিনি পরতে ইচ্ছা করেন। পত্র পেয়ে বিষ্ণুপুরী ভক্তিরত্নাবলী পাঠিয়ে দেন। কথিত আছে যে ঐ ভক্তিরত্নাবলীর এক একটি শ্লোক এক একটি গুলিকার মধ্যে আবদ্ধ করে পূজারিরা সেই গুলিকামালা শ্রীজগন্নাথকে পরাতেন। এঁর আবির্ভাব কাল চতুর্দশ শতাব্দী। ইনি আচার্য জয়ধর্মের, কারুর কারুর মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর দ্বিতীযা পত্নী এবং নবদ্বীপের সনাতন পণ্ডিতের কন্যা। চৈতন্যদেবের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সর্প দংশনে মৃত্যু হলে শচীদেবী পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করেন। শচীদেবী একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেন এবং তাঁর ধীর-নম্র স্বভাব ও রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই চৈতন্যের যোগ্যা পাত্রীরূপে নির্ধারণ করেন। এবং কাশীনাথ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় চৈতন্য-দেবের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া অত্যন্ত শশ্রূ ও পতিভক্তিপরায়ণা রমণী ছিলেন। কিন্তু স্বামী-সুখ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। চৈতন্যদেব দিন দিন সংসারের প্রতি আসক্তিহীন হয়ে উঠেন এবং একদিন নিশীথে বিষ্ণুপ্রিয়া যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্না ছিলেন, তখন চৈতন্যদেব গোপনে গৃহত্যাগ করে চলে যান। বৃন্দাবন যাত্রাকালে চৈতন্যদেব একবার বাংলায় আসেন এবং কুলিয়া হয়ে পিতৃগৃহ দর্শনে যান। বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহদ্বারে চৈতন্যচরণে লুটিয়ে পড়েন। চৈতন্যদেব নিজ কাষ্ঠ-পাদুকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রদান করে সান্ত্বনা দেন। সেই থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া আমৃত্যু প্রতিদিন গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠাসহকারে ঐ পাদুকা পূজা করতেন। ইনি অতি প্রত্যুষে স্নান-আহ্নিক ও পূজা সম্পন্ন করে হরিনাম জপ করতেন। নিশাকালেও নাম জপ করতেন এবং গভীর নিশিথে ভূমিশয্যা গ্রহণ করতেন। মহাপ্রভুর পবিত্র স্মৃতিকে হৃদয়ে চিরজাগরূক রেখে ইনি আশি বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বিষ্ণুভদ্র—প্রাচীন বাংলার একজন বিশেষ খ্যাতনামা ভাস্কর-শিল্পী। ইনি ছিলেন দশম শতাব্দীর লোক।

বিষ্ণুরাম নন্দী—কবি এবং কবি রামেশ্বর নন্দীর বংশধর। ময়মনসিংহ জেলার গচিহাটায় (পাড়া আতরতপা) ছিল এঁর বাসস্থান। এঁর রচিত গ্রন্থ "উদ্ধবগীতা"। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত—মেদনমল্ল পরগণায়, বর্তমান চব্বিশ পরগণা

জেলার বারুইপুর চৌকির ভিতরে নবগ্রামনিবাসী বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গা-সপ্তশতীর অনুবাদ করেছিলেন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

বীটপাল বা **বীতপাল**—বাংলার পালযুগের বিখ্যাত শিল্পী ধীমানের পুত্র। ইনি নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর বাসভূমি ছিল বরেন্দ্র। লামা তারানাথ লিখেছেন যে ধীমান ও বীটপাল উভয়ে প্রস্তর ও ধাতু মূর্তি গঠনে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। ইনি চিত্রশিল্পেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বীটপালের শিষ্যেরা মধ্য-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হত। হেবজ্র, হেরুক, প্রজ্ঞাপারমিতা, পর্ণশবরী, আর্যতারা, বজ্রতারা, হারীতি প্রভৃতি বৌদ্ধমূর্তিগুলি বীটপাল ও তাঁর গোষ্ঠীরই সৃষ্টি। হিমালয় উপত্যকা ও সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় এঁদের শিল্প বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বীটপাল পিতা ধীমানের সঙ্গে পালরাজ ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের গঠন-পরিকল্পনা করেছিলেন।

বীণাপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য। সিদ্ধাচার্য ভদ্রপা ছিলেন এঁর গুরু। প্রাচীন বঙ্গ ভাষায় ইনি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। এঁর রচিত একটি চর্যাপদ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' দেখতে পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

বী ত রা গ—অষ্টমশতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূর কর্তৃক কনোজরাজসভা থেকে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। ইনি কাশ্যপগোত্রীয় বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। দক্ষ, সুষেণ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি নামে এঁর চারি পুত্র ছিলেন।

বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র গোস্বামী—নিত্যানন্দের পুত্র। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে লিখিত আছে যে 'মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীবসুধামাতা'র গর্ভে বীরচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি অদ্বৈত-প্রভুর পত্নী জাহ্নবাদেবীর নিকট দীক্ষিত হয়েছিলেন। 'চৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকা' গ্রন্থ মতে বীরচন্দ্রের পত্নীর নাম 'চান্দঠাকুরানী', 'মুরলিবিলাস' মতে সুভদ্রা, এবং 'গৌরগণোদ্দেশ' মতে নারায়ণী। বীরচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন গোপীজনবল্লভ। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বর্ণিত আছে বীরভদ্র ধর্মপ্রচারের জন্য 'গৌড়ের পাৎসাহের দ্বারে' পৌঁছলে বাদশাহ্ তাঁর ধর্ম নষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হন। তখন বীরভদ্রও জানালেন যে তিনি যবন গৃহেই ভোজন করবেন। বাবুর্চিরা পরপর তিনবার তাঁর জন্য 'খানা' এনে দিলে দেখা গেল উহা পুষ্পসম্ভারে পরিণত হয়েছে। বীরচন্দ্রের মাহাত্ম্য দেখে বাদশাহ মুগ্ধ হন এবং তাঁকে নিজের বহুমূল্য একটি পাথর দান করেন। সেই পাথরে বীরচন্দ্র শ্যামসুন্দর মূর্তি

নির্মাণ ও খড়দহের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বীর হাম্বীরের গৃহে বীরচন্দ্র আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। খেতুরির মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। বীরচন্দ্র বোরাকুলি মহোৎসবেও অংশ গ্রহণ করেন। 'কীর্তনগীতরত্নাবলী'তে 'বীরচন্দ্র' ভণিতার একটি বাংলা পদ পাওয়া যায়। বীরচন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বীরচন্দ্র গোস্বামী—নিত্যানন্দ বংশীয় মাড়োগ্রামবাসী বৈষ্ণব। ইনি গোপালচম্পূ ও পদ্যাবলীর টীকা লেখেন।

বীরদেব—জালালাবাদ উপত্যকার নগরহার নামক স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র। ইনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বৌদ্ধতন্ত্রের অনুরাগী হয়ে পেশোয়ারে কণিষ্ক-বিহারে গমন করেন, এবং সর্বজ্ঞশান্তি নামক আচার্যের নিকট থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করে বোধগয়ার যশোবর্মপুর বিহারে এসে যখন দীর্ঘকাল অবস্থান করেন, সেই সময় ইনি দেবপালের নিকট পূজা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দেবপাল এঁকে নালন্দার প্রতিপালন কার্যেও নিযুক্ত করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল নবম শতাব্দী।

বীরনারায়ণ—কোচবিহারের কামতাপুরের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ বীরনারায়ণ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং ইনি রাজ্যের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। রাজার আদেশে কবিশেখর নামক ব্রাহ্মণ 'কিরাতপর্ব' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইনি কোচবিহারের সন্নিহিত ভেলা-ডাঙ্গর গ্রামে চতুর্ভুজ বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। এঁর রাজত্বকালে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক ষ্টিফেন ক্যাসিলা কামতাপুরে এসেছিলেন। মহারাজ বীরনারায়ণ কর্তৃক রাজধানী 'আঠার কোটায়' স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

বীরবল্লভ—একজন কবি ও পদকর্তা। এঁর রচিত একটি মাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। এই ব্রজবুলি পদটি শ্রীগৌরচন্দ্রের সায়ংকালীন 'আরতি' বিষয়ক। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী।

বীরবাহু—একজন বৈষ্ণব পদকর্তা।

বীরভদ্র গোস্বামী—সমগ্র দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের মর্মানুবাদক। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

বীরসিংহ—বীরভূম জেলার বীরভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে ইনি স্থানীয় লোকদের পরাভূত করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহপুরে ইনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

কারুর কারুর মতে এই বীরসিংহের নামেই রাজ্যের নাম বীরভূম হয়েছে। বীরসিংহই বীরভূম রাজ্যের প্রথম হিন্দু নরপতি। ইনি অত্যন্ত দানশীল ও ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন এবং গুণীর সমাদর করতেন। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। এঁর অবস্থিতি-কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

বীরসিংহ—ইনি ছিলেন মেদিনীপুরের অদূরে এক ক্ষত্রিয় রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ধমানের দামোদর নদের তীরে হেমসিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা বাস করতেন। তাঁরই ভ্রাতা এই বীরসিংহ স্ব.য় পরাক্রমবলে তাম্রলিপ্ত, কর্ণদুর্গ ও বরদাভূমি অধিকার করেছিলেন। মেদিনীপুর শহরের দক্ষিণে বিশমৎ পরগণার মধ্যে চাঙ্গুয়াল গ্রামে বীরসিংহের রাজধানী ছিল। কাঞ্চীপুবপতি গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর বীরসিংহের কন্যা বিদ্যাকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাজিত করে বিবাহ করেছিলেন।

বীর হাম্বীর—বন-বিষ্ণুপুরের রাজা। এঁর একটি দস্যুবাহিনী ছিল। তারা ধনসম্পদ লুঠ করে আনত। একবার বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ একটি পেটিকায় ভরে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য। তার সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপিখানিও ছিল। বন-বিষ্ণুপুরের পথে বীরহাম্বীর নিয়োজিত দস্যুরা ঐ পেটিকাগুলি লুণ্ঠন করে। বহু পরিশ্রমে লিখিত গ্রন্থ অপহরণের সংবাদ পেয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস হতাশ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। গ্রন্থগুলির সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। গ্রন্থগুলি অপহৃত হওয়ায় তিনি একদিন শোকবিহ্বল হৃদয়ে বীর হাম্বীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। শ্রীনিবাসের ব্যক্তিত্বে ও ভক্তি-ভাবে বীরহাম্বীর বিচলিত হন। সপারিষদ বীরহাম্বীর শ্রীনিবাসের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এবং সমস্ত অপহৃত গ্রন্থ প্রত্যর্পণ করেন।

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর বীর হাম্বীরের নামান্তর হয় "শ্রীজীব গোপাল দাস।" ইনি কয়েকটি পদ রচনা করেন। এঁর রচিত একটি পদ কর্ণানন্দে এবং ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরের মতে বীর-হাম্বীর "শ্রীচৈতন্যদাস" ভণিতায় পদ রচনা করেছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে অবস্থান করছিলেন।

বীরহাম্বীরের পুত্র ধাড়িহাম্বীরও শ্রীনিবাসের কৃপালাভ করেছিলেন। ধাড়ীহাম্বীর ভণিতায় শ্রীনিবাস আচার্যের একটি বন্দনা পদ পাওয়া যায়।

বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫৮৭-১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর প্রাধানা মহিষীর নাম সুলক্ষণা।

বীরেশ্বর—একজন কবি। ইনি 'সারদা-মঙ্গল' বা 'সরস্বতী-মঙ্গল'

নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। ইনি 'দৈত্য বীরেশ্বর' নামেও খ্যাত। কথিত আছে, একদিন বীরেশ্বর তাঁর কোন ভৃত্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে একটি চড় মারেন। তাঁর এক চড়েই ভৃত্য প্রাণত্যাগ করে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে রেহাই দিলেন বটে; কিন্তু তিনি বললেন—"পণ্ডিত! আপনার কার্যটি দৈত্যের ন্যায় হইয়াছে।" সেই থেকে বীরেশ্বর দৈত্য বীরেশ্বর নামে খ্যাত।

বীরেশ্বর পঞ্চানন—ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কর্তৃক আহুত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশ জন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পরে হ্যালহেড কর্তৃক উহা Code of Gentoo Laws নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

বুদ্ধ গুপ্ত—পঞ্চম শতকে বুদ্ধগুপ্ত ছিলেন রক্তমৃত্তিকা বা কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ) মহাবণিক।

বুদ্ধশ্রী-জ্ঞান—হরিভদ্রের প্রধান শিষ্য। তিব্বতীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী ইনি ধর্মপালের সময় বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'প্রজ্ঞা-প্রদীপাবলী' নামে ইনি 'অভিসময়ালঙ্কারে'র (বিজ্ঞানবাদ) বৃত্তি লিখেছিলেন। এঁর অপর গ্রন্থের নাম 'মহাযানলক্ষণসমুচ্চয়'। ইনি ছিলেন উড্ডিয়ান বিনির্গত। অবস্থিতিকাল নবম শতাব্দী।

বুদ্ধসেন—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পীঠী (বর্তমান গয়া জেলায় অবস্থিত) রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানা যায় না।

বুদ্ধিমন্ত খান্—পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বুদ্ধিমন্ত খান্ নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। চৈতন্যভাগবতের বহুস্থানে এঁর নামোল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইনি পাঠান নবাবের অধীনে নবদ্বীপের শাসন কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্র এঁর রাজসভার পণ্ডিত ছিলেন। এঁরই প্রযত্নে গৌরাঙ্গদেবের বিবাহ রাজকুমারোচিত সমারোহে সম্পন্ন হয়েছিল। এবং এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বুদ্ধিমন্ত খানই বহন করেছিলেন।

এই বুদ্ধিমন্ত খান্ই মহাপ্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্যের সম্পূর্ণ আয়োজন করেছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

বুনো রামনাথ—রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত দ্র°।

বুরহান্‌উল্লা—একজন মুসলমান কবি। এঁর রচিত 'কেয়ামত নামা' ইস্‌লামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। কবির পিতার নাম শেখ মসএদ, গুরু ছিলেন শেখ দিদার মামুদ। পুথির লিপিকাল ১১৫৪ সাল।

বুর্শিয়ে, রিচার্ড—প্রথমে কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। পরে বোম্বাই-এর গভর্নর হন। কলকাতায় ফ্রি-স্কুল নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে ইনি অগ্রণী ছিলেন। মেয়র-কোর্ট স্থাপিত হবার পর বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর পূর্বদিকে সেণ্ট এণ্ড্রু গির্জার নিকট এঁর বাস ছিল।

বৃন্দকুণ্ড বা **বৃন্দাবন**—বৈদ্য-শাস্ত্রে ইনি বৃন্দ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, কিন্তু বঙ্গদেশীয় কুণ্ড বংশের বীজিপুরুষ বৈদ্যকুল পঞ্জিকায় এঁর 'বৃন্দকুণ্ড' নাম দেখা যায়। চন্দ্রপ্রভায় লিখিত আছে —"কুণ্ডবংশে বৃন্দকুণ্ডো বীজী বৈদ্যক-শাস্ত্রকৃৎ। স ভরদ্বাজসম্ভূতে বঙ্গভূমি কৃতাশ্রয়ঃ॥"

ইনি বৃন্দমাধব বা বৃন্দ অর্থাৎ সিদ্ধযোগ, বৃন্দসিন্ধু এবং পদবিনিশ্চয় এই তিনখানি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। ইনি নবম-দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বৃন্দাবতী দাসী—উৎকলীয় বৈষ্ণব-মহিলা। ইনি ১৬২১ শকে 'পূর্ণতমচন্দ্রোদয়' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

বৃন্দাবন দাস—শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ শ্রীরামের কন্যা নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস। বৃন্দাবন দাসের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বৃন্দাবন ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ সুকুমার সেনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কবি "ষোড়শ শতাব্দীর দশের কিংবা বিশের কোঠায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন বৃন্দাবন দাস ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনদাসই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় চৈতন্য-চরিত কাব্য 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত' রচনা করেছিলেন। কথিত আছে বৃন্দাবন দাস গ্রন্থরচনা করে প্রথমে এর নাম দিয়েছিলেন চৈতন্য-মঙ্গল। কিন্তু পরবর্তীকালে লোচন-দাস এই একই নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করায় বৃন্দাবন-জননী পুত্রের রচিত গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে নাম দেন 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'। আবার 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে বৃন্দাবনের গোস্বামীরাই ভাগবত আখ্যা দেন। কবি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পরম ভক্ত-শিষ্য। তাঁরই প্রেরণা ও নির্দেশে কবি চৈতন্য-চরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন। খুব সম্ভব ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' রচিত

হয়। চৈতন্যভাগবতের বৈশিষ্ট্য তার নানা তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিকতা। প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের নানা উপাদান এতে সন্নিবিষ্ট আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসকে ‘চৈতন্যলীলার ব্যাস’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ‘নিত্যানন্দবংশমালা’ নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এছাড়া, তিনি বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ-প্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবন বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বসবাস করেন। এ গ্রামে তিনি একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা ‘দেনুড় শ্রীপাঠ’ নামে এখনো পরিচিত। তিনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর শেষ পরিণতি সম্বন্ধে বীর-হাম্বীর প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। বীর-হাম্বীর দ্রং।

বৃন্দাবন চক্রবর্তী—শ্রীকৃষ্ণদেব সার্বভৌমের শিষ্য। ইনি শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের ‘সদানন্দবিধায়িনী’ নামে এক প্রাঞ্জল টীকা রচনা করেন। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

বৃহস্পতি ভাদুড়ী (আচার্য)—বিখ্যাত উদয়নাচার্যের পিতা। বৃহস্পতির পিতার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ এবং পিতামহের নাম যোগেশ্বর ভাদুড়ী। বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন বলে আচার্যপদ লাভ করেন। এঁর সঙ্গে বৌদ্ধাচার্য জিষ্ণুর বিচার হয়। সেই বিচারে বৃহস্পতি পরাস্ত ও অপমানিত হয়ে বনে গিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এঁর উপযুক্ত ধর্মসংস্থাপন ও বৌদ্ধবিধ্বংস-হেতুই শঙ্করাচার্যের ন্যায় উদয়নাচার্য নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল চতুর্দশ শতাব্দী।

বৃহস্পতি রায়—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রাঢ় দেশে মহিন্তা গ্রাম-নিবাসী শ্রীনিবাস অর্থাৎ বৃহস্পতি রায় ‘মুকুটশুদ্ধিদীপিকা’ নামে ধর্মচারণ কাল-নির্ণয়ের গ্রন্থ লেখেন। হলায়ুধ এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস ‘গণিতচূড়ামণি’ নামে একখানা বিশুদ্ধগণিতের গ্রন্থ রচনা করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে শ্রীনিবাস হয়ত রাজা গণেশের পুত্র যদুরও অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই বৃহস্পতিকে ‘আচার্য’ ও ‘কবিচক্রবর্তী’ উপাধি দেন। বৃহস্পতি রচিত স্মৃতিরত্নহার গ্রন্থ এবং অমরকোষের টীকা পদার্থচন্দ্রিকায় তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ, মাতা নীলমুখায়ী এবং স্ত্রী রমা। তাঁর পুত্র বিশ্রাম ও রাম ছিলেন দাতা, মহাপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থরচয়িতা। গৌড়ের রাজা জালালউদ্দিন বৃহস্পতিকে ছয়টি উপাধি দেন—(১) আচার্য, (২) কবিচক্রবর্তী (৩) পণ্ডিত সার্বভৌম, (৪) কবিপণ্ডিত

চূড়ামণি, (৫) মহা আচার্য, (৬) রাজপণ্ডিত। সর্বশেষে তাঁকে রাজোচিত জাঁকজমকে রায়মুকুট উপাধি দেওয়া হয়। 'নির্ণয়বৃহস্পতি' নামে তিনি শিশুপালবধের একখানি টীকা রচনা করেন। তাতে দেখা যায় তিনি বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত স্মৃতিরত্নহার গ্রন্থে বহু উৎসবের সূচী আছে। 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র উপর বৃহস্পতি "পদচন্দ্রিকা" নামে একটি টীকা রচনা করেন। এই বিস্তৃত গ্রন্থে তিনি বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই টীকা ষোলখানি টীকা দেখে লেখা। ২৭০ খানি পুথি থেকে তাঁর প্রমাণ গৃহীত। এই থেকে বুঝা যায় গৌড় সুলতানের আশ্রিত রায়মুকুটের গ্রন্থসংগ্রহ বিপুল ছিল। রায়মুকুট দু'চারটা বাংলা শব্দেরও উল্লেখ করেছেন।

বেচার, রিচার্ড—একজন ইংরেজ। ইনি প্রথমে ঢাকার কাউন্সিলের প্রধান সদস্য ছিলেন। তারপর ক্লাইবের সময় কলকাতা কাউন্সিলের তৃতীয় সদস্য হন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার জমিদার পদ প্রাপ্ত হন।

বেতালভট্ট বা বেতাল সিংহ—ভট্ট বা ভাট ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের সময় ইনি স্তবগান করেছিলেন। অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

বেদব্যাস—বিশ্ববিখ্যাত 'মহাভারত' মহাকাব্য-প্রণেতা বেদব্যাস বাঙালী ছিলেন বলে বিশেষভাবে অনুমিত হয়। বজ্রসূচী উপনিষদে বেদব্যাসের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে—'জাত ব্যাসস্তু কৈবর্তাৎ'। দ্বীপে জন্ম বলে তাঁর নাম আবার দ্বৈপায়ন। ভারতে বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও দ্বীপ ছিল না এবং কৈবর্তও ছিল না। এখনো কোথাও নেই। সুতরাং বেদব্যাস নিঃসন্দেহে বাঙালী।

বেণ্টো ডি সেলভেস্ত্রে—ডিসুজা দ্র°।

বেলি, উইলিয়াম—জাতিতে ইংরেজ। ইনি ছিলেন একজন চিত্রকলাবিদ্। ইনি প্রাচীন কলকাতার অনেক প্রসিদ্ধ স্থান ও অট্টালিকাদির চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন। ইনি ১৩নং চিৎপুর রোডে থাকতেন এবং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ফ্রী-স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বৈজয়ন্তী—পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামনিবাসী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিদুষী পত্নীই বৈজয়ন্তী। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিতা ছিলেন। বৈজয়ন্তীর পিতা ছিলেন ফরিদপুরের ধানুকা গ্রামের মুরভট্ট। তিনি পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং মীমাংসাশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। স্বামীর সাহিত্যসাধনায় বৈজয়ন্তীর সাহায্য ছিল অপরিহার্য।

স্বামী কৃষ্ণনাথ তাঁর 'আনন্দলতিকা' কাব্য রচনায় তাঁর পত্নী বৈজয়ন্তীর ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

বৈদ্যদেব—বাংলার পাল রাজবংশের রাজা কুমার পালদেবের মন্ত্রী। এঁব পিতা ও পিতামহের নাম ছিল যথাক্রমে বোধিদেব ও যোগদেব। এঁরাও যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপাল ও রামপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহামন্ত্রী বৈদ্যদেব বিখ্যাত যোদ্ধা ও সেনাপতিও ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গে একটি নৌযুদ্ধে ইনি বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন। কামরূপপতি তিমৃগ্যদেবেব বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হয়ে বৈদ্যদেব তাঁকে "নিজভুজবিমর্দনে" যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে ১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দে "তিনি মহীপাল সামন্ত নরপালগণের আশ্রয়" স্বরূপ হয়ে কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কমৌলিতে প্রাপ্ত এঁর অনুশাসন রচনা করেছিলেন কবি মনোরথ।

বৈশ্য গারো—খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ময়মনসিংহ জেলার উত্তরভাগ, সুসঙ্গ "পাহাড় মুল্লুকে" বৈশ্য গারো নামক এক গারো রাজত্ব করতেন। এঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

বৈষ্ণব দাস—এঁর আসল নাম গোকুলানন্দ সেন। জাতিতে বৈদ্য। নিবাস ছিল কাটোয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর নন, টেঞা-নিবাসী "দ্বিজ" হরিদাসের বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবদাস 'গীতকল্পতরু' বা 'পদকল্পতরু' নামে বৈষ্ণব পদাবলীর এক বিরাট পদসংহিতা সঙ্কলন করেছিলেন। ইহা বৈষ্ণবপদাবলীর মহাভারত। সংগ্রহের নাম ছিল গীতকল্পতরু, পরে গায়কের মুখে মুখে নাম পরিবর্তিত হয়ে 'পদকল্পতরু' হয়ে গিয়েছে। এতে একশ ত্রিশ জনেরও বেশী কবির লেখা তিন হাজারেরও বেশী পদ সঙ্কলিত আছে। বৈষ্ণবদাসের এই সংগ্রহ ভারতের প্রা দে শি ক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। "'পদকল্পতরু'তে পদগুলি সাজাবার সময় বৈষ্ণবদাস বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের মোটামুটি সকল কথাই সরল ক'বে বলেছেন। এই অংশটি স্বতন্ত্রভাবে বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের একটি সুন্দর নিবন্ধ। এতে তাঁর নিজেরও কতকগুলি পদ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। এঁর রচিত কোন কোন পদ এতই সুন্দর যে, পাঠ করতে করতে মনে হয় যেন ঠাকুর নরোত্তম দাসেরই রচনা। এঁর কোন কোন পদ পাঠে অতি পাষণ্ডেরও নয়নযুগল অশ্রুভারাবনত হয়। এঁর রচিত পদগুলি থেকে জানা যায় বৈষ্ণব সাহিত্য ও ইতিহাসে এঁর অসাধারণ

ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াও ছিলেন। ইনি যে সুরে গান করতেন, তাকে এখন 'টেঞার ছপ' বলে। বৈষ্ণবদাসের একমাত্র পুত্রের নাম ছিল রামগোবিন্দ সেন।

বোধিধর্ম আচার্য—নানাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বৌদ্ধ পণ্ডিত। চীন সম্রাট স্বয়ং এঁকে চীনদেশে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পাঠালে ইনি ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত থেকে সমুদ্রপথে চীনে রওনা হন এবং ক্যান্টনে এসে পৌছান। চীনবাসিগণ এঁর অপূর্ব ধর্মপ্রাণতা, চরিত্রমাহাত্ম্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে এঁর একান্ত গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। 'প্রজ্ঞাপারমিত সূত্র' ও 'উষ্ণীষবিজয়' নামে এঁর দু'খানি গ্রন্থ জাপানের প্রসিদ্ধ হবিয়জি মঠে রক্ষিত আছে।

বোধি বর্মণ—'কাপট্য' নিবাসী। এবং প্রজ্ঞাবর্মণের গুরু। এঁর রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। এঁর অবস্থিতি কাল দশম শতাব্দী।

বোধিভদ্র—শীলভদ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। বোধিভদ্র সূত্রে ও শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনিও নালন্দায় বাস করতেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন প্রথম নালন্দায় যান, তখন এই বোধিভদ্রের আবাসেই তাঁর বাসস্থান নির্ণীত হয়েছিল এবং সাতদিন ধরে বোধিভদ্র এই বিদেশী আগন্তুককে পরিচর্যা করে তৃপ্ত ও তুষ্ট করেছিলেন। তখন বোধিভদ্রের বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। বোধিভদ্র ছিলেন সোমপুর বিহারের আচার্য। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'জ্ঞানসারসমুচ্চয়।' ইহা একখানি মহাযান গ্রন্থ। এছাড়া, বোধিভদ্র আরও কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলার পালরাজাদের রাজত্বকালে ইনি জীবিত ছিলেন।

বোপদেব গোস্বামী—সুপ্রসিদ্ধ বোপদেব গোস্বামী যাঁর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সর্বজন সমাদৃত গ্রন্থ, তিনি বাঙালী ছিলেন। বগুড়া জেলার সুপ্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানেই তাঁর নিবাস ছিল। বোপদেবের পিতা চিকিৎসক ছিলেন। ইনি একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর 'কাব্যকামধেনু' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বোল্টস, উইলিয়ম—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন খ্যাতনামা কর্মচারী ছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "Consideration on Indian Affairs" নামক একখানি বহু-জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এতে ইনি তৎকালীন বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

ব্রজকিশোর রায়—বর্ধমান রাজের দেওয়ান। চুপীগ্রাম নিবাসী। ইনি ও এঁর দুই পুত্র নন্দকুমার (নন্দ-

কিশোর) রায় ও রঘুনাথ রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনেকগুলি শাক্তপদ রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে রঘুনাথের কয়েকটি গান কাব্যগুণে শাক্ত-পদ সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ব্রজমোহন দাস—'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ' নামক চৈতন্যচরিত গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মের তারিখটি বার, মাস ও তিথিসমেত সঠিকভাবে পাওয়া যায়। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, বৃন্দাবন দাস ও মুরারির চরিতগ্রন্থ এর উপাদান এবং গ্রন্থ মধ্যে এক স্থলে চৈতন্য চরিতামৃতের এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামীর' বচন উদ্ধৃত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল।

ব্রজমোহন মজুমদার—ধর্ম-সংস্কারকাযে যে সব বন্ধু ও শিষ্য রাজা রামমোহন রায়কে সাহায্য করেছিলেন, ব্রজমোহন মজুমদার তাঁদের একজন। তাঁর জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। একবার তাঁর গৃহে রামমোহনেব 'আত্মীয় সভার" অধিবেশনও হয়েছিল। ব্রজমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম ছিল —'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ'। এই গ্রন্থখানি 'A Tract Against the prevailing system of Idolatry' নামে ইংরেজীতেও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল ব্রজমোহনের মৃত্যু হয়।

ব্রজানন্দ—একজন কবি ও পদ-কর্তা। 'ব্রজানন্দ' ভণিতায় একটি মাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। এঁর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী।

ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস—'গোপী উপাসনা' রচয়িতা। গ্রন্থের লিপি-কাল ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ব্রহ্মানন্দ গিরি—ময়মনসিংহ জেলার কাটেহালি গ্রামনিবাসী জগদানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ বটুর (জন্ম ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ) গুরু। ব্রহ্মানন্দ অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি স্বীয় গুরু ত্রিপুরানন্দকে অবজ্ঞা করায় শাপগ্রস্ত হন এবং বহু অনুনয় বিনয় দ্বারা গুরুর নিকটে শাপ হতে উদ্ধার লাভের উপায় অবগত হন। জগদানন্দকে কামাখ্যা পীঠের উত্তর-সাধক হিসাবে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করেই ব্রহ্মানন্দ শাপমুক্ত হন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। এঁর রচিত দুখানি তন্ত্রগ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ—(১) শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, (২) তারারহস্য।

ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী—মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির উপরে 'অদ্বৈতচন্দ্রিকা' নামে এক টীকা রচনা করেন। ইনি ছিলেন নারায়ণ তীর্থ এবং পরমানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনি গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলেই খ্যাত। পরিমাণ

অনুসারে তাঁর চন্দ্রিকার দুটি সংগ্রহ আছে—একটি গুরুচন্দ্রিকা, অন্যটি লঘুচন্দ্রিকা। তাঁর রচিত অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত বিদ্যোতন, বেদান্তসূত্র মুক্তাবলী, সিদ্ধান্তবিন্দু টীকাও প্রসিদ্ধ। জৈমিনি সূত্রের উপর তাঁর মীমাংসা চন্দ্রিকা লিখিত। এঁর আবির্ভাব কাল সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দী (?)

ব্রাউন, দি রেভারেণ্ড ডেভিড—ব্রিটেন থেকে বাংলায় আগত আদি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের অন্যতম। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কলকাতায় পুরোহিতের কাজ করতেন। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

ভ

ভক্তরাম দাস—'গোকুলমঙ্গল' রচয়িতা। এঁর নিবাস ছিল সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রাম। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

ভক্তি দাস—এঁর রচিত কাব্যের নাম 'বৈষ্ণবামৃত'। রচনাকাল ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যটি 'কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ' অর্থাৎ কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোচনা, গীতার মতো। কবির ভণিতায় পাওয়া যায়,

"বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ পাঁচালী রত্নময়ে
কৃষ্ণের চরণে দীন ভক্তিদাসে গায়ে।"

গ্রন্থ রচনাকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

ভগদত্ত—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরকের পুত্র। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নরক নিহত হলে ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভগদত্ত অতি সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। সমগ্র আসাম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর প্রভৃতি সুবিস্তৃত অঞ্চলের উপর ভগদত্ত আধিপত্য করতেন। অর্জুনের দিগ্বিজয়কালে ভগদত্ত নিজ কিরাত ও চীন সৈন্য নিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এবং অতুল পরাক্রম দেখিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

পাণ্ডবদের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ভগদত্ত পুত্র বজ্রদত্ত কর্তৃক ধৃত হয়েছিল। তাতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পরিশেষে বজ্রদত্ত পরাজিত হয়ে পাণ্ডবদের সামন্তশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন।

ভগদত্ত পাল—ইনি খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যে মধুপুরে (ময়মনসিংহ জেলায়) রাজত্ব করতেন। কেউ কেউ এঁকে কোচ বলে অনুমান করেছেন।

ভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্য—'প্রেমামৃত মহাস্তোত্র রচয়িতা। এই পুঁথির ১১৩১ বঙ্গাব্দের একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গেছে।

ভগবান আচার্য—এঁর পিতার

নাম শতানন্দ খান। শতানন্দ ঘোর বিষয়ী ছিলেন। আর ভগবান ছিলেন সংসারবিরাগী। ইনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি সব কিছু পরিত্যাগ করে চৈতন্যচরণে শরণ নিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন 'প্রভুর অতি প্রিয় দাস'। ইনি মাঝে মাঝে মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য নীলাচলে যেতেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর ভগবান আচার্য নালাচলে গিয়ে তাঁর নিকট বাস করতে থাকেন। মাঝে মাঝে ইনি মহাপ্রভুকে 'ঘরভাতে নিমন্ত্রণ' করে খাওয়াতেন। মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভগবান আচার্যের স্থান ছিল অতি উচ্চে। ভগবান আচার্য খঞ্জ ছিলেন। তবুও ইনি মহাপ্রভুর সেবা করে গিয়েছেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

ভগবান রায়—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভব, মিত্রোপাধিধারী, কাটোয়া মহকুমার খাজুড্ডি গ্রামনিবাসী। রাজস্বসংক্রান্ত কাজে এঁর বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে সম্রাট আকবর এঁকে বাংলার প্রধান কানুনগোর পদে নিযুক্ত করেন। ইনি প্রথমে রায়মহাশয় ও পরে কার্যদক্ষতার জন্য ভগবান রায় "বঙ্গাধিকারী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ভগবান রায় প্রথম বাংলার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে কানুনগোর কার্য করেন। ইনি মালদহে যে কালীবাড়ী ও অতিথিশালা নির্মাণ করিয়েছিলেন তার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

ভগীরথ কবিরাজ—প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পিতা। পত্নীর নাম সুনন্দা।

ভগীরথ ঠকুর (নামান্তর 'মেঘ') —মিথিলাবাসী নৈয়ায়িক। মাত্র বিশ বছর বয়সে পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ সমাপ্ত করে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বর্ধমান রচিত দ্রব্যপ্রকাশ, গুণপ্রকাশ, কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ ও লীলাবতী প্রকাশের 'প্রকাশিকা' টীকা রচনা করেন, যা নৈয়ায়িক সমাজে 'মেঘ' বা 'জলদ' নামে পরিচিত। ইনি বৌদ্ধাধিকারের উপর একখানি টীকা রচনা করেছিলেন। ভগীরথ ছিলেন দ্বারভাঙারাজ মহেশ ঠকুরের অগ্রজ মধ্যম ভ্রাতা। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

ভগীরথ, দ্বিজ—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। রচিত কাব্য 'শিবায়ন'।

ভগীরথ-বন্ধু—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যসংহিতা'। আগমের ধরনে অর্থাৎ শিব-শক্তির সংলাপরূপে রচিত ছোট নিবন্ধ। ভগীরথ ছিলেন "শঙ্খকার" অর্থাৎ শাঁখারি। চৈতন্য-সংহিতার রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

ভট্টনারায়ণ—বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের আদি পুরুষ। তাঁর নিবাস বর্ধমানের ভূরিশ্রেষ্ঠ (ভুরশুট) গ্রামে।

তাঁর রচিত বিখ্যাত 'বেণীসংহার' গ্রন্থ ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদৃত।

আদিশূর কনৌজ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন ভট্টনারায়ণ নাকি তাঁদের অন্যতম। অবশ্য এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

ভট্ট শ্রীধর—৯৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়কন্দলী নামে বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের একটি অসাধারণ মূল্যবান টীকা রচনা করেছিলেন। শ্রীধরের পিতা ছিলেন বলদেব, মাতা অব্বোকা (বা অচ্ছোকা)।

ভট্টার হরিশ্চন্দ্র—চরকের প্রসিদ্ধ টীকাকার এবং ভট্টারসংহিতাকার। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আদ্রদেব এবং রথ্যাদেবী হতে উৎপন্ন হয়ে ইনি যথাসময়ে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কদেবের সভাপতি এবং রাজবৈদ্য হন। এঁর রচনা বাণভট্টেরও সুখ্যাতি লাভ করেছিল। হরিশ্চন্দ্র কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদে) থাকতেন।

ভদ্রপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য। সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ ছিলেন এঁর গুরু। প্রাচীন বঙ্গভাষায় ভদ্রপাদ চর্যাপদ রচনা করেন। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' এঁর রচিত একটি চর্যাপদ পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

ভদ্রবাহু—গৌড়ের পুণ্ড্রবর্ধন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কোটিকপুরের অধিপতি পদ্মরথের পুরোহিত সোমশর্মার পুত্র। ভদ্রবাহু বাল্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। শিক্ষা শেষ হলে তিনি জৈন সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়ে সংসার ত্যাগ করেন। কালে তিনি শ্রুতকেবলি—সকল জৈনের মহাগুরু হন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এঁর নিকট জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র ভারতে জৈনধর্মের প্রভাব বিস্তারে ভদ্রবাহুর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। এঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল জন্মভূমি গৌড়। এখানকার বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থান করে ইনি কল্পসূত্র, আবশ্যকনিযুক্তি, ভদ্রবাহুসংহিতা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। এঁর প্রধান শিষ্য গোদাস গুরুর নির্দেশে গৌড়ের চারপ্রান্তে চারটি শক্তিশালী জৈনকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। মহীশূরের জৈনতীর্থ শ্রাবণবেলগোলায় ৩১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভদ্রবাহুর মৃত্যু হয়।

ভবচন্দ্র—রোহটাস্‌গড়ের ভূস্বামী সুবর্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র এবং বিজয়চন্দ্রের পুত্র। দশম শতাব্দীতে পিতামহ ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গের একটি স্বাধীন রাজ্যের ইনি ছিলেন শেষ নৃপতি। ইনিই রূপকথার সেই বিখ্যাত হবুচন্দ্র রাজা। অপরূপ বুদ্ধিবৃত্তির জন্য মন্ত্রী গবুচন্দ্র সহ আজও তিনি লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী দ্রং।

ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য—একজন স্মার্ত। এঁর পিতার নাম হরিহর তর্কালঙ্কার, পিতামহ শিবকৃষ্ণ

ন্যায়পঞ্চানন ও প্রপিতামহ গঙ্গাতীর-বাসী গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য। লেখকের অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতকের শেষভাগ। এঁর রচিত গ্রন্থ-গুলির নাম: 'শ্রাদ্ধকলা,' 'শুদ্ধিকলা', 'তীর্থকলা'।

ভ ব দে ব ভ ট্ট—জীমূতবাহনের সমসাময়িক রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী। এঁর পিতামহ আদিদেব বঙ্গাধীপের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থেকে বিশ্রাম-সচিব, সান্ধি-বিগ্রহীক ও মহামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। রাঢ়ের শূররাজগণের অধীনে ভবদেব এক নিম্নস্তরের কর্মচারী-রূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। বঙ্গরাজ হরিবর্মদেব তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে উচ্চ রাজকাজে নিযুক্ত করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি মন্ত্রী-সচিবের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তন্ত্র, সিদ্ধান্ত, গণিত, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদে ভবদেবের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ভবদেব নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করে-ছিলেন: ব্যবহারতিলক, প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ, দশকর্মপদ্ধতি, ছন্দোগ্যপদ্ধতি, সম্বন্ধবিবেক, শবসূতকাশৌচপ্রকরণ, সংস্কারপদ্ধতি ইত্যাদি। ইনি ছিলেন যুগন্ধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। 'তৌতাতিত-মততিলক' নামে ভবদেবের একখানি মীমাংসা গ্রন্থও আছে। এঁর পিতার নাম গোবর্ধন, মাতার নাম সাঙ্গোকা। এঁর নামের সঙ্গে 'বালবলভীভূজঙ্গ' উপাধিটি যুক্ত দেখা যায়। ইনি হোরা শাস্ত্রে গ্রন্থ লিখে 'দ্বিতীয় বরাহ' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে অনন্ত মন্দিরগাত্রে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তা এই ভবদেব ভট্টেরই প্রশস্তি। সম্ভবতঃ ইনি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

ভবশঙ্করী—রায়বাঘিনী দ্র°।

ভবানন্দ, দ্বিজ—ভবানন্দ সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের কবি। এঁর পিতার নাম শিবানন্দ। 'হরিবংশ'ই ছিল কবির রচিত গ্রন্থ। এই হরিবংশের সঙ্গে মূল সংস্কৃত পৌরাণিক গ্রন্থ 'হরিবংশ'-এর কোনই সংশ্রব নেই। যদিও কবি বার বার বলেছেন,

"পরাশর-সুত মুনি নারায়ণ-অংশ
বিরচিত কৈল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ।
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে
লোক বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে।"

প্রধানতঃ দানলীলাদি লৌকিক কাহিনীই গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কবি তাঁর কাব্যে বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনী বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। কাহিনীগুলি যেন কৃষ্ণ বলছেন রাধাকে। ভবানন্দের কাব্যের সবচেয়ে পুরানো পুঁথির লিপিকাল ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হওয়া সম্ভব। ভবানন্দের কাব্য সিলেট অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

তাছাড়া, ভবানন্দ 'কৃষ্ণের একপদী চৌত্তিশা' বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেছিলেন।

ভবানন্দ, দীন—একজন প্রাচীন পদকর্তা। এঁর সুন্দর পদসমূহ বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়।

ভবানন্দ মজুমদার—কৃষ্ণনগর-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। মহারাজ মানসিংহকে বাংলা বিজয়ে সাহায্য করায় পুরস্কারস্বরূপ ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরমান বলে চোদ্দটি পরগণার শাসনভার লাভ করেছিলেন। এঁরই বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি মানসিংহের নিকট। এঁর পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র বা রাম সমাদ্দার। ভবানন্দের পূর্ব নাম ছিল দুর্গাদাস। পরে মহারাজ ভবানন্দ মজুমদার নামে অভিহিত হন।

দুর্গাদাসের পিতামহ ছিলেন রাজা কাশীনাথ। দুর্গাদাস বাল্যকাল থেকেই চতুর ছিলেন এবং নিজ বুদ্ধিকৌশলে হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে ঢাকার নবাবকে সন্তুষ্ট করে হুগলীর কানুনগোর পদ লাভ করেন। উত্তর-কালে ভবানন্দ বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাঙালী ভূপতি প্রতাপের খুল্লতাত পুত্র কচু রায় ও চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র রায়ের সাহায্যে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে নদীয়া সমুদ্র-গড়ে সসৈন্য পার হবার সহায়তা করে প্রতাপের এবং সমগ্র বাঙালী জাতির সর্বনাশ সাধন করেছিলেন। তা প্রত্যেক বাঙালীর সুবিদিত।

ভবানন্দ রায়—প্রখ্যাত ভক্ত রামানন্দ রায়ের পিতা। এঁরা ছিলেন গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যানগরের অধিকারী, উৎকলাধিশ্বর প্রতাপরুদ্র-দেবের প্রদেশপাল। প্রতাপরুদ্রদেব এঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর ভবানন্দ রায় সপরিবারে এসে নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন মহাপ্রভু ভবানন্দকে 'পাণ্ডু', তাঁর স্ত্রীকে 'কুন্তী' এবং তাঁর পাঁচ পুত্রকে 'পঞ্চপাণ্ডব' আখ্যা প্রদান করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ—ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বিদ্যমান ছিলেন। ষোড়শ শতকের সমসাময়িক মহানৈয়ায়িকগণের মধ্যে ভবানন্দ ছিলেন অন্যতম। ইনি ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইনি মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণদাস সার্বভৌম ছিলেন ভবানন্দের গুরু। ভবানন্দ-রচিত টীকাসমূহ "ভবানন্দী" টীকা নামে প্রসিদ্ধ। ভবানন্দ রচিত টীকাসমূহ: প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা, অনুমানদীধিতিটীকা, আখ্যাতবাদ টীকা, নঞ্‌বাদ টীকা, গুণদীধিতি টীকা, লীলাবতীশিরোমণিটীকা গ্রন্থসমূহ এবং প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী,

অনুমানালোকসারমঞ্জরী, শব্দালোক-সারমঞ্জরী, শব্দমণিসারমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পক্ষধর মিশ্র কৃত 'আলোক' গ্রন্থের টীকা। ভবানন্দ প্রণীত পক্ষধর মিশ্র কৃত মন্যালোকের "সারমঞ্জরী" নামক টীকা এবং "কারকচক্র" প্রধান। এছাড়া, ভবানন্দ 'লটার্থবাদ', 'কাবণতাবাদ-বিচাব', 'শব্দার্থসার-মঞ্জরী' এবং রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির 'ভাষ্য' ও 'মণিদীধিতি-গূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।

ভবানন্দ সেন—কবি ভবানন্দ সেন ভাগবতের আংশিক অনুবাদ করেন। তাঁব পুঁথির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

ভবানী দাস—ইনি ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনী রচয়িতা। ইনি ছিলেন ত্রিপুরা অঞ্চলের অধিবাসী। এঁর কাব্য রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

ভবানী দাস-ঘোষ—ভবানীদাস-ঘোষের রচিত কাব্যের নাম 'রাধাবিলাস' বা 'রাধাকৃষ্ণ-বিলাস'। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড এই কাব্যের অন্যতম প্রধান বিষয়। সর্বাপেক্ষা পুরানো পুঁথির লিপিকাল ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম যশোদা। নিবাস পাতগুা পাঠান্তরে পাগুগুা, নবদ্বীপের কাছে। কবির কৃষ্ণলীলা কাব্যের পুঁথি উত্তর এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গেও পাওয়া গেছে। ইহা কবির প্রাচীনত্বের ও লোক-প্রিয়তার পরিচায়ক।

অন্য এক স্বতন্ত্র ভবানী দাসের নাম পাওয়া গেছে। এঁর নামে লক্ষ্মণদিগ্বিজয়, শত্রুঘ্নদিগ্বিজয়, রামের স্বর্গারোহণ ইত্যাদি বিভিন্ন পালার একাধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এক ভবানীদাসের রচিত ব্রহ্মপুরাণের পুঁথি শ্রীহট্টে পাওয়া গিয়েছে।

ভবানীনাথ "দ্বিজ" "পণ্ডিত" (ভবানী দাস বা ভবানী রাম)—এঁর 'শ্রীরাম পাঁচালী' কাব্য অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে লেখা। কবি ছিলেন ভুলুয়ার (নোয়াখালির প্রত্যন্ত) রাজা জয়চন্দ্র বা জগৎমাণিক্যের "সদস্য" অর্থাৎ সভাসদ্। রাজার নির্দেশেই কবি বামাযণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কাব্যরচনাকালে রাজকোষ থেকে কবির জন্য রোজ দশ মুদ্রা বরাদ্দ ছিল ("দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান")। কবি সাধারণতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। ইনি 'ব্রহ্মাপুরাণ' নামে আর একখানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

ভবানী পাঠক—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলার এক ডাকাত দলের বিখ্যাত ব্যক্তি। প্রথমে ছিলেন, বাংলার আর এক বিখ্যাত ডাকাত মজনুন শাহের সহযোগী। ইনি ছিলেন আরা জেলার

বিহারী ব্রাহ্মণ। দেবী চৌধুরানী নামে একজন স্ত্রীলোক ডাকাতের সঙ্গে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান একদল সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে ভবানী পাঠকের দলকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে তিনজন অনুচরসহ ভবানী পাঠক নিহত হন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে ভবানী পাঠকের চরিত্র অমরত্ব লাভ করেছে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—চব্বিশ পরগণাজেলার উখড়ার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভবানীচরণ ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন ভবানীচরণ পুরাতনের পক্ষ অবলম্বন করে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এজন্য তাঁকে তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। তিনি রামমোহনের সহমরণ-প্রথা বিলোপ আন্দোলনেরও বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি "ধর্মসভা" সংস্থাপনও করেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির পথে ভবানীচরণের উল্লেখযোগ্য অবদান বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের সংযোগে সরস ব্যঙ্গ রচনার সূত্রপাত করে ভাষায় লালিত্য ও রস সঞ্চার করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা সাংবাদিকও ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'সম্বাদ কৌমুদী' 'সমাচার চন্দ্রিকা' উনবিংশ শতকের বাংলা সাময়িক পত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান।

তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি: (১) কলিকাতা কমলালয়, (২) হিতোপদেশ (৩) নববাবুবিলাস, (৪) দূতীবিলাস, (৫) নববিবিবিলাস, (৬) শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার, (৭) আশ্চর্য উপাখ্যান, (৮) পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা।

ভবানীচরণ সম্পাদিত গ্রন্থরাজি: (১) হাস্যার্ণব, (২) শ্রীমদ্ভাগবত, (৩) প্রবোদচন্দ্রোদয় নাটকং, (৪) মনুসংহিতা, (৫) উনবিংশ সংহিতা (৬) শ্রীভগবদ্গীতা, (৭) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি।

ভবানীপ্রসাদ রায় (অন্ধকবি)—ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার আটীয়া পরগণার কাঁটালিয়া গ্রামে ভবানীপ্রসাদের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন জাতিতে বৈদ্য, উপাধি 'কর'। কিন্তু 'রায়' খ্যাতি দ্বারাই এই কর-বংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে দেশে পরিচিত। এঁর পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ ছিলেন। এঁর

জন্মকাল ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন কবি জ্ঞাতি বিরোধে আজীবন দুঃখ পেয়েছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থ: দুর্গামঙ্গল। তাছাড়া, ইনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদক।

ভবানী বেনে—খ্যাতনামা কবিওয়ালা। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার নিকট সাতগেছে গ্রামে জন্ম। জাতিতে গন্ধবণিক। ইনি নিজে গান রচনা করতেন এবং গাইতেন। পরে তিনি রামবসুর থেকে গান নিতেন। নিত্যানন্দ বৈরাগীর সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হত। পরবর্তী নিবাস কলকাতা বরানগর।

ভবানীশঙ্কর দাস—'মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা' নামক একখানি সুবৃহৎ কাব্য রচয়িতা। কাব্যটির রচনাকাল ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই কাব্যখানি 'জাগরণের পুঁথি' ও 'চণ্ডীমঙ্গল গীত' নামেও পরিচিত। কবির বর্ণিত আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায় যে তিনি আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের বংশধর ও কুলীন কায়স্থ কুলোদ্ভব। কবির পূর্বপুরুষ নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ চট্টগ্রামের অন্তর্গত সমুদ্র-তীরস্থ দেবগ্রামের নিকটবর্তী বটতলী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তারপর তাঁর বংশধর মধুসূদন বটতলী থেকে চক্রশালার অন্তর্গত ছনহারা গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। এই মধুসূদনই কবির পিতামহ। কবির পিতার নাম শ্রীমন্ত। ছনহারা গ্রামেই ভবানীশঙ্করের জন্ম হয়। এঁর পুত্রের নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। কবির বংশধরগণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কবির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত পুরাণসমূহের বহু কাহিনী তিনি নানা-ভাবে তাঁর কাব্যে সদ্ব্যবহার করেছেন। বিষম সংস্কৃত পদের ব্যবহার এবং তদ্ভব পদের সঙ্গে তৎসম শব্দের সন্ধি ভবানী শঙ্করের রচনা বিকট করে তুলেছে। কাব্যের মধ্যে "ঘোষা" নামে অনেক-গুলি কৃষ্ণলীলাত্মক এবং অন্যবিষয়ক ভক্তিমূলক পদ সন্নিবিষ্ট আছে। এই পদগুলিতে কবির রচনা শক্তির সত্য-কার পরিচয় রয়েছে।

ভবানীশঙ্কর বাঁড়ুজ্জে—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। সম্ভবত ইনি রামায়ণ কাব্যের রচয়িতা। এঁর রচিত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের এবং আরও কোন কোন পালার পুথি পাওয়া যায়। এঁরা পাঁচ ভাই। পিতা রাম বা বিজয়রাম, পিতামহ গোবিন্দ।

ভব্যদত্ত দেব—লৌহশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ 'বৈদ্যপ্রদীপ'।

ভরত মল্লিক—ভরতের রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন হরিহর খাঁর বংশধর ও গৌরাঙ্গ মল্লিক বা গৌরাঙ্গ সেনের পুত্র। ভরত

মল্লিক জাতিতে বৈদ্য এবং মালঞ্চবাসী। এঁর পিতামহ ছিলেন বিনায়ক সেন এবং প্রপিতামহ হরিহর। বর্ধমানের পাটলিপাড়ার কল্যাণ মল্লের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভরত তাঁর গ্রন্থাবলী রচনা করেন। তাঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী বলে অনুমিত।

ভরত মল্লিক রচিত অভিধান-সমূহের নাম: একবর্ণার্থসংগ্রহ, দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ, মুগ্ধবোধিনী (অমর-কোষের টীকা), লিঙ্গাদিসংগ্রহ।

বৈদ্যকুলপঞ্জিকা সম্বন্ধে ভরত মল্লিক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন, যথা—চন্দ্রপ্রভা, রত্নপ্রভা, বৈদ্যকুলতত্ত্ব। ভরত মল্লিক ভরতসেন নামেও পরিচিত।

ভরত মল্লিক রচিত অপর কয়েক-খানি গ্রন্থ: উপসর্গবৃত্তি, গণপাঠ, ঘটকর্পর টীকা, দ্রুতবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য টীকা, সুখলেখনম্‌, সুবোধা প্রভৃতি।

ভাইয়া দেবকীনন্দন—প্রথম জীবনে ছিলেন বামাচারী সাধক। এঁর স্ত্রীর সঙ্গগুণে এবং দেবীব স্বপ্না-দেশে ইনি শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে পরম চৈতন্য-ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। ইনি টাকীর নিকটবর্তী জালালপুর নামক স্থানে অবস্থান করে "কিশোর নগর" নামক পল্লী স্থাপন করেন এবং শ্রীশ্রীনন্দদুলাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর অব-স্থিতিকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী।

ভাগবত আচার্য—'চৈতন্য-ভাগবতে' বর্ণিত আছে যে মহাপ্রভু গৌড়াঞ্চল থেকে দ্বিতীয়বার নীলাচল গমন-পথে বরাহনগরে 'মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে' গিয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভাগবতপাঠে 'অত্যন্ত সুশিক্ষিত' ছিলেন এবং তাঁর ভাগবত-পাঠ শুনে মহাপ্রভু এমন মুগ্ধ হন যে তাঁর পাঠকালে তিনি ভাবাবেশে 'বাহ্য পাশরিয়া' নৃত্য আরম্ভ করেন এবং

"প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য॥"

কবিকর্ণপুর বলেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবতা-চার্য 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

ভানু—গৌড়াধিপ নয়পালের পাত্র নারায়ণের (১০৩৮ খ্রীঃ) ভ্রাতা। ভানু বিচক্ষণ চিকিৎসকও ছিলেন।

ভানুদত্ত—চক্রদত্তের ভ্রাতা। রচিত বৈদ্যকগ্রন্থ 'কুমার ভার্গবীয়'। এঁর জীবিতকাল একাদশ শতাব্দী।

ভান্দসী রায়—গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজ্যের সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি দুর্গের অধ্যক্ষ। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সুপরিচিত।

এঁর 'অন্নদামঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই কাব্য তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ শিবায়ন ও দেবীমঙ্গল, দ্বিতীয়ভাগ কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, তৃতীয়ভাগ মানসিংহ-প্রত্যাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান।

বর্ধমান জেলায় ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রীয় ফুলিয়া-মেল-মুখুটি ব্রাহ্মণ পরিবারে আনুমানিক ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভাবতচন্দ্র বায়গুণাকর জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা "রাজা" নরেন্দ্রনারায়ণ প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। মাতা ভবানী। বৈষয়িক ব্যাপারে নরেন্দ্র-নারায়ণের সঙ্গে বর্ধমানের রাজার বিবাদ হয। তাতে নরেন্দ্রনারায়ণ সর্বস্বান্ত হন। বালক ভারতচন্দ্র নাওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লাভ করে তাজপুর টোলে কিছুকাল সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মণ্ডলঘাট পরগণাব সারদা গ্রামে 'কেশরকুনি' আচার্যদের বাড়ীর একটি বালিকাকে বিবাহ করে বাড়ী ফিরে আসেন। এজন্য পিতা মাতা ও অন্যান্য অগ্রজগণ কর্তৃক ভর্ৎসিত হলে ভারতচন্দ্র গৃহত্যাগ করে হুগলী দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে তিনি ফারসী শিক্ষা করেন। সেইখানেই তাঁর কবি জীবনেরও সূত্রপাত হয়। মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজোপলক্ষে পঞ্চদশ বর্ষীয় ভারতচন্দ্র স্বকৃত 'সত্যপীরের কথা' পাঠ করে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। এই সময় তিনি ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে দুখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা কবেছিলেন। অবশেষে ফারসী ভাষায় বুৎপন্ন লাভ করে কবি বাড়ী ফিরে আসেন এবং পাণ্ডিত্যের জন্য গৃহে সাদরে গৃহীত হন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাগ্যে স্থিতিলাভ ছিল না। বর্ধমান রাজসরকারের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপার মীমাংসার জন্য বাজধানীতে গিয়ে ভাবতচন্দ্র রাজকর্ম-চারীদের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। কিন্তু প্রখব বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতচন্দ্র কৌশলে মুক্তিলাভ করে পুরীতে পলায়ন কবেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পব একদিন এক সন্ন্যাসীদলেব সঙ্গে সন্ন্যাসী-বেশে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। পথে খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্যালিকা-পতির সঙ্গে দেখা হওয়ায তিনি ভারত চন্দ্রকে আটক করেন। কবি তখন বৃন্দাবন না গিয়ে শ্বশুব বাড়ী গিয়ে সেখানে কিছুদিন বাস করলেন। তাবপর ফরাসডাঙায গিয়ে সেখানকার ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহায়তায় তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর সভাকবি নিযুক্ত হন। তখন থেকেই কবির অন্নবস্ত্রের অভাব বিদূরিত হয়। সেইখানেই রাজ-পৃষ্ঠ-

পোষকতায় কবি প্রথমে 'রসমঞ্জরী' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তাছাড়া, কবি অসম্পূর্ণ 'চণ্ডীনাটক' এবং বহু সংখ্যক হিন্দী-বাংলা-সংস্কৃত খণ্ড কবিতা রচনা করেছিলেন। ৪৮ বছর বয়সে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য শব্দ ও ছন্দের ঐশ্চর্যে সুসমৃদ্ধ। জনৈক সমালোচক তাই তাঁর কাব্যগুলিকে 'ভাষার তাজমহল' আখ্যা দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রই প্রথম গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট সাহিত্যের উপর নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ বুলিয়েছিলেন। এইজন্যই পণ্ডিতমহলে তাঁকে পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলা হয়ে থাকে। সে-যুগে ভারতচন্দ্র অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন। কাব্যের আদর্শে প্রণয়-কাহিনীমূলক আখ্যান কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরাদমে চলেছিল। শতাব্দীকালেরও উপর বাংলার প্রায় সব কবি এবং মধ্যভাগের অনেক কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। এমনকি মাইকেল মধুসূদন দত্তও নয়।

ভাস্কর পণ্ডিত—মারাঠা বীর—মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলার মন্ত্রী। ভাস্করের বাংলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন ইতিহাসে "বর্গী হাঙ্গামা" নামে প্রসিদ্ধ। ভাস্কর পণ্ডিত ভাগীরথীর পশ্চিমে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করেছিলেন। একবার নবাব আলীবর্দীকে পরাজিত করে জগৎশেঠের গৃহ লুণ্ঠন করে আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর আক্রমণ করতে গিয়ে বাধা পান এবং রাজা গোপাল সিংহের নিকট পরাজিত হন। এই দুর্ধর্ষ মারাঠা বীর আলীবর্দী কর্তৃক কৌশলে নিহত হয়েছিলেন।

ভাস্করবর্মা—ভগদত্তবংশীয় রাজা কুমার ভাস্করবর্মার নাম কামরূপের ইতিহাসে সমধিক বিখ্যাত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ভাস্করবর্মার পিতা সুস্থিতবর্মা গুপ্তবংশীয় রাজা দামোদরগুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্তের হস্তে লৌহিত্যতীরে পরাজিত হয়েছিলেন। ভাস্করবর্মার সময়ে পশ্চিম কামরূপ, সমগ্র আসাম এবং বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি সমসাময়িক কর্ণসুবর্ণ রাজ্যও জয় করেছিলেন। ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে তাঁর বংশের ঊর্ধ্বতন একাদশ রাজার নাম আছে, তাঁদের মধ্যে পুষ্যবর্মার নাম সর্বপ্রথমে উল্লিখিত হয়েছে। চীনদেশীয় ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ ভাস্করবর্মার অনুরোধে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপে এসেছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্করবর্মা ছিলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (বর্তমান আসাম বা কামরূপ) প্রবল পরাক্রম-

শালী রাজা। নিধনপুরে ভাস্করবর্মার একটি তা ম্র শা স ন পাওয়া গিয়েছে। কনোজাধিপ হর্ষের সঙ্গে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের যুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি কনোজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। ইনি পশ্চিম থেকে বহু ব্রাহ্মণ আনয়ন করে এঁর রাজ্যে হিন্দু ধর্মের বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিলেন। ইনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত সামন্তচক্রের বল খর্ব করে সার্বভৌম নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

তাম্রশাসনে লিখিত আছে, ভাস্করবর্মা কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত নরক রাজার বংশধর। ভাস্কর ছিলেন শ্যামাদেবীর গর্ভজাত।

ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ—পলিতা-নহাটার বৈদিক ভট্টাচার্যগণের পূর্বপুরুষ। ইনি ছিলেন রাজা সীতারামের সভাপণ্ডিত ও কবি। এঁর স্বহস্ত লিখিত কবিতা হতে জানা যায়, ইনি সীতারামকে ইন্দ্রতুল্য রাজেন্দ্র বলে বর্ণনা করেছেন:

"ভাস্করে উদয় ভাস, উদয় নারায়ণ দাস,
তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম।
গুণেন্দ্র দেবেন্দ্র তথি, ভু-অধিপতি
ভূষণে-ভূষিত গুণগ্রাম॥"

ভাস্করানন্দের অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

ভ্যান্সিটার্ট, হেনরী—জাতিতে ইংরেজ হেনরী ভ্যান্সিটার্ট হলওয়েলের পর লর্ড ক্লাইবের সুপারিশে কলকাতার গভর্নর হন। ইনি প্রথমে কলকাতা কাউন্সিলের একজন জুনিয়ার মেম্বর ছিলেন। ইনিই মীরজাফরকে গদিচ্যুত করে মীরকাশিমকে সিংহাসন প্রদান ক রে ছি লে ন। এঁরই পরিচালনায় কোম্পানীর লবণ-বিভাগের আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির ইনি একজন উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। ইনি পারসী থেকে আলমগীর বাদসার রাজত্বের প্রথম দশ বছরের ঘটনার এক ইংরেজী রচনা করেছি লে ন। বিলাতে গিয়ে ইনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর হন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এদেশীয় ও ইংরেজ উভয় সম্প্রদায়ের নিকট ইনি বিশেষ সম্মানিত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ভীম—কৈ ব র্ত অধিনায়ক ও বরেন্দ্রভূমির রাজা দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রুদোকের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ভীম রাজা হন এবং প্রবল পরাক্রমে বরেন্দ্রভূমি শাসন করেন। এঁর রাজধানী ছিল ডমর-নগর। রামপাল বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হলে ভীম রামপালের সামন্তচক্রের গতিরোধ করার জন্য বিশাল মৃৎপ্রাকার নির্মাণ করেছিলেন। উহা "ভীমের জাঙ্গাল" নামে প্রসিদ্ধ। উত্তর বঙ্গের বহু স্থানে এখনো ঐ মৃৎ প্রাকারের অবশেষ দৃষ্ট হয়। রামপাল সমস্ত সামন্তরাজকে একত্রিত করে

ভীমকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ভীম বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করলেও অবশেষে পরাজিত ও নিহত হন।

ভীম স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাদর করতেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্যশালী ছিলেন এবং মুক্তহস্তে দান করতেন। শত্রুপক্ষের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর ভাষায়, "ভীম লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের আবাস। তাঁহাকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ লাভ করিয়াছিলেন। সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি।

ভীম (দ্বিজ)—একজন কবি ও পদকর্তা। 'দ্বিজ ভীম' ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এঁর আব কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।

ভুবন দাস—'গৌরপদতরঙ্গিণী'র সংকলক জগবন্ধু ভদ্রের মতে ভুবন দাস ছিলেন রাধামোহন ঠাকুরের ভ্রাতা। জগদানন্দ ছিলেন এঁর পিতা। ইনি নাকি পদকর্তাও ছিলেন। এঁর একটিমাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী।

ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী—কলকাতার কালীঘাটের কালীর প্রথম সেবক। ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় ভুবনেশ্বরকে কালীর প্রথম ইষ্টক নির্মিত মন্দির প্রস্তুত করে দেন। কারণ, কালীঘাট তাঁদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তারপর কালীর সেবার জন্য রাজা বসন্ত রায় কালীঘাট গ্রাম গুরু ভুবনেশ্বরকে দান করেন। কালীর বর্তমান হালদার মহাশয়েরা ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র বংশসম্ভূত।

ভুবনেশ্বর বাচস্পতি—কাছাড়ের একজন কবি। রাজা সুরদর্পের রাজত্বকালে ভুবনেশ্বর "শ্রীনারদীয় কথামৃত" বাংলা পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও এঁর বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর গ্রন্থ রচনাকাল ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

ভুসুকু—ভুসুকু নামটি ছদ্মনাম। এঁর আসল নাম ছিল শান্তি। কিছুকাল ইনি মগধে 'রাউতেব' (সেনাপতি) বৃত্তি গ্রহণ করে শেষ জীবনে নালন্দায় বৌদ্ধ-ভিক্ষু হযে বাস করেন। ভোজনে, শয়নে এবং কুটীতে শান্তভাবে থাকতেন বলে ইনি 'ভুসুকু' নামে অভিহিত হন, এবং এঁর পুবা নাম হয় 'রাউত ভুসুকু'। এই শান্তিদেব ভুসুক ছিলেন মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁর রচিত গ্রন্থ 'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও 'বোধিচর্যাবতার'। ইনি সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। চযা-রচয়িতা ভুসুকু ভিন্ন ব্যক্তি বলে অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধতান্ত্রিক ভুসুকু 'চতুরাভরণ' নামক একখানি বজ্রযান গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থটি লিপিকৃত হয় ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

চর্যার একটি পদ থেকে জানা যায় ভুসুকু বাঙালী :

"আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥"

ভুসুকুপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য। ভুসুকুর ভণিতায় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এ আটটি চর্যাপদ পাওয়া যায়। মনে হয় এগুলি সবই একই লোকের লেখা নয়। এপর্যন্ত দু'জন ভুসুকুর সন্ধান পাওয়া গেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন ইনি ৬৪৮ থেকে ৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন ইনি দেবপালের (৮০৯—৮৪৯ খ্রী:) সমসাময়িক। এদিকে তারানাথ অতীশের পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে এক ভুসুকুর উল্লেখ করেছেন।

ভুসুকুর নামাঙ্কিত পদের মধ্যে দুই ভুসুকুর রচনাই মিশে আছে বলে মনে হয়। প্রথম ভুসুকু নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের এবং দ্বিতীয় ভুসুকু একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লোক বলে আপাততঃ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

ভূগর্ভ—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গৌরাঙ্গদেব লোকনাথ চক্রবর্তীকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করলে ভূগর্ভও গৌরাঙ্গ ও গদাধরের অনুমতি নিয়ে লোকনাথের সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। ইনি সেখানে লোকনাথের সঙ্গে সাধন-ভজন করেন এবং বৃন্দাবনবাসীদিগের নিকট এঁরা পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন। এইভাবে লোকনাথ ও ভূগর্ভের দ্বারা বৃন্দাবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজে ভূগর্ভ বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। ইনি রূপ-গোস্বামীর সঙ্গী এবং শ্রীজীবের প্রণম্য ছিলেন। শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৃন্দাবনে পৌঁছলে ভূগর্ভ এঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রামদাস নামক এক বৈষ্ণব এঁর শিষ্য ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

ভূপতি কণ্ঠহার—একজন পদকর্তা। কবি ভূপতি কণ্ঠহার কোন্ সময় কোন্ অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিছুই জানা যায় না। এঁর একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্‌ধৃত হয়েছে।

ভূশূর—গৌড়েশ্বর বিখ্যাত আদিশূরের পুত্র। এঁর রাজত্বকাল ৭৪৫—৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর সময়ই পালরাজদের সঙ্গে শূররাজগণের বৈরিতার সূত্রপাত হয়। ইনি পিতৃরাজ্য সম্প্রসারণ করেন। পুণ্ড্রবর্ধন রাজ জয়ন্তশূর মারা গেলে ভূশূর তাঁর রাজ্য অধিকার করে .নন। তারপর থেকে পুণ্ড্রবর্ধন বরেন্দ্র নামে পরিচিত হয়। পিতা আদিশূরের মতো ভূশূরের প্রতিভা ছিল না। পালরাজ গোপালের পুত্র ধর্মপাল তাঁকে বরেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করে রাজ্যটি অধিকার করে নেন।

ভূষণ দ্বিজ—কোচবিহারের কামতাপুরের মহারাজা নরনারায়ণের

রাজসভা কবি। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

ভৃগু নন্দী—পাবনা জেলার পয়োদার জমিদার বংশের আদি পুরুষ। কান্যকুব্জ প্রদেশান্তর্গত রামায়ণ-বর্ণিত নন্দীগ্রাম-নিবাসী চিত্রগুপ্তবংশীয় ছিলেন এই ভৃগু নন্দী। রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে ইনি কর্মোপলক্ষে বঙ্গদেশে এসে উক্ত রাজার অন্যতম মন্ত্রী হন। পরে কোন কারণে ঐ কার্য ত্যাগ করে প্রথমতঃ শৈলকুপা, পরে পাবনা জেলার বল্লা বা পোতাজিয়ায় বাস করেন।

ভৃগুরাম দাস, শুভঙ্কর—শুভঙ্করের আর্যার সঙ্গে বাঙালীমাত্রেই সুপরিচিত। এই আর্যা রচয়িতার নাম ভৃগুরাম দাস। "শুভঙ্কর' এঁর নাম নয়—উপাধি। ইনি আপন বিজ্ঞতা-বলে বিষ্ণুপুরের রাজসরকার হতে এই উপাধি লাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি বিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহের সমসাময়িক ছিলেন। জাতিতে বৈদ্য। শুভঙ্কর দ্র॰।

ভেরিলিষ্ট—হ্যারি ভেরিলিষ্ট ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। ইনি ছিলেন একজন সিভিল সার্ভেণ্ট। লর্ড ক্লাইবের পর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার গভর্নর হন এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

ভৈরবচন্দ্র দাস—এঁর রচিত 'ঊষারসার্ণব' বৃহৎ কাব্য। কবির নিবাস যশোরে পলুয়া গ্রামে। ইনি ছিলেন জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। পিতার নাম দেবীপ্রসাদ, পিতামহ রামসন্তোষ, অগ্রজ শম্ভুচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভৈরবচন্দ্র তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

ভৈরবচন্দ্র শর্মা—শ্রীহট্টবাসী। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন।

ভোজ গৌড়—জাতিতে কায়স্থ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইনি পুণ্ড্র অধিকার করে সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে প্রভাব বিস্তার করেন। নন্দভোজ পর্যন্ত এই বংশের নয়জন রাজার নাম আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'-তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ভোজবর্মা—পূর্ববঙ্গের বর্ম রাজবংশের শেষ রাজা। এঁর পিতার নাম সামল বর্মা। পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজত্ব করেন সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। বেলাব তাম্র-শাসনে ভোজবর্মা পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি একজন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।

ভোলা ময়রা—বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। এঁর পুরো নাম ভোলানাথ মোদক। এঁর আদি নিবাস হুগলির গুপ্তিপাড়া। এঁর পিতার নাম রামগোপাল মোদক। কলকাতার বাগবাজারে রামগোপালের একখানি খাবারের দোকান ছিল। সেইস্থানে

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত কবি-ওয়ালা হরু ঠাকুরের চেলা। মহারাজ নবকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন ভোলা ময়রা। ইনি মহারাজকে স্বীয় অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে এবং কবিত্বগুণে প্রীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কবিগান করার উদ্দেশ্যে ইনি বাংলার প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন। বাগবাজারেব রস-গোল্লার আবিষ্কারক নবীনচন্দ্র দাস ছিলেন ভোলা ময়রার নাৎজামাই। বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন—"বাংলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম-প্যাচার লেখকের ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

ভোলা সা—বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলিম কবিদের অন্যতম। ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার বালাগঞ্জ থানার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত 'খবর নিশান' নামক এক গান ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ম

মংখদাস—বাংলার একজন খ্যাতনামা শিল্পী। পালরাজ নারায়ণ পালদেবের রাজত্বকালে ইনি অবস্থান করছিলেন। নারায়ণ পালদেব কর্তৃক প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন মংখদাস কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়েছিল। ইনি ছিলেন সমতটবাসী শুভদাসের পুত্র।

মকদুম শাহজালাল তাব্রেজী—পাণ্ডুয়ার বড় দরগার (বাইশ হাজারীর) পীর। ইনি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ছিলেন পাণ্ডুয়ার পঞ্চপীরের অন্যতম।

মুঘিসউদ্দিন তুঘরিল খান—তুঘরিল খান প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস। বহু প্রভুর সেবা করে তিনি উলুঘ খান বলবনের প্রসাদ লাভ করেন। বলবন কর্তৃক তিনি প্রথমে বাংলার সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কারণ তুঘরিল ছিলেন অত্যন্ত প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান। কিন্তু তিনি আস্তে আস্তে বঙ্গদেশে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এবং বঙ্গের শাসনকর্তা আমীন খানকে পরাজিত করে নিজেই বঙ্গের শাসন-কর্তা হয়ে বসেন। পরপর বঙ্গের নানা অঞ্চল অধিকার করে ত্রিপুরা অভিযান করেন। দিল্লীর সুলতান বলবন পীড়িত এবং অসুস্থ ছিলেন। তিনি মারা গেছেন এই মিথ্যা সংবাদ শুনে তুঘরিল নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ বলবন তখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। প্রথমে কয়েকবার বলবনের পরাজয় হয়।

পঞ্চমবারে তিনি তুঘরিলখানকে পরাজিত ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। তুঘরিল ১২৬৮-১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন।

তুঘরিল সুশাসক ছিলেন। রাজ্য শাসনে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সমবেত সহায়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর সুশাসনে দিল্লী অঞ্চলের বহু মুসলমান বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তুঘরিল তাঁর দানশীলতার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তুঘরিলের রাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতা যথেষ্ট ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে তুঘরিল ত্রিপুরা অভিযান করে ত্রিপুররাজকে পরাজিত করার পর সেইরাজ্য রাজভ্রাতা রতন ফাকে প্রদান করেন এবং তাঁকে "মাণিক্য" উপাধি প্রদান করে প্রচুর ধনরত্ন ও অনেক হাতী প্রাপ্ত হন। সেই থেকেই ত্রিপুরার রাজারা আজ অবধি মাণিক্য উপাধি ধারণ করে আসছেন।

মঙ্গল ওঝা—বিখ্যাত পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদ্ উদয়নাচার্যের সমসাময়িক। ইনিও ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদ্। মঙ্গল ওঝা ছিলেন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। এঁর অবস্থিতিকাল চতুর্দশ শতাব্দী।

মঙ্গল ঠাকুর—এঁর নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কীরিটকোনায়। ইনি ছিলেন বৈষ্ণব এবং বিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাসের সমসাময়িক। মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র—রাধিকাপ্রসাদ, গোপীরমণ এবং শ্যামকিশোর। সম্ভবত ইনি খেতুরির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

মজনুন শাহ—মদরি সম্প্রদায়ের ফকির এবং ডাকাত দলের সর্দার। বগুড়া জেলার ১২ মাইল দক্ষিণে গোয়াইল নামক স্থানের নিকট মদরগঞ্জে এবং মহাস্থানে তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল। দিনাজপুর ও রংপুরের দক্ষিণে এবং বগুড়ার পশ্চিমে ইনি এঁর দল নিয়ে লুটতরাজ করতেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এঁর উপদ্রব চলে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। বিখ্যাত ভবানী পাঠক ছিলেন মজনুনের একজন সহযোগী। মজনুন আলোয়ার রাজ্যের লোক।

মণিকণ্ঠ মিশ্র—মিথিলা নিবাসী ন্যায়াচার্য ও 'তীরভুক্তীয় রাজ ধর্মাধিকারী'। এঁর রচিত গ্রন্থ,—ন্যায়রত্ন' ও 'নয়চিন্তামণি'। এঁর অভ্যুদয়কাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী।

মণিরাম, দ্বিজ—একজন কবি। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। এঁর পিতার নাম ছিল দ্বিজ হরিহর। দ্বিজ মণিরাম সম্ভবতঃ শ্রীহট্ট অঞ্চলের অধিবাসী। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'বৈদ্যনাথমঙ্গল'। ইহা শিবমঙ্গল কাব্য। ইনি এঁর কাব্য মধ্যে

অধিকাংশস্থলে 'সুন্দর রায়', 'সুন্দর দ্বিজ' ও একবার 'সুন্দরাম' ভণিতা ব্যবহার করেছেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের বৈদ্যনাথ শিবের কাহিনাই এঁর কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

মণ্টেগু, স্যামুয়েল—১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার শেরিফ এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মেয়র হয়েছিলেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথ—মৎস্যেন্দ্রনাথের নাম মচ্ছেন্দ্র, মচ্ছেন্দ ও মচ্ছিন্দ্র প্রভৃতি নানারূপেই পাওয়া যায়। মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আদিভাগে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীর অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে (আধুনিক সন্দীপ) বাস করতেন। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে মৎস্যেন্দ্রনাথ কৌল সম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। তিনি 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। বৌদ্ধমতে মৎস্যেন্দ্র অবলোকিতেশ্বরের অবতার। কেউ কেউ মীননাথকে মৎস্যেন্দ্রের পুত্র বলে মনে করেন, আবার কারও মতে মৎস্যেন্দ্র ও মীননাথ অভিন্ন। ইনি ছিলেন সম্ভবতঃ কৈবর্ত্ত।

স্কন্দপুরাণে মৎস্যেন্দ্রের অশুভলগ্নে জন্ম ফলে পিতামাতা কর্তৃক সমুদ্রে নিক্ষেপ কাহিনী, মৎস্যোদর থেকে শিবের যোগ ব্যাখ্যা শ্রবণ ও শিব কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্তির কাহিনী আছে। বিখ্যাত গোরক্ষনাথ ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালীদের রক্ষকস্বরূপ দেবতা ও রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা।

মতিলাল শীল—কলকাতার সুবর্ণ বণিকজাত খ্যাতনামা দানশীল ধনী। বোতল ও কর্কের (ছিপির) ব্যবসা করে ধনী হন। ১৭৯১ সালে কলকাতার কলুটোলায় এঁর জন্ম হয়। ইনি কলকাতায় একটি অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় (সীল'স ফ্রি কলেজ) স্থাপন করেন। ইনি জীবনের অধিকাংশ সময় অন্নদান বস্ত্রদান ও অতিথিশালা নির্মাণ প্রভৃতি সৎকর্মে অতিবাহিত করতেন। এঁর পিতা চৈতন্যচরণ শীল ছিলেন সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী। ১৮৫৪ সালে মতিলাল দেহত্যাগ করেন।

মর্তুজা (সৈয়দ)—বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম। জনশ্রুতি আছে সৈয়দ মর্তুজার পিতা হাসান কাদেরী সাহেব বেরেলী থেকে বাংলা দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের নিকটবর্তী বালিয়াঘাটা নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ এঁরই রচিত একটি পদ 'পদকল্পতরুতে' উদ্ধৃত হয়েছে। 'সৈয়দ মর্তুজা' ভণিতাযুক্ত এ-যাবৎ ২৮টি রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ পাওয়া গেছে।

সম্ভবতঃ চট্টগ্রামেও আর এক সৈয়দ মর্তুজা ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে এঁর রচিত অনেকগুলি পদ পাওয়া গেছে। এঁর বিশেষ কোন পরিচয়

পাওয়া যায় না। খালি একস্থলে কবি নিজেকে 'জনমের ফকির' ও অন্যত্র 'গাজী' বলে অভিহিত করেছেন।

মথুরাদাস—একজন কবি ও পদকর্তা। 'মথুরাদাস' ভণিতায় একটি-মাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি বাংলা পদ হলেও ওতে 'তৎসম' অর্থাৎ সংস্কৃতসম শব্দের এতই প্রাচুর্য যে পদকর্তা সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়। এঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ—নবদ্বীপবাসী মথুরানাথ তর্কবাগীশ নব্য-ন্যায়ে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ তাঁর আবির্ভাবকাল বলে অনুমান করা হয়। 'সিদ্ধান্ত রহস্য' মথুরানাথের বিরাট মৌলিক গ্রন্থ। অন্যান্য সব টীকা গ্রন্থ। শিরোমণির কতকগুলি গ্রন্থের উপর মথুরানাথের লিখিত টীকা, যেমন, অনুমানদীধিতি-মাথুরী, গুণদীধিতিমাথুরী, লীলাবতী-দীধিতিমাথুরী ইত্যাদি। উদয়নাচার্যের মূলগ্রন্থের উপর মথুরানাথ লিখিত টীকাগ্রন্থ: দ্রব্যকিরণাবলীটীকা, গুণ-কিরণাবলীটীকা ইত্যাদি। এসব ছাড়া, তত্ত্বচিন্তামণি রহস্য, দ্রব্যপ্রকাশটীকা, লীলাবতীপ্রকাশটীকা, গৌতমসূত্র-মাথুরী ও সুপ্‌শক্তিবাদ প্রভৃতি আরও বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

মথুরানাথের পিতার নাম শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। তাঁর এক ভ্রাতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্তী। মথুরানাথ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। যে সকল মহাপণ্ডিত গ্রন্থরচনা দ্বারা নবদ্বীপ মহাবিদ্যালয়ের ভারত বিখ্যাত খ্যাতি বর্ধন করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তাঁর টীকা-গ্রন্থ—মূল চিন্তামণির উপর 'মাথুরী'—ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করেছিল এবং ইহাই তাঁকে এ-যাবৎ চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। এই গ্রন্থে মথুরানাথের অপূর্ব প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান। এই গ্রন্থখানি রঘুনাথ শিরোমণি রচিত তত্ত্বচিন্তামণি ও তত্ত্ব-চিন্তামণিদীধিতির টীকা হলেও এতে মথুরানাথ যে বিচার ও তর্কশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অধ্যয়ন করলে বিস্মিত হতে হয়। তাছাড়া, মথুরানাথ আরও বহু নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। মথুরানাথ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য এবং বাসুদেব সার্বভৌমের প্রশিষ্য।

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার—একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। এঁর পিতার নাম শিবরাম চক্রবর্তী ও মাতার নাম পার্বতী। মথুরেশকৃত 'অমরকোষে'র টীকার নাম 'সারসুন্দরী' (১৬৬৬)। এতে শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তির ব্যাপারে মথুরেশ 'সুপদ্মব্যাকরণে'র অনুসরণ করেছেন। 'শব্দরত্নাবলী' নামক

একখানি অভিধানও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর অপর গ্রন্থদ্বয়ঃ 'নানার্থশব্দ' ও 'শ্যামাকল্পলতা'। মথুরেশের জীবনকাল সপ্তদশ শতাব্দী। মথুরেশের পিতামহ চন্দ্রবন্দ্য, প্রপিতামহ মাধব এবং অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ সর্বানন্দ।

মদন—গৌড়ের অধিবাসী। পরে মালবদেশে গিয়ে বাসস্থান স্থাপন করেন। অসামান্য কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে ইনি মালবের পণ্ডিত সমাজে "বাল-সরস্বতী" উপাধি লাভ করেন। মালবরাজ অর্জুন বর্মণ এঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে এঁকে গুরুপদে বরণ করেন। এঁর রচিত 'পারিজাত মঞ্জরী', 'বিজয়শ্রী' নামক নাটক গুণিসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। গুজরাটের রাজা জয়সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন বর্মার জয়লাভের স্মারক গ্রন্থরূপে ইহা রচিত। এঁর অবস্থিতিকাল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী।

মদনগোপাল রায়—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামনিবাসী বৈদ্যকুল জাত। পিতার নাম শ্যাম রায় চৌধুরী, বৃদ্ধ প্রপিতামহ চক্রপাণি চৌধুরী। ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। মদনগোপাল গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

মদন দত্ত—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। মাণিক দত্ত ও দ্বিজ জনার্দনের পর এঁকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তৃতীয় কবি বলা যায়। এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

মদন দত্ত—কলকাতার হাটখোলার দত্ত বংশীয়। রামদুলাল সরকার প্রথম জীবনে এঁর আশ্রিত ছিলেন ও এঁর বদান্যতায় সৌভাগ্যের তুঙ্গে আরোহণ করেন। জন্ম অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে। রামদুলাল সরকার দ্রঃ।

মদন পাল—রাম পালের কনিষ্ঠ পুত্র। তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি আনুমানিক ১১৪০—১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় আভ্যন্তরিক বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে পালরাজ্য দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। মদন পাল চারিদিকে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়েও পালরাজ্য রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। মদন পালের রাজত্বের বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁর মৃত্যুকালে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে তাঁর কোন অধিকার ছিল না। উত্তর বঙ্গেরও সমগ্র বা কিয়দংশ তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছিল। সুতরাং পালরাজ্য এই সময় মগধের মধ্য ও পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ ছিল।

মদন মল্ল—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি। মোগলসেনার সঙ্গে

যুদ্ধে ইনি প্রতাপাদিত্যের পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

মধুকণ্ঠ, দ্বিজ—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি বলে অনুমিত হয়। কবি বিরচিত রামায়ণের কয়েকটি খণ্ডিত অংশমাত্র পাওয়া গেছে। এই কবির রামায়ণে ব্রাহ্মণ-শাসিত সংস্কার যুগের চিত্র বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত কালকেতুর উপাখ্যানের (চণ্ডীমঙ্গল) ছায়া যেন দ্বিজ মধুকণ্ঠের রামায়ণে পড়েছে।

মধু পণ্ডিত—বৃন্দাবনের গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে পরমানন্দ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মধু পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বৃন্দাবনে উল্লেখযোগ্য বিগ্রহ গোপীনাথের প্রতিষ্ঠায় ইনি ছিলেন পরমানন্দের প্রধান সহায়ক। বৃন্দাবনে এঁর একটা বিশেষ স্থান ছিল। 'সাধন-দীপিকা' ও 'ভক্তমাল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে যমুনার উপকূলে বংশীবট-তটে মধু পণ্ডিত কর্তৃক গোপীনাথ প্রকটিত হন। এই প্রকটের পরেই মধু পণ্ডিত, গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা-অধিকারী হয়ে বাস করছিলেন। মধু পরমানন্দ ভট্টাচার্যের বিশেষ স্নেহ-ভাজন ছিলেন। মধুর এক সতীর্থের নাম ভবানন্দ। মধু পণ্ডিত ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

মধুমথনদেব—লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের শেষদিকে পূর্ববঙ্গে মেঘনা নদীর পূর্বতীরে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধুমথনদেব ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী। এঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

মধুরায় বা মুকুট রায়—বাংলার বারভুঞার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঞা কেদার রায়ের সেনাপতি। মোগলদের সঙ্গে কেদার রায়ের যে যুদ্ধ হয় তাতে মধুরায় অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে-ছিলেন। ফলে কেদার রায়ের সৈন্য-বাহিনীর কাছে মোগলদের পরাজয় ঘটেছিল। মধু রায় স্বকীয় বীরত্বের জন্য মুকুট রায় নামে অভিহিত হতেন। সেকালে এইরূপ মুকুটরায় উপাধি বিশেষ গৌরবব্যঞ্জক ছিল। বিক্রমপুরে আজও মধুমুকুট রায়ের প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। মুকুটরায় যেখানে বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন, তা এখনো মুকুটপুর নামে অভিহিত। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

মধু শীল—জাতিতে নরসুন্দর। কারুর কারুর মতে ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় ক্ষৌরকার্য করেছিলেন।

মধু সেন—বাংলার কোন এক অঞ্চলের বৌদ্ধ রাজা। ইনি লক্ষ্মণসেনের বংশধর কিনা জানা যায় না। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ্যের অবস্থিতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

তিনি 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'পঞ্চরক্ষা' নামক একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথি লিখিত হয়েছিল।

মধুসূদন—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। এঁর রচিত গ্রন্থ জীমূতবাহনের ব্রতকথা বা জিতাষ্টমীর পাঁচালীর কবি বলেছেন যে বিস্তারিত ব্রতকথা রচনা করবার জন্য জীমূতবাহন এঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। তবে প্রত্যক্ষ অনুরোধ করেছিলেন গোপাল মৈত্র। মধুসূদন জাতিতে ছিলেন কায়স্থ, নিবাস বিষ্ণুপুর। শিক্ষাগুরু মনসারাম।

মধুসূদন চক্রবর্তী—দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যাসুন্দর-কালিকা মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কোন কোন পুঁথিতে মধুসূদন চক্রবর্তী, মধুসূদন কবীন্দ্র, কবিচন্দ্র ইত্যাদি ভণিতাও পাওয়া যায়।

মধুসূদন চৌধুরী—পূর্ববঙ্গের চন্দ্রদ্বীপের দনুজ রায়ের বংশধর। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জমিদারী উপলক্ষে সন্দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই মধুসূদন চৌধুরীই সন্দ্বীপের প্রথম উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ঔপনিবেশিক। ইনিই পরে বহু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ আনিয়ে সন্দ্বীপে বসবাস করিয়েছিলেন।

মধুসূদন ঠকুর—গোবিন্দ ঠকুরের সপ্তম পুত্র এবং দেবনাথের সহোদর। এঁর রচিত 'আলোক-কণ্টকোদ্ধার' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এঁর অপর গ্রন্থ "মঙ্গলবাদ"। উল্লেখযোগ্য যে মিথিলায় মধুসূদনই প্রথম শিরোমণির বচন উদ্ধৃত করেছিলেন। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

মধুসূদন দীক্ষিত—এঁর পিতার নাম মহেশ্বর দীক্ষিত। ইনি ছিলেন 'স্মৃতিরত্নাবলী' গ্রন্থ-প্রণেতা।

মধুসূদন নাপিত—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলে অনুমিত হয়। এঁর জন্ম হয় নরসুন্দরকুলে। ইনি মহাভারতের অন্তর্গত "নলদময়ন্তী" উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। কবি মধুসূদনের রচনা মার্জিত, সরল এবং সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচায়ক। কাব্যে কবির আত্মপরিচয় এইরূপ :

"ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব।
যাহার কবিত্ব কীর্তি লোকেতে সম্ভব ॥
তাহার তনয় বাণীনাথ মহাশয়।
পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্তির বিজয় ॥
তাহার তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন।
শুনিয়া প্রভুর কীর্তি উল্লসিত মন ॥'

এই পরিচয় থেকে বুঝা যায় কবির পিতামহও একজন কবি ছিলেন।

মধুসূদন সরস্বতী—পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম প্রমোদ পুরন্দর আচার্য। মধুসূদন প্রথম থেকেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। বিশ্বেশ্বর সরস্বতী ছিলেন তাঁর গুরু। 'মধুসূদন' তাঁর সন্ন্যাসাশ্রমে গুরুদত্ত নাম। তাঁর

পূর্ব নাম ছিল কমলজনয়ন। মধুসূদন সরস্বতী নবদ্বীপে হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র গদাধর চক্রবর্তীর সতীর্থ এবং পুরুষোত্তম সরস্বতীর অধ্যাপক ছিলেন।

মধুসূদনের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বলে অনুমিত হয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করে মধুসূদন কাশীতে বসবাস করেন। এখানে 'রামচরিতমানস' রচয়িতা তুলসীদাসের সঙ্গে তাঁর সখ্য স্থাপিত হয়। কথিত আছে, মধুসূদন সম্রাট আক্‌বরের সভায় বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। মধুসূদন ছিলেন প্রধানতঃ দার্শনিক। তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থগুলি অধিকাংশই দর্শন বিষয়ক। তাঁর দর্শন গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' সর্বপ্রধান। বেদান্তকল্পলতিকা, অদ্বৈতমঞ্জরী, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, আনন্দমন্দাকিনী প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য দর্শন-গ্রন্থ। তিনি অনেকগুলি দর্শনশাস্ত্রের টীকাও রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, ভক্তিসামান্য-নিরূপণ, ভগবদ্ভক্তিরসায়ন, বেদস্তুতিটীকা, হরিলীলাব্যাখ্যা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করেন। মধুসূদনের গীতাভাষ্য বাঙালীর গৌরবের বস্তু। মধুসূদনের গভীর দার্শনিক মতবাদ পরিশেষে ভক্তিবাদের নিকট নতিস্বীকার করেছিল।

মন্‌সন্‌—কর্নেল জর্জ মন্‌সন্‌ ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দক্ষিণ ভারতে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য হন। ইনি ফ্রান্সিস্‌ ফিলিপ্‌ ও ক্লেভারিং-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে অবিচলিতভাবে হেষ্টিংসের কাজের বিরোধিতা করতেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হুগলীতে মারা যান।

মনোহর—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি। রচিত কাব্য 'পঞ্চানন-মঙ্গল' বা 'পঞ্চাননের ব্রতকথা'। নিবাস ছিল বর্ধমান শহরের পশ্চিম প্রান্তে গোদা গ্রামে। স্বপ্নাদেশে ব্রতকথাটি লেখা হয়েছিল।

মনোহর কর্মকার—হুগলী জেলার ত্রিবেণী-নিবাসী কামার। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। পঞ্চানন কর্মকার যখন শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) মুদ্রাক্ষর নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তখন যুবক মনোহর ছিলেন তাঁর সহকারী। পরে তিনি পঞ্চাননের জামাতা হয়েছিলেন। মনোহর দীর্ঘকাল জীবিত থেকে (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ভারতবর্ষের প্রায় পনেরটি প্রাদেশিক ভাষার এবং চীনা ভাষার হরফ তৈরী করে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রও এই কাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

মনোহর দাস—জনৈক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। পদকর্তা জ্ঞানদাস এঁর

বন্ধু ছিলেন। মনোহর "নিত্যানন্দ পরিবার" ভুক্ত প্রাচীন ভক্ত।

মনোহর দাস—পনের হাজার পদবিশিষ্ট গীতামৃত সমুদ্র রচনা করেছিলেন। ইনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। এঁর আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

মনোহর দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস চট্টরাজের পুত্র এবং শ্রীনিবাসের অপর এক শিষ্য রামশরণ চক্রবর্তীর শিষ্য। মনোহর দাস গুরুদত্ত নাম। মনোহর কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রামে থাকতেন। পরে গুরুর আদেশে ব্রজবাস করেন। মনোহর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'অনুরাগবল্লী'। গ্রন্থটির বিষয়ও প্রেমবিলাস-প্রেমামৃত-কর্ণানন্দের অনুরূপ। এটি ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে রচিত হয়। মনোহর কিছু কিছু পদও রচনা করেছিলেন। 'অনুরাগবল্লী' বাংলা পয়ার ছন্দে রচিত।

মনোহর দাস—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুচর রামানন্দ রায়ের অনুজ বাণীনাথ পট্টনায়কের প্রপৌত্র। মনোহর দাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা 'দিনমণিচন্দ্রোদয়'। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় বাণীনাথের পৌত্র, কটকবাসী গোবিন্দানন্দ, নিত্যানন্দ ও মনোহর এই দুই পুত্র রেখে পরলোক গমন করলে তাঁদের সম্পত্তি উড়িয়া রাজা আত্মসাৎ করেন। তখন মনোহর বালক মাত্র। অগ্রজের সঙ্গে বধমানে চলে এসে বসবাস করেন। একদিন তিনি পথে গৌরহরি বাউলকে দেখে আকৃষ্ট হন। এবং তাঁর সঙ্গে কেন্দুবিল্ব হয়ে বৃন্দাবনে যান। সেখানে কয়েক বছর থেকে নবদ্বীপে এসে পুনর্বার গৌরহরি বাউলের সঙ্গে মিলিত হন। পরে তাঁর আদেশে ঘরে ফিরে আসেন এবং গৃহদেবতা গোপীনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে অবস্থান করছিলেন।

মনোহর ভণিতায় আরও কতকগুলি নিবন্ধ পাওয়া যায়। এগুলিও হয়ত এই মনোহর দাসের রচনা। যেমন, 'আশ্রয়কল্পলতিকা', 'ভক্তিরসোজ্জ্বল চূড়ামণি', 'মনোহরকারিকা', 'রূপঞ্জনলতিকা'।

মনোহর দাস (আউল)—ভক্ত বৈষ্ণব। ১৬৫৭ শকাব্দের ১৭ পৌষ ইনি বদনগঞ্জ থেকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেছিলেন বলে জানা যায়। এঁর তিরোভাবের জন্য বদনগঞ্জে মকর সংক্রান্তিতে মহোৎসব হয়ে থাকে। ইনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার গোমট থানার অন্তর্গত বদনগঞ্জ গ্রামে, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের গোকুলনগর গ্রামে এবং সোনামুখী গ্রামে বাবা মনোহর দাসের সমাধি আছে। এঁর বহু শিষ্য ছিল। ইনি দেশের পাঠশালাসমূহে গমন করে বালকদের ধর্ম শিক্ষা

দিতেন। এঁর নিকট বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ ছিল। ইনি দীর্ঘজীবি ছিলেন।

মনোহর দাস বাবাজী—প্রসিদ্ধ সাধক। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মহারাজা বীর হাম্বিরের (১৫৬৫-১৬১৯ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'দিনমণি-চন্দ্রোদয়'। বিষ্ণুপুরের প্রায় ২০ মাইল উত্তরে সোনামুখী গ্রামে তাঁর পটে প্রতি বছর রামনবমী তিথিতে মহাসমারোহে মহোৎসব হয়।

মনোহর শর্মা—একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও টীকাকার। রাজা মাণিক্য মল্লের আদেশে ইনি সুবোধিনী নামে শ্রুতবোধটীকা ও সুভাষিণী নামে কিবাতার্জুনীয় টীকা রচনা করে-ছিলেন।

মনোহর সিংহ—গৌড়দেশীয় একজন রাজা। রাজা হৃদয়েশ যে তাম্রফলক দান করেন, তাতে এঁর নাম দৃষ্ট হয়।

ময়নামতী—পালরাজাদের যুগের বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশজাত রাজা মাণিকচন্দ্রের পত্নী, ত্রিপুরার মিহির-কুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। ময়নামতী পরম সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। কথিত আছে রাজা মাণিকচন্দ্র প্রৌঢ় বয়সে এক সুন্দরী ও তরুণী রমণীকে বিবাহ করেন। সেই ষোড়শীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ময়নামতীকে বিতাড়িত করেন। ময়নামতী ভারত বিখ্যাত মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিষ্যা হন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ময়নামতীর এক পুত্র জন্মে—নাম গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ। মাণিক চাঁদের মৃত্যুর পর ময়নামতীই দেশের শাসনকর্ত্রী ছিলেন। কথিত আছে উনিশ বছর বয়সে রাজকুমার গোপীচন্দ্রের রিষ্ট ছিল। এবং দ্বাদশ বছর যদি তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করে দেশত্যাগী হন, তবেই রিষ্ট কেটে যেতে পাবে। তাই গোপীচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করলে ময়নামতীর আদেশে তাঁকে সন্ন্যাসী হযে গৃহত্যাগ করতে হয়। এই উপলক্ষে একদল লোক ময়নামতীর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করে। গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে সমস্ত রাজ্য উপভোগ করবার ইচ্ছায় নাকি ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে দ্বাদশ বছরের জন্য বনে পাঠিয়েছিলেন।

ময়ূরধ্বজ—মহাভারতীয় যুগে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই প্রবল পরাক্রমশালী রাজা পাণ্ডবগণের বিপক্ষে ও কৌরবদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। এঁর পুত্র ছিলেন মহাবীর তাম্রধ্বজ। ময়ূরধ্বজের নির্দেশে তাম্রধ্বজ পাণ্ডবদের অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্ব ধরেন। ঘোরতর যুদ্ধে প্রথমে পাণ্ডবদের পরাজয় হব। পরে ছলচাতুরী করে যজ্ঞীয় অশ্ব উদ্ধার করেন। রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের অবস্থিতি-কাল সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী।

ময়ূরভট্ট—অনেকের মতে ময়ূরভট্টই নাকি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেব আদি কবি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি ঘনবামের বচনায় দেখা যায়,

"ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আগু কবি।"

ঘনরাম অন্যত্র বলেছেন,

"হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্মসভায়।"

ঘনবামেব বারবার এই সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখে ময়রভট্টই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি অনুমিত হয়। তাছাড়া, মাণিক গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবিব কাব্যে ময়ূর ভট্টেব বন্দনা আছে। ময়ূবভট্টের কাব্যের কোন প্রামাণ্য নিদর্শন এ-পযন্ত পাওয়া যায়নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত ময়ূরভট্টের কাব্যের একখানি পুঁথি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। পরে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৩১০ সালে বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভট্টের কাব্যের সম্পাদনা করেছেন। নাম দিয়েছেন 'শ্রীধর্ম পুরাণ'। তাঁর মতে ময়ূরভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সময় বিগুমান ছিলেন। অর্থাৎ তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক এবং ধর্মসেন স্থাপিত ধর্মমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। ময়ূরভট্ট সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ বা বাংলা কোন্ ভাষায় যে ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন তা জানা যায় না। এই প্রসংগে সংস্কৃত 'সূর্যশতকে'র রচয়িতা ময়ূরভট্টের কথা আলোচিত হয়। ইনি নাকি 'সূর্যশতক' লিখে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচাষ বলেন, "মনে হয়, ময়ূরভট্ট কোন বাঙালি কবির প্রকৃত নাম নহে —সংস্কৃত 'সূযশতক' রচযিতা ময়ূর ভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙালি কবি গ্রহণ করিযা এই কাব্য বচনা করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য এক হিসাবে সূয-দেবতার মাহাত্ম্যসূচক কাব্য,—এই উদ্দেশ্যেই বাঙালি কবি সংস্কৃত কবির নামটি এখানে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।" ডঃ ভট্টাচাযেব মতে ময়ূরভট্টের কাব্য হযতো খ্রীষ্টীয পঞ্চদশ শতক বা তার কাছাকাছি সময়ে লিখিত হযেছিল।

ময়ূরভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গলের কবি একে "দ্বিজ ময়ূবভট্ট" বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এঁকে ধর্ম মঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট বলে নির্ণয় করে এঁকে ১১৭৯ বা ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছির লোক বলে ধরেছেন।

মরদন—রোসাঙ্গ-রাজসভার বিখ্যাত কবি দৌলত কাজীর সমসাময়িক একজন মুসলমান কবি। রোসাঙ্গ-রাজ থিরী থুধর্মার রাজত্বকালে (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ) ইনি আবির্ভূত হন। সম্ভবতঃ রোসাঙ্গের

"কাঞ্চি" নামক স্থানে কবির জন্ম হয়। এঁর রচিত "নছিরা নামা" কাব্যখানি একটি মৌলিক গ্রন্থ।

মল্লিকার্জুন সূরী—একজন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লল্লাচার্য প্রণীত শিষ্যধী-মহাতন্ত্রের একটি টীকা রচনা করেন।

মহম্মদ কবির—উত্তরবঙ্গবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। এঁর রচিত কাব্য 'মনোহর-মধুমালতী'।

মহম্মদ খান—এঁর রচিত কাব্যের নাম 'মুক্তাল-হোসেন'। কাব্যটি কারবালার যুদ্ধকাহিনী বিষয়ক আরবী কাব্যের বঙ্গানুবাদ। এতে নবীবংশের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। কাব্যের শেষে কবি নিজেই পিতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুবারিজ খান, পিতামহ জালাল খান এবং প্রপিতামহ নসরৎ খান। কবির গুরু ছিলেন শাহ সুলতান। মহম্মদ খান সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর কাব্য রচনাকাল সম্ভবত ১৬৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মহম্মদ তকী খাঁ—১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে নবাব মীর কাসেমের সঙ্গে ইংরেজদের যে যুদ্ধ হয় তাতে তকী খাঁ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। পলাশীর দক্ষিণভাগে তকী খাঁর শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। ১৯ জুলাই ইংরেজ সৈন্য অগ্রগামী হলে অসম সাহসী তকী খাঁ তাদের প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করেন। ইংরেজ বাহিনীর সুতীব্র অগ্নিবৃষ্টির সম্মুখে বারবার প্রতিহত হলেও তিনি নিরস্ত হলেন না। ইংরেজদের একটি গোলার আঘাতে তকী খাঁর অশ্ব নিহত হয় এবং তিনি স্বয়ং পাদদেশে আঘাত পান। কিন্তু কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে পুনরায় অশ্বারোহণে অগ্রসর হন। এবারে স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ হলেও বীরবর তকী অন্যের ভয় নিবৃত্তির মানসেই বস্ত্রাঞ্চলে ঐ স্থান আবৃত করে অগ্রসর হতে থাকেন। শেষে এঁর মস্তকে একটি গুলি লাগলে ইনি নিহত হন।

মহম্মদ মহসীন (হাজি)—দানবীর মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীন ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার মহান সন্তানদের তিনি অন্যতম। বাল্যে তিনি সিরাজী নামক এক পণ্ডিতের নিকট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর মাতার ছিল দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের সন্তান মন্নু বেগম। মন্নুর পিতা আগা মোতাহার বহু সম্পত্তি রেখে মারা গেলে, মন্নুর মাতা ফৈজুল্লাকে বিবাহ করেন। মহসীন এই ফৈজুল্লার ঔরসজাত সন্তান। মন্নু অল্প বয়সে বিধবা হলে তাঁর প্রায় অর্ধলক্ষ টাকার আয়ের সম্পত্তি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী ফকির মহসীনকে দান করে দেন। মহসীন জিতেন্দ্রিয়, দানী ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁর সংযম ও বদান্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহসীন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সৎকাজে ব্যয় করবার জন্য দানপত্র করে যান। পরে উক্ত 'মহসীন-ফাণ্ড' থেকে হুগলী মহসীন কলেজ, ইমাম বাড়া হাসপাতাল, হুগলীর ইমামবাড়া, বহু মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর হাজি মহম্মদ মহসীন পরলোক গমন করেন। মহসীনের সমাধি একটি দর্শনীয় বস্তু।

মহম্মদ রমজান আলী—ছাওয়াল শা দ্র°।

মহম্মদ রেজা খাঁ—১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। লর্ড ক্লাইব মহম্মদ বেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করে এঁর উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দিযেছিলেন।

মহম্মদ শিরান—প্রথম বঙ্গ আক্রমণকারী বক্তিয়ার খিল্‌জির প্রিয়পাত্র। ইনি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসী ছিলেন। তাই তিব্বত অভিযানের পূর্বে বক্তিয়ার এঁকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। প্রভুর মৃত্যুর পর (১২০৫ খ্রীঃ) সামন্তগণ ও নেতারা একত্র হয়ে মহম্মদ শিরানকে রাজপদ প্রদান করেন। রাজা হয়ে প্রথমেই তিনি প্রভু হত্যায় অভিযুক্ত আলীমর্দনকে পরাস্ত করে কারারুদ্ধ করেন। অনেকের ধারণা আলীমর্দন বক্তিয়ারকে রোগ শয্যায় নিহত করেছিলেন। এক আত্ম-কলহের ফলে মহম্মদ শিরান আলীমর্দান কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। শিরান ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর সময় দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন কুতুবুদ্দিন। কিন্তু শিরান কখনো তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন নি।

মহম্মদ সাহ স্থর—শের শাহের পুত্র সেলিম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলে মহম্মদ সাহ স্থর নামক এক আত্মীয়কে বাংলাব কর্তৃত্ব প্রদান করেন ১৫১২ খ্রীঃ। সেলিম সাহ মহম্মদ আদিল কর্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হলে মহম্মদ সাহ স্থর বাংলার স্বাধীন নবাব বলে নিজেকে ঘোষণা করেন এবং জোয়ানপুর পযন্ত অধিকার করেন। মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হি মুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বঙ্গেশ্বর মহম্মদ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপরা ঘাট নামক স্থানে নিহত হন।

মহম্মদ হেয়াৎ—হেয়াং মামুদ দ্র°।

মহম্মদী বেগ—এই সেই কুখ্যাত পুরুষ জাতীয় কুলাঙ্গার যে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করেছিল। মহম্মদী বেগ আজীবন আলীবর্দী ও সিরাজের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছিল। মীরজাফরের পুত্র মীরন যখন নবাবকে হত্যা করার জন্য বহু অর্থের লোভ দেখিয়েও একজনও হত্যাকারী পায় নি,

তখন এই কৃতঘ্ন মহম্মদী বেগ তার প্রভুসম নবাবকে হত্যার জন্য এগিয়ে এল। এই নর-পশু এক আঘাতেই নবাবকে হত্যা করতে পারত। তা' না করে হতভাগ্য নবাবকে সে বারংবার আঘাত করে করে হত্যা করে। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখেছেন, "... কসাইটা তাঁহার উপর ক্রমাগত খড়্গাঘাত করিতেছিল। এই আঘাতগুলির কয়েকটি তাঁহার মুখের উপর পড়িল, যে মুখের লাবণ্য ও অনুপম সৌন্দর্য সমস্ত বঙ্গদেশে প্রবাদ বাক্যের মতো হইয়াছিল সেই মুখশ্রী আঘাতে আঘাতে নষ্ট হইল। মুখখানি হেলিয়া পড়িল।"

মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠ— বিখ্যাত ধনকুবের ফতেচাঁদ জগৎ শেঠের পৌত্র এবং আনন্দ চাঁদের পুত্র। ইনিও পিতামহের ন্যায় "জগৎশেঠ" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দীর কাশিমবাজার কুঠী আক্রমণকালে ইংরেজরা মহাতাপ চাঁদের নিকট থেকে বার লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নবাবকে দিয়েছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা হয়। সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় জগৎশেঠের মধ্যস্থতাতেই সন্ধির প্রস্তাব হয়েছিল। ফরাসীদের সঙ্গেও জগৎশেঠের বিশেষ সোহার্দ ছিল। ক্লাইবের চন্দননগর আক্রমণকালে ফরাসী গভর্নমেণ্ট জগৎশেঠের নিকট থেকে পনের লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। সেই সময় দিল্লীর সম্রাট সিরাজউদ্দৌলার উপর অসন্তুষ্ট হলে সিরাজ জগৎশেঠকে তিন কোটি টাকা সংগ্রহ করে দেবার আদেশ দেন। কিন্তু এত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব বলায় সিরাজ জগৎশেঠের গালে এক চড় মারেন এবং এঁকে কারারুদ্ধ করেন। নবাবের ক্রোধ প্রশমিত হলে ইনি কারামুক্ত হন। মহাতাপ ও এঁর ভ্রাতা স্বরূপচাঁদ (মহারাজ) সিরাজের ভয়ে প্রকাশ্যে ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে সাহসী হন নি। কথিত আছে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য জগৎশেঠই সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেছিলেন। মীরজাফর ও ইয়ার লতিফ সেনাপতিদ্বয় পরে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেছিলেন। ক্রমে বাংলার আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র সভা গঠিত হয়েছিল।

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কলকাতায় টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত করায় জগৎশেঠের ব্যবসায় অনেকটা মন্দা হতে আরম্ভ করে। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মীর্জাফরের সঙ্গে জগৎশেঠও নিমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতা যাত্রা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জগৎশেঠের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেছিল। শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় মীর্জাফর নবাবী লাভে সমর্থ হয়ে-

ছিলেন। মীর্জাফর জামাতা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নবাবী লাভ করে প্রথম প্রথম শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিশেষ সম্মান করতেন। শেষে বাণিজ্য শুল্ক বিষয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশীমের গোলমাল বাধলে শেঠেরা ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করেন। তখন মীরকাশীম শেঠদের সপরিবারে বন্দী করবার আদেশ দেন। ক্লাইবের হস্তক্ষেপে পরিবারের অন্যান্য নারী পুরুষ রক্ষা পায়; কিন্তু মহাতাপ চাঁদ ও স্বরূপচাঁদ ভ্রাতৃদ্বয় বন্দী হয়ে হীরাঝিলের প্রাসাদে অবরুদ্ধ হন। এঁদের মুক্তির জন্য ইংরেজরা বহু অনুরোধ করেছিল; কিন্তু সবই মীরকাশীম অগ্রাহ্য করেন। শেঠভ্রাতৃদ্বয়কে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারা হয় (১৭৬৩ খ্রীঃ)।

মহাদেব বিদ্যাবাগীশ—মহাদেবের রচিত গ্রন্থের নাম 'আনন্দলহরী টীকা'। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে মহাদেব ছিলেন যাদবানন্দ চক্রবর্তীর পুত্র, বিদ্যাসাগরের পৌত্র ও সুবুদ্ধিমিশ্রের প্রপৌত্র। মান্দারনের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে গুরুর নিকট থেকে তিনি 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধি প্রাপ্ত হন। গ্রন্থের রচনাকাল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মহাবৎ খাঁ—মোগল আমলে ইনি অল্প কিছু সময়ের জন্য বাংলার জায়গীরদার ছিলেন (১৬২৬ খ্রীঃ)।

মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য—এঁর প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। এঁর রচিত গ্রন্থের একটি পুঁথির লিপিকাল ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। 'কাম্যমন্ত্রোদ্ধার' নামক একটিমাত্র তন্ত্রনিবন্ধ তাঁর নামাঙ্কিত দেখা যায়। এতে তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহ সংগৃহীত হয়েছে।

মহিধর—বাংলার পালরাজাদের রাজত্বকালে বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী। অবস্থিতিকাল অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে।

মহীপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য। কাহ্নপাদ ছিলেন এঁর গুরু। প্রাচীন বঙ্গভাষায় ইনি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' এঁর রচিত একটি চর্যাপদ পাওয়া যায়। ইনি দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

মহীপাল—দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন পালরাজবংশ অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁচেছিল, তখন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন (আঃ ৯৮৮ খ্রীঃ অব্দ)। তাঁর অর্ধ শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে পালরাজবংশের সুদিন আবার ফিরে এসেছিল। তিনি বাংলায় বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার ও পুনরায় পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যে অতুল কীর্তি অর্জন করেন তা ইতিহাসে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। দিনাজপুরের মহীপালদীঘি, মহীপাল এবং মহীপুর, মহীসন্তোষ

প্রভৃতি স্থান আজিও মহীপালের স্মৃতি রক্ষা করে আসছে। পালরাজ্যকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে তিনি বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্ত থেকে বারাণসী পর্যন্ত ও মিথিলায় পালরাজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নানাস্থানে অশোকস্তূপ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। মহীপাল অগ্নিদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারের জীর্ণোদ্ধার এবং বৌদ্ধগয়ায় দুটি মন্দির নির্মাণ করেন। কাশীধামে নবদুর্গার প্রাচীন মন্দির ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরও সম্ভবতঃ তিনিই নির্মাণ করে-ছিলেন। মহীপালের রাজত্বকালে বাংলায় এক নূতন জাতীয় জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। তিনি ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছিলেন।

মহীপাল (দ্বিতীয়)—তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র। পিতার মৃত্যুর (১০৭০ খ্রীঃ) পর দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পালরাজাদের তখন চরম অবনতির যুগ। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র চলছিল। বরেন্দ্রের সামন্তবর্গ প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে মহীপাল পরাস্ত ও নিহত হন। এবং কৈবর্তজাতীয় নায়ক দিব্য বরেন্দ্রের রাজা হন।

মহীরজ—রামায়ণের যুগে ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রথম আর্য রাজা ছিলেন। মহীরজ ছিলেন মহাবীর।

মহেন্দ্রদেব—বঙ্গেশ্বর (১৪.০-১৮ খ্রীঃ) রাজা গণেশের দ্বিতীয় পুত্র এবং যদু বা জালালুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গণেশের মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হন (১৪১৮ খ্রীঃ)। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ইনি শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু জালালুদ্দীন রাজ্যের বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নিজের দলে ভিড়িয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে অপসারিত করে সিংহাসন পুনরধিকার করেন।

মহেশ পণ্ডিত—'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী' গ্রন্থ মতে মহেশ পণ্ডিতের জন্মস্থান শ্রীহট্ট। এঁরা ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। এঁর পিতার নাম কমলাক্ষ, মাতা ভাগ্যবতী। ইনি ছিলেন নিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্য। ইনি 'ঢকাবাদ্যে নৃত্য' করতেন। নিত্যানন্দের আজ্ঞায় রঘুনাথ-দাসের চিঁড়াদধি ভোজদানকালে মহেশ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্যের খড়দহ আগমনকালে এবং নীলাচল যাত্রার প্রাক্কালে নরোত্তম যখন খড়দহে পৌঁছান তখন মহেশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী-কালের গ্রন্থগুলিতে সরডাঙ্গা বা সুরডাঙ্গা-সুলতানপুরে মহেশ পণ্ডিতের পাট নির্ণীত হয়েছে। মহেশ পণ্ডিত দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম ছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার—বিখ্যাত পণ্ডিত। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত সুপাতলী গ্রামে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম মুকুন্দরাম বিশারদ্। মহেশ্বর কাব্যপ্রকাশের "ভাবার্থ-চিন্তামণি" নামক টীকা প্রণয়ন করে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতসমাজে অক্ষয়-কীর্তি রেখে গিয়েছেন। ইনি "বর্ণধর্ম-প্রদীপ", "দায়প্রদীপ", "বিচারপ্রদীপ", "সংসারপ্রদীপ" প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি প্রদীপ লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

মহেশ্বর বিশারদ্—প্রখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা। ইনি বাংলাদেশ ছেড়ে কাশীতে গিয়ে বসবাস করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি অদ্বৈত-মকরন্দের টীকা রচনা করেন। তাতে উপনিষদাদি শ্রুতিশাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নরহরি বিশারদ্ দ্রঃ।

মহেশ্বর বৈদ্য—ভট্টার হরিশ্চন্দ্রের বংশধর, 'বিশ্বপ্রকাশ' নামক কোষ-প্রণেতা। এঁর অবস্থিতিকাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। ইনি মাধবকর প্রণীত পর্য্যায়রত্নমালার উপর টীকা লিখেছেন।

মহেশ্বর ভট্টাচার্য—বাঙালী নৈয়ায়িক। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। 'চরিতাভিধান' অনুসারে এঁর জন্মকাল ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ এবং এঁর পিতার নাম মুকুন্দরাম বিশারদ্। এঁর রচিত গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শে'র উপর রচিত টীকা 'কাব্যাদর্শ টীকা।' 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ' নামে এঁর অপর একখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহৌজা—মহাভারতীয় যুগের রাঢের রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল বর্ধমান জেলার কাঁকশা থানার সেন-ভূমের সেনপাহাড়ীতে। এর পূর্ব নাম ছিল কৌশকী কচ্ছ।

মার্কো পোলো—বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক। পাঠান রাজত্ব-কালে ১২৫০-১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মার্কোপোলো বঙ্গদেশ ভ্রমণ করে-ছিলেন। এঁর বিবরণী থেকে বাংলার তৎকালীন অবস্থা জানা যায়।

মাগন ঠাকুর—সম্ভবতঃ কোরেশ বংশসম্ভূত বলে এঁর নাম কোরেশী মাগন ঠাকুর। কোরেশী মাগন দ্রঃ।

মাণিকচন্দ্র—বিক্রমপুরের চন্দ্র-বংশজাত। পালরাজাদের রাজত্ব-কালে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইনি অবস্থান করছিলেন। ইনি গৌড়ের এক বিস্তৃত জমিদারী মিরাশ-স্বরূপ লাভ করেছিলেন। তিনি ত্রিপুরার মিহিরকুলের রাজা তিলক-চন্দ্রের কন্যা ময়নামতীর পাণিগ্রহণ করে ত্রিপুরদেশের এক বিস্তৃত অংশের অধিকারী হন। তাঁর রাজধানী ছিল পটিকায়,—আধুনিক পাটিকারাতে। এখনো সেখানে মাণিকচন্দ্রের রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই মাণিকচন্দ্রের পুত্রই গোবিন্দচন্দ্র বা চর্যাপদ রচয়িতা সিদ্ধাচার্যগণের বর্ণিত

গোপীচাঁদ যাঁর কাহিনী অবলম্বনে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

মাণিকচাঁদ—মাণিকচাঁদ পূর্বে বর্ধমান রাজার দেওয়ান ছিলেন। উড়িষ্যার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে নবাব আলীবর্দী খাঁর যুদ্ধ উপস্থিত হলে বর্ধমানের রাজা মাণিকচাঁদকে আলীবর্দী খাঁব সাহাযার্থ প্রেরণ করেছিলেন।

মাণিকচাঁদ—বিখ্যাত ধনকুবেব জগৎশেঠের মাতুল ও দত্তক পিতা। মাণিকচাদের পিতা হীরানন্দ ছিলেন বাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুরের অধিবাসী। এঁরা শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পবে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হন। হীরানন্দ ব্যবসাযেব উদ্দেশ্যে পাটনায আসেন। সেখানে কিছু অর্থের অবিকারী হযে কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদকে ঢাকায় কুঠী স্থাপনেব জন্য প্রেরণ করেন। ঢাকা সে সময় বাংলাব বাজধানী ছিল। প্রথমে মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকায বাস করে বাংলাদেশের শাসনকায নির্বাহ করতেন। মাণিক চাঁদ মুর্শিদকুলীর প্রধান সহাযক ছিলেন। মুর্শিদকুলী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করলে মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে এসে ভাগীরথীর পূর্বতীরে মহিমাপুর নামক স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতে আরম্ভ করেন এবং নবাব সরকারের প্রধান কর্মচারীরূপে পরিগণিত হন। মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হলে মাণিকচাঁদ তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎকালে জমীদাবরা প্রত্যেক মাসে যে বাজস্ব জমা দিতেন তা মাণিকচাঁদেব নিকটই জমা হত এবং মাণিকচাঁদ বার্ষিক ১½ কোটি টাকা দিল্লীর সম্রাটের নিকট পাঠাতেন। নবাবের টাকাব দরকাব হলে মাণিকচাঁদই তা সববরাহ করতেন। তাতে মাণিকচাঁদেব যথেষ্ট ক্ষমতা বৃদ্ধি পেযেছিল। মুর্শিদকুলীর সুপারিশে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকচাঁদ সম্রাট ফেরোকসেরের নিকট থেকে "শেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হযেছিলেন। শুনা যায মুর্শিদকুলীর মৃত্যুব পর মাণিকচাঁদের তহবিলে নবাবেব সাত কোটি টাকা জমা ছিল। প্রভূত অর্থের অবিকাবী হযে মাণিকচাঁদ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দয়াবাগে মাণিকচাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয।

মাণিক দত্ত—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জনশ্রুতিমূলক আদি কবি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও মাণিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর আদি কবি বলে স্বীকার করেছেন :

আগু কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস
মানিক দত্তের দাগু করিযে প্রকাশ।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথে পরিচয়
বিনয় করিয়া কবিকঙ্কণে কয।"

মাণিক দত্তের পুথি মধ্যস্থ আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, তিনি ফুলুয়া নগরের অধিবাসী ছিলেন। এই

ফুলুয়া মালদহ জেলার বর্তমান ফুলবাড়ী বলে অনেকে নির্দেশ করে থাকেন। কবির রচনাংশসমূহ মালদহ জেলা থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া, কাব্যে বর্ণিত বহু স্থান মালদহ জেলায় অবস্থিত। কবির আত্মপরিচয় থেকে আরও জানা যায়, তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। কিন্তু দেবীর প্রসাদে তাঁর বিকলাঙ্গসমূহ সুস্থ হয়ে ওঠে। আবার দেবীর প্রসাদেই কবিত্ব লাভ করে তিনি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মাণিক দত্ত খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। কেউ কেউ এঁকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলেও অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। মাণিক দত্তের রচনা সরল ও অনাড়ম্বর। এঁর রচনা ভক্তজনের হৃদয় স্পর্শ করে। পুঁথি রচনার পর কবি গানের দল বাঁধেন। এঁর রঘু ও রাঘব নামে দু'জন দোহার ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ইনি নানা স্থানে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চণ্ডীর গান গেয়ে বেড়াতেন। কথিত আছে যে, মাণিকদত্তের গানে কলিঙ্গরাজের উল্লেখ থাকায় তৎকালীন কলিঙ্গরাজ এঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে এঁকে নিজ রাজ্যে ধরে নিয়ে যান এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে চণ্ডীর কৃপায় কবি মুক্তি লাভ করেন।

মাণিকরাম গাঙ্গুলী—ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদ্বয় ঘনরাম ও আদি রূপরামের অনুসরণে মাণিকরাম গাঙ্গুলী একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। মাণিকরামের পিতামহ অনন্তরাম, পিতা গদাধর, মাতা কাত্যায়ণী, পত্নী শৈব্যা। নিবাস বেলডিহা (বর্তমান বেলটে, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা।) গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশের এক বিচিত্র কাহিনী আছে। মাণিকরামের কাব্যের প্রধান উপজীব্য লাউসেন উপাখ্যান। মাণিকরাম একটি সংক্ষিপ্ত 'শীতলামঙ্গল' পাঁচালীও লিখেছিলেন। মাণিকরামের প্রপিতামহ সুদাম, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম গোপাল। কবির বংশ অত্যন্ত প্রাচীন। তাঁরা ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। মাণিকরাম কেবল সুকবি ছিলেন না, সুপণ্ডিতও ছিলেন।

মাধব বা মাধবকর—মাধব নামে একাধিক ব্যক্তি বৈদ্যকশাস্ত্রের ইতিহাসে পরিচিত। এঁদের মধ্যে মাধবকর নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিষক্‌সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। মাধবের পিতার নাম ইন্দুকর। খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীই মাধবের আবির্ভাবকাল বলে অনুমিত হয়। মাধব রচিত 'রুগ্‌বিনিশ্চয়' বা 'নিদান' বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা অধীত গ্রন্থ। মাধবের নামাঙ্কিত অপর একটি গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা'। খাদ্যাখাদ্য ও পরিপাক বিষয়ক 'কূটমুদ্গর' গ্রন্থও মাধবের নামাঙ্কিত। আরও কয়েকটি গ্রন্থ

মাধবের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়, যেমন—'দ্রব্যগুণ', 'পর্যায়রত্নমালা', 'রসকৌমুদী' 'আয়ুর্বেদরসশাস্ত্র', 'ভাবস্বভাব,' 'মুগ্ধবোধ'। হারুণ-অল-রসীদ মাধবকরের নিদান অনুবাদ করেছিলেন।

মাধব আচার্য পণ্ডিত—শ্রীহট্ট হতে নবদ্বীপে আগত বৈদিকবিপ্র দুর্গাদাস ও তৎপত্নী বিজয়ার পৌত্র। এঁর পিতার নাম কালীভক্ত পরাশর। পরাশর কালিদাস নামে খ্যাত। মাধবের পিতৃব্য সনাতনের একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই গৌরাঙ্গপ্রভুর পত্নী। মাধবের মাতা বিধুমুখী অল্প বয়সে বিধবা হন এবং মাধব মহাপণ্ডিত হয়ে আচার্য উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গ অভিষেককালে গৌরাঙ্গোচ্চারিত নাম-মহামন্ত্র শ্রবণে এঁর হৃদয়ে পরমাভক্তির উদয় হলে তাঁর উপদেশে তখন থেকে ইনি 'সংখ্যা করি লক্ষ নাম লয় অনুরাগে' এবং 'সেই হৈতে হৈল তার সংসার বিরাগে'। সংসার-বিরক্ত হয়ে ইনি নবদ্বীপ থেকে কুলিয়ায় বসতি করেন। মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এসে কুলিয়ায় অবস্থানকালে এই মাধবের গৃহেই উঠেছিলেন। মাধবাচার্য ভাগবতের প্রতি অনুরাগী হন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্দ অবলম্বনে ইনি প্রসিদ্ধ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করে তাহা গৌরাঙ্গ-চরণে অর্পণ করলে গৌরাঙ্গ এঁর ভক্তিভাব দেখে এঁকে অনুগৃহীত করেন। তারপর ইনি গৌরাঙ্গের নির্দেশে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র লাভ করেন। এরপর মাধবাচার্য সংসার বিরাগী হলে এঁর মাতা এঁর সংসার-ত্যাগের সম্ভাবনা বুঝে এঁর বিবাহের উদ্যোগ করতে থাকেন। তখন মাধবাচার্য বৃন্দাবনে পালিয়ে যান এবং রূপ-গোস্বামীর নিকট থেকে ব্রজের মধুর ভাবের ভজনা করতে থাকেন। ঐ স্থানে ইনি নাকি পরমানন্দপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মাতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইনি শান্তিপুরে আসেন। এই সময় ইনি অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতের সঙ্গে খেতরির মহোৎসবে গিয়েছিলেন। পরে ইনি আবার বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে বসবাস করেন। জাহ্নবীদেবী বৃন্দাবন গেলে তাঁর ভক্ত-সঙ্গী নিত্যানন্দ দাস মাধবাচার্যের সঙ্গে বৃন্দাবনের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে মাধবদাস, দ্বিজ-মাধব ও মাধব ভণিতার বহু পদই এই মাধব আচায রচিত। জনশ্রুতি এইরূপ যে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।

"স্বপনে পাইল কৃষ্ণ-চৈতন্য আদেশ।
সেই সে ভরোসা আর না জানি বিশেষ॥"

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের বিশুদ্ধ পুঁথি দুষ্প্রাপ্য। অধিকাংশ পুঁথিতে ভাগবতাচার্যের কাব্যের অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কচিৎ গায়নের

ভণিতাও দেখা যায়। মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধব-এর নামে একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও পাওয়া যায়। তাঁর এই কাব্যের নাম ভণিতায় বেশীর ভাগ "সারদা চরিত" পাওয়া যায়। এই থেকে অনুমিত হয় তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের হয়তো নাম ছিল 'সারদা চরিত' বা 'সারদামঙ্গল'। কবি পঞ্চগৌড়ের অন্তবর্তী সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে মৈমনসিংহ জেলার নবীনপুর, বর্তমান গোঁসাইপুর গ্রামে বসবাস করেন। কবির বংশধরগণ বহুকাল ঐ গ্রামে ছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজমাধব একজন উল্লেখযোগ্য কবি। মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'সারদামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাছাড়া, 'গঙ্গামঙ্গল' নামে আর একখানি কাব্যের রচয়িতাও দ্বিজমাধব। এই সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা দুরূহ।

মাধব-কন্দলী—আসামের কামরূপ অঞ্চলের কবি। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম শ্রীরাম-পাঁচালী। এই গ্রন্থই কামরূপ অঞ্চলের বাংলা রচনার সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন। "মহামাণিক্য বরাহ-রাজার অনুরোধে" মাধব-কন্দলী এই কাব্য রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত বলে অনুমিত হয়।

মাধবকবীন্দ্র ভট্টাচার্য—উনিশ শতকের প্রথমভাগে পলিতনগরে বাস করতেন। এছাড়া, তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। মাধবের রচিত কাব্য 'উদ্ধবদূত'।

মাধব ঘোষ—বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে মাধব ঘোষ ভ্রাতাদের সঙ্গে তথায় গিয়ে মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। সেখানে ইনি সম্প্রদায়-সংকীর্তনে যোগদান করেছিলেন। ইনি পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাধব বাসু ঘোষের সঙ্গে গৌড়ে নিত্যানন্দের অনুগামী হয়েছিলেন। মাধবও ভাল কীর্তনীয়া ছিলেন। ইনি একজন পদকর্তাও ছিলেন। এঁর রচিত প্রায় দশ-বারটি পদ পাওয়া যায়। তমলুকে মতান্তরে দাঁইহাটে মাধবের পাট ছিল বলে জানা যায়। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপ সমাজের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি যাঁরা রক্ষা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাধব সিদ্ধান্ত অগ্রগণ্য। অধ্যাপনাগুণে তিনি সুবিখ্যাত শ্রীরাম শিরোমণির প্রতিপক্ষরূপে নৈয়ায়িক সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। রাঢ়ীয় বাৎস্যগোত্র 'পুতিতুণ্ড' বংশে তাঁর জন্ম হয় (১৭৮২ খ্রীঃ)। তিনি নিজে শক্তিবাদ টীকায় সাধক-শ্রেষ্ঠ 'গাংফিরানো ভট্টাচার্য্য' রাজেন্দ্রের বংশধর বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর

পিতার নাম বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি, পিতামহ চন্দ্রশেখর ন্যায়বাগীশ, প্রপিতামহ মহাদেব পঞ্চানন। মাধবসিদ্ধান্তই রাজেন্দ্র বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। মাধব শঙ্কর তর্কবাগীশের পুত্র শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে নবদ্বীপেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮২১-২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নলডাঙারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্ধমানরাজের 'ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যালয়ে' পণ্ডিত নিযুক্ত হন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবদ্বীপ ত্যাগ করেন নি। দশ-এগার বছর নবদ্বীপ সমাজের প্রধান নৈয়ায়িক থেকে তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিরাশি বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর অধ্যাপনা করে তিনি বহু শত ছাত্রকে নব্যন্যায়ে কৃতবিদ্য করে গিয়েছেন। মাধব-রচিত গ্রন্থ সমূহের নাম: (১) শক্তিবাদ টীকা ('মাধবী' নামে প্রসিদ্ধ), (২) কারকচক্রবিবৃতি, (৩) পদার্থখণ্ডনবিবৃতি, (৪) ন্যায়পত্রী, (৫) কাব্যমালিকা, (৬) হাস্যার্ণবটীকা, (৭) মুগ্ধবোধটীকা, প্রভৃতি। মাধব ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তাঁকেই নবদ্বীপ সমাজের শেষ নৈয়ায়িক গ্রন্থকার বলা যেতে পারে।

মাধবদাস কবিচন্দ্র—রাধাকান্ত কবিকণ্ঠহারের পিতামহ এবং ত্রিলোচনবৈদ্য কবীন্দ্রচন্দ্রের পিতা। ইনি "বৈদ্যকরত্নাবলী" প্রণেতা বরিশালের রাজা কন্দর্পনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। ইনি ছিলেন কাতন্ত্রপরিভাষার টীকাকার।

মাধবদেব—আসামের শঙ্করদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য বৈষ্ণবধর্মের সংস্কারক। আহোমরাজ এবং কামরূপরাজের উৎপীড়নের ফলে মাধবদেব স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক কামতারাজ্যে আগমন করলে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ এঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং আশ্রয়দান করেন। ইনি মহারাজের সাহায্য ও উৎসাহে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কথিত আছে, মাধবদেবের প্রচারিত ধর্মমত রাজধর্ম বলে স্বরাজ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষণা করেছিলেন। মাধবদেবের পৌত্রী দময়ন্তীদেবীকে মহারাজ বিবাহ করেছিলেন। মাধবদেব নামমালিকা, রাজসূয়, ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য এবং আদিকাণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

মাধবের পদাবলীতে ভক্তিভাবের নিরাবিল প্রকাশ দেখা যায়। একটি প্রার্থনা পদের কিয়দংশ এইরূপ:

"কাকরু মনুয়া বিষয়বিলাস
দুর্লভ মানবী তনু পুনু হোঁ না পাস।
ভারতে মানবী তনু তরণী উপাম
দেহু ভরা কলিকো ধরম হরিনাম।"

মাধব দ্বিজ—মাধব আচার্য দ্রঃ।

মাধব ভট্টাচার্য ওরফে **শুভরাজ খাঁ**—এঁর থেকেই শুভরাজখানি মেলের উৎপত্তি হয়েছে। এঁর পিতার নাম তপন এবং পিতামহের নাম আখণ্ডল ভট্টাচার্য। শুভরাজের পুত্র বিষ্ণু হাজরাই নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিগুমান ছিলেন।

মাধব মিশ্র—খান্তর মিশ্রের পুত্র। এঁর রচিত গ্রন্থ 'আলোক-দীপিকা'। এঁর অভ্যুদয়কাল পঞ্চদশ শতাব্দী। ইনি মিথিলার অধিবাসী ছিলেন।

মাধব মিশ্র—গৌরাঙ্গ লীলাসঙ্গী গদাধর পণ্ডিতের পিতা। ইনি 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলী' প্রণেতা উদয়ন আচার্যের প্রপৌত্র। মাধবের পিতামহ পশুপতি, পিতা বিলাস আচার্য। বিলাস আচার্য চট্টগ্রামরাজ চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হয়ে চট্টগ্রামের বেলেটিগ্রামে বাস করতেন। মাধব আচার্য চক্রশালার জমিদার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সখা বা বন্ধু ছিলেন। উভয়ের পত্নীর নাম ছিল রত্নাবতী। তাঁরাও পরস্পরের সখী ছিলেন। পরে মাধব নবদ্বীপে বসবাস করেন এবং মাধবেন্দ্র পুরী কর্তৃক দীক্ষিত হন। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিগুমান ছিলেন।

মাধবশূর— কাশ্মীররাজ ললিতা-দিত্যের মহাসামন্ত। দরদ্ দেশাগত পিতা কবিশূরের সঙ্গে ইনি গৌড় রাঢ় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে। রাঢ়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি বিখ্যাত আদিশূর এই মাধব শূরের পুত্র।

মাধবাচার্য—কাটোয়ার নিকটবর্তী নন্দাপুর গ্রামনিবাসী বিশ্বেশ্বর আচার্যের ঔরসে ও মহালক্ষ্মী দেবীর গর্ভে মাধবাচার্যের জন্ম হয়। মাধব পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'আচার্য' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত-শিষ্য। পরে নিত্যানন্দ নিজ কন্যা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে মাধবের বিয়ে দেন। মাধবাচার্য গদাধর দাস প্রভুর তিরোধানতিথি মহোৎসবে যোগদান করেন। ইনি গঙ্গাদেবীসহ খেতুরির মহামহোৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মাধবাচার্য 'গানবাদ্যে' যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

মাধবানন্দ (দ্বিজ)—আমুলিয়া গ্রামনিবাসী দ্বিজ মাধবানন্দ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে "দণ্ডী কাব্য" রচনা করেন।

মাধবী দাসী বা **মাধুরী দেবী**—চৈতন্য মহাপ্রভুর উড়িয়া ভক্ত শিখি মাহিতীর ভগিনী—'বৃদ্ধা তপস্বিনী', মহা 'সাধ্বী ধর্মরতা' বৈষ্ণব-রমণী। এঁর অপর ভ্রাতা মুরারি মাহিতীও চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার সার্ধ তিনজন পাত্রের মধ্যে শিখি মাহিতী একজন এবং মাধবী বা মাধুরী ছিলেন অর্ধজন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'

থেকে জানা যায় যে শিখি, মাধবী ও মুরারি নীলাচলে তিনভ্রাতা বলে অভিহিত হতেন। খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্যের অন্যতম মুখ্য ভক্ত জগদানন্দের (পণ্ডিত ঠাকুর নামে খ্যাত) শিষ্যা ছিলেন এই মাধবী দাসী। কোন কোন পুঁথিতে 'মাধুরী দাস' ভণিতা দেখা যায়। মহাপ্রভুর নীলাচল বসবাসকালে শিখি-ভগিনী এই মাধবী মহাপ্রভুর প্রতি অসামান্য ভক্তিমতী ছিলেন। মহাপ্রভুর অন্যতম সহচর ছোট হরিদাস মাধবী দাসীর নিকট সামান্য ভিক্ষা চাওয়ার জন্য তিনি মহাপ্রভু কর্তৃক তিরস্কৃত ও তাঁর সম্মুখ থেকে বহিষ্কৃত হন। জানা যায় "মাধবী তপস্বিনী, কবিতাকামিনী, সুপণ্ডিতা ও পদরচনাকর্ত্রী ছিলেন।" মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে নিয়ে যখন যা-কিছু লীলা করতেন, মাধবী তা চাক্ষুষ দর্শন করে উড়িয়া ও বাংলা ভাষায় পদ রচনা করতেন। মাধবীদাস ভণিতায় কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরও মাধবী কিছুদিন জীবিতা ছিলেন।

মাধবীলতা—এঁর 'সুবচনীর পাঁচালী' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের রচনা। এঁর নিবাস দক্ষিণ রাঢ়াঞ্চলে। ভণিতার নিদর্শন,

"সুবচনী-পাদপদ্ম করিয়া সেবন,
রচিল মাধবীলতা অপূর্ব কথন।"

মাধবেন্দ্র পুরী—সম্ভবত জাতিতে ব্রাহ্মণ। 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' তাঁকে শিখাসূত্রত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে অভিহিত করা হয়েছে। 'ভক্তিরত্নাকর' মতে মাধ্বসম্প্রদায় লক্ষ্মীপতি ছিলেন মাধবেন্দ্রের গুরু। মাধবেন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমময়তনু। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে ইনি নানা তীর্থ পরিক্রমা করে বেড়াতেন। কোন কোন গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে তাঁর এই পরিভ্রমণ-কালে অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং ইনি তাঁকে ভক্তিধর্মে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থ পর্যটনকালে মথুরায় এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে উঠেন। সনৌড়িয়া-ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আহার অবিধেয় সত্ত্বেও জাতিভেদ প্রথায় অবিশ্বাসী মাধবেন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভক্তিমান বৈষ্ণব জেনে বিনা দ্বিধায় তাঁকে মন্ত্রদান করে তাঁর বাড়ীতে আহার গ্রহণ করেন। মাধবেন্দ্রের এই আচরণের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বৈষ্ণবসমাজের জাতিভেদ অমান্যের আদর্শ নিহিত ছিল। মথুরা-বাসকালে মাধবেন্দ্রপুরী একদিন গিরিগোবর্ধনে গোপালবিগ্রহ আবিষ্কার করেন এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজবাসী প্রায় সকল ব্রাহ্মণই এঁর নিকট দীক্ষালাভ করেন। কিছুদিন পরে গৌড়দেশ থেকে দু'জন ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হলে মাধবেন্দ্র তাঁদের উপর বিগ্রহ সেবার ভার দিয়ে গোপাল সেবার জন্য মলয়জ-চন্দন আনতে ইনি নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন। ইনি

নাকি শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুকে দীক্ষা-দান করে রেমুণা গমন করেন। নীলাচলে পৌঁছে মাধবেন্দ্র রাজপাত্রের সাহায্যে প্রচুর চন্দন সংগ্রহ করেন। এক ব্রাহ্মণ-সেবক চন্দন নিয়ে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেন। কিন্তু রেমুণা পর্যন্ত গিয়ে তাঁর আবযাওয়াহয়নি। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' থেকে জানা যায় মাধবেন্দ্র একবার গৌড়দেশে এসে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে উঠেন। ইহা গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্বে। পরেও নাকি আর একবার ইনি নবদ্বীপে এসেছিলেন। ঈশ্বর পুরী, রাঘবেন্দ্র পুরী, মাধব মিশ্র, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, পরমানন্দ প্রভৃতি এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁদেরই সাহায্যে ইনি ভারতে প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তার ফলে বৈষ্ণব ধর্মের গোড়াপত্তন হয়, বিরাট পুরুষ গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব সম্ভব হয়ে উঠে। মহাপ্রযাণের সময় কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য মাধবেন্দ্রেব ব্যাকুল আর্তনাদ দেখা যায়। জানা যায় রেমুণাতেই মাধবেন্দ্র পুরী দেহরক্ষা করেছিলেন। এঁর অবস্থিতি-কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী।

মা ধু রী জি—রূপগোস্বামীর শিষ্য। এঁর রচিত 'মাধুরীবাণী' বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অতি উজ্জ্বল রত্ন। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

মা ধো—এক জন পদকর্তা। 'মাধো' ভণিতায় চারটি পদ 'পদকল্প-তরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণীর সংকলক জগবন্ধু ভদ্র এঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মাধো একজন নীলাচলবাসী কবি, শ্যামানন্দের প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য। 'মাধো' ভণিতার পদ চারটির ভাষা বাংলার ব্রজবুলী নয়, ইহা ব্রজ-মণ্ডলের প্রচলিত "ব্রজ-ভাষা"; মাধো যে ঐ অঞ্চলের লোক, তা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয়। হিন্দুস্থানের বিশেষত্ব অনুযায়ী 'মাধো' 'মাধব' নামেরই অপভ্রংশ হতে পারে।

মা ন সিং হ (রাজা)—রাজ-পুতানার অম্বর-রাজবংশজাত। ইনি আকবর বাদশাহের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হযেছিলেন। ইনি বিশেষ যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। বাংলার শাসন-কর্তারা বিদ্রোহী হযে উঠলে তাদেব দমন করা যখন মোগলদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে, তখন সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমনেব জন্য প্রতিনিধি ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করে পাঠান (১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)। আকবর বাদসাহের বঙ্গদেশীয় সেনাপতি সুবেদার হযে রাজা মানসিংহ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি বাংলার বিদ্রোহী পাঠান ও অন্যান্য রাজন্যবর্গকে বশীভূত করেছিলেন।

মানো এল্‌-দ্য-আসৃম্পশ্‌ সাম—পর্তুগীজ পাদ্রী। এদেশে রোমান-ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে

আসেন। পূর্ববঙ্গের ভাওয়ালে অবস্থান করে মানোএল্ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' নামক একখানি বাংলা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এতে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মের কথা বাংলা গদ্যে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন। এই গ্রন্থখানি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত হয় বাংলা হরফের পরিবর্তে রোমান হরফে। ইহাই বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

জানা যায় মানো এল্ পর্তুগাল থেকে একেবারে বাংলাদেশে এসে-ছিলেন। ইনি অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন এবং বাংলা দেশে সিদ্ধা নিকোলাস-দে-তোলেন্তিনোর নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচার কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল নগরে অবস্থিত অগস্তীনীয় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে এঁর নাম পাওয়া যায়। ১৭৩৪-১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ এই দুই তারিখের পূর্বের ও পরের আর কোনও সংবাদ এঁর সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। মানোএল্ রচিত অন্য গ্রন্থ হচ্ছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সমেত বাংলা পর্তুগীজ এবং পোর্তুগীজ ও বাংলা শব্দ-সংগ্রহ। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পাণ্ডুলিপি পোর্তুগালে লিস্বন শহরের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। পাদ্রি মানোএল্-এর অভিধান বা শব্দ-সংগ্রহের একখানি পুঁথি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আছে, অন্যখানি আছে লিস্বনের জাতীয় গ্রন্থশালায়। তাছাড়া, পোর্তুগালের এভোরা নগরীর প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহে পাদ্রি মানোএল্-এর দুখানি গ্রন্থের কিয়দংশ করে হস্তলিখিত পুঁথির আকারে পাওয়া যাচ্ছে।

মালাধর বসু—বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগে অনুবাদের দ্বারা যাঁরা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছিলেন, মালাধর বসু তাঁদের অন্যতম। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শ্রীমদ্ভা-গবতের বঙ্গানুবাদ। এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোকনিস্তারিতে কবি
পাঁচালী রচিয়া॥"
"ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি
লৌকিকের মতে॥"

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কোন কোন প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথিতে 'গোবিন্দবিজয় বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। গৌ ড়ে শ্ব র সুলতান রুকনু-দ্-দীন বারবক্ শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) কবি মা লা ধ র বসুকে 'গুণরাজ-খান' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কবির কাব্যমধ্যে গ্রন্থ রচনার কালের উল্লেখ আছে :

"তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন॥"

অর্থাৎ কাব্যরচনা আরম্ভ হয় ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৪৮০

খ্রীষ্টাব্দে। এই হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'ই বাংলা সাহিত্যের সন-তারিখযুক্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ।

কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে কুলীনগ্রামে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ বসু এবং মাতা ইন্দুমতী। শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রী:) মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' পাঠে ও কীর্তনে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করতেন।

মালিনী দেবী—নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিতের সহধর্মিণী। গৌরাঙ্গ আবির্ভাবকালে প্রতিবাসিনী হিসাবে নবজাতকের জন্য মঙ্গলকার্যাদি ইনি সম্পাদন করেছিলেন। মালিনীদেবী গৌরাঙ্গদেবের স্তন্যদাত্রী মাতার স্থানও অধিকার করেছিলেন। মহাপ্রভুকে ইনি সন্তান জ্ঞানে স্নেহ করতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে মালিনী দেবী দু একবার নীলাচল গিয়েছিলেন। নবদ্বীপের মতো সেখানেও ইনি মহাপ্রভুকে বার বার নিমন্ত্রণ করে এবং তাঁর প্রিয় ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিয়ে বাৎসল্যভাবে তাঁর সেবা করতেন।

মার্শম্যান, জন ক্লার্ক—১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগষ্ট ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রডমিডে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জোশুয়া মার্শম্যান এবং মাতা হানা। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতামাতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। পিতা মার্শম্যান, উইলিয়ম-কেরী, ফেলিক্স কেরী এবং উইলিয়ম ওয়ার্ডের সংস্পর্শে থেকে জন শ্রীরামপুরে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুরোপুরি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মিশনের ভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে বিচিত্র কর্মময় জীবন যাপন করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের পরিচালন ও আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন ও পরিচালনা করেন।

তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাছাড়া, ইংরেজী ও বাংলায় সরকারী আইন সঙ্কলন করেছিলেন। কেরীর পরে তিনিই সরকারের বাংলা অনুবাদকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার মতো তিনিও চীনাভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। উইলিয়ম কেরীর মতো তাঁকেও বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বলা চলে। ইনি এদেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এবং কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রবল সমর্থক ছিলেন। ভারতবর্ষীয়দের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে

তোলাই শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি পরবর্তী জীবনে বারংবার ঘোষণা করেছিলেন—"ভারতকে খ্রীষ্টধর্ম দেওয়ার পূর্বে জ্ঞানদান করিতে হইবে।" আমৃত্যু তিনি এজন্য প্রাণপাত করে গিয়েছেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে সর্বদা একজন ভারতীয় বলেই জ্ঞান করতেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থ: বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগ। বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাস, দুই খণ্ড। পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। দারোগাদের কর্মপ্রদর্শক গ্রন্থ সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস। জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়। দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ। ব্যবস্থাবিধান ইত্যাদি।

A Dictionary of the Bengalee Language. Vol. I, Bengalee and English. Vol. II, English and Bengalee.

The Life and Times of Carey, Marshman and Ward.

তাছাড়া, তিনি দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, গভর্নমেণ্ট গেজেট প্রভৃতি পত্র পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

মার্শম্যান, জোশুয়া—১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল উইলটশায়ারের ওয়েষ্টবেরিলেতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জন মার্শম্যান তন্তুবায়ের কাজ করতেন। জোশুয়া বাল্যকালে ইতিহাস ও বীর জীবনী পড়তে ভালবাসতেন। তাঁর অবিশ্বাস্য পুস্তক-প্রীতি ছিল। তিনিও প্রথম জীবনে তাঁতবোনার কাজ করতেন। পরে ধর্মজীবনের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশনারীরূপে ভারতে আসেন। শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই তিনি সস্ত্রীক শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং উক্ত পত্রিকায় রামমোহন রায়ের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মার্শাল, জে—মুর্শিদাবাদজেলার কাশিমবাজারের কুঠীতে এই ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন ও শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ করেন।

মা হুয়ান—একজন চৈনিক পরিব্রাজক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মা হুয়ান বাংলাদেশে এসে এদেশের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এদেশের বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন।

মিত্তন্‌লাল—বাঙালী হিন্দু। ইনি সিরাজের পিতৃব্য পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গের শরীররক্ষী সৈন্য-দলের অধিনায়ক ছিলেন।

মিন্‌হাজ উদ্দীন—১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। সুলতান ইয়ালতিমিসের এবং তাঁর বংশধরগণের রাজত্বকালে ইনি প্রথমে গোয়ালিয়রের এবং পরে দিল্লীর প্রধান কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান কাজির পদ ত্যাগ করে মিন্‌হাজ উদ্দীন বাংলায় আসেন এবং এখানে দু'বছর অবস্থান করে দিল্লী ফিরে যান। এই সময় মিন্‌হাজ বাংলার ও বিহারের তৎকালীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এঁর ইতিহাস থেকে বাংলার তৎকালীন অবস্থা কিছুটা জানা যায় যদিও তা অতিরঞ্জিত। তার রচিত গ্রন্থ "তবকৎ-ই-নাসিরী-ই" থেকে বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কাহিনী পাওয়া যায়। ঘটনার বহু বছর পরে এঁরই স্বধর্মাবলম্বী দুজন সৈনিক, যারা উক্ত যুদ্ধে যোগদান করেছিল, তাদের মুখে শোনা কাহিনীর উপর নির্ভর করে ইনি মুসলমানদের বঙ্গবিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

মিলার, জন—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির ইংরেজ সিভিলিয়ান। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইনি বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে একখানি ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনা করেছিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর The Tutor বা 'শিক্ষাগুরু' নামক পুস্তক তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

মীরজাফর—বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে মীরজাফর একটি চিরকলঙ্কিত নাম। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে সিরাজের পরাজয় ঘটিয়ে মীরজাফর বাংলা তথা ভারতের পরাধীনতার কারণ হয়েছিলেন। কোন ব্যক্তি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকামূলক কাজ করে দেশদ্রোহী হলে তাকে 'মীরজাফর' এই ঘৃণিত আখ্যায় অভিহিত করা হয়। মীরজাফর নাম দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক।

ইনি ইতিহাসে মহম্মদের বংশধর বলে পরিচিত। ইনি প্রথমে বাংলার নবাব আলীবর্দীর গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। উচ্চ বংশীয় মুসলমান সন্তান বলে আলীবর্দী নিজের বৈমাত্রেয় ভগ্নী শাখানামের সঙ্গে মীরজাফরের বিবাহ দিয়েছিলেন। তার গর্ভেই মীরনের ও ফতেমা বেগমের জন্ম হয়। মীরজাফরের কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে আলীবর্দী এঁকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। মারাঠা যুদ্ধে নিজ বিক্রম প্রকাশ করে ইনি যথেষ্ট সুখ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু পরে আতাউল্লার সঙ্গে মন্ত্রণা করে বঙ্গরাজ্যের অংশ লাভ করার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় আলীবর্দী এঁকে পদচ্যুত করেন এবং শেষে নওয়াজেস মহম্মদের অনুরোধে ক্ষমা করে পুনরায় সেনাপতির পদ প্রদান করেন। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর (১৭৫৬ খ্রীঃ) সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হলে মীরজাফর ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর ইংরেজ মহলে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। সুচতুর ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ক্লাইবের সঙ্গে এঁর চুক্তি হয় যে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করলে ক্লাইব এঁকে বাংলার নবাব হতে সাহায্য করবেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধের অভিনয়ে সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইংরেজের মুষ্টিমেয় সৈন্যের সামনে মীরজাফর অসংখ্য সৈন্য, কামান ও গোলাবারুদ নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। যুদ্ধে ইংরেজের জয় ও সিরাজের পরাজয় হল (২৪ জুন, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ২৯ জুন ক্লাইব এঁকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবরূপে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসালেন। প্রথমে মীরজাফর জাফ্রাগঞ্জের প্রাসাদেই অবস্থান করতেন। নবাব হয়ে ইনি সিরাজের হীরাঝিলের প্রাসাদে বাস করতে থাকেন এবং পুত্র মীরনকে স্বীয় আবাস-ভবন প্রদান করেন। শীঘ্রই রাজ্যের চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের প্রবল বাতাস বইতে আরম্ভ করল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন মোগল সম্রাটের পুত্র আলীগহর (পরে সাহআলম) পাটনা আক্রমণ করলেন। ক্লাইবের সৈন্যরা মীরজাফরের সহায় হওয়ায় আলীগহর পাটনা পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। ইংরেজের কৃপায় বিপদ থেকে মুক্তি-লাভ করে মীরজাফর চব্বিশ পরগণার জমিদারীর বিনিময়ে যে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব পেতেন তা ইংরেজ কোম্পানীকে জায়গীরস্বরূপ দান করেন। ইনি এঁর শাসন সময়ের চতুর্থ বছরে ইংরেজ কোম্পানীকে কলকাতায় টাকশাল স্থাপনের পরওয়ানা প্রদান করেন। মীরজাফরের পুত্র মীরন দেশবাসীর উপর মহা অত্যাচার আরম্ভ করলে চতুর্দিকে অশান্তির উদয় এবং সুযোগ বুঝে আবার আলীগহর বিহার আক্রমণ করলেন। ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে মীরন যুদ্ধযাত্রা করে আলীগহরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। শিবিরে অবস্থানকালে একদিন সহসা বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হলে মীরজাফর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। রাজ্যে আবার অশান্তি দেখা দেয়। তখন ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে মীরকাশিমের সহকারী নবাবরূপে কায করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু মীরজাফর তাতে অসম্মত হওয়ায় এঁকে জোর করে সরিয়ে এঁর জামাতা মীরকাশিমকে নবাবী পদ প্রদান করেন (১৭৬০ খ্রীঃ) এবং মীরজাফর অবশেষে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করেন। মীরকাশিমের পদচ্যুতির পর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুলাই মীরজাফর পুনরায় মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে ইনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি

৭৪ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুকালে মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শানুসারে মীরজাফর কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত আনিয়ে পান করেছিলেন।

মীননাথ—একজন নাথ-সিদ্ধাচার্য। এঁর রচিত কতকগুলি বাংলা চর্যাপদ পাওয়া গেছে। মীননাথের রচনার ভাষা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। গোরক্ষনাথ ও জালন্ধারিপাদ এঁর গুরু ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দী।

মীনপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য। এঁর গুরু ছিলেন কুক্কুরীপাদ। ইনি দেবপালের সমসাময়িক অর্থাৎ নবম শতাব্দীর শেষার্ধে অবস্থিত ছিলেন। প্রাচীন বাংলা ভাষায় ইনি কয়েকটি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন।

মীরকাশীম—গুজরাটের সুবাদার সৈয়দ ইম্‌তিয়াজের পৌত্র এবং মীরজাফরের জামাতা। মীরজাফরের কন্যা ফতেমা বেগমের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়েছিল।

ইংরেজের হাতের ক্রীড়নক নবাব মীরজাফরকে নানা কারণে অপসারিত করে ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশীমকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসান। মীরকাশীম কার্যদক্ষ, বুদ্ধিমান, তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতির নবাব ছিলেন। মীরজাফরের মতো ইনি ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে থাকা পছন্দ করতেন না। ইনি নবাব হয়েই ইংরেজদের দাবীর টাকা পরিশোধ করেছিলেন। ইনি রাজ্যের উন্নতিকল্পে এবং অধিক অর্থ সংগ্রহের জন্য কতকগুলি বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ, ধনশালী নগরবাসীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং জমিদারদের নিকট থেকে প্রচুর নজরানা আদায় করতে শুরু করেন। এইভাবে অর্থ আদায় করে সৈন্যদের বেতন দেনা পরিশোধ করেছিলেন। সম্রাট সাহ আলমের কর্মচারীদের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণার সন্দেহে ইনি মহারাজ নন্দকুমারকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। এঁর সময় সম্রাট আলমগীরের পুত্র আলীগহর (সাহ-আলম) পাটনা অধিকারের জন্য সচেষ্ট হলে ইনি বিহার গিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। ইনি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন এবং মুঙ্গের দুর্গ সুদৃঢ় করে তথায় বাস করতে থাকেন। মীরকাশীম ইংরেজদের অনুকরণে এঁর সৈন্যগণকে সমরু নামক এক ইংরেজ ও গার্গিন ও আর্থারাদি কয়েকজন আর্মেনীয়ের দ্বারা শিক্ষিত করতে আরম্ভ করেন। ইনি মুঙ্গের দুর্গে উৎকৃষ্ট বন্দুক, কামান, গোলা, গুলি প্রভৃতি প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করেছিলেন। বাণিজ্য শুল্ক ও আরও দু-একটি বিষয় নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে এঁর মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। মীরকাশীম ইংরেজানুগত জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় (মহাতাপ রায় ও স্বরূপ চাঁদ), রাজা রাজবল্লভ, রামনারায়ণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ হিন্দুগণকে বন্দী

করে মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই ইংরেজরা মীরকাশীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং এঁকে রাজ্যচ্যুত করে রাজ্যচ্যুত মীরজাফরকে পুনরায় রাজ্য প্রদান করেন। রাজ্যচ্যুত হয়ে মীরকাশীম প্রথমে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও পরে সাহ আলমের আশ্রম প্রার্থী হন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের নিকট ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশীমের পুনরায় যুদ্ধ হয়। কিন্তু শেষে ইনি পরাজিত হন। চরম দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মধ্যে মীরকাশীমের দিল্লীর উপকণ্ঠে মৃত্যু ঘটে।

মীরজুমলা—পারস্যবাসী। রত্ন-ব্যবসায়ী হিসাবে দক্ষিণ ভারতে গোলকুণ্ডায় উপস্থিত হন। কালক্রমে গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। পরে অবস্থার বিপাকে ইনি দিল্লীশ্বর সাজাহানকে বহু ধনরত্ন উপহার দিয়ে তাঁর আশ্রয় লাভ করেন। কথিত আছে সাজাহান মীরজুলমার কাছ থেকেই পৃথিবী-বিখ্যাত কোহিনূর লাভ করেছিলেন। সাজাহান প্রীত হয়ে এঁকে মোয়াজ্জিম খাঁ উপাধি প্রদান করে উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ করেন। দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে মীরজুমলা আরাঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বিদ্রোহী সুজাকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করে মীরজুমলাই বাংলার নবাব হয়ে বসে- ছিলেন (১৬৬১ খ্রীঃ)। এঁর নবাবী আমলের প্রধান ঘটনা—কুচবিহার ও আসামকে বশীভূত করা। কুচবিহার অধিকার করার পর নাম পরিবর্তন করে আলমগীর নগর নাম রেখেছিলেন এবং আলমগীরের নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। আসামকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে ফিরে আসার পথেই ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার অনতিদূরে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে এঁর মৃত্যু হয়। প্রায় পাঁচ বছর ইনি বাংলার শাসন-কর্তা ছিলেন।

মীরণ—মীরজাফরের পুত্র। ইনি বড়ই দুর্বৃত্ত ও নিষ্ঠুর ছিলেন। এঁরই আদেশে পিশাচ মহম্মদী বেগ সিরাজকে তীক্ষ্ণ তরবারি আঘাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করে। এঁর অত্যাচার ও পাশব চরিত্র বৃদ্ধ পিতার উপরেও কলঙ্ক নিক্ষেপ করেছে। আলীবর্দীর দুই কন্যাকে নৃশংস হত্যা তাঁর জীবনের প্রধান কলঙ্ক। মীরন নবাব মীরজাফরের কার্যের ভার কিয়দংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরণের সাহস ও যোগ্যতা লক্ষিত হত। ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজগণের প্রদর্শিত নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বন করে মীরণ আপন পথ নিষ্কণ্টক করবার উদ্যম করে-ছিলেন। গৃহশত্রু নির্মূল করে ভবিষ্যতে শক্তিশালী ইংরেজের বন্ধুত্বশৃঙ্খল উন্মোচন করার অভিপ্রায়ও এঁর ছিল। বজ্রাঘাতে এঁর মৃত্যু হয়।

মীরমদন—ঢাকায় হোসেনকুলী

খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাসানউদ্দীনের পার্শ্বচর। পরে মুর্শিদাবাদে এসে সিরাজউদ্দৌলার বিশেষ অনুগত হন। মীরজাফর খাঁ বহুদিন থেকেই দেওয়ান্-ই-অন্ অর্থাৎ সৈন্য পরিসংখ্যার প্রধান সদস্য ছিলেন। তাঁকে কেবল নামে মীর বক্সী (প্রধান সেনাপতি) রেখে উক্ত পদে মীরমদনকে সিরাজ নিয়োজিত করেন।

মীর মোহাম্মদ সফীর—সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। এঁর রচিত কাব্য 'নূরনামা'।

মীর হবীব্—পারসীক মুসলমান যুবক। ইনি প্রথমতঃ হুগলীতে সামান্য রকমের ব্যবসা করতেন। বর্ণজ্ঞান না থাকলেও ইনি পারসী ভাষায় সুন্দর কথা কইতে পারতেন। এঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। নবাব সুজাউদ্দীনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খাঁ যখন নায়েব নাজিম হয়ে ঢাকায় যান, তখন মীর হবীব্ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ইনি পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ সময়ে (বর্গীর হাঙ্গামা) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। নানা বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করে ও কয়েক প্রকার দ্রব্যের ব্যবসায় একচেটিয়া রেখে ইনি প্রভুর যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। মীরহবীব্ জালালপুরের জমিদার নুরউল্লাকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক নিহত করে তাঁর সম্পত্তি হরণ করলেন। এই সময় ত্রিপুরার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র জগৎরাম নির্বাসিত হয়ে ঢাকায় অবস্থিতি করছিলেন। মীরহবীব্ এঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এঁকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরা জয় করেন। মীর হবীবের ত্রিপুরা জয়ে নবাব সুজাউদ্দীন অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে তাঁকে খাঁ উপাধি প্রদান করেন এবং খেলাত দেন।

মুকুট রায়—বাংলার পাঠান নবাব সিকন্দর সাহের (১৩৫৯-১৩৯০ খ্রীঃ) আমলে মুকুট রায় নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ জমিদারের আবির্ভাব হয়। এঁর জমিদারীর এলাকা ছিল এখনকার পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, নদীয়া, খুলনা ও বর্ধমান জেলা। বর্ধমান জেলার জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণার পুরধূল বা পুর্বস্থলীতে এঁর রাজধানী ছিল। ১৩৩৮-১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। শুনা যায় ইনি বৈদিক, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থেকে তিনটি পত্নী গ্রহণ করেছিলেন। ইনি বীরপুরুষ ছিলেন। সে সময় পাঠানরা এদেশের লোককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য বড় দৌরাত্ম্য করত। তাঁদের দৌরাত্ম্যে বাধা দিতে গিয়ে মুকুট রায় মারা যান। ইনি সমসাময়িক দিল্লীর পাঠান বাদশাহের নিকট পাঞ্জা লাভ করে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী সমস্ত বিভাগের জমিদারী লাভ করে-ছিলেন।

মুকুটরাম রায়—গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী (ক্রোরীয়ন) দ্রং।

মুকুন্দ—হোসেন শাহের (১৪৯৩-

১৫১৯ খ্রীঃ) চিকিৎসক। এঁর পিতা নারায়ণ দাস রুকুনুদ্দীন বারবক শাহের চিকিৎসক ছিলেন। মুকুন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। এঁর অনুজ নরহরি ও পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ষদদের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁর পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেতা ও গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুকুন্দদের বাড়ী ছিল শ্রীখণ্ডে। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৫শ অধ্যায়ে লেখা আছে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নীলাচলে বসে মুকুন্দের সামনে তাঁর প্রেমভক্তির পরিচয় অপর ভক্তদের কাছে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে "ম্লেচ্ছ রাজা" অর্থাৎ হোসেন শাহেরও উল্লেখ আছে।

মুকুন্দ বা **হাড় ওঝা**—গৌরাঙ্গ-লীলাসহচর নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা। এঁর পিতার নাম সুন্দরমল্ল বা নকড়ি ভাদুড়ী। এঁরা ছিলেন বীরভূম জেলার একচক্রা বা একচাকা খলকপুর গ্রামের অধিবাসী। সুন্দরমল্লের কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা যান। অবশেষে মুকুন্দ ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতা তাঁকে হরপার্বতীর নামে সমর্পণ করে তাঁর নাম রাখেন হাড়। মুকুন্দের পত্নীর নাম পদ্মাবতী। হাড় ওঝা নানাবিধ শাস্ত্রপাঠ করে হাড়াই পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হন। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

মুকুন্দ কবিচন্দ্র—একজন বাঙালী কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'বাসুলী-মঙ্গল'। কবি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। কাব্যমধ্যে কবির প্রদত্ত আত্ম পরিচয় থেকে জানা যায় এঁর পিতামহের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতার নাম বিকর্তন মিশ্র, মাতার নাম হারাবতী, সহোদর ভ্রাতার নাম গদাধর মিশ্র ও তিনপুত্রের নাম রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। পুঁথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুঁথি-খানি বর্ধমান জেলার মণ্ডলঘাট পরগণার আমুরিয়া গ্রামে অনুলিখিত হয়। অনেকের অনুমান কবি হয়তো এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। পুঁথিখানি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত। কোন কোন মতে পুঁথিটির রচনাকাল ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। মুকুন্দ কবিচন্দ্রের ভাষা সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত। এঁর উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর যথেষ্ট প্রভাব আছে।

মুকুন্দ দত্ত—একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এঁর বিশেষ অধিকার ছিল। ইনি একজন সুচিকিৎসক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বাংলার তৎকালীন নবাব হুসেন খাঁর ইনি রাজচিকিৎসক ছিলেন।

মুকুন্দ দত্ত—অম্বষ্ঠ-কুলজাত চট্টগ্রামের অধিবাসী। বাসুদেব ছিলেন এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ছিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর বিশেষ ভক্ত।

নবদ্বীপে এঁদের বাড়ীতে যে একটি বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল বাল্যকালে নিমাই সেখানে গিয়ে পড়ুয়াদের ফাঁকি জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। মুকুন্দরাও নিমাইর গৃহে যাতায়াত করতেন এবং চন্দ্রশেখর বা শ্রীবাসের গৃহে কীর্তনকালে উপস্থিত থাকতেন। নিমাইর নবদ্বীপ লীলার অন্যান্য স্থানেও মুকুন্দকে দেখতে পাওয়া যেত। গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বার বিবাহকালে বুদ্ধিমন্ত খানের সঙ্গে মুকুন্দ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মুকুন্দ দত্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবাল্য সঙ্গী এবং তাঁর প্রবর্তিত সংকীর্তনই ছিল এঁর সাধন-ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। ইনি গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় ইনি নিমাইর নিকট পরাজিত হতেন। মুকুন্দ ছিলেন সুগায়ক, যথার্থ মরমী ও ভাবুক। এঁর গান শুনে সবাই মুগ্ধ হতেন। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এসে এঁর গান শুনে ভাববিহ্বল হন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও এঁর গান শুনে কেঁদে ফেলতেন। শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখরের গৃহে যে সংকীর্তন ও নৃত্য হত তাতে মুকুন্দ ছিলেন মুখ্য গায়ক। চন্দ্রশেখরের গৃহে ভক্তবৃন্দদের নিয়ে গৌরচন্দ্র যে কৃষ্ণলীলা নাটক অভিনয় করেন সেই উপলক্ষে মুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ করেছিলেন। গৌরাঙ্গ জীবনের এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই যার সঙ্গে মুকুন্দ দত্ত যুক্ত ছিলেন না। গৌরাঙ্গ প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দিনেও মুকুন্দ উপস্থিত থেকে সর্বকার্য সমাধা করেছিলেন। এবং তাঁর দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে সংকীর্তন করেন। মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রার সঙ্গী ছিলেন এই মুকুন্দ। কীর্তন দ্বারা ইনি তাঁকে বিমোহিত করতেন। দেবকীনন্দন মুকুন্দ সম্বন্ধে বলেছেন, "গন্ধর্ব জিনিঞা যার গানের মহত্ব।" মহাপ্রভুর গৌড়-যাত্রাকালেও মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

মুকুন্দ দাস—পাঞ্চাল দেশীয় ব্রাহ্মণ। নাহুর নিকট মুলতান নামক গ্রামে এঁর নিবাস ছিল। এক বার মুকুন্দ নৌকা সাজিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন। পথে ঝড়ে পড়ে নৌকা ব্রজমণ্ডলে গিয়ে হাজির হল। তখন নৌকা ভিড়িয়ে মুকুন্দ মদনমোহন ও গোপীনাথ বিগ্রহাদি দর্শন করেন এবং গোবিন্দমূর্তি দেখে তাঁর ভাবের উদয় হয়। এবং ইনি বৃন্দাবনে অবস্থান-কারী কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও নৌকার দ্রব্যসামগ্রী বিলিয়ে দিয়ে সঙ্গীদের বিদায় দেন। তারপর ইনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে নানা ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি কবিরাজ গোস্বামীর অতি প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

মুকুন্দ দাস—মুকুন্দ দাস, অথবা মুকুন্দদেব বা মুকুন্দরাম দাস ইত্যাদি ভণিতায় অনেক নোংরা ধরনের বৈষ্ণব তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনার হদিস পাওয়া যায়। কেউ কেউ মুকুন্দদাসকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলে সিদ্ধান্ত করে থাকেন। মুকুন্দদাস ভণিতায় নিম্নলিখিত নিবন্ধগুলি পাওয়া যায় যথা, 'অমৃতরত্নাবলী,' 'আত্মসারাৎ-সারকারিকা,' 'আনন্দলহরী,' 'রস-সমুদ্র', 'রসসাগরতত্ত্ব', 'রাগরত্নাবলী', 'রাধারসকারিকা,' 'সাধনোপায়' ইত্যাদি। মুকুন্দদেব (দাস)-এর ভণিতা পাওয়া যায় 'লবঙ্গ চরিত্র'-এ এবং 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়'-এ। সহজ-পন্থী মুকুন্দদাস বোধ হয় "সাঁই" সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বলরাম দাসের 'সারাবলী' থেকে জানা যায় যে 'অমৃতরসাবলী' রচয়িতা মথুরাদাস এই মুকুন্দদাসেরই শিষ্য ছিলেন। মুকুন্দদাস ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

মুকুন্দ দ্বিজ—দ্বিজ মুকুন্দ বা মুকুন্দ ভারতীর রচিত গ্রন্থের নাম 'জগন্নাথ বিজয়'। ইহা অষ্টাদশ শতকের রচনা।

মুকুন্দ সেন—প্রসিদ্ধ আয়ু-র্বেদাচার্য। বাংলার প্রখ্যাত সুলতান হুসেন শাহের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—মঙ্গল-কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খুব সম্ভব ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দরামের জন্ম হয়। কাব্যের প্রারম্ভে বর্ণিত আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায় মুকুন্দরামের পিতামহ ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র, পিতা ছিলেন হৃদয় মিশ্র, মাতা দৈবকী। কবীন্দ্র নামে কবির এক অগ্রজ ছিলেন। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও জামাতার নাম যথাক্রমে শিবরাম, চিত্রলেখা, যশোদা ও মহেশ। বাংলার সুবাদার মানসিংহের কালে ডিহিদার মামুদসরিপ-এর অত্যাচারে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অনেকেই বাস্তুত্যাগ করে অন্য নিরাপদ স্থানে চলে যায়। ব্রাহ্মণ মুকুন্দরামও করভারে প্রপীড়িত হয়ে অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বগ্রাম ত্যাগ করে সপরিবারে নিঃসম্বল অবস্থায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। পথে অনেক দুঃখকষ্ট ও বিপদ অতিক্রম করে কবি অবশেষে কুচট্যা নগরে উপনীত হন। কবি লিখেছেন:

"তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান,
করিনু উদক পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে
নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥"

ঐ স্থানে ঐ অবস্থায় পথশ্রমে ও ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে যখন কবি বৃক্ষতলে

নিদ্রামগ্ন, তখন দেবী চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার নির্দেশ দিলেন। দেবীর আদেশ শিরোধার্য করে মুকুন্দরাম সপরিবারে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রমে বসতি স্থাপন করেন। কবির গুণমুগ্ধ বাঁকুড়া রায় তাঁকে নিজ পুত্র রঘুনাথের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যে বাঁকুড়া রায় ইহলোক ত্যাগ করলে রঘুনাথ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই রঘুনাথেরই সভাসদরূপে মুকুন্দরাম বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য-রচনা-কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে নানারূপ সংশয় আছে। তবে তাঁদের অনুমান—মোটামুটি ষোড়শ শতকের শেষপাদে অর্থাৎ ১৫৭৪-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুকুন্দ রামের 'চণ্ডী মঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল। মুকুন্দরামের উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কণ'।

কবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বন্দনা, সৃষ্টি-কাহিনী, শিব-সতী ও শিব-পার্বতী কাহিনী। এই অংশকে শিবায়ন বা "দেবখণ্ড" বলা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনী। তৃতীয় খণ্ডে ধনপতি-খুল্লনা কাহিনী। কাব্যখানিতে কবিকঙ্কণের অসামান্য সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর বিদ্যমান। কাব্যে সমকালীন বাংলার জাতীয় জীবনের প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। কারুর কারুর মতে বৃদ্ধ বয়সে মুকুন্দরাম দামুন্যায় ফিরে এসেছিলেন এবং তৎকালীন ডিহিদার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট জমি যায়গা দিয়ে তাঁর বসবাসের সুব্যবস্থা করে দেন। আবার কেউ কেউ অনুমান করেন কবি নিজে কখনো স্বগ্রামে আর ফিরে আসেন নি, তাঁর পুত্র শিবরাম দামুন্যায় প্রত্যাবর্তন করে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেছিলেন।

মুকুন্দরাম রায়—বাংলার বারভূঞাদের মধ্যে ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম রায় ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। মুকুন্দরাম রায় প্রথমে সামান্য জমিদার ছিলেন। পরে স্বীয় প্রতিভা, বুদ্ধিবল ও বাহুবলে রাজ্য সম্প্রসারিত করে বারভূঞার অন্যতম বিশেষ পরাক্রমশালী ভূঞারূপে আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। পরাক্রমশালী পাঠান ও মোগল সবারই সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল লড়াই করেছিলেন। মোগল-পাঠানের যুদ্ধে ফতেয়াবাদের পাঠান মোরাদ খাঁ মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তখন কতুল খাঁ মোরাদ খাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে আক্রমণ করলেন। মোরাদ মারা গেলে মুকুন্দরাম মোরাদের নাবালক পুত্রদের সহায়তা করেন। এই ব্যাপারে দিল্লীর বাদশাহর প্রতিনিধি রাজা তোড়রমল্ল মুকুন্দরামের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ফতেয়াবাদের অধিকাংশ স্থানের শাসন-কর্তৃত্ব দান-

করেন এবং তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। সায়দ খাঁ নামক একজন মোগল বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসে মুকুন্দ রায়কে পদচ্যুত করলেন। রাজা মুকুন্দ রায় এ অপমান সহ্য করার লোক ছিলেন না। তিনি অপমানের প্রতিশোধের জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফতেজঙ্গপুরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। এতে মুকুন্দরাম জয়লাভ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে ইনি পরাজিত ও নিহত হন। ফতেয়াবাদের কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মুকুন্দ রায় প্রদত্ত বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরে বহু লোক প্রতিপালিত হয়। মুকুন্দরামের ছয় পুত্রের মধ্যে শত্রুজিৎ রায় ও শিবরাম রায়ের নাম পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম প্রতিষ্ঠিত "ভূষণা সমাজ", বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর "ভূষণাপটী" এখনো তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে।

মুকুন্দ সরকার ঠাকুর—তাৎকালিক গৌড়ের বাদশাহের গৃহ-চিকিৎসক। এঁর পিতার নাম ছিল নারায়ণ। ইনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। পিতৃবিয়োগের পর মুকুন্দ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরহরিকে অধ্যয়ন করাবার জন্য নবদ্বীপে রেখে গৌড়ে গমন করেন। পরবর্তীকালে এসে নরহরি ও পরে মুকুন্দ নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করেছিলেন। মুকুন্দ ব্রজ-লীলায় "বৃন্দাদেবী" সেজেছিলেন। মুকুন্দের আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ ১৪৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দ। মুকুন্দের পুত্রের নাম মদনাবতার শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

মুক্তারাম দাস—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের লেখক। ইনি সত্যনারায়ণ পূজার ইতিহাস রচনা করেন। নিবন্ধের রচনাকাল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর নিবাস ছিল সম্ভবতঃ আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে। এঁর পিতা গঙ্গারাম, পিতামহ রাজারাম।

মুক্তারাম নাগ—'দুর্গাপুরাণ' নামক কাব্যের রচয়িতা। ইহা জগৎরামের দুর্গাপঞ্চরাত্রির মতো দুর্গার পিত্রালয় গমন—শারদীয়া পূজা বিষয়ক কাব্য। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ, সম্ভবত ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। মূল পুঁথিতে কবির আত্ম-পরিচয় পাওয়া গেছে:

"বিদ্যানন্দ নাগ আইলেন ছাড়ি
রাঢ় দেশ
ধন লইয়া বঙ্গদেশে করিলেন প্রবেশ।
শ্রীধর ব্রাহ্মণ সঙ্গে কুলপুরোহিত
বিনোদ বারই আর রূপ নাপিত।'

কাব্যের মধ্যে অনেকগুলি গান আছে। দুর্গাপুরাণের উপসংহারে মুক্তারাম 'কালীপুরাণ' কাব্য রচনা করেছিলেন।

'পদ্মাপুরাণ' নামে মুক্তারাম আরও একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুমুর-দিয়া গ্রামে ইনি বাস করতেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

মুক্তারাম সেন—চণ্ডীমঙ্গল

কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'সারদা-মঙ্গল' (১৭৪৭ খ্রীঃ)। ইহা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঞ্চালী' নামেও পরিচিত। চট্টগ্রাম দেয়াঙ্গ বা দেবগ্রাম (বর্তমানে আনোয়ারা) নামক গ্রামে কবি মুক্তারাম সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। এঁর জ্ঞাতি-বংশীয়েরা বহুকাল ঐ গ্রামে বসবাস করছেন। কবির এই বংশ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কুলীন বলে সম্মানিত। কবি-বর্ণিত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় পূর্বপুরুষ 'জাহ্নবীকুলে রাঢ়' হতে এসেছিলেন। এঁর পূর্বপুরুষ যাদব রায় ১৫৪০ শকাব্দের (১৬১৮ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসে সহোদর মাধব রায়, নিজের কুল পুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীমন্ত নামক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পূর্ব বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমণের জন্য চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রশেখরাধিষ্ঠিত স্বয়ম্ভুশিব দর্শনার্থে আগমন করেন। চন্দ্রশেখর দর্শনের পর যাদব রায় আব যশোহরে ফিরে যাননি। চট্টগ্রামেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। কবির পিতামহের নাম নিধিরাম, পিতা মধুরাম। কবির অপর দুই ভ্রাতার নাম গোবিন্দরাম ও ব্রজলাল। মুক্তারাম ছিলেন চির-কুমার ও সাধক পুরুষ। ইনি বিষয়-নিস্পৃহ হয়ে তীর্থ পর্যটন ও সাধুসঙ্গ দ্বারাই জীবন অতিবাহিত করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম হয়। এঁর কাব্যের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। মুক্তারামের কাব্যের দুটি ভাগ—প্রথম ভাগে কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের কাহিনী। উভয় কাহিনীই সংক্ষিপ্তা-কারে রচিত। এঁর রচনা সহজ ও সরল।

মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়—অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। এঁর নিবাস ছিল নবদ্বীপের উলা। রসিকতার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এঁকে বৈবাহিক সম্বোধনে আপ্যায়িত করতেন। গোপাল ভাঁড়ের ন্যায় এঁরও বহু সরস বাক্য দেশে প্রচলিত আছে।

মুজঃফর খাঁ তুর্বতি—দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহ কর্তৃক ইনি ১৫৭৯-১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়-বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। গৌড়-বঙ্গের বিদ্রোহীদের দ্বারা ইনি নিহত হয়েছিলেন।

মুন্‌শি এবাদৎ-উল্লা—এঁর রচিত গ্রন্থ 'গোলে বকাওলি'। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

মুন্‌শি বিলায়েৎ হোসেন—কলকাতাবাসী কবি। ইনি শাক্ত পদাবলী রচনা করে এবং দেবী কালিকার ভক্ত হয়ে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে 'কালীপ্রসন্ন' নামে পরিচিত

হয়েছিলেন। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

মুনিরাম মিশ্র—'সারদামঙ্গল' সরস্বতীমাহাত্ম্যমূলক কাব্য রচয়িতা। কাব্যের বিষয় বিক্রমাদিত্য-কালিদাস কাহিনী। ভণিতা থেকে জানা যায় যে রাজপুরনিবাসী বাচস্পতি ভট্টাচার্য কবিকে কাব্য রচনায় সাহায্য করে-ছিলেন। কাব্যের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ।

"মিশ্র মুনিরামকৃত দেবলীলা প্রকাশিত নানাবিধ ছন্দে বিরচিত। রাগরাগিণীর সনে যন্ত্রবাদ্যতাল মানে করিলেন দেবীর সঙ্গীত।"

মুনিরাম রায়—কার্ণ্যঘোষ-বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। পিতার নাম রামভদ্র রায়। ইনি মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে উকিল ছিলেন। রাজা সীতারাম রায় জমিদার ও পরে রাজা হলে মুনিরাম তাঁর পক্ষীয় উকিলরূপে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করতেন। তৎকালে উকিলরূপে মুনিরামের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এমন কি এঁরই নামে নবাব দরবারে সীতারামের পরিচয় হত। 'কোন্ সীতারাম' এই প্রশ্ন উঠলে 'যেস্কা উকীল মুনিরাম'—এই উত্তর দেওয়া হত। সীতারামের মতো মুনিরামও নবাব সরকার থেকে জায়গীর পেয়েছিলেন। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে।

মুন্নি বেগম—নবাব মীরজাফরের বিধবা পত্নী। ইনি প্রথমে ছিলেন নর্তকী। পরে মীরজাফর এঁকে বিয়ে করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এঁকে নবাব পরিবারের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পরে তরুণ নবাব মুবারক উদ্দৌলার অভিভাবিকা নিযুক্ত করেছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে হেস্টিংস মুন্নি বেগমের কাছে মোটা টাকা ঘুস নিয়েছেন। কিন্তু এই অভিযোগের কোন তদন্ত হয়নি এবং মুন্নিবেগম স্বপদে বহাল ছিলেন।

মুনেম খাঁ—বাংলার বিদ্রোহী পাঠান নবাব দায়ূদ খাঁকে দমন করার জন্য মোগল সম্রাট আকবর সেনাপতি মুনেম খাঁকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেছিলেন। মুনেম খাঁর উপস্থিতিতে দায়ূদ পরাজিত হয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহার বাদশাহের হস্তগত হয়। তখন মুনেম খাঁ গৌড়ের রাজধানীতেই অবস্থান করে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। এই সময় গৌড়ে ভীষণ মহামারী দেখা দেয় এবং বহু লোক মারা যায়। মুনেম খাঁও ঐ সময় গতায়ু হন।

মুরলীধর দাস—এঁর রচিত কাব্য 'সুবচনীর পাঁচালী'। সাধারণতঃ বিবাহের পর নববধূ শ্বশুর বাড়িতে পদার্পণের পর পশ্চিমবঙ্গে এই উপলক্ষে সুবচনী দেবীর পূজা ও ব্রতকথা পাঠ করা হয়। ইনি দক্ষিণ রাঢ়ের খুব সম্ভব মেদিনীপুরের কবি। ইহা একটি

ক্ষুদ্র কাব্য। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ। মুরলীধর দেবীর অনুগ্রহে এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

"কে জানে কেমন লীলা। ঠিক দু-প্রহরের বেলা। গুথুলী জলায় দরশন। লেহ বাছা মাগ্যাবর। যাই আপনার ঘর। আমার মঙ্গল কর গান।"

মুরারি—সম্ভবতঃ বাঙালী। এঁর রচিত গ্রন্থ অনর্ঘরাঘব। আনুমানিক নবম-দশম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

মুরারি আচার্য—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। তাঁরই আদেশে ইনি ১৬২৮ শকাব্দে 'বিন্দুপ্রকাশ' নামে ১৪৪ শ্লোকে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

মুরারি গুপ্ত—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহপাঠী ও একজন আদি অনুচর ইনি ছিলেন শ্রীহট্টের বৈদ্য-পরিবার সম্ভূত। মুরারী আদর্শ বৈষ্ণব হয়েও রামচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি হনুমানের অবতার বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। ইনিই চৈতন্যদেবের আদি জীবনীকার। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত, নাম 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য চরিতামৃত'। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও এই সর্গবন্ধ মহাকাব্যটি "মুরারী গুপ্তের কড়চা" নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানির রচনাকাল বিতর্কমূলক। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৩৩ খ্রীঃ। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ১৫২০ খ্রীঃ। 'চৈতন্য-চরিতের উপাদান' প্রণেতা ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থখানি ১৫৩৬-৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় রচিত হয়েছিল।

ইনি বাংলায় এবং ব্রজবুলিতে কতকগুলি পদও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে দু'টি পদ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

চৈতন্য-পার্ষদ মুরারি গুপ্ত ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ন্যায় ও চিকিৎসাশাস্ত্রে এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। শ্রীবাস প্রভৃতির সঙ্গে ইনি শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। মহাপ্রভু প্রথম জীবনে মুরারি গুপ্তের সঙ্গে নানা শাস্ত্র বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন এবং শ্রীহট্টের ভাষা নিয়ে এঁকে ব্যঙ্গ করতেন। মহাপ্রভু মুরারিকে খুব শ্রদ্ধাও করতেন। মুরারি শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তনে যোগাযোগ করতেন। মাঝে মাঝে এঁরই গৃহে গৌরাঙ্গের নৃত্য-কীর্তন চলত। নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি নবদ্বীপ লীলার প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাতেই মুরারি অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন। এমনকি চন্দ্রশেখর আচার্য আচার্য-রত্ন গৃহে নাটকাভিনয়েও মুরারি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় শুনে মুরারি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কিন্তু যথাসময়ে মহাপ্রভুর হস্তক্ষেপে মুরারির জীবন রক্ষা পায়। ইনি একাধিক বার নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর

দর্শনলাভ করেন। ইনি নবদ্বীপেই বসবাস করতেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পরে কিছুদিন মুরারি জীবিত ছিলেন।

মুরারি-চৈতন্য দাস—'গৌরপদতরঙ্গিণী'র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বর্ধমান জেলার গলসী রেল ষ্টেশন থেকে এক ক্রোশ দূরে সর-বৃন্দাবনপুর গ্রামে মুরারি-চৈতন্যদাসের জন্ম হয়। ইনি সম্ভবতঃ নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ইনি নিত্যানন্দ-শিষ্যদের সঙ্গে খেতুরি মহামহোৎসবে যোগদান করেন। ইনি খেতুরির উৎসবের পর জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করেছিলেন। এঁর সম্বন্ধে কিছু অলৌকিক কাহিনী আছে। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

মুরারি দাস—রাজা অচ্যুতের দ্বিতীয় পুত্র এবং রসিকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুরারির জন্ম হয়। ইনি ছিলেন শ্যামানন্দপুরীর মন্ত্রশিষ্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রসিকানন্দের সঙ্গে ইনি খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন।

মুরারী মিশ্র—মৌদ্গল্য-গোত্রীয় বর্ধমানাঙ্কপুত্র, বাঙালী। এঁর রচিত গ্রন্থ 'অনর্ঘরাঘব'। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের উৎসবে অভিনয়ের জন্য অনর্ঘরাঘব রচিত হয়।

মুলুক মুগীসউদ্দীন যুজবেক—দিল্লীর সম্রাট আলতামাসের একজন তাতার দেশীয় দাস। ইনি স্বেচ্ছাচারী ও দুরভিসন্ধিমূলক ব্যক্তি ছিলেন। দিল্লীর নানা ষড়যন্ত্রে ইনি লিপ্ত ছিলেন। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর মুলুক যুজবেক বাংলার মসনদ পেয়ে কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ পরাজিত হলেও তৃতীয় বারে যুজবেক ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরাস্ত হন। তাঁর সমস্ত হস্তী কলিঙ্গরাজের হস্তগত হয়। এই পরাজয়ের পর তিনি দিল্লী থেকে সৈন্য সাহায্য পেয়ে আর একবার গোপনে কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করে ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে নিয়ে আসেন। বিজয়োল্লাসে যুজবেক দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ—এই ত্রিবর্ণের চন্দ্রাতপ ব্যবহার এবং সম্রাট 'মুগীসউদ্দিন' উপাধিধারণপূর্বক নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। তিনি কামরূপ রাজকে পরাজিত করে ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। এবং কামরূপ-রাজ মুগীশউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মুগীশ সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। এইবার তিনি কামরূপবাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হলেন। হস্তিপৃষ্ঠে পলায়নপর বঙ্গেশ্বরকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত এক বিষাক্ত তীর মুগীশের বক্ষ ভেদ করল। তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। ১২৪৬-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ—বাংলার বিখ্যাত নবাব জাফর মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন দাক্ষিণাত্য-নিবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। বাল্যে নিরাশ্রয় অবস্থায় হাজি সফী নামক ইস্পাহান নগরের এক বণিক এঁকে ক্রয় করে স্বদেশে নিয়ে যান এবং নাম রাখেন মহম্মদ হাজী। বণিক এঁকে নিজ সন্তানের মতো লালন পালন করেন এবং শিক্ষা দেন। বৃদ্ধ বণিকের মৃত্যুর পর ইনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বেরারে দেওয়ানের অধীনে রাজস্ব বিভাগে একটি সামান্য কাজে নিযুক্ত হন। শীঘ্রই ইনি স্বীয় প্রখর বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার বলে আরঙ্গজেবের দরবারে পরিচিত হন। হায়দরাবাদে দেওয়ানের পদ শূন্য হলে বাদশাহ এঁকে ঐ পদে উন্নীত করেন। আরঙ্গজেবের পৌত্র সাহজাদা আজিম ওস্মান যখন বাংলার নবাব (১৬৯৭-১৭০৭ খ্রীঃ), তখন আরঙ্গজেব এঁকে বাংলার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। তখন এঁর নাম হয় মুর্শিদ-কুলী খাঁ। ইহা আরঙ্গজেবেরই দেওয়া উপাধি। ইনি বাংলার তৎকালীন রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত গোলমাল মিটিয়ে ফেলে সেরেস্তা পর্যন্ত দুরস্ত করেছিলেন। আজিম ওস্মানের অধীনে নামে মাত্র দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। প্রকৃত পক্ষে ইনিই ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। দেওয়ান থাকাকালেই ইনি মুখসুদাবাদে উপনীত হয়ে উহার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। এবং নিজ নামানুসারে ঐ স্থানের নাম-করণ করেন মুর্শিদাবাদ। ইনি সেখানে একটি টাকশালও নির্মাণ করেছিলেন। আজিম ওস্মান এঁকে সহ্য করতে পারতেন না এবং এঁকে হত্যারও ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আজিম ওস্মানের মৃত্যু হলে মুর্শিদকুলীই বাংলার নবাব হলেন। মুর্শিদাবাদ রাজধানী এঁর স্থায়ী বাস-স্থানে পরিণত হয়। দেশের শাসন সংস্কারের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করতেন। এঁর শাসন বড় কড়া ছিল। এঁর আমলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা ঘটে নি। ইনি সপ্তাহে দুদিন বিচার কায পরিচালনা করতেন। সুবিচারের জন্য এঁর খ্যাতি আছে। অপরাধের জন্য নিজ পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিহারের সুবেদারী পদ প্রাপ্ত হন। বাংলায় ইনিই প্রথম মুসলমান রাজ্যশাসনের প্রকৃতি উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁর জমিদারী বন্দোবস্তে হিন্দু জমিদার ও প্রজাবর্গের সামাজিক বল বর্ধিত হয়েছিল। চুরি ডাকাতি নিবারণ-কল্পে ইনি অনেকগুলি থানা স্থাপন করেন। তন্মধ্যে কাটোয়ার থানাই প্রধান। দস্যু ধরা পড়লে তাকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হত। তাই এঁর রাজ্যে দস্যু ভয় দূর হয়েছিল। মুর্শিদকুলীর শাসনে প্রজাদের অন্নকষ্ট ছিল না।

ইনি নিজে সুধী ও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদর করতেন। মুর্শিদকুলী খাঁ রাজ্যে প্রজার পীড়াদায়ক করসমূহ উঠিয়ে দিয়েছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ জীবন সায়াহ্নে (১৭২৩ খ্রীঃ) মুর্শিদাবাদের পূর্ব প্রান্তে খাস তালুকে কাটরায় মসজিদ, মিনার, হাউজ বা কূপ ইত্যাদি প্রস্তুত করেছিলেন। মসজিদের সোপানের নীচে জীবদ্দশাতেই তাঁর সমাধিগৃহ নির্মাণ করেন। মুর্শিদকুলীর কোন পুত্র-সন্তান না থাকায ইনি মৃত্যুকালে আপন দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। মুর্শিদকুলীর চরিত্র ও রাজনীতি সম্বন্ধে একজন অজ্ঞাত-নামা লেখক বলেছেন: "শায়েস্তা খাঁর সময থেকে বঙ্গদেশে—শুধু বঙ্গদেশে কেন সমগ্র ভারতে এমন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃষ্ট হয় নাই, যাঁর গুণগ্রাম—কি ধর্মপালন ও প্রচারে, কি রাজকীয় নিয়মাবলী ও ব্যবহার শাস্ত্রের যথাবিধি প্রণয়নে ও বিধানে, বিশিষ্ট বংশীয় ও সদ্‌গুণশালী লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ও উৎসাহ-সাহায্যাদির প্রদানে, ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারে, বিপন্নের ত্রাণে ও দুষ্কৃতের দমনে, মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর কার্যাবলীর সহিত তুলিত হইতে পারে।"

ইংরেজ বণিকদের মুর্শিদকুলী অত্যন্ত কড়া নজরে রেখেছিলেন। তারা যে নানা ফন্দি ফিকির করে এদেশের শাসনক্ষমতায় আসতে চায় তা তিনি উপলব্ধি করেই তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজ-দের ঔদ্ধত্যভাব প্রকাশ পেত। দিল্লীর বাদশাহকে বশ করলেও ইংরেজরা মুর্শিদকুলীকে ভেজাতে পারেন নি।

মুর্শিদকুলী খাঁ (দ্বিতীয়)—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবিখ্যাত নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীনের জামাই। সুজাউদ্দীন এঁকে ঢাকার নায়েব-নাজিম্ নিযুক্ত করেছিলেন।

মুসা খাঁ—বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর পুত্র। ইনি বারো-তেরো জন সামন্তের সাহায্যে নানা স্থানে নানাভাবে মুঘলশক্তির বিরোধিতা করেছিলেন।

মুস্তাফা খাঁ—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) আলীবর্দী খাঁর প্রধান সেনাপতি। মারাঠা দস্যু বা বর্গীর হাঙ্গামার সময় ইনি আলীবর্দীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রধানতঃ মুস্তাফারই বীরত্ব ও সাহসে আলীবর্দী জয়ী হয়েছিলেন। এজন্য নবাব তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু পরে মুস্তাফা খাঁর আস্পর্ধা বড় বেড়ে উঠতে থাকে। বিহার প্রদেশের যুদ্ধে তাঁর পূর্ব ঋণের কথা স্মরণ করে আলীবর্দী সেই দেশ মুস্তাফাকে দেবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু মুস্তাফা আলীবর্দীর অধীন থাকতে অনিচ্ছা

প্রকাশ করে স্বাধীন নৃপতির দাবী জানালেন। পরে এই ব্যক্তি বঙ্গদেশও দখল করতে চাইতে পারে এই আশঙ্কায় নবাব ইতস্তত করতে লাগলেন। মুস্তাফাকে খুশী করার জন্য নবাব অনেক চেষ্টা করেন। যে সব জমিদারের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন মুস্তাফা খাঁ তাঁদের নিকট প্রচুর উৎকোচ নিয়ে নবাবকে তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে অনুরোধ করতেন। খাঁ সাহেবকে খুশী করার জন্য নবাব তা করতেনও।

মুহম্মদ আকিল—চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

মুহম্মদ কবীর—চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী, বাঙালী মুসলমান কবি। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। এঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'মধুমালতী'। রচনাকাল ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী—ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনমুহম্মদ বিন বখতিয়াব খিলজী দ্র°।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টোপাধ্যায় বংশ-সম্ভূত কুলীন বাঙালী ব্রাহ্মণ। মেদিনীপুর জেলা উড়িষ্যা রাজের অধীন থাকায় ভুল করে তাঁকে অনেকে উড়িষ্যাবাসী বলেছেন। কৈশোরে মৃত্যুঞ্জয় নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরবর্তী জীবন তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। বাগবাজার অঞ্চলে রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে তাঁর বাস ছিল।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে মৃত্যুঞ্জয় উইলিয়ম কেরীর অধীনে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। এবং কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ পরিত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটনের অধীনে অধিক বেতনে জজ-পণ্ডিতের কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সে যুগে প্রবাদ বাক্যের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা এবং সুপ্রিম কোর্টে জজ-পণ্ডিতি ছাড়াও তিনি তাঁর বাগবাজারের গৃহে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সে যুগে তিনি উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন রীতিমত চর্চা করতেন। তৎকালীন রাজপুরুষেরা তাঁর নিকট নানাবিধ সামাজিক ও আইনঘটিত ব্যাপারে বিধান নিতেন। রামমোহনের পূর্বে

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে শাস্ত্রীয় নজির থেকে তিনি সহমরণের বিরুদ্ধে বিধান দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের নিয়মাবলী প্রণয়ন সমিতি ও কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মৃত্যুঞ্জয় পরলোক গমন করেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের অবদান অসামান্য। তিনিই বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। তার রচিত গ্রন্থ: বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলী, বেদান্তচন্দ্রিকা, প্রবোধচন্দ্রিকা। তাছাড়া, তিনি উইলিয়ম কেরীকে তাঁর কথোপকথন, সংস্কৃত হিতোপদেশ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় সহায়তা করেছিলেন। তাঁর পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ' পুস্তকের রচনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের যথেষ্ট হাত ছিল।

মেদিনীকর—বিখ্যাত 'মেদিনী কোষ' গ্রন্থ-প্রণেতা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ১০০ থেকে ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মেদিনীকোষ লিখিত হয়েছিল। এই মেদিনীকরের নামেই নাকি মেদিনীপুর নগর স্থাপিত হয়েছিল। এবং এঁরই নামানুসারে মেদিনীপুর নামকরণ হয়েছে। মেদিনীকরের পিতার নাম ছিল প্রাণকর। এঁরা জাতিতে ছিলেন বৈদ্য।

মেধাতিথি বা **তিথিমেধা**—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূর কর্তৃক কনোজ রাজসভা থেকে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। ভরদ্বাজগোত্রীয় বহু শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি, শশী ও ধ্রুব নামে নয় পুত্র ছিলেন। এঁর রচিত প্রধান গ্রন্থ মনুসংহিতার টীকা।

মেনাহাতী, মেলাহাতী বা **মৃণ্ময়**—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা সীতারাম রায়ের সেনাপতি। ইনি নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত রায়-গ্রামনিবাসী ঘোষবংশের পূর্বপুরুষদের একজন। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম রূপনারায়ণ বা রামরূপ ঘোষ। এঁর শরীর দৈর্ঘে ৭ হাত ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিল। সীতারামকে ইনি আদর্শ পুরুষ বলে মনে করতেন। রাজা সীতা-রামের জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ইনি দিল্লীতে কুস্তী করে মল্লসমাজে 'মেনাহাতী' উপাধি পান। ইনি প্রত্যহ কুস্তী করার পরে সর্বাঙ্গে মাটি মাখতেন, এজন্য সীতারামের গুরুদেব এঁর নাম রেখেছিলেন মৃণ্ময়। মেনাহাতী অকৃতদার, অত্যন্ত ধার্মিক ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। রাজা সীতা-রামের কাছ থেকে কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। দেশের দুর্দশা দূর করাই ছিল এঁর জীবনের উদ্দেশ্য।

মৈত্রেয়রক্ষিত—পণ্ডিতগণ নানা যুক্তি বলে মৈত্রেয়ী রক্ষিতকে বাঙালী বলেই মনে করেন। ইনিও বিখ্যাত বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক। ইনি জিনেন্দ্র-

বুদ্ধির 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা' নামক গ্রন্থের উপর 'তন্ত্রপ্রদীপ' নামক টীকা রচনা করেন। মৈত্রেয় ভীমসেন-রচিত ধাতুপাঠ অবলম্বন করে 'ধাতুপ্রদীপ' নামেও একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী পালরাজাদের রাজত্বকালে। তাঁর গ্রন্থের উপলভ্যমান সকল পুঁথিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

মোকরম খাঁ—মোগল শাসনকালে নবাব মোকরম খাঁ ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি ঢাকায় বসবাস করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহান পিতৃদ্রোহী হয়ে বঙ্গদেশে এলে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে ইনি ধলেশ্বরী নদীগর্ভে জলমগ্ন হয়ে প্রাণ হারান।

মোক্ষাকর গুপ্ত—জগদ্দল বিহারের এক আচার্য ছিলেন। তিনি তর্কভাষা নামে বৌদ্ধন্যায়ের উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অপভ্রংশ দোহাকোষের উপর একখানা টীকাও তাঁর রচনা। পাল রাজাদের রাজত্বকালে ইনি জীবিত ছিলেন।

মোজাম্মেল—পঞ্চদশ শতাব্দীর সর্বশেষ মুসলমান কবি। ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর নামে তিনখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। (১) নীতিশাস্ত্র, (২) সয়ৎনামা, (৩) খঞ্জনচরিত্র।

মোফাত, জেমস—এই ইংরেজ পুরুষ ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর চিত্রশিল্পী। ইনি কলকাতা ও নিকটবর্তী বহু স্থানের ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বহু চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন।

মোবারক উদ্দৌলা—মীরজাফরের অন্যতম বেগম বব্বুর গর্ভজাত সন্তান। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সৈফউদ্দৌলার মৃত্যু হলে মোবারক উদ্দৌলা নবাবের মস্‌নদে উপবিষ্ট হন। ঐ সময় এঁর বয়স ছিল মাত্র বার বছর। গর্ভধারিণী মাতা বব্বু বেগমের পরিবর্তে বিমাতা মণি বেগম এঁর অভিভাবিকা নিয়োজিত হয়েছিলেন। মোবারকের সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস ও লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর ছিলেন। এই সময় নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন। নবাব মোবারকউদ্দৌলা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ বছর বয়সে মারা যান।

মোহন দাস—একজন পদকর্তা। 'পদকল্পতরু'তে মোহন ভণিতায় ত্রিশটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। 'গৌরপদতরঙ্গিণীর'র সঙ্কলয়িতা জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে মোহন ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের সুহৃদ। 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে আছে,—

"শ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে।
নৈষ্ঠিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে॥"

গোবিন্দদাসের একটি ভণিতায় আছে,—

"মোহন গোবিন্দদাস পহুঁ।"

মোহনের পদগুলির মধ্যে বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ পদই আছে। মোহনের রচনা ও বর্ণনা-শক্তি প্রশংসনীয়। মোহন দাসের অবস্থিতি-কাল ষোড়শ শতাব্দী।

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর—মোহনপ্রসাদের জন্ম হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ১৮২২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোহনপ্রসাদ শ্রীরামপুর বিচারালয়ে কাজ করতেন। তিনি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-ইংরেজী অভিধান এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িয়া-ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন। তাঁর অপর গ্রন্থ পারস্য-কাহিনীর বঙ্গানুবাদ।

মোহনলাল—রাজা মোহনলাল ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী। অনেকের ধারণা তিনি হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে বাঙালী বলে স্বীকার করতে নারাজ। যাই হোক, সিরাজ তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর সঙ্গে হিতাকাঙ্খী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করতেন। মোহনলালের বীরত্ব, দেশপ্রেম ও প্রভুভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয় পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে। এই বীরবর পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে যে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন তা ইতিহাসে তাঁকে চির অমর করে রেখেছে।

মোহনলালের ভগিনীর নাম ছিল ফৈজী বা ফয়র্জান। তিনি ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী নারী।

মোহাম্মদ এয়াকুব সপ্তদশ শতাব্দীর একজন কবি। চব্বিশ পরগণা জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত জীরিকপুর গ্রামে এয়াকুবের জন্ম হয়। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "জঙ্গনামা" প্রকাশিত হয়।

মোহাম্মদ খান—একজন মুসলমান কবি। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের মধ্যে এঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে। এঁর রচিত গ্রন্থ : (১) মকতুল হোসেন, (২) কাসিমের লড়াই, (৩) দজ্জালের বয়ান, (৪) হানিফার পত্রপাঠ, (৫) কেয়ামতনামা। 'মকতুল হোসেন' গ্রন্থখানি বিরাট; ইহা এই নামীয় একখানি ফারসী গ্রন্থেরই ভাবানুবাদ। 'কেয়ামত নামা' পুস্তকখানিও আকারে বিরাট। এর রচনাকাল ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থদ্বয় চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত ছিল। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

মোহাম্মদ দানেশ—ইনি লিখেছিলেন 'চাহার দরবেশ' এবং 'গুল-ও-সনোবার'। চাহার-দরবেশের শেষে কিছু কবি-পরিচয় পাওয়া যায়।

"শিবপুর ঘর মেরা শুন হোসমন্দ
রফি মোল্লার আমি প্রথম ফরজন্দ।"

মোহাম্মদ মতিন—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। রচিত গ্রন্থ 'ইসলাম-নবী কিস্‌সা'। নিবাস বর্ধমান শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠ গোদা গ্রাম।

মোহাম্মদ রফীউদ্দীন—সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বাঙালী মুসলমান কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম "জেবল মুলুক শামারোখ"। এঁর ভাষা পরিমার্জিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এঁর রচিত কাব্য থেকে জানা যায় ইনি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কুমিল্লার নারানঞা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর পিতার নাম আশরফ।

মোহাম্মদ রাজা—সপ্তদশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি। ইনি দু'খানি কাব্য রচনা করেছিলেন। একখানির নাম "তমিম গোলাল" এবং অপরখানির নাম "মিছরীজমাল"। দুইখানিই প্রেমমূলক কাব্য।

ম্যাক, জন—১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম ওয়ার্ড জন ম্যাককে শ্রীরামপুর কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নির্বাচন করে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে নিয়ে আসেন। কলেজ পরিচালনায় ম্যাক জোশুয়া মার্শম্যানকে বিশেষ সাহায্য করতেন। বাঙালী যুবকদের বিজ্ঞান-শিক্ষাদানে এবং বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান-পুস্তক রচনায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি বাংলা ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। ম্যাকের নেতৃত্বে বাংলায় ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র সংকলিত হয়। উহাই ভারতীয় ভাষায় প্রথম ভারতবর্ষের মুদ্রিত মানচিত্র। তাঁর উদ্যোগে শ্রীরামপুর কলেজে লেবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাক রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই রসায়নবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লিখিত একমাত্র বাংলা গ্রন্থ "কিমিয়া বিদ্যার সার, অর্থাৎ রসায়ন বিদ্যার মূলকথা" বাংলা ভাষায় অগ্রদূতের মর্যাদা লাভ করেছে

য

যজ্ঞপতি উপাধ্যায়—মিথিলার বিখ্যাত ন্যায়াচার্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পৌত্র এবং বর্ধমানের পুত্র। পিতা বর্ধমান অপেক্ষা ইনি অধিকতর প্রতিভাশালী ছিলেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র এঁর ছাত্র ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ 'মণিপ্রভা'। সম্ভবতঃ যজ্ঞপতি ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

যদুনন্দন আচার্য—অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য। গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ইনি অদ্বৈত

সাধনাকে সফল করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। ইনি বাসুদেব দত্তের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থে বাসুদেব দত্ত ও যদুনন্দনকে মহাপ্রভুর দুই সেনাপতি-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তগ্রামের তৎকালীন বিখ্যাত জমিদার হিরণ্য দাস এঁর শিষ্য ছিলেন। গোবর্ধন দাসের পুত্র বিখ্যাত রঘুনাথ দাস অধিকারী যদুনন্দনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

যদুনন্দন চক্রবর্তী—পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য এবং পদকর্তা। এঁর নিবাস ছিল বর্ধমানের কাটোয়ায়। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের একখানি জীবন-চরিত রচনা করেছিলেন। ইনি নিজের নামের সঙ্গে স্থানে স্থানে "দাস" পদবীও ব্যবহার করতেন। "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে এঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র পাওয়া যায়। যথা,—

"যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য।
দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়।
বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত॥"

যদুনন্দন গৌরাঙ্গ চরিত রচনা করেছিলেন। এঁর রচিত অপর কাব্য "রাধাকৃষ্ণলীলাকদম্ব"। এঁর শ্রীমতী ও নারায়ণী নাম্নী কন্যাদ্বয়কে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেছিলেন।

যদুনন্দন দাস—সপ্তদশ শতকের অনুবাদাশ্রয়ী কবিদের মধ্যে যদুনন্দন দাস অগ্রগণ্য। ইনি মালিহাটীর বৈষ্ণ-পরিবারে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন বটে, তবে শ্রীনিবাসকেই গুরু বলে মানতেন। যদুনন্দনের 'রসকদম্ব', 'দানলীলাচন্দ্রামৃত', 'গোবিন্দবিলাস' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' যথাক্রমে রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের ও 'দানকেলিকৌমুদী' ভাণিকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্যের এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকা সমেত বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যের অনুবাদ। যদুনন্দনের নামে একটি জীবনীজাতীয় কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায়। উহাই বিখ্যাত 'কর্ণানন্দ' কাব্য। উহার রচনাকাল ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ। 'হরিভক্তিচন্দ্রামৃত' নামক বৈষ্ণবতত্ত্ব-নিবন্ধের রচয়িতা এবং রায়-শেখরের সংস্কৃত রচনা 'হীরাবলীতত্ত্বের অনুবাদকারী এই যদুনন্দন বলেই অনুমিত হয়। যাইহোক, পদকর্তা হিসাবেই যদুনন্দন বিশেষ খ্যাত

যদুনন্দন দাস—যদুনন্দন দাসের রচিত কাব্যের নাম 'শুকদেব চরিত্র'। কাব্যের লিপিকাল ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ। কবির পরিচয়,

"জন্মস্থান নবদ্বীপ বন্দো হরষিতে
ক্ষেত্র মথুরা বন্দো ঘোষ [পা] জগতে।

পিতা রামানন্দ বন্দো মোর জন্মদাতা
পরম সানন্দে বন্দো মঞ্জোদরী মাতা।
বিদ্যারম্ভ গুরু বন্দো শ্রীচৈতন্য পণ্ডিত
জন্মে জন্মে তিহোঁ মোর
কুল পুরোহিত।"

শেষের ভণিতায়,

"ভাবিয়া কৃষ্ণচরণ-কমল বন্দে
শুকদেব চরিত্র কহে দাস যদুনন্দে।"

যদুনাথ বা **যাদুনাথ** বা **যাদব পণ্ডিত**—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম "ধর্মের মঙ্গল" বা "ধর্মপুরাণ।" কবির পিতার নাম ধর্মদাস। পিতামহের নাম বিনোদনাথ এবং প্রপিতামহের নাম দামোদর। এঁদের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দোম গ্রামে। সম্ভবতঃ ১৬৯১-৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যদুনাথের ধর্মপুরাণ রচিত হয়ে ছিল।

যদুনাথ—একজন কবি। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। কবির জন্মস্থান রংপুর জেলার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত চরখাবাড়ী গ্রাম। কবিকৃত সংস্কৃত চণ্ডীর অনুবাদ রচনার সময় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ।

যদুনাথ আচার্য—নবদ্বীপের অধিবাসী। এঁর পূর্ব নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার কুরুজা গ্রামে। এঁর উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে—

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহাকে সদয়।"

যশশ্চন্দ্র—একজন কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'গোবিন্দবিলাস'। ইহা একটি বৃহৎ কাব্য। ইহার রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের এদিকে নয় বলে অনুমিত হয়। কাব্যটির বিভাগে বৈচিত্র্য আছে,—আদ্যখণ্ড, রাধাখণ্ড, দানখণ্ড, অনুরাগখণ্ড, পৌগণ্ডখণ্ড ইত্যাদি। বন্দনা-অংশে গৌরাঙ্গ, সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীবিদ্যালঙ্কার, জনক-জননী, শ্রীহরিদাস ও গুরুপত্নীর বন্দনা আছে। গোবিন্দবিলাস প্রধানত বর্ণনাময়। কবির ভণিতার নিদর্শন,

"দীন যশশ্চন্দ্র বলে গোবিন্দবিলাস
নৌকাখণ্ড শুন হবে পাপতাপ নাশ॥"

যশোধর্মন—পুণ্ড্র রাজকুমার (গুপ্ত বংশের জ্ঞাতি)। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের গুপ্তরাজ বালাদিত্য গুপ্ত এঁকে মালবের অন্তর্গত মন্দাশোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যশোধর্মন হুন-দলপতি মিহিরকুলকে পরাজিত করে সমগ্র ভারতবাসীকে হুনদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি তার রাজধানী মন্দাশোরের নাম পরিবর্তন করে দাসপুর রাখেন। কারণ, তিনি নিজে পুণ্ড্রের সংস্কার-বিহীন ক্ষত্রিয় বা দাস জাতিভুক্ত গঙ্গারাঢ়ী ছিলেন। ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাদিত্য গুপ্তের মৃত্যুর পর তিনি মগধ ও সর্বভারতের রাজ্যপদ লাভ করেছিলেন।

যশোপাল—পূর্ববঙ্গের কাশীমপুর এবং চাঁদ-প্রতাপ পরগণার সীমান্ত দেশে প্রবাহিত গাজী খালী বা কানাই নদীর তীরদেশে অবস্থিত বাইদগাও নামক স্থানে যশোপাল নামক জনৈক নৃপতির রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই যশোপালের সঙ্গে পালনৃপতিদের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে যশোপাল পূর্ববঙ্গের এক নিভৃত কোণে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই যশোপালই ধামরাই-এর সুপ্রসিদ্ধ যশোমাধবের আবিষ্কর্তা। কিম্বদন্তী আছে একদিন রাজা যশোপাল একদন্ত শ্বেতকায় গজারোহণে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর রাজধানীর অদূরে এক স্থানে উপস্থিত হলে হস্তীটি আর অগ্রসর না হয়ে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হল। মাহুতের বারবার অঙ্কুশ তাড়নেও সে অগ্রসর হতে চাইল না। সুশিক্ষিত হস্তীর এইরূপ অদ্ভুত ব্যবহার দেখে রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ঐ স্থান খনন করতে আদেশ দিলেন। ঐ স্থান খনন করা হলে মৃত্তিকা মধ্যে একটি মন্দির ও মাধবের একটি সুন্দর মূর্তি মন্দির মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল। সেই সময় দৈববাণী হল যে যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করলে তাঁর রাজ্য এবং যশ নষ্ট হবে। কিন্তু ভক্ত রাজা তাতে বিচলিত না হয়ে, "তুমি মোর ধন বংশ তুমি শিরোমণি" বলে হৃষ্টচিত্তে মাধববিগ্রহ স্বগৃহে আনয়ন করে প্রতিষ্ঠা করলেন। যশোপাল নির্বংশ হলেন, কিন্তু "বংশ গেল যশোনাম মাধবে মিলিল।" মাধবের নামের সঙ্গে পুণ্যাত্মা যশোপালের নাম বিজড়িত হয়ে আজও সেই মহাপুরুষ অমর হয়ে আছেন। যে স্থান থেকে মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, সেই গর্তটি এখনো বর্তমান এবং "মাধবের চৌবাচ্চা" নামে খ্যাত। মাধব মন্দিরের ভগ্ন স্তূপটি বর্তমানে "মাধব চালা" বা "মাধব টেক" নামে খ্যাত।

যশোবন্ত সিংহ—মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজ্যের রাজা। এঁর পিতা রাজা রামসিংহের মৃত্যুর পর ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজা হন। ইনি ছিলেন মেদিনীপুরে সর্বগুণান্বিত নৃপতি। রাজা যশোবন্ত অতি সচ্চরিত্র, দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ ও পরমধার্মিক ছিলেন। লোকে এঁকে কুলদেবী মহামায়ার "বরপুত্র" বলত। বাংলার ইতিহাসে রাজা যশোবন্ত একজন বিখ্যাত রাজনীতিকুশল ব্যক্তি ছিলেন। সুজাউদ্দীন বাংলার সুবেদার হয়ে যশোবন্তকে ঢাকার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কথিত আছে এঁর দেওয়ানী সময়ে দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত সুখে ছিল। ১৬৬৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার নবাব ছিলেন, তখন তিনি টাকায় আট মণ করে চাল বিক্রি করেছিলেন এবং এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য ঢাকা

নগরের পশ্চিম দ্বারের উপর লিখে গিয়েছিলেন যে, "যিনি তণ্ডুল এতাদৃশ সুলভ করিতে না পারিবেন তিনি এই দ্বার খুলিতে পারিবেন না। দেওয়ান যশোবন্ত সিংহ পুনরায় টাকায় আট মণ চাল বিক্রয় করিয়ে, সেই পশ্চিম দ্বারের কপাট উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন (১৭৩৯ খ্রীঃ)। রাজা যশোবন্ত বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। কবিবর রামেশ্বর ভট্টাচার্য এঁর সভা-পণ্ডিত ছিলেন। রাজারই উৎসাহে রামেশ্বর "শিবায়ন" গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোবন্ত ইহলোক ত্যাগ করেন।

যশোরাজ খান—হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) কর্মচারী। ইনি একটি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের কোন পুথি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী কাব্যে যশোরাজ খানের একটি 'ব্রজবুলি' পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এই পদটিই বোধহয় বাংলাদেশে লিখিত ব্রজবুলি কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন।

"এক পয়োধর চন্দন-লেপিত
আরে সহজই গোর
হিমধরাধর কনকভূধর
কোরে মিলল জোর।
মাধব, তুয়া দরশন-কাজে
আধ পদচারি করত সুন্দরী বাহির
দেহলী-মাঝে।
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল
বহল বাম
নীল ধবল কমলযুগলে চাঁদ পূজল কাম।
শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ সোহ এ
রস-জান
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভনে
যশরাজ-খান॥"

রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' থেকে জানা যায় যে যশোরাজ-খান শ্রীখণ্ড-নিবাসী ও বৈদ্য ছিলেন।

"শ্রীযুত হুসন" এই ভণিতার উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যশোরাজ খান হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হোসেন শাহের দরবারে কাজ করতেন বলেও এর থেকে অনুমান হয়। এই অনুমান যে ঠিক, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গোপালদাস-রসিক দাসের শাখা নির্ণয়ে। তাতে লেখা আছে যশোরাজ "রাজসেবী" ছিলেন।

যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী॥

যাদবাচার্য—ইনি সংসার ত্যাগ করে কাশীশ্বর গোঁসাইর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনে এঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। রূপ-গোস্বামীর ইনি বিশেষ ভক্ত ও সঙ্গী ছিলেন। আজীবন যাদবাচার্য বৃন্দাবনে অবস্থান করেছিলেন। এঁর জীবিতকাল ষোড়শ শতাব্দী।

যাদবেন্দ্র—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর মতে ইনি নাকি ছিলেন বীরভূম কচুজোড়ের রাজা রুদ্রচরণ রায়ের

গুরুদেব। এঁর পুরো নাম যাদবেন্দ্র বা যাদবিন্দ ভট্টাচার্য। ইনি ছিলেন একজন পদকর্তা। এই যাদবেন্দ্রই নাকি বীরভূমের মহিলা কবি 'স্বর্ণলালী' দেবীর স্বামী ছিলেন। এঁর রচিত তিনটি পদ 'পদকল্পতরু'তে সংগৃহীত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

যাদবেন্দ্র ঘোষ বা শ্রী যাদবানন্দ—বিখ্যাত সাধক কামদেব তার্কিকের শিষ্য। রাজা সীতারাম রায়ের সম-সাময়িক অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামদেবের সঙ্গে ভূষণায় আসেন এবং রণরঙ্গিণীর মন্দিরে উপস্থিত হন। গুরুর সঙ্গে ভূষণার নিকটবর্তী চম্পকদহের তীরে নানাস্থানে সাধনাসন পেতে বহু বৎসর তপস্যা করেছিলেন। পরে জমিদার মাধব বিশ্বাসের কন্যা ভগবতী দেবীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ইনি গোপীনাথের মন্দিরের কর্তা ছিলেন। রাজা সীতারাম এই মন্দিরে এসে যাদবেন্দ্রের গান শ্রবণ করে ভক্তিরসে আপ্লুত হতেন। কবি গোসাঁই গোরাচাঁদ ছিলেন এঁর শিষ্য। যাদবেন্দ্র ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। পূর্বে কুলীন ছিলেন। মাধবের কন্যাকে বিবাহ করে কুল হারিয়ে বংশজ হয়েছিলেন।

যামিনীশূর—আদিশূরের প্রপৌত্র, ধরণীশূরের পৌত্র। এঁর পিতার নাম ধরাশূর। এঁর রাজত্বকাল দশম শতাব্দী। যামিনীশূরের সময় শূররাজ্যের উপর উত্তর সামান্ত থেকে আবার নূতন করে আক্রমণ হতে থাকে। এবার পালবাহিনীর কাছে বারবার পরাজিত হয়ে শূরশক্তি শেষ পর্যন্ত গড়-মান্দারণে এসে রাষ্ট্ররক্ষা করে। স্থানটি হুগলী জেলার জাহানাবাদ থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আজও গড়-মান্দারণ গ্রামে শূর রাজবংশের দুর্গের বিশাল স্তূপের ধ্বংশাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

যোগ্লোক—জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মৃতিকারেরা তাঁদের স্মৃতিগ্রন্থে যোগ্লোকের গ্রন্থের উল্লেখ ও বচন উদ্ধার করেছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কাল ও ব্যবহার—এই দুই বিষয়ের আলোচনায় যোগ্লোকের উল্লেখ আছে বলে ইনিও এই উভয়বিধ বিষয়ে গ্রন্থ-রচনা করেছিলেন এরূপ মনে করা হয়। রঘুনন্দন যোগ্লোকের মতের উল্লেখ সসম্মানেই করেছেন এবং তাঁর 'ব্যবহারতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে মৈথিল লেখকগণের নিকটও যোগ্লোকের মতের আদর ছিল। ইনি পালরাজত্ব-কালে সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

র

রক্ষিত মৈত্রেয়—একাদশ শতাব্দীতে রক্ষিত মৈত্রেয় "ধাতু-প্রদীপ" নামক পাণিনির ধাতুপাঠের টীকা প্রণয়ন করেছিলেন।

রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার—হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র। তিনি ছিলেন কাশীবাসী মহাপণ্ডিত। যশোবিজয়ের 'অষ্টসহস্রীবিবরণে' রঘুদেবের নাম আছে এবং ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্ণয়পত্রে তিনিও স্বাক্ষর করেছেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। বিখ্যাত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ছিলেন রঘুদেবের ছাত্র। রঘুদেব রচিত গ্রন্থাবলী বাংলার বাহিরেও সুপ্রাপ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম: (১) তত্ত্বদীপিকা, (২) নিরুক্তিপ্রকাশ, (৩) কুসুমাঞ্জলি-কারিকা ব্যাখ্যা, (৪) দ্রব্যসারসংগ্রহ, (৫) আখ্যাত-বাদটীকা, (৬) নঞ্‌বাদ টীকা, (৭) পদার্থখণ্ডন ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

রঘুনন্দন—নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ রামজীবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে নিযুক্ত ছিলেন। রঘুনন্দন অতি ক্ষুদ্র পদ থেকে স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করতে করতে অবশেষে খালেসা দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হন। রঘুনন্দন নবাব আলীবর্দীর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। রঘুনন্দনের যত্নে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম-জীবন সমগ্র বঙ্গের প্রায় পঞ্চমাংশের জমিদারী স্বত্ব লাভ করেছিলেন।

রঘুনন্দন আচার্য—ইনি ছিলেন মুক্তাগাছা জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের পৌত্র ও শিবরাম আচার্যের পুত্র। ইনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। বাংলা ১১৭৬ সালে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, রঘুনন্দন তখন মুক্ত-হস্তে অন্নদান করে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন রক্ষা করেছিলেন। এঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই শেষ বয়সে ইনি গৌরীকান্তকে দত্তক পুত্র-রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। এঁর রচিত 'রামরসায়ন' একটি বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি আজও কম পরিচিত নয়। এটির রচনাকাল আনুমানিক ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ। কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে মানকরের কাছে মাড়োঃ গ্রামে (মাগুগ্রাম)। কবির গুরু ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠতাত বংশীমোহন গোস্বামী। বিষয়বস্তু অভিনব, রচনা সুললিত।

রঘুনন্দনের অপর বাংলা রচনা হচ্ছে: কৃষ্ণলীলাকাব্য 'রাধামাধব-উদয়' ও পদাবলী 'গীতমালা'। রঘু-নন্দন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এঁর সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'সদাচারনির্ণয়' 'দুর্জনমিহির কলঙ্ক',

'গোবিন্দচরিত', 'ভক্তলীলামৃত', 'গোবিন্দমেঘোদয়', 'স্তবকদম্ব', 'কৃষ্ণকেলিসুধাকর', 'ভক্তমালা' ও সুবৃহৎ 'গৌরাঙ্গচম্পূ'। ইনি আয়ুর্বেদীয় নিবন্ধও রচনা করেছিলেন। যেমন, 'রোগার্ণবতারিণী' ও 'অরিষ্টনিরূপণ'। ব্যাকরণ বিষয়ক নিবন্ধ হচ্ছে 'ধাতুদীপ' ও 'ঔনাদিকোষ'।

তাছাড়া, ভাগবতের 'সংশয়শাতনী' নামক টীকা এবং 'ছন্দোমঞ্জরীর' 'ব্যাখ্যামঞ্জরী' নামক টীকা রঘুনন্দন-রচিত।

রঘুনন্দন ঠাকুর বা **দাস**—বর্ধমান জেলার সুবিখ্যাত শ্রীখণ্ড গ্রামে রঘুনন্দনের জন্ম হয় ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ ছিলেন রঘুনন্দনের পিতৃদেব। রঘুনন্দন, শ্রীনরহরি ঠাকুরের পুত্ররূপে প্রতিপালিত হয়ে তাঁর নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গৌরমণ্ডলে প্রেমভক্তি প্রচারে ইনি সবিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। রঘুনন্দনের বহু শিষ্য ছিল। ইনি মহাপ্রভুর মানসপুত্র বলে উল্লিখিত হন। কারুর কারুর মতে রঘুনন্দন ছিলেন অভিরাম-গোপালের মন্ত্র শিষ্য। ইনি ছিলেন পরম কৃষ্ণভক্ত। ইনি নাকি অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করে 'গৌরভাবামৃত' স্তোত্রের দ্বারা তাঁর বন্দনা করেছিলেন। রঘুনন্দনের আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দী।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য—স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। স্মার্ত পণ্ডিত "সময় প্রদীপ" রচয়িতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য ছিলেন রঘুনন্দনের পিতা। বাল্যাবধি রঘুনন্দন অত্যন্ত মেধাবী ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং সুন্দর শ্লোক রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি বহু স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইনি ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার এবং নবদ্বীপবাসী। 'স্মার্ত ভট্টাচার্য' বা শুধু 'স্মার্ত' নামেই তিনি পরবর্তীকালে সুপরিচিত। এঁর জ্যোতিষতত্ত্ব ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। রঘুনন্দন রচিত "অষ্টবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে "উদ্বাহতত্ত্ব", "দায়ভাগতত্ত্ব", "প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব" এবং "একাদশীতত্ত্ব"ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রঘুনাথ—এঁর রচিত বাংলা কাব্যগ্রন্থ "অশ্বমেধ পঞ্চালিকা"। ১০৩১ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ এই গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হয়। কবি রঘুনাথ গ্রন্থ রচনা শেষ করে উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেবের সভায় উহা পাঠ করেন। মুকুন্দদেবের ইনি স্নেহভাজন ছিলেন বলে অনুমিত হয়। আরও জানা যায় ইনি উড়িষ্যায় বাস করতেন। জাতিতে ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে কবি একস্থানে

উৎকলাধিপতিকে সম্বোধন করে বলছেন,
"শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি।
আইলুঁ তোমারদেশে গুণ শুনি অতি।"

রঘুনাথের অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

রঘুনাথ বা **আদিমল্ল**—বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি বা প্রথম রাজা। কথিত আছে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৃন্দাবনের নিকটবর্তী জয়নগর গ্রামের এক ক্ষত্রিয় রাজা পুরীর জগন্নাথ দর্শনের জন্যে বহির্গত হয়ে বাঁকুড়ার লাউগ্রামের নিকটবর্তী বনভূমিতে উপস্থিত হলে তাঁর পূর্ণগর্ভা পত্নীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। রাজা পত্নীকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করে গন্তব্য স্থানে চলে যান। রানী যথাকালে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে প্রাণত্যাগ করেন। এক বাগ্দী শিশুটি কুড়িয়ে এনে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করতে থাকে এবং তার নাম রাখে রঘু। রঘুর আট-দশ বছর বয়স হলে বাগ্দী তাকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালী করতে দেয়। প্রিয়দর্শন রঘুকে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নী পুত্রের ন্যায় ভালবাসতেন। একদিন ব্রাহ্মণ রঘুর কপালে রাজচিহ্ন দেখে তাকে গরু চরানর কাজ থেকে রেহাই দিয়ে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। এদিকে মল্লভূমিতে এক মল্লরাজ লাউগ্রামে রাজত্ব করতেন। কিছুদিন পরে ঐ মল্লরাজের মৃত্যু হলে রঘুকেই লাউগ্রামের সিংহাসনে বসান হয়। রঘু আদিমল্ল নামে লাউগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করে রাজত্ব করতে থাকেন। একটি অরণ্যময় স্থানে দৈবশক্তির প্রভাব অনুভব করে রঘু ঐ স্থানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং আপন অভীষ্টদেব বিষ্ণুর নামানুসারে স্থানটির নাম রাখেন বিষ্ণুপুর।

আদিমল্লের রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির দিন থেকে বিষ্ণুপুরে এক অব্দ গণনা করা হয়ে থাকে তার নাম মল্লাব্দ। রঘুনাথ বা আদিমল্ল ১২২ বঙ্গাব্দে বা ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। তিনি লাউগ্রামের পাম্বেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রাজা রঘুনাথ তাঁর প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। রঘুনাথ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা ইন্দ্র সিংহের কন্যা চন্দ্রকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে মৃন্ময়ী দেবী আজও বিদ্যমান, তিনিও রাজা রঘুনাথ বা আদিমল্লের প্রতিষ্ঠিতা। চৌত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর আদিমল্ল রাজা রঘুনাথ পরলোক গমন করেন। জয়মল্ল ছিলেন আদি মল্লের পুত্র।

রঘুনাথ চক্রবর্তী—দ্বিজ রঘুনাথ দ্র°।

রঘুনাথ চক্রবর্তী—সামন্তসার নামক স্থাননিবাসী। তাঁর পিতার নাম গৌরকান্তি। রঘুনাথ 'অমরকোষে'র উপর 'ত্রিকাণ্ড চিন্তামণি'

নামক একখানি টীকা রচনা করেন।

রঘুনাথ তর্কবাগীশ—ইনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ন্যায় বিরাট পটভূমিকায় তন্ত্রমতসমূহের আলোচনা করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থ "আগমতত্ত্ববিলাস" (১৬৮৭ খ্রীঃ)। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

রঘুনাথ দাস—হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের কায়স্থ জমিদার গোবর্ধনের পুত্র। বাল্যকাল থেকেই রঘুনাথের ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তাঁর মনে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। পাণিহাটি হতে নিত্যানন্দের সঙ্গ লাভ করে সন্ন্যাস জীবনের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ জন্মে। পরিশেষে বিশাল সম্পত্তি ও সুন্দরী পত্নীকে পরিত্যাগ করে পুরীতে চৈতন্য দেবের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে স্বরূপ দামোদরের উপর তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। যদুনন্দন আচার্য বা রূপগোস্বামী তাঁর শিক্ষা-গুরু ছিলেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তিনি পুরী থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ ও সনাতনের সঙ্গ-লাভ করেন এবং রাধাকুণ্ডের নিকট শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবনের ষট্‌ গোস্বামীর মধ্যে তিনিই ছিলেন শুধু অব্রাহ্মণ। কিন্তু তিনি সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। রঘুনাথের রচিত 'দানকেলি চিন্তামণি' ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ। তাঁর 'মুক্তাচরিত্র' একটি নাতিদীর্ঘ চম্পূকাব্য। কাব্যটি সরস ও সুখপাঠ্য। রঘুনাথ রচিত ঊনত্রিশটি স্তোত্র 'স্তবাবলী' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। রঘুনাথের অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

রঘুনাথ দাস—অবস্থিতিকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। রচিত কাব্য-গ্রন্থ 'হংসদূত'।

রঘুনাথ দাস—আদি কবিওয়ালাদের ইনি অন্যতম। এঁর জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে। ইনি ছিলেন জাতিতে তন্তুবায় এবং চুঁচুড়া-নিবাসী। এঁর জীবৎকাল আনুমানিক ১৭২৫-৯০ খ্রীঃ। হরু, রাসু-নৃসিংহ এঁর কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এঁকে দাঁড়া কবির সৃষ্টিকর্তা বলা হয়ে থাকে।

রঘুনাথ দাস বৈদ্য—এঁর নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার ভিটাদিয়া গ্রামে। জাতিতে বৈদ্য। এঁর পিতার নাম রাম সেন, মাতার নাম মেধা। এঁর রচিত গ্রন্থ "স্বরূপ চরিত্র"। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে নৌকায় বসে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১১৬৭ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল।

রঘুনাথ দ্বিজ—'অশ্বমেধ-পর্ব' পাঁচালী কাব্য রচয়িতা। এই কাব্যের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে। কবি উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেবের সভায় নিজ কাব্য পাঠ করেছিলেন। কাব্যটির

রচনাকাল খুব সম্ভব ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ পর্বের সঙ্গে কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে।

রঘুনাথ দ্বিজ বা রঘুনাথ চক্রবর্তী—ইনি একখানি 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনা করেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে।

রঘুনাথ পণ্ডিত—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য দ্র°।

রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য—কাশীবাসী বাঙালী নৈয়ায়িক ও শিরোমণি সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁর 'মীমাংসারত্ন' দুই খণ্ডে রচিত; এক-খণ্ডে মীমাংসা দর্শনোক্ত প্রমাণ ও ও অপর খণ্ডে প্রমেয়ের আলোচনা আছে। রঘুনাথ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লেখক।

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়—বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দের বর্ণনায় রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন পাণিহাটী অথবা তার নিকটবর্তী কোনও গ্রামের অধিবাসী। ইনি প্রায়ই নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। নিত্যানন্দের নীলাচলে বসবাসকালে রঘুনাথ সেইস্থানে অবস্থান করছিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণ করলে রঘুনাথও তাঁর সঙ্গে পাণিহাটীতে চলে আসেন। তারপর মহাপ্রভু রামকেলি থেকে ফিরে পাণিহাটীতে এলে রঘুনাথ এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচল গিয়ে সেখানে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে খেতুরির মহোৎসবে যোগদান করেন। জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে রঘুনাথ বৃন্দাবনও গমন করে-ছিলেন। রঘুনাথের অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

রঘুনাথ ভট্ট—বৃন্দাবনের রূপ, সনাতন প্রভৃতি ষড়-গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী। শোনা যায়, রাজা মান-সিংহ নাকি তাঁকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা করতেন এবং গুরুর নির্দেশে অম্বরাধি-পতি গোবিন্দ-বিগ্রহের মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। রঘুনাথের পিতা তপন মিশ্র ছিলেন চৈতন্যের প্রথম শিষ্য। চৈতন্য যখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়ে-ছিলেন তখন তপন মিশ্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তপন মিশ্র সপরিবারে কাশী গিয়ে বাস করে-ছিলেন। বৃন্দাবন যাতায়াতের পথে চৈতন্য তাঁর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। ছেলেবেলায় রঘুনাথ চৈতন্যদেবকে দেখেছিলেন। একবার তপন মিশ্রের বাড়ীতে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব বালক রঘুনাথকে কৃপা করেছিলেন। কিছু দিন পরে বয়ঃ-প্রাপ্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের সঙ্গ লাভ করার জন্য রঘুনাথ গৃহত্যাগ করে নীলাচলে এসে উপস্থিত হন। তাঁকে পেয়ে চৈতন্যদেবও সবিশেষ আনন্দিত হন। রঘুনাথ সুনিপুণ সূপকার

ছিলেন। তিনি প্রায়ই চৈতন্যদেবকে রান্না করে খাওয়াতেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করবার উপদেশ দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেন। মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী রঘুনাথ কাশী ফিরে গিয়ে পিতামাতার সেবা করেন এবং অবসর সময়ে বৈষ্ণব ভক্তদের নিকট ভাগবত পাঠ করতেন। চার বছর পরে পিতামাতার মৃত্যু হলে রঘুনাথ পুনরায় নীলাচলে আসেন এবং মহাপ্রভু তাঁর গলায় জগন্নাথের তুলসীর মালা পরিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনে যেতে নির্দেশ দেন। তখন রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ-সনাতনের সান্নিধ্য লাভ করেন। রূপ-সনাতন তাঁর ভাগবতপাঠে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতেন। মৃত্যুর সময়ও তিনি শ্রীচৈতন্যপ্রদত্ত তুলসীমালা পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর আদর্শ জীবনের জন্য তিনি বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য—রঘু পণ্ডিত নামেও পরিচিত। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের বারটি স্কন্দেরই ধারাবাহিক অনুবাদ করেছিলেন। এঁর অনুবাদ মূলের আক্ষরিক অনুসরণমাত্র নয়; প্রতিটি স্কন্ধের মূল প্রতিপাদ্যটুকু গ্রহণ করে কবি স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষায় তার রূপায়ণ সাধন করেছেন। এই অনূদিত গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী"। রঘুনাথ বরাহনগরের অধিবাসী। গৌড় থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় রঘুনাথের কণ্ঠে মূল সংস্কৃত ভাগবত পাঠ শুনে মহাপ্রভু মোহিত হন। এবং রঘুনাথকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। রঘুনাথ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরই রঘুনাথ ভাগবতাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-তরঙ্গিণী' অনুবাদ করেছিলেন বলেই অনুমিত হয়।

রঘুনাথ মল্ল (সিংহ)—বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের দুর্ধর্ষ শক্তিশালী রাজা। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনি দিল্লীর মোগল সম্রাট শাজাহান বাদশাহের সমসাময়িক। এঁর অসীম শৌর্যে বিষ্ণুপুর রাজবংশ 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত হন এবং এঁরই অলৌকিক শক্তিতে বিষ্ণুপুর করভার মুক্ত হয়ে নবাব দরবারে স্বাধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়।

রঘুনাথ রায়—ষোড়শ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার আরড়ার রাজা বাঁকুড়া রায়ের পুত্র। ইনি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বঙ্গের বিখ্যাত কবি দামুন্যার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দেশ ত্যাগ করে আরড়ায় আসেন এবং বাঁকুড়া রায়ের

আশ্রয়ে রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। রঘুনাথ রাজা হয়েও মুকুন্দরামকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন এবং তাঁর সর্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

রঘুনাথ রায় দেওয়ান—ইনি বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বর্ধমানের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। এঁর পিতৃপিতামহও দেওয়ান ছিলেন। এঁর পিতার নাম দেওয়ান ব্রজকিশোর। রঘুনাথ সংস্কৃত ও ফারসীতে অগাধ পণ্ডিত ছিলন। ইনি অনেকগুলি ধর্ম সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের আদেশে রঘুনাথ দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিশারদের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন। এঁর শ্যামা বিষয়ক গানগুলি সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ও রামদুলাল রায় প্রণীত গান-সমূহের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হবার যোগ্য। এঁর গানে "আকিঞ্চন" ভণিতা আছে। প্রবাদ আছে রঘুনাথ প্রত্যহ ভোরে কালীবিষয়ক এবং দুপুরে কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করতেন।

রঘুনাথ শিরোমণি—নিবাস শ্রীহট্ট পঞ্চখণ্ডে। এঁর পিতার নাম গোবিন্দ চক্রবর্তী, মাতা সীতাদেবী। শৈশবে মাতার সঙ্গে নবদ্বীপে এসে রঘুনাথ বাসুদেব নামক এক বিখ্যাত নৈয়ায়িককের গৃহে অবস্থান করেন। বাসুদেব পণ্ডিতের টোলে রঘুনাথ নবদ্বীপের পাঠ শেষ করেন্। ছাত্র জীবনে তিনি তাঁর অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির বহু পরিচয় দিয়েছিলেন। কথিত আছে নবদ্বীপে রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সতীর্থ ছিলেন। নবদ্বীপের পাঠ শেষ করে রঘুনাথ মিথিলায় যান এবং সেখানে পক্ষধর মিশ্রের টোলে তিন বছর অধ্যয়ন করেন। তখন মিথিলার টোলের নিয়ম ছিল যে সেখানকার কোন পুঁথি কোন বিদেশী ছাত্র নকল করে নিয়ে যেতে পারবে না। রঘুনাথ পুঁথিগুলি কণ্ঠস্থ করেই নবদ্বীপে ফিরে আসেন। তিনি নবদ্বীপে টোল খুলতেই মিথিলার গৌরব অস্তমিত হল। নবদ্বীপের টোলে পঞ্জাব, কনোজ, মদ্র ও তামিল দেশের ছাত্রেরা পডতে আসতে লাগল। রঘুনাথ বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যথা—তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি, পদার্থ-খণ্ডন, আত্মতত্ত্ব-বিবেক টীকা, প্রামাণ্যবাদ' নানার্থবাদ, আখ্যাতবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, লীলাবতী টীকা, খণ্ডন খণ্ড খাদ্য-টীকা, ন্যায়লীলাবতী-বিভূতি, প্রত্যক্ষমণি-দীধিতি, অনুমানদীধিতি, শব্দমণি-দীধিতি, নঞ্‌বাদ, গুণকিরণাবলী প্রকাশদীধিতি, দ্রব্যকিরণাবলী প্রকাশ দীধিতি, মলিম্লুচবিবেক প্রভৃতি। তিনি খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে রঘুনাথের আবির্ভাব কাল ১৪৫৫-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে।

রঘুনাথ সার্বভৌম—বিখ্যাত স্মৃতিকার। এঁর রচিত গ্রন্থগুলির নাম স্মার্ত ব্যবহার্ণব, সংক্রিয়ামুক্তাবলী, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

এই গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে, রঘুনাথ ছিলেন মহামহোপাধ্যায়, বন্দ্যঘটীয় বংশসম্ভূত ও নদীয়া জেলার গ্রাম উলানিবাসী। আরও জানা যায় যে গ্রন্থকার নদীয়া রাজপরিবারের 'রায় রাঘব নৃপতি'র পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থরচনা করেছিলেন।

রঘুনাথ সিংহদেব—(দ্বিতীয়) বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মহারাজা ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সম্রাট ঔরংজেব ও বাহাদুর শাহের সমসাময়িক। তৎকালীন ভারতে ইনি ছিলেন সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। ঔরংজেব যখন তার সাম্রাজ্যে সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন রঘুনাথ আলমগীরের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের তাঁর রাজ্যে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ে দিল্লী থেকে তানসেনের বংশধর বাহাদুর সেনকে বিষ্ণুপুরে আনিয়েছিলেন। এবং সঙ্গীতে অনুরাগী দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বিনাব্যয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতের গৌরব বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের জনকরূপে রঘুনাথসিংহদেব প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

রঘুপতি উপাধ্যায়—'তিরোহিতা' ব্রাহ্মণ ও মহাপণ্ডিত। রামানন্দ রায়ের মতো ইনি পরম ভক্ত-পণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রয়াগে বল্লভাচার্যের বাড়ীতে অবস্থানকালে রঘুপতি তথায় তাঁর দর্শনলাভ করেছিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী ইনি নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়ে শোনালে চৈতন্যদেব ভাবাবিষ্ট হন। 'পদ্যাবলী'তে এঁর কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ—নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু। তাঁর পিতার নাম রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কার এবং ভ্রাতা রামনন্দন বিদ্যালঙ্কার। তাঁর রচিত অভিধানের নাম 'প্রাণকৃষ্ণ শব্দাব্ধি'। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের আনুকূল্যে সংকলিত। তাঁর অপর অভিধানের নাম 'শব্দমুক্তামহার্ণব'। ইহা উইলসন্ সাহেবের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের আদর্শ ছিল। দত্তক বিষয়ে রচিত 'দত্তক চন্দ্রিকা' রঘুমণির রচনা বলেই অনেকে ধারণা করেন। রঘুমণির জীবন-কাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

রঘুরাম—সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি কামতা রাজদরবারে সভাকবি ছিলেন। ইনি অপর সভাকবি রুদ্রদেবের সঙ্গে একত্রে মহাভারতের আদিপর্ব রচনা করেছিলেন। ইনি "দ্বিজ" রঘুরাম নামেও পরিচিত।

রডা—জাতিতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জলযুদ্ধ-বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপের সুবিশাল নৌবাহিনীর সুযোগ্য অধিনায়করূপে রডা অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

রণবল্লম মল্ল—কমলাঙ্করাজ। মাণিকচাঁদের বংশধর মুসলমান যুগে স্বাধীনতা রক্ষা করেন। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

রণশূর—রাঢ়রাজ আদিশূরের বংশজাত শূরবংশের শেষ রাজা। এঁর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী। ইনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও কুক্রিয়াসক্ত রাজা। দ্রাবিড় দেশ থেকে রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যবাহিনী এসে দক্ষিণরাঢ় আক্রমণ করলে রণশূর বীরবিক্রমে লড়াই করে শেষে রণে ভঙ্গ দেন। এর কিছুকাল পরেই বিখ্যাত শূরবংশের যবনিকাপাত হয়।

রণ্ণাদেবী—বাংলার পালরাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের মহিষী।

রতিদেব, দ্বিজ—শিবায়ন বা শিবমঙ্গলমূলক 'মৃগলুব্ধ' রচয়িতা। রতিদেব ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ কার্তিক বৃহস্পতিবার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। চাটিগাঁ পটিয়া থানার চক্রশালা পরগণার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হয়। পিতার নাম গোপীনাথ এবং মাতার নাম মধুমতী (বা বসুমতী)। রাম ও নারায়ণ নামে বড় দুই ভাই ছিলেন। কবির গুরুর নাম মোক্ষদা ঠাকুর, শ্বশুরের নাম মহেশ ও শাশুড়ী অন্নপূর্ণা। রতিদেবের মৃগলুব্ধ-কাহিনী নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার,—পাঁচালীর মতো লেখা। কিন্তু রচনার মূলে রচয়িতার অটুট নিষ্ঠার পরিচয় প্রকাশভঙ্গিতে প্রস্ফুট হয়েছে। বিশেষ করে মৃগী কণ্ঠে শিবরাত্রি মাহাত্ম্য-কথনের পরেই জোর দেওয়া হয়েছে। মুদ্রিত 'মৃগলুব্ধ' কাব্যের পরিশিষ্টে 'মনসার ধূপাচার' নামে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে তা এই রতিদেবেরই রচনা হতে পারে। কবি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে সংস্কৃতের বাহুল্য দেখা যায়।

রতিরাম দাস—এঁর 'সারগীতা' বা 'গ্রন্থরসামৃত' সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম প্রাপ্ত গীতার অনুবাদ। রতিরামের বিবরণ থেকে জানা যায় তাঁর গুরু শান্তিপুরনিবাসী রাধাচরণ ঠাকুর ছিলেন নরোত্তমদাসের প্রশিষ্য বেহারী তর্কালঙ্কারের শিষ্য। গুরুর আজ্ঞায় রতিরাম গীতা-পাঁচালী রচনায় হাত দেন।

রতিরাম দাস—রংপুরের এক রাজবংশী কবি। রংপুরের কৃষক-বিদ্রোহকে অবলম্বন করে সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'জাগগান' শীর্ষক ছড়া লিখেছিলেন।

রত্নকীর্তি—নবম শতাব্দীর শেষে

পাল-রাজত্বকালে ইনি 'অভিসময় বিভঙ্গ'র একখানি টীকা লিখেছিলেন।

রত্নগর্ভ সার্বভৌম—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ক্রমচন্দ্রিকা'। এতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির মন্ত্রাবলী লিপিবদ্ধ আছে। ইনি ছিলেন বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গুরু। ইনি গোস্বামী ভট্টাচার্য নামেও পরিচিত।

রত্ননাভ আগমাচার্য—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম সুন্দরী রহস্যবৃত্তি। এঁর গ্রন্থের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, ইনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, মৈত্রেয়। এঁর পিতার নাম নারায়ণ এবং পিতামহের নাম মুকুন্দ। রত্ননাভের গুরু গোপীনাথ।

রত্নপাল—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইনি প্রাগজ্যোতিষপুর (কামরূপ) শাসন করতেন। ইনি ছিলেন শ্রীব্রহ্মপালের পুত্র। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন।

রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি—বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা। বাসুদেব উড়িষ্যা গমন করলে ইনি নবদ্বীপেই বাস করতে থাকেন। রত্নাকরও পরম পণ্ডিত ছিলেন। সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষিণী টীকার নমস্কার বচনে 'বিদ্যাবাচস্পতিম্ গুরুন্' লিখেছেন। সম্ভবতঃ সনাতন বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন। অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দী।

রত্নাকর শান্তি—রত্নাকর শান্তি (৯৮৩ খ্রীঃ) ওদন্তপুরের শ্রাবক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমশিলার দ্বারপণ্ডিতগণের তালিকায় এঁর নাম আছে। ইনি জিতারি ও রত্নকীর্তি প্রভৃতি আচার্যগণের শিষ্য ছিলেন। ইনি বহুকাল সিংহলে বাস করেছিলেন। ইনি তীর্থক দলের প্রতিবাদ নিরাশ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এঁর রচিত প্রধান পুস্তকের নাম "বিজ্ঞানমাত্র-সিদ্ধি"। এঁর রচিত অপর গ্রন্থের নাম "সহজরতিসংযোগ"। এঁর 'রাজাচার্য' ও 'মহাপণ্ডিত' উপাধি ছিল। ইনিই সম্ভবতঃ পালরাজ প্রথম মহীপালের আচার্য বা গুরু ছিলেন। কখনো কখনো রত্নাকর 'শান্তি-পদ' নামেও পরিচিত হতেছিলেন। রত্নাকর শান্তি অতীশেরও অন্যতম দীক্ষাগুরু।

রবি গুপ্ত—ইনি সর্বদগুদাহক সিদ্ধসারকৃৎ এবং বিশিষ্ট বৌদ্ধবৈদ্য। এঁর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। নবম শতাব্দীতে রচিত ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্ত ভট্ট এঁর নামোল্লেখ করেছেন। ইনি বঙ্গীয় শূরবংশজাত কোনও রাজার ধর্মাধিকরণে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে অনুমিত হয়।

রমানাথ দ্বিজ—"দ্বিজ" রমানাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। এঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রধানত ভাগবতেরই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড কাহিনী বাদ যায় নি। রচনায় চাতুর্য নেই, তবে সারল্য আছে।

রমেশশাস্ত্রী—ষোড়শ শতাব্দীতে তাহিরপুরের রাজা কংস-নারায়ণের সময় রমেশ শাস্ত্রী ছিলেন বাংলা বেহারের মধ্যে সর্ব-প্রধান পণ্ডিত। রাজা কংসনারায়ণের অভিপ্রায় অনুযারী ইনি তাঁকে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আধুনিক দুর্গোৎসবপদ্ধতি রমেশ শাস্ত্রী-প্রণীত।

রসময় দাস—একজন পদকর্তা। এঁর আর কোন পরিচয় জানা যায় না। 'রসময় দাস' ভণিতায় তিনটি পদ 'পদ কল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনটি পদই বাংলা মাথুর-বিরহের পদ। ওতে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা ও প্রেমোচ্ছ্বাস বেশ ফুটেছে। এঁর রচিত "বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরাণ-পুতলি" ইত্যাদি পদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি গোপী-ভাবের অভিমানে নিজকে "রসময়ী দাসী" রূপে পরিচিত করেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। "রসময়ী দাসী" প্রকৃতপক্ষে কোনও মহিলা কবি কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী।

রসিক মিশ্র (দ্বিজ)—একজন কবি। এঁর রচিত 'মনসা-মঙ্গল' কাব্য একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। এঁর কাব্যের ভণিতা থেকে এঁর আত্মপরিচয় জানা যায়। কবির প্রপিতামহের নাম কালিদাস, পিতামহের নাম মহেশ মিশ্র, পিতার নাম শিবপ্রসাদ। সেনভূম ও মল্লভূমের মধ্যবর্তী আখড়া-শাল নামক স্থানে কবির নিবাস ছিল। কবির দুই ভ্রাতার নাম রাজারাম ও অযোধ্যা; এক ভগিনী—নাম সাবিত্রী। কবির দু'টি উপাধি ছিল—কবিকঙ্কণ ও কবিবল্লভ। দ্বিজ রসিক সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর মনসা-মঙ্গল কাব্যে রামায়ণ ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়। রামায়ণের হনুমান চরিত্রটিকে মনসা-মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কবি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এঁর কাব্যে কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

"কালিদাস গুণজিতা
মহেশ-মিশ্রির পিতা
তার সুত প্রসাদ কুশল
রসিক নন্দন তস্য
সঙ্গীতে অভিলষ্য
বিরচিল মনসামঙ্গল।"

ভণিতায় কাব্যের নাম ক্বচিৎ 'জগতীমঙ্গল' পাওয়া যায়।

রসিকানন্দ দাস—নীলাচলের অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন রসিকানন্দ। ইনি ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। রসিকানন্দ অনেকগুলি মুসলমানকে শিষ্য করে-ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মেদিনীপুরের শাসনকর্তা আহম্মদ বেগ। রসিকানন্দের শিষ্য গোপীজনবল্লভ দাস তাঁর জীবনী

অবলম্বনে 'রসিকামঙ্গল' নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। রসিকানন্দের খুল্লতাত ছিলেন তুলসী ঠাকুর। রসিকানন্দের মাতার নাম ছিল ভবানী। ইনি খেতুরির মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। রসিকানন্দের একটি মাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস বিষয়ক একটি বাংলা পদ। এতে শ্রীগৌরাঙ্গের কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণকালে নাপিত কর্তৃক কেশ-মুণ্ডন অতি মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রাইচরণ দাস—সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি। এঁর রচিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ 'অভিরামবন্দনা'। পুথির লিপিকাল ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। সম্ভবতঃ ইহা মল্লাব্দ। অভিরাম বন্দনায় জাহ্নবা দেবীর প্রসঙ্গ আছে। এবং "দ্বিজ" রামপ্রসাদ ভণিতায় একটি পদও উদ্ধৃত আছে।

রাঘব দেবশর্মা—রাঘবের রচিত গ্রন্থ পঞ্চকল্পতরু। ইনি রামানন্দ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। গ্রন্থটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিষয়ক নিবন্ধ।

রাঘব পঞ্চানন—বিখ্যাত নৈয়ায়িক জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর রচিত একটিমাত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, নাম—'আত্মতত্ত্বপ্রবোধ' উদয়নাচার্যের আত্মতত্ত্ববিবেকের ন্যায় এর প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি—প্রথম ভাগে বৌদ্ধমত-নিরাসপূর্বক ঈশ্বরসিদ্ধি এবং দ্বিতীয় ভাগে মুক্তিবিবেচন। রাঘব পঞ্চাননের এই গ্রন্থরচনাকাল ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।

রাঘব পণ্ডিত—পাণিহাটি-নিবাসী। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূল স্কন্ধ-শাখায় এঁকে চৈতন্যের 'আদ্য অনুচর' বলা হলেও গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার মধ্যে এঁর নাম দৃষ্ট হয় না। এঁর নাম পাওয়া যায় চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণকালে। রাঘবের ভগ্নী দময়ন্তী দেবীও একজন ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। দেশ-দেশান্তর থেকে রাঘব বহু অর্থব্যয়ে দিব্য সামগ্রী এনে কৃষ্ণ-পূজার আয়োজন করতেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর নীলাচলাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে রাঘবের নাম পাওয়া যায়। ইনি মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তন, জলকেলি প্রভৃতি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করতেন। মহাপ্রভু পঞ্চমুখে রাঘবের কৃষ্ণভক্তির প্রশংসা করে প্রেমালিঙ্গন দান করেছিলেন। মহাপ্রভু গৌড়ে এসে প্রথমে রাঘবের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। রাঘব ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দপ্রভু মাঝে মাঝে পাণিহাটিতে এসে রাঘবের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। ইঁনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

রাঘবানন্দ রায়—বীরভূম জেলার রাঘবপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর পূর্ব বাস ছিল বর্ধমান জেলার মেমারির সন্নিকটস্থ হরকলা-বাবোয়া

গ্রামে। সেখান থেকে ইনি বীরভূমের রাজনগররাজের জনৈক কর্মচারী নিযুক্ত হন। ইনি তলোয়ার ও লাঠি-খেলায় বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এজন্য রাজা সাহেব এঁকে বিশেষ ভাল-বাসতেন। এবং এঁকে সমরকৌশলে বিশেষ পারদর্শী দেখে সৈনিক বিভাগে স্থানান্তরিত করেন। সম্ভবতঃ এই রাজা ছিলেন খাজা কমল খাঁ। তাঁর মৃত্যুর পর নূতন রাজা আসাদুল্লা খাঁর সঙ্গে স্বাধীনমনা রাঘবের মনোমালিন্য ঘটায় রাঘব রাঘবপুরে এসে জঙ্গল কেটে নূতন পল্লী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এঁরই নামানুসারে নাম হয় রাঘবপুর। এঁর তেজস্বিতা ও পরোপকারিতার জন্য ইনি পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এঁর অবস্থিতি কাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী।

রাজকৃষ্ণ বাহাদুর—কলকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণদেব বাহাদুরের পুত্র। এঁর জন্ম ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি 'কুলপ্রদীপ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই এই গ্রন্থ তাঁর পুত্র কালীকৃষ্ণ দেব ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

রাজগুরু মদন—গৌড়বঙ্গের অধিবাসী। মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত পিপলিয়ানগর নামক স্থানের রাজা অর্জুন বর্মদেবের গুরু ছিলেন মদন। পিপলিয়ায় ও ভূপালে অর্জুন বর্মদেবের যে দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তার রচয়িতা এই মদন। মদনের বহু রচনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাঁর রচনার মধ্যে কাব্য এবং নাটকও ছিল। মদন ছিলেন গঙ্গাধর বংশীয়। এঁর গুরু ছিলেন জৈনাচার্য আশাধর। ত্রয়োদশ শতাব্দী এঁর আবির্ভাবকাল। মদনের উপাধি ছিল বালসরস্বতী।

রাজগোবিন্দ সার্বভৌম—শ্রীহট্টের ইটাপরগণার উড়া গ্রাম-নিবাসী। ইনি বহু সদ্‌গ্রন্থের লেখক এবং শ্রীহট্টের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য এবং এঁর ন্যায় বহু পণ্ডিতের জন্ম-স্থান বলে শ্রীহট্ট সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বাক্যপ্রচলিত আছে—"শ্রীহট্টে নাস্তি মধ্যমঃ"। রাজগোবিন্দ সার্বভৌম জীবনের শেষ-ভাগে কাশীবাস করেন এবং তথায় অধ্যাপনার দ্বারা কাল যাপন করেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

রাজধর মাণিক্য—ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের পুত্র। অমর-মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজধর ১৬১১-২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরা শাসন করেন। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ইনি সার্বভৌম ও বিরিঞ্চি নারায়ণ নামক পরম বৈষ্ণব পুরোহিত ও ২০০ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সর্বদা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করতেন। আটজন কীর্তনীয়া দিন-রাত্র কীর্তন গান করত। ইনি অনেক

দানধ্যান করেন এবং মঠমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

রাজবল্লভ চক্রবর্তী—বোরাকুলি গ্রামনিবাসী গোবিন্দ চক্রবর্তী বা ভাবক চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁরা পিতাপুত্র উভয়েই শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য ছিলেন। রাজবল্লভ সম্ভবতঃ একজন পদকর্তা ছিলেন। এঁর আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

রাজবল্লভ দাস—রামচন্দ্র গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'বংশীবিলাস' ও 'মুরলী বিলাস'। গ্রন্থদ্বয়ে স্বীয় গুরু ও জ্যেষ্ঠতাত রামচন্দ্র গোস্বামীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ইনি ছিলেন শচানন্দন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এর অপর দুই ভ্রাতা শ্রীবল্লভ ও শ্রীকেশবও কবি ছিলেন। শ্রীবল্লভ 'শ্রীবল্লভ-গীতা' ও কেশব 'কেশব-সঙ্গীত' রচনা করেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'রাজবল্লভ' ভণিতার দুটিমাত্র পদ সংগৃহীত হয়েছে।

রাজবল্লভ, রাজা—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম কৃতী পুরুষ। এঁর পিতার নাম কৃষ্ণজীবন। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার বৈদ্য পরিবারে এঁর জন্ম হয়। কৌলিক উপাধি সেন। রাজবল্লভ শৈশব থেকেই অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। বিদ্যাবত্তা, মল্লযুদ্ধ, অসি-চালনা ও নানা শারীরিক ব্যায়ামে ইনি অশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রাজবল্লভ প্রথমে কানুনগো সেরেস্তার মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন (১৭১৭ খ্রীঃ)। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নাওয়ার বিভাগের পেস্কারের পদ লাভ করেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদপ্রাপ্ত হন। নবাব আলীবর্দী খাঁর জামাতা নোয়াজিস্ খাঁর মৃত্যুর পর রাজবল্লভ তাঁর বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগমের দেওয়ান হন। পরে ঢাকার নবাব হোসেন কুলী খাঁ এঁকে তাঁর সহকারীর পদে নিযুক্ত করেন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে রাজোপাধি আনিয়ে দেন। হোসেনকুলির মৃত্যুর পর রাজা রাজবল্লভই ঢাকার একপ্রকার সর্বেসর্বা হয়েছিলেন। এবং ধনেমানে ইনি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হয়েছিলেন। ইনি প্রথম থেকেই সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং ইংরেজদের সহায়তা করেন। সিরাজউদ্দৌলা এঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। মীরজাফর বাংলার নবাব হলে রাজবল্লভের আবার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মীরকাসিমের শাসন-সময়ে এঁকে এক রকম বন্দীভাবে জীবনযাপন করতে হয়েছিল। মীরকাশিম এঁর প্রাণবধের আদেশ দিলে ইনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দেন (১৭৬৩ খ্রীঃ)।

পূর্ববঙ্গের বৈদ্য পরিবারে উপনয়ন সংস্কারে ও বালিকা-বিধবার পুণর্বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কেবলমাত্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অদৃষ্ট

হস্তক্ষেপের জন্য বিধবা-বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

রাজবল্লভ, রাজা—চুঁচুড়ার সোম বংশ-জাত, মহারাজা জানকী রামের পৌত্র, দুর্লভরামের পুত্র। জন্ম ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি তেজস্বী, বীর্যবান, বুদ্ধিমান ও পরহিতকামী ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতায় এঁর পিতার প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে বাস করতেন। এঁর নামে কলকাতার বাগবাজারের একটি রাস্তার নাম 'রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট।' ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভের মৃত্যু হয়। তিনি উত্তর কলকাতার অভিজাত অধিবাসী ছিলেন।

রাজভট বা রাজভট্ট—সেং-চি নামক একজন চীনা ভ্রমণকারীর (৬৫০-৬৫৫ খ্রীঃ) ভ্রমণ-বিবরণ হতে জানা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজভট নামক একজন বৌদ্ধরাজা সমতটে রাজত্ব করতেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খড়্গবংশীয় রাজভট্ট ও এই রাজভট অভিন্ন। পিতার নাম দেবখড়্গ, পিতামহ জাতখড়্গ, প্রপিতা-মহ খড়্গোদ্যম। রাজভট্টের মহিষীর নাম প্রভাবতী।

রাজ রাজ—বাংলার খড়্গ রাজ বংশের শেষ রাজা। এঁর মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গের কিছুটা অংশ নিয়ে এঁর রাজ্য গঠিত ছিল। এঁর রাজধানী ছিল সম্ভবত কর্মান্ত। কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত বড়কামতা নামক স্থানটি 'কর্মান্ত' বলে কারও কারও বিশ্বাস। এঁর রাজত্বকাল সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ।

রাজসিংহ—ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গের রাজা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি 'ভারতী মঙ্গল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত কবি কালিদাস সম্পর্কিত একটি লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করে এই কাব্যখানি রচিত। তিনি সরস্বতী কুণ্ডে স্নান করে কিভাবে অগাধ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব লাভ করেন ইহাই কাব্যখানিতে বর্ণিত আছে। ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত-বহুল। রাজসিংহের অন্য দু'খানি গ্রন্থ "রাগমালা", "মনসা পাঁচালী।' ইনি সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। ১১৫৮ বঙ্গাব্দে রাজা রাজ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন।

রাজ্যপাল—নারায়ণপালের এক মাত্র পুত্র। এঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ৯০৮-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর রাজত্বের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। পাল-রাজগণের সভাকবি লিখেছেন যে রাজ্যপাল সমুদ্রের ন্যায় গভীর জলাশয় খনন ও পর্বতের তুল্য উচ্চ মন্দির নির্মাণ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটপতি জগতুঙ্গদেবের কন্যা ভাগদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এঁরই একমাত্র পুত্র দ্বিতীয় গোপাল দেব।

রাজারাম দত্ত—এঁর রচিত

ভাগবতের অনেক প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়েছে। একখানি পুথির লিপিকাল ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ এবং লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দে। পুথিখানি এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবির রচনা প্রাঞ্জল।

রাজারাম সিংহ—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি ছিলেন মেদিনীপুরের ফৌজদার। ইনি সিরাজউদ্দৌলার সংবাদবিভাগের সর্বপ্রধান কর্মচারী ছিলেন। ইংরেজদের কাগজপত্রে ইনি নবাবের প্রধান গুপ্তচর বলে দেখতে পাওয়া যায়। ইনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। পলাশি যুদ্ধের পরাজয় এবং সিরাজউদ্দৌলার হত্যার পরেও রাজারাম ইংরেজের নিকট নতি স্বীকার করেন নি। ক্লাইব এঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর—ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। এঁর অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সময়ে সময়ে পণ্ডিত সমাজ বিস্মিত হয়ে যেতেন। এঁর একটি বড় চতুষ্পাঠী ছিল। সেখানে ইনি সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করতেন। গ্রাম্য ছাত্র ব্যতীত বিদেশাগত বহু ছাত্রও এঁর নিকট অধ্যয়ন করত। এঁর পিতার নাম গোপীনাথ। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কমলাকর ছিলেন এঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ। রাজীবের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে কোন কোন রাজা ও জমিদার একে জ্যোতির্বিদ সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান, কিন্তু স্বাধীনচেতা রাজীব তা কখনো গ্রহণ করেন নি। এঁর পুত্রের নাম প্রাণবল্লভ। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। ইনি নদীয়ার অধিবাসী।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশসম্ভূত বলে জানা যায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে উইলিয়ম কেরীর অধীনে রাজীবলোচন মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'। এই একখানি মাত্র পুস্তকের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজীবলোচনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজীবলোচনকে একশত টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে পুস্তক প্রকাশিত হয়।

রাজু—কালাপাহাড়ের নামান্তর। কালাপাহাড় দ্র°।

রাজু গোস্বামী—অযোধ্যারাম গোস্বামী দ্র°।

রাজেন্দ্র চক্রবর্তী—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইনি ও এঁর সহোদর রামনারায়ণ, রাজপুতানায় যান এবং সেখানে রত্নগর্ভ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দুই কন্যাকে দুইজনে বিবাহ করে জয়পুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

রাজেন্দ্র চোল—দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য রাজ্যের রাজা। পরে সমগ্র পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আন্দামান এবং পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। এবং বর্তমান হুগলী জেলার গোঘাট থানার মধ্যে অপার মান্দার গড়ে (গড় মান্দারণ) রাজ্য স্থাপন করেন।

রাজেন্দ্র দাস—'ভাবত-পাঁচালী' রচয়িতা। এঁর রচিত আদিপর্বে শকুন্তলার কাহিনীই প্রধান স্থান নিয়েছে। কাব্যটিকে 'শকুন্তলা উপাখ্যান' নাম দেওয়াই সঙ্গত। কাব্যের কাহিনী অভিনব। এর রচনা অতি মনোরম। এঁর কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

রাণক শূলপাণি—প্রাচীন বাংলার একজন খ্যাতনামা শিল্পী। নিজের পরিচয়প্রসঙ্গে ইনি বলেছেন যে ইনি বরেন্দ্রের শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি অর্থাৎ শিল্পীদের সঙ্ঘের চূড়ামণি অর্থাৎ শিল্পীদের সঙ্ঘের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। এঁর অবস্থিতিকাল নবম শতাব্দী।

রাধাকান্ত, দ্বিজ—দ্বিজ রাধাকান্ত সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। এঁর রচিত একখানি কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি পাওয়া যায়। ইনি এঁর কালিকা-মঙ্গলকে 'শ্যামার গীত' বলে উল্লেখ করেছেন, খুব সম্ভব দ্বিজ রাধাকান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন।

রাধাকান্ত দেব, রাজা স্যার—(১৭৯৪-১৮৫৭ খ্রীঃ)। উনবিংশ শতকের আরম্ভে বাংলার নবজাগরণের যুগে গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের সুবিদিত নেতা ও বিশেষ বিদ্যোৎসাহী। তবে ইনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষারপক্ষপাতী ছিলেন। বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রণয়নে এর অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রকাশনে ইনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

ভারতীয় বালকদের পাশ্চাত্য বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার জন্য ইনি ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছিলেন। তাছাড়া, ইনি স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠায়ও সহযোগী ছিলেন। কারণ, ইনি অনুভব করতেন যে শিক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষে সস্তায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ বিশেষ সহায়ক।

ইনি সমাজ-সংস্কার ও ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধী ছিলেন। এমন কি অমানুষিক সতীদাহ প্রথা বিলোপেরও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। এবং ইনি এজন্য পার্লামেন্টে গণ-আবেদনের

নেতৃত্ব করেছিলেন। হিন্দু রক্ষণশীল-তার ইনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

রাধাকান্ত বৈদ্য কবিকণ্ঠহার—কাতন্ত্রপরিভাষা টীকাকার মাধব দাস কবিচন্দ্রের পৌত্র এবং 'রত্নাবলী' নামক বৈদ্য গ্রন্থকার ত্রিলোচন কবীন্দ্র-চন্দ্রের পুত্র। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি বরিশালে বাস করতেন। ইনি বৈদ্যশাস্ত্রের 'প্রয়োগরত্নাকর' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রাধাকান্ত মিশ্র—এঁর রচিত কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভণিতায় শুধু "শ্যামার মঙ্গল" বলে উল্লিখিত হয়েছে। কবির নিবাস ছিল কলকাতায়। এঁকেই খাস কলকাতা শহরের সবচেয়ে পুরনো কবি বলা যায়। এই কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দা কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-কুলে কবির জন্ম হয়। রাধাকান্তের পিতামহের নাম শ্রীবল্লভ, পিতা রমানাথ, অগ্রজ দেবীরাম। তাঁর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। রাধাকান্তের কাব্যের ভাষা মার্জিত, ভাব গ্রাম্যতাবর্জিত। কাহিনী গতানু-গতিক হলেও চরিত্রচিত্রনে নূতনত্ব আছে।

রাধাকান্ত সিংহ—কান্দী রাজবংশের পূর্বপুরুষ। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। ইনি বঙ্গাধিকারী নবাব সরকারে কাজ করতেন। নিজ ক্ষমতায় ও বুদ্ধিবলে ইনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। নবাব আলীবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে রাধাকান্ত রাজস্ব বিভাগের একজন উচ্চ রাজ-কর্মচারী ছিলেন। রাধাকান্তের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির কথা শুনা যায়। রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজপত্র এঁর করতলস্থ ছিল। সিরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করার ব্যাপারে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন রাধাকান্ত তাঁদের একজন। মীরজাফর নবাব হলে ক্লাইব রাধাকান্তকে মহম্মদ রেজা খাঁ ও দুর্লভ রামের সঙ্গে রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাব-ধানের কাজে নিয়োগ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকান্তের মৃত্যু হয়।

রাধাকৃষ্ণ দাস—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'রসভক্তি লহরী'। ইহা ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এতে রসতত্ত্ব এবং লীলাতত্ত্ব দুইই বিচারিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ দাস ছিলেন অম্বিকা-নিবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের সম্প্রদায়-শিষ্য। দীক্ষাগুরু নিমাইচাঁদ গোস্বামী, শিক্ষা-গুরু পীতাম্বর বৈরাগী গোসাঞি।

রাধাকৃষ্ণ দাস—কবি রাধাকৃষ্ণ দাস কুচবিহারের রাজা হরেন্দ্র-নারায়ণের আদেশে কুচবিহার রাজ-বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গোসানী দেবীর বর্ণনা "গোসানী-মঙ্গল" রচনা করেন (১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ)। কবি রঙ্গপুর জেলার বাগদুয়ার পরগণার অন্তর্গত ঝাড়বিশিনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

রাধানন্দ দেব—রসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৫৩৮ শকাব্দ। ইনি

সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত 'শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্য' এঁর অক্ষয় কীর্তি। তাছাড়া, এঁর পদাবলীও আছে। ১৬০৬ শকাব্দে এঁর তিরোভাব হয়।

রাধাবল্লভ দাস বা **রাধা দাস**—কাঞ্চনগেড়িয়া গ্রামবাসী সুধাকর মণ্ডল ও তৎপত্নী শ্যামাপ্রিয়ার পুত্র। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্যদের তিনজন রাধাবল্লভ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি রাধাবল্লভ চক্রবর্তী তিনিই পদকর্তা। কারণ, রামগোপাল দাস তাঁর রসকল্পবল্লীতে "শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্তী ঠাকুর" বলে পদ উদ্ধৃত করেছেন। রাধাবল্লভ ধারাবাহিকভাবে কৃষ্ণলীলা পদাবলী রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। একটি পুঁথিতে আঠারটি পদ পাওয়া গিয়েছে। পদগুলিতে ভাগবতের কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। রাধাবল্লভ কয়েকটি শোচক অর্থাৎ শোকপ্রকাশক পদ লিখেছিলেন। রঘুনাথ দাসের 'বিলাস কুসুমাঞ্জলি'র বাংলা অনুবাদও রাধাবল্লভ করেছিলেন।

ইনি সনাতন-রূপ-রঘুনাথের মহিমাখ্যাপক একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করেছিলেন; উহা 'শোচক' (পুঁথিতে সূচক) নামে প্রসিদ্ধ। এঁর অপর গ্রন্থের নাম "সনাতন গোস্বামীরসূচক" ও "সহজতত্ত্ব"। রাধাবল্লভ বাংলা ও ব্রজবুলী এই উভয়বিধ পদের রচনায়ই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এঁর পদাবলীও নানাবিষয়ক। ইনি লোচনদাসের ধামালি পদের অনুকরণে "মন মোহনিয়া গোরা ভুবনমোহনিয়া" ইত্যাদি পদ রচনা করেছেন।

রাধাবল্লভ শর্মা—ইনি "সপিণ্ডাদি-বিচার-প্রবৃত্তি" নামক একখানি স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

রাধামাধব ঘোষ—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। রাধামাধব ঘোষ বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ 'বৃহৎ সারাবলির' সঙ্কলয়িতা বা রচয়িতা।

পৌরাণিক কাহিনী ও বৈষ্ণবজীবনী নিয়ে গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণলীলা, দ্বিতীয় খণ্ডে রাম লীলা, তৃতীয় খণ্ডে গৌরাঙ্গলীলা, চতুর্থ খণ্ডে জগন্নাথ লীলা। প্রথম খণ্ডে ব্রহ্ম বৈবর্ত ও ভবিষ্য পুরাণ, দণ্ডীপুরাণ, হরি বংশ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। চতুর্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে স্কন্দপুরাণের। গ্রন্থটির কতকাংশ লেখকের নিজস্ব রচনা, কতক অংশ পূর্বতন গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

রাধামাধবের পিতৃনিবাস ছিল হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামে। পিতা রামপ্রসাদ, মাতা অলকা, বিমাতা শিবানী, মাতামহ সাফল্যরাম। রাধামাধব পৈতৃক নিবাস ছেড়ে আরামবাগের অন্তর্গত জাহানাবাদ-এর কাছে পশ্চিমপাড়া গ্রামে শ্বশুরালয়ে

গমন করেন। তাঁর পিতা-পিতামহ বংশধরায় "রাজমন্ত্রী" ছিলেন।

রাধামুকুন্দ দাস—বৈষ্ণব সাহিত্যে 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি পদাবলীর নানা সঙ্কলন গ্রন্থ দেখে 'মুকুন্দানন্দ' নামে একটি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। মুকুন্দানন্দ পূর্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে এবং ষোড়শ স্তবকে গ্রথিত। এতে সর্বসমেত ৬৫৯টি পদ আছে। রাধামুকুন্দের স্বরচিত পনেরটি পদ এতে আছে। স্বরচনায় ইনি 'রাধা-মুকুন্দ' এবং 'মুকুন্দ' উভয় ভণিতাই ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থ-সঙ্কলন কাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। রাধামুকুন্দ ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের এক প্রধান শিষ্য গোবিন্দ-চরণ চক্রবর্তীর বংশধর। পিতার নাম পতিতপাবন।

রাধামোহন—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম গৌতমীয় তন্ত্রতত্ত্বদী[illegible]কা। ইনিই বোধহয়, সেই বৈষ্ণব রাধামোহন যিনি 'কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণব' নামক গ্রন্থ এবং রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতত্ত্বে'র ও গোতমন্যায়সূত্রের টীকা রচনা করে-ছিলেন। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর লেখক ও কোলব্রুকের বন্ধু ছিলেন।

রাধামোহন গোস্বামী (ঠাকুর)—বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত। এঁর জন্ম শ্রীনিবাস আচার্যের বংশে সপ্তদশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটি গ্রামে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য থেকে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন এঁর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। রাধামোহন শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় প্রকট বলে অভিহিত হন। এঁর পিতার নাম জগদানন্দ। ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে রাধামোহনের অগাধ জ্ঞান ছিল। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় ইনি সমসাময়িককালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। কথিত আছে যে, শাস্ত্রযুক্ত ও তর্কযুদ্ধে ইনি জয়পুররাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করে "পরকীয়া" মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং তিনি মালিহাটীতে গুরুর স্মৃতি রক্ষার্থ "রাধাসাগর" নামে একটি দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এঁর "পদামৃত সিন্ধু" গ্রন্থটি বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত। সংস্কৃত টীকা গ্রন্থটি 'মহাভাবানুসারিণী' রাধামোহনেরই প্রণয়ন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। রাধামোহন সুগায়কও ছিলেন। এঁর সংস্কৃত পদগুলি প্রায় কবি জয়দেবের অনুকরণে রচিত।

রাধামোহন দাস—পয়ারে 'মন্ত্রার্থচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা।

রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য—অদ্বৈতাচার্যের অবস্তন সপ্তম পুরুষ এবং শান্তিপুর বিদ্যাসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন।

স্মৃতি স্থায়াদি নানা শাস্ত্রে তাঁর রচিত টীকা ও নিবন্ধ বাংলার সর্বত্র এবং তাঁর নব্যন্যায়ের পত্রিকাসমূহ এক সময়ে বাংলার বাহিরেও প্রচার লাভ করেছিল। এঁর জন্ম তারিখ ১৭৩০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন। এঁর স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন 'জোড়াবাড়ী'র বিখ্যাত 'গোপাল ন্যায়ালঙ্কার'। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী: ভাগবত-তত্ত্বসার, তত্ত্বসংগ্রহ-ভক্তিরহস্য, কৃষ্ণভক্তি সুধার্ণব, শ্রীকৃষ্ণার্চন-চন্দ্রিকা, তত্ত্বসন্দর্ভটিপ্পনী, কৃষ্ণতত্ত্বামৃত, কৃষ্ণভক্তি-রসোদয়, পদাঙ্কদূতটীকা, ন্যায়সূত্রবিবরণ, ব্যাখ্যাপ্রকাশ প্রভৃতি। ইনি নব্যন্যায়ের পত্রিকা রচনা করেও যশস্বী হয়েছিলেন।

রাধামোহন সেন—কলকাতার উত্তরাঞ্চলের কাঁসারিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে রাধামোহন সেনের জন্ম হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলায় কাব্য রচনা করে তিনি সমসাময়িক কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: বিদ্বমোদ তরঙ্গিণী, অন্নপূর্ণামঙ্গল, রসসার সঙ্গীত।

রানী ভবানী—উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলার অন্তর্গত নাটোরের রানী। নাটোরের প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে রানী ভবানীর পরিণয় হয়েছিল। ১১২২ বঙ্গাব্দে বগুড়ার ছাতিয়ান গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে রানী ভবানীর জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম ছিল আত্মারাম চৌধুরী। কথিত আছে ইনি অতি সুলক্ষণা ও সুন্দরী ছিলেন। এইজন্য নাটোরের ভূম্যাধিকারী রাজা রামজীবন রায় আপন পুত্র রামকান্ত রায়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। রানী ভবানীর দুই পুত্র জন্মের কিছুদিন পরেই মারা যায়। একমাত্র কন্যা তারা ঠাকুরানী জীবিতা ছিলেন। তিনিও অল্পবয়সে বিধবা হন।

রানী ভবানীর ন্যায় দানশীলা রমণী কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। দেবসেবা, অতিথিসেবা ও নানাপ্রকার ধর্মকার্যের জন্য ইনি প্রতি বছর এক লক্ষ আশি হাজার টাকার নগদ বৃত্তি নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাছাড়া, ইনি বীরভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ, বগুড়া, যশোহর ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে দেব প্রতিষ্ঠায় ও ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি প্রধান ব্যক্তিদের ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ বিঘা জমি দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর দিয়েছিলেন। ইনি কাশী, গয়া, রাজসাহী ও বড় বড় নগরে অনেক দেবালয় স্থাপন করে-ছিলেন। ইনি দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু পান্থনিবাস নির্মাণ করে দেন। জলাভাব দূরীকরণের জন্য ইনি বহু পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়ে দেন।

কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে ইনি প্রত্যহ পাঁচশমণ চাল বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া, হাজার

হাজার লোক অন্নও গ্রহণ করত। পশুপক্ষীদের মধ্যেও আহার্য বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। রানী কাশী গমন কালে ১৭০০ নৌকাভর্তি জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া, প্রতি বছর চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ১০০০ নৌকা পরিপূর্ণ করে কাশীতে গমন করতেন। এই সকল দান ও সদ্ব্যয়ের জন্য কাশীতে রানী ভবানীকে কলির অন্নপূর্ণা আখ্যা দিয়েছিল। গয়াধামেও ইনি অনেক পুণ্যকর্ম ও দেবালয় স্থাপন করেছিলেন। গয়ালীকে নগদ ও জহরাতে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। নাটোর গঙ্গাহীন স্থান বলে রানী অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বড নগর গ্রামে গঙ্গা তীরে বাস করতেন। রোগীদের প্রতিও এঁর অসাধারণ দয়া ছিল। ইনি আটজন বৈদ্যকে বেতন দিয়ে রেখেছিলেন। তারা বড়নগর ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের আবশ্যকীয় রোগীদের চিকিৎসা করে বেড়াত। ঔষধ পথ্যাদিও বিনামূল্যে বিতরিত হত। রানী ভবানী অত্যন্ত পবিত্রহৃদয়া ও ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। ধর্মের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করতেন। তাঁর ন্যায় বিদুষী মহিলা খুব কমই দেখা যায়। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন। তার পর জমিদারির সমস্ত কাজকর্ম তিনি নিজেই দেখাশুনা করতেন। প্রজাদের শুভাশুভের সমস্ত বিষয়ই তিনি সম্যক-ভাবে অবগত হতেন। ৭৯ বছর বয়সে রানী ভবানী পরলোক গমন করেন।

রাবিয়া বেগম—নবাব আলীবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। সুজা খাঁর আত্মীয় আতাউল্লা খাঁর সঙ্গে রাবিয়ার পরিণয় হয়। পিতার নাম ছিল হাজি মহম্মদ। সিরাজের মতিঝিল আক্রমণকালে রাবিয়া ঘসেটি বেগমের সঙ্গে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। ঘসেটির মতো ইনিও দুশ্চরিত্রা ছিলেন।

রামকমল সেন—(১৭৮৩-১৮৪৪ খ্রীঃ) চব্বিশ পরগণার গরিফা গ্রামে জন্ম। পরবর্তী কালে মধ্য কলকাতার মধ্য কলুটোলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পিতা গোকুলচন্দ্র সেন সে-যুগের একজন নামকরা ফার্সী-নবিস ছিলেন। ১৮০০-১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রামকমল কলকাতার চীফ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নেমির অধীনে চাকরি করেন। ১৮০৪-১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ডাঃ উইলিয়ম হাণ্টারের 'হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেসে'কম্পোজিটার-রূপে এবং ১৮১১-২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উহার তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করেন। এই সময়ে হোরেস হেমান উইলসনের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর সহায়তাই রামকমলের উন্নতির সূচনা। ১৮২৮-৪৪ খ্রীঃ অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত রামকমল টাঁকশালের নেটিভ সেক্রেটারী বা দেওয়ানের পদে কাজ করেন।

রামকমলের জ্ঞানার্জন-স্পৃহা ছিল

অত্যন্ত প্রবল। নানা কাজকর্মের মধ্যে সারাদিন ব্যস্ত থেকেও অবসর সময়ে অধ্যয়নে রত থাকতেন। বাংলা-ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফার্সী এই চারটি ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি গভীর গবেষণাও করেছেন। কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজের সঙ্গে রামকমলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর রচিত একাধিক পুস্তক কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজেরও তিনি ছিলেন একজন বিশেষ উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। হিন্দু কলেজের শিক্ষা-সম্প্রসারণে ব্যবহার-শাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যভুক্ত করায় তিনি অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। তিনি কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ও সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে তাঁর অবদান অসামান্য। ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ঔষধসার সংগ্রহ' নামে একখানি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং এগ্রিকালচারাল এবং হরটিকালচারাল সোসাইটির সঙ্গেও রামকমলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এগ্রিকালচারাল এবং হরটিকালচারাল সোসাইটির তিনি ছিলেন নেটিভ সেক্রেটারী ও কালেক্টার। বীমা কোম্পানী এবং গভর্ণমেন্ট সেভিংস্ ব্যাঙ্কেরও তিনি একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন। সারা জীবন নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে রামকমল যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্য: ঔষধসার সংগ্রহ, নীতিকথা, ১ম ভাগ (কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত), হিতোপদেশ (কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির জন্য প্রকাশিত), ইংরেজী-বাংলা অভিধান, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এই অভিধান ইংরাজী জনসনের সুবৃহৎ ডিক্সনারী অবলম্বনে রচিত। ইহা ইংরাজী-বাংলা অভিধানে সঙ্কলনে প্রধান কীর্তি। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সংকলন সুরু করেন, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়। উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স্ কেরী তাঁকে এই ব্যাপারে সহায়তা করেন। প্রামাণ্য ইংরেজী-বাংলা অভিধান হিসেবে ইহা সুধী-সমাজে সমাদৃত হয়।

রামকান্ত—একজন পদকর্তা। 'পদকল্পতরু'তে 'রামকান্ত' ভণিতায় একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়েছে। এঁর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এঁর পদটি শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক-বিষয়ক 'মল্ল-ঝাপ' ছন্দের একটা বাংলা পদ। প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে এই ছন্দের পদের সংখ্যা খুব বিরল।

রামকান্ত, দ্বিজ—রামকান্ত দ্বিজ বা দ্বিজ রামকান্ত রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শিষ্য বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে ছিলেন।

কবির আদি নিবাস রাজশাহী জেলার গুড়নই গ্রামে এবং পরবর্তী বাস রঙ্গপুর জেলার ব্রাহ্মণীপুণ্ডা গ্রামে। ইনি ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুবাদ করেছিলেন।

রামকান্ত নন্দী—কান্তবাবু দ্র°।

রামকান্ত মুন্সী—(১৭৪১—১৮০১ খ্রীঃ) চব্বিশ পরগণা জেলার টাকীগ্রামের রায়চৌধুরী ও মুন্সী উপাধিক জমিদারগণের পূর্বপুরুষ। ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অনুগ্রহে রামকান্ত রেভিনিউ বোর্ডে সামান্য বেতনে এক কর্মপ্রাপ্ত হন। এই কর্মে বুদ্ধি ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে রামকান্ত "মুন্সী" পদে উন্নীত হন। হেষ্টিংসের পর ইনি লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও সার জন্ শোরের শাসনকালেও তুবার অধিকতর উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন।

রামকান্ত রায়—ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। রচনাকাল ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ। কবির নিবাস ছিল সেহারা বা সেহাড়া। গ্রামটি বর্ধমান শহরের প্রায় তিন চার ক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের অপর পারে। কাব্য রচনায় ধর্মঠাকুরের আদেশ-কাহিনীটি অতি বিচিত্র। কাব্যে বর্ণিত কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর প্রপিতামহ বনমালী, পিতামহ শোভারাম, পিতামহী সুরধনী, পিতা মহেন্দ্ররাম, মাতা শিবানী।

রামকান্ত রায়—রাজা রামকান্ত রায় ছিলেন বগুড়া জেলার অন্তর্গত নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী। এঁর পিতার নাম ছিল রাজা রামজীবন। পিতার পরলোক গমনের পর ১১৩৭ বঙ্গাব্দে রামকান্ত নাটোরের জমিদারী প্রাপ্ত হন। ছাতিয়ান গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর পরমাসুন্দরী ও বিদুষী কন্যা ভবানীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ভবানীই হন বাংলা দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রানী ভবানী। রাজা রামকান্ত ষোল বছর রাজ্যভোগ করে ১১৫৩ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন।

রামকিশোর—এর রচিত গ্রন্থ 'দীক্ষাতত্ত্বপ্রকাশ।' ইনি পূর্ববঙ্গের মেহারের সর্ববিদ্যাবংশীয়।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর রাম কিশোর তর্কচূড়ামণি সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৮১৯ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ : ভগবদ্গীতার টীকা।

রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আগম চন্দ্রিকা'। এঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ইনি ছিলেন 'নপাড়ীয়' বা নপাড়া নিবাসী। এঁর পিতার নাম রঘুনাথ। রামকৃষ্ণের গ্রন্থটি তৎপিতৃকৃত 'আগমতত্ত্ব বিলাস' নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

রামকৃষ্ণ (মহারাজ)—বিখ্যাত রানী ভবানীর দত্তক পুত্র। ইনি

লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রস্তাবিত "দশশালা" বন্দোবস্তে ঘোর আপত্তি করেছিলেন। তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য না হওয়ায় ইনি সংসারে বীতস্পৃহ হন। দীন-দরিদ্রের সন্তান রামকান্ত অদৃষ্টের ফলে রাজত্ব লাভ করেছিলেন। ইনি দিল্লীর বাদশাহ আলমগীরের নিকট থেকে "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" উপাধি লাভ করেছিলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের লেখক ছিলেন। ইনি 'অমরকোষে'র উপর যে টীকা বা টিপ্পনী রচনা করেছিলেন, তার নাম 'নামলিঙ্গাখ্য কৌমুদী'।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)—শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্য ও মহা-নৈয়ায়িক। রামকৃষ্ণ শিরোমণির একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে তার্কিকদের যে তালিকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের নাম পঞ্চম। ইনিই 'জগৎগুরু' মহানৈয়ায়িক কাশীবাসী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। রামকৃষ্ণ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর সমস্ত গ্রন্থই শিরোমণির উপর রচিত। গ্রন্থ সমূহের নাম: (১)প্রত্যক্ষ-দীধিতিটীকা (২) অনুমান দীধিতিটীকা (৩) আখ্যাতবাদ টীকা (৪) নঞ্‌বাদ টীকা, (৫) গুণদীধিতি প্রকাশ, (৬) লীলাবতীদীধিতি প্রকাশ প্রভৃতি।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (মহা-মহোপাধ্যায়)—'অধিকরণ কৌমুদী' নামক মীমাংসাগ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে রামকৃষ্ণ বাচস্পতিমিশ্রের 'শ্রাদ্ধ চিন্তামণি', 'পরাশর-মাধবীয়' রচয়িতা মাধব ও শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র উল্লেখ করেছেন। রামকৃষ্ণ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর লোক।

রামকৃষ্ণ রায় (কবিচন্দ্র)—খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের একজন খ্যাতনামা কবি। এঁর পিতা কৃষ্ণ রায় সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এঁর মাতার নাম রাধা। কবির পিতামহ যশশ্চন্দ্র পাঠান আমলে মুসলমান নবাব প্রদত্ত 'রায়' পদবী লাভ করেন। তিনি উচ্চ সামাজিক মর্যাদারও অধিকারী ছিলেন। পিতামহীর নাম নারায়ণী। কবির মাতামহ ছিলেন সূর্য মিত্র। কবিরা ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ি কায়স্থ ও কাশ্যপ গোত্রের। কবির নিবাস হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রামে ছিল। ইহা আমতা থেকে মাত্র তিন মাইল উত্তরে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। কবির বংশধররা আজও এই গ্রামে বাস করছেন। এবং বংশের আভিজাত্যের ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। কবির দুই পত্নী ও সাত পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ ও দ্বিতীয় পুত্র বলরামের নাম পাওয়া যায়। আনুমানিক ১৪৯০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় রামকৃষ্ণের জন্ম হয়।

ইনি যৌবনেই 'কবিচন্দ্র' উপাধি লাভ করেছিলেন। এঁর সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত শিবমঙ্গল কাব্য 'শিবায়ন' শিব-বিষয়ক বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান অবলম্বন করে কবিচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের রচনাকাল ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়। কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত এই পুঁথিতে এঁর ভণিতায় একটি মালসী গান পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ ইনি এই শ্রেণীর ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ব্যক্তিগত অত্যন্ত উচ্চ নীতিবোধের দরুন সেযুগেও কবিচন্দ্রের কাব্যের সর্বত্র যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের কোনও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যখন পাওয়া যায় নি, তখনই রামকৃষ্ণের 'শিবায়নে'র মধ্যে মধ্যযুগের সাহিত্যিক গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলিকে 'বচনিকা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পয়ার ও ত্রিপদীর অবকাশে মধ্যে মধ্যে গদ্যের সহায়তায় কোন কোন প্রসঙ্গের সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে। নব্বই বছর বয়সে এই জ্ঞান-তাপস কবি রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এঁর মৃত্যুর সঙ্গে একটি মর্মান্তিক ঘটনা জড়িত আছে। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রসপুর গ্রামে কবির বাড়ী আক্রমণ করেন এবং কবির পারিবারিক বিগ্রহ রাধাকান্ত অধিকার করে নেন। কবি ঘুঁটের গাদায় বিগ্রহটি গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু তাতেও রক্ষা পেল না। বিগ্রহ বর্ধমানে স্থানান্তরিত হল। এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

রামগতি সেন (রায়)—কবি জয়নারায়ণ রায়ের অগ্রজ ও লেখক। বিক্রমপুর, রাজনগর নিবাসী বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ (নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক) ও রামগতি সেন একই বংশের বিভিন্ন শাখায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রামগতির নিবাস ছিল রাজনগরের নিকটবর্তী জপ্সা গ্রামে (বিক্রমপুর)। এঁর পিতার নাম লালা রামপ্রসাদ সেন। মাতার নাম সুমতী। রামপ্রসাদের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামগতি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁরা সকলে নামের পূর্বে "লালা" কথাটি ব্যবহার করতেন। রামগতি সেনের দ্বিতীয় পুত্র জয়নারায়ণ সেন। এবং বিদুষী কন্যা আনন্দময়ী। রামগতি ছিলেন প্রসিদ্ধ শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেনের সমসাময়িক। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। শতাব্দীর শেষ ভাগে রামগতি "মায়া তিমিরচন্দ্রিকা" রচনা করেন (১৭৭২ খ্রীঃ)। ৫০ বছর বয়সের পর রামগতি সংসার ত্যাগ করে প্রথমে কালীঘাটে এবং পরে কাশীবাসী হন। কাশীবাসকালে ইনি "যোগকল্পলতিকা" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

রামগোপাল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। রচিত গ্রন্থ 'কীরদূত'। শুকপক্ষীকে গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের নিকট প্রেরণের বর্ণনা। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

রামগোপাল চৌধুরী—শ্রীখণ্ডবাসী ও মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত চক্রপাণি চৌধুরীর বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইনি 'রস-কল্পবল্লী' রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।

রামগোপাল দাস—রামগোপাল দাস (সংক্ষেপে গোপাল দাস) ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে "রসকল্পবল্লী" ব "রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে কবি যথাসম্ভব নিজের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। ইনি ছিলেন শ্রীখণ্ড-নিবাসী বৈদ্য। এঁর গুরু ছিলেন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর রতিকান্ত ঠাকুর। রামগোপালের পিতা ছিলেন শ্যাম রায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদন রায়, পুত্র পীতাম্বর। এর রচিত অন্য রচনা হচ্ছে "চৈতন্যতত্ত্বসার" এবং "সরকারঠকুর শাখাবর্ণন"। তাছাড়া, "অষ্টরস" নামে রামগোপাল দাস একটি ছোট নিবন্ধও লিখেছিলেন। এঁর পুত্র পীতাম্বর দাস "রস-মঞ্জরী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার—ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কর্তৃক আহূত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশ জন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাদের অন্যতম। এই গ্রন্থ পরে হ্যালহেড কর্তৃক। Code of Gentoo Law নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

রামগোপাল সিদ্ধান্ত পঞ্চানন—মহাপণ্ডিত নৈয়ায়িক। তাঁর অভ্যুদয়কাল ১৬২৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ: বিবাহতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, নির্ধারণতত্ত্ব, বিধিতত্ত্ব, কারকতত্ত্ব প্রভৃতি। বিবাহবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে রামগোপালের বিবাহতত্ত্ব, সর্বোৎকৃষ্ট। ন্যায়মতে স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার তৎকালে যথেষ্ট প্রচারিত হয়ে নৈয়ায়িকদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রামগোবিন্দ দাস—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। এঁর রামায়ণ নিবন্ধে ভণিতায় নিজের নাম "রামগোবিন্দ দাস," 'গোবিন্দরাম দাস", "গোবিন্দ দাস," "বাল্মীকির দাস", "হনুমন্ত দাস" ইত্যাদি নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। পিতার নাম শোভারাম, পিতামহের নাম কুঞ্জবিহারী।

রামচন্দ্র—অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেখর ভূমি বা পঞ্চকোটের রাজার প্রিয় কবি ছিলেন রামচন্দ্র। ইনি পাণ্ডব দিগ্বিজয় নামে একটি সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইহা পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি ও জগমোহনের 'দেশাবলী বিবৃত্তি' এবং বিক্রমবিজ্জলের "বিক্রম-

সাগর" নামক দেশ বিবরণমূলক গ্রন্থাবলীর প্রবর্ধিত সংস্করণ।

রামচন্দ্র—ইনি বংশীবদন দাস ঠাকুরের পৌত্র ও বিখ্যাত পদকর্তা। ইনি জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। ইনি পরবর্তীকালে বুধুরীর নিকট বাধানগরে বাস করতেন।

রামচন্দ্র—তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরিতে 'ঐন্দ্রবানন্দনাটকম্' নামে একখানি নাট্যগ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থের প্রস্তাবনা থেকে জানা যায় যে, গুহ-পদবীধারী গৌড়রাজের মহামাত্য শ্রীহর্ষ বিশ্বাসের পুত্র ছিলেন রামচন্দ্র। এই গৌড়রাজ বা শ্রীহর্ষ কে তা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় না। 'বিশ্বাস' পদবীটি বাংলার মুসলমান শাসকগণের সৃষ্টি। সুতরাং শ্রীহর্ষ তুর্কী আক্রমণের পরে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

রামচন্দ্র কবিরাজ—চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দ দাস কবিরাজের অগ্রজ এঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা। সঙ্গীত-দামোদর গ্রন্থের বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা দামোদর ছিলেন এঁর মাতামহ। রামচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। ইনি ছিলেন নরোত্তম দাসের পরম সুহৃদ ও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। এঁর জন্মকাল ছিল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি কয়েকটি নিবন্ধ ও পদ রচনা করেছিলেন। নিবন্ধগুলির মধ্যে স্মরণদর্পণ, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ও দুর্লভামৃত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি পুথিতে রামচন্দ্রের সতেরটি পদ পাওয়া গিয়েছে। 'পদ্মমালা'ও রামচন্দ্রের রচনা বলে অনেকে মনে করেন। রামচন্দ্রের জন্ম হয় তেলিয়া বুধরি গ্রামে। ইনি গদাধর দাসের তিরোধান তিথি-মহা মহোৎসবে এবং হরিদাসাচার্যের অপ্রকট তিথি-মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। খেতুরির মহামহোৎসবে রামচন্দ্র বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইনি এঁর জীবনের অধিকাংশ সময় নরোত্তমের সঙ্গে খেতুরিতে অবস্থান করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রামচন্দ্র কবিভারতী—ইনি অল্প বয়সেই শ্রুতি, স্মৃতি ও কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগের জন্য রামচন্দ্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন এবং জন্মভূমি ত্যাগ করে সিংহলে চলে যান। অবশিষ্ট জীবন তিনি সিংহলে অতিবাহিত করেন। সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু তাঁকে গুরুত্বে বরণ করে বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত করেন। রামচন্দ্র সিংহলে বৌদ্ধাচার্য রাহুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁর রচিত গ্রন্থসমূহে ইনি 'গৌড়দেশীয়' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। রামচন্দ্রের জন্মস্থান ছিল বীরবতী নামক গ্রামে, অন্য মতে

ব রে ন্দ্র দে শে র চিরবাটিকা গ্রামে। কবির পিতার নাম গণপতি ও মাতা ছিলেন দেবী। তাঁর অনুজদ্বয়ের নাম হলায়ুধ ও অঙ্গিরস। রামচন্দ্র রচিত 'বৃ ত্ত র ত্না ক র পঞ্চিকা' গ্রন্থের রচনা কাল ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর রচিত অন্য এক কাব্যগ্রন্থ 'ভক্তিশতক'। এতে হিন্দুগণের ভক্তিতত্ত্ব অনুসারে বুদ্ধ দেবের স্তুতিগান করা হয়েছে। রামচন্দ্র 'বৃত্তমালা' নামক ছন্দ বিষয়ক একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

রা ম চ ন্দ্র খা ন—ষো ড় শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রামচন্দ্র খান নামে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্তত দুজন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সমসাময়িক। প্রথম রামচন্দ্র খানের কাহিনী চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন বেনাপোলের জমিদার। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে ইনি যবন হরিদাসের উপর অত্যাচার করেছিলেন এবং বারাঙ্গনা দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করে তাঁর সাধনা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন; পরে নিত্যানন্দ এঁর গ্রামে এলে তাঁকেও ইনি অপমান করে ছিলেন। ইনি পরে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াতেন এবং রাজকর দিতেন না, তারপরে "ম্লেচ্ছ উজীর" এসে স্ত্রীপুত্র সমেত তাঁকে বন্দী করেন, অভ্যক্ষ মাংস ভক্ষণ করান এবং ঘর ও গ্রাম তিনদিন ধরে লুঠ করে শ্মশানে পরিণত করেন।

দ্বিতীয় রামচন্দ্র খান একখানি বাংলা মহাভারত রচনা করেন। এটি জৈমিনি রচিত অশ্বমেধ পর্বের মর্মানুবাদ। এর শেষে যে রচনাকালবাচক শ্লোক আছে, তার পাঠ বিকৃত বলে অর্থ সম্বন্ধে সকলে একমত নন। কারও মতে ১৪৫৪ শক, কারও মতে ১৪৭৪ শক পাওয়া যায়। যাইহোক ১৪৫৪ থেকে ১৪৭৪ শকাব্দের (১৫৩২-৫২ খ্রীঃ) মধ্যে যে এই মহাভারত লেখা হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই রামচন্দ্র খানও সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন, অন্তত ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর নিবাস ছিল উত্তর রাঢ়ে, কোন পুথির মতে দণ্ড সিমলিয়াডাঙা গ্রামে, কোন পুথির মতে জঙ্গীপুরে।

তৃতীয় রামচন্দ খানের কথা চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইনি হোসেন শাহের অধীনে কাজ করতেন এবং গৌড়-উৎকল সীমান্ত অঞ্চলের লস্কর বা শাসনকর্তা ছিলেন। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব এঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। চৈতন্য-ভাগবতে দেখি রামচন্দ্র খান সম্বন্ধে চৈতন্যদেবকে ছত্র ভোগের "সর্ব-লোক" বলছে, "এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে" এবং রামচন্দ্র খান চৈতন্য-দেবকে নিজের সম্বন্ধে বলেছেন "মুঞি সে নস্কর এথা সব মোর ভার।" ইনিই ছত্রভোগে চৈতন্যদেবকে নিরাপদে

গৌড়-উৎকল সীমান্ত পার হতে সাহায্য করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন এই রামচন্দ্র খানই মহাভারতের রচয়িতা।

রামচন্দ্র গুহ—মহারাজা প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহ। প্রথম জীবন এঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পরে শ্রীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক পদস্থ কায়স্থের আশ্রয় লাভ করে ইনি জীবনে উন্নতি লাভ করেন। ইনি সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা কানন গুহের সেরেস্তায় এক মুহুরীর পদে নিযুক্ত হয়ে কাল-ক্রমে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। পরে কানন গুহের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় রামচন্দ্র গৌড়ে প্রস্থান করেন এবং সুযোগক্রমে গৌড়ের নবাব দরবারে একটি কার্যে নিযুক্ত হন। তখন বাংলার নবাব ছিলেন জালালুদ্দীন। জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর কররাণী বংশীয় সুলেমান ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ কবেন। এবং আপন প্রতিভাবলে বিশেষ পদে উন্নীত হন। এঁর তিনপুত্রের নাম ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। রামচন্দ্রের অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দী।

রামচন্দ্রদাস গুহ—ইনি রস-চিন্তামণি বা রসেন্দ্রচিন্তামণি, রস-রত্নাকর এবং রসপারিজাত প্রণয়ন করেন। রসেন্দ্র চিন্তামণি বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে খুব আদৃত। এঁর অনেক টীকা আছে। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

রামচন্দ্র দাস গোস্বামী—শ্রীচৈতন্যের অনুচর বংশীবদন চট্টের জ্যেষ্ঠ পৌত্র চৈতন্যদাসের পুত্র। রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামাইকে নিত্যা-নন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতু-পুত্র ও শিষ্য রাজবল্লভ 'বংশীবিলাস' বা 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থে স্বীয় গুরু জ্যেষ্ঠ-তাতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। রামচন্দ্র ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চিরকুমার ছিলেন। রামচন্দ্র কড়চা মঞ্জরী, সম্পুটিকা ও পাষণ্ডদলন এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইনি একজন পদকর্তাও ছিলেন। এঁর বহু শিষ্য ছিল। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র "দ্বিজ" বা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মল্লরাজ গোপাল সিংহদেবের রাজত্বকালে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজ রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির নিবাস ছিল আমোদর-তীরে চামোট গ্রামে। এই গ্রাম এখন বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর থানার সামিল। কবির পিতার নাম জীবন, মাতা মহামায়া। গোকুল নগরের ধর্মঠাকুর শঙ্খাসুরের অনুগ্রহ লাভ করে রামচন্দ্র কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রামচন্দ্র ধর্মপুরাণও লিখেছিলেন।

রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ—নবদ্বীপ বাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। নবদ্বীপের

'জোড়াবাড়ীর ভট্টাচার্য' বংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম নয়নানন্দ, মাতার নাম ভবানী। তিনি জগদীশ পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এঁর আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। রামচন্দ্রের রচিত গ্রন্থের নাম: 'আখ্যাতবাদটীকা' 'নঞ্‌বাদ' টীকা প্রভৃতি। ন্যায়বাগীশ রচিত বহু 'বাদগ্রন্থ পাওয়া যায়। এই সব বাদগ্রন্থে তাঁর প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই সংগ্রহ গ্রন্থের নাম ছিল 'বাদতত্ত্ব'।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পালপাড়া গ্রামে এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। চার ভ্রাতার মধ্যে ইনি কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ খ্যাতনামা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। বাংলা ভাষায় ইনিই প্রথম বাংলা অভিধান তৈরী করেন। স্মার্ত পণ্ডিতরূপে এঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সে যুগের সামাজিক বহু ব্যাপারেই এঁকে বিধান দিতে হত। হেদুয়ার নিকট ইনি একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনে রামচন্দ্র তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন। এঁর পরামর্শ ভিন্ন রাজা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেন না। পণ্ডিত ও সুবক্তা হিসেবে এঁর খ্যাতি ছিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি সমাজ বিষয়ে আধুনিক মতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই ইনি বিধবা বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। কিন্তু সহমরণ প্রথাকে শাস্ত্রীয় বলে সমর্থন করায় এঁকে রাজা রামমোহনের বিরাগ-ভাজন হতে হয়েছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ মার্চ ইনি পরলোক গমন করেন। এঁর রচিত গ্রন্থ: জ্যোতিষ-সংগ্রহসার, বাংলা অভিধান, পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান, বিবাদ-চিন্তামণি: হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা, শিশুসেবধি (বর্ণমালা), নীতিদর্শন।

রামচন্দ্র মুখুটি—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। সর্ববৃহৎ দেবী মঙ্গল কাব্য 'দুর্গামঙ্গল', বা 'গৌরীবিলাস' বা 'হরপার্বতীমঙ্গল'-এর রচয়িতা। এঁর পুরো নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিবাস হরিনাভি। উপাধি তর্কালঙ্কার, কবিকেশরী ইত্যাদি। এঁর কাব্য রচনার সমাপ্তিকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ। কবি বলেছেন তিনি দেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়েই কাব্য রচনা করেছিলেন। রামচন্দ্রের অন্যান্য রচনা: 'মাধবমালতী', 'কৃষ্ণলীলামৃত' বা 'অক্রুর সংবাদ', চন্দ্রবংশোদয়, বা

'চন্দ্রবংশ', 'কর্মবিপাক' ও 'আনন্দ-লহরী'।

রামচন্দ্র রায়—চন্দ্রদ্বীপের রাজা। যশোহরাধিপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। বিবাহ রাত্রের আমোদোৎসব এক ভয়ানক বিষাদে পরিণত হয়। রামচন্দ্র রামাই ভড় নামক একজন অনুচরকে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়ে বিবাহ রাত্রিতে রাজ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করান। পরে সে প্রতাপাদিত্যের রানীর সঙ্গে হাস্য-কৌতুককালে তার পরিচয় প্রকাশ পায়। প্রতাপাদিত্য একথা শুনে ক্রোধান্ধ হন এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে জামাইকে বধ করার আদেশ দেন। এই কথা শুনে প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্ত রায় ও পুত্র উদয়াদিত্য রামচন্দ্রের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে রামচন্দ্রকে স্ত্রীবেশে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। রামচন্দ্র নির্বিঘ্নে চন্দ্রদ্বীপে ফিরে গেলেন, কিন্তু নববিবাহিতা স্ত্রীকে আর গ্রহণ করতে চাইলেন না। বহুদিন পরে ইন্দুমতীর ঐকান্তিকতায় এবং রামচন্দ্রের মাতার চেষ্টায় রামচন্দ্র স্ত্রীকে গৃহে আনয়ন করেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের অপমানের কথা তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি আজীবন প্রতাপাদিত্যের বিরোধিতা করেছিলেন। মোগল সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য আক্রমণ করলে রামচন্দ্র মানসিংহকে প্রতাপের বিরুদ্ধে সাহায্য করলেন। রামচন্দ্র একজন বুদ্ধিমান ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাজা ছিলেন। পর্তুগীজ পাদরীরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। রামচন্দ্রের পিতাই রাজা কন্দর্পনারায়ণ বসু রায়।

রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—কাশীবাসী বাঙালী পণ্ডিত। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। এঁর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কাশীর সরস্বতী ভবনে রামচন্দ্র রচিত একখানি পুথি আছে, নাম প্রত্যক্ষদীধিতি-বিবেচন।'

রামচরণ রায়—আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পূর্বে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। পলাশির যুদ্ধের সময় দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ক্লাইব ও হেষ্টিংস-এর ইনি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁদের অনুগ্রহ লাভ করেই ইনি সৌভাগ্যবান হন। এঁরই পুত্র রাজা রামলোচন রায়। এঁরা উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ।

রামচরণ সোম—হুগলী-চুঁচুড়ার বিখ্যাত সোম বংশজাত। এঁর পিতার নাম গঙ্গানারায়ণ, পিতামহ নৃসিংহ এবং প্রপিতামহ বলভদ্র। রামচরণ চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী এঁর কার্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে "বাবু" উপাধি প্রদান করেছিলেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামচরণের জন্ম হয়েছিল।

রামজপী বিপ্র—দাক্ষিণাত্য নিবাসী এক বিপ্র। ইনি সর্বদা রাম নাম জপ করতেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু সিদ্ধবটে গিয়ে রঘুনাথ প্রণামের পর এই রামজপীর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে এঁর গৃহে গমন করেন। রামজপী মহাপ্রভুর দর্শনলাভের পর থেকে তাঁর মুখে কৃষ্ণনাম শুনে ইনিও কৃষ্ণনাম ভজতে আরম্ভ করেন। এবং মহাপ্রভুকেই কৃষ্ণ বলে সাব্যস্ত করেন। মহাপ্রভু রামজপীকে নানাভাবে কৃপা করেছিলেন।

রামজী দাস—ইনি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর একজন কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম "শশীচন্দ্রের পুথী"। এঁর রচনায় প্রসিদ্ধ কবি আলাওলের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

রামজীবন—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন কবি। ১৬৩১ শকাব্দ বা ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে রামজীবন সূর্যমঙ্গল বা 'আদিত্য-চরিত' কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি একখানি 'মনসা-মঙ্গল'ও রচনা করেছিলেন।

রাম জীবন—নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ। ইনি সমগ্র বঙ্গের প্রায় পঞ্চমাংশের জমিদারী স্বত্ব লাভ করেছিলেন। রাজশাহী ছিল এঁর প্রধান জমিদারী। রামজীবনের প্রধান জমিদারীর নামানুসারে এঁর সমস্ত জমিদারীই রাজশাহী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিল। সীতারাম রায়ের জমিদারী নাটোরের মহারাজা রামজীবন প্রাপ্ত হন। দিল্লীর সম্রাট ফররুকশিয়র রামজীবনকে ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই জমিদারীর সনদ দেন। রামজীবনের পুত্রই কালু কুঁওর।

রামজীবন বিদ্যাভূষণ—চট্টগ্রামের অধিবাসী। এঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে। কবির পিতার নাম গঙ্গারাম, খুল্লতাত নারায়ণ। রামজীবনের অপর রচনা হচ্ছে 'আদিত্য চরিত' বা 'সূর্যমঙ্গল পাঁচালী।' এর রচনাকাল ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ। কবির পূর্ণ নাম রামজীবন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভণিতায় ইনি এঁর নামের পরিবর্তে বিদ্যাভূষণ কথাটি ব্যবহার করেছেন।

রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। খড়দহের বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী (১৭৬৪- ৮৩৩ খ্রীঃ) প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের আনুকূল্যে রামতোষণ 'প্রাণতোষিণী' গ্রন্থ লেখেন সংস্কৃত ভাষায়। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থ বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়।

রামদয়াল তর্করত্ন—ভট্টপল্লীবাসী। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

রচিত গ্রন্থ 'অনিলদূত'। মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে বিরহিনী গোপী কর্তৃক বায়ুকে দূতরূপে প্রেরণের আখ্যান বর্ণনা।

রামদাস আদক—"অনাদি মঙ্গল" নামক একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রণেতা। গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। কোন কোন পুথিতে রচনাকাল আছে ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

রামদাস ছিলেন দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কৈবর্তবংশোদ্ভব। পিতার নাম রঘুনন্দন আদক। তাঁর পূর্ব নিবাস হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন ভুরসুট পরগণার হায়াৎপুর। পরে সেই থানার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে স্থানান্তরিত হয়। কবি নিজ বংশ পরিচয়স্থলে বলেছেন,

"ভুরসুটে রাজা রায় প্রতাপ নারায়ণ'
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান ॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হোতে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে ॥"

কবির ধর্মমঙ্গল রচনার ভার গ্রহণ করবার বৃত্তান্তটি বড় কৌতুকাবহ। হায়াৎপুরে চৈতন্য সামন্ত নামক একজন দুর্দান্ত তসিলদারের অত্যাচারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন,—খাজনার টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তাঁর পিতা ঋণ গ্রহণের চেষ্টায় গ্রামান্তরে প্রস্থান করেন। সুতরাং রামদাস উপায়ন্তর না দেখে দারোয়ানের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করাতে দারোয়ান তাঁকে মুক্ত করে দেয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কবি মাতুলালয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পাড়া বাঘনান গ্রামের পথে এক সশস্ত্র সিপাই তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এবং তার একটি ভারী মোট বইতে বলে। কবি কাতর চিত্তে লিখেছেন,

"ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হৃদয় ফেটে যায় বুক।
ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাই সুখ ॥"

সিপাই ভয় দেখাতে লাগল মোট ফেলে দিলে রামদাসকে মেরে ফেলবে। ভয়ে চক্ষু মুদে রামদাস পথ চলতে লাগলেন। তারপর চোখ খুলে আর সিপাইকে দেখতে পেলেন না। কবির ভীষণ জ্বর বোধ হল। শুষ্ককণ্ঠ রামদাস সম্মুখস্থ "কানাদীঘি"র জল খেতে ছুটলেন। কিন্তু দীঘিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই জল শুকিয়ে গেল। পদে পদে এইরূপ বিপন্ন ও নিরাশগ্রস্ত হয়ে রামদাস কাঁদতে লাগলেন। তখন এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভৃঙ্গার গঙ্গোদকে পূর্ণ করে কবির সন্নিহিত হয়ে বললেন,

"ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাম ক্লেশ পাও তুমি।
তোমার লাগিয়া জল
আনিয়াছি আমি ॥
এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল।
আজি হোতে হোল তব জনম সফল ॥
জল পানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।
ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি ॥"

রামদাস লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। তিনি বললেন,

"পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া॥
খেলা ছলে পূজি ধর্ম কর্ম জ্ঞানহীন।
জানি না ধর্মের গীত তায় অর্বাচীন॥"

কিন্তু দিব্য পুরুষ নাছোড়বান্দা। তিনি বর দিয়ে বললেন,

"আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম হই আমি।
আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে॥
স্বচ্ছন্দ বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার।
শ্রীধর্ম মহাত্ম্য মর্ত্তে হইবে প্রচার॥"

কবি রচিত 'অনাদিমঙ্গলে'র ভাষা সহজ ও সরল,—কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব নেই। হায়াৎপুর গ্রামের ধর্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধির গাজনে রামদাসের কাব্য প্রথম গীত হয়েছিল ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে। কালুরায়ের বাৎসরিক গাজনে আজও রামদাসের ধর্মমঙ্গল বারোদিন ধরে গান করা হয়।

রামদাস বাবাজী, তোতা—নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ এবং তাঁর নাম ছিল রামদাস মিশ্র। তাঁর কার্যদক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্য ছিল অতুলনীয়। তিনি প্রথম যৌবনে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করবার জন্য নবদ্বীপে আসেন, কিন্তু পাঠ শেষ হবার পূর্বেই প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, বৃন্দাবন চলে যান। ষড়দর্শনে তাঁর অপূর্ব পাণ্ডিত্য দেখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে "তোতা" উপাধি দেন। তখন থেকে তিনি তোতা রামদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

রামদাস বিপ্র—দাক্ষিণাত্য-বাসী ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ কালে মহাপ্রভু এঁর গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করেছিলেন। রামদাস পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি রাম সীতার উপাসক হলেও মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে ভক্তি করতেন।

রামদুলাল নন্দী—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। ত্রিপুরারাজের দেওয়ান এবং প্রসিদ্ধ ভক্ত ও কবি। এঁর কয়েকটি পদ শাক্ত-সাহিত্যে অত্যন্ত সুপরিচিত। যেমন:

(১) জেনেছি জেনেছি তারা
তুমি জান মা ভোজের বাজি।

(২) সকলি তোমারি ইচ্ছা,
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি।

ইনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

রামদুলাল সরকার—(১৭৫২-১৮২৫ খ্রীঃ) বাংলার "রথস চাইল্ড"-খ্যাত ধনকুবের। কলকাতার উপকণ্ঠ দমদমার নিকটবর্তী রেকজানি নামক গ্রামের নিঃসহায় বলরাম সরকারের পুত্র। অসাধারণ প্রতিভা ও সততা বলে তিনি ব্যবসায়ে কোটিপতি হয়েছিলেন। তাঁর ন্যায় সত্যনিষ্ঠ বদান্য ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়। অর্জিত

বিপুল অর্থের অধিকাংশই তিনি দান ধ্যানে ব্যয় করতেন। তাঁর পুত্রদ্বয় আশুতোষ ও প্রমথনাথ দেব (সরকার)।

রামদেব, দ্বিজ—একজন কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'অভয়া-মঙ্গল'। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এঁর এই কাব্যখানি রচিত হয়েছিল। ইনি কোন কোন স্থলে এঁর কাব্যকে 'সারদা-চরিত' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ রামদেব চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলে অনুমিত হয়। কাব্যের প্রায় সর্বত্রই ভণিতায় ইনি নিজেকে 'কবি বিধুসুত' বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্য রচনায় ইনি দ্বিজ মাধবকেই অনুসরণ করেছেন।

রামধন চক্রবর্তী—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। 'ষষ্ঠীমঙ্গল' নামে একখানি বৃহৎ কাব্যের রচয়িতা। রচনা কাল সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। নিবাস পীলা জেলা বর্ধমান। ইনি খুব সম্ভব দাশরথি রায়ের মাতুল গোষ্ঠীর লোক ছিলেন।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত বা **বুনো রামনাথ**—অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার নৈয়ায়িক-প্রধান রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের শিষ্য। পাঠ সমাপনান্তে ইনি একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করার চেষ্টা করেন। এঁর নিজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। আবার অপরের সাহায্য গ্রহণেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বনের মধ্যে কুটীর নির্মাণ করে সমাগত ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাদান করতেন। বনে কুটির মধ্যে বাস করায় লোকে এঁকে বুনো রামনাথ বলত। এঁর যশঃ-সৌরভে বহু ছাত্রের সমাগম হত।

রামনাথ দরিদ্র হলেও সর্বদা তিনি নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতেন। কেবলমাত্র অধ্যয়নে ও শাস্ত্রচর্চায় তন্ময় হয়ে থাকতেন। সিদ্ধ তণ্ডুল ও সিদ্ধ তেঁতুল পাতা ছিল তাঁর একমাত্র খাদ্য। এঁর পাণ্ডিত্যের কাছে কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে কোন মতে দান গ্রহণ করাতে পারেন নি।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি—রামনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু এই জানা যায় যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গন্ধর্ব রায় উপাধিধারী 'মহাকুলীন নৃপতি নারায়ণ'। রামনাথ 'ত্রিকাণ্ডবিবেক' নামক 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমর কোষে'র একটি টীকা রচনা করেছিলেন। টীকার রচনা কাল ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর অপর গ্রন্থ 'সংস্কার-পদ্ধতিরহস্যে'র রচনাকাল ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ। রামনাথের দুটি অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থের নাম 'রহস্যপ্রকাশ' ও 'কাব্যরত্নাবলী'। রামনাথ সর্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ 'দায়রহস্য'।

রামনাথ ভাদুড়ী—নবাব আলীবর্দীর একজন কর্মচারী। বীরভূম

জেলার কনকপুর গ্রামে এঁর নিবাস ছিল। ধর্মাত্মা ব্যক্তিরূপে এঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইনি গ্রামের নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন। একাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথিত আছে বর্গীর আক্রমণ কালে ইনি সপরিবারে নৌকারোহণে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

রামনাথ সিদ্ধান্ত বাচস্পতি—একজন প্রখ্যাত বাঙালী বেদব্যাখ্যাতা। ইনি ১৫৪৪ শাক বৎসরে ভবদেবী টীকা রচনা করেন।

রামনারায়ণ—নবাব আলীবর্দীর সময় রাজা রামনারায়ণ পাটনায় নায়েব নাজিমের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কুট রাজনীতিজ্ঞ হিসাবেও ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

রামনারায়ণ—অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন কবি। এঁর রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে। কিন্তু পুঁথির মধ্যে এঁর কোন আত্মপরিচয় প্রদত্ত হয় নি। এঁর যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়েছে তা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। এঁর ভাষা মার্জিত ও সুপরিণত গুণসম্পন্ন।

রামনারায়ণ দত্ত—এঁর লেখা শুধু দ্রোণ পর্বের পুঁথি পাওয়া যায়। কবির ভণিতা,—"রামনারায়ণ কহে হরিপাদপদ্মে।" কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কাছাকাছি।

রামনারায়ণ, দ্বিজ—"দ্বিজ" রামনারায়ণের রচিত গ্রন্থের নাম 'শক্তিলীলামৃত'। কাব্যের রচনাকাল ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ। ভণিতায় কবি কখনো পুরো নাম এবং কখনো শুধু "রাম" অথবা "রামদাস" ব্যবহার করেছেন। পিতার নাম রঘু,

"রচিল রঘুর সুত রাম নারায়ণ।"

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য—"কৃতভাষ্য" নামক সারস্বত ব্যাকরণের সুবৃহৎ পরিশিষ্টের প্রণেতা। বগুড়া জেলার অন্তর্গত আদমদিঘী থানায় "তালশন" নামক গ্রামে এঁর জন্ম হয়। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুল সম্ভূত। এঁর স্বহস্ত লিখিত একখানি "কৃতভাষ্য" পাওয়া গেছে। উহা ১৫৭২ শকের আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে সমাপ্ত হয়েছিল বলে লিখিত আছে।

রামনিধি গুপ্ত—সাধারণতঃ 'নিধুবাবু' নামে পরিচিত। ইনি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী চাপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ ছিলেন কবিরাজ এবং পুত্রের জন্মের পরে কলকাতায় কুমারটুলিতে এসে বসবাস করেন। রামনিধি ফারসী, বাংলা ও ইংরাজী ভালভাবে শিক্ষা করেছিলেন। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি করতেন।

দীর্ঘ জীবন লাভ করেন ও কোম্পানির পেন্‌সান ভোগ করেন। সংগীতবিদ্যায় এঁর অসামান্য অনুরাগ ছিল। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ইনি বিহারের ছাপরা জেলার কালেক্টরী কাছারিতে বদলী হন। সেখানে বিখ্যাত মুসলমান গায়কগণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের সঙ্গীত অভ্যাস করেন। এই গায়কদের মধ্যে সারি মিঞা নামক জনৈক মুসলমান গায়ক নিধুবাবুর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই সারি মিঞা "টপ্পা" জাতীয় গান গাইতেন। নিধুবাবু তাঁর অনুকরণে বাংলা গানে সর্বপ্রথম এই "টপ্পা" আমদানী করেন। এঁর রচিত গানগুলি 'নিধুর টপ্পা' নামে খ্যাত। সংগীত শাস্ত্রে নিধুবাবু ছিলেন স্বতন্ত্রপথাবলম্বী। মৃত্যুর পূবে রাজনিধি তাঁর রচিত গানগুলি "গীতরত্ন" গ্রন্থে সংকলিত করেছিলেন। নিধুবাবু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ছিলেন। এঁকে কেন্দ্র করে বাংলার সংগীত শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল।

ইনি ৮৭ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন (১৮৩৯ খ্রীঃ)। নিধুবাবুর 'স্বদেশী ভাষা' গানটি বাঙালীর অন্তরের মণিকোঠায় চিরজাগরূক হয়ে আছে॰

"নানান দেশের নানা ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা।
কত নদী সরোবর
কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা"।

রামপাল—তৃতীয় বিগ্রহপালের তৃতীয় পুত্র। রামপাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পালরাজ্য প্রায় অবলুপ্তির পথে। বিদ্রোহী কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গের সমস্তটা দখল করে নিয়েছিল। পদ্মা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রামপাল রাজত্ব করতেন। তিনি সমস্ত সামন্তরাজার কাছ থেকে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য নিয়ে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেন এবং ভীষণ যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধারে সক্ষম হন। মালদহের নিকটবর্তী রামাবতী নামক স্থানে তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে সমস্ত গৌড়দেশ তাঁর অধিকারে আসে এবং পাল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরে আসে। রামপাল পরে মগধ, মিথিলা, কামরূপ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলও অধিকার করেছিলেন। রামপাল সম্ভবতঃ ১০৭৭-১১২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি জীবিত ছিলেন প্রায় ৭০ বৎসর। রামপাল দয়ালু ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। এঁর সময়ে রাজ্যে প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। রামপালের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার পালরাজ বংশের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হয়।

রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন—হুগলীর অন্তর্গত 'ইলছোবা'র ভট্টাচার্য-বংশীয় বাঁশবাড়িয়া বিদ্যাসমাজের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি

কাশীবাসী হয়েছিলেন এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর কাশী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ৮২ বছর বয়সে তিনিই ন্যায়ের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২২ বছর অধ্যাপনা করে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০৩ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। ১০৫ বছর বয়সে তিনি পরলোক যাত্রা করেন।

রামপ্রসাদ দ্বিজ বা **রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী**—ইনি পূর্ববঙ্গনিবাসী, পশ্চিমবঙ্গের সাধক রামপ্রসাদ থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। ইনিও রামপ্রসাদের ঢঙে শাক্ত পদাবলী রচনা করতেন। এঁর জন্মস্থান ব্রহ্মপুত্রতীর। ঢাকা জেলার অন্তর্গত চিনীসপুর নামক স্থানের কালী বাড়ীতে দ্বিজ রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ ও জীবন অতিবাহিত করেন। এঁর অবস্থিতি-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

রামপ্রসাদ সেন (কবিরঞ্জন)—বিখ্যাত কবি ও কালী-সাধক। বর্তমান হালিশহরে পূর্বতন কুমারহট্ট গ্রামে দরিদ্র বৈদ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল ১৭১৮-১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়। তাঁর পিতার নাম ছিল রামরাম। রামরামের দুই পত্নী ছিলেন; রামপ্রসাদ ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। পিতামহ রামেশ্বর। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল। তাঁর পরিবারের আদিপুরুষের নাম কৃত্তিবাস। সিদ্ধিকামী কবি স্বগ্রামে তান্ত্রিক সাধনায় কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং দেবী কালিকা কন্যারূপে কবির বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন,—এরূপ লোক-প্রসিদ্ধি আছে। রামপ্রসাদের সাধনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে আরো বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে, রামপ্রসাদ কোন ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরি-গিরির কাজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু আজন্ম মাতৃ-সাধক রামপ্রসাদ জমিদারী সেরেস্তার হিসাব কর্মে আনন্দ পেতেন না। তাই আত্মভোলা সাধক কবি হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে শ্যামা-সংগীত লিখে ফেলতেন। একদিন জমিদার মশাই সেরেস্তা পরিদর্শন করতে গিয়ে রামপ্রসাদের হিসাবের খাতায় অনেক শ্যামা-সংগীত লেখা দেখতে পেলেন। ঐ খাতাতেই নাকি অন্যান্য সংগীতাবলীর মধ্যে বহুল-প্রচারিত অতি বিখ্যাত এই সংগীতটিও ছিল :

"আমায় দে মা তবিলদারী।
আমি নিমক-হারাম নই শঙ্করী॥"

এইসব সংগীত পড়ে জমিদার মুগ্ধ হন এবং কবিকে অসাধারণ ব্যক্তি বলেই মনে করেন। তখন তিনি কবিকে ত্রিশ টাকা করে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়ে স্বগৃহে গিয়ে সাধন ভজনে অনুরক্ত হতে উৎসাহিত

করেন। সেই থেকেই কবি গ্রামে গিয়ে অসংখ্য শ্যামা-সংগীত রচনাদি ও সাধনায় নিযুক্ত থাকেন। পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে একশ' বিঘা জমি এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেছিলেন।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রামপ্রসাদের অল্পবয়সের রচনা। কথিত আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশেই কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন। ভিন্ন রুচি ও রসের বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনায় তিনি শেষে নিরুৎসাহ বোধ করেন। তাই পরে তিনি শাক্ত-সংগীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতচন্দ্রের মত চটকদার না হলেও রামপ্রসাদের উক্তি মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার। যেমন,

স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা
ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা…

'কালীকীর্তন' রামপ্রসাদের ক্ষুদ্র রচনা। কালীকীর্তনের মতো রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্তনও লিখতে শুরু করেছিলেন। তার একটিমাত্র পদ পাওয়া গেছে।

রামপ্রসাদের আসল খ্যাতি তাঁর রচিত পদাবলী সংগীতে। এই গানেই তিনি এক সময় সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। আজও রামপ্রসাদী সংগীত কম আদরণীয় নয়। তাঁর সুর-বৈশিষ্ট্যের একটা বিশেষ মাদকতা আছে। শ্যামা-সংগীতে সাধক কবি কালীকে স্নেহময়ী মাতার ন্যায় চিত্রিত করেছেন।

রাম বসু—(১৭৮৬-১৮২৮ খ্রীঃ) অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কবি-ওয়ালাদের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত কবি। ইনি ছিলেন কুলীন কায়স্থ। এঁর পুরোনাম রামমোহন বসু। কলকাতার পশ্চিমপারে হাওড়ার শালিখা গ্রামে এঁর জন্ম হয়। ইনি 'জন্মকবি' ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সের সময় কবিতা রচনা করে-ছিলেন। ভবানী বেনে এঁর কাছ থেকে গান লিখে নিতেন। রাম বসু নিজে একটি দল গড়েন। উহা "রাম বসুর দল" নামে বিখ্যাত ছিল। ১২৩৫ বাংলা সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি বহু সার্থক কবিতা রচনা করে গেছেন। প্রথমে তিনি কেবল গানই লিখতেন, পরে একটি দল গঠন করেন।

রামভদ্র সার্বভৌম—জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির কনিষ্ঠ পুত্র ও মহানৈয়ায়িক। রামভদ্রের অভ্যুদয়কাল ১৫২৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে বলেই অনুমিত হয়। মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গৌরীকান্ত সার্বভৌম, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িকগণ রামভদ্রের ছাত্র ছিলেন। নবদ্বীপের অন্য কোন নৈয়ায়িকই রামভদ্রের ন্যায় ছাত্র সম্পদ লাভ করেন নাই। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রামভদ্র-রচিত কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা বাংলাদেশের ন্যায়-চতুষ্পাঠীসমূহে অধীত হত। রামভদ্রের রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

'ন্যায়রহস্য' গৌতমসূত্রের ব্যাখ্যা। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থসমূহ: গুণরহস্য, সিদ্ধান্তসার, সময়রহস্য, সমাসবাদ, শব্দানিত্যতাবাদ, সুবর্ণতৈজসত্ববাদ পদার্থতত্ত্ব বিবেচনপ্রকাশ, সিদ্ধান্তরহস্য, নঞবাদটীকা, কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা প্রভৃতি।

রা ম মা ণি ক্য—ত্রিপুররাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র। ১৬৭০-৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ইনি ছিলেন অতি পুণ্যবান ও দয়ালু রাজা।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন কবি। ইনি ছিলেন নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেটেরি গ্রামের অধিবাসী। এঁর পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রামায়ণ রচনা করে-ক রে ছি লে ন। ইনি পিতার আদেশানুসারে নিজ গৃহে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং হনুমানের আদেশে তদীয় রামায়ণ রচনা করেন। কবির রচনায় ভক্তিরসের এবং ভারতচন্দ্রীয় যুগের ভাষাগত অলঙ্কারের প্রাধান্য দেখা যায়।

রামমোহন মাল—ইনি বাংলার বারভূঞার অন্যতম চন্দ্রদ্বীপরাজ কন্দর্পনারায়ণের শরীররক্ষক ছিলেন। এঁর ছিল বলিষ্ঠ চেহারা। ইনি অমিত শক্তিশালী ছিলেন। বাল্যকালে রামমোহন অত্যন্ত ঔদ্ধত্য প্রকৃতির যুবক ছিলেন। ইনি ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। এঁর পিতা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে ভুলুয়ার (নোয়াখালি) শিজারগাও গ্রামে বাস করতেন। কন্দর্প নারায়ণের মৃত্যুর পর রামমোহন তৎপুত্র রামচন্দ্র রায়ের শরীররক্ষক হয়েছিলেন। মহাবল রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইনি রামচন্দ্রের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

রামমোহন রায়—ভারতে বর্তমান যুগের নবজাগরণের প্রথম উদ্গাতা ও জাতীয়তার আদি মন্ত্রগুরু। ১৭৭৪ (মতান্তরে ১৭৭২ খ্রীঃ) খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম রামাকান্ত এবং মাতার নাম তারিণী দেবী। ইনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ। যৌবনে নানা বিদ্যাশিক্ষার মধ্যেই ইনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে-ছিলেন এবং ষোল বছর বয়সে দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে পাড়ি দিয়েছিলেন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করেন এবং নানা জনহিতকর কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। তিনি পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। ধর্মের নামে অধর্মীয় আচরণ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন।

তাই প্রথমেই তিনি ধর্ম সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের দ্বারা ভারতীয়দিগকে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার থেকে বিরত করেন।

তৎকালীন প্রচলিত সর্বপ্রকার কুসংস্কারের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন, সতীদাহ নিবারণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আন্দোলনে তিনি সফল হন।

রামমোহন রায়ই প্রথম সংস্কৃতিবান বাঙালী যিনি সর্বপ্রথম বিলেত যাত্রা করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর কলকাতা থেকে যাত্রা করে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল তিনি লিভারপুল শহরে অবতরণ করেন। তখন দ্বিতীয় আকবর ছিলেন দিল্লীর নামেমাত্র সম্রাট। তাঁর কতকগুলি অভিযোগ ইংলণ্ডের রাজার নিকট উপস্থাপিত করার জন্য তিনি রামমোহনকে "রাজা" উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া, কোম্পানীর অধীনে ভারতীয় জন-সাধারণের সুযোগ-সুবিধা ও সুশাসন প্রবর্তনের জন্যও তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। মোগল-বাদশার দেওয়া এই "রাজা" উপাধির জন্যই তাঁকে 'রাজা' বলা হয়। বিলেতে তিনি বিপুল সম্বর্ধনা ও রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিলেতে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে ইংলণ্ডবাসীকে ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিলেন। তিনি একদিকে এদেশে যেমন শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের আদিগুরু, তেমনি আন্তর্জাতিকতারও তিনি ছিলেন বিশ্বে প্রথম পুরোহিত। তিনি পৃথিবীতে সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা, সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য কামনা করতেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী।

রামমোহন আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিব্রু ও ইংরেজী ভাষা জানতেন। ইংরেজী-ভাষায় তাঁর অদ্ভূত দখল ছিল। বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান অসামান্য। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় থেকেই বাংলা তথা ভারতের এ যুগের নতুন ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে বলা যায়। বাংলা-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। এক হিসেবে তাঁকে প্রথম বাংলা গদ্যরীতির অন্যতম প্রবর্তক বলা যায়। রামমোহন একাধিক ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় বিভিন্ন ভাষায় কয়েকখানি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। বিলেতে অবস্থানকালে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে

রামমোহন দেহত্যাগ করেন। সেখানে এখন তাঁর সমাধি মন্দির বিদ্যমান। রামমোহনের রচনাবলী : (১) তুহ্‌ফাৎ—উল্‌ মুয়াহ্‌হিদীন, (২) বেদান্ত গ্রন্থ, (৩) বেদান্ত সার, (৪) তলবকার উপনিষদ (কেনোপনিষদ), (৫) ঈশোপনিষৎ, (৬) উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, (৭) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, (৮) কঠোপনিষৎ, (৯) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, (১০) গোস্বামীর সহিত বিচার, (১১) সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, (১২) গায়ত্রীর অর্থ, (১৩) মুণ্ডকোপনিষৎ, (১৪) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, (১৫) কবিতাকারের সহিত বিচার (১৬) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, (১৭) চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮) প্রার্থনাপত্র, (১৯) পাদরি ও শিষ্য সংবাদ, (২০) গুরু পাদুকা, (২১) পথ্য প্রদান, (২২) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, (২৩) কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, (২৪) বজ্রসূচী, (২৫) গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং, (২৬) ব্রহ্মোপাসনা, (২৭) ব্রহ্মসঙ্গীত, (২৮) অনুষ্ঠান (২৯) সহমরণ বিষয়, (৩০) গৌড়ীয় ব্যাকরণ। তাছাড়া, রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'সম্বাদ কৌমুদী', 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার নামক পত্রিকাত্রয়েরও সম্পাদনা করেন।

রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। ইনি দেবীভাগবত পুরাণের অন্তর্গত 'ভগবতীগীতা'র অনুবাদ করেছিলেন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে।

রামরাজা—'মৃগলুব্ধ' নামক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। কবির কাল ও আত্মপরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞরা অনেকেই পুঁথিখানিকে প্রাচীন বলে মনে করেন। কেউ কেউ অনুমান করেন কবি জাতিতে মগ ছিলেন। এবং তাঁদের মতে কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রামে। সম্ভবতঃ ইনি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে শৈব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রামরাজের রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এঁর রচনায় সংস্কৃত পুরাণের ভাষার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

রামরাম বসু—আনুমানিক ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু চুঁচড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণার নিমতা গ্রামে তাঁর শিক্ষালাভ হয়। সে যুগের রীতি অনুযায়ী ফারসী জানার জন্য তিনি সুপ্রীম কোর্টের ফারসী দোভাষী উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্‌সীরূপে কাজ করেন। ১৭৮৭-৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কেরীর সহকর্মী জন টমাসের বাংলাভাষার শিক্ষক ও সহকর্মী ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর উইলিয়ম কেরী টমাসের সঙ্গে কলকাতা পৌছলে রামরাম বসু ঐ সময় থেকে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেরীকে বাংলা শেখান। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কেরী সাহেব তাঁকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজে সহকারী পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। ঐ অবস্থায় ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ: খ্রীষ্ট-স্তব, হরকরা, জ্ঞানোদয়, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, লিপিমালা, খ্রীষ্ট বিবরণামৃতং।

রামরাম শর্মা—ইনি 'মনোদূত'-রচয়িতা বিষ্ণুদাসের বংশধর বলে স্বীয় গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। ইনিও 'মনোদূত' নামক একখানি দূতকাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যটি দূতকাব্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভের যোগ্য। কারণ, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় কবি গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ করেন নি। কাব্যটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, যা অপর কোন দূতকাব্যে নাই। সাধারণতঃ দূতকাব্যগুলি প্রেরকের উক্তিসমূহ নিয়েই রচিত হয়। কিন্তু এই কাব্যে প্রেরক ও দূতের উক্তি প্রত্যুক্তি রয়েছে। বিষ্ণুদাসেব কাব্যের ন্যায় এই কাব্যেও মনকে দূতরূপে কৃষ্ণসমীপে প্রেরণই বর্ণনার বিষয়। কাব্যে কবির বর্ণনাকৌশল চিত্তাকর্ষক। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর লোক। 'কবিকৌতূহল' নামক বিষ্ণুদাসের একখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থও পাওয়া যায়।

রামরাস—একটি পুরানো পুথিতে দু'টি পদ পাওয়া গিয়েছিল 'রামরাস' নামে। পদ দু'টিতে ব্রজবুলির মিশ্রণ আছে। পদ দু'টি রামলীলা বিষয়ক, কিন্তু কীর্তনের ঢঙে রচিত। রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর।

রামরুদ্র বিদ্যানিধি—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের "পঞ্চরত্ন সভা"র অন্যতম রত্ন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ হৃদয়ানন্দ-বিদ্যার্ণবের পৌত্র এবং বিষ্ণুদাসের পুত্র। এই রুদ্ররাম বিদ্যানিধি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কয়েকখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং পঞ্জিকা গণনার সহজ সঙ্কেতসূচক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। ইনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্রেব 'নবরত্ন সভা'র বরাহমিহির। এঁর অবস্থিতিকালে অষ্টাদশ শতাব্দী। রুদ্ররাম সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

রামলোচন ঘোষ—(১৭৯০-১৮৬৬ খ্রীঃ) বিখ্যাত মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা—বিগত শতাব্দীর বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্তী ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু। বহু বিষয়ে তিনি সেকালের বাঙালীদের অগ্রণী ছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। ঢাকা কলেজের পূর্বজ ঢাকা স্কুল প্রতিষ্ঠায় এবং কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলা চর্চার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের

অন্তর্গত বয়রাগাদি গ্রাম। পরে তিনি কৃষ্ণনগরে বসতি স্থাপন করেন।

রামলোচন রায়—আন্দুলের রাজা এবং রামচরণের পুত্র। লর্ড ক্লাইবের চেষ্টায় ইনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আমলের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন। ৫০০০ সৈন্যের অধিনায়কত্ব করার অধিকারও ইনি লাভ করেছিলেন। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ইনি পণ্ডিত ব্যক্তি ও চতুষ্পাঠীকে অর্থ সাহায্য করতেন। সমাজে এঁর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কালীঘাটে মন্দিরের সামনে সুবৃহৎ নাটমন্দির ইনি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ইনি 'আন্দুলাব্দ' নামে একটি অব্দের প্রচলন করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। নন্দকুমারের বিচারে ইনি গভর্নমেণ্ট পক্ষের প্রধান সাক্ষী ছিলেন।

রামলোচন দেবদাস—রামলোচন দেবদাস বিরচিত কাব্যের নাম "বিক্রমাদিত্য রাজোপাখ্যান" বা "বিক্রমাদিত্য চরিত্র"॥ বইটি কলকাতায় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। রামলোচনের কাব্যের কিছু অংশ ফর্সটারের অভিধানে উদ্ধৃত হয়েছে। ফর্সটারের উদ্ধৃতির মধ্যে রামলোচনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

"স্বধুঁনীর পশ্চিমে পুর্ব্বেতে সারদার
অগ্নিকোণে আছে হগ্নি
রাজধানী তার।
চন্দনপুরেতে বাস শ্রীরাম লোচন
দেব-দাস পাঁচালীতে করিল যোটন্।"

রামশঙ্কর দত্ত, বৈদ্য ("ভিষক")—কবি রামশঙ্কর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের আদি নিবাস ছিল বৈদ্যবাটী গ্রামে। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এঁর পরিবার বৈদ্যবাটী গ্রাম ত্যাগ করে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বায়রা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর রামায়ণ রচিত হয়। রামশঙ্কর কৃত্তিবাসের পাঁচালী ও অদ্ভুত-রামায়ণের কাহিনী মিশিয়ে তার কাব্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই লিখেছেন:

"অদ্ভুত-কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিয়া
কহিল শঙ্কর কিছু সংক্ষেপ করিয়া।"

রামশঙ্কর দেব—রামানন্দ যতির শিষ্য। এঁর রচিত বৃহৎ কাব্য 'অভয়ামঙ্গল'। কাব্যের প্রারম্ভে গুরু বন্দনা আছে। ইনি ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ("শ্রীকরণে উৎপত্তি দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণী")। নিবাস হুগলী জেলার চাকলার অন্তর্গত ধর্মদা গ্রামে। পিতা রামকৃষ্ণ, পিতামহ হরিবদন। নদীয়া-নিবাসী "পরমদেব" কাব্যরচনায় রামশঙ্করকে উৎসাহিত করেছিলেন, "কবিবর পরমদেব নদীয়া-নিবাসী। অভয়ামঙ্গল গীতে হৈলা অভিলাষী।" গৌতম-পুত্র শতানন্দের আগম-শাস্ত্র এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

অবলম্বন করে "পরমদেব-আদেশে শঙ্কর রচিল ভাষা নাচাড়ী প্রবন্ধে কৈল গান।" সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে ত্রিদিবার তপস্যা, শিবমাহাত্ম্য, সতীর কাহিনী, গৌরীর উপাখ্যান, ধূম্রলোচন শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ, হরিহর-সংবাদ, উৎকল-মাহাত্ম্য ইন্দ্রদ্যুম্নের আখ্যান, মহিষাসুর বধ ইত্যাদি অভয়ামঙ্গলের বিষয়।

রামশরণ চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস চট্টরাজের পুত্র। রামশরণ ছিলেন 'অনুরাগবল্লী' রচয়িতা মনোহর দাসের গুরু। তাঁর প্রভাব শিষ্যে প্রভাবিত হয়। কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রামে গুরুবাড়ীতে ইনি বাস করতেন। পরে গুরুর আদেশে ব্রজবাস করেন।

রাম শর্মা—শ্রীরাম তর্কবাগীশ দ্র०।

রামসন্তোষ ঘোষ—কলকাতার বাগবাজারস্থ কাঁটাপুকুরের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের সন্তান। কান্যকুব্জাগত স্বনাম-প্রসিদ্ধ মকরন্দ ঘোষের বংশই গৌড় থেকে কলকাতাব কাঁটাপুকুরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এখন বাগবাজারের যে কালী সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা, তৎকালে তিনিই ছিলেন ডাকাতে কালী। পূর্বে ডাকাতরা এঁর সামনে নরবলি দিত। রামবাবু এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখতে না পেরে ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এস্থান ত্যাগ করে বর্ধমানে গিয়ে বাস করেন। ইনি বহুভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের কুঠীতে কাজ করে ৭০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

রাম সরস্বতী—অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতী দ্র०।

রাম সিংহ—মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা। এঁর পিতা রাজা রঘুনাথ রায়ের মৃত্যুর পর রামসিংহ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ইতিহাসে ইনি "মেদিনীপুরের শাসনকর্তা রাজারাম রামসিংহ" নামে অভিহিত। রাজা রামসিংহ মেদিনীপুরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। মোগল রাজত্ব সময়ে ইনি একজন সর্বপ্রধান গণ্যমান্য দেশীয় কর্মচারী ছিলেন। এঁর সর্বপ্রধান ঘটনা ইনি বরদা-যদুপুরের উৎপীড়িত কবিবর রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে আশ্রয় দান করেছিলেন। ইনি এক বৃহৎ সরোবর খনন করেছিলেন। উহা "রাম-সরোবর" নামে খ্যাত। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামসিংহ ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাম সেন কবীন্দ্র মণি—মীরজাফরের রাজবৈদ্য। ইনি গোপালকৃষ্ণভট্টকৃত রসেন্দ্রসার সংগ্রহের উপর রসেন্দ্রসার সংগ্রহ টীকা রচনা করেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক।

রাম হাজরা—অষ্টাদশ শতাব্দীর রামকথার কবি। ইনি রামচরিত রচনা করে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের কাছে মোটা রকম পুরস্কার

লাভ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

রামাই—রামচন্দ্র গোস্বামী দ্র°।

রামাই, নন্দাই—এঁরা প্রথমে নদীয়াবাসী ছিলেন। চৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলে গেলে এঁরাও সেখানে যান এবং উভয়েই সর্বদা মহাপ্রভুর পার্শ্বচর গোবিন্দের সঙ্গে থেকে তাঁর সেবাযত্ন করতেন। জ্যেষ্ঠ রামাই ছিলেন বিশেষ বলবান। তাঁকে প্রত্যহ বাইশ ঘড়া জল ভরে দিতে হত। মহাপ্রভুর গৌড় গমনকালে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে এঁরাও সম্ভবত ছিলেন। এঁদের অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

রামাই পণ্ডিত—বাইতি জাতীয়। রাঢ় দেশের অন্তর্গত দ্বারকা নামক স্থানে এঁর পৈতৃক নিবাস ছিল এবং ইনি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ও দারুকেশ্বর নদীতীরস্থ চম্পাইঘাট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। ইনি গৌড়ের পালরাজা দ্বিতীয় ধর্মপালের সমসাময়িক। রাঢ়দেশের "হাকন্দ" (বাঁকুড়া জেলা) নামক স্থানে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে রামাই পণ্ডিতের পিতার নাম বিশ্বনাথ। ৮০ বছর বয়সে শুধু ধর্ম-পূজা প্রচলনের অভিপ্রায়ে রামাই পণ্ডিত কেশবতী নামে এক রমণীকে বিবাহ করেন। এঁর পুত্রের নাম ধর্মদাস।

রামাই পণ্ডিত বঙ্গীয় ধর্ম-পূজার প্রধান পুরোহিত। ইনিই যে ধর্ম-পূজার প্রচলন করেন, তা মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধধর্মের বিকৃতরূপ। ঐতিহাসিকগণের মতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্মই কালে ধর্মঠাকুররূপে পরিণত হয়েছেন।

রামাই পণ্ডিত রচিত গ্রন্থের নাম "শূন্যপুরাণ" বা "ধর্ম-পূজাপদ্ধতি"। রামাই পণ্ডিত "বাইতি" বা "ডোম" জাতীয় "পণ্ডিত" বা পুরোহিত না সত্যই ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়।

রামাই পণ্ডিতের চক্ষে বুদ্ধই ধর্ম। একদিকে তান্ত্রিকদের পঞ্চমকারের সাধনা এবং অন্যদিকে বৈদিকদের গোঁড়ামিতে জনসাধারণ যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সেই সময়ে এঁর নূতন বাণী তাদের মনে অভূতপূর্ব তরঙ্গ তোলে; এঁকে অনুসরণ করে অসংখ্য নরনারী ধর্ম ঠাকুরের পূজা শুরু করে। গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীসহ অসংখ্য নরনারী এঁর কাছে দীক্ষা নেয়।

এখনো যে গৌড়ের স্থানে স্থানে ধর্মপূজার প্রচলন রয়েছে এই রামাই পণ্ডিত তার আদি উদ্যোক্তা।

রামানন্দ ঘোষ—অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রামানন্দ ঘোষ

রামায়ণকাব্য রচনা করেন। কবি নিজেকে 'বুদ্ধাবতার' বলে প্রচার করেছেন। ম্লেচ্ছাচার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য কালীর শাপে 'বুদ্ধদেব' নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থে কবির নাম ছাড়া ব্যক্তি-পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। কবি নিজেকে কোথাও 'দ্বিজ-অংশ' সম্ভূত, আবার কোথাও শূদ্রকুল-জাত বলে অভিহিত করেছেন। ইনি ছিলেন দারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথদেবের উপাসক। তাঁর মতে জগন্নাথদেব ও রামচন্দ্র উভয়ে এক ও অভিন্ন, এবং উভয়েই বুদ্ধদেবের রূপান্তর। রামানন্দ যৌবনে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তিনি শেষে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

রামানন্দ বসু—বিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসুর (গুণরাজ খানের) পৌত্র এবং সত্যরাজ খানের পুত্র। ইনি ছিলেন চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক ও বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামনিবাসী। রামানন্দ গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় যুক্ত হয়েছিলেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' বলা হয়েছে যে মহাপ্রভু গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবদ্বীপে শ্রীবাস, রামানন্দ প্রভৃতি পরিকর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। রামানন্দ ছিলেন অত্যন্ত চৈতন্যভক্ত। মহাপ্রভু একবার এঁর গৃহে পদার্পণ করেছিলেন। নীলাচলে যাত্রাকালে রামানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশমত প্রতিবছর পট্টডোরী প্রস্তুত করে নীলাচলে যেতেন এবং মহাপ্রভুর লীলায় যোগদান করতেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর রামানন্দ সম্ভবত নিত্যানন্দের ভক্ত হয়েছিলেন। রামানন্দ ছিলেন একজন পদকর্তা এবং ইনি ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। কথিত আছে মহাপ্রভু এঁকে মিত্র সম্বোধন করতেন। অনেকের মতে রামানন্দ বসুরই উপাধি ছিল 'সত্যরাজ খান'।

রামানন্দ বাচস্পতি—ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। "আহ্নিক-আচার" গ্রন্থ এঁরই প্রণীত।

রামানন্দ যতি—পণ্ডিত-সন্ন্যাসী। ইনি দু'তিনখানি বাংলা কাব্য এবং অনেকগুলি সংস্কৃত নিবন্ধ ও টীকা রচনা করছিলেন। রামানন্দের বাংলা রচনা হচ্ছে শ্রীরাম-পাঁচালী ও চণ্ডীমঙ্গল। 'ভাগবতাশয়' বাংলা রচনাও হতে পারে। এঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ—কুণ্ডতত্ত্ব প্রকাশিকা, তন্ত্রসার, জ্ঞানবৈভর্ত তন্ত্র, অদ্বৈত রহস্য, জ্ঞানাবলী, অধ্যাত্মসার, যোগসার আচার-দীধিতি, এবং গীতার, শান্তিশতকের ষট্চক্রের, মোহ মুদ্গরের ও গায়ত্রীর টীকা ইত্যাদি। সংস্কৃতে ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রও লিখেছিলেন। অনেকগুলি বাংলা

বই-এরও অনুবাদ করেছিলেন। এঁর চণ্ডীকাব্য রচিত হয়েছিল ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে।

রামানন্দ রায়—চৈতন্যদেবের উৎকলীয়া ভক্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেবের অধীনে কোন অঞ্চলের ভূস্বামী বা বড় রাজ-কর্মচারী ছিলেন। রামানন্দও প্রতাপরুদ্রদেবের একজন উর্দ্ধতন কর্মচারী ছিলেন এবং বিদ্যানগরের উচ্চতর রাজকর্মোপলক্ষে গোদাবরী-তীরে রাজমহেন্দ্রীতে বাস করতেন। জাতিতে শূদ্র হলেও শাস্ত্র ও ভক্তিতে অগাধ অধিকার ছিল। বহু ব্রাহ্মণ এঁর অনুচর ছিলেন। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে গিয়ে রাজ-মহেন্দ্রীতে গোদাবরীতীরে রসিক রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে রামানন্দ পুরীধামে আগমন করে চৈতন্যদেবের নিকটই অবস্থান করে-ছিলেন। চৈতন্যদেব এঁকে মিত্র সম্বোধনে আপ্যায়িত করতেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর পাদবন্দনা করতেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে রামানন্দের তিরোধান হয়। রায় রামানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বিখ্যাত "জগন্নাথবল্লভ" নামক একখানা নাটক রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর কয়েকটি পদও পাওয়া যায়।

রামেশ্বর নন্দী—কাশীরাম দাসের ন্যায় রামেশ্বর নন্দী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত রচনা করেছিলেন। কবির বাসস্থান ছিল ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন নন্দীপুর (বনগ্রাম)। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। মহাভারত ব্যতীত রামেশ্বর "ক্রিয়াযোগসার" এবং মঙ্গল-চণ্ডী, সত্যনারায়ণ, শনির পাঁচালী প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়াকলাপের পুথিও রচনা করেছিলেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য অন্যতম। এঁর 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্য শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কাব্য রচনা শেষ হয়েছিল ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ভট্ট নারায়ণ বংশোদ্ভূত। এঁর প্রপিতামহের নাম নারায়ণ, পিতামহ গোবর্ধন, পিতা লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী, এবং সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। রামেশ্বরের পৈতৃক নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার বরদাবাটী পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে। পরে কবি ঐ জেলার কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ হয়ে উক্ত পরগণার অযোধ্যাবাড় গ্রামে বসবাস করেন। যশোবন্ত সিংহের উৎসাহে তিনি "শিবায়ন" কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থের বহু স্থলেই যশোবন্তের যশোকীর্তন করা হয়েছে। কীর্তোনোদ্দেশ্যে রচিত বলেই শিবায়ন "অষ্টমঙ্গলা" অর্থাৎ আটপালার পাঁচালী কাব্য। বিষয় শুধু বাংলাদেশে প্রচলিত বিশিষ্ট কাহিনী

নয়, পদ্মপুরাণ, ভাগবত পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ হতেও কোন কোন আখ্যায়িকা গৃহীত হয়েছে। শিবের চাষ কাহিনী ধর্মঠাকুরের পুরাণ কাহিনী থেকে নেওয়া।

রামেশ্বরের রচনা সহজ সরল ও সুন্দর। ভারতচন্দ্রের চটক এতে নেই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিলাসী রাজসভাসদের কাব্য, রামেশ্বরের শিবায়ন চাষী গৃহস্থের পাঁচালী। শিবায়নের কোন কোন কাহিনী—যেমন, বাগদিনীর পালা বিদ্যাসুন্দরের কাহিনার তুলনায় কম আদিরসাত্মক নয়। কিন্তু তা যথেষ্ট মার্জিত রুচিসম্পন্ন। শিব মঙ্গলকে রামেশ্বব গ্রাম্য পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করে যথার্থই ভদ্র কাব্য করে তোলেন। রামেশ্বর যে-রাজসভার কবি ছিলেন তাঁরা বিলাসী নাগরিক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন যোদ্ধা এবং ভক্তিমান। কবিও ছিলেন সুপণ্ডিত, তত্ত্বদর্শী এবং ভক্ত। তার কাব্যের আলংকারিক সমৃদ্ধি ও শাব্দিক সম্পদ প্রচুর এবং উপভোগ্যও। তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে অনুপ্রাসবাহুল্য। তাঁর রচনার অনেক অংশ লোক-প্রবচনে পরিণত হয়েছে। প্রথম জীবনে যদুপুরে থাকাকালে রামেশ্বর একখানি সত্য-নারায়ণ পাঁচালীও রচনা করেছিলেন।

রায়বসন্ত—গোবিন্দদাস কবি-রাজের সুহৃদ এবং নরোত্তমদাসের শিষ্য। এঁর জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। পদকল্পতরুতে রায় বসন্তের অনেকগুলি ব্রজবুলি ও বাংলা পদ সঙ্কলিত হয়েছে। 'দাস বসন্ত' ভণিতায় এঁর একটি নরোত্তম-বন্দনা পদ ভক্তি-রত্নাকরে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনটি পদে রায়বসন্তের ও গোবিন্দদাসের যুক্ত ভণিতা দেখা যায়। কর্ণানন্দের মতে রায় বসন্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ। গোবিন্দদাসের দু-একটি পদের ভণিতায় 'প্রতাপ-আদিত'-এর উল্লেখ দেখে কেউ কেউ রায় বসন্তকে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় বলে মনে করেন। শেষ বয়সে ইনি বৃন্দাবনবাসী হন এবং শ্রীজীবগোস্বামীর পত্র নিয়ে গৌড়ে একবার শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট এসেছিলেন। ভক্তি বত্নাকরে উল্লিখিত আছে, "হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্রী লৈয়া আইল তেহোঁ আচার্য সভায়॥" কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায়ের পদাবলীর উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

রায় বাঘিনী—রায় বাঘিনী একটি খেতাব। এঁর আসল নাম রানী ভবশঙ্করী। ভবশঙ্করীর পিতা দীননাথ চৌধুরী ভুরসুট (ভুরিশ্রেষ্ঠ) রাজ্যের অন্তর্গত পেঁড়োর গড়ে বাস করতেন। এবং পেঁড়োর গড়ের দুর্গাধিপের অধীন একজন সম্ভ্রান্ত সর্দার ছিলেন। দীননাথ অস্ত্রনৈপুণ্যে বঙ্গ বিখ্যাত ছিলেন এবং সহস্রাধিক সৈন্যের পরিচালক ছিলেন বলে রাজ্য মধ্যে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন।

ভবশঙ্করী ছিলেন পিতার একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা। দীননাথ কন্যাকে এক মুহূর্তও কাছছাড়া করতেন না। ভবশঙ্করী সর্বদা পিতার সঙ্গে থেকে তলোয়ার ও বর্শা চালান এবং তীর ও বন্দুক ছোঁড়া শিখতেন। ঘোড়ায় চড়ে শিকারও করতেন। ভুরস্থটের রাজা রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। বাংলায় পাঠানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য মোগল সম্রাট আকবর বদ্ধপরিকর ছিলেন। মহারাজ রুদ্রনারাযণও মোগলদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে পাঠান-প্রধান দায়ুদ খাঁ ও কতলু খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। রাজার মৃত্যুর পরই ওসমান তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে অতর্কিতে। তখন রানী ভবশঙ্করী সৈন্যদের উৎসাহিত করে নিজেই অশ্বারোহণে বর্শাহস্তে ভীমপরাক্রমে যুদ্ধ করে পাঠান সৈন্যদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। সম্রাট আকবর এই যুদ্ধে রানীর বীরত্বের কথা শুনে মহারাজ মান সিংহকে ভুরস্থটে পাঠিয়ে দেন এবং রানীকে বহু মণিমাণিক্য উপহারসহ 'রায়-বাঘিনী' উপাধি প্রদান করেন। রানীর অবস্থানকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

রায় দুর্লভ—মহারাজা দুর্লভরাম সোম দ্র°।

রায়মল্ল—বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা। এঁর পিতায় নাম ছিল জীবনমল্ল। ইনি ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি বিষ্ণুপুর দুর্গের সমধিক উন্নতি সাধন করেন। এঁর সময় নানাপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও নানারকমের কলকারখানা আমদানি হয়। শাসনকার্যে ইনি শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সৈনিকদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী হয়। এবং তাদের যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী করে তোলা হয়। প্রতিবেশী সকল রাজাই এঁর ভয়ে ভীত ছিল। এঁর রাজ্য দামোদরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। রায়মল্ল বহু অর্থ ব্যযে রাধাকান্ত বিগ্রহের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

রায়মুকুট—রায়মুকুটের বাসস্থান ছিল রাঢে। তিনি মাহিন্তা গাঁই-এর ব্রাহ্মণ বংশজাত। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ এবং মাতা নীলমুখারী দেবী। রায়মুকুট রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জালাল উদ্দীনের রাজত্বকালে প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এবং জালাল উদ্দীনের পোষকতা লাভ করেছিলেন। জালালউদ্দীনই তাঁকে রায়মুকুট উপাধি দিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার হিসাবে রায়মুকুট প্রভূত যশ অর্জন করেছিলেন। রঘুনন্দন তাঁর বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থে রায়মুকুটের মতের বা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

রায়মুকুট 'স্মৃতিরত্নহার', 'রায়-

মুকুটপদ্ধতি' নামে দুখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রায়মুকুটের আসল নাম সঠিক জানা যায় না। কেউ কেউ তাঁর আসল নাম শ্রীনিবাস বলে মনে করেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে এঁর গ্রন্থগুলি রচিত হয়। মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পরে ইনিই বোধহয় সর্বপ্রথম শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ করেন।

রায়শেখর—"রায়শেখর" নাম কিংবা উপাধি জানা যায় না। "শেখর-রায়" ধরলে অবশ্য নাম হয়। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। অর্থাৎ এঁর আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। বর্ধমান জেলার পরাণ গ্রামে ছিল এঁর নিবাস। কাটোয়ার যদুনাথ দাসের "সংগ্রহ-তোষিণী" গ্রন্থে এই পদকর্তার উল্লেখ আছে। রাযশেখরের রচিত পদাবলীর নাম "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী"।

আরও একজন "রাযশেখর" ছিলেন। তিনি ছিলেন পদকর্তা। তবে সেই "রায়শেখর" উপাধি এবং শশী শেখর ও চন্দ্রশেখর নামে সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের একজনের এই উপাধি ছিল বলে অনুমিত হয়। উভয়েই পদকর্তা এবং বিশিষ্ট কীর্তন-গায়ক ছিলেন। এঁদের পিতার নাম গোবিন্দদাস ঠাকুর। এই ভ্রাতৃদ্বয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। এঁদের বাড়ী ছিল বর্ধমানের কাঁদড়া গ্রামে এবং এঁরা জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ।

রাসু ও নৃসিংহ—এঁরা ছিলেন সহোদর ভ্রাতা ও কবিওয়ালা। এঁরা রঘুনাথ দাস বা রঘু মুচির সমসাময়িক ছিলেন। অর্থাৎ এঁদের অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী। চন্দননগরের নিকটবর্তী গোন্দলপাড়া গ্রামে এঁদের নিবাস ছিল। এঁদের রচিত "সখী-সংবাদ" বিশেষ প্রসিদ্ধ। এঁদের পিতার নাম আনন্দীনাথ রায়। রাসু ও নৃসিংহের জন্মকাল যথাক্রমে ১৭৩৫ ও ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। মৃত্যুকাল ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ ও তার পর।

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্—ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান নাসীরুদ্দীন মামুদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর রুকনুদ্দীন ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার রাজত্বকালেই তিনি সাতগাঁয়ের শাসন-কর্তারূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যোদ্ধা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। তিনি দক্ষিণ পশ্চিমে মুসলমানদের চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বী উড়িষ্যার বিরুদ্ধে এবং উত্তর-পূবে কামরূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে ছিলেন। তিনি মিথিলা বা ত্রিহুত অধিকার করে ছিলেন বলে জানা যায়।

সুলতান রুকনুদ্দীন অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণ ও বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বে হিন্দু মুসলমান সমস্ত প্রজাই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে নিশ্চিন্তে বাস করত। তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই সমান

চোখে দেখতেন। তাঁর ন্যায় অসাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজা খুব কমই দেখা যায়। বহু হিন্দু তাঁর অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। বারবক নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এবং কবি, পণ্ডিত, সাহিত্যিক নানা শ্রেণীর জ্ঞানীগুণীদের তিনি যথেষ্ট সমাদর করতেন। তিনি সৌন্দর্য-রসিকও ছিলেন। তাঁর সময় বাংলা সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামনিবাসী মালাধর বসু বঙ্গসাহিত্যের অমর গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেছিলেন। বারবক শাহ্ তাঁকে 'গুণরাজ খান, উপাধিতে ভূষিত করেন। মালাধরের পুত্র সত্যরাজও 'খান' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। খুব সম্ভব বাংলার বাল্মীকি অমর কৃত্তিবাসও বারবকের সমকালীন। তিনি গৌড়েশ্বরেব রাজ-সভায় বিরাট সম্বর্ধনা লাভ করে-ছিলেন। বিখ্যাত কবিরাজ অনন্ত সেন ছিলেন বারবকের চিকিৎসক। অনন্তসেনের পুত্র শিবদাস সেন চরকের দ্রব্যগুণের বিখ্যাত টীকাকার এই সময় ছিলেন। কেদার রায় ছিলেন বারবকের একজন বিশিষ্ট সভাসদ। রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্র বিশ্বাস রায় বারবকের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান তো বটেই, সবদেশের সবকালের রাজাদের মধ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ পরলোকগত হন।

রুচিদত্ত—মিথিলার এক ন্যায়াচার্য। মূল তত্ত্বচিন্তামণির উপর ইনি 'প্রকাশ' নামে প্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেছিলেন। এঁর প্রধান ন্যায়গুরু ছিলেন বিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র। এঁর রচিত অন্য গ্রন্থ: 'কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ মকরন্দ', 'দ্রব্যপ্রকাশ বিবৃত্তি', 'লীলাবতীবিলাস'। রুচিদত্তের গ্রন্থগুলি ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।

রুদোক—কৈবর্ত অধিনায়ক ও বরেন্দ্রভূমির রাজা দিব্বোকের ভ্রাতা। ১০৮২-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহীপালকে রাজ্যচ্যুত করে দিব্বোক রাজা হন। দিব্বোকের মৃত্যুর পর রুদোক বরেন্দ্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর জীবিত কাল একাদশ শতাব্দী।

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি—কাশীতে বসবাসকারী বিখ্যাত বাঙালী নৈয়ায়িক। ইনি এঁর কাব্যগ্রন্থের শেষে সামান্য আত্মপরিচয় দিয়েছেন। রুদ্রের পিতামহ বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন গৌড়রাজ হোসেন শাহের সম-সাময়িক। তিনি গৌড়ের নিকটবর্তী ভাগীরথীতীরস্থ রামকেলি গ্রামে বাস করতেন। রুদ্রের পিতার নাম ছিল বিদ্যানিবাস। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কোন সময়ে রুদ্র জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। এঁর রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভ্রমরদূত'।

রাবণহৃতা অশোকবাসিনী সীতাকে মনের গোপন কথা জানাবার জন্য রামচন্দ্র একটি ভ্রমরকে দূত নিযুক্ত করে ছিলেন—ইহাই সংক্ষেপে কাব্যের বিষয়। রুদ্ররচিত অন্যান্য কাব্যের নাম—পিকদূত, ভাববিলাস, বৃন্দাবনবিনোদ।

রুদ্র পণ্ডিত—চাতরার শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের ভাগিনেয়। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এঁর অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দী।

রুদ্রবাহু—চন্দ্রগুপ্তের গুরু ও জৈন শাস্ত্রের লেখক।

রুদ্ররাম চক্রবর্তী—ইনি 'ষষ্ঠী মঙ্গল' নামক একখানি কাব্যের রচয়িতা। কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। কবির উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ। পিতার নাম গঙ্গারাম চক্রবর্তী। দেবীর স্বপ্নাদেশে গীত রচিত হয়েছিল।

রুস্তমজী কাওয়াসজী—(১৭৯২-১৮৫২ খ্রীঃ)। বোম্বাই-এর এক পার্শী পরিবারে জন্ম। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথম জাহাজযোগে কলকাতায় আসেন এবং ব্যবসায় শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করেন। তিনি কলকাতায় সপরিবারে বাস করতে থাকেন এবং কলকাতা ও বাংলার বহুবিধ হিতকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গদেশে বীমা-ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও জাহাজ-ব্যবসায়াদির কাজে তিনি ছিলেন ভারতীয়দের অগ্রণীদের অন্যতম।

রূপ ঘটক—পরম বৈষ্ণব, শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইনি রাধাকৃষ্ণ নাম গানে বিভোর হয়ে থাকতেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

রূপ কবিরাজ—এঁর ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। এঁর রচিত 'সারসংগ্রহ' বৈষ্ণব দর্শনের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এঁর জীবনকালও জানা যায় না। তবে গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৬২৮ থেকে ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে।

রূপ গোস্বামী—সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা। রূপ গোস্বামীর পূর্বপুরুষরা ছিলেন কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণ। চতুর্দশ-পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কোন পূর্বপুরুষ বাংলা দেশে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কুমার। তাঁর নিবাস ছিল গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি নামক গ্রামে। 'দবির খাস' পদবী ধারণ করে রূপ গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে কাজ করতেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে তাঁর 'রূপ' নামকরণ হয়। চৈতন্যদেবের আদেশে ভক্ত রূপ বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বসবাস করে কাব্য, নাটক ও বৈষ্ণব শাস্ত্র বিষয়ে নানা গ্রন্থ প্রণয়নে আত্ম-

নিয়োগ করেন। গভীর ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ইনি বৃন্দাবনে ষট্ গোস্বামীদের অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। চৈতন্য-পরিকল্পিত নব বৃন্দাবন নির্মাতাদের মধ্যে রূপ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি। রূপগোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'মেঘদূতে'র অনুকরণে তিনি 'হংসদূত' ও 'উদ্ধবসন্দেশ' নামক দুটি দূতকাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটক 'দানকেলিকৌমুদী', 'বিদগ্ধ-মাধব' ও 'ললিতমাধব' প্রভৃতি। রূপের বৈষ্ণবরসশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ দুটির নাম 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'। তাছাড়া, রূপ বহু স্তোত্র, বিরুদ ও গীত রচনা করেছিলেন। 'স্তবমালা' নামক গ্রন্থে রূপের এই জাতীয় রচনাগুলি জীবগোস্বামী কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। রূপের রচনাগুলি নানা ছন্দে লিখিত ও বিবিধ অলঙ্কারমণ্ডিত। রূপ-গোস্বামী সংকলিত কোশ-কাব্য 'পদ্যাবলী' প্রখ্যাত। এতে শুধু কৃষ্ণ-লীলা ও কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক শ্লোকসমূহই সংকলিত হয়েছে। এঁর আবির্ভাব কাল ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান হয়।

রূপচন্দ্র বা রূপনারায়ণ—পিতার সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী, মাতা কমলাদেবী। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কামরূপের রাজধানী এগার সিন্ধুর নিকটস্থ ভিটাদিয়া কুলীন পল্লীতে জন্ম। বাল্যকালে রূপচন্দ্র অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন এবং লেখাপড়া আদৌ করতেন না। পিতা বিরক্ত হয়ে একদিন পত্নীকে নির্দেশ দিলেন রূপচন্দ্র ভাত চাইলে যেন তাকে ছাই দেওয়া হয়। এই কথা শুনে বালক রূপচন্দ্র মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করে চলে যান। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র "পণ্ডিত বাড়ী" নামক পল্লীতে গিয়ে বালক অসামান্য মনস্বিতাগুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাকরণ আয়ত্ত করে "চক্রবর্তী" উপাধি লাভ করেন। পাণ্ডতবাড়া থেকে নবদ্বীপে এসে তিনি কয়েক বৎসর ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে "আচায" উপাধি প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপ থেকে পুরীধাম হয়ে তিনি মহারাষ্ট্রে যান। পুনার টোলে তিনি দীর্ঘকাল বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গ পাঠ করে সরস্বতী উপাধি লাভ করলেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষের নানাদেশ ঘুরে বহু পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে দিগ্বিজয়ী হন। অবশেষে বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীর নিকট পরাজিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এবার রূপচন্দ্রের উপাধি হ'ল "রূপনারায়ণ"।

রূপচাঁদ অধিকারী—ঢপ কীর্তনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা গ্রামে এঁর জন্ম হয়। ইনি ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ ঢপ-কীর্তন গায়ক। এঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতীব সুন্দর। একবার ইনি এঁর সুললিত কণ্ঠে কীর্তন গান করে

দস্যু হস্ত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

রূপনারায়ণ ঘোষ—চণ্ডীর অনুবাদক। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে রূপনারায়ণের নিবাস ছিল। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। চণ্ডী ব্যতাত "দুর্গামঙ্গল" নামক আর একখানি গ্রন্থও ইনি রচনা করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত ই ন জীবিত ছিলেন।

রূপনারায়ণ সিংহ—এঁর পুরা নাম পরম ভট্টারক শ্রীশ্রী রূপনারায়ণ সিংহ বা রূপা। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইনি সপ্তগ্রামের একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইনি ছিলেন বাগ্‌দী জাতীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। রূপনারায়ণ সিংহ সপ্তগ্রামে একটি বিহার বা সঙ্ঘারাম প্রাতষ্ঠা করেছিলেন।

রূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিদ্যালঙ্কার—রাঢ়দেশবাসী নারায়ণ দাসের কন্যা। নারায়ণ দাস কন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। কন্যার মেধাশক্তি দেখে ষোল-সতের বছর বয়সের সময় এক ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখেন। রূপমঞ্জরী গুরুগৃহে টোলের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাকরণ পড়তেন। তারপর সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনেকে তাঁর নিকট ব্যাকরণ, চরক-সংহিতা ও নিদান প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করত। অনেক কবিরাজ চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। মাথা মুড়িয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো শিখা রাখতেন এবং পুরুষের মতো উত্তরীয় ব্যবহার করতেন। প্রায় একশত বছর বয়সে (বাংলা ১২৮২ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রূপরাম চক্রবর্তী—ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "রচনাকাল ধরিয়া বিচার করিলে প্রাচীনতম ধর্ম-মঙ্গল-কবি হইতেছেন রূপরাম চক্রবর্তী। ...রূপরাম তাঁহার কাব্য লিখিয়া-ছিলেন ১৫৭১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে"। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে রূপরামের গ্রন্থ রচনাকাল ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। রূপরামের জন্মস্থান ছিল কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মস্থান দামুন্যার অনতিদূরে বর্ধমান জেলার প্রাচীন গ্রাম কাইতির পাশে শ্রীরাম-পুরে। কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতার নাম দৈমন্তী (অর্থাৎ দময়ন্তী)। কাব্যের প্রারম্ভে রূপরাম ধর্মমঙ্গল রচনার সূত্ররূপে নিজের প্রথম জীবনের দুঃখকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহৃদয়তা ও রসবোধ মিলিত হয়ে এই বর্ণনাটিকে সবিশেষ উপভোগ্য করেছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "পুরানো বাংলা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোট

গল্পের মতো কোন জীবন-রস-নিটোল-রচনা থাকে তবে তাহা রূপরামের এই আত্মকাহিনী।”

কবি-পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর টোল ছিল। তিনি ছিলেন তার অধ্যাপক। তাঁর বহু ছাত্র ছিল। রূপরামও পিতার টোলে মৃত্যুর পর অগ্রজ রত্নেশ্বরের কাছে পাঠ গ্রহণের সময় কবি অমনোযোগিতার জন্য ভৎর্সিত হন। পরে আরো একাধিক স্থানে শিক্ষালাভ করতে গিয়েও তিনি বার বার ঝগড়া করে বাড়ী ফিরে আসেন। এমনি করে একবার রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কাছে ‘বিদায় হয়ে’ নবদ্বীপ যাবার আগে কবি মার সঙ্গে দেখা করতে যান। পথে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ধর্মকে দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাড়ী পৌঁছানোর আগেই রত্নেশ্বরের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয় এবং পুনরায় ভৎর্সিত হয়ে তিনি মার সঙ্গে দেখা না করেই গৃহত্যাগ করে যান। পথে বহু ক্লেশ ভোগের পর কবি গোপভূমের রাজা গণেশের সভায় উপনীত হন, এবং রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মমঙ্গল রচনায় ব্রতী হন। সে-যুগেও ধর্মঠাকুরের উপাসনার অপরাধে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রূপরামকে সমাজে পতিত হতে হয়েছিল। রূপরামের ধর্মমঙ্গল সরল সাবলীল ভাষায় লিখিত।

রূপরাম বসু—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের আত্মীয়। ইনি অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভয়ে ইনি বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব বা কচু রায়কে হিজলীর জমিদার ঈশা খাঁর নিকট লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঈশা খাঁ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হলে রূপরাম রাঘবকে নিয়ে দিল্লীর সম্রাটের আশ্রয় নেন। এবং সম্রাটকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেন। ইনি আজীবন প্রতাপাদিত্যের বৈরিতা করে গিয়েছেন।

রূপসেন—পূর্ববঙ্গে মুসলমান-দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেন-রাজ বংশের একটি শাখা পরাধীনতার অসহনীয় ক্লেশ ও মুসলমানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিক্রমপুর থেকে পঞ্জাবে গমন করেন (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে)। রূপসেন ছিলেন এই দলের অধিনায়ক। তিনি পঞ্জাবের যে-স্থানে অনুচরগণের সঙ্গে প্রথমতঃ বসতি স্থাপন করেন তা তাঁর নাম অনুসারে রূপারনগর নামে পরিচিত হতে থাকে। এই রূপারনগর স্থানটি শতদ্রু বা সট্‌লেজ নদীর তীরবর্তী। রূপসেনের উত্তর পুরুষগণ বহুকাল এই স্থানে বাস করেছিলেন।

রেণেল, মেজর—একজন ইংরেজ সেনাপতি। বাংলার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান কাশিম-বাজার প্রভৃতি স্থানের যথাযথ মানচিত্র ইনি অঙ্কিত করেছিলেন। সপ্তদশ

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইনি বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন।

রোমপাদ—লোমপাদ দ্র°।

রোহিতগিরি বা রোহিতাশ্ব—বঙ্গে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের আদি-পুরুষ। ইনি রোহতাস্ গড় পর্বতের অধিপতি ছিলেন। এঁর নাম পূর্ণচন্দ্র। অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী।

ল

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন কবি। এঁর পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মহাভারতের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। এঁব রচিত "কুশধ্বজেব পালা" পাওযা গিয়েছে। সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন হুগলী জেলাব মহানাদ নিবাসী।

লক্ষ্মণ মাণিক্য—দিল্লীর সম্রাট আকবরের সময় বাংলার যে দ্বাদশ জন ভৌমিক স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষায় বদ্ধ-পরিকর হয়ে উঠেছিলেন ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁদের মধ্যে একজন। মেঘনাব পূর্ব তীরবর্তী ভুলুয়া বিস্তৃত অংশ ছিল তাঁব রাজ্য। মিথিলার আদিশূর বংশীয় বিশ্বম্ভর একবার চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে এসেছিলেন এবং সেই সময় ভুলুয়ায় দৈববলে রাজ্যলাভ করেন। লক্ষ্মণমাণিক্য বিশ্বম্ভরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। মিথিলাবাসী ক্ষত্রিয় হলেও তিনি বাংলার কায়স্থদের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজত্বের সময় আরাকানের মগেরা বঙ্গোপসাগরের তীরভূমিগুলিতে জনসাধারণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করত। লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্য ভুলুযাতেও তারা লুটতরাজ করত। লক্ষ্মণমাণিক্য একে একে তিনবাব মগদেব পবাজিত ও বিতাডিত কবেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের এক ভাই রাজ্য-লোভের আশায় গৃহশত্রুরূপে আরাকানরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল। ফলে আরাকানরাজ ভুলুয়া আক্রমণ করলে ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণমাণিক্য পরাস্ত হন এবং খিজিরপুরে অন্যতম ভৌমিক ঈশা খাঁব শরণাপন্ন হন। ঈশা খাঁর সঙ্গে মানসিংহের বিশেষ ভাব ছিল। মানসিংহ বাংলার সমস্ত ভৌমিকদেব সাহায্যে মগদের আক্রমণ করে পবাজিত কবলেন এবং লক্ষ্মণমাণিক্য আবার ভুলুযাব রাজা হলেন। এঁব মৃত্যু সম্বন্ধে দু'টি কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি মতানুযায়ী ইনি নিজ হঠকারিতাবশতঃ চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। আর দ্বিতীয় মতানুযায়ী ইনি ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান। লক্ষ্মণমাণিক্য ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ। তিনি প্রত্যহ এক এক মণ ওজনের দুটি লোহার মুগুর ভাঁজতেন। যুদ্ধে এক

মণ লোহার বর্ম পরতেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য নানা স্থান থেকে বহু বিদ্বান ও গুণবান ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যাদি এনে জায়গীর দিয়ে ভুলুয়াতে অবস্থান করিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ নিজেও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এঁর বিশেষ অধিকার ছিল। 'বিখ্যাত-বিজয়' ও 'কুবলয়াশ্চরিত' নামক দু'খানি নাটক লক্ষ্মণমাণিক্যের রচিত।

লক্ষ্মণ সিংহ—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কর্ণগড় রাজবংশের আদি রাজা। ইনি জাতিতে সদ্‌গোপ। বর্ধমানের নালপুর গ্রামে এঁর বাস ছিল। লক্ষ্মণের পিতা অত্যন্ত গরীব ছিলেন। জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় করতে না পেরে পুত্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুরে আসেন এবং রাজা সুরত সিংহের পুরোহিত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লক্ষ্মণকে গোরক্ষার কাজে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্মণের বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা শুনে রাজা সুরত সিংহ এঁকে একটি নিম্ন রাজকর্মচারীর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই লক্ষ্মণের কার্যদক্ষতা দেখে এঁকে রাজা দেওয়ান ও সেনাপতির পদে উন্নতি করলেন। উড়িষ্যারাজের সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধ বাধলে রাজা সুরত উড়িষ্যারাজের সাহায্যার্থে লক্ষ্মণ সিংহের একদল সৈন্য পাঠান। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করায় উড়িষ্যারাজ লক্ষ্মণ সিংহের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ এঁকে কর্ণগড় প্রভৃতি অঞ্চল প্রদান করেন। তখন লক্ষ্মণ সিংহ দেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণগড়ে রাজ্য সংস্থাপন করলেন। রাজা লক্ষ্মণ সিংহ অমিত-বলশালী ছিলেন। ইনি নাকি বন্য মহিষের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। রাজা লক্ষ্মণ সিংহ তেজস্বী, বুদ্ধিমান, সরল, সদাশয়, ধার্মিক ছিলেন। এঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইনি নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে-ছিলেন। বহু জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে ইনি নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুদক্ষ কারিগর দ্বারা লক্ষ্মণ সিংহ কর্ণগড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী মহামায়া ও দণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সিংহ এঁর ভ্রাতা শ্যামসিংহ কর্তৃক নিহত হন।

লক্ষ্মণসেন—বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণসেন ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কয়েকটি তাম্রশাসন ও মুসলমান ঐতিহাসিক মীনহাজুদ্দিন বিরচিত তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকালের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বাল্যকালেই তিনি পিতা ও পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সমরকুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যৌবনে তিনি মহাবীররূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি কলিঙ্গ-

দেশে অভিযান করেন। তিনি কাশী-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। কামরূপরাজ তাঁর নিকট পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। গৌড়দেশ তিনি সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। তাঁর নামানুসারেই রাজধানী গৌড়ের লক্ষ্মণাবতী নাম হয়েছিল। তিনি সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, কাশীতে ও প্রয়াগে যজ্ঞযুপের সঙ্গে 'সমর জয়স্তম্ভ' স্থাপন করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় সারাজীবনই লক্ষ্মণ-সেন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। সমগ্র আর্যাবর্তে তিনি রণকুশল নিপুণ প্রবীণ রাজা বলে সম্মানিত হতেন। তিনি কেবল দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গেছে। পিতার নির্দেশক্রমে তিনি 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায় তিনি আনন্দ পেতেন। তিনি জ্ঞানী ও গুণীদের যথেষ্ট সমাদর করতেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন এবং উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুধ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। লক্ষ্মণ-সেন বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সুশাসক, দানশীল ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামে লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত হয়।

লক্ষ্মণসেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর। প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা গঙ্গাতীরে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে আসেন। তাঁর এই শেষ বয়সে রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়। এই সময় প্রায় ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সেনানায়ক বখ্‌তিয়ার খিলজী নবদ্বীপ আক্রমণ ও দখল করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে মাত্র সপ্তদশ তুরস্ক অশ্বারোহী বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন এবং লক্ষ্মণসেন কাপুরুষের মতো পলায়ন করেছিলেন বলে যে বিকৃত কাহিনী প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন সর্বৈব মিথ্যা। বখ্‌তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ বিজয়ের পরে প্রায় তিন চার বছর লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। আনুমানিক ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লক্ষহীরা (কৃষ্ণদাসী)—হরিদাস ঠাকুরের বৈরাগ্যব্রত ভঙ্গ করার জন্য রামচন্দ্র খাঁ কর্তৃক নিযুক্তা রূপসী বারবণিতা। ভক্ত হরিদাসের মুখে নামশ্রবণে এবং তাঁর অকপট ব্যবহারে এঁর কুপ্রবৃত্তি, দুরভিসন্ধি দূর হয়। 'প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।'

লক্ষ্মীকান্ত দাস—একজন পদ-কর্তা। 'লক্ষ্মীকান্ত দাস' ভণিতায় কেবল একটিমাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি নদীয়া-নাগরীর উক্তি, পূর্বরাগের উৎকৃষ্ট বাংলা পদ।

এই একটি মাত্র পদই লক্ষ্মীকান্তের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক।

লক্ষ্মীকান্ত ধর—হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে যে সকল সুবর্ণবণিক মহাজন কলকাতায় এসে বসবাস স্থাপন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত ধর অন্যতম। সুবর্ণ বণিক মহাজনদের মধ্যে তখন ইনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা ধনবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। জনসাধারণের নিকট ইনি নকুধর নামে পরিচিত ছিলেন। এই ধর বংশের আদি নিবাস ছিল হুগলীর বিখ্যাত সপ্তগ্রামে। পরে এঁদের উপাধি 'রায়' হয়ে যায় এবং রায়-উপাধিকরূপেই এঁরা পরিচিত হন। এই লক্ষ্মীকান্তই কলকাতার পোস্তা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বা আদি পুরুষ।

লক্ষ্মীকান্তের যেরূপ প্রভূত ধন-রত্ন ছিল, তেমনি এঁর দানও ছিল অপরিসীম। জগৎশেঠ যেমন মুর্শিদাবাদের নবাবদের টাকা যোগান দিতেন, লক্ষ্মীকান্তও তেমনি শিশু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অগ্রিম টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্বে যখন ইংরেজ বণিকদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তখন সুবর্ণবণিক মহাজন লক্ষ্মীকান্ত ধর ক্লাইবকে অর্থ সরবরাহ করেছিলেন। প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময়ও ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নয়লক্ষ টাকা সাহায্য করেছিলেন। কৃতজ্ঞতা-বশতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এঁকে মহারাজা উপাধি দান করতে চাইলে, ইনি নিজে এই উপাধি গ্রহণ না করে দৌহিত্র সুখময় রায়কে দান করতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দৌহিত্র সুখময়কে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কেবল অর্থ নয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রয়োজন হলে লক্ষ্মীকান্তের কাছ থেকে বিশ্বাসভাজন কর্মীও গ্রহণ করতেন। লক্ষ্মীকান্তই নবকৃষ্ণকে ক্লাইবের মুন্সী করে দিয়েছিলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রথমে লক্ষ্মীকান্তেরই মুন্সী ছিলেন। লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যুতে সকল শ্রেণীর লোক দুঃখে অভিভূত হয়েছিল। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার—বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদার বংশের আদি পুরুষ। এঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এঁর মাতা মারা যান এবং পিতা কামদেব ব্রহ্মচারী সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ কামদেব ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবিজয়ের পর মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তকে আবিষ্কার করে এঁকে বহু জমিজমা ও ধন-সম্পদ দেন এবং রায়চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী—শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রথমা পত্নী এবং বল্লভ আচার্যের কন্যা। ইনি একদিন দেবতাপূজার জন্য

গঙ্গা-স্নানে এলে বিশ্বম্ভর পরে শ্রীচৈতন্য দেব এঁকে দেখেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। বনমালী আচার্যের মধ্যস্থতায় বিশ্বম্ভরের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিবাহ হয়। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী আশৈশব ভক্তিমতী এবং শ্বশ্রূ ও পতির প্রতি ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। ইনি পতির পরিচর্যা ও চরণ সেবাদির দ্বারা তাঁকে পরিতৃপ্ত করতেন। আবার মধ্যে মধ্যে অতিথি ও ভক্তরা এলে পতিব্রতা পত্নী তাঁদের আহার ও অভ্যর্থনার সুব্যবস্থা করে পতিব সন্তোষ বিধান করতেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গেলে একদিন লক্ষ্মীপ্রিযাদেবী রাত্রে শচীমাতার নিকট পালঙ্কে নিদ্রিতা ছিলেন। সেই সময় রাত্রিশেষে এক বিষধব সর্পের দংশনে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীব প্রথমপাদ।

লক্ষ্মীধর—নিজ কাব্যে কবি যে আত্মপরিচয় দিযেছেন তা থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মীধব গৌড়ের 'ভট্টাঙ্কিত কোশল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ গ্রামটির নাম 'ভট্টকোশল' বলে মনে করেন। কারুর কারুর মতে নামটি 'কোশল' এবং ভট্টাঙ্কিত শব্দের অর্থ 'ভট্ট বা বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অধ্যুষিত'। স্থানটি সম্ভবতঃ বর্তমান বগুড়া জিলার কুশৈল গ্রাম। তাঁর পিতার নাম শ্রীগুপ্ত। কবি স্বীয় কুল-পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তাঁর এক পূর্বপুরুষের নাম ভোজদেব বলে উল্লেখ করেছেন। এই ভোজ কারুর কারুর মতে ধীরেশ্বর ভোজ (১০০০-১০৫৫ খ্রীঃ)। কেউ কেউ মনে করেন ইনি বাংলা দেশের রাজা ভোজবর্মদেব (খ্রীঃ দ্বাদশশতকের শেষার্ধ)। লক্ষ্মীধর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'চক্রপাণিবিজয়'। ইহা কুড়ি সর্গে রচিত। বাণাসুরের কন্যা উষার বিবাহ-কাহিনী এই মহাকাব্যের বিষয়। সুভাষিত রত্নকোশ, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুক্তিমুক্তাবলী, পদ্যাবলী প্রভৃতি কোশ-কাব্যগুলিতে লক্ষ্মীধরের নামাঙ্কিত বহু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এই লক্ষ্মীধর এবং 'চক্রপাণিবিজয়'-রচযিতা লক্ষ্মীধব অভিন্ন কিনা জানা যায় না।

লক্ষ্মীনারায়ণ—কামতাপুরের মহারাজা নরনারায়ণের পুত্র। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজমহিষী ভানুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবাজা নরনারায়ণেব পরলোক গমনেব পব লক্ষ্মীনারায়ণ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুমার লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেই স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তখন আকবব বাদসাহ ছিলেন দিল্লীব সম্রাট। বারভূঞার অন্যতম ঈশা খাঁ কর্তৃক কোচবিহার আক্রান্ত হলে (ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ আকবর বাদসাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবং বাংলার তৎকালীন সুবাদার অম্বররাজ মানসিংহের সঙ্গে এঁর মিত্রতা স্থাপিত

হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নী প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে মানসিংহের শুভ পরিণয় ঘটে (১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল-পাঠান সংগ্রামে বেশীর ভাগ মোগলপক্ষই অবলম্বন করতেন। তাতে পাঠানদের অবস্থা উত্তরবঙ্গে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জ্ঞাতিবিরোধে লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আকবরনামায় মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যসীমা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তরে তিব্বত ও আসামের পর্বতমালা, পশ্চিমে তীরহুত এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে লিখিত আছে। লক্ষ্মীনারায়ণের চারি সহস্র অশ্বারোহী, দুইলক্ষ পদাতিক, সপ্তসতী হস্তী এবং এক সহস্র রণপোত থাকার বৃত্তান্ত আকবর-নামায় লিখিত আছে। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ আগ্রা থেকে স্থপতি আনয়নপূর্বক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। আহোমরাজ এবং কামরূপরাজের উৎপীড়নের ফলে বৈষ্ণবধর্মসংস্কারক মাধবদেব এবং দামোদরদেব স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক কামতারাজ্যে আগমন করলে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁদের সসম্মানে গ্রহণ ও আশ্রয়দান করেন। তাঁরা রাজার সাহায্যে ও উৎসাহে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মহারাজা মাধবদেবের প্রচারিত ধর্মকে রাজধর্ম বলে স্বরাজ্যে ঘোষণা করেছিলেন। ইনি মাধবদেবের পৌত্রী দময়ন্তী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমের দিকে ইনি পরলোক গমন করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ—মুর্শিদ কুলীর সময়ের বিখ্যাত কানুনগো দর্পনারায়ণের পৌত্র ও শিবনারায়ণের পুত্র। শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর নবাব আলীবর্দীর শাসনকালে লক্ষ্মীনারায়ণ কানুনগোর পদে নিযুক্ত হন। ইতিহাসে এঁর বহু সৎকর্মের উল্লেখ আছে। ইনি বহু ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। এবং তিন লক্ষ কালী পূজার ব্যবস্থা করে যান। আলীবর্দী খাঁর সময় থেকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ কানুনগোর কার্য করেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

লক্ষ্মীবর সিংহ—বঙ্গরাজ বল্লালসেনের প্রধান সচিব ব্যাস সিংহের পিতা। ইনি "কায়স্থ বা করণগুরু" সম্মানে সম্মানিত হতেন। এঁর অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী। কান্দী বা পাইকাপাড়া রাজবংশের ইনি অন্যতম পূর্ব-পুরুষ।

লম্বোদর বৈদ্য—অবস্থিতিকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। রচিত গ্রন্থ 'গোপীদূত'। গোপীগণ কর্তৃক কোন একজন গোপীকে দূতীরূপে প্রেরণের বর্ণনা।

ললিত গুপ্ত—অদ্বয়বজ্রের বংশধর। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'শুক্লৈকজটাসাধন'। জগদ্দলের দানশীল গ্রন্থ-

খানির অনুবাদ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী।

লহয়চন্দ্র—হরিকেলের রাজা কান্তিদেবের সমসাময়িক। ইনি ছিলেন কুমিল্লার নিকটবর্তী এক স্বাধীন রাজ্যের রাজা। ইনি আনুমানিক আঠার বছর রাজত্ব করেছিলেন। এঁর রাজত্বকাল নবম-দশম শতাব্দী।

লাউসেন—আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এঁর সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। রাজা ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের রাজত্বকালে বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ঢেকুর নামক স্থানের সামন্ত রাজা গোপবংশীয় সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গৌড়েশ্বর মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা ক্ষত্রিয় বংশীয় বৃদ্ধ কর্ণসেনকে এই বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের চারি পুত্র সকলেই নিহত হয়। স্ত্রীও পুত্রশোকে মারা যান। কর্ণসেনের এই দুর্দশা দেখে গৌড়েশ্বর ব্যথিত হন এবং স্বীয় শ্যালিকা সুন্দরী যুবতী রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেন। রঞ্জাবতীর ভাই মাহমদ (মাহুদ্যা) গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর অজ্ঞাতে গৌড়েশ্বর শুধু স্ত্রী ভানুমতীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই বিবাহ সম্পন্ন করায় মহামদ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হন। তিনি কর্ণসেনের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে থাকেন। রঞ্জাবতীর কোন সন্তান না হওয়ায় ধর্মঠাকুরের পুরোহিত রামাই পণ্ডিতের উপদেশানুসারে তিনি ধর্ম-পূজা করেন। তারই ফলে রঞ্জাবতীর এক পুত্র জন্মে। তাঁরই নাম লাউসেন। তাই লাউসেনের কাহিনী ধর্মপূজার কাহিনী। ধর্মোপাসক লাউসেন বাল্য-কাল থেকেই অদ্ভুতকর্মা হয়ে উঠে-ছিলেন। শারীরিক বল, দৈহিক সৌন্দর্য, বীরত্ব, চরিত্রবল ও স্বভাব মাধুর্যে লাউসেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মহামদ লাউসেনকে বারবার বধ করার চেষ্টা করেন। মহামদ লাউসেনকে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু ধর্মের বরে লাউসেন জয়ী হন, ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হন। লাউসেনের বিশ্বস্ত ডোম সৈন্য ও তাদের নেতা কালু ডোম যুদ্ধে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে। একবার লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হন। কামরূপ জয় করে রাজকন্যা কলিঙ্গা ও সিমূল জয় করে রাজকন্যা কানেড়াকে লাউসেন বিবাহ করেন।

লাকলঙ—একজন বাঙালী বীর। এঁর মাতৃকুল নাগবংশীয়। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইনি আনাম রাজ্যে গমন করেন। আনাম দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ইনি সেদেশের রাজাকে বিতাড়িত করে স্বয়ং রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। সেখানে 'উকি'

নামক এক রমণীকে বিবাহ করে তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি আনাম দেশের নাম রাখেন বনলজ। সেখানকার রাজবংশীয়েরা বন্ বা বজ নামে পরিচিত ছিল। এঁরা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত আনামে রাজত্ব করেছিলেন।

লারকিন্স, উইলিয়াম্—এই ইংরেজ পুরুষ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেরানীরূপে কলকাতায় আসেন। ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। কয়েক বছরের জন্য ইনি একাউন্টান্ট জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিলাতের পার্লামেণ্টে হেষ্টিংসের বিচারের সময় সাক্ষ্য দিবার সময় ইনি বিলাত গিয়েছিলেন।

লালচাঁদ (বা **লালু**) ও **নন্দলাল**—এঁরা দুই ভাই নামে পরিচিত। এরা নিধুবাবু ও শ্রীধর কথকের পূর্ববর্তী সংগীত রচয়িতা। এঁদের জীবৎকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। এঁদের অধিকাংশ সংগীতে "লালচন্দ্র-নন্দলাল" যুক্তভণিতা পাওয়া যায়।

লালদাস—এঁর নামান্তর কৃষ্ণদাস। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য গোষ্ঠীর শিষ্য। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ভক্তমাল' রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ। মূল টীকার সহিত অনেক নূতন ভক্ত কাহিনী যোগ করে লালদাস "গৌড় ভাবাছন্দে" সাতাশ "মালা"য় সুবৃহৎ 'ভক্তমাল' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভক্তমালে মহারাজা নন্দকুমারের এবং পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের উল্লেখ আছে। "কৃষ্ণদাস" ভণিতায় কতকগুলি পদও আছে। ভক্তমালের পূর্বে লালদাস 'উপাসনাচন্দ্রামৃত' নামে আর একখানি বইও লিখেছিলেন। এটি সাধনতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব ঘটিত নিবন্ধ। ভণিতা এইরূপ, শ্রীগুরু-চরণ পদ্ম করিয়া প্রত্যাশ উপাসনা-চন্দ্রামৃত কহে লালদাস।" উপাসনা-চন্দ্রামৃতের রচনাকাল ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

লালমামুদ—বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম। ইনি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার নারায়ণ ডহরের নিকটবর্তী বাওই ডহর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল কালু। লালমামুদ গ্রামের পাঠশালায় যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। প্রথম জীবনে ইনি গাজীর কীর্তন করতেন। পরে কবির দলে যোগ দেন। এই সময় হিন্দুধর্ম গ্রন্থ ও চৈতন্যলীলা গ্রন্থ পাঠ করার ফলে এঁর বৈষ্ণবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ইনি আপন বাটীর নিকটস্থ নদীতীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে তুলসীমঞ্চ স্থাপন করে রীতিমতো সেবা পূজা করতে থাকেন। এই সময় হতে নিরামিষাশী হয়ে স্বহস্তে পাক করে খেতে আরম্ভ করেন। লালমামুদ স্থাপিত তুলসীমঞ্চের সম্মুখে খোল-করতাল সংযোগে প্রত্যহ দুবেলা কীর্তন হত। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

লাল সিং—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বীরভূম জেলায় চোয়াড় বিদ্রোহ হয়, লাল সিং ছিলেন তার নেতা। তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ৪০০০ কৃষক বিদ্রোহ করে।

লালন ফকির—বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম। ইনি নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত 'ভাড়োরা' গ্রামে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কারুর কারুর মতে লালন এক কায়স্থ হিন্দুর সন্তান ছিলেন। পরে 'দরবেশ সিরাজ সাঁই'য়ের নিকট বাউল সহজিয়া বা সূফী মতে দীক্ষিত হন। এঁর রচিত বহু সংগীতে এঁর গুরু দরবেশের প্রতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। ইনি ছিলেন 'সাঁই'পন্থী বাউল। এঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুইই ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি এঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। লালন থাকতেন কালিগঙ্গাব ধারে ঠাকুর বাড়ীর জমিদারীর বিবাহিমপুর পরগণার ছেউঁড়িয়া গ্রামে। ১২৯৮ বাংলা সালের ১ কার্তিক লালন দেহত্যাগ করেন।

লালা জয়নারায়ণ সেন—জয়নারায়ণ সেন দ্র°।

লালাবাবু—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দ্র°।

লালা রামগতি রায়—রামগতি সেন (রায়) দ্র°।

লালু—লালচাঁদ-নন্দলাল দ্র°।

লালু হাজারী—বাঙালী হিন্দু। সিরাজের পিতৃব্য পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গের পদাতিক গোলন্দাজ-সেনার ইনি অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। পরে ইনি সিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

লীলাবতী—বিখ্যাত উদয়নাচার্যের কন্যা। ইনি অত্যন্ত বিদুষী বলে প্রসিদ্ধা ছিলেন। বল্লভাচার্যের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। পতিবিয়োগে কাতর হয়ে ইনি সংস্কৃতে একখানি করুণরসাশ্রিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। খল্লির ভট্টাচায-গৃহে ঐ গ্রন্থ এখনো রক্ষিত আছে। এঁর অবস্থিতিকাল চতুর্দশ শতাব্দী।

লুইপাদ—বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে লুই-পাদ (অথবা লুই-পা) সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের সমসাময়িক। তিনি চারখানি বজ্রযান গ্রন্থ এবং বহু দোহা রচনা করেন। তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে তিনি বাংলা দেশের চন্দ্রদ্বীপে ধীবব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং যোগিনীতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। সাধারণতঃ লুই পাদকে আদি সিদ্ধাচার্য বলা হয়। সম্ভবত ইনি রামপালের কায়স্থ (করণিক) ছিলেন। ইনি শবর-পাদের শিষ্য। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে ইনি আবির্ভূত হন।

লুৎফুন্নেসা—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধানা ও প্রিয়তমা বেগম। লুৎফুন্নিসা সিরাজের পরিণীতা পত্নী কিনা, এ

সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। সিরাজের তিন-চারটি বেগমের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু সহধর্মিণী না হলেও সিরাজ লুৎফুন্নেসাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। লুৎফুন্নেসা কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নি। অতি অল্প বয়সেই ইনি "জারিয়া" বা ক্রীতদাসীরূপে নবাব আলীবর্দীর অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা ও প্রতিপালিতা হন। সিরাজ এঁর অনুপম রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হয়েছিলেন। লুৎফুন্নেসা সিরাজের প্রিয়তমা বেগমরূপে পরিগণিত হয়ে চিরজীবন ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসরণ করেছিলেন। ইনি ছিলেন সাধ্বী নারী। অকৃত্রিম প্রেম, ভালবাসা ও মমতা প্রদর্শন করে ইনি সিরাজের হৃদয় অধিকার করেছিলেন। নারী হৃদয়ের অপার মহানুভবতার জন্যই ইনি ক্রীতদাসী থেকে রাজরানী হতে পেরেছিলেন। ইতিহাসে সিরাজের বিপদে ও সম্পদে, সুখে ও দুঃখে সকল সময়েই লুৎফুন্নেসার অসাধারণ স্বামী-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের পর সিরাজের পলায়নের সময় লুৎফুন্নেসা সিরাজের সহগামিনী হয়েছিলেন। হিন্দু নারীর ন্যায় স্বামীই ছিলেন এঁর নিকট পরম দেবতা। ইনি মুসলমান সমাজের এক উজ্জ্বল আদর্শ রমণী। সিরাজের মৃত্যুর পর তাঁর বেগমদের নিকট স্ব-স্ব পাত্র নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থিত হলে লুৎফুন্নেসা ঘৃণার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সঙ্গে সগর্বে বলেছিলেন, "যাহারা সর্বদাই গজারোহণে অভ্যস্ত তাহারা কি গর্দভ পৃষ্ঠারোহণ অভিলাষ করে?" আমৃত্যু সিরাজকে ইনি কখনো ভুলতে পারেন নি। ইনি প্রত্যহ একমাত্র শিশুকন্যাসহ খোসবাগে সিরাজের সমাধির উপর পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও উপাসনায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। ১৭৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। শুনা যায় স্বামীর সমাধি পূজা করতে করতেই নাকি এঁর মৃত্যু হয়।

লেবেডেফ, হেরাসিম—রুশদেশবাসী পর্যটক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডেফ নানা দেশ ভ্রমণ করে কলকাতায় এসে ২৫নং ডুমতলাতে (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীটে) একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন।

এখানে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন লেবেডেফ। গোলোকনাথ দাসের নিকট ইনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। প্রকৃষ্টরূপে বাংলা ভাষা শিক্ষার পর লেবেডেফ 'The Disguise' ও 'Love is the Best Doctor' নামে দু'খানি ইংরেজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাসের পরামর্শে দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করে 'The Disguise' নাটকটি অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। ১৭৯৫-

খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর এই নাটক প্রকাশ্যে অভিনয় হয়। পর বছর ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ আবার এই নাটক দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। লেবেডেফই বাংলা নাটক ও নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। এজন্য ইনি বাঙালীর নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কয়েক বছর পরে ইনি বিলাত চলে যান এবং সেখানে থেকে একখানা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ 'A Grammer of Pure and Mixed East Indian Dilects' (1801) প্রকাশ করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে অত্যন্ত হীনতাবস্থায় গতায়ু হন।

লোকনাথ—"মুনি ভরদ্বাজ-সদ্বংশজাত" "অধিমহারাজ নাথ"-এর পুত্র সামন্ত শ্রীনাথের পুত্র লোকনাথ। মাতামহ "পারশব।" মাতা গোত্র-দেবী। সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইনি ছিলেন ত্রিপুরার রাজা। সামন্তরাজ লোকনাথ ছিলেন "পরমেশ্বর" অর্থাৎ সার্বভৌম নৃপতি। লোকনাথ অত্যন্ত প্রতাপশালী, যুদ্ধবিশারদ ও গুণবান রাজা ছিলেন। সমতটের রাজবংশীয় শ্রীজীবধারণ নৃপতিকে ইনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। এবং তাঁর নিকট হতে "জয়তুঙ্গবর্ষ" বা জয়ন্তিয়া পাহাড় লাভ করেন। ইনি শৈব ছিলেন। সম্ভবত ইনি জয়তুঙ্গবর্ষে "লোকনাথ বুদ্ধমূর্তি" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

লোকনাথ চক্রবর্তী (গোস্বামী)—আনুমানিক ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে লোকনাথ চক্রবর্তীর জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম পদ্মনাভ এবং মাতার নাম সীতাদেবী। বাল্যে ইনি শান্তিপুরে গিয়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে ইনি অদ্বৈত প্রভুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ইনি গৌরাঙ্গ দেবের সহপাঠী। গৌরাঙ্গদেব যখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন লোকনাথ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। গৌরাঙ্গদেব কয়েকদিন লোকনাথের বাড়ীতে ছিলেন এবং বহু পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। ক্রমে লোকনাথের চিত্তে ধর্মভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এবং একদিন নিশিথে গৃহত্যাগ করে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন এঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে তীর্থোদ্ধারের জন্য আদেশ দেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ মতো লোকনাথ বৃন্দাবনে গিয়ে অবস্থান করেন। বনে বনে ঘুরে তিনি তিন শতাধিক তীর্থের আবিষ্কার ও মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তারপর তিনি সারাজীবন কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। লোকনাথ সম্ভবত 'ভাগবতের টীকা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

লোকনাথ দাস—অদ্বৈতপ্রভুর পত্নী সীতাদেবীর জীবন-চরিত 'সীতা চরিত্র' কাব্য প্রণেতা। কাব্যে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও তাঁদের রচনার উদ্ধৃতি দেখে মনে হয়,

'সীতা চরিত্র' চৈতন্যচরিতামৃতেরও পরে রচিত হয়েছিল। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মনে করেছিলেন সীতা-চরিত্র-লেখক এই লোকনাথ দাস এবং অদ্বৈত-শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্তী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতরা এ মতের বিরোধী। তবে লোকনাথদাসের 'সীতা চরিত্র'ই সীতা-জীবনী সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—খ্যাত-নামা মহাপুরুষ। জন্ম চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত এলাকার চৌরাসী চাকলা গ্রামে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে। পূর্ব নাম লোকনাথ ঘোষাল। পিতা রামনারায়ণ, মাতা কমলা দেবী। পূর্ব-বঙ্গবাসিগণের নিকট ইনি "বারদীর ব্রহ্মচারী" নামে পরিচিত। ইনি নাকি ১৫৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

লো কা ন ন্দা চা র্য—নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। 'ভক্তিসার-সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। 'ভক্তি-চন্দ্রিকাপটল'ও এঁরই সঙ্কলিত বৈষ্ণব স্মৃতি।

লোচন (ত্রিলোচন, সুলোচন বা লোচনানন্দ) দাস—লোচন দাস ১৪৪৫ শকে বা ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কোগ্রামে বৈদ্য পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতা সদানন্দী। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। বিবাহিত হলেও পত্নীকে কেবলমাত্র সাধন সঙ্গিনী হিসাবে দেখেছেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ছিলেন লোচনের দীক্ষাগুরু। রাম-গোপালদাস রসিকদাসের শাখা-নির্ণয়ে আছে যে গুরুর জন্য লোচন দাস নিজেকে ফিরিঙ্গি (অর্থাৎ পর্তুগীজ) বণিকের কাছে জামিন রেখেছিলেন। লোচনদাসের রচিত গ্রন্থের নাম 'চৈ ত ন্য ম ঙ্গ ল'—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত। ইহা মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুসরণে রচিত। কথিত আছে, তিনি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। কোগ্রামের নিকটবর্তী বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে লোচনের স্বহস্ত-লিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। লোচন যে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসে চৈতন্যমঙ্গল লিখেছিলেন, তা এখনো আছে। লোচন দাস আনুমানিক ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরোহিত হন। ইনি কতক-গুলি বৈষ্ণবতত্ত্ববিষয়ক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। যেমন, 'দুর্লভসার', 'চৈতন্যবিলাস', 'বস্তুতত্ত্বসার', 'আনন্দ-লতিকা' ইত্যাদি। ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের মধ্যে লোচন দাস অন্যতম।

লোমপাদ বা রোমপাদ—রোমপাদ শব্দ লোমপাদ শব্দের আকার ভেদ। ইনি অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। এখনকার ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদ, মালদহ,

বীরভূম ও বর্ধমানের কতকাংশ নিয়ে অঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়েছিল। রামায়ণের যুগে রামচন্দ্রের পিতা দশরথের ইনি ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইনি ছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর। হস্ত্যায়ুর্বেদবেত্তা পালকাপ্যের শিষ্য। হস্ত্যায়ুর্বেদবিচারে রাজা লোমপাদ অত্রি, বাস্কলি, ভরদ্বাজ গার্গ, মাণ্ডব্য, ভৃগু, মতঙ্গ, চ্যবন, পালকাপ্য প্রভৃতিদের নিয়ে মাঝে মাঝে সভা আহ্বান করতেন। এঁর অবস্থিতি কাল এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে। চম্পায় অর্থাৎ বর্তমানের ভাগলপুরে ছিল এঁর রাজধানী। লোমপাদের প্রপৌত্র চম্প ছিলেন এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

শ

শ ও ক ৎজ ঙ্গ—বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পিতৃব্যপুত্র। ইনি পূর্ণিয়ার নায়েব নাজিম ছিলেন। ইনি সর্বাংশে সিরাজেরই অনুকৃতী। উভয়েই সমান কুক্রিয়াসক্ত ও কার্যাকার্য বিচারে অক্ষম। সিরাজের বরং বিবেচনা শক্তি ছিল, শওকতে তারও অভাব। কাগজে স্বাক্ষর করতেই গলদঘর্ম হতেন। পিতার নাম সইদ আহম্মদ। শওকতই ছিলেন আলীবর্দী খাঁর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী। মুর্শিদাবাদের আমীর ওমরাহগণ সিরাজের প্রতি নানাকারণে বিরূপ থাকায় শওকৎকেই বাংলার নবাব করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

শক্তিস্বামী—শক্তিস্বামীর পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস ছিল গৌড়ে। এঁর পিতামহ শক্তি স্বদেশ ত্যাগ করে চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তা নদীর মধ্যভাগে একটি অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করেন। শক্তিস্বামীর বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় পেয়ে কাশ্মীরের সুবিখ্যাত রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় এঁকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। এঁর অবস্থিতি কাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দী।

শঙ্কর—অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন কবি। ইনি শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র হতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি একখানি ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে কবির তু'খানি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ অঞ্চলে কবির রচিত ষষ্ঠীমঙ্গল এখনও গীত হয়। সেকারণে তাঁকে মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী বলা হয়। কবির-আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম সীতারাম এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্ধন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁর কাব্য রচিত হয়েছিল।

শঙ্কর ঘোষ—'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' থেকে জানা যায় শঙ্কর ঘোষ ছিলেন একজন 'ডম্ফবাদ্যবিশারদ। বৈষ্ণববন্দনা', 'চৈতন্যগণোদ্দেশ' এবং রামাই-এর 'চৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থেও ডম্ফবাদক এই শঙ্কর ঘোষের নাম পাওয়া যায়। শঙ্কর

ঘোষ ছিলেন একজন পদকর্তা। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাল্যসঙ্গী ও পরে বীর সেনাপতি। মোগল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে ইনি বারবার অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অম্বররাজ মানসিংহ শঙ্কর চক্রবর্তীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

শঙ্কর (কবিচন্দ্র) চক্রবর্তী—মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে একাধিক বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন, শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী অন্যতম।

রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ ছাড়াও তিনি দু'খানি মঙ্গল কাব্য ও একখানি পাঁচালী রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ অতি অল্প কবিই রচনা করতে পেরেছিলেন। এঁর মঙ্গলকাব্য দুখানির মধ্যে একখানি শিবমঙ্গল ও অন্যখানি শীতলামঙ্গল। শিবমঙ্গল রচনায় ইনি পূর্ববর্তী কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করার পরিবর্তে এঁর লৌকিক ধারাই অনুসরণ করেছিলেন; সেইজন্যই এঁর কাব্য এই বিষয়ে এঁর পরবর্তী কবি-দিগেরও পথ প্রদর্শন করেছে। শঙ্কর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি মল্লভূমির অধিপতি রাজা বীর সিংহের আমলে আনুমানিক ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের অনতিদূরে পানুয়া নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্তী। ইনি 'কবিচন্দ্র' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং ভণিতায় নামের পরিবর্তে অনেক স্থলে ইনি এই উপাধিই ব্যবহার করেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনেও ইনি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বিবিধ প্রামাণ্য বৈষ্ণব গ্রন্থে এঁর সম্পর্কে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র সার সংকলন করে ইনি যে অনুবাদকাব্য রচনা করেন, তা 'ভাগবতামৃত' নামে বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হত। এই সূত্রে ইনি বৈষ্ণবসমাজেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামক যে অংশটি দেখতে পাওয়া যায়, তা এই কবিচন্দ্র শঙ্করেরই রচনা। শঙ্কর ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহদেবের (রাজ্যকাল ১৭১২-৪৮ খ্রীঃ) সভাকবি।

শঙ্কর তর্কবাগীশ—একজন অসামান্য প্রতিভাধর পণ্ডিত। তর্ক শাস্ত্রে তাঁর ছিল অদ্ভুত অধিকার। অনেক পণ্ডিতের ধারণা শঙ্কর ছিলেন রঘুনাথ শিরোমণির বংশধর। তাঁর পিতা রত্নরাম সার্বভৌম (১০০০ খ্রীঃ)

মুর্শিদাবাদ থেকে নবদ্বীপে আসেন। শঙ্করের জন্মকাল ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়। তিনি পিতার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। কালক্রমে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক পদে সুদীর্ঘ কাল প্রতিষ্ঠিত থেকে বাঙালী প্রতিভার মূর্ত প্রতীকরূপে ভারতের সর্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর সুবৃহৎ চতুষ্পাঠীতে একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রই অধীত হত। তাঁর ৬৫ বছরব্যাপী অধ্যাপক জীবনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু সহস্র প্রবীন ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য করে দিয়েছিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯৩ বছর বয়সে শঙ্কর পরলোক গমন করেন।

শঙ্কর দাস—একজন কবি। এঁর পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইনি ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। এঁর রচিত গ্রন্থ "দোললীলা"। 'পদকল্পতরু'তে এঁর তিনটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। তিনটিই বাংলা পদ। এঁর রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী।

শঙ্করদেব—ইনি কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। ইনি নাকি নীলাচলে গিয়ে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। শঙ্করদেব ছিলেন জাতিতে কায়স্থ এবং ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়দোয়া গ্রামে (নওগাঁও জেলায়) এঁর জন্ম হয়েছিল। ইনি ছিলেন কায়স্থ ভূস্বামী রাজাধর দলই-এর প্রপৌত্র। সূর্যবর ছিলেন পিতামহ, আর পিতা ছিলেন খ্যাতনামা "ভৌমিক" কুসুম। ইনি শক্তিপূজার বিরুদ্ধে মত প্রচার করতে আরম্ভ করায় ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে আহোম রাজার নিকটে এঁর প্রতিকূলে অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন। কামতাপুরের রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আসাম বিজয়ের পর, শঙ্করদেব আসাম পরিত্যাগপূর্বক কামতারাজ্যে আগমন করেন এবং তথায় রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলা রায়) সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। শুক্লধ্বজের অনুমতিক্রমে শঙ্করদেব 'সীতাস্বয়ংবর' নাটক রচনা করে দেশে 'ভাবনা'র (অভিনয়ের) প্রবর্তন করেছিলেন। রাজগুরু কণ্ঠভূষণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ এস্থানেও এঁর বিরুদ্ধাচারী হন। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে অপরাধ আরোপিত এবং তজ্জন্য এঁর নামে রাজদ্বারে অভিযোগ আনীত হয়েছিল। রাজা শঙ্করদেবের শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্লধ্বজের চেষ্টায় রাজা শঙ্করদেবের পূতচরিত্র, আত্মত্যাগ এবং ধর্মমত অবগত হয়ে এঁর অনেক সমাদর হয়। কৃষ্ণভারতী 'সন্তনির্ণয়' পুঁথিতে লিখেছেন যে শঙ্করদেব রাজার আদেশে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তদবস্থায় 'গুণ্ড-চিন্তামণি' পুঁথি রচনাপূর্বক তাহা রাজাকে উপহার দিয়ে মুক্তিলাভ

করেন। পরে মহারাজা রাজনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। মহারাজার আশ্রয়ে থেকে তিনি কৃষ্ণগুণমালা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন, 'ভাগবত-পুরাণ' 'অনাদিপত্তন', 'ভক্তিপ্রদীপ', 'রুক্মিণী-হরণ নাট' ও 'শ্রীরামবিজয় নাট'। নাট দুটিতে সেকালের সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই গদ্যও ব্রজবুলিতে লেখা। এক কথায় বলতে গেলে শঙ্করদেব ছিলেন কামরূপ সাহিত্য সংস্কৃতির গোষ্ঠীপতি। তিনি ও এঁর শিষ্য-উপশিষ্যরা একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মতো এঁরও উপদেশ ছিল "সকল নিগম-লতা তার

অবিনাশি ফল কৃষ্ণনাম চৈতন্যস্বরূপ
সুমধুর সুমঙ্গল শ্রদ্ধায়ে হেলায়েলৈ
নর মাত্র তরে ভবকূপ।"

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেব পরলোক গমন করেন।

শঙ্কর দ্বিজ—একজন কবি। পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি আদি, মধ্য, সন্ন্যাস ও শেষ খণ্ডে উনত্রিশ অধ্যায়ে 'শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের লিপিকাল ১৭১১ শকাব্দ।

শঙ্কর পণ্ডিত—দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা। ইনি গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে নীলাচলে বাস করেছিলেন। শঙ্কর পণ্ডিত মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। গৌরাঙ্গের ইনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। নীলাচলে থেকে শঙ্কর পণ্ডিত প্রথম হতে একেবারে তিরোধান কাল পর্যন্ত তাঁর সেবা করে গিয়েছেন। উৎসবাদি উপলক্ষে ভোজন-কালে তাঁকে প্রায়ই পরিবেশন করতে দেখা যেত। মধ্যে মধ্যে ইনি মহাপ্রভুকে ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। মহাপ্রভুর শেষজীবনে শঙ্করকে উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁর জন্য ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। সেই সময় তিনি মহাপ্রভুর পদতলে শয্যাগ্রহণ করতেন। মহাপ্রভু পাদ-প্রসারণ করলেই এঁর গায়ে লাগত। অমনি সচকিত হয়ে তাঁর প্রতি যত্নবান হতেন। সেইজন্য তখন থেকে 'প্রভু পাদোপাধান' বলে এঁর নাম প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

শঙ্কর বিশ্বাস—একজন পদকর্তা। 'পদকল্পতরু'তে এঁর তিনটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী।

শঙ্কর মিশ্র—মিথিলানিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক। বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় ইনিও ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শঙ্কর মিশ্র রচিত গ্রন্থসমূহ: (১) বাদিবিনোদ প্রকরণ, (২) ভেদপ্রকাশ, (৩) অভেদ-ধিক্কার, (৪) কণাদরহস্য, (৫) ত্রিসূত্রী-নিবন্ধ ব্যাখ্যা, (৬) কুসুমাঞ্জলি আমোদ, (৭) আত্মতত্ত্ববিবেক-কল্পলতা, (৮)

কিরণাবলীনিরুক্তিপ্রকাশ, (৯) বৈশেষিকসূত্রোপস্কার, (১০) খণ্ডন-টীকা, (১১) লীলাবতীকণ্ঠাভরণ, (১২) মণিময়ূখ। তাছাড়া, শঙ্কর কাব্য-নাটকও রচনা করেছিলেন। তিনি প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। তাঁর বিদ্যাগুরু ছিলেন তাঁর পিতা ভবনাথ।

শঙ্কর সেন—বিষপাড়া সমাজের ষোড়শ শতাব্দীর চিকিৎসক। এঁর রচিত গ্রন্থ বিদ্যাবিনোদসংহিতা, রসশঙ্কর এবং নাড়ীপ্রকাশ।

শচীদেবী—এই মহীয়সী মহিলা ছিলেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জননী ও জগন্নাথ মিশ্রের সহধর্মিণী। শ্রীহট্ট-নিবাসী এবং পরে নবদ্বীপে বসবাসকারী নীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন শচীদেবীর পিতা। শচীদেবী পিতার জ্যেষ্ঠা কন্যা। জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে এবং শচীদেবীর গর্ভে আটটি কন্যা হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় পরম শুভক্ষণে শচীদেবী এক সর্বাঙ্গ-সুন্দর পুত্র প্রসব করেন। ইনিই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ষোল বছর বয়সে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করলে শচীদেবী ব্যথিত হন। পরে নিমাই-এর গৃহত্যাগেও ইনি মর্মাহত হন। এঁর অবস্থিতি কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

শচীনন্দন—বৈষ্ণব সাহিত্যে একজন মাত্র শচীনন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন বংশীবদনের পৌত্র, চৈতন্যদাসের দ্বিতীয় পুত্র এবং রাম-চন্দ্রের অনুজ। ছাত্রাবস্থাতেই শচী-নন্দন অত্যন্ত কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে শচীনন্দন-ভণিতায় তিনটি পদ পাওয়া যায়। এ ছাড়া, ইনি 'শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর তিন পুত্র—রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব। সকলেই পদকর্তা ও গ্রন্থকর্তা ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

শচীনন্দন বিদ্যানিধি—বর্ধমান জেলার চাণক গ্রামবাসী। ১৭০৭ শকাব্দে ইনি উজ্জ্বলনীলমণির 'উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা' নামে পদ্যানুবাদ করেন।

শতানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ—জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য নবদ্বীপে এঁর সুখ্যাতি ছিল। সুপণ্ডিত শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন ভৃগুরাম বাচস্পতির পুত্র। এঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত কমলাকর জ্যোতিষী। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

শবরীপাদ—একজন সিদ্ধাচার্য ও চর্যাকার। চুরাশি সিদ্ধার অন্যতম। এঁর রচিত দু'টি চর্যাপদ চর্যাগীতি-সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে। এঁর নামে নানা স্থানে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত

আছে। এক শবরীপাদ বজ্রযান বিষয়ে সংস্কৃতে অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন। তন্মধ্যে 'বজ্রযোগিনী সাধনা', 'মহামুদ্রা-বজ্রগীতি', 'চিত্তগুহ্য গম্ভীরার্থগীতি' প্রভৃাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সাধন-মালা'য় 'সিতকুরুকুল্লা সাধন' নামক আর একখানি পুস্তকে শবরপার ভণিতা আছে। এই 'সাধনমালা'য় 'বজ্র-যোগিনী আরাধনবিধি' নামক আর একখানি গ্রন্থেও শবরপাদের নাম রয়েছে। শবরপাদ বাংলা দেশের কোন এক পাহাড়ী শিকারী জাতির (শবর) মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তারানাথ এঁকে 'শবরী' বলেছেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী শবরপার দুই স্ত্রী—লোকি ও গুণি। নাগার্জুন নাকি এঁকে বজ্রযান ধর্মে দীক্ষিত করেন। ইনি ছিলেন সরহপাদের শিষ্য এবং লুইপাদের গুরু। তেঙ্গুর তালিকায় শবরাশ্বর নামক এক আচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বজ্রযোগিনী সাধনা বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন। আচার্য শবরীশ্বর এবং পদকর্তা শবরী-পাদ সম্ভবত একই ব্যক্তি। এঁর অবস্থিতি কাল অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

শমশের আলী—চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন মুসলমান কবি। চট্টগ্রামের প্রাচীন হাটহাজারী (বর্তমান রাউজান) থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে কবি শমশের আলীর জন্ম হয়। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। শমশের আলী "বিজওয়ান শাহ" নামে একখানি উপাখ্যানমূলক কাব্য রচনা করে-ছিলেন। কবি শমশের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এঁর ফারসী ও উর্দু ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল। তাছাড়া, সংস্কৃত ভাষায়ও ইনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এঁর কাব্যের স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে।

শম্ভুচন্দ্র রায়—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রংপুরের জমিদার। ইনি মহাভারতের অনু-করণে 'বিক্রম ভারত' সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারতের অবস্থা বর্ণনা।

শম্ভুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ—একজন স্মার্ত। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম: 'অকাল ভাস্কর"। গ্রন্থটি ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। এতে মলমাস ও মলমাসে কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এঁর রচিত 'বর্ষভাস্কর' গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইনি ছিলেন কোচবিহার নিবাসী এবং ইনি রাজা ধর্মদেবের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শম্ভুনাথ রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: দিনভাস্কর (শুভাশুভ দিন বিচার), দুর্গোৎসবকৃত্যকৌমুদী, দেবী-পূজনভাস্কর ইত্যাদি।

শম্ভুরাম, (মজুমদার) দ্বিজ—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। এঁর রচিত

গ্রন্থের নাম 'জীমূতমঙ্গল'। এঁর নিবাস ছিল মেদিনীপুরের নিকট পাথরা গ্রামে "প্রাচীন বাটী" অর্থাৎ পুরনো বাড়ীতে। পৈতৃক নিবাস ছিল রতনচক গ্রামে। নাড়াজোলের জমিদার মোহনলাল খান এঁর পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। খুল্লতাতের অনুমতি-ক্রমে শম্ভুরাম 'অনন্তচতুর্দশী-ব্রত কথা'ও লিখেছিলেন।

শরণ—শরণ বা শরণদেব ছিলেন সেন রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম সভাকবি। এঁর বিশটি শ্লোক সদুক্তি কর্ণামৃতে উদ্ধার করা হয়েছে। কবি জয়দেবেব নিজের ভাষায়, "শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ-দ্রুতে"—কবি শরণ দুরূহ ও দ্রুত শ্লোক-বন্ধনে শ্লাঘ্যঅনুসারে ইনি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। সুতরাং ইনি দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন বলে মনে করা যায়।

শরফুন্নেসা—বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর বেগম এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের মাতামহী। নবাব আলীবর্দীর রাজত্বের বহু ঘটনাব সঙ্গে বেগম শরফুন্নেসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত। বেগম সাহেবা ছায়ার ন্যায় স্বামার অনুবর্তিনী হতেন। এঁর পুরুষোচিত ধৈর্য ও রাজনীতি প্রসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। বেগম শরফুন্নেসা ছিলেন "উৎসবে আনন্দময়ী, সোহাগে প্রেম-বিহ্বলা লজ্জাশীলা, রোগে ও ক্লান্তিতে শুশ্রূষাপরায়ণা সহচরী, রাজকার্যে বিপদে পরামর্শদাত্রী।"

কি রাজনৈতিক উন্নতিবিধানে, কি সামাজিক মঙ্গলকল্পে এবং প্রজাদের হিতার্থে পরদুঃখকাতরা বেগম সাহেবা স্বামীকে সৎপরামর্শ দিতেন। আলীবর্দী যখনই কোন কার্যে হতাশ বা চিন্তান্বিত হতেন তখন বেগম সাহেবা তাঁকে সুপরামর্শ দিয়ে উদ্বেগ দূর করতেন। স্বামীকে কখনো কোন কাজে পশ্চাদ্‌পদ বা দুর্বল হতে দেখলে শরফুন্নেসা তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উত্তেজিত করে সবল করে তুলতেন। একাধিক সংগ্রামে ইনি আলীবর্দীর সঙ্গে ছিলেন। বর্গীর আক্রমণের সময় বেগম সাহেবা নানাভাবে স্বামীকে সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন। আলাবর্দীর সমস্ত মহৎকর্মের প্রেরণা-দাত্রী ছিলেন শরফুন্নেসা। তাঁর উন্নত চরিত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে হলওয়েল সাহেব বলেছিলেন, "জ্ঞানগরিমা, মহানুভবতা, কারুণ্য ও অপরাপর কমনীয় সদ্‌-গুণাবলীভূষিতা বেগম সাহেবার চরিত্র তাহার পদমর্যাদারূপই ছিল এবং এ সকল সদ্‌গুণ যে তাঁহাকে চিরকাল নারীকুলোত্তমা করিয়া রাখিবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।" পলাশীর যুদ্ধাবসানে সিরাজের হত্যাকাণ্ডের পর শরফুন্নেসা, আমিনা, ঘসেটি প্রভৃতির সঙ্গে ঢাকায় নির্বাসিতা হন। আমিনা ও ঘসেটির নির্মমভাবে মৃত্যু হয়। শরফুন্নেসা সাত বছর

পরে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন এবং কোন্ সময় এঁর মৃত্যু হয় তা জানা যায় না। তবে খোসবাগ সমাধি কাননে স্বামী আলীবর্দীর চরণতলে সমাহিতা হয়েছিলেন।

শশধরাচার্য—মিথিলানিবাসী ন্যায়াচার্য এঁব জীবিতকাল ১২০০ শক বা ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।

শশাঙ্ক—বাঙালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। এঁর বংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে কারুর কারুর মতে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। এবং ইনি গুপ্তরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা ভিত্তিহীন বলেই অনুমিত হয়। প্রাচীন রোহিতাশ্বের (রোটাস্‌গড়) গিরিগাত্রে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক" এই নামটি ক্ষোদিত আছে। যদি এই শশাঙ্ক ও গৌড়রাজ শশাঙ্ককে অভিন্ন বলে গ্রহণ করা যায় তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, শশাঙ্ক প্রথমে একজন মহাসামন্ত মাত্র ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে শশাঙ্ক এই মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন।

৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ খুব সম্ভব মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও শশাঙ্ক জয় করেছিলেন। শশাঙ্কের পূর্বে আর কোনও বাঙালী রাজা এতবড় বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। তিনি বারাণসী অধিকার করে আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিলেন। থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। শশাঙ্ক খুব সম্ভব ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে মারা যান। শশাঙ্ক বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনিই সর্বপ্রথম আর্যাবর্তে বাঙালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মৌখরি রাজশক্তি তাঁর কূটনীতি ও বাহুবলে সমূলে ধ্বংস হয়। সমগ্র উত্তরাপথেব অধীশ্বর প্রবল শক্তিশালী হর্ষবর্ধনের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

শশীদেব—বাংলার পাল রাজাদের রাজত্বকালীন প্রখ্যাত বাঙালী শিল্পী। অবস্থিতিকাল অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ।

শাকর মল্লিক—প্রখ্যাত সনাতন গোস্বামীর বাদশাহ-দত্ত পূর্ব নাম। সনাতন দ্র°।

শান্তি বা শান্ত রক্ষিত—শান্তি রক্ষিত এক সময় নালন্দা মহাবিহারের

প্রধান আচার্য ছিলেন। এঁর জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের জাহোর নামক স্থান। কারুর কারুর মতে ইনি গৌড়বঙ্গের লোক। এঁর জন্ম গোপালের রাজত্ব কালে ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপালের রাজত্বকালে মৃত্যু হয়। 'অষ্টতথাগত স্তোত্র', 'ব্রজধর-সংগীত-ভগবত-স্তোত্রটীকা' এবং 'পঞ্চ মহোপ-দেশ' নামক তিনখানা বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্য নাম ছিল আচার্য বোধিসত্ত্ব। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে এই বৌদ্ধ আচার্য শান্তিরক্ষিত এবং মহাযানী নৈয়ায়িক ও দার্শনিক শান্তরক্ষিত একই ব্যক্তি। তিনি সুপ্রসিদ্ধ 'তত্ত্বসংগ্রহ', 'তত্ত্বসিদ্ধি', 'বা দ ন্যা য় বৃ ত্তি-বিপঞ্চিতার্থ' এবং 'মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা' প্রভৃতি গ্রন্থেরও লেখক।

শান্তি রক্ষিত তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে দু'বার তিব্বত গমন করেন। ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বতে একটি মঠ স্থাপন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ-ধর্মের সংস্কার করেন। তিনি তিব্বতের বিখ্যাত লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন এবং অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

শান্তিদেব—শান্তিদেব ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। 'তেঙ্গুরে' এঁকে জাহোরের (ঢাকা জেলার সাভার গ্রাম) অধিবাসী বলা হয়েছে। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুযায়ী শান্তিদেব ছিলেন রাজকুমার এবং তিনি তারাদেবীর অনুপ্রেরণায় রাজ্যলোভ ত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন যাপন করেন।

শান্তিদেব অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে 'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থদ্বয় প্রধান।

শান্তি-পা—একজন সিদ্ধাচার্য। সম্ভবতঃ ইনি দীপঙ্কর অতীশকে তন্ত্র-শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং শান্তি পা অতীশের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন ধরা যায়। পালরাজ মহীপালের অনুরোধে শান্তি-পা বিক্রমশিলা বিহারের পূর্বদ্বার-পণ্ডিতের পদে কাজ করেছিলেন। ইনি একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। প্রাচীন বাংলা ভাষায় ইনি কয়েকটি চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' এঁর দু'টি পদ পাওয়া যায়।

শান্তিপাদ—চর্যাকার শান্তিপাদের দু'টি চর্যা চর্যাগীতিসংগ্রহে স্থান লাভ করেছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে শান্তিপাদ মগধে জন্মগ্রহণ করেন এবং উদ্দন্তপুরী বিহারে সর্বাস্তিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে ইনি কিছুকাল সোমপুরী বিহারের (বাঙলা) 'স্থবির' হয়েছিলেন। শান্তিপাদ সাত বছর সিংহলে ধর্মপ্রচার করেন। এঁর নামে প্রায় নব্বইখানা গ্রন্থ পাওয়া যায়। চর্যাকার শান্তিপাদ সম্ভবত ভুসুকুর শিষ্য। এঁর আবির্ভাব কাল সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দী।

শার্ঙ্গধর—সংকলয়িতা হিসেবেই পরিচিত। এঁর সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি'। সংকলন-কাল ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

শামসুদ্দীন (দ্বিতীয়)—সৈফুদ্দীন হম্‌জার মৃত্যুর পর (১৪১২-১৩ খ্রীঃ) তাঁর পালিত পুত্র শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ দ্বিতীয় শামসুদ্দীন নাম গ্রহণ করে বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন। প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল রাজা গণেশের হাতে। অল্পদিনের মধ্যে শামসুদ্দীন নাকি রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ—রাজা গণেশের পৌত্র এবং জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৩১ খ্রীঃ)। 'ফিরিশ্‌তা' বলেছেন, "তিনি (শামসুদ্দীন) তাঁর মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়ে বহু লোক বাধিত হয়েছিল।" কিন্তু 'রিয়াজে' এ পাওয়া যাচ্ছে, "তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী, অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু ছিলেন। বিনা কারণে তিনি রক্তপাত করতেন এবং গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরতেন। অত্যাচার যখন চরম সীমায় পৌছোলো এবং উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলেই যখন তাঁর নৃশংসতায় শোচনীয়ভাবে পীড়িত হতে লাগল, তখন শাদী খাঁ এবং নাসির খাঁ নামে তাঁর দুই ক্রীতদাস, যাঁরা অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ষড়যন্ত্র করে আহ্‌মদ শাহকে হত্যা করেন।" ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে রাজা গণেশের বংশের রাজত্ব চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেল।

শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ—ইলিয়াস শাহী বংশের খ্যাতনামা সুলতান রুকনুদ্দীন বরবাক শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর রাজত্বকালে কোন বিদ্রোহ হয়নি। এতে তাঁর সুমহান্ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি রাজ্যে সুরাপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফেরিস্তা ও নিজামুদ্দীন তাঁদের গ্রন্থে ইউসুফ শাহের বহু গুণকীর্তন করেছেন। ইউসুফ শাহ সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, সুদক্ষ ও ন্যায়-বিচারক নরপতি। জটিল বিষয়ে তিনি কাজী ও মুফতির সঙ্গে আলোচনা করে বিচার করতেন। তাঁর সময়ে শ্রীহট্ট-বিজয় সমাপ্ত হয়। সুহৈল-ই-ইয়মন নামক একখানি গ্রন্থে মুসলীম কর্তৃক শ্রীহট্ট-বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে—প্রবাদ ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

জৈনুদ্দীন নামক একজন মুসলমান কবির লেখা 'রসুলবিজয়' নামে একখানি বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়েছে। এর ভণিতায় কবি জনৈক রাজা "ইছপথান" বা "যুসুফ খান" এর উল্লেখ করে লিখেছেন,

"দানে ধর্ম হরিশ্চন্দ্র মান্য গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান।"

ইউসুফ শাহের রাজত্বকালেই মালাধর বসু তাঁর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্য সমাপ্ত করেন। ধনী, গরীব বা হিন্দু, মুসলমান এদের মধ্যে বিচারের সময় কোন তারতম্য করতেন না। পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট কাজীদের ইনি কঠোর শাস্তি দিতেন। তাঁর রাজত্বকালে কয়েকটি বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালদহের সাকোমোহন মসজিদ, গৌড়ের কদমরসুল' মসজিদ, দরাসবাড়ী জামী মসজিদ ও তাঁতি পাড়া মসজিদ। ইনি পাণ্ডুয়ার অনেকগুলি স্তূপ ও বাসুদেবের মন্দির মসজিদে পরিণত করেন। "বাইশ দরজা" নামক গৌড়ের বিশাল মসজিদটি ভগ্ন স্তূপ মন্দিরের উপাদানে নির্মিত। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মারা যান।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ—আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করে হাজী ইলিয়াস শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করে রাজা হন (১৩৪২ খ্রীঃ)। কোন কোন বিবরণী থেকে জানা যায় যে ইলিয়াস দুশ্চরিত্র লোক ছিলেন এবং ষড়যন্ত্র করে তাঁর প্রভু আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করেছিলেন। হাজী ইলিয়াসের আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরাণের সিজিস্থানে। যাই হোক, সামান্য ব্যক্তি থেকে তিনি পরবর্তীকালে এক বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করেই শামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ রাজ্য জয়ের দিকে মন দেন। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করেন এবং সেখানকার বহু নগর ভস্মীভূত করেন এবং বিখ্যাত পশুপতিনাথের মূর্তিকে তিন খণ্ড করেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে চিল্কা পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বহু ধনসম্পত্তি লুঠ করেছিলেন। তিনি বিহারের ত্রিহুতও আক্রমণ করে ধনসম্পত্তি লুঠ করে আনেন। বিহারের হাজিপুর পর্যন্ত তিনি জয় করেছিলেন। শোনা যায় হাজী ইলিয়াসের নামানুসারে হাজীপুর নামক স্থানের নামকরণ হয়েছিল। ১৩৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁওসহ সমগ্র পূর্ববঙ্গ জয় করে সমগ্র বাংলা দেশের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি কামরূপেরও কিছু অংশ জয় করেছিলেন।

দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক একাধিকবার বাংলাদেশ আক্রমণ করে ইলিয়াসকে অধীনতা-

পাশে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইলিয়াসের বিখ্যাত একডালা দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য। তাকে জয় করতে না পেরে ফিরোজ শাহ বঙ্গেশ্বরের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ই'লয়াস শাহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু সংদে'ও (সহদেব)। এছাড়া, হিন্দু রাজারা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে ইলিয়াস উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শামসুদ্দীন ষোল বছর পাঁচ মাস রাজ্য সুশাসন করে ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইলিযাস শাহ তাঁর রাজ্যে একটি নূতন রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। ফিরুজা-বাদের বিরাট হামাম বা স্নানাগার তাঁরই আদেশে নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইনি দিল্লীর অধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন ও সার্বভৌমিক রাজা হয়েছিলেন।

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ—পরিব্রাজক ইবন্ বতুতার মতে ইনি বুগরা খানের পুত্র। রুকনুদ্দীন কাইকাউসের পর শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ লখনৌতির সুলতান হন। ১৩০১-২২ খ্রীষ্টাব্দ—এই সুদীর্ঘ একুশ বছর তিনি রাজত্ব করেন। ইনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন রাজা ছিলেন। সম্ভবত শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নামানুসারে পাণ্ডুয়া (মালদহ জেলা) নগরের নামান্তর ফিরোজাবাদ'—এর উল্লেখ দেখা যায়।

শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ—একজন হাব্শী। পূর্ব নাম সিদি বদর। নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহকে (দ্বিতীয়) হত্যা করে গৌড়ের সুলতান হন। এবং শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ নাম গ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজা হয়ে ইনি বহু দরবেশ, আলিম ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করেন। মুজাফ্ফর শাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ার নূর-কুৎব্ আলমের সমাধি-ভবনটি পুন-নির্মিত হয়। ইনি গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার দরগায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নিহত হন। এঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাবশী রাজত্বের অবসান হয়।

শায়েস্তা খাঁ—পুরো নাম নবাব আমীর-উল-ওমরা শায়েস্তা খাঁ। আরঙ্গজেবের মাতুল। দাক্ষিণাত্যের সুবাদাররূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নববিজিত পুণা দুর্গে অবস্থানকালে শিবাজী ও তাঁর কয়েক-জন অনুচর কর্তৃক রাত্রিকালে আক্রান্ত হয়ে পলায়নকালে এঁর একটি আঙুল কর্তিত হয়। মুয়াজ্জিম খাঁ বা মীর-জুমলার মৃত্যুর পর সম্রাট আরঙ্গজেব কর্তৃক ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত ইনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। এঁর সুশাসনে প্রজারা যথেষ্ট সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করত। ইনি সদ্বংশজাত বিধবা ও অন্যান্য দুস্থ লোকদের ভূসম্পত্তি প্রদান করে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতেন। এঁর শাসনকালে শস্যাদির দাম অত্যন্ত সস্তা ছিল, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। আরঙ্গজেবের বারবার কঠোর নির্দেশে ইনি বাংলার হিন্দুদের উপর জিজিযা কর প্রচলন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইনি হিন্দুদের কিছু দেবমন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলে হিন্দুরা এঁর উপর বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। শায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলের প্রধান ঘটনা আরাকান রাজের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ এবং মগদিগের দৌরাত্ম্য-নিবারণ। এঁর শাসনকালের প্রথমের দিকে ইংরেজদের বাণিজ্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজরা ক্রমে অত্যন্ত দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। আরঙ্গজেব তাদের কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দেন। তখন শায়েস্তা খাঁ ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলেন। শায়েস্তা খাঁ নির্মিত অনেকগুলি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো ঢাকায় পরিদৃষ্ট হয়।

শালিক নাথ—'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি'-রচয়িতা উদয়ন ও তদীয় টীকাকার বরদরাজের মতে মীমাংসক শালিকনাথ ছিলেন বাঙালী। শালিকনাথ 'গৌড় মীমাংসক' বলে খ্যাত। এঁর জীবিত-কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কোন সময়ে। রামানুজ রচিত 'তন্ত্ররহস্যে' উল্লেখ আছে শালিকনাথ প্রভাকরের 'বৃহতী' ও 'লঘ্বী' টীকার উপর 'পঞ্জিকা' রচনা করেছিলেন।

শাহজালাল—এক দরবেশ। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কৌশলে গৌড়-গোবিন্দকে পরাভূত করে শ্রীহট্ট অধিকার করেন। সেই থেকে শ্রীহট্ট মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। শাহ জালাল নাকি হজরত মহম্মদের অধস্তন বংশধর। শ্রীহট্টে শাহজালালের দরগা আজও বিদ্যমান।

শাহ মাদার—মদিনার অধিবাসী এবং সেখ মোহাম্মদ তাইফুরী গোস্বামীর শিষ্য। শাহ মাদার সংসার ত্যাগপূর্বক ধর্মের সাধনা এবং ইসলাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণকালে (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) আক্রান্ত প্রদেশে উপস্থিত ছিলেন, পরে কামরূপ অঞ্চলে আগমন করেন। ঈশ্বরভক্তি এবং পবিত্রজীবন যাপন এঁর কাম্য ছিল। গল্পচ্ছলে ইনি লোককে নূতন নূতন উপদেশ দিতেন। রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকা প্রভৃতি নানাস্থানে শাহ মাদারের আস্তানা আছে।

শাহ মোহাম্মদ সগীর—বাংলার লেখক এক মুসলমান কবি। ফার্সি কাব্য "ইউসুফ জুলেখা"র ইনি বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। কেউ কেউ এঁকে চতুর্দশ শতাব্দীর কবি

বলেছেন। অনেকে এঁকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলে থাকেন।

শাহ সোলতান মাহীসোয়ার—কথিত আছে যে, ইনি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বল্‌খের রাজকুমার ছিলেন এবং রাজসিংহাসনের মায়া পরিত্যাগ-পূর্বক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম কামরূপে আগমন করেছিলেন। বর্তমান উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। বগুড়ার অন্তর্গত 'মহাস্থান গড়ে' এঁর আশ্রম ছিল এবং তথায় ইনি সমাহিত হয়েছেন। শুনা যায় শাহ সোলতানের সঙ্গে মহাস্থান গড়ের তৎকালীন রাজা পরশুরামেব নাকি যুদ্ধ হয়েছিল। শাহ সোলতান ১০৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাস্থান গডে বিদ্যমান ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি মৎস্যারোহণে এদেশে আগমন করায় এঁর উপাধি 'মাহীসোর' হয়েছিল।

শাহা বদিউদ্দীন—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ফাতেমার স্বরৎ-নামা'। কবিতায় হজরত মুহম্মদের কন্যা ফাতিমার রূপগুণের বর্ণনা আছে। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

শিখাই বা শিখি বা হন সান্যাল—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সামসুদ্দীন ইলিয়াস যখন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব, তখন ইনি তাঁকে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছিলেন। ফলে ইনি খাঁ উপাধি ও বিস্তীর্ণ জমিদারী লাভ করেছিলেন। এঁর পুত্র বলাই সাঁতোড়ের রাজা হন। টোডরমল্ল এই বংশীয় রাজা রামকৃষ্ণকে সামন্ত নৃপতি বলে স্বীকার করেন এবং সাঁতোড়ের বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে দেন।

শিখি মাহিতী—পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে লিখনাধিকারী, এবং একজন পরমভক্ত। প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থে এঁর নাম দেখা যায়। এঁর ভ্রাতা মুরারি মাহিতী চৈতন্য-মহাপ্রভুর একজন ভক্ত-সেবক ছিলেন। এঁর ভগিনী 'বৃদ্ধা তপস্বিনী' মাধবী বা মাধুরীদেবী ছিলেন এক মহা 'সাধ্বী ধর্মরতা' বৈষ্ণব রমণী। মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার সার্ধ তিনজন পাত্রের মধ্যে শিখি মাহিতী ছিলেন একজন এবং মাধবী অর্ধজন। 'চৈতন্য চরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে শিখি, মাধবী ও মুরাবি নীলাচলে তিন ভ্রাতা বলে অভিহিত হতেন। শিখি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। মুরারি ও মাধবী প্রথমে শিখিকে চৈতন্যানুরক্ত করতে পারেন নি। কিন্তু একদিন শিখি স্বপ্নে দেখলেন যে চৈতন্য ও মহাপ্রভু একদেহ। তখন ইনি ভ্রাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে উপস্থিত হলেন। চৈতন্য এঁকে মুরারির ভ্রাতা জেনে এঁকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলেন এবং শিখি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হয়ে উঠলেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পরেও শিখি জীবিত ছিলেন।

শিবচন্দ্র—অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছয় ভ্রাতার মধ্যে ইনি ছিলেন রূপে, গুণে ও চরিত্রবলে সর্বশ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ শিবতুল্যই। ইনিও পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার নবাব মীরকাশিম কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এঁকেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান। কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে তিনি পত্তন করেন নিজনামে 'শিবনিবাস' অঞ্চল। শিবচন্দ্র পিতার চেয়েও শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ষাট বছর বয়সে শিবচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

শিবচন্দ্র সেন—ইনি রামায়ণের অন্যতম কবি। রাবণ-বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা উপলক্ষ করে শিবচন্দ্র তাঁর রচিত রামায়ণের নাম রেখেছিলেন "সারদামঙ্গল"। কবি শিবচন্দ্র ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। ইনি ছিলেন ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁটাদিয়া গ্রামের অধিবাসী। এঁর পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল সেনহাটি গ্রামে। কবির জীবিতকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। এঁর পিতার নাম গঙ্গাপ্রসাদ সেন। কবি ছিলেন পিতার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। অপর দুই ভ্রাতার নাম শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র। শিবচন্দ্রের "সারদামঙ্গল" এক সময়ে পূর্ববঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

শিবচন্দ্র আরও দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাদের নাম 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' ও 'সাবিত্রী উপাখ্যান'।

শিবচরণ সেন—অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'গৌরীমঙ্গল'। কাব্যখানি সংস্কৃত কাব্যের বঙ্গানুবাদ।

শিবদত্ত মিশ্র—'সংজ্ঞাসমুচ্চয়' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকর্তা। ইনি ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'শিবকোষ' নামে একখানি সটিক অভিধান প্রণয়ন করেন।

শিবদাস সেন—পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত মালবিকাগ্রামে অবস্থান করতেন। এঁর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ শিখরেশ্বরেব সভাপণ্ডিত সাহ্নিসেন, বৃদ্ধ প্রপিতামহ কাকুৎস্থসেন, প্রপিতামহ লক্ষীধর সেন, পিতামহ উদ্ধব সেন, এবং পিতা অনন্ত সেন। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত সেন বাংলার সুলতান বারবকশাহার রাজবৈদ্য ছিলেন। শিবদাসের রচিত বৈদ্যকগ্রন্থ—চরক-তত্ত্বপ্রদীপিতা, যোগরত্নাকর-টীকা প্রভৃতি।

শিবরাম—বৈষ্ণব-প্রধান নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও একজন পদকর্তা। এঁর অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 'শিবরাম' ভণিতায় 'পদকল্পতরুতে চব্বিশটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। এই পদগুলির কতকগুলি বাংলা এবং কতকগুলি ব্রজবুলিতে লেখা। এঁর রচিত হোরি-লীলার পদগুলি থেকে জানা যায় যে ইনি সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

শিবরাম সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

শিবরাম ঘোষ—সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গভাষার একজন কবি। এপর্যন্ত এঁর লেখা দু'খানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমটির নাম কালিকামঙ্গল, যদিও কাব্যের বিষয়বস্তু বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ সিংহাসনের গল্প। এতে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পের মধ্য দিয়ে কালীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। তাই এর নাম কালিকামঙ্গল।

শিবরাম ঘোষের আর একটি রচনা 'একাদশীর পাঁচালী'। কবির পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ এবং মাতার নাম রাধিকা। একাদশীর পাঁচালীর রচনাকাল ১৬৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। সম্ভবতঃ কবি তাম্রলিপ্তের (তমলুকের) অনতিদূরে কেলোমাল গ্রামের প্রাচীন ঘোষ জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ।

শিবরাম দাস—বৈষ্ণবাচার্য নরোত্তম দাসের শিষ্য। আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দী। শিবরাম দাস বা শিবরাম ভণিতায় অনেকগুলি ব্রজবুলি ও বাংলা পদ পাওয়া গেছে। এঁর গোষ্ঠ বাৎসল্যের একটি পদাংশ এইরূপ :

"রাম কানাঞি রে আমার
জীবন কানাঞি
রবি ঐ অস্তে গেল বাছা রে
তবু দেখা নাঞি।...
শিবরাম দাসে বলে শোন নন্দরানী
শাঙলি-ধবলির পাছু আসিব নীলমণি।"

শিবরাম বাচস্পতি—গদাধর ভট্টাচার্য-চক্রবর্তীর মুক্তিবাদের উপর শিবরাম বাচস্পতির রচিত টীকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবরাম কাশীতে বসে ১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শিবরাম-রচিত আর একটি গ্রন্থের নাম 'গৌতমসূত্রবৃত্তি'।

শিব সিংহ মল্ল—বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজা। ইনি নিজে সংগীতপ্রিয় ও সংগীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এঁর সময় থেকেই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সংগীত বিদ্যার প্রচলন শুরু হয়। মহারাজ শিবসিং মল্ল ১৩৭০-১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

শিবাই দাস—পদকর্তা। পদকল্প-তরুতে ছ'টি পদ আছে।

শিবাদিত্য মিশ্র—মিথিলা-নিবাসী ন্যায়াচার্য। সম্ভবতঃ ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ 'সপ্তপদার্থী', 'লক্ষণমালা' ও 'হেতুখণ্ডন' প্রভৃতি।

শিবানন্দ কর—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি। উপাধি ছিল "গুণরাজখান"। জাতিতে বৈদ্য। রচিত গ্রন্থ 'পঞ্চাননের নিবন্ধ'। রচনা-কাল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ। নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার সুজফর বা সুজপুর গ্রামে।

শিবানন্দ চক্রবর্তী—'চৈতন্য-চরিতামৃত মতে ইনি ছিলেন আচার্য

গোসাঞির শিষ্য এবং চৈতন্যচরিতামৃত রচনার যাঁরা আজ্ঞাদান করেছিলেন ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইনি মদনগোপালের পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি সম্ভবত খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে 'পদকল্পতরু', 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'রসকল্পবল্লী'তে 'শিবানন্দ', 'শিবাই' ও 'শিবানন্দ-আচার্যঠাকুর ভণিতায় যে বাংলা ও ব্রজবুলি পদগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি গদাধর-শিষ্য শিবানন্দেরই রচনা। ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।

শিবানন্দ সেন—নৈহাটির নিকটবর্তী কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গ্রামের বিখ্যাত কবি কর্ণপুর বা পরমানন্দ সেনের পিতা। ইনি ছিলেন চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য। কবিতা রচনায় তাঁর প্রবণতা ছিল। তাঁর রচিত পদাবলী 'পদকল্পতরু' ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত হয়েছে। এঁর জীবনকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। শিবানন্দের তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পুরীদাস বা কবি কর্ণপুর। শিবানন্দ বৈদ্যকুল-সম্ভূত ও সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক গৃহত্যাগ করতে কৃতসংকল্প হলে মহাপ্রভু এঁর প্রতি একটি গুরুতর কার্যের ভার অর্পণ করে নিরস্ত করেন। মহাপ্রভুর আদেশে শিবানন্দ সেই থেকে প্রতি বছর রথ-যাত্রার পূর্বে গৌড়ীয় ভক্তগণকে সঙ্গে করে নীলাচলে যেতেন এবং সঙ্গের যাত্রিগণের পাথেয় ব্যয় সানন্দে নিজে বহন করতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের বহু স্থলেই শিবানন্দের প্রসঙ্গ আছে। এঁর ন্যায় কায়মনোবাক্যে গৌরাঙ্গ-ভক্ত বড় অধিক জন্মগ্রহণ করেন নি। বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিত হয়েছে,—

"প্রেমময়-তনু বন্দ্যো সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব॥"

শিয়াবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ—শামসুদ্দীন (দ্বিতীয়) দ্রঃ।

শিশুপাল—ভাওয়ালের অন্তর্গত চুর চুরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট এবং শাইট হালিয়া নামক স্থানে, শিশুপাল নামক জনৈক রাজার কীর্তিচিহ্ন বিদ্যমান। দীঘলির ছিট নামক স্থানে শিশুপালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে চুরচুরিয়ার দুর্গ শিশুপালের নির্মিত। ভাওয়ালের ভীষণ অরণ্য মধ্যে শিশুপালের বিবিধ কীর্তিকলাপের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। নানা জনপ্রবাদ এই শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী শিশুপালের সঙ্গে অভিন্ন বলে নির্দেশ করে। এরূপ নানা অদ্ভুত কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হয়ে শিশুপালের আবির্ভাবকাল এবং তাঁর কীর্তিকাহিনীকে আরও দুর্বোধ্য ও জটিল করে তুলেছে।

শীলভদ্র—সমতটের ব্রাহ্মণ

রাজবংশে শীলভদ্রের জন্ম হয়। এঁর জীবৎকাল সপ্তম শতাব্দী। শীলভদ্র ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নালন্দায় ভিক্ষুপ্রবর ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহু দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মগধে এসে ধর্মপালকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। শীলভদ্রের বয়স তখন মাত্র ত্রিশ বছর, কিন্তু ধর্মপাল তাঁকেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে তর্ক করতে আদেশ দিলেন। শীলভদ্র ব্রাহ্মণকে পরাজিত করলে মগধের রাজা আনন্দিত হয়ে তাঁকে একটি নগরের রাজস্ব উপহার দেন। ভিক্ষুর ধনলোভ উচিত নয় বলে শীলভদ্র প্রথমে উহা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু রাজার সাতিশয় অনুরোধে তিনি এই দান গ্রহণ করেন এবং এর দ্বারা একটি বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে শীলভদ্র জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সংঘবাসিগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁর নাম উচ্চারণ না করে তাঁকে 'ধর্মনিধি' বলে অভিহিত করতেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। শীলভদ্র সংস্কৃত ভাষায় 'আর্য-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আঃ ৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

শুক্রেশ্বর পণ্ডিত—ত্রিপুরারাজ ধর্মমাণিক্যের (১৪০৭-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) রাজসভার পণ্ডিত। ইনি ও পণ্ডিত বাণেশ্বর উভয়ে মিলে ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থ সংকলন করেন।

শুক্লধ্বজ—কোচবিহার কামতাপুরের বিখ্যাত রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা ও বিশ্বসিংহের পুত্র। ইনি ছিলেন মহারাজ নরনারায়ণের প্রধান সেনাপতি। রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসন ব্যাপারে ইনি মহারাজের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। রাজা এঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পশ্চিমে মিথিলা প্রদেশের সীমান্ত থেকে পূর্বে আসামের শেষপ্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে চট্টগ্রামের নিকটস্থ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ বিশাল ভূখণ্ড শুক্লধ্বজেরই বাহুবলে বিজিত হয়েছিল। মহারাজ নরনারায়ণ এঁকে 'সংগ্রামসিংহ' উপাধি প্রদান এবং যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। মহারাজ এঁকে সনকোষ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বদিকে অবস্থিত সামন্তরাজ্যগুলির শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসামান্য শৌর্যবীর্য, স্বাভাবিক নিঃস্বার্থপরতা এবং

অবিচলিত ভ্রাতৃপ্রেম এর মধ্যে বিদ্যমান থাকায় ইনি তাৎকালিক প্রাচ্য ভারতের রাজনৈতিক গগনে পূর্ণশশীর ন্যায় প্রতিভাত ছিলেন। গৌড় আক্রমণকালে ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্রমাসে গঙ্গাতীরে বসন্ত রোগে শুক্লধ্বজের মৃত্যু হয়।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপ-বাসী। এঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। ভিক্ষা করেই এঁর দিন চলত। গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের বহু পূর্বেই ইনি অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে পরিচিত হন এবং সম্ভবত তাঁর প্রভাবেই ইনি ভক্তিমান হয়ে ওঠেন। গৌরাঙ্গ তাঁর বাল্যলীলা কালে দরিদ্র অথচ সরলস্বভাব এই প্রতিবেশীকে একান্ত আপনার জন বলে মনে করতেন। বহু তীর্থ পর্যটন করেও শুক্লাম্বরের চিত্তে প্রসন্নতা আসে নি, কিন্তু গৌরাঙ্গ চরণে আত্ম সমর্পণ করে এঁর চিত্ত শান্ত হয়। গৌরাঙ্গ এঁকে কখনো বিস্মৃত হন নি। সন্ধ্যাকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি নবদ্বীপলীলার সকল উল্লেখ-যোগ্য ঘটনার সঙ্গে শুক্লাম্বরের নাম বিজড়িত। চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন-ভবনে নৃত্যাভিনয়কালে শুক্লাম্বর নারদ-শিষ্যের ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। মহা-প্রভুর নীলাচল গমনের প্রাক্কালে শুক্লাম্বর প্রভৃতি ভক্ত শান্তিপুরে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া, ইনি মাঝে মাঝে নীলাচলে গিয়ে চৈতন্য-প্রভুর দর্শন লাভ করতেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

শুভগুপ্ত—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে শুভগুপ্ত রামপালের সমসাময়িক অর্থাৎ ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন। কিন্তু বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে শুভগুপ্তের সময় ৬৪০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ইনিও একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন।

শুভঙ্কর—ভৃগুরাম দাস দ্র°।

শুভরাজ খাঁ—মাধব ভট্টাচার্য বা শুভরাজ খাঁ দ্র°।

শুভাকর—উত্তর বঙ্গের জগদ্দল বিহারের আচার্য এবং শাক্যশ্রীভদ্রের গুরু। ইনি পালরাজাদের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। ইনি কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা।

শুভানন্দ—চৈতন্যমহাপ্রভুর নীলাচল-ভক্ত। ইনি প্রথম বছর মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান করেছিলেন। একবার রথ-যাত্রাকালে নৃত্যকীর্তনরত চৈতন্যের মুখ থেকে ফেন-লালা নির্গত হতে থাকলে শুভানন্দ তা সানন্দে পান করেছিলেন। 'নামামৃতসমুদ্রে' শুভানন্দকে 'বিপ্র' বলা হয়েছে। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

শূরপাল—তৃতীয় বিগ্রহপালের দ্বিতীয় পুত্র। শুনা যায় ইনি দ্বিতীয় মহীপাল কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর শূরপাল

কারামুক্ত হন এবং পাল রাজ্যের কোন এক অংশে, সম্ভবত মগধে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের কোন বিবরণই জানা যায় না। সম্ভবত তিনি খুব অল্প-কালই রাজত্ব করেছিলেন।

শূরপাল বা শূরেশ্বর—শব্দ-প্রদীপ, বৃক্ষায়ুর্বেদ এবং লৌহপদ্ধতি এই তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা। শব্দপ্রদীপ ও বৃক্ষায়ুর্বেদে আয়ুর্বেদোক্ত উদ্ভিদসমূহের পরিচয় আছে। লৌহপদ্ধতিতে ঔষধে লৌহ ব্যবহার-পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এঁর অবস্থিতিকাল সম্ভবত একাদশ শতাব্দী।

শূলপাণি—সেনরাজ বিজয়সেনের রাজত্বকালে শূলপাণি বরেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলে গণ্য হয়েছিলেন। ইনি সেই সময় "রাণক" উপাধি লাভ করেছিলেন।

শূলপাণি—একজন খ্যাতনামা স্মৃতিকার ও বহু গ্রন্থ-প্রণেতা। এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। পণ্ডিতদের অনুমান একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে কোন এক সময় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। ইনি যাজ্ঞ-বল্ক্যস্মৃতিরউপর 'দীপকলিকা' নামক একখানি সংক্ষিপ্ত সরল টীকা রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, দোলযাত্রা-বিবেক, ব্রতকালবিবেক, সম্বন্ধ বিবেক, দত্তক বিবেক, দুর্গোৎসববিবেক প্রায়শ্চিত্তবিবেক, তিথি বিবেক প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক বাক্যে 'মহামহোপাধ্যায় ও 'সাহুড়িয়ান' এই দুটি মাত্র পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দ আছে। 'সাহুড়িয়ান' শব্দে সম্ভবতঃ বাংলা দেশের রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি শাখাকে বুঝান-হয়েছে।

শেখ কবীর—চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান কবি। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি কিছু কিছু বৈষ্ণবপদ এবং গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন।

শেখ চান্দ—এঁর রচিত 'রসুল বিজয়' কাব্যে হজরৎ মুহম্মদের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

শেখ জালাল হল্‌বী—১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে আলেপ্পোতে এঁর জন্ম হয়। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে আগমন করে-ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে ইনি এখানে ধর্ম প্রচার করেন। চট্টগ্রামের জালালাবাদে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর সমাধি আজও জালালাবাদের সর্ব-সাধারণের কাছে অত্যন্ত ভক্তির বস্তু। এঁর উত্তর সূরীরা এখনো চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি থানায় বসবাস করছেন।

শেখ পরাণ—চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

শেখ ফয়জুল্লা—একজন বাঙালী মুসলমান কবি। গোরক্ষবিজয় ও সত্য-পীরের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া, 'মীর ফয়জুল্লা' ভণিতায় কতকগুলি বৈষ্ণবপদ পাওয়া যায়। সেগুলিও এঁর রচনা বলে অনুমিত হয়। এঁর কাব্যগুলির রচনাকাল ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় বলে অনেকে মনে করেন।

শেখ মহদ্দি—ত্রিপুরার এক মুসলমান কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে ত্রিপুরারাজবংশ সংক্রান্ত একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন—নাম 'চম্পকবিজয়'।

শেখ মোহাম্মদ হোসেন—সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। ইনি কাব্যাকারে চাণক্যশ্লোকের অনুবাদ করেন।

শেখর রায়—কবিশেখর রায় দ্র°।

শের আফগান—সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ইনি আগ্রায় অবস্থান করতেন। ঐ সময়ে তাজা আয়াসের কন্যা মেহেরুন্নেসার সঙ্গে শের আফগানের বিবাহ হয়। এঁর নাম ছিল আস্তা জিল্লো, কিন্তু একটি বাঘ নিহত করে ইনি শের আফগান নামে পরিচিত হন। শের আফগান সাহস, বীরত্ব ও উদার হৃদয়ের জন্য রাজ দরবারে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আকবর এঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। মেহেরুন্নিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের বিশেষ আকর্ষণ থাকায় এবং সেই নিয়ে জন সমাজে নানা নিন্দাবাদ রটায় শের আফগান আগ্রা ত্যাগ করে বাংলাদেশে আসেন এবং বঙ্গাধীপের আনুকুল্যে বর্ধমান জেলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন কিন্তু জাহাঙ্গীরের রোষদৃষ্টি থেকে ইনি রেহাই পেলেন না। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে শের আফগান ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। এঁর সমাধি বর্ধমান শহরে বিদ্যমান। মেহেরুন্নেসা নুরজাহান (জগতের আলো) নাম ধারণ করে জাহাঙ্গীরের অঙ্কশায়িনী হন।

শের শাহ—সাসারাম ও তাণ্ডার জমিদার হুসেন সুরের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর বাল্য নাম ছিল ফরিদ। ফরিদ বাল্যকালে খুব ভালভাবে বিদ্যা-শিক্ষা করেছিলেন। তরুণ বয়সেই ইনি সাদির সমস্ত কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করতে পারতেন। এবং তৎকাল-প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাস ও কবিতার প্রতিই এঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। ফরিদ একদিন স্বহস্তে এক বাঘ শিকার করে 'শের সাহ' উপাধি লাভ করেছিলেন। ইনি কিছুকাল পিতার জায়গীর শাসন-সংরক্ষণ করেন। পরে পিতৃসম্পত্তির অধিকার নিয়ে গোলমাল দেখা দিলে শের সাহ দিল্লী পলায়ন করে দৌলত নামক ইব্রাহিম লোদির এক প্রধান ওমরাহের আশ্রয় গ্রহণ

করেন। এঁর কার্যদক্ষতা ও নানা গুণে মুগ্ধ হয়ে দৌলত সম্রাট বাবরের সঙ্গে শেরর আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেন। সম্রাট শেরের নানা বিষয়ে যোগ্যতা ও উচ্চাভিলাষ দেখে এঁর প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। কালক্রমে শের সাহ নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে সমগ্র বিহার ও চুনার অধিকার করেন। এর পর ইনি বাংলাদেশ দখল করেন। দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন পূর্বাঞ্চলে শের সাহের শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে শেরের হাত থেকে বঙ্গদেশ উদ্ধারের জন্য অভিযান করেন। কিছু প্রতিকূল অবস্থায় শেরের সঙ্গে হুমায়ুনের সন্ধি হয়। হুমায়ুন শেরকে বাংলা ও বিহারের স্বাধীন নৃপতি বলে স্বীকার করে নেন (১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু সন্ধির পরদিনই সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শের সাহ অতর্কিতে হুমায়ুনকে আক্রমণ করে পরাস্ত ও বিপর্যস্ত করেন। হুমায়ুনকে দিল্লী পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শের সাহ সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করেন। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে ইনি বাংলার মসনদে খিজির খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে খিজির খাঁর ভাবগতিকে সন্দেহপরায়ণ হয়ে শের সাহ স্বয়ং বাংলাদেশে চলে আসেন এবং খিজির খাঁকে শাসনকর্তৃত্ব থেকে অপসারিত করে বাংলাকে দ্বাদশ মণ্ডলে বিভক্ত করেন। এবং এক একটি মণ্ডল এক একজন শাসনকর্তার হাতে অর্পণ করেন। এই ভাবে ইনি বাংলাদেশকে অবদমিত করে রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শের সাহ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে বোমার আগুনে নিহত হন। শের সাহ বহু মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি সোনার গাঁ থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত ৩০০০ মাইল ব্যাপী একটি রাস্তা নির্মাণ। তিনিই প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন করেন। রাজ্যের পরিমাণ-নির্ণয় ও রাজস্ব-নির্ধারণের জন্য শের সাহ যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, তারই উপর ভিত্তি করেই সুপ্রসিদ্ধ তোডরমল্ল তাঁর বহু বিস্তৃত জরিপ কার্য সুসম্পাদিত করেছিলেন।

শৈলেন্দ্র—গঙ্গারাঢ়া কলিঙ্গ রাজবংশধর। ইনি সর্বপ্রথম সুমাত্রা ও পরে বলীদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন।

শোভারাম মুন্সি—একজন কবি। ময়মনসিংহ জেলার রণভাওয়ালের অন্তর্গত উথুরি গ্রামে ইনি বাস করতেন। ইনি "সন্দীপ বর্ণনা" রচনা করেছিলেন। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

শোভা সিংহ—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতোবরদার তালুকদার। শোভা সিংহের প্রপিতামহ রঘুনাথ সিংহ প্রথমে বঙ্গদেশে এসে

বসবাস করেন। রঘুনাথের পুত্র কানাই সিংহ চেতুয়া মহল ক্রয় করেন। কিন্তু পরে ঋণগ্রস্ত হয়ে বরদার জমিদার ফতে সিংহের নিকট চেতুয়া বিক্রয় করেন। শোভা সিংহের পিতা দুর্জয় সিংহ ওরফে দুর্লভ সিংহ ফতে সিংহের পুত্র বীর সিংহের নিকট থেকে চেতুয়া ক্রয় করেন এবং পরে শোভা সিংহ পৈতৃক সম্পত্তি চেতুয়ার সঙ্গে বরদা যুক্ত করে লন। ফলে শোভা সিংহ বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ইনি বাংলার অধিনায়ক হবার উচ্চাশা পোষণ করতে থাকেন।

বর্ধমান পরগণার জমিদার ও চৌধুরী কৃষ্ণরাম রায় কোন এক সময় শোভা সিংহের তালুক লুঠ করেছিলেন। সেই আক্রোশে শোভা সিংহ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম পরাজিত ও নিহত হন। শোভা সিংহ প্রাসাদ লুঠ করে বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন এবং কৃষ্ণরামের পরিবারবর্গকে বন্দী করেন।

সমগ্র বর্ধমান তাঁর হস্তগত হয়। এবং তিনি যথেষ্ট বলশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে বঙ্গবিজয়ের আশা প্রবল আকার ধারণ করে। এই সময় উড়িষ্যার পাঠান-সর্দার রহিম খাঁকে তিনি সহকারী হিসাবে গ্রহণ করেন। বর্ধমান অধিকারের পরে বিদ্রোহী শোভা সিংহের সৈন্যদল দলবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে লুঠ করে এবং মোগল সৈন্যের সঙ্গে তাদের বহু খণ্ড যুদ্ধও হয়। চন্দননগর ও হুগলীতে অবস্থিত ফরাসী এবং ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশী বাণিজ্যকুঠীগুলিও বিপদের সম্মুখীন হয়ে উঠেছিল।

শোভা সিংহের বন্দী বর্ধমান রাজ-পরিবারের মধ্যে কৃষ্ণরামের কন্যা কুমারী সত্যবতী ছিলেন পরমা সুন্দরী শোভা সিংহ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একদিন বলপ্রয়োগে তাঁর উপর ব্যভিচার করতে গেলে পবিত্রহৃদয়া, তেজস্বিনী রাজকন্যা ছুরিকাঘাতে তাঁর প্রাণনাশ করেন। বঙ্গদেশ থেকে মোগল অধিকার উচ্ছেদ করার জন্যই শোভা সিংহ বিদ্রোহী হন।

শ্বেতাব রায়—নবাব আলীবর্দী নিয়োজিত পাটনার নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণের বন্ধু। ইনি বাদশাহের নিয়োজিত কর্মচারী। বোটাস্ দুর্গের এবং বিহারে বাদশাহী সেনাপতির জাগীরের তত্ত্বাবধান এঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সাহসের জন্য শ্বেতাব রায়ের সুখ্যাতি ছিল। শেষ জীবন ইনি অযোধ্যায় অতিবাহিত করেন।

শ্যামদাস আচার্য—অদ্বৈত আচার্যের একজন প্রধান ভক্ত। ইনি 'অদ্বৈতমঙ্গল' কাব্য লিখেছিলেন। এই কাব্যের উল্লেখ পাওয়া গেছে। কিন্তু কোন পুথি আজ অবধি আবিষ্কৃত হয় নি।

শ্যামদাস দত্ত—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'গুরুদক্ষিণা'। এই ধরণের

ছোট নিবন্ধের মধ্যে বোধহয় সর্বপেক্ষা প্রাচীন। এতে কৃষ্ণ-বলরামের গুরু-গৃহে বাস ও গুরুর মৃত পুত্রের জীবন দান-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

শ্যামাদাস, দুঃখী—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'গোবিন্দমঙ্গল'। ভণিতায় পিতামাতার নাম পাওয়া যায়: 'শ্রীমুখ জনমদাতা সুমতি ভবানী মাতা যার পুণ্যে নিরমিল তনু'। অর্থাৎ তাঁর পিতার নাম শ্রীমুখ ও মাতা ভবানী। গ্রন্থ-সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসুর মতে মেদিনীপুর শহর থেকে ষোল মাইল দূরে হরিহরপুর গ্রামে ছিল শ্যামাদাসের বাস। ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ। মহাভারত পাঁচালী রচয়িতা কাশীরামের এক খুল্লপিতামহের নাম ছিল শ্রীমুখ। এঁরাও দে-বংশীয় কায়স্থ। এবং হরিহরপুর গ্রামনিবাসী। এই সব থেকে অনুমিত হয় যে শ্যামাদাসের পিতাই কাশীরাম দাসের খুল্লপিতামহ। ডঃ সুকুমার সেনের মতে শ্যামাদাসের গোবিন্দমঙ্গল রচনাকাল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি। কাব্যে লৌকিক কাহিনীর প্রভাব অধিক।

শ্যামাদাস "দ্বিজ"—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম "আত্মজিজ্ঞাসা"। রচনা কাল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর নিবাস ছিল গোপভূমে করট্যা গ্রামে। বইটি লেখা হয়েছিল বীরভূমে শিবপুর গ্রামে।

শ্যাম পণ্ডিত—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন কবি। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ধর্মমঙ্গল'। পুঁথি রচনার তারিখ ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ। কবি সম্ভবত ধর্মপূজারী ছিলেন। ইনি কাব্যমধ্যে ভণিতায় নিজেকে ধর্মদাস বলেও উল্লেখ করেছেন। ইনি খুব সম্ভব বীরভূম অঞ্চলের লোক ছিলেন। এঁর পুঁথি এই বীরভূম অঞ্চলেই বিশেষ প্রচলিত। স্থানীয় জনশ্রুতি অবলম্বন করেই শ্যাম পণ্ডিত কাব্য রচনা করেছেন। ইছাই ঘোষকে ইনি ঈশ্বর ঘোষ এবং তাঁর অনুজকে ইনি বিজয় ঘোষ নামে অভিহিত করেছেন। এঁর কাব্যে ঢেকুর গড়ের নাম ত্রিহট্টগড়। মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি জালন্দার গড়ের রাজার নাম লিখেছেন জল্লাদশেখর—শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথিতে সামন্তশেখর নাম পাওয়া যায়। এসব ব্যাপারে স্থানীয় প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে শ্যাম পণ্ডিতের মিল আছে। শ্যাম পণ্ডিতের কবিত্বশক্তি বিশেষ উচ্চাঙ্গের ছিল না। ইনি এঁর কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন-মঙ্গল' বলেও উল্লেখ করছেন।

শ্যামবল্লভ—মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় রাজবংশের ত্রয়োদশ রাজা। ১০২০ বঙ্গাব্দে ইনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিদ্যাধর নামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এঁর মন্ত্রী ছিলেন। শ্যামবল্লভের রাজত্বকালে নারায়ণগড়ের অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছিল। এঁর রাজত্বকালে সম্রাট সাজাহান দাক্ষিণাত্য হতে প্রত্যাগমনকালে ১০৩০ বঙ্গাব্দে এই নারায়ণগড়ে

আগমন করেন। রাজা শ্যামবল্লভ একজন প্রকৃত মল্ল ছিলেন। এঁর বীরত্বকাহিনী প্রসিদ্ধ ছিল। ইনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতকে বহু অর্থ ও ভূমি দান করেছিলেন। ১০৮৬ বঙ্গাব্দে রাজা শ্যামবল্লভের মৃত্যু হয়।

শ্যামল বর্মা—কুলগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, গৌড়াধিপতি শ্যামল-বর্মা (খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক) কনৌজ অথবা কাশী থেকে বঙ্গে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে যশোধর মিশ্র প্রভৃতি সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনিয়ে তাঁদিগকে এই দেশেই স্থাপিত করেছিলেন।

শ্যামসুন্দর—একজন বাঙালী কায়স্থ। ইনি পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গের পিতার আমল থেকে পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যের বেতনাধ্যক্ষ এবং কাযতঃ ওর অধিনায়ক ছিলেন। নাম শওকতজঙ্গই তোপাধ্যক্ষ। সিরাজ যখন পূর্ণিয়া আক্রমণ করেন (১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে), তখন এই বাঙালী শ্যামসুন্দরই শওকতের সৈন্যদল ও কামান সংস্থাপিত করেন। শ্যামসুন্দর বীরপ্রতাপে যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুপক্ষকে বিব্রত করে তুলে-ছিলেন। এই সময় মুসলমান সেনা-নায়কদের কিছুটা নিষ্ক্রিয় দেখে শওকৎজঙ্গ বলেছিলেন, "হিন্দু শ্যাম-সুন্দর কেমন বীরপ্রতাপে যুদ্ধ করিতেছে। তোমরা মুসলমান, বীরপুরুষ বলিয়া গর্ব করিয়া থাক, এ সময়ে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় কার্য করা শোভা পায় না।" শ্যামসুন্দর ছিলেন মোহনলালেরই প্রতিকৃতি।

শ্যা ম সু ন্দ র ন্যা য়সিদ্ধান্ত—ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ কর্তৃক আহূত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশজন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পরে হ্যালহেড কর্তৃক Code of Gentoo Laws নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

শ্যামানন্দ দাস—এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'সাধনবত্ম্য'। পুঁথির লিপিকাল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি ছিলেন সদ্‌গোপ। বীরভূমের অন্তর্গত 'সিহড়ি' অর্থাৎ সিউড়িতে এঁর বাস ছিল। পুত্র। নাম শ্যামসুন্দর। বড ভাই রামচন্দ্র, পিতা উজ্জ্বল।

শ্যামানন্দ দাস—নরোত্তম দাস ও শ্রীনিবাস আচার্যের প্রধান সহযোগী। এঁর জন্মকাল আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দুরিকা ও অগ্রজ বলরাম। পৈতৃক নিবাস মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা-বাহাদুর গ্রামে। পরে ইনি ঐ জেলারই দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস করেন। বাল্যকালে এঁকে সকলে 'দুঃখী' বা 'দুখিয়া' বলে ডাকত। তৎপর ইনি 'কৃষ্ণদাস' ও পরে বৃন্দাবনে বাসকালে

'শ্যামানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। এঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অনুচর গৌরী দাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ বা হৃদয়চৈতন্য। শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করেন। শ্যামানন্দ শেষ জীবনে উড়িষ্যার নৃসিংহপুরে অবস্থান-পূর্বক বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহারই চেষ্টায় উৎকলবাসী অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। গোপীবল্লভ দাসের 'রসিক মঙ্গলে' নবহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' এবং কৃষ্ণচরণ দাসের 'শ্যামানন্দ প্রকাশে' শ্যামানন্দের কাহিনী পাওয়া যায়। শ্যামানন্দ কয়েকটি ছোট ছোট সাধন-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। যেমন, 'উপাসনাসার', 'গোবর্ধনোপদেশ-সংপ্রার্থনা', 'ভারমালা' ও 'অদ্বৈততত্ত্ব'। 'বৃন্দাবন পরিক্রমা' গ্রন্থটিও কেউ কেউ শ্যামানন্দের রচনা বলে অনুমান করেন। শ্যামানন্দ কয়েকটি পদ ও স্তব রচনা করেছিলেন।

শ্যামা-রামা—চতুর্দশ শতাব্দীর নামকরা দস্যু। এঁদের দৌরাত্ম্যে বাংলার প্রায় অর্ধেক প্রকম্পিত হত। প্রবাদ আছে যে এঁদের দমন করতে সাঁতোলের ও ভাতুড়ী (রাজা গণেশ) চক্রের প্রবল পরাক্রান্ত দুইটি ভূস্বামী অশক্ত হয়ে উঠেছিলেন। গৌড়ের পাঠানশক্তি এঁদের নিবাসদ্বীপ অধিকার করেও দস্যু দমন করতে অসমর্থ হন। চলনবিলের অধিকার নিয়ে যখন ভাতুড়ীচক্র ও সাতোলরাজদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন শ্যামা-রামার বীর হুঙ্কারে ভাতুড়ীচক্র কম্পিত হয়ে উঠেছিল। পরে সাঁতোল ও ভাতুড়ী চক্রের মধ্যে বিদ্বেষ বিদূরিত হলে সাঁতোল রাজ শ্যাম ও রামার নেতৃত্বে দ্বাদশ সহস্র সৈনিক দিয়ে রাজা গণেশের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন।

শ্রীঅমিতাভ—ইনি ছিলেন একজন সদ্বোদ্ধকরণ কায়স্থ। ইনি ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বেণুগ্রামে বসে বঙ্গাক্ষরে শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতারে'র একখানি পুথি নকল করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই বেণুগ্রাম সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলার বেণুগ্রাম বা বেড়ুগ্রাম।

শ্রীকণ্ঠ—মিথিলা নিবাসী একজন ন্যায়াচার্য। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ন্যায়ালঙ্কার'। ইনি উদয়নের পরে এবং শ্রীহর্ষের পূর্বে আনুমানিক ১১০০-২৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

শ্রীকণ্ঠ দত্ত—ইনি বিজয় রক্ষিতের শিষ্য ও নিশ্চলকরের সতীর্থ। মধুকোষ সম্পূর্ণ করার পূর্বে বিজয় রক্ষিত দেহত্যাগ করলে শ্রীকণ্ঠ দত্ত উহা সম্পূর্ণ করেন। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। শ্রীকণ্ঠ দত্ত বৃন্দপ্রণীত সিদ্ধযোগের উপর 'ব্যাখ্যাকুসুমাবলী' প্রণয়ন করেছিলেন।

শ্রীকণ্ঠ শিব বা শ্রীকণ্ঠশম্ভু—গৌড় দেশ থেকে চিদম্বরে যান

এবং কুলোত্তুঙ্গ প্রথম চোলের এবং বিক্রম চোলের গুরুপদে বৃত হন। চোল-সম্রাট বিক্রম চোলের সময় (১১২২ খ্রী:) রাজাব পুণ্যার্থ স্বামীদেবর (চোল সম্রাটগণের গুরুগণের সংজ্ঞা) শ্রীকণ্ঠশিব মঙ্গলবকুড়িগ্রামে কুলোত্তুঙ্গ চোলীশ্বরম উদয় মহাদেব বিগ্রহ স্থাপন করেন। রাজার আদেশে বিগ্রহের সেবায় দেবদানরূপে ভূসম্পত্তি দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীকর নন্দী—নবাব হুসেন শাহের (১৫১৯-১৫৩২ খ্রী:) 'লস্কর' পরাগল খানের পুত্র 'ছুটি-খান' বা নসরৎ খানের সভাকবি। নসরৎ মহাভারত কাহিনীর অত্যন্ত অনুরক্ত শ্রোতা ছিলেন। পিতার সভাকবি ও মহাভারত-কাহিনীব প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভারত কাহিনী বিশেষ করে অশ্বমেধ-পর্বকথা সংক্ষিপ্ত বলে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। তিনি শ্রীকর নন্দীকে বিস্তৃততর অশ্বমেধ-পর্ব অনুবাদের অনুরোধ জানান। তারই ফলে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি-সংহিতার বহুবিস্তৃত অশ্বমেধ-পর্বকাহিনী পাঁচালী কাব্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় মহাভারতের ইহাই দ্বিতীয় অনুবাদ। প্রথম অনুবাদ পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়'। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে ছুটিখান সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

"তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুর গড়েত গিয়া করিল সন্নিধান॥...
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥

শ্রীকর নন্দী নসরৎ শাহ সম্বন্ধে বলেছেন:

নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥

শ্রীকান্ত—সনাতন-রূপের ভগ্নিপতি। ইনি হাজিপুরে থাকতেন। সুলতান হোসেন শাহের ঘোড়া সংগ্রহ করে পাঠানো ছিল এঁর কাজ। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

শ্রীকান্ত পণ্ডিত—এঁর জীবিত কাল পঞ্চদশ শতাব্দী। এঁর পিতার নাম রত্নাকর। ইনি ছিলেন কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক নরহরি বিশারদ। এঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম। শ্রীকান্তও একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

শ্রীকান্ত মিশ্র—একজন রসশাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিত। ইনি পদভাবার্থচন্দ্রিকা নাম্নী গীতগোবিন্দটীকা এবং 'চন্দ্রিকা' ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য—স্বনামপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহানুভব পণ্ডিত উদায়নাচার্যের বংশধর। মুক্তাগাছার আচার্য-বংশ এই কৃতী পুরুষের বংশধর ও উত্তরাধিকারী। ভাগ্যান্বেষী শ্রীকৃষ্ণ আচার্য ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজদরবারে গমন করেন এবং নিজ প্রতিভা ও প্রজ্ঞাবলে নবাব মুর্শিদকুলীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। ক্রমে-ক্রমে নবাব দরবারে এঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর কিছু-কাল পরে এঁরই মন্ত্রণা-প্রভাবে আলীবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আলীবর্দী এজন্য শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাই এঁর অভিলাষ অনুযায়ী আলীবর্দী ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁকে সুবিস্তীর্ণ আলেপসাহী পরগণার স্বত্ব প্রদান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য নাকি অতিশয় প্রিয়দর্শন ও সচ্চরিত্র ছিলেন। গভীর জ্ঞান, সত্যবাদিতা ও প্রখর ধীশক্তির জন্য সমসাময়িক জনসমাজে ইনি সবিশেষ আদৃত হয়েছিলেন। এঁর চার পুত্রের নাম রামরাম, হরিরাম, বিষ্ণুরাম ও শিবরাম। এই পুত্রেরা পরবর্তীকালে মুক্তাগাছায় বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করেন। এবং তখন থেকে এঁরা মুক্তাগাছার জমিদার নামে খ্যাত হন।

শ্রী কৃ ষ্ণ জী ব ন দাস—'দুর্গা-মঙ্গল' বা 'অম্বিকামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। কবি ছিলেন সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের সভাসদ্। ভণিতায় কবি বারবার রামকৃষ্ণের উল্লেখ করেছেন,

"চৌধুরী-চক্রবর্তী সুরীতে পালয়ে
পৃথ্বী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রায়
তাহার সভার মাঝে
কবিত্ব-সবিতা রাজে
শ্রীকৃষ্ণজীবন দাসে গায়।"

কবির নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে, বাহারবন্দ পরগণায় বোজড়া বা বোজরা গ্রামে। কবির "জন্ম মোদক-কুলে"।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—গোপীকান্ত ভট্টাচার্যের পুত্র। ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। ইনি জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র ও মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশে'রও টীকাকার।

এঁর রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রদূত'। হনুমান কর্তৃক সীতার সংবাদ আনীত হলে রামচন্দ্র চন্দ্রকে লঙ্কাস্থিতা সীতার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন—ইহাই কাব্যের বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস—মহাভারতের কবি-শ্রেষ্ঠ কাশীরাম দাসের অগ্রজ। ইনি অতি ধর্মনিষ্ঠ এবং গোপালদাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এঁর জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণাস্থিত সিঙ্গিগ্রামে। কৃষ্ণদাসের পিতার নাম কমলাকান্তদেব, পিতামহ সুধাকর, প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর। এঁরা জাতিতে কায়স্থ। শ্রীকৃষ্ণদাস সুকবি ছিলেন। গুরু গোপালদাসের আদেশে ইনি ভাগবতের একখানি অনুবাদ গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' প্রণয়ন করেন "শ্রীকৃষ্ণ-

'কিঙ্কর" ভণিতায়। গুরুর নিকট হতেই তিনি এই "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর" নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার দু-এক বছর পূর্বে কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্য রচনা করে ছিলেন। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক দু এক বছরের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচিত হওয়া সম্ভব। কাব্যখানি ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত। যদিও একাধিক স্থানে কবি নিজ গ্রন্থকে 'ভাগবত-সার' নামে অভিহিত করেছেন, তবু বস্তুতঃ গ্রন্থটিতে ভাগবতের কাহিনীরও অভাব নেই। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন,

"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস কৃষ্ণের কিঙ্কর।
রচিত কৃষ্ণের গীত অতি মনোহর॥'

শ্রী কৃ ষ্ণ বৈদ্য—'মাতৃকাদর্পণ' প্রণেতা। বৈদ্যবাচস্পতির মতে বিশ্বপ্রকাশকার মহেশ্বর বৈদ্যের পিতা। কিন্তু রামাবতার শর্মা এঁকে মহেশ্বরের পিতামহ বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্য চরক ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম—নব্যন্যায়ের ইনি একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত। এঁর বাসস্থান বহু বিতর্কিত তবে ইনি নবদ্বীপবাসী বলে অনুমিত হয়। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে ভূমিদান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম রচিত 'পদাঙ্কদূত' প্রখ্যাত গ্রন্থ। ইহা নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের রায়ের সভায় ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরহক্লিষ্ট গোপীগণ কর্তৃক তাঁর পদাঙ্কসমূহকে তাঁর নিকট দূতরূপে গমনের অনুরোধ—ইহাই সংক্ষেপে 'পদাঙ্কদূতের বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের অপর কাব্য গ্রন্থ 'কৃষ্ণপদামৃত'। ইহা নানা ছন্দে ২৫০টি শ্লোকে রচিত। কাব্যটির রচনাকাল ১৭১১ ১২ খ্রীষ্টাব্দ। এর বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা।

শ্রীগুপ্ত—গুপ্তবংশের আদিপুরুষ ও গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্থ শতাব্দীতে বরেন্দ্রভূমে রাজত্ব করতেন। ইনি নাকি বাঙালী ছিলেন।

শ্রীচন্দ্র—পূর্ববঙ্গের হরিকেল অঞ্চলের রাজা। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইনি রাজত্ব করতেন। রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিলেন এঁর পিতা। শ্রীচন্দ্র প্রায় ৭৪ বছর কাল রাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবতঃ এঁরই রাজত্বকালে কলচুরীরাজ লক্ষ্মণরাজ বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করেছিলেন।

শ্রী চৈ ত ন্য দে ব—বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দুর্যোগময় যুগে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে মানবতা ও প্রেমের বন্যায় ডুবিয়ে ছিলেন। ১৪০৭ শকাব্দের ২৩ ফাল্গুন অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল বিশ্বম্ভর। বাল্যকালে তিনি 'নিমাই' নামেই

সমধিক পরিচিত ছিলেন। পিতা-মাতার অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁর জন্ম হয় বলে অদ্বৈতপ্রভু-পত্নী সীতাদেবী তাঁর নাম রাখেন নিমাই—নিমের মতো তেতো, যাতে যম বালককে ছুঁতে না পারে। নিমাই অত্যন্ত গৌরবর্ণ ছিলেন বলে নবদ্বীপে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ (অপভ্রংশে ও আদরে-শ্রদ্ধায়—গোরা, গোরাচাঁদ, গোরা-রায় প্রভৃতি) নামেও অভিহিত হয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন শ্রীহট্টের অধিবাসী। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীহট্টে মুসলমান অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং বিদ্যালাভের আকাঙ্খায় তিনি নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন। এইখানেই নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্রের বিবাহ হয়। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষরা উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের অধিবাসী ছিলেন। রাজা ভ্রমরের ভয়ে তাঁরা শ্রীহট্টে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে ষোল বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। পাছে নিমাইও বিদ্যালাভ করে সন্ন্যাস হয় এই ভয়ে জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে পাঠশালায় দেন নি। বাল্যকালে নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। সে সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে। অবশেষে পিতা তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দেন। অধ্যয়নে তিনি অত্যন্ত তন্ময় হয়ে যেতেন। অল্প বয়সেই তিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেন। এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতে থাকেন। কেশব-কাশ্মীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তরুণ নিমায়ের নিকট তর্কযুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি নবদ্বীপে টোল খুলে অধ্যাপনা করতে শুরু করলেন। এই সময় ষোল-সতের বছর বয়সে বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। নবদ্বীপে একদিন ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে চৈতন্যের চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী সর্পদংশনে মারা গেলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়।

তেইশ বছর বয়সে চৈতন্য পিতৃপিণ্ড প্রদানের জন্য গয়া গমন করেন। সেখানে পিণ্ডদানের পর ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্য তখন ঈশ্বরপুরীর নিকট দশাক্ষর গোপালমন্ত্র গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে ফিরে এসে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। টোল বন্ধ করে দিলেন। চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট চৈতন্য দীক্ষা গ্রহণ করে সংসারত্যাগ করেন। কেশবভারতী তাঁর নূতন নামকরণ

করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এরপর তিনি নীলাচল যাত্রা করেন (১৫১০ খ্রীঃ)। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব (রাজত্ব কাল খ্রীঃ ১৪৯৮-১৫৪০) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর পরম ভক্ত হন। পুরীতে কিছুদিন অবস্থান করে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পরিক্রমায় বার হন। সেখানে বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। মারাঠী সাধক তুকারাম তাঁকে গুরু বলে শ্রদ্ধা করেন। দক্ষিণ ভারত পর্যটনকালে চৈতন্যদেব আদি কেশব মন্দির থেকে 'ব্রহ্মসংহিতা' এবং কৃষ্ণবেম্বাতীরে বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত' নামক দুখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থদ্বয় চৈতন্য-মত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার বিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছিল। এরপর মধ্ব-মতাবলম্বী আচার্যগণ বিচারে পরাস্ত হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি বিদ্যানগরে গোদাবরী তীরে পরম ভক্ত-বৈষ্ণব রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর চৈতন্যদেব সোমনাথ, দ্বারকা, প্রভাস পরিক্রমার পর পুরীধামে প্রত্যাবর্তন করে কাশী মিশ্রের আশ্রমে বাস করতে থাকেন। এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নিত্যানন্দকে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন।

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন পরিক্রমার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যদেব গৌড় যাত্রা করেন। সম্ভবতঃ এই সময় তিনি শান্তিপুরে শচীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এর পর আর কখনো তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নি। গৌড়ের পথে যাত্রাকালে হুসেন শাহের প্রসিদ্ধ কর্মচারী ভ্রাতাদ্বয় সনাতন ও রূপ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। মুসলমান রাজরোষের আশংকায় তিনি পুনরায় পুরী প্রত্যাবর্তন করেন। এবং সেখান থেকে ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে উপস্থিত হন। সেখান থেকে প্রয়াগ এবং প্রয়াগ থেকে মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপনে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদব্রজে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর তিনি আর কোথাও যান নি। তাঁর জীবনের শেষ আঠার বছর এইখানেই অতিবাহিত হয়েছিল। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মর্তলীলার অবসান হয়। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কোন কোন মতে তিনি পুরীর জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। আবার অন্যমতে তিনি নাকি ভাবাবেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। আবার এমনও লোকশ্রুতি আছে যে, পুরীর পাণ্ডারা নাকি চৈতন্যদেবের মহিমা ও প্রভাব দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে মন্দির মধ্যে হত্যা করে সমাহিত করেছিল, এবং প্রচার করে দিয়েছিল যে তিনি মহাপ্রভুর শরীরে লীন হয়ে গিয়েছেন।

যাইহোক, পূর্বভারতের তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব ছিল অপরিসীম। পরবর্তী কালেও সেই প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে চৈতন্য যুগের দান অসামান্য।

শ্রীজীব গোস্বামী—জীব-গোস্বামী দ্রঃ।

শ্রীজীব ধারণ—সম্ভবত সমতটের রাতরাজবংশীয় নৃপতি। রাজত্বকাল সপ্তম শতাব্দী। ত্রিপুরার রাজা লোকনাথের নিকট পরাজিত হয়ে তাঁকে "জয়তুঙ্গবর্ষ" বা জয়ন্তিয়া পাহাড় প্রদান করেছিলেন। এঁর পুত্র শ্রীধারণ। লোকনাথের সঙ্গে ইনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

শ্রীদাস—কাঞ্চনগড়িয়া নিবাসী ও চৈতন্যপার্ষৎ দ্বিজ হরিদাসাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম গোকুলানন্দ। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীনিবাসের ইচ্ছানুযায়ী শাস্ত্রানুশীলনের জন্য ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যাজিগ্রামে বাস করতেন। মধ্যে মধ্যে এঁরা স্থানান্তরেও যেতেন। খেতুরি এবং বোরাকুলির মহোৎসবে এঁরা উপস্থিত ছিলেন। বুধরি এবং কণ্টকনগরেও এঁরা গিয়েছিলেন। শ্রীদাসের তিন পুত্র জয়কৃষ্ণ, জগদীশ, শ্যামবল্লভ, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সত্যভামা—এঁরা সকলে শ্রীনিবাসের প্রথমা-পত্নী দ্রৌপদীর নিকট দীক্ষিত হয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীদামোদর—চট্টগ্রামরাজ। মুসলমান যুগে স্বাধীনতা রক্ষা করেন। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

শ্রীধর "কথক"—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য সংগীত রচয়িতা। শ্রীধরের উপাধি ছিল "কবিরত্ন" ও "কবিভূষণ"।

শ্রীধর কবিরাজ—ষোড়শ শতাব্দীর একজন কবি। প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে ইনি অন্যতম। এঁর দু'খান মাত্র খণ্ডিত পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ইনি সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। কাব্যের ভণিতায় কবি নিজেকে দ্বিজ বলে উল্লেখ করেছেন। মনে হয় ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে আরও কয়েকজন প্রাচীন কবি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। দ্বিজ শ্রীধরই ছিলেন তাঁদের পথ-প্রদর্শক। শ্রীধর কাব্যের ভণিতায় ফিরোজ শাহকে কোথাও রাজা, কোথাও যুবরাজ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন কবি ফিরোজ শাহের সভাকবি ছিলেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়ে থাকতে পারে। এঁর কাব্যের ভাষা সংস্কৃতবহুল।

শ্রীধর দাস—একজন বিদগ্ধ কাব্য-

রসিক ও সাহিত্য বোদ্ধা, এবং লক্ষ্মণসেনের 'মহামাণ্ডলিক'। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত, লেখক ও বন্ধু বটুদাসের পুত্র। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' নামে একখানি সংস্কৃত কবিতার গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। এতে ৪৮৫ জন কবির মোট ২৩৭০টি কবিতা স্থান লাভ করেছে। এই সংকলন গ্রন্থে একদিকে যেমন সর্ব ভারতীয় কবি ভাস, কালিদাস, ভামহ, অমরু, ভর্তৃহরি, রাজশেখর, বিশাখ দত্ত প্রভৃতির কবিতা সংকলিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রসিদ্ধ বাঙালী কবিদেরও বিবিধ ধরনের শ্লোক স্থান পেয়েছে। এছাড়াও, এতে আশি জন অজ্ঞাত পরিচয় কবির নাম পাওয়া যায় যাঁদের বাঙালী বলে মনে হয়। শ্রীধর দাস গ্রন্থটি সংকলন করে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাঙালীর সঙ্গে পরবর্তী কালের বাঙালীর সেতু রচনা করে দিয়েছেন।

শ্রীধর দৈবজ্ঞ—কোচবিহারের কামতাপুরের রাজা নরনারায়ণের রাজসভা পণ্ডিত। ইনি 'জ্যোতিষ' নামক নিবন্ধ রচনা করেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

শ্রীধর দ্বিজ—চট্টগ্রামের অধিবাসী। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। ইনি বাংলাদেশের লৌকিক ভাবের প্রথম কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'বিদ্যাসুন্দর'। ইহা ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত।

শ্রীধর পণ্ডিত (খোলাবেচা)—কবিকর্ণপূর শ্রীধর সম্বন্ধে বলেছেন, "খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।" সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে শ্রীধর ব্রাহ্মণ এবং 'পণ্ডিত' উপাধিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী। শ্রীধর ছিলেন ব্যবসায়ী। থোড, কলা, মূল, খোলা ইত্যাদি বিক্রয় করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন 'মহাসত্যবাদী এবং প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত'। প্রত্যেক দিন খোলাগাছি বা কলাপাতার আঁটি এনে বিক্রয় করতেন। অতি কষ্টে তাদের দিন কাটত। কিন্তু গৃহে বিগ্রহরূপে 'লক্ষ্মীকান্ত সেবন' ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত হরিনাম চলত। এই সরলস্বভাব শ্রীধরের প্রতি গৌরাঙ্গ প্রভুর যথেষ্ট প্রেম ছিল। শ্রীধর যখন থোড, কলা, মূলা, খোলা নিয়ে বাজারে বসতেন গৌরাঙ্গ তখন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে তার মালপত্র ধরে টানাটানি করতেন এবং 'এই মত শ্রীধর ঠাকুরে হুড়াহুড়ি' লেগে যেত। কিন্তু এই দীন ভক্তের প্রতি গৌরাঙ্গের অপার করুণা ছিল। গৌরাঙ্গদেব শ্রীধরকে কখনো বিস্মৃত হন নি। শ্রীধরের নিকট গৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান-রূপেই প্রতিভাত হয়েছিলেন। একবার নগর সংকীর্তনের দিন কাজীকে উপযুক্ত শাস্তিদানের পর গৌরাঙ্গপ্রভু

অসংখ্য ভক্তসহ নগর পরিভ্রমণ করে শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হন। তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত। দরিদ্র শ্রীধর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁর গৃহে একটি 'ফুটা লৌহপাত্র' পড়েছিল। গৌরাঙ্গ ছুটে গিয়ে সেই ফুটোপাত্র করেই পরমানন্দে জলপান করতে লাগলেন। এবং শ্রীধরের গৃহপ্রাঙ্গণে নৃত্য-সংকীর্তন করলেন। নবদ্বীপলীলার সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে শ্রীধর জড়িত ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু শান্তিপুর পৌছলে শ্রীধরও সেই স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মাঝে মাঝে তিনি নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

শ্রীধর ভট্ট বা শ্রীধরাচার্য—এঁর স্বরচিত গ্রন্থে বর্ণিত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় ইনি ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরি-সৃষ্টি (আধুনিক বর্ধমানের ভুরস্যুট) গ্রামের অধিবাসী। শ্রীধরের পিতার নাম ছিল বলদেব, মাতা অচ্ছোকা ও পিতামহ বৃহস্পতি। ইনি কায়স্থরাজ পাণ্ডুদাসের আশ্রমে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কোন সময় এঁর জন্ম হয়।

শ্রীধরের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ন্যায়কন্দলী'—রচনাকাল ৯৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা বৈশষিক সূত্রের প্রশস্তপাদ রচিত 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' নামক ভাষ্যের টীকা। ন্যায়বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ শ্রীধরভট্টই সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এ ছাড়া, শ্রীধর 'অদ্বয়-সিদ্ধি', 'তত্ত্বপ্রবোধ', 'তত্ত্ব-সংবাদিনী' এবং 'সংগ্রহটীকা' নামে অন্তত আরও চারখানি বেদান্ত ও মীমাংসাবিষয়ক পুথি রচনা করে-ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে মিথিলার পরম ন্যায়াচার্য উদয়নাচার্য তাঁর রচিত ন্যায়গ্রন্থ 'কিরণাবলী'তে কন্দলীকার শ্রীধরাচার্যের মত উদ্ধৃত করেছেন। ন্যায়কন্দলী অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ গ্রন্থ-রূপে ভারতের নানা প্রদেশে প্রচারিত হয়েছিল। শ্রীধর কুমারিল ভট্টের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। সাংখ্যযোগদর্শনেও তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। শ্রীধরের ভূরিশ্রেষ্ঠস্থিত চতুষ্পাঠীতে ষড়দর্শনের চর্চা পরম উন্নতি লাভ করেছিল।

শ্রীধরস্বামী—বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীধর শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা' টীকা রচনা করেন। শ্রীধর প্রাক্‌চৈতন্য যুগের আচার্য বলে অনুমিত হয়। শ্রীধর-স্বামীর শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেছেন,

"শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করিবে গ্রহণ॥"

শ্রীধরস্বামার অনুকরণে তিনি ভাগবতের টীকা রচনার ইঙ্গিত দিয়ে-

ছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীধর স্বামীর আদর্শেই ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীধরস্বামী 'শ্রীব্রজবিহার' নামে এক কাব্যও রচনা করেছিলেন।

শ্রীধারণ—সম্ভবত সমতটের রাতরাজবংশীয় রাজা। পিতার নাম রাজা শ্রীজীবধারণ। এঁর রাজত্বকাল সপ্তম শতাব্দী।

শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি—বাংলার প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার রঘুনন্দনের গুরু। 'গুরু চরণাঃ' 'গুরু পাদাঃ' প্রভৃতি সম্মানসূচক পদে রঘুনন্দন শ্রীনাথের মতামতের উল্লেখ করেছেন। শ্রীনাথ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

শ্রীনাথের রচিত মৌলিক গ্রন্থ—বিবাহার্ণব, কৃত্যতত্ত্বার্ণব, শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব, গূঢ়দীপিকা, শ্রাদ্ধদীপিকা, আচারচন্দ্রিকা, শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা, দানচন্দ্রিকা, দুর্গোৎসববিবেক, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, শুদ্ধিবিবেক প্রভৃতি। তাঁর রচিত টীকাগ্রন্থ—সারমঞ্জরী (নারায়ণ-কৃত 'ছন্দোগ-পরিশিষ্ট প্রকাশে'র টীকা), তাৎপর্যদীপিকা (শূলপাণির 'তিথি বিবেকে'র টীকা), শ্রাদ্ধবিবেক ব্যাখ্যা (শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র ব্যাখ্যা), দায়ভাগটিপ্পনী (জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকা)।

শ্রীনাথ "ব্রাহ্মণ"—সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি। কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের (রাজ্যকাল ১৬৩২-৬৫) নির্দেশে শ্রীনাথ মহাভারত পাঁচালী লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দ্রোণ-পর্ব রচনার কালে কোচবিহারের রাজা ছিলেন মোদনারায়ণ (রাজ্যকাল খ্রীঃ ১৬৬৫-৮০)। "দ্বিজ কবিরাজ" শ্রীনাথেরই ভণিতা। দ্রোণ পর্বে শ্রীনাথ যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে এঁর পিতা রামেশ্বর ছিলেন শুক্লধ্বজের সভাসদ ভবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীনাথের রচিত কাব্য দ্রৌপদীর স্বয়ংবর। শ্রীনাথ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত "বিশ্বসিংহ-চরিত' কাব্যের একখানি অসম্পূর্ণ হস্তলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

শ্রীনাথ ভট্ট কবিশার্দূল—এঁর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী। ইনি রসরত্ন, পরহিত-সংহিতা, বৃহৎকামরত্ন-টীকা এবং লঘুকামরত্ন-টীকা প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থ-সমূহ প্রণয়ন করেন। এঁর পুত্রের নাম গোবিন্দ ভট্ট।

শ্রীনাথ ভট্টাচার্য—মাদ্রাজের আড্যার গ্রন্থাগারে শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত 'সাংখ্যপ্রয়োগ' নামক এক খানি গ্রন্থ আছে। এঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দী।

শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী—পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক নরহরি বিশারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং

বাসুদেব সার্বভৌমের পিতৃব্য। ইনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী নৈয়ায়িক। পিতার নাম রত্নাকর।

শ্রীনিবাস—ইনি দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে 'শুদ্ধিদীপিকা' নামে একখানি স্মৃতি ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ 'গণিত চূড়ামণি' নামে একখানি বিশুদ্ধ গণিতের গ্রন্থ ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রণয়ন করেছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য—ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে শ্রীনিবাস আচার্য জন্মগ্রহণ করেন বলে অনুমিত হয়। এঁর পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্তী ভাগীরথী-তীরবর্তী অধুনালুপ্ত চাগন্দী গ্রামে বাস করতেন। গঙ্গাধর শেষে চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের নিকটস্থ মাতুলালয় জাজিগ্রামে বাস করতেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশে বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলে সমাদৃত হতেন। বাল্যে তিনি নরহরি সরকার ঠাকুরের স্নেহাশীর্বাদ লাভ করেন এবং তাঁহারই প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি গোপালভট্ট গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শীর্ষস্থানীয় নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবী এবং নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্র (ভদ্র) ও এঁকে স্নেহ করতেন। শ্রীনিবাস আচার্যের সাহায্যেই বাংলা-দেশে বৃন্দাবনীয় ভক্তিশাস্ত্র-গ্রন্থনিচয় প্রচারিত হয়েছিল। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম যখন স্তিমিতপ্রায় হয়ে এসেছিল, তখন শ্রীনিবাসই তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণকৃত বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থসমূহ (এই সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও ছিল।) সঙ্গে নিয়ে শ্রীনিবাস যখন গৌড়ে যাত্রা করছিলেন তখন পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীরের নিয়োজিত দস্যুগণ এই মহামূল্য গ্রন্থ লুণ্ঠন করলে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। পরিশেষে স্বীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে সমস্ত অপহৃত গ্রন্থ উদ্ধার করেন এবং বীর-হাম্বীরকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসে', মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী'তে এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' শ্রীনিবাসের জীবন-কাহিনী পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসের রচিত পদের সংখ্যা অতাল্প। তাঁর প্রতিভায় সৃজনী শক্তি অপেক্ষা ব্যাখ্যা করার শক্তিই ছিল অধিক, যেজন্য তিনি বহু মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গোটা

পাঁচেক পদ পাওয়া গেছে। একটি সুন্দর পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল:

"বদনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো।
কে না কুন্দিলে দুটি আঁখি
দেখিতে দেখিতে মোর
পরাণ কেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী।

শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই পদকর্তা ছিলেন।

শ্রীবৎস—মিথিলানিবাসী পরম ন্যায়াচার্য উদয়নাচার্যের গুরু। ইনিও একজন বিখ্যাত ন্যায়াচার্য ছিলেন। এঁর অভ্যুদয়কাল আনুমানিক ১০০০-৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীবল্লভ—বল্লভদাস ও শ্রীবল্লভ দ্র°।

শ্রীবল্লভাচার্য—মিথিলানিবাসী ন্যায়াচার্য। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ন্যায়লীলাবতী'। গৌড় মিথিলার নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত গ্রন্থকার লীলাবতীকে অন্যতম আকর গ্রন্থরূপে তার উপর টীকা টিপ্পনী রচনা করেছেন। ১১০০-২৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে, শ্রীবল্লভ আপন পত্নীর নামে গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় শ্রীবাস পণ্ডিতের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সম্ভবত জলধর পণ্ডিত। তাঁর অনুজ অপর তিন ভ্রাতার নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত, শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি। নবদ্বীপ ও কুমারহট্ট উভয় স্থানেই তাঁদের বাসগৃহ ছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় তাঁরা নবদ্বীপে অতিবাহিত করতেন। ছেলেবেলায় শ্রীবাস অত্যন্ত দুর্দান্ত ও অসদাচারী ছিলেন। ষোড়শ বছর বয়সে তিনি শান্ত হন এবং তার মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। একদিন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট গিয়ে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ শ্রবণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন অন্যান্য পড়ুয়ারা তাঁকে উৎপাত মনে করে বাইরে বার করে দিল। তাতে শ্রীবাস প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে যান। কিন্তু এই ঘটনার পর শ্রীবাসের চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় অদ্বৈতপ্রভু নবদ্বীপে এসে বাস করতে থাকেন। শ্রীবাসের বাড়ীতেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত। অদ্বৈতপ্রভু টোল খুলে বসলে শ্রীবাসই হলেন তাঁর প্রধান ভক্ত ও সহায়ক। এমনি শ্রীবাস অদ্বৈতের অন্যতম মনোযোগী ছাত্র হয়ে উঠলেন। শ্রীবাস আচার্য ও জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনে নিদারুণ অধঃপতন ঘটায় অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তরা একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রার্থনা করছিলেন। গৌরাঙ্গদেবের জন্ম হলে তাঁকেই ত্রাণকর্তা মনে করে অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাসাদি ভক্তরা 'বিবিধর্ম'মত জাত-

কর্মাদি সম্পন্ন করেন। জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর শ্রীবাস পণ্ডিত মিশ্র পরিবারের দেখাশুনা করতেন। গয়াধাম থেকে ফিরে এসে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হন এবং তখন থেকেই তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন আরম্ভ করেন। প্রত্যহ দিনরাত্রি এই কীর্তন চলত। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দও এসে শ্রীবাস গৃহে অবস্থান করেন। একদিন শ্রীবাস-গৃহেই গৌরাঙ্গদেবের অভিষেক হয়। জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি গৌরাঙ্গের সমস্ত কর্মেই শ্রীবাস পণ্ডিত অংশগ্রহণ করতেন। শ্রীবাস গৃহই ছিল গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার প্রধান কেন্দ্র। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ পযন্ত সমস্ত লীলানুষ্ঠানের সঙ্গী ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত।

শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন একজন অতি উচ্চশ্রেণীর লেখক, পাঠক, কথক ও বক্তা। তাই তাঁর পাঠ শুনে গৌরাঙ্গ নৃসিংহভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন এবং তার বৃন্দাবন-কথনে বিহ্বল হয়ে তিনি বংশী প্রার্থনা করে আকুলচিত্তে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলেন। গৌরাঙ্গের জন্য শ্রীবাসকে পাষণ্ডীদের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। এজন্য তাঁর প্রতি গৌরাঙ্গের করুণার সীমা ছিল না। চন্দ্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়কালে শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনিই গৌরাঙ্গের নির্দেশানুসারে নাট্যাভিনয়ের সমস্ত ব্যবস্থার ভার নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য-মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌঁছলে শ্রীবাস পণ্ডিত শচীমাতাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুরে গিয়ে তাঁকে বিদায় দেন। গৌরাঙ্গের নির্দেশমতো শ্রীবাস কিছু-কাল কুমারহট্টে বসবাস করেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে গৌরাঙ্গ কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রতি বছর নীলাচলে যেতেন চৈতন্য-দর্শনের জন্য এবং সেখানে কীর্তনানন্দে বিভোর হতেন। জানা যায় মহাপ্রভুর তিরোধানকালে শ্রীবাস পণ্ডিত নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে আরও কিছুকাল শ্রীবাস পণ্ডিত জীবিত ছিলেন।

শ্রীমন্ত খাঁ—ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বিখ্যাত বারভূঞার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঞা চাঁদ রায় ও কেদার রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের গুরু। দেবতা কতৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চাঁদ রায় শ্রীমন্ত খাঁকে সেই গুরু পদ থেকে অপসারিত করলে শ্রীমন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেন। ঈশা খাঁর সঙ্গে যখন চাঁদ ও কেদার রায়ের যুদ্ধ হয়, তখন এই শ্রীমন্ত খাঁই হীন চাতুরী অবলম্বনে রাজকন্যা সোনামণিকে শ্রীপুর থেকে নিয়ে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। তাছাড়া, এই দেশদ্রোহী, গৃহশত্রু শ্রীমন্ত খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায়ই কেদার

রায় পূজার আসনে মোগল গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। শ্রীমন্ত খাঁ বাংলার ইতিহাসে একটি চির কলঙ্কিত নাম।

শ্রীমন্ত দেবরায়—নলডাঙা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সন্ন্যাসী বিষ্ণুদাস হাজরা ছিলেন এঁর পিতা। জনশ্রুতি আছে যে বিষ্ণুদাস দেবতার অনুগ্রহে এই পুত্র লাভ করেছিলেন বলে এঁর নামের সঙ্গে দেব অভিধা সংযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। এই শ্রীমন্তদেব হতেই নলডাঙা রাজবংশের উপাধি হয়েছে দেবরায়। শ্রীমন্ত দীর্ঘাকার, সুদর্শন ও নানা বীরোচিত গুণে বিভূষিত ছিলেন। ইনি বহু সহস্র লোক সংগ্রহ করে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। তারপর ইনি বহু পাঠান জমিদারকে যুদ্ধে পরাজিত করে বহু জমিদারী অধিকার করে নেন এবং নিজে একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার হয়ে উঠেন। পাঠান্ বীর উদার ওসমান খাঁ এঁর বীরত্বে বিমুগ্ধ হয়ে এঁকে 'রণবীর খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

শ্রীমান পণ্ডিত—নদীয়া বাসী, এবং চৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং 'চৈতন্য-ভাগবতে' আছে ইনি ছিলেন 'প্রভুর নিজ ভৃত্য।' এবং এঁকেই গৌরাঙ্গের নৃত্যকালে দেউটি-ধারী বলা হয়েছে। সান্ধ্যকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি নবদ্বীপলীলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিতে শ্রীমান পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন-ভবনে নৃত্যাভিনয়-কালে এই শ্রীমান পণ্ডিত 'দিবড়িয়া চাড়ির' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য ইনি মাঝে মাঝে নীলাচলে যেতেন। প্রথম বছর জগন্নাথের চতুষ্পার্শ্বস্থ সম্প্রদায়-কীর্তনের মধ্যে শ্রীমান পণ্ডিতও ছিলেন। গৌরাঙ্গদেব এঁকে বিশেষ কৃপা করতেন। এঁর অবস্থিতি কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

শ্রীমান ভট্টাচার্য—বাঙালী মহা-পণ্ডিত প্রগল্‌ভের সমকালীন এবং মহা-পণ্ডিত। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দী। তিনি ছিলেন পাণিনিমতের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। তিনি নৈয়ায়িকও ছিলেন। তিনি ছিলেন বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, চম্পটি গাঞি। বলভদ্র মিশ্র শ্রীমান ভট্টাচার্যের ছাত্র ছিলেন। তিনি 'ন্যাসটীকা', 'পরিভাষাবৃত্তিটিপ্পনী' 'অনুন্যাসসার', 'তন্ত্রপ্রদীপটীকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি দ্রব্যকিরণাবলী ও বর্ধমানকৃত দ্রব্যপ্রকাশের টিপ্পনী রচনা করেছিলেন।

শ্রীমান্ সেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম সেবক। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। 'চৈতন্য-

চরিতামৃতে' আছে : "শ্রীমান সেন — প্রভুর সেবক প্রধান। চৈতন্যচরণ বিনু নাহি জানে আন।"

শ্রীমুকুন্দ শর্মা—একজন মহামহোপাধ্যায়। ইনি 'কলাপচন্দ্রিকা নামে ভট্টিটীকা রচনা করেন। এঁর টীকা প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের টীকার প্রকারান্তরে অনুবাদ মাত্র। নব্যন্যায়ে এর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরাম তর্কবাগীশ বা **রাম শর্মা**—এঁর ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এর জীবনকাল সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দী। শ্রীরাম 'অমরকোষে'র একখানি টীকা রচনা করেছিলেন। সেই টীকার উপর একখানি টিপ্পনীও তিনি প্রণয়ন করেন।

শ্রীরাম তর্কালঙ্কার (জগদ্গুরু) — নবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পুত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ পিতৃবন্দনায় 'জগদ্গুরু' বিশেষণ পদ ব্যবহার করেছেন। পণ্ডিতদের মতে কৃষ্ণদাস সার্বভৌম বা রামভদ্র সার্বভৌম শ্রীরামের গুরু ছিলেন। শ্রীরামের রচিত গ্রন্থ : 'অনুমানদীধিতিটীকা ও 'আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটিপ্পনী'। তাঁর গ্রন্থরচনার কাল ১৫৪০-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলে নির্ণয় করা হয়। উপরি-লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া ইনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

শ্রীরাম পণ্ডিত—শ্রীবাস পণ্ডিতের মধ্যম ভ্রাতা। চন্দ্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়ে শ্রীরামও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইনি 'স্নাতক' সেজে সকলকে আনন্দ দান করেছিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তনাদিতে ইনিও যোগদান করতেন। গৌরাঙ্গের কাছে শ্রীরাম পণ্ডিতের একটি বিশেষ স্থান ছিল। কোনও বিশেষ সংবাদ গ্রহণ বা প্রেরণাদি ব্যাপারে ইনি গৌরাঙ্গ কর্তৃক প্রেরিত হতেন। মহাপ্রভুর নীলাচল অবস্থান-কালে ইনিও শ্রীবাসের সঙ্গে নীলাচল যেতেন তার দর্শনলাভের জন্য। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পরেও শ্রীরাম পণ্ডিত জীবিত ছিলেন।

শ্রীরাম শিরোমণি—বিখ্যাত নৈয়ায়িক কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর জীবনকাল ১৭৯৩-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। এর পিতার মৃত্যুর পর ইনি মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অত্যল্প-কাল মধ্যেই নবদ্বীপ সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী—রূপ গোস্বামী দ্র°।

শ্রীলক্ষ্মণ "দ্বিজ"—এঁর রচিত অধ্যাত্ম রামায়ণের আদি-কাণ্ডের ও 'শিবরামের যুদ্ধ' ও অন্যান্য পালার পুথি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে। পূর্ববঙ্গের একটি পুথির লিপিকাল ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। সম্ভবত ইঁনিই বন্দ্যঘটীয় লক্ষ্মণ, যাঁর ভারত

পাঁচালীর কোন কোন আখ্যানের পুথি পাওয়া গিয়েছে। শ্রীলক্ষ্মণ সম্ভবত যোগবাশিষ্ঠ হতেও কিছু কিছু অংশ নিয়েছিলেন,

"এত বলি নারায়ণ প্রবেশিল বনে,
বশিষ্ঠের মতে ভণে শ্রীযত লক্ষ্মণে॥"

শ্রীশ্যাম পণ্ডিত—মঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য শ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ করেছেন। পুথিখানার লিপিকাল ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যের কোন সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত পুথি সবই নিতান্ত খণ্ডিত অথবা অপর কবির। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ছিলেন উত্তর পশ্চিম রাঢ়ের প্রাচীন কবি। এঁর কাব্যের পুথি বীরভূম জেলা ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে পাওয়া যায়। কবি ঐ অঞ্চলের অধিবাসী বলেই অনুমিত হয়। পণ্ডিত উপাধি দেখে ডঃ ভট্টাচার্য অনুমান করেন যে কবি হয়ত ধর্ম পূজারী ছিলেন। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের রচনায় প্রাচীনত্বের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

শ্রীসনাতন—সনাতন গোস্বামী দ্রঃ।

শ্রীহরিকাল দেব—ময়নামতী পাহাড়ে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেব নামক পট্টিকেরার এক রাজার নাম পাওয়া যায়। বর্তমান কুমিল্লা জেলায় পট্টিকেরা রাজ্য অবস্থিত ছিল। শ্রীহরিকালদেব ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় সতের বছর রাজত্ব করেন।

শ্রীহর্ষ—শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মহাভারতের সুবিদিত নলদময়ন্তীর উপাখ্যানই এই কাব্যের উপজীব্য। কাব্যের শ্লোক সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশী কবির পিতা ছিলেন হীর এবং মাতা মামল্লদেবী। শ্রীহর্ষের জীবিতকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে, সাধারণতঃ তাকে কান্যকুব্জের রাজা বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয় (খ্রী. দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ)। ইনি ভারতের কোন অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। তার রচিত 'নৈষধ চরিতের' অংশ বিশেষ থেকে কেউ কেউ তাকে বাঙালী বলে মনে করে থাকেন। বিবাহে মাছ ভাত খাওয়া, উলু ধ্বনি দেওয়া, বিবাহিতা নারীর শাখা ধারণ করা, চালের পিটালীর আলপনা দেওয়া, প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতি, বরের মাথায় মুকুট ও হাতে দর্পণ ধারণ ও বিবিধ স্ত্রী আচারের বর্ণনা থেকে তাকে বাঙালী বলেই ধরে নেওয়া হয়। কাব্যটি গৌড় রীতিতে রচিত, এ থেকেও তাকে বাঙালী মনে করা হয়। শ্রীহর্ষ যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তাতে 'ন' ও 'ণ' অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব', অন্তঃস্থ 'য' ও বর্গীয় 'জ' প্রভৃতিকে স্বতন্ত্ররূপে

ব্যবহার করা হয় নি। এ থেকেও শ্রীহর্ষকে বাঙালী বলে মনে করা হয়।

বাঙালী হলে শ্রীহর্ষ ছিলেন বাংলার সেন রাজা বিজয়সেনের সমসাময়িক। নৈষধ-চরিত ছাড়াও ইনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এবং সে-সবের উল্লেখ রয়েছে নৈষধ চরিতে: যেমন, নবসাহসাংক-চরিত, স্থৈর্যবিচার-প্রকরণ, অর্ণববর্ণনা, শিব-শক্তিসিদ্ধ, ছিন্দ-প্রশস্তি ও শ্রীবিজয়-প্রশস্তি। খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামে দর্শনের উপরও ইনি একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

শ্রীহর্ষ সেন—একজন চিকিৎসক। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বঙ্গের পাঠান-নবাব ফকরুদ্দীন মোবারক সাহের (১৩৩৯-৫৩ খ্রীঃ) স্ত্রীর মৃত-বৎসত্ব-দোষের চিকিৎসা করেন। ফকরুদ্দিন সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীহর্ষ সেনকে বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম পরগণার জমিদারী ও রাজোপাধি প্রদান করেন। এঁর পুত্র বিনায়ক সেনও সুচিকিৎসক ছিলেন।

শ্রুতায়ু—মহাভারতীয় যুগের বাঙালী রাজা। এঁর রাজধানী ছিল বর্তমান ও তদানীন্তন ভুবনেশ্বরে। ইনি নাকি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ষ

ষষ্ঠীবর দত্ত—একজন কবি। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী। ইনি 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। মনসা-মঙ্গল কাব্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি নারায়ণদেবের পরেই ষষ্ঠীবর দত্তের নাম শ্রীহট্টে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠীবরের কবিখ্যাতি কেবল শ্রীহট্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজও ষষ্ঠী-বরের কাব্য শ্রীহট্ট জেলার সর্বত্র প্রচলিত। এখনো প্রতিবছর কার্তিক মাসে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামে ষষ্ঠীবরের প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত উমা-মহেশ্বরের শিবের বাটীতে কবির বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠী-বরের কাব্য 'পদ্মাপুরাণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইনি কাব্যের বন্দনাভাগে উল্লেখ করেছেন—'জ্যেষ্ঠ ভাই বন্দি গাই পিতার সমান'। ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁ। যেমন, 'ভণে গুণরাজ খানে কাজির বড়াই।' সম্ভবতঃ স্থানীয় কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কর্তৃক কবিকে এই উপাধি প্রদত্ত হয়েছিল। ষষ্ঠীবরের পিতার নাম ভুবনানন্দ বা ভুমানন্দ, পিতামহের নাম পুরুষোত্তম। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' থেকে জানা যায় ষষ্ঠীবর নিজে 'তালচর' হাতে নিয়ে পদ্মাপুরাণ গান করতেন। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ষষ্ঠীবর এঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

ষষ্ঠীবর সেন—মহাভারত কাব্যের রচয়িতা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি। ষষ্ঠীবর সেনের ভণিতায় স্বর্গারোহণের পুথি পাওয়া গেছে। কবি ছিলেন শ্রীহট্টের লোক। আবার কারুর কারুর মতে কবি ছিলেন ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার জিনারদি গ্রামের বৈদ্য সেন-বংশজ। ষষ্ঠীবরের রচনা অনাড়ম্বর ও সবল। এঁর পুত্র গঙ্গাদাস সেনও ছিলেন কবি। ইনিও মহাভারত কাব্যের রচয়িতা।

ষ্টানহোপ, ফিলিপ—এই ইংরেজ পুরুষ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আসেন। তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস এঁকে একটি কাজ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কাউন্সিলের সদস্যগণ রাজী না হওয়ায় তা সম্ভব হয় নি। কিছুদিন পরেই ইনি মাদ্রাজে চলে যান এবং আর্কটের নবাবের নিকট তিন বছর চাকরি করেন। ইনি "The Genuine Memoirs of Asiaticus" নামক একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

ষ্টুয়ার্ট (কর্ণেল)—কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন বলে লোকে এঁকে "হিন্দু-ষ্টুয়ার্ট" বলত। খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে ইনি কোন পার্থক্য দেখতেন না। জনশ্রুতি এই যে, ইনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতেন। অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ইনি নিজ গৃহে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সাউথ পার্ক ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে আজও এঁর সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান। অবস্থিতি কাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

স

সঙ্কর্ষণ—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা। ইনি সঙ্কর্ষণ ভণিতা দিয়ে বহু পদ রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর 'সঙ্গীত রসার্ণব' প্রকাশিত হয়।

সঞ্জয়—একজন কবি। ইনি মহাভারত কাব্যের অনুবাদক। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে সঞ্জয়কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদই "নানা কারণে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন"। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতের মতে এ ধারণা ভ্রান্ত। অনুমানে জানা যায় সঞ্জয় ছিলেন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদ্য বংশ-সম্ভূত। কেউ কেউ কবিকে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত বলে মনে করেন। একটি পুথির বিবৃতি থেকে জানা যায় যে হরিনারায়ণ দেব নামে কোন কবি 'সঞ্জয়' ছদ্মনামে মহাভারতের একখানি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বিরাট ভারত পাঁচালীর সর্বাপেক্ষা পুরনো পুথি লেখা হয়েছিল ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে। আদিপর্বে রাজেন্দ্রদাসের ভণিতা আছে, অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাস সেনের, স্বর্গারোহণ-পর্বে

ষষ্ঠীবরের। বাকী কোন কোন পর্বে ভণিতা পাওয়া যায়, "প্রয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়" অথবা "সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়।"

সঞ্জয় হাজরা—বাংলার বার-ভূঞার অন্যতম চাঁদগাজির সেনাপতি। ইনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতেন। পরে ব্যসনাসক্ত গাজীবংশের বিষয়কর্মের সর্বেসর্বা হন। পরে সঞ্জয়ের বংশধরেরাই গাজিবংশের জমিদারী হস্তগত করে পরগণার জমিদার হন। সঞ্জয়ের অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

সত্যরাজ খাঁ—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রামবাসী। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা ও 'গুণরাজ খান' উপাধিধারী বিখ্যাত মালাধর বসু ছিলেন এঁর পিতা। আর বিখ্যাত রামানন্দ বসু ছিলেন সত্যরাজের পুত্র। সপুত্র সত্যরাজ ছিলেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত-পার্ষদ। রামানন্দসহ সত্যরাজ প্রতি বছর অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যেতেন এবং চার মাস কাল মহাপ্রভুর সঙ্গে নানা-বিধ লীলায় যোগদান করতেন।

সত্রাজিৎ—সমতটাধিপতি ও বার ভূঁইয়ার নেতা। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদের হাতে এঁর পতন ঘটে।

সদ্দত উল্লা—সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। এঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'হাতেমতাই'।

সদানন্দ মুন্সি—একজন কবি। জাতিতে বৈশ্য। ময়মনসিংহ জেলার রণভাওয়ালের অন্তর্গত উত্তি গ্রামে এঁর নিবাস ছিল। এঁর রচিত গ্রন্থ "দারো শেকো"র বঙ্গানুবাদ। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

সদাশিব কবিরাজ—সম্ভবতঃ চৈতন্য-পার্ষদ। গৌরাঙ্গের সান্ধ্য-কীর্তন-আসরে এবং জগাই-মাধাই উদ্ধার ঘটনায় সদাশিবের উপস্থিতি দেখা যায়। চন্দ্রশেখর আচার্য-ভবনে গৌরাঙ্গের 'গোপীকা নৃত্য' কালে ইনি গৌরাঙ্গ কর্তৃক বুদ্ধিমন্ত খানের সঙ্গে 'কাচ সজ্জ' করবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইনি চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্খায় অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নীলাচল গমন করেছিলেন। ইনি ছিলেন সম্ভবতঃ নিত্যানন্দের শিষ্য। সদাশিবের পুত্রই পুরুষোত্তম, এবং পৌত্র কানু ঠাকুর। সদাশিব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

সনাতন গোস্বামী—চৈতন্য-মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সনাতন। এঁর অপর দুই ভাই-এর নাম রূপ ও অনুপ। বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীজীব গোস্বামী সনাতনেরই ভ্রাতুষ্পুত্র (অনুপের পুত্র)। এঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে এঁদের কোন পূর্ব-পুরুষ বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। সনাতনের পিতার নাম ছিল কুমার। কুমারের নিবাস

ছিল গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি নামক গ্রামে। আনুমানিক ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন আবির্ভূত হন। ইনি বাল্যে অধ্যাপক-শিরোমণি বিদ্যা-বাচস্পতির নিকট সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বুৎপন্ন হয়েছিলেন। প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্য গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ সনাতন ও রূপকে প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত করেন। তখন এঁদের নাম হয়েছিল যথাক্রমে 'সাকরমল্লিক' ও 'দবীরখাস'। রাজমন্ত্রী হবার পরেও এঁরা নিয়মিত শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চা করতেন। ফলে চারিদিকে এঁদের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। সুদূর কর্ণাট দেশ থেকে বহু ব্রাহ্মণ এসে রূপ-সনাতনের নিকট উপস্থিত হতেন। আর রূপ-সনাতন এই সব ব্রাহ্মণদের 'গঙ্গা-সন্নিধানে' বাসস্থান দিতেন। এই-ভাবে 'ভট্টগোষ্ঠী-বাসে ভট্টবাটী নামে গ্রাম' গড়ে ওঠে। নবদ্বীপ থেকেও বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকরা রাম-কেলি গ্রামে যেতেন। রূপ-সনাতনের সহায়তায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে রামকেলি বাংলাদেশের এক বিশেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

উচ্চ রাজপদে সমাসীন থেকেও ভ্রাতৃ-দ্বয়ের মনে শান্তি ছিল না। লোকমুখে নদীয়ায় গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল থেকে রামকেলিতে এসে পৌছলে, সনাতন ও রূপ দুই ভাই রাজপোশাক পরিত্যাগ করে দীনহীনবেশে চৈতন্য-চরণে প্রণত হন। মহাপ্রভু এঁদের প্রতি অত্যন্ত সদয় হন এবং এঁদের নূতন নামকরণ করেন 'সনাতন' ও 'রূপ'। সনাতনের পরামর্শেই মহাপ্রভু বৃন্দাবন না গিয়ে রামকেলি থেকেই নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর থেকে সনাতন দিনরাত্রি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। রাজকার্যে অমনোযোগী হচ্ছেন দেখে বাদ্‌শাহ্‌ হুসেন সাহ সনাতনকে কারাগারে বন্দী করলেন। সনাতন বহু কৌশলে কারামুক্ত হয়ে পদব্রজে কাশীধামে গিয়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে মহাপ্রভু প্রায় দু'মাস ধরে সনাতনকে ভক্তিতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধনা সম্বন্ধে নানা রহস্যের সন্ধান জানিয়ে সুশিক্ষিত করে তুললেন এবং সনাতনের অন্তরে শক্তি-সঞ্চার করে মহাপ্রভু এঁকে আচার্য-পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মহাপ্রভুর সকল চিন্তা ও আদর্শের ধারক এবং বাহক হয়ে তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে গিয়ে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। সেই থেকেই সনাতন আজীবন বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। বৃন্দাবন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যাঁরা প্রথম পথিকৃৎ সনাতন ছিলেন তাঁদের গুরুস্থানীয়। এঁদের প্রচেষ্টায় বৃন্দাবনে

বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত ভাষায় সনাতন ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নাম :

(১) শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও দিগ্‌-দর্শিনী টীকা, (২) শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত ও টীকা, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত এবং (৪) দশম টিপ্পনী বা তোষণী। তাছাড়া, 'লঘুহরিনামামৃত ব্যাকরণ' নামে একখানা গ্রন্থও সনাতনেরই রচনা বলে প্রকাশ। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁর তিরোধান ঘটে।

সনাতন ঘোষাল (বিদ্যাবাগীশ) —কলকাতার ঘোষাল পরিবারের কৃষ্ণানন্দের পৌত্র। কটকে থেকে 'ভাষাভাগবত' নাম দিয়ে ইনি ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। গ্রন্থের নবম স্কন্ধের শেষে আছে :

"কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবন বিদিত রামচন্দ্র॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা।
ভাষাভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা॥"

সনাতন ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁর ভাগবতের রচনা শেষ করেছিলেন। এরপর ইনি আর কোন স্কন্ধ রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না।

সনাতন চক্রবর্তী—একজন কবি। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থখানি বঙ্গবাসী প্রেস হতে মুদ্রিত হয়েছিল এবং এতে আওরঙ্গজেব ও সুজার যুদ্ধ সময়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

সনাতন পণ্ডিত (মিশ্র)—শ্রীচৈতন্যদেবের শ্বশুর এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতা। ইনি কুলেশীলে একজন বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এঁর পিতার নাম ছিল দুর্গাদাস এবং মাতা ছিলেন বিজয়া। এঁর পদবী ছিল 'রাজপণ্ডিত'। ইনি পরম বিষ্ণুভক্ত, সদাচারসম্পন্ন, পরোপকারী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। এঁর পত্নীর নাম মহামায়া। বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন এঁদের একমাত্র কন্যা। সনাতনের উপাধি ছিল মিশ্র।

সন্তোষ দত্ত—বিখ্যাত বৈষ্ণব নরোত্তম ঠাকুরের খুল্লতাত ভ্রাতা। এঁর পিতার নাম পুরোত্তম দত্ত। নরোত্তম ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণানন্দ পরলোক গমন করলে, নরোত্তম সন্তোষ দত্তের হস্তে রাজকার্য পর্যালোচনার ও বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করে স্বয়ং বৃন্দাবনে গমন করেন। কেউ কেউ সন্তোষ দত্তের নাম বসন্ত দত্ত বলেন এবং বলেন যে ইনি শিয়ালা নামক স্থানে বসন্তপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। তার বর্তমান নাম শিয়ালা-বসন্তপুর। নরোত্তম ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষালাভান্তে বৃন্দাবন থেকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করলে তাঁর ইচ্ছাক্রমে রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমন ও রাধাকান্ত নামে ছয়টি বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী এক সুবৃহৎ মহোৎসব হয়, যাহা বৈষ্ণব-জগতে "খেতরীর মহোৎসব" নামে খ্যাত। এই মহোৎসবে দেনুড় থেকে বৃন্দাবন দাস, বুধরী থেকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ, যাজিগ্রাম থেকে শ্রীনিবাসাচার্য ও গোকুলদাস, শ্রীখণ্ড থেকে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার ও একচক্রা থেকে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি মহান্ত, ভক্ত মনোহর দাস, প্রভৃতি পদকর্তা ও কীর্তনিয়ার সমাগম হয়।

সন্ধ্যাকর নন্দী—বরেন্দ্রের পুণ্ড্রবর্ধনপুরে জন্মস্থান। পিতা প্রজাপতি নন্দী ছিলেন পালরাজ রামপালের সান্ধি-বিগ্রহিক মন্ত্রী। সন্ধ্যাকর ১০৭৫-১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'রামচরিত', চারিটি পরিচ্ছদে রচিত। আর্যাছন্দে রচিত শ্লোকের সংখ্যা ২২০। কাব্যটি শ্লেষাত্মক ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। কবি এক অর্থে রামায়ণের রামচন্দ্রের কাহিনী, এবং অপর অর্থে পালরাজ রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাহিনী যুগপৎ বর্ণনা করেছেন। সন্ধ্যাকর আত্মপরিচয়ে নিজেকে 'কলিকাল-বাল্মীকি' অলংকারবিদ্ সুনিপুণ কবি এবং কুশলী ভাষাবিদ্ বলে ব্যক্ত করেছেন।

সর্ফতোল্লা—বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম। ইনি চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত ওশখাইন গ্রামের অধিবাসী। প্রসিদ্ধ কবি আলিরাজা বা কানুফকির ছিলেন এঁর পিতা। আলিরাজার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান কবি সর্ফতোল্লা। ইনিও পিতার ন্যায় বহু সংগীত রচনা করেছিলেন।

সবাই ঢালী—পুরোনাম সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। যশোহরের অন্তর্গত আলতাপোলের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পূর্বপুরুষ। ইনি শাণ্ডিল্য বন্দ্যঘটীবংশীয় মকরন্দের অষ্টম অধস্তন বংশধর এবং কুলীন শ্রেষ্ঠ চতুর্ভুজের পুত্র। ইনি প্রতাপাদিত্যের একজন সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপের অন্য সেনাপতি সুন্দরমল্ল সবাই-এর সহোদর ভ্রাতা।

সবিতা রায়—মুর্শিদাবাদ জেলার ফতেসিংহ রাজবংশের আদি-পুরুষ। ইনি দীক্ষিত উপাধিধারী ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বিদ্রোহী রাজাদের দমন করার জন্য দিল্লীশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে রাজা মানসিংহ যখন বাংলায় আসেন (১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ), তখন পশ্চিম থেকে প্রতাপশালী সবিতা রায় মানসিংহের সাহায্যার্থে দুই পুত্র ও চার পৌত্রসহ বঙ্গদেশে এসেছিলেন। কাছাড়, কোচবিহার ও খরগপুর যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করে সবিতা রায় মানসিংহের বিশেষ প্রীতির পাত্র হন। এবং মানসিংহ এঁকে দিল্লী নিয়ে গিয়ে

বাদশাহের প্রদত্ত ভূমি ভোগের সনন্দ দেন। পরে মুর্শিদাবাদের হাড়ি রাজা ফতেসিংহকে পরাজিত করে ফতেসিংহ পরগণার অধিকার লাভ করেন।

সভানর—চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি কর্তৃক বঙ্গে নির্বাসিত পুত্র অনুর পুত্র। অনুর মৃত্যুর পর ইনি বঙ্গের রাজা হন। অবস্থিতিকাল বৈদিক যুগ।

সমসুউদ্দিন ইউসুফ—বার্বক-শাহের পর তৎপুত্র সমসুউদ্দিন ইউসুফ বাংলার সুলতান হন। নিজামউদ্দিন ও ফিরিস্তা উভয়েই বলেন, সমসুউদ্দিন শিক্ষিত, ধার্মিক ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। মালদহে পাণ্ডুয়াতে ইনি সম্ভবত সোনা মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সমসুউদ্দিন ইউসুক সাহের শিলালিপিই শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আরবী শিলালিপি। এতে মনে হয় এই সময়েই শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুরাজা গৌড়-গোবিন্দ পরাজিত হয়েছিলেন। ১৪৭৪-৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমসুউদ্দিন বাংলার সুলতান ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

সমাচার দেব—এঁর এক তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে চতুর্দশ সংবৎসরে (ষষ্ঠ শতাব্দী) তিনি গৌড়ের মহারাজাধিরাজ ছিলেন এবং স্থাণু দত্তকে অন্তরঙ্গ উপরিখ নিযুক্ত করেছিলেন। ইনি ছিলেন গুপ্ত রাজপুরুষগণের বংশধর। সপ্তম শতাব্দীতে ইনি পূর্বভারত শাসন করতেন।

সমীরাচার্য—অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। এঁর রচিত তন্ত্রগ্রন্থ 'গোবিন্দকল্পলতা।'

সমুদ্র সেন—একজন বঙ্গরাজ। মহাভারতের যুগে ইনি অবস্থান করছিলেন। কথিত আছে এঁর পুত্র 'প্রতাপবান' চন্দ্রসেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অশ্ব এঁর রাজ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ইনি তার গতিরোধ করেন। তাতে পরাজিত হলে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেন। সুতরাং এঁর অবস্থিতিকাল এখন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে।

সরফরাজ খাঁ—বাংলার সুবিখ্যাত নাবব আলীবর্দী খাঁর দৌহিত্র এবং সুজাউদ্দীনের পুত্র। এঁর মাতার নাম জিন্নেতুন্নেসা। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হলে সরফরাজ খাঁ বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। ইনি ১৭৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র প্রায় এক বছর রাজত্ব করেন। ইনি অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। এঁর অন্দর মহলে ১৫০০ রমণী ছিল। তাদের নিয়ে নবাব প্রমত্তাবস্থায় দিন যাপন করতেন। তবে ইনি কখনো সুরাপান করতেন না। কোন সুন্দরী রমণীর কথা শুনলে ইনি অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন।

জগৎ শেঠের এক পৌত্র মহাতাপ রায়ের সঙ্গে একাদশ বর্ষীয়া এক অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যার বিবাহ হয়েছিল। বালিকার অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শুনে নবাব সরফরাজ তাকে একবার শুধু দেখবার জন্য নবাবের অন্তঃপুরে বালিকাবধূকে পাঠাতে বাধ্য করেন। নবাব এ ক্ষেত্রে ব্যভিচার করার কোন সুযোগ পান নি। সিংহাসনে আরোহণ করেই সরফরাজ ইরান নৃপতি নাদির সাহের আক্রমণে দিল্লীর দুরবস্থার কথা শুনে ভয়ে বাংলার তিন সনের বাকী খাজনা নাদির সাহকে পাঠিয়ে দেন। শুধু তাই নয় নাদির সাহের নামাঙ্কিত করে ইনি মুদ্রার প্রচলন করেন। এর ফলে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ সাহ এঁর প্রতি বিরূপ হন এবং তিনি আলীবর্দীকেই নবাবীপদে অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত করেন।

পিতা সুজাউদ্দীন মৃত্যুর সময় সরফরাজকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে ইনি যেন হাজি আহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠকে বিশ্বাস ও মান্য করে চলেন। প্রথম প্রথম নবাব এই তিনজনের কথামতো চলতেন। কিন্তু পরে স্বেচ্ছাচারী হয়ে তাঁদের অমান্য করতে আরম্ভ করেন। পাটনার শাসনকর্তা আলীবর্দীকেও ইনি বিশেষ আমল দিতেন না। বাংলার মসনদের প্রতি আলীবর্দীরও যথেষ্ট লোভ ছিল। তিনি গোপনে দিল্লীর সম্রাটের কাছে বাংলার গদি দখলের নিয়োগপত্র পেয়ে একদিন অতর্কিতে আলীবর্দী নবাব সরফরাজকে আক্রমণ করলেন। সরফরাজ অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করেন। কিন্তু সেনাপতি ও অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইনি যুদ্ধক্ষেত্রেই গোলার আঘাতে নিহত হন। রাজকার্যে অনভিজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতা ও বিলাসিতাই সরফরাজের চরিত্রের দোষ ছিল। ইনি ধর্মপ্রবণ ও উদার প্রকৃতির ছিলেন।

সরহপাদ—একজন বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য। ইনি নাকি রত্নপাল নামক কোন রাজাকে স্বীয় মতাবলম্বী করেন। ইনি উড়িষ্যা থেকে মন্ত্রযান শিক্ষা করেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়ে সিদ্ধাচার্য হন। তখন ইনি 'সরহপাদ' নামে খ্যাত হন। এঁর আবির্ভাবকাল অষ্টম শতাব্দী। 'তেঙ্গুর' গ্রন্থমালায় সরহপাদের রচিত বলে প্রায় ৩৫ খানি তান্ত্রিকগ্রন্থ, ছ'খানিরও অধিক দোহাকোষগীতি ও চর্যাগীতি এবং 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত চারিটি পদ পাওয়া গিয়েছে। সরহ ছিলেন অতীশের ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ গুরু। সিদ্ধাচার্য শবরপাদ সরহের শিষ্য ছিলেন।

সর্বানন্দ গোস্বামী—কোচবিহারের কামতাপুরের রাজার রাজগুরু। রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ বিকৃতমস্তিষ্ক হলে তাঁর প্রধানা মহিষী মহারানী কামতেশ্বরী দেবী যাবতীয় রাজকার্য নিজহস্তে গ্রহণ করেন এবং

রাজগুরু এই সর্বানন্দের সহায়তায় পরিচালনা করেন। সর্বানন্দের উপর মহারানীর বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি গোস্বামীকে বিশ্বস্ত এবং রাজ-পরিবারের অকৃত্রিক হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জন বলে মনে করতেন। এই অবস্থায় গোস্বামী রাজ্যশাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ ইনি রাজমন্ত্রী ও মহারানীর 'মোখতার' (প্রতিনিধি) বলে পরিচিত হন। সর্বানন্দ গোস্বামী বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। স্বকর্মসাধনে এঁর এরূপ দক্ষতা ও দৃঢ়তা ছিল যে, প্রতিপক্ষগণ এঁর নিকট প্রায়ই পরাভূত হতেন। সর্বানন্দ পরে বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁর আত্মপরিচয়ে নিজেকে আর্তিহরপুত্র ও বন্দ্যঘটীয় বলে বর্ণনা করেছেন। 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র উপর সর্বানন্দের বিখ্যাত টীকার নাম 'টীকাসর্বস্ব'। গ্রন্থখানি বাংলার গৌরব। এই গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বাংলা ভাষার তদ্ভব ও দেশী শব্দের উল্লেখ আছে। এই শব্দগুলির মধ্যে কতক অবিকৃতভাবে এবং কতক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে আজও বাংলা ভাষায় বিদ্যমান। গ্রন্থের রচনা-কাল ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ। সর্বানন্দ বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

সর্বেশ্বর মল্ল উগাল ষণ্ডদেব—মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ছিলেন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। কথিত আছে, ইনি ফতেপুর সিক্রি থেকে পুরীধামে তীর্থ করতে এসে ফিরবার পথে নিজের অসীম সাহস ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এঁর প্রভূত শারীরিক বলের জন্য ইনি মল্লদেব এবং উগাল ষণ্ডদেব নামে অভিহিত। এঁর বংশধরেরা আজও এই উপাধি ধারণ করে থাকেন।

সহদেব চক্রবর্তী—'অনিল-পুরাণ' ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা। রচনা-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। কবির পিতামহের নাম রাজারাম, পিতা বিশ্বনাথ, অগ্রজ মহাদেব। নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিগড় পরগণায় রাধানগর (নামান্তর নন্দনবাটী) গ্রামে। অনিলপুরাণে ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান উপজীব্য লাউসেন-কাহিনী নেই। হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর পুত্র লুইচন্দ্রের প্রাচীনতম কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া, প্রাচীনতম লোকদেবতা শিবসম্বন্ধীয় নানা লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী, নাথ-সম্প্রদায়-ভুক্ত মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী ও অন্যান্য পুরাণ কাহিনীর বর্ণনা ও পাওয়া যায়। কবি কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন।

সাকরমল্লিক—সনাতন গোস্বামীর অপর নাম। সনাতন গোস্বামী দ্র°।

সাকের মামুদ—অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। মনোহর-মধু-মালতী কাব্যের অনুসরণে ইনি বাইশ বছর বয়সে কাব্য রচনা করেন। কবির নিবাস ছিল সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত মুক্তিপুর পরগণায় রিকাইতপুর গ্রামে। পিতার নাম সেখ মামুদ, পিতামহ কাবিল।

সাগর নন্দী—ইনি সংস্কৃত ভাষায় একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকটিব নাম—'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ'। রচনাকাল ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বহু বাঙালী নাট্যকারের নাট্য রচনার উল্লেখ আছে।

সাজাহান—সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিবদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সাজাহান বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ইনি ঢাকায় এসে বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তার সম্পত্তি ও সরকারী রাজস্ব হস্তগত করেছিলেন। তারপর পাটনা জয় করে রোটাস গড় দুর্গ দখল করেন। দরাব নামক কোন ব্যক্তিকে ইনি এই সময় বঙ্গদেশের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহের পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে এর প্রীতির ভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬২২-২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাহাজান বঙ্গদেশে অবস্থান করেছিলেন।

সাদেক আলি—সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। ইনি বৈষ্ণব ঢঙে পদাবলী রচনা করেছিলেন। এঁর অপর কাব্য-গ্রন্থ 'রামচন্দ্রের বনবাস'।

সাবিরিদ খান—ষোড়শ শতাব্দীর একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান কবি। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে ইনি একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে এঁর কয়েকখানি খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। তাতে কবির প্রদত্ত আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায়—এঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন জিঠাকুর। তিনি তিনসিকের সরকার ছিলেন। এই তিনসিক পরগণা হয়ত নোয়াখালি জেলাতেই অবস্থিত ছিল। কবি সাবিরিদ সম্ভবতঃ নোয়াখালি জেলার অধিবাসী। আবার কারুর কারুর মতে এঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের রোসাঙ্ অঞ্চলে। সাবিরিদ খান বিদ্যাসুন্দরের অন্যতম কবি শ্রীধর কবিরাজকে অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয়। সাবিরিদ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। শ্রীধরের মতো ইনিও সংস্কৃত বচনিকা এবং স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক এঁর কাব্যমধ্যে স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এঁর ভাষা একান্ত সংস্কৃতানুগ এবং আরবি-পারসির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের

কাছাকাছি সময়ে এঁর কাব্যখানি রচিত হয়।

এঁর রচিত কাব্য—'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুলবিজয়' ও 'হানিফা কয়রাপরী'।

সামন্ত সেন—দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হতে আগত। পাল-রাজাদের অবনতির সময় একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইনি রাঢ় দেশে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। ইনি বহু যুদ্ধে স্বীয় শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করে জনপ্রিয় হন। সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হেমন্তসেনের উপর রাজ্যভার দিয়ে আরণ্য আশ্রম জীবন যাপন করেন।

সারঙ্গ ঠাকুর—নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ জান্নগড় গ্রামনিবাসী শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ। অতি বৃদ্ধ বলে মহাপ্রভু এঁকে শিষ্য সংগ্রহ করে তাঁর সেবিত গোপীনাথ বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করতে আদেশ দেন। এই অনুযায়ী স্থির হল পরদিন প্রভাতে উঠে সারঙ্গ প্রথমে যাকে দেখবেন, তাকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন। পরদিন প্রত্যুষে সারঙ্গ গঙ্গাস্নান করবার সময় দ্বাদশবর্ষীয় এক ব্রাহ্মণকুমারের এক মৃতদেহ এঁর অঙ্গস্পর্শ করল। তখন মহাপ্রভুর আদেশ স্মরণ করে ইনি ঐ মৃত বালকের কর্ণে মন্ত্র দিলেন। বালক ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করলেন। এই বালকের সর্প দংশনে মৃত্যু হয়েছিল। প্রাণ পেয়ে বালক মুরারি জান্নগড়ে সারঙ্গ ঠাকুরের শ্রীপাটে অবস্থান করেন।

সারল (বা **সারলাদাস** বা **সারণ**)—একজন কবি। দক্ষিণরাঢ়-প্রান্তনিবাসী। ইনি যে ভারত-পাঁচালী লিখেছিলেন তার আদি ও বিরাট প্রভৃতি কোন কোন পর্ব পাওয়া গেছে। তাঁর কাব্য রাঢ় উৎকল সীমান্তে জন-সমাদৃত হয়েছিল। ফলে এই গ্রন্থের উৎকল ভাষা ও লিপিতে লিখিত পুঁথিও পাওয়া যায়। কবি খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর কয়েকটি ভণিতা এইরূপ :

"গাইলো সারল কবি উৎকলব্রাহ্মণ"

"বিরাট-পর্ব্ব ভারত সারল কবি ভণে"

সারাই আচার্য—চন্দ্রদ্বীপের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় ও তৎপুত্র রাজা রামচন্দ্র রায়ের দেওয়ান। ইনি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও নির্ভীক বলে বিখ্যাত ছিলেন। অবস্থিতিকাল যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—নীলাচল বা পুরীর বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক পণ্ডিত। জীব থেকে ঈশ্বরকে পৃথক মনে করতেন না। এবং অবতার মানতেন না। ইনি ছিলেন ঘোর মায়াবাদী। পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞান-গরিমায় তৎকালে নীলাচলের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নিকট বিচারে পরাস্ত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

সালবেগ—একজন বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। ইনি উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন। জানা যায় যে, পাঠানরাজের এক মুসলমান সেনাধ্যক্ষ বলপূর্বক জনৈকা হিন্দু বিধবাকে গ্রহণ করেন। উক্ত সেনাধ্যক্ষের ঔরসে ঐ হিন্দু বিধবার গর্ভে সালবেগের জন্ম হয়। সালবেগ পরবর্তী জীবনে একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলে পরিগণিত হন। এঁর রচিত তিনটি পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্‌ধৃত হয়েছে। সালবেগের পদ উড়িষ্যার মন্দিরে এখনো নাকি গীত হয়। এই উড়িয়া কবির পদ বাঙালী বৈষ্ণবদের নিকট বিশেষ আদরের বস্তু বলেই বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে স্থান পেয়েছে। কারুর কারুর মতে সালবেগ এঁর মাতার মৃত্যুর পর ব্রজমণ্ডলে চলে যান এবং তথায় স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন।

সাহ আবদুল্লা—ঘোষটিকুরী গ্রামের সিদ্ধ ফকির। বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামের পায়ুয়া গোপালের প্রভাবে ইনি মুগ্ধ হন।

সাহাবাজ খাঁ—দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহ কর্তৃক সাহাবাজ খাঁ ১৫৮৩-৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং বাংলার বিদ্রোহী ভুঞা ও পাঠানদের বশ্যতা স্বীকার করান।

সিংহবর্মা—প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত যখন বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বাংলাদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী সুসুনিয়া নামক স্থানে পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত একখানি লিপি থেকে অনুমিত হয় যে সিংহবর্মা পুষ্করণের অধিপতি ছিলেন। সুসুনিয়ার পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে দামোদর নদের দক্ষিণ তটে পোখর্ণা নামে একটি গ্রাম আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে খুব সম্ভব উহাই সিংহবর্মার প্রাচীন রাজধানী পুষ্করণের ধ্বংসাবশেষ। সিংহবর্মার পুত্রের নাম চন্দ্রবর্মা। তিনিও এই রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। চন্দ্রবর্মা দ্র°।

সিংহবাহু—সিংহল দেশীয় মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আখ্যান থেকে জানা যায় যে বঙ্গদেশের এক রাজা কলিঙ্গরাজার দুহিতাকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দৈবজ্ঞেরা গণনা করে বলেন যে, এই কন্যা সুসিমার সঙ্গে পশুপতির মিলন হবে। সুসিমা অতি সুন্দরী ও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে একদিন কুমারী রাজকন্যা মগধের পথে যাত্রা করেন। পথে এক সিংহ কর্তৃক তিনি অপহৃতা হন এবং সিংহের গুহায় পশুরাজের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। ফলে রাজকুমারীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছেলেটির হাত ও পা কতকটা সিংহের মতো ছিল বলে সুসিমা তার নাম রাখেন সিংহবাহু। কন্যার নাম হয় সিংহসিবলী।

কয়েক বছর সিংহের সঙ্গে বাস করার পর সুসিমা পুত্র কন্যা নিয়ে পালিয়ে আসেন এবং বঙ্গদেশের সেনাপতি অনুরকে বিবাহ করেন। কালক্রমে বঙ্গরাজের মৃত্যু হলে অপুত্রক রাজার মন্ত্রিগণ সিংহবাহুকে রাজা হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সিংহবাহু তাঁর মাতার স্বামী অনুরকে রাজপদে বরণ করে রাঢ়দেশে গমন করেন। সেখানে তিনি "সিংহপুর" নামক নগর প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য স্থাপন করেন এবং সিংহসিবলীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে রানী ষোলবার প্রসব করেন এবং প্রত্যেক বারই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠের নামই বিজয়সিংহ, যিনি তাঁর দুশ্চরিত্রতার জন্য পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে লঙ্কাদ্বীপ জয় করেন এবং পিতার নামানুসারে দ্বীপের নাম রাখেন সিংহল। বর্তমান সিঙ্গুর বা সিঙ্গুর গড়কে অনেকেই সিংহবাহুর সিংহগড় বলে অনুমান করে থাকেন। খুব সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহবাহু অবস্থান করছিলেন।

সিকন্দর শাহ—শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধীকারীই সিকন্দর শাহ। পিতার মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। সিকন্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে ফিরোজের অভিযানকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন। পিতা ইলিয়াসের ন্যায় তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে ফিরোজ শাহের কাছে স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

সিকন্দরের প্রধান কীর্তি বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ। স্থাপত্য সৌকর্যের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মস্‌জিদের মধ্যে এইটি আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও বহু হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি হিন্দুদের প্রতি বিশেষ উদার ছিলেন বলে মনে হয় না।

সিকন্দরের রাজত্বকাল বেশ শান্তিতেই কেটেছিল। কিন্তু শেষে তাঁর দুই স্ত্রীকে নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়। প্রথমা স্ত্রীর ছিল সতেরটি সন্তান এবং দ্বিতীয়ার ছিল একটি—নাম গিয়াসুদ্দীন। সিকন্দর গিয়াসুদ্দীনকে অত্যন্ত আদর করতেন। ফলে প্রথমা পত্নী গিয়াসুদ্দীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। গিয়াসুদ্দীন বিমাতার ষড়যন্ত্র টের পেয়ে সোনার গাঁয়ে গিয়ে বিদ্রোহী হন। সিকন্দর বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। ইনি শিল্পানুরাগী ছিলেন। ইনি বহু প্রাসাদ, মিনার, হামাম ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তবে বহু হিন্দু মন্দির-ধ্বংস করেই এগুলি গঠন করেন। ইনি

বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

সিতাব বা সেতাব রায়—বাংলায় মুসলমান শাসনের শেষভাগে ও ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে ইনি ছিলেন বাংলার প্রসিদ্ধ রাজকর্মচারী। ইনি ছিলেন শকসেন বংশীয় কায়স্থ। দিল্লীতে এঁর জন্ম হয়েছিল। পরবর্তী কালে বাংলায় এসে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী গ্রহণ করে এঁকে পাটনার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং এঁর উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। পরবর্তী-কালে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের বিষনজরে পড়ে ইনি কলকাতায় বিচারের জন্য আনীত হন। এবং বিচারে নির্দোষী সাব্যস্ত হন।

সিদ্ধকৃষ্ণ দাস—গোবর্ধনবাসী সিদ্ধ মহাত্মা। এঁর রচিত গ্রন্থ—'ভাবনাসার-সংগ্রহ', 'গুটিকাপদ্ধতি', 'প্রার্থনামৃততরঙ্গিণী।'

সিদ্ধান্ত সরস্বতী—ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) সভাপণ্ডিত। রাজার নির্দেশে 'নারদীয় পুরাণ' অনুবাদ করেছিলেন।

সিদ্ধি নরসিংহ মল্ল—নেপালের ললিতাপুরের রাজবংশজ লেখক। এঁর রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটক'-এর পদ্যাংশের ভাষা ছিল বাংলা। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

সিরাজউদ্দৌলা—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবিখ্যাত নবাব আলীবর্দী খাঁর দৌহিত্র। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর (১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল) ইনিও বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হয়েছিলেন। এঁর পিতার নাম জইনুদ্দীন আহম্মদ খাঁ, মাতার নাম আমিনা বেগম। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয় মুর্শিদাবাদে। ইনি এঁর দাদমশাই আলীবর্দীর অত্যধিক স্নেহে বেড়ে উঠেন। স্নেহান্ধ আলীবর্দী দৌহিত্রের শত অপরাধও উপেক্ষা করে চলতেন। এরই ফলে সিরাজ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। এই উচ্ছৃঙ্খলতাই তাঁর ও বাংলা দেশের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ।

আলীবর্দী তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজউদ্দৌলাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। আলীবর্দীর মৃত্যুর পরেই ইনি নবাব হয়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। সিরাজ প্রাচীন কর্মকর্তাদের কয়েকজনকে বিদায় দিয়ে স্বীয় মনোনীত দু'তিন জন বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারীকে সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করেছিলেন। যেমন, মীরমদন ও মোহনলাল। মোহনলালকে ইনি "মহারাজা" উপাধি দিয়ে সর্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন। আর মীরমদন ছিলেন দ্বিতীয় ওমরাহ। সিরাজ যাদের অবিশ্বাস করতেন

তাঁদের অনেকেই আলীবর্দীর সময় থেকেই অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পরে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। সিরাজের আপন মাসী ঘসেটী বেগমই ওমরাহদের সাহায্যে সিরাজকে গদিচ্যুত করার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেছিলেন। সিরাজ সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে ঘসেটিকে বন্দীবাসে প্রেরণ করেন। প্রথম থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের দ্বন্দ্ব বাধে। কলকাতার ইংরেজ শিবির বহু বিশ্বাসঘাতক আমীর ওমরাহের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, মিরজাফর, দুর্লভরাম প্রভৃতি নানা কারণে সিরাজের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ইংরেজদের সহায়তায় সিরাজকে অপসারিত করে মীরজাফরকে মসনদে বসাবার ফন্দী করলেন। তাঁরা নবাবের নামে নানা দোষ সাধারণের নিকট প্রচার করে তাঁকে সর্বজননিন্দিত ও সকল লোকের অপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন পলাশী প্রান্তরে এক আম বাগানে ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ তো নয়, যুদ্ধের অভিনয়। সিরাজের বাহিনীতে ছিল ৫০০০০ পদাতিক, ১৮০০ সুদক্ষ অশ্বারোহী। তাদের হাতে ছিল বন্দুক, ধনু, বোমা ইত্যাদি। তাছাড়া, ৫০টি কামান ছিল। তাদের মধ্যে এক একটিতে ২৪ থেকে ৩২ পাউণ্ড বারুদ ধরত। ইংরেজ বাহিনীতে ছিল ৮০০ পদাতিক, ১০০ কামান-চালক এবং ৫০ জন কামান নিয়ে যাবার নৌসেনা। এই কামানগুলির এক একটিতে মাত্র ছ' পাউণ্ড করে বারুদ ধরত। এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজ বাহিনীর তো ফুৎকারে উড়ে যাবার কথা। কিন্তু সিরাজ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের অভাবনীয় বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটল। ইংরেজ পক্ষের প্রধান ছিলেন ধূর্ত ক্লাইভ। মীরজাফরের নিষ্ক্রিয়তায় সিরাজের সৈন্যদল পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। আর ইংরেজদের জয় হতে লাগল। একমাত্র নবাবের একান্ত বিশ্বস্ত মীরমদন ও মোহনলাল সেনানায়কদ্বয় নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইংরেজদের এক গোলার আঘাতে মীরমদন মারা গেলে মোহনলাল বীরবিক্রমে ইংরেজদের আক্রমণ করেন। সিরাজের পক্ষে জয় যখন সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, তখন মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলেন। মোহনলাল তীব্রস্বরে এর প্রতিবাদ করলেন; কিন্তু অসহায় সিরাজের করার কিছুই ছিল না। বীর মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। মাত্র একদিনের কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধের অভিনয়। তারপরেই ২৩ জুন সিরাজের পরাজয় হল।

সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্ত্রী বেগম লুৎফউন্নেসাকে নিয়ে সিরাজ ২৪ জুন রাত্রে মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ২৯ জুন মীরজাফরের পুত্র মীরণের অনুচরদের হাতে ভগবানগোলা নামক স্থানে ইনি ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে নীত হন। তিন ঘণ্টার মধ্যেই মীরণের এক দুরাত্মা অনুচর মহম্মদীবেগ সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা কারাকক্ষে হতভাগ্য সিরাজকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তারপর তাঁর ক্ষত-বিক্ষত বিচ্ছিন্ন দেহকে হস্তীপৃষ্ঠে চড়িয়ে মুর্শিদাবাদের রাজপথ প্রদক্ষিণ করান হয়। পরিশেষে তাঁর মৃতদেহ খোসবাগের সমাধি মন্দিরে আলীবর্দীর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন সিরাজের পরাজয় বাঙালী তথা ভারতবাসীর কপালে দাসত্বের যে কলঙ্কতিলক এঁকে দিয়েছিল তা পরবর্তী প্রায় দু'শ বছর ধরে সমগ্র জাতিকে ধারণ করতে হয়েছিল। সিরাজকে বিভিন্ন গ্রন্থে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও স্বৈরাচারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে বাস্তবিকই তিনি তা ছিলেন না। তাঁর তেজ বিক্রম, বুদ্ধি সবই ছিল। এতো অল্প বয়সে এরূপ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও লোকচরিত্র বুঝবার শক্তি বোধ হয় আলীবর্দীরও ছিল না। তাঁর দোষ ছিল তিনি মাতামহের অত্যধিক আদরে মানুষ হওয়ায় যা ইচ্ছা তাই করতেন। চারদিকে লোকজনকে হীনভাবে দেখতেন। আলীবর্দীর মতো অমায়িক ব্যবহার দ্বারা শত্রুকেও বশে রাখবার কৌশল তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি।

সিরাজুদ্দিন ওসমান—একজন পীর। ইনি এদেশে পীরানেপীর অর্থাৎ পীরের পীর নামে বিখ্যাত। বাল্যকালে সিরাজুদ্দিন দিল্লীর প্রসিদ্ধ পীর নিজামুউদ্দিন আউলিয়ার নিকট আসেন। যথার্থ সুশিক্ষিত হলে নিজামুউদ্দিন এঁকে হিন্দুস্থানের দর্পণ বলতেন। নিজামের আদেশানুসারে ইনি বাংলায় আগমন করেন। গৌড়ের রাজা এঁর শিষ্য হয়েছিলেন। এখানে ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

সীতাদেবী—অদ্বৈতমহাপ্রভুর পত্নী। সীতাদেবীর জীবনীগ্রন্থ 'সীতাগুণকদম্বে' লিখিত আছে:

"ভাদ্র মাসে সিত পক্ষে
জন্মে চতুর্দশীতে।
সেইহেতু সীতানাম হইলা জগতে।"

সীতাদেবীর পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মত আছে। 'সীতাগুণকদম্বে'র রচয়িতার মতে ইনি ছিলেন গোবিন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের পালিতা কন্যা। অদ্বৈত আচার্য একদিন গঙ্গাতীরে এলে সীতাদেবীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় জন্মে এবং পরে উভয়ের শুভ পরিণয় হয়। 'প্রেমবিলাস,' 'ভক্তি-রত্নাকর,' 'অদ্বৈতমঙ্গল,' অদ্বৈতপ্রকাশ' অনুযায়ী অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী সপ্ত-

গ্রামের নিকটবর্তী নারায়ণপুর নিবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা ছিলেন। নৃসিংহের শ্রীদেবী নামে আর এক কন্যা ছিল। উভয় ভগিনীর সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের বিবাহ হয়। বিবাহের পর সীতাদেবী ও শ্রী উভয়েই অদ্বৈত কর্তৃক দীক্ষিতা হয়েছিলেন। বিবাহের পর অদ্বৈত আচার্য পত্নীদের মাঝে মাঝে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে নিয়ে যেতেন। গৌরাঙ্গ আবির্ভাবকালে সীতাদেবী নবদ্বীপেই অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় ইনি শ্রীবাস আচার্য ও জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সূত্রে ইনি বালক গৌরাঙ্গের মাতৃস্থানাভিষিক্তা হয়ে উঠেছিলেন। তাই 'চৈতন্যভাগবত'কার লিখেছেন :

"অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বোলে মাতা।"

স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সীতাদেবী গৌরাঙ্গের পরিচর্যা করতেন এবং তাঁকে নানা দ্রব্য ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। তাঁর গর্ভে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, স্বরূপ ও জগদীশ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি ছিলেন অসামান্যা পতিব্রতা রমণী ও স্নেহময়ী জননী। অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে সীতাদেবী একাধিক বার নীলাচলে যান এবং অপত্যস্নেহে মহাপ্রভুকে নিকটে বসিয়ে আহারাদি করিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধান-বার্তা শুনে ইনি শোকাভিভূতা ও মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন। এঁর জীবিতকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

সীতারাম দাস—ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস্ গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। পিতৃনিবাস ছিল সুখসায়ের গ্রাম। কবির পিতার নাম দেবীদাস,—জাতিতে এঁরা ছিলেন কায়স্থ। 'গৃহ-দেবতা' 'গজ লক্ষ্মীমা'র স্বপ্নাদেশে কবি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

"শিওরে বসিল মোর গজ লক্ষ্মীমা।
উঠ বাছা সীতারাম গতী লেখ গা।"

গ্রন্থ-রচনাকাল ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। সীতারামের রচনা ছিল প্রাঞ্জল ও সরল। কবি সীতারাম একখানি মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা করেছিলেন ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে। সীতারাম অল্প বয়সে মনসা-মঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের গায়ন হয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়।

সীতারাম ভাট—ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কর্তৃক আহূত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে একাদশ জন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পরে হ্যালহেড কর্তৃক Code of Gentoo Laws নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

সীতারাম রায়, রাজা—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর

প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গের এক বৃহৎ ভূ-ভাগের অতি শক্তিশালী অধিপতি। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কল্যাণগঞ্জ থানায় গিধিনা নামক গ্রামে সীতারামের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল। সীতারাম জাতিতে ছিলেন উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। সীতারামের ঊর্ধ্বতন একাদশ পুরুষের নাম রামদাস দাস। এই রামদাস মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধ করে গজদান করায় গজদানী উপাধি পেয়েছিলেন। সীতারামের প্রপিতামহ রামরাম দাস রাজমহালের নবাব সরকারের খাস সেরেস্তায় কোন রাজ-পদে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করে বিশ্বাস-খাস উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্র রাজমহলের কোন উচ্চ পদে সমাসীন হয়ে রায়-রাঁয়া উপাধি লাভ করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়নারায়ণ প্রথমে রাজমহলে পিতৃপদে থেকে রায়-রাঁয়া উপাধিতে ভূষিত হন। পরে তাঁর কার্যকুশলতা দেখে তাঁকে নবাব ইব্রাহিম খাঁর অধীনে ঢাকার রাজকার্যে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তিনি ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্মচারী ছিলেন। উদয়-নারায়ণ ভূষণার নিকটে একটি তালুক ও বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শ্যামনগর জোত বন্দোবস্ত করে নিয়ে-ছিলেন। ১৬৫৭ বা ৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মাতামহালয় মহীপতিপুর গ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। মাতামহালয়েই সীতারামের বাল্যশিক্ষা হয়েছিল। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ছিল এই মহীপতিপুর।

মহম্মদ আলী নামক এক ফকীরের নিকট সীতারাম আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। কিছু কিছু সংস্কৃতও তিনি জানতেন। স্ত্রী-বিয়োগান্তে এই ফকীর সীতারামের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়ে তাঁর নিকট বাস করেন এবং সীতারামের প্রধান মন্ত্রদাতার কাজ করতেন। অস্ত্রবিদ্যায় বাল্যকালেই সীতারাম বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। শতাব্দীর শেষের দিকে সীতারামের অভ্যুদয় ঘটে। বিদ্রোহী করিম খাঁকে পরাজিত করে সীতারাম নবাব সায়েস্তা খাঁর সুনজরে পড়েন। সায়েস্তা খাঁ সন্তুষ্ট হয়ে সীতারামকে ভূষণার অধীন নলদী পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। তখন মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরা দেশের মধ্যে ভীষণ অত্যাচার করত। সীতারাম তাদের নির্মম হস্তে দমন করে প্রজাদের জীবন সুখী ও নিরাপদ করেছিলেন। দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে তিনি রাজা উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। মহম্মদপুরে তিনি রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। জ্ঞানী, গুণী ও ও পণ্ডিতদের সীতারাম যথেষ্ট সমাদর করতেন। মেনাহাতী, মেলাহাতী বা মৃণ্ময় সীতারামের সেনাপতি ছিলেন।

এই মেনাহাতীই সীতারামের দস্যু-দমনাদি সমস্ত সৎকর্মের ও রাজ্য-বিস্তারের পরম সহায় ছিলেন। সীতারামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে ইনি এঁর সৈন্যদলে বাঙালী ছাড়া অন্য কোন সৈনিক গ্রহণ করেন নি। বাঙালীর বীরত্বের ইনি যোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। সীতারামের মন সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকদোষমুক্ত ছিল। হিন্দুমুসলমানকে ইনি সমান চোখে দেখতেন।

সীতারাম ক্রমশঃ এঁর রাজ্যবিস্তার করে চলছিলেন। এর রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হতে আরম্ভ করে বঙ্গোপ-সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত রাজ্য ৪৪টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং তখনকার দিনে এর আয় ছিল এক কোটি টাকার বেশী। সীতারাম কখনো মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলীর কাছে ইনি কোন রাজস্ব পাঠাতেন না। কিছুকাল পরে সীতারামের এই স্বাধীন মনোভাব মুর্শিদের অসহ্য হয়ে উঠল। ফলে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে ফৌজদার তরপ খাঁ মেনাহাতীর হাতে নিহত হলেন। গুপ্ত গুণ্ডার দ্বারা মেনাহাতী নিহত হলে সীতারাম একক সংগ্রাম করেন। কিন্তু স্বজনদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইনি বন্দী হয়ে মুর্শিদাবাদে নীত হন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে সীতারাম তথায় নিহত হন।

শৈশব থেকেই সীতারাম শিবাজীর মতো সার্বভৌম হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সীতারাম শিল্পের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। ইনি বহু দুর্গ ও কামান তৈরী করেছিলেন। 'কালু খাঁ' ও 'ঝুমঝুম খাঁ' নামক কামান বহু বিখ্যাত। ইনি বহু পুষ্করিণী ও দীঘি খনন করিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় দীঘি "রামসাগর" ও "সুখসাগর"। এই সব দীঘিতে "ময়ূরপঙ্খী" ভাসিয়ে ইনি নৌবিহার করতেন। সীতারামের রাজসভায় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হত। সভায় দর্শন, সাহিত্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্বদা আলোচনা চলত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বীরত্ব, সাহস, ন্যায়বোধ প্রভৃতির জন্য সীতারাম বাঙালীর নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সুকুর মহম্মদ—পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। এঁর রচিত গ্রন্থ "যোগীর পুথি" ও "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস"।

সুখদাস—প্রাচীন বাংলার একজন খ্যাতনামা ভাস্করশিল্পী। ইনি একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

সুজা [শাহজাদা মোহাম্মদ সুজা]—সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ সুজা চব্বিশ বছর বয়সে ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন। এঁর অনুগ্রহে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠী স্থাপন করে। সুজা রাজমহলে

রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনি অত্যন্ত বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। রাজমহলকে ইনি প্রায় দিল্লীর মতো সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। সুজা মোটের উপর উন্নতমনা ও ন্যায়-পরায়ণ নবাব ছিলেন। এঁর শাসন-কালে প্রজারা বেশ সুখে জীবনযাপন করত। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এঁর রাজত্বকাল রাম রাজত্বের সঙ্গে তুলনীয়। বঙ্গদেশে এঁর প্রভাব যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে ভেবে আশঙ্কা করে সাজাহান এঁকে কাবুলের শাসনকর্তা করে পাঠান। কিন্তু সুজা এতে প্রীত হলেন না। এক বছর পরে ইনি পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরে এসে বাংলার মসনদ অধিকার করেন। এই সময় সাজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে সুজা তাঁর মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিয়ে বাদশাহের সিংহাসনে তাঁর দাবী প্রতিপন্ন করার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ করে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। দারার সঙ্গে এঁর চির-শত্রুতা ছিল। সুতরাং দারা সম্রাট হলে যে এঁর মৃত্যু অবধারিত, এই আশঙ্কা করে সুজা বিদ্রোহ করে-ছিলেন। বঙ্গদেশের সৈন্যরা এঁকে ভালবাসত। তারা এঁর জন্য প্রাণপণ করে সংগ্রাম করেছিল। সুজার দূরদর্শিতা এবং নির্ভীকতা সত্ত্বেও কার্যতৎপরতার অভাব এবং আওরঙ্গ-জেবের দৃঢ়সংকল্প ও ছলচাতুরীর কাছে এঁর পরাভব ঘটে। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে সুজা সুতি নামক স্থানে পুনরায় মীরজুমলার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে বহু বাঙালী সৈন্য নিহত হয় এবং সুজা তাঁর অবশিষ্ট ১৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে বিদায় দিয়ে চট্টগ্রামে পালিয়ে যান। সেখানে এঁর সমস্ত অনুচর-বর্গকে বিদায় দিয়ে শুধু পরিবারবর্গ ও দাসদাসীদের নিয়ে ইনি আরাকান রাজ্যে উপস্থিত হন (১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ)। আরাকানরাজ এঁকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করেন এবং সম্মানীয় রাজ-অতিথি হিসাবে সুখে বসবাস করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজার ভাবান্তর দেখা যায়। তিনি অবিলম্বে সুজাকে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন। আরাকানরাজ সুজার পরমাসুন্দরী কন্যা পরীবাণুকে বিবাহ করতে চেষ্টা পান। সুজা এতে সম্পূর্ণ অসম্মত হন। আরাকানরাজের সঙ্গে সুজার একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। এতে অনেকেই নিহত হয়। সুজা সপরিবারে আহত ও ধৃত হন। সুজাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। সুজার তিন কন্যা মানরক্ষার জন্য ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন। এইভাবে সুজা সপরিবারে সমূলে ধ্বংস হন। কিন্তু তাঁর সুশাসনের জন্য তিনি বাঙালীর প্রিয় নবাব ছিলেন।

সুজাউদ্দীন খাঁ—পারস্যদেশীয় খোরাসানের প্রসিদ্ধ আফসর নামক তুর্কবংশসম্ভূত। দক্ষিণাপথে বুর্হানপুরে তাঁর জন্ম হয় এবং মুর্শিদকুলি খাঁর

একমাত্র কন্যা জিন্নেতুন্নেসার পাণিগ্রহণ করে তাঁরই আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। মুর্শিদকুলীখাঁ বঙ্গের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে এসে সুজাউদ্দিনকে প্রথমে উড়িষ্যার নায়েব-দেওয়ান ও পরে নায়েব নাজিমের পদে উন্নীত করেন। তিনি বিনয়ী ও ন্যায়পরায়ণ হলেও অত্যন্ত কামাসক্তির জন্য তাঁর চরিত্র কলুষিত হয়। তাই ধর্মপরায়ণা পত্নী বেগম জিন্নেতুন্নেসা পিতৃগৃহে মুর্শিদাবাদেই বাস করতেন। মুর্শিদকুলি খাঁ জামাই-এর ব্যভিচারের জন্য তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হয় এবং দৌহিত্র সরফরাজকেই বঙ্গের মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের সনন্দ বলে সুজাউদ্দীন উড়িষ্যা থেকে এসে বাংলার মসনদে সমাসীন হলেন (১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ)। বাংলার মসনদে বসেই তিনি অতি ধীর-স্থির ও বিজ্ঞতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন। মুর্শিদকুলির সময় যে সকল জমিদার রাজস্ব অনাদায় প্রভৃতি কারণে বন্দী বা নজরবন্দী ছিলেন সুজাউদ্দীন তাঁদের সবাইকে কারামুক্ত করলেন। বিচারকার্যে সুজাউদ্দিন অত্যন্ত নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করতেন। দীনহীন অর্থিপ্রার্থিগণও তাঁর নিকট পিতার ন্যায় ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করতে পারত। সুজাউদ্দীন তৎকালে সাহস ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। দান-ধর্মে ও উদারতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। পূর্ববর্তী সুবাদারগণ অপেক্ষা সুজাউদ্দীন অধিকতর আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। যৌবন অতিবাহিত হলেও তিনি বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সময় কাটাতেন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার হাজি আহম্মদ, রায়-রায়ান, আলমচাঁদ এবং জগৎশেঠকে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজধানীকে অত্যন্ত মনোরম করে সাজিয়েছিলেন। সুন্দর মসজিদ, বৃহৎ দীর্ঘিকা ও রমণীয় কেলিকুঞ্জ প্রস্তুত করে সুজাউদ্দিন প্রতিবার বসন্তবিহার করতেন। প্রতিবছর জন্মদিনে তিনি নিজের ওজনের সমপরিমাণ সোনা রূপা দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। কর্মচারী ও অনুচরবর্গের প্রতি তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। এজন্য তারা তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। পণ্ডিত ও ফকিরদের তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-যত্ন করতেন। অনেক আদর্শ রাজোচিত গুণে সুজাউদ্দীন প্রজা-সাধারণের চিত্ত জয় করে যশস্বী হয়েছিলেন। বিলাসিতা ও চরিত্র-হীনতা দোষ না থাকলে ইনি আদর্শ নরপতি বলে পরিগণিত হতে পারতেন।

শ্বশুর মুর্শিদকুলি খাঁর দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে সুজাউদ্দীন মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে ভাগীরথীর পরপারে নবাবী কেল্লার সম্মুখে স্বীয় সমাধি মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র সরফরাজকে

সুবাদার পদে নিযুক্ত করে হাজি আহম্মদ, রায়রায়ান, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠকে সর্বদা বিশ্বাস ও মান্য করতে উপদেশ দিয়ে যান। মৃত্যুকালে তিনি সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও অনুচরবর্গকে দু'মাসের মাহিনা পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করার আদেশ দিয়ে যান এবং যদি কোনও কাজের জন্য কখনো কাহারও নিকট অপরাধ করে থাকেন সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যান। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হয়।

সুদান্তসেন—কেউ কেউ এঁকে সুদত্তসেন বলে অভিহিত করেছেন। ইনি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ছিলেন চরকের ব্যাখ্যাকার। মধুকোষে এঁর নাম পাওয়া যায়।

সুদেব—পৌণ্ড্রপতি বাসুদেবের মহাপরাক্রান্ত পুত্র। ইনি হরিবংশে "পৃ থ গ ক্ষৌ হি নী পতি" বলে বর্ণিত হয়েছেন। সুদেব ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, ১০৯৩৫০ পদাতিকের নায়ক ছিলেন।

সু ধা নি ধি—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূর কর্তৃক কনোজ-রাজসভা থেকে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। ইনি বাৎস্য-গোত্রীয় ও বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। ছান্দড় ও ধরাধর নামে সুধানিধির দুই পুত্র ছিলেন।

সুধীশ্বর বা সুধীর বৈদ্য—মধুকোষের প্রারম্ভেই এঁর নাম আছে। ইনি সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর লোক। ইনি মাধব-নিদানের ব্যাখ্যাকার বলে অনুমিত হয়।

সুন্দর—গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক শাহের "ধর্মাধিকারিণী" অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী। অবস্থিতি-কাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

সুন্দর দাস—একজন পদকর্তা। 'সুন্দর দাস' ভণিতায় দু'টি পদ পদ-কল্পতরুতে উদ্‌ধৃত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে 'সুন্দর' গৌরসুন্দর বা কৃষ্ণসুন্দর প্রভৃতি সুন্দরান্ত নামের সংক্ষিপ্তকরণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ না থাকায় এঁকে গৌর-সুন্দর দাস না বলে সুন্দর দাস এই স্বতন্ত্র নামেই অভিহিত করা যায়। সুন্দরের পদ দুটি শ্রীবলরামের গোষ্ঠ-বেশের বর্ণনা। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

সুন্দরমল্ল—মহারাজ প্রতাপা-দিত্যের অন্যতম সেনাপতি সবাই ঢালী বা সবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও প্রতাপাদিত্যের একজন সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপা-দিত্যের পতনের পর সুন্দর বা এঁর পুত্র বিষ্ণুচরণ ভৈরবকূলে সেনহাটি এসে বাস করেন। সেনহাটির সিদ্ধান্ত-বংশীয়েরা সুন্দরমল্লের বংশধর।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর—নিত্যানন্দের একজন প্রধান সঙ্গী। সুন্দরানন্দ দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম বলে খ্যাত। হালদা-মহেশপুরে এঁর পাট প্রতিষ্ঠিত

হয়। 'পাটপর্যটনে' অভিরামঠাকুরের শিষ্য অন্য একজন সুন্দরানন্দের কথা উক্ত আছে। তিনি বিপ্র ও পণ্ডিত; তাঁর পাট ছিল ভাঙামোড়ায়। বাসু ঘোষ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রথমোক্ত সুন্দরানন্দ রামাই, গৌরীদাস, অভিরাম প্রভৃতিকে নিয়ে গৌরাঙ্গ 'গোষ্ঠলীলা' প্রকাশ করেছিলেন। নবদ্বীপলীলাকালে সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণ করবার সময় সুন্দরানন্দকে তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন। গৌড়ে ইনি নিত্যানন্দের সহচর হিসাবে বিশেষ খ্যাত হন। রঘুনাথ দাসের চিঁড়াদধি মহোৎসব অনুষ্ঠানে ইনি পাণিহাটীর গঙ্গাতীরে উপস্থিত ছিলেন। ইনি খেতুরির মহোৎসবেও যোগদান করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে সুন্দরানন্দ বিদ্যমান ছিলেন।

সুবর্ণচন্দ্র—বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশজাত পূর্ণচন্দ্রের পুত্র। পালরাজাদের সময়ে একাদশ শতাব্দীতে ইনি বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার এঁর দ্বারা স্থাপিত হয়। 'গোরক্ষবিজয়' কাহিনীর রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ সুবর্ণচন্দ্রেরই প্রপৌত্র।

সুবলশ্যাম—ব্রজভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদক।

সুবিদনারায়ণ—শ্রীহট্টের বল্লাল রাজা সুবিদনারায়ণ দিল্লীর সম্রাট বিহ্লোল লোদীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের এক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ুয়া পাহাড় বেষ্টিত ইটা ছিল তাঁর রাজ্য। তিনি প্রখ্যাত বীর ও সুশাসক ছিলেন। বাড়ুয়া পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গ পাগড়ীয়া টিলার চুড়ায় তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। তিনি বল্লালসেনের মতো সমাজসংস্কারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বঙ্গের স্বনামখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা রত্নাবতীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

সুবুদ্ধি ভাদুড়ী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সামসুদ্দীন ইলিয়াস্ যখন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান, তখন সুবুদ্ধি ভাদুড়ী তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। ইনি প্রতিদানে খাঁ উপাধি ও বিস্তীর্ণ জমিদারী লাভ করেছিলেন। সুবুদ্ধির বংশধরেরা ভাদুড়ীচক্র বা ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই বংশীয় রাজা গণেশ স্বাধীন সুলতান হয়েছিলেন।

সুবুদ্ধি রায়—'গৌড় অধিকারী' অর্থাৎ গৌড় শহরের চৌধুরী বা ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক। হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের অনেক আগে থেকেই তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হোসেন তখন তাঁর অধীনে কাজ করতেন। কাজের ত্রুটির জন্য তিনি একবার হোসেনকে চাবুক

মেরেছিলেন। পরে হোসেন সুলতান হলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) "সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইল"। কিন্তু তাঁর বেগম চাবুক মারার কথা জেনে সুবুদ্ধি রায়ের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর উপরোধে হোসেনশাহ গোমাংস খাইয়ে সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেন। সুবুদ্ধি রায় তখন কাশী চলে যান এবং পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চান। পণ্ডিতদের পরস্পরবিরোধী বিধান শুনে "শুনিঞা রহিলা রায় করিয়া সংশয়।" পরে কাশীতে চৈতন্যদেব এলে সুবুদ্ধি রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। চৈতন্যদেব বলেন, "বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন কর, তাহলেই সব পাপ খণ্ডন হবে।" সুবুদ্ধি রায় তাই করলেন। শুকনো কাঠ বেচে তিনি নিজের জীবনধারণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করতেন। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে এলে তাঁদের সুবুদ্ধি রায় অনেক যত্ন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে চৈতন্যদেব কাশীতে এসেছিলেন। সুতরাং হোসেন শাহের হাতে সুবুদ্ধি রায়ের লাঞ্ছনা তার কিছু আগে ঘটেছিল। বৃন্দাবন পুনর্গঠনে সুবুদ্ধি রায়ের যথেষ্ট অবদান আছে।

সুবুদ্ধি রায়—'ভারত পাঁচালী'-রচয়িতা। সিলেট অঞ্চলে সুবুদ্ধি রায় ভণিতায় অশ্বমেধ পর্বের (সম্ভবত জৈমিনিসংহিতা অবলম্বনে) পুঁথি পাওয়া গেছে অনেকগুলি। সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে গঙ্গাদাস সেন, কৃত্তিবাস এবং ভবানীদাসের ভণিতাও দেখা যায়। এঁর কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

সুবুদ্ধি শিরোমণি—নবদ্বীপের একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পরিবারের আদি পুরুষ। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর পূর্বনিবাস ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এঁর পারদর্শিতা দেখে ভবানন্দ মজুমদার এঁকে নদীয়াতে বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। ইনিই ভবানন্দের সুদিনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী।

সুভদ্রা দেবী—বৈষ্ণবাচার্য বীরচন্দ্রের বা বীরভদ্রের পত্নী। ইনি মাতা জাহ্নবার তিরোভাবের কথা শুনে শতশ্লোকে 'অনঙ্গকদম্বাবলী' নামে স্তোত্র রচনা করেছিলেন।

সুভূতিচন্দ্র—সম্ভবতঃ বাঙালী বৌদ্ধ। ইনি ছিলেন একজন অভিধানকার। 'কামধেনু' নামে ইনি অমরকোষের একটি টীকা রচনা করেছিলেন।

সুরথ সিংহ—মেদিনীপুরের বীরসিংহের বংশের শেষ রাজা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি

বিদ্যমান ছিলেন। কথিত আছে লক্ষ্মণসিংহ ও ভীম মহাপাত্র নামক সুরথ সিংহের দুজন কর্মচারী এবং নারায়ণগড়ের রাজা গন্ধর্ব পালের কোন অধস্তন পুরুষ ষড়যন্ত্র করে রাজা সুরথসিংকে হত্যা করে এবং এঁর রাজ্য তিনজন মিলে ভাগ করে নেয়। সুরথ সিংহের মৃত্যুর পর এঁর সাতজন রানী এঁর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিলেন।

সুরদেব—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দেবগণ বর্ধমান জেলার কণ্টকদ্বীপ বা বর্তমান কাটোয়ায় এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সুরদেব ছিলেন এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রক্ষক ও বৌদ্ধধর্মের বিদ্বেষক ছিলেন। দুর্জনদের ইনি কঠোর শাস্তি দিতেন। এঁর অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী।

সুরেশ্বর বা **সুরপাল**—এঁর পিতামহ বা প্রপিতামহ দেবগণ চন্দ্ররাজ গোবিন্দচন্দ্রের এবং পিতা ভদ্রেশ্বর রামপালের সভাচিকিৎসক ছিলেন। ইনি ছিলেন রাজা ভীমপালের রাজবৈদ্য। ইনি পালযুগের শেষভাগে বা তার কিছুকাল পরে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

সুরেশ্বর আয়ুর্বেদীয় উদ্ভিদের পরিচয় দিবার জন্য 'শব্দপ্রদীপ' ও 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' নামে দুখানি এবং ঔষধে লোহ ব্যবহার বিষয়ে 'লোহপদ্ধতি' বা 'লোহসর্বস্ব' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সুরেশ্বর বসু—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহোদয়ের পূর্বপুরুষ এবং সর্বাধিকারী বংশের স্থাপয়িতা। ইনি উড়িষ্যার দেওয়ান বা গভর্নর ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

সুলতান বায়েযীদ বিস্তামী—চট্টগ্রামের একজন খ্যাতনামা সুফীসাধক। এঁর পুরা নাম সুলতান আরেফীন বুরহানুল মুহাক্কেকীন খলীফায়ে ইলাহী আল্লামা হযরত বায়েযীদ বিস্তামী। শুধু চট্টগ্রামের নয়, ইনি মুসলীম জগতের একজন সুপরিচিত দরবেশ। চট্টগ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা ও অঞ্চলে ইনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কথিত আছে এই দরবেশ নবম শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বত চূড়ায় অবস্থান করতেন। এই স্থান থেকেই বিস্তামী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইনি আল্লাহ্‌তা' আলার গুপ্ত রহস্যবাদ, তত্ত্বজ্ঞান এবং হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। "পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় এঁর নাম দৃষ্ট হয়।

সুলতান, সৈয়দ—বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম। ইনি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লস্করপুরের প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর

রচিত 'নবীবংশ', 'শবে মেয়েরাজ' ও 'জ্ঞান-প্রদীপ' নামক তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। 'শবে মেয়েরাজ' কবির শেষ রচনা—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এটির রচনা আরম্ভ হয়। এই তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত ইনি কতকগুলি পরমার্থ সংগীতও রচনা করেছিলেন।

সুলেমান কররানী—একজন আরব বণিক। ইনি বাংলাদেশ সম্বন্ধে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। বাংলায় তৈরী সূতী-বস্ত্র সম্বন্ধে লিখেছেন, "এই বস্ত্র এতো সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা প্রস্তুত যে ইহা অনায়াসে একটি আংটির মধ্য দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যায়।" ইনি নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

সুলেমান কররানী—ইনি প্রথমে শেরশাহের একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। শেরশাহ এঁকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। স্বীয় ভ্রাতা তাজ খাঁর মৃত্যুর পর সোলেমান বাংলাদেশেরও শাসন কর্তা হন এবং স্বাধীনভাবে বাংলা, বিহার শাসন করতে থাকেন। পরে অবশ্য ইনি আকবর বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কররানী উড়িষ্যা জয় করে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ একজন সেনাপতিকে তথায় স্থায়ীভাবে শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু উড়িষ্যায় বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। গৌড় নগরীর জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বিবেচনা করে সোলেমান রাজধানী গৌড় থেকে তাণ্ডায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। ১৪৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কররানীর মৃত্যু হয়। এঁর শাসন সময়ে মালদহে সোনা মস্‌জিদ্ নির্মিত হয়েছিল। সুলেমানের স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত ছিল। তথাপি ইনি হজরত আলা (প্রধান সামন্ত) উপাধি ধারণ করে বাহ্যতঃ আকবর বাদশাহের নিকট বশ্যতা স্বীকারপূর্বক সময় সময় ভেট পাঠাতেন। সুলেমানের রাজত্ব মোটের উপর নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ ছিল। এই সময় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী আড়ারা ব্রাহ্মণ ভূমিতে থেকে তাঁর চণ্ডীকাব্য সমাপ্ত করেছিলেন।

সূত্রধর—প্রাচীন বাংলার একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। ইনি একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

সূর্যকান্ত গুহ—মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বাল্য বন্ধু ও পরবর্তীকালে মহাপরাক্রান্ত সেনাপতি। মোগল সৈন্যের সঙ্গে বারবার যুদ্ধে ইনি অমিত বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

সূর্যদাস পণ্ডিত—উপাধি 'সরখেল'। নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী বসুধা-জাহ্নবা দেবীর পিতা। পূর্ব নিবাস শালিগ্রাম। পরে কালনায়

বসবাস করেন। এঁর পত্নীর নাম ভদ্রাবতী। ইনি 'ভোগ-নির্ণয়-পদ্ধতি' রচনা করেন।

সূর্য মাঝি—বল্লালসেনের নৌবিভাগের কর্তা। বল্লাল এঁকে বিস্তৃত অঞ্চল জায়গীর দিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন জাতিতে জালিক বা জেলে। অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী।

সৃষ্টিধর—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় বৈয়াকরণ সৃষ্টিধর "ভাষাবৃত্তীয়ার্থ-বিবৃতি" রচনা করেছিলেন।

সেকেন্দর, সুলতান—বাংলার শাসনকর্তা। ইনি পাণ্ডুয়াতে বিখ্যাত আদীনা মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

সেখনুর কুতব আলম—পাণ্ডুয়ার (মালদহের) ছোট দরগার (ছয় হাজারীর) পীর। পাণ্ডুয়ার পাঁচ পীরের অন্যতম। রাজা গণেশের পুত্র যদু (জালালুদ্দীন) এঁর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখনুর দেহত্যাগ করেন।

সেখ ফয়জুল্লা—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। এঁর রচিত গ্রন্থ "গোরক্ষ-বিজয়"।

সেরবাজ—সপ্তদশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি। এযাবৎ এঁর দুখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। একখানির নাম "ফক্করনামা" বা "মল্লিকার হাজার সওয়াল" এবং অপর খানিরনাম "কাসেমের লড়াই"। 'সেরবাজ ছিলেন একজন সাধারণ কবি। তবে, হিতকথা ও তত্ত্ববাণীর প্রচারকরূপে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

সেখ হবু—হোসেন শাহ্ যখন সনাতন গোস্বামীকে কারারুদ্ধ করে রাখেন, তখন সেখ হবু ছিল কারারক্ষী। ইনিই সনাতনকে কারগার থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

সৈফউদ্দৌলা—মীরজাফরের অন্যতম পুত্র ও নজমউদ্দৌলার সহোদর। ইনি মণিবেগমের গর্ভজাত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নজমউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ইনি ষোল বছর বয়সে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নিজামতের আসনে উপবেশন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৈফউদ্দৌলার জন্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই নবাবের কার্যকালে মুর্শিদাবাদে একটি নিজামত শুল্কাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ, দুর্লভরাম ও জগৎশেঠের হস্তে নবাব সরকারের কার্যভার ন্যস্ত ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সৈফউদ্দৌলার বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়।

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ—'তারিখ-ই-ফিরিশতা' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'এর মতে মালিক আন্দিল নামক এক হাবশী সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ নাম নিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে

আরোহণ করেন (১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ)। ইনিই বাংলার প্রথম হাবশী সুলতান। ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল এবং নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। ইনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। এঁর বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও দয়ালুতা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ফিরোজ বহু প্রজাহিতকর কাজ করেছিলেন। তিনি এত বেশী দান করতেন যে পূর্ববর্তী রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত ধন-দৌলত নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। কথিত আছে একবার তিনি একদিনেই এক লাখ টাকা দান করেছিলেন। ফিরোজ শাহ গৌড় নগরে একটি মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। মিনারটি এখনো বর্তমান। উহা 'ফিরোজ মিনার' নামে পরিচিত। তিনি ১৪৮৭-৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ—গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ বাংলার রাজা হন। (১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি "সুলতান-উস্‌-সলাতীন" বা "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা আছে, "তিনি ছিলেন সাহসী,-ধৈর্যশীল এবং উদার নরপতি। তাঁর বুদ্ধি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তাঁর কর্মচারীরা সাবধানে শাসনকার্য পরিচালনা করত। দেশের হিন্দু রাজারা তাঁর বশ্যতার জোয়াল থেকে মাথা বার করত না এবং রাজস্ব দিতে দেরী করত না। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে লেখা আছে, "তিনি দয়ালু, ধৈর্যশীল এবং সাহসী রাজা ছিলেন।" অতি অল্প দিনের মধ্যেই ১৪১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। এঁর সময় থেকে হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ বঙ্গ সিংহাসনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন।

সৈয়দ মর্তুজা—মুসলমান ফকির। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে মর্তুজা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর পশ্চিম বেরেলী জেলায় নাকি এঁদের পৈতৃক বাস ছিল। জঙ্গীপুরের নিকট চড়কা নামক স্থানে রাজাক সাহেবের শিষ্য হয়ে মর্তুজা সূতীর অদূরে ছাপঘাটীতে একটি আস্তানা স্থাপন করেন। ধর্মে ও দীক্ষায় মুসলমান হলেও হিন্দু ধর্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ইনি তন্ত্রোক্ত শক্তি উপাসকগণের আচার, নিয়ম ও সাধন প্রণালী মতো আচরণ করতেন। ধর্ম-সাধনের জন্য ইনি সুরা সেবন করতেন এবং সাধনার সহকারিণীরূপে আনন্দময়ী নামে এক ব্রাহ্মণী ভৈরবী-রূপে এঁর সঙ্গে থাকত। ইনি কিছু সংখ্যক পদ রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত "পদকল্পতরু"র মধ্যে মর্তুজা রচিত বহু পদ পাওয়া যায়।

সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর—মুসলিম বাংলার একজন খ্যাতনামা

কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম "জেবল মুলুক শামারোখ।" জানা যায় ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কবির জন্ম হয়েছিল। কাব্যখানি ছিল বিরাট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই কাব্য আকবর মাত্র ষোড়শ বছর বয়সে রচনা করেছিলেন। এতে অবশ্য এঁর প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানির রচনাকাল ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

সৈয়দ সুলতান—কবি সৈয়দ সুলতান ছিলেন সুফি ধর্মাবলম্বী সাধক। চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুরে ছিল তাঁর বাসভূমি। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাত্মক লোক-সংগীতের ইনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী। এঁর রচিত দু'খানি কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি 'জ্ঞানপ্রদীপ' (বা 'জ্ঞান চৌতিশা') তান্ত্রিক যোগ-বিষয়ক নিবন্ধ। দ্বিতীয়টি নবীবংশ—সংস্কৃত হরিবংশের অনুসরণে মুসলমান-শাস্ত্র মতে সৃষ্টিতত্ত্ব, নবীদের আবির্ভাব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। কবি হিন্দু-শাস্ত্রকে উদার দৃষ্টিতে দেখে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-কৃষ্ণকেও নবী বলে স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থখানির সমাপ্তিকাল ১৬৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর রচিত অপর গ্রন্থ "শবে-মেয়েরাজ"। রচনাকাল ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।

সৈয়দ হামজা—'আমীর হামজা' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতা। রচনাকাল ১৭৯২-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণ-রাঢ়ের মুসলমান কবিদের মধ্যে রচনা-বাহুল্যে সৈয়দ হামজাই শ্রেষ্ঠ। এঁর অন্যান্য রচনা: 'মনোহর-মধুমালতী', 'জৈগুনের পুথি' ও 'হাতেম তাই'।

কবির পৈতৃক নিবাস ছিল ভুরশুট অদুনা (বা উদনা) গ্রামে। পরে কবিরা বায়ড়া পরগণায় রাণাঘাট গ্রামে উঠে এসেছিলেন।

সোনাগিরিপাল বা গৌরী-নারায়ণ—'ছুটিয়া' বংশের প্রথম রাজা বীরপালের পুত্র। ইনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভদ্রসেন নামক এক রাজাকে পরাজিত করে 'রত্নধ্বজপাল' নাম গ্রহণ করে সদীয়া অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন (১২২৪ খ্রীষ্টাব্দ)। রত্নধ্বজপাল পূর্ব কামরূপের রাজা ন্যায়পালের কন্যা এবং কামতাপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কথিত আছে রত্নধ্বজপাল ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং তৎকালীন গৌড়েশ্বরের সঙ্গে এঁর মিত্রতা স্থাপিত হয়েছিল।

সোনামণি বা স্বর্ণময়ী—বাংলার বারভূঞার অন্যতম বিখ্যাত ভূঞা চাঁদ রায়ের কন্যা ও কেদার রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সোনামণি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। অল্প বয়সেই ইনি বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। একবার ঈশা খাঁ চাঁদ রায় কেদার রায়ের অতিথিরূপে শ্রীপুরে এসে অবস্থান কালে সোনামণিকে দেখে পাগল হয়ে যান। এবং সোনামণিকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। ফলে চাঁদ রায় কেদার

রায়ের সঙ্গে ঈশা খাঁর যুদ্ধ বাধে। চাঁদ রায় ও ঈশা খাঁ দ্র°।

সোমেশ্বর—গৌড়বাসী শ্রীকণ্ঠ শম্ভুর পুত্র সোমেশ্বর ছিলেন অষ্টাদশ বিদ্যা ও শৈব দর্শনে মহানিষ্ণাত। শৈব উপনিষদে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় গুরু। এঁরই আর এক নাম ঈশ্বর শিব। ইনি সিদ্ধান্ত-রত্নাকর গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের গুরু ছিলেন ও সেই সম্রাটের স্থাপিত ত্রিভুবন মন্দিরে ইনিই বিগ্রহ স্থাপনা করেন। চোল সম্রাটদের উপর এই গুরুদের দুর্দম প্রতাপ ছিল। এঁর অবস্থিতি কাল দ্বাদশ শতাব্দী।

সোমেশ্বর পাঠক—একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা। ইনি বহু অনুচর নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ "পাহাড় মুল্লুকের" রাজা বৈশ্য গারোকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে ঐ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। এই সোমেশ্বর পাঠকই সম্মানিত সুসঙ্গ রাজবংশের আদি পুরুষ। ইনি ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে কান্যকুব্জ থেকে এদেশে আগমন করেছিলেন।

সোর, জারজন্—কর্নওয়ালিশের পর ইনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হন। ইনি লর্ড টিন্‌মাউথ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিলাত প্রত্যাগমন করেন।

সৌভরি—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূর কর্তৃক কনোজরাজসভা থেকে আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের অন্যতম। ইনি সাবর্ণগোত্রজ বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর নামে এঁর চারি পুত্র ছিলেন।

স্টিওয়ার্ট, জেমস্ (ক্যাপ্টেন)—ইংরেজ পাদ্রী। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিদেশী স্রষ্টাদের ইনি অন্যতম। বিলেতে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। এদেশে ধর্ম প্রচার করতে এসে বাংলাভাষার উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ইনি বর্ধমানে একটি মিশন গঠন করেন। এখানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দুটি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর এই স্কুলগুলির খুব সুনাম ছিল। শিক্ষা-পদ্ধতির তিনি অনেক সংস্কারও করে-ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ: ইতিহাস কথা, বর্ণমালা, তমোনাশক।

স্তম্ভেশ্বর দাস—গুপ্তরাজ কুমার-গুপ্তের রাজত্বকালে প্রদত্ত কয়েকখানি ভূমিদানপত্র (তাম্রশাসন) পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একখানি রাজশাহী জেলায় নাটোর মহকুমায় ধানাইদহ গ্রামে পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনখানির খোদাইকার ছিলেন স্তম্ভেশ্বর দাস। এটির লিপিকাল ৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

স্বপ্নেশ্বর আচার্য—নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব-ভৌমের পৌত্র ও জলেশ্বরবাহিনী-

পতির পুত্র। এঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যবর্তী কোন সময়। স্বপ্নেশ্বর রচিত গ্রন্থ—'সাংখ্যাতত্ত্বকৌমুদীপ্রভা' নামক সাংখ্যগ্রন্থ। শাণ্ডিল্যসূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকাররূপে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে স্বপ্নেশ্বর স্বরচিত ন্যায় ও বেদান্তগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। শাণ্ডিল্যসূত্রের অভিনব টীকাকার মৈথিল মহামহোপাধ্যায় ভবদেব মিশ্র বহু স্থলে শ্রদ্ধা সহকারে স্বপ্নেশ্বরের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করেছেন।

স্বরূপ চরণ গোস্বামী—ইনি রূপ গোস্বামীর ললিত মাধব-নাটক কাব্যের আকারে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনূদিত কাব্যের নাম ছিল 'প্রেমকদম্ব'। রচনাকাল ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থশেষে কবি যে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে স্বরূপচরণ ছিলেন নিত্যানন্দ-বংশীয় খড়দহ-নিবাসী। পিতা নবকিশোর ছিলেন নিত্যানন্দের পৌত্র রামচন্দ্রের প্রপৌত্র। নবকিশোরের চারি পুত্রের মধ্যে কবি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। বৈষ্ণব-বর্গের অনুরোধে এবং জ্যেষ্ঠ অগ্রজ জগন্নাথের আদেশে প্রেমকদম্ব লেখা হয়েছিল।

স্বরূপ দাস—একজন পদকর্তা। 'পদকল্পতরু'তে এঁর দুটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য পরম্পরায় ইনি ছিলেন চতুর্থ স্থানীয়। এঁর গুরু বিলাসাচার্য পুরুষোত্তম আচার্যের শিষ্য এবং পুরুষোত্তম আবার শ্রীনিবাসের শিষ্য বিশ্বাচার্যের শিষ্য। এঁর অবস্থানকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অসংখ্য পরিকরের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম।

স্বরূপ দামোদর—সম্ভবতঃ ইনি পুরুষোত্তম আচার্য নামে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করতেন। সন্ন্যাস অবলম্বন করে ইনি স্বরূপ দামোদর নাম গ্রহণ করেন। স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। আচার্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'রসরূপতা' প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে স্বরূপ-দামোদর নামে অভিহিত হতেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং চৈতন্যের তিরোধানের পরেও কিছুকাল জীবিত ছিলেন। স্বরূপ পুরীতে চৈতন্যদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নৃত্যগীতে এঁর অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। বৈষ্ণবতত্ত্ব, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আদি ভাষ্যকারদের ইনি ছিলেন অন্যতম।

স্বরূপের সঙ্গে পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। স্বরূপের পিতার নাম ছিল পণ্ডিত পদ্মগর্ভাচার্য।

স্বরূপ দামোদরের মধ্যে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের চরম বিকাশ সাধিত হয়েছিল। ইনি ছিলেন চৈতন্য জীবনতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক।

স্বরূপের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য থেকে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক যে দুখানি মহামূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন তা স্বরূপের কাছেই ছিল। মহাপ্রভু এঁর সঙ্গে নানা তত্ত্ব আলোচনা করতেন॥ স্বরূপ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে ইনি ছিলেন 'সংগীতে গন্ধর্বসম,' শাস্ত্রে বৃহস্পতি।' চৈতন্যজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে পরিচিত হয়ে স্বরূপ চৈতন্যজীবনী সম্বলিত একখানি কড়চা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উহাই স্বরূপ 'দামোদরের কড়চা' নামে পরিচিত। এতে মহাপ্রভুর মধ্য ও শেষ জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর "চৈতন্যচরিতামৃত' রচনায় এই কড়চার নিকট বিশেষ ঋণ স্বীকার করেছেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর আহারে, বিহারে, শয়নে দিবারাত্রির সঙ্গী ছিলেন। শেষ জীবনে ইনিই হয়ে উঠেছিলেন মহাপ্রভুর একমাত্র অবলম্বন। কথিত আছে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর শোকে স্বরূপের মৃত্যু হয়। কারুর কারুর মতে ইনি শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেছিলেন। কালিদাস রায়ের মতে "স্বরূপ বৃন্দাবনে বাস করলে সপ্তম গোস্বামী হইতেন। পুরীধামে স্বরূপই ছিলেন গোস্বামীদিগের প্রতিনিধি।"

স্বর্ণময়ী—সোনামনি বা স্বর্ণময়ী দ্র°।

স্বর্ণরেখ—পালরাজ ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের নিকট থেকে বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ নামক একখানি গ্রাম শাসনস্বরূপ লাভ করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণ স্বর্ণরেখেরই উত্তরপুরুষ চতুর্ভুজ, যিনি হরিচরিত নামক একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন।

হ

হটী বা **হটু বিদ্যালঙ্কার** (ওরফে রূপমঞ্জরী)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের এক বিদুষী রমণী। রাঢ় দেশের এই কুলীন বালবিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্যন্যায়ে পারদর্শিনী হয়ে কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে ভূষিতা হন। ইনি সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্যের ন্যায় বিদায় নিতেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বৃদ্ধা বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। রূপমঞ্জরী দ্র°।

হটু রায়—অযোধ্যারাম রায় দ্র°।

হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রী—হবুচন্দ্রকে কেউ কেউ পালবংশের রাজা বলে অনুমান করে থাকেন। করতোয়া নদীর তীরবর্তী হাওড়া থেকে ঘোড়াঘাটের দক্ষিণ পর্যন্ত ভূভাগে অবস্থিত অনেক

ধ্বংসাবশেষ হবুচন্দ্র রাজা এবং গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কীর্তির চিহ্ন বলে কথিত হয়ে থাকে। কথিত আছে যে, হবুচন্দ্র রাজা প্রথমে গোপীনাথপুরে এবং পরে বাক্ দুয়ারে (রঙ্গপুর জেলার) বাস করতেন। রঙ্গপুর নগরের 'ধাপ' নামক স্থান তাঁর 'ধাপরাজ্যের' স্মৃতি রক্ষা করছে।

কোন পদস্থ ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করলে, 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর' উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ কাহিনী বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। এঁদের নির্বুদ্ধিতার একটি গল্প এইরূপ :—একদিন দুই বণিক রাজবাটীর নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীর তীরে রন্ধন করার জন্য একটি চুল্লী খনন করতে থাকে। বণিকদ্বয় পুষ্করিণী চুরির উদ্দেশ্যে সিঁদ খুড়ছে এই অভিযোগে গবুচন্দ্র মন্ত্রী তাদের রাজদ্বারে অভিযুক্ত করেন। হবুচন্দ্র রাজার বিচারে অবধারিত হয় যে, পুষ্করিণী অপহরণপূর্বক নগরবাসীকে জলাভাবে বিনষ্ট করাই ঐ দুই ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং উক্ত অপরাধে তাদের শূলে দেওয়ার আদেশ প্রদত্ত হল। বণিকদ্বয় প্রাণরক্ষার জন্য এক কৌশল স্থির করল এবং শূলের নিকট আনীত হলে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শূলটিতে আরোহণের জন্য উভয়েই ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। তাদের এই আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, বণিকদ্বয় নিজদিগকে জ্যোতির্বিদ বলে পরিচিত করে বলেন যে, শূল দুটি অতি শুভক্ষণে স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং উচ্চনীচ ভেদে ঐ দুই শূলে প্রাণত্যাগ করতে পারলে পর-জন্মে উভয়ের যথাক্রমে রাজা এবং মন্ত্রী হওয়া একেবারে অবধারিত রয়েছে। উক্ত কারণে তাঁরা পরজন্মে রাজা হবার আশায় প্রত্যেকেই উচ্চ শূলে আরোহণের জন্য বিশেষভাবে উৎসুক হয়েছে। হবুচন্দ্র রাজা এবং গবুচন্দ্র মন্ত্রী পরজন্মেও রাজা এবং মন্ত্রী হবার প্রত্যাশায় তৎক্ষণাৎ ঐ দুই শূলে আরোহণপূর্বক প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপ উপকার এবং অন্তিমকালীন পুণ্য সঞ্চয়ের পরামর্শ প্রদানের জন্য তাঁরা উক্ত বণিকদ্বয়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন।

হ র গো বি ন্দ রা য়—জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। শ্রীহট্টের অন্তর্গত পলাশ পরগণার জমিদার। ইনি ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদের শেষভাগে সংস্কৃত ভাষায় এক বিশাল তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'পঞ্চমবেদসারনির্ণয়'। গ্রন্থখানি নিবন্ধজাতীয়। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় দক্ষিণা কালিকার উপাসনা ও কুলাচার।

হরপ্রসাদ রায়—লং সাহেবের বিবরণ মতে হরপ্রসাদ কাঁচড়াপাড়া নিবাসী। জাতি বৈদ্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলাবিভাগের একজন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত একমাত্র

গ্রন্থ 'পুরুষ পরীক্ষা।' ইহা সংস্কৃত 'পুরুষ পরীক্ষা'র বঙ্গানুবাদ।

হরি ঘোষ—ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে হরিঘোষ নামে এক ধনাঢ্য গোপ বাস করতেন। এই সময় বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে এসে নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপনে প্রয়াসী হন। রঘুনাথ অতি দরিদ্র ছিলেন। তখন হরি ঘোষ তাঁর সুবিস্তীর্ণ গোশালা চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য শিরোমণিকে দান করেন। এই গোশালাতেই রঘুনাথ টোল খুলে বসেন এবং নানা দেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র এসে তাঁর চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ করে। গোশালায় ছাত্রমণ্ডলীর পাঠাভ্যাসকালীন কোলাহল বহুদূর থেকে শোনা যেত। সে কারণে এখনো লোকে কোন স্থান জনাধিক্যে কোলাহলপূর্ণ হলে "হরিঘোষের গোয়াল" বলে থাকে।

হরি ঘোষ (শ্রীহরি ঘোষ)—এঁর আসল নাম শ্রীহরি ঘোষ। ইনি কলকাতার কাঁটাপুকুরের বিখ্যাত ঘোষ বংশের রামসন্তোষ ঘোষের পৌত্র এবং ফরাসী গভর্নর ডুপ্লের শাসন-সহায়ক বলরাম ঘোষের পুত্র। বলরামের চারি পুত্রের মধ্যে ইনি দ্বিতীয়। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুঙ্গের কেল্লার দেওয়ানের কাজ করতেন। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর ইনি কলকাতায় গিয়ে বসবাস করেন এবং বহু অসহায় দরিদ্র স্বজাতিকে নিজ-গৃহে রেখে তাদের ভরণপোষণ করতে থাকেন। বহু কুপোষ্য পালনের জন্য তাঁর ভদ্রাসন ক্রমে "হরিঘোষের গোহাল" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শেষ জীবনে ইনি এঁর আদি বাসভূমি বাগবাজারের গাঙ্গুলীদের কাছে বিক্রী করে এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কাশীনাথকে সঙ্গে নিয়ে কাশীবাসী হন। সেখানে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিঘোষের মৃত্যু হয়।

হরিকৃষ্ণ দাস—একজন পদকর্তা। 'হরিকৃষ্ণ দাস' ভণিতায় একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত অন্য এক পদকর্তা হরেকৃষ্ণ দাসের সঙ্গে এঁকে এক ও অভিন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। এঁর অবস্থিতি কাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী।

হরিকৃষ্ণ দাসের—

"কি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর
মূরতি জগ-মন-হারী।
কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল
গোরাতনু।
আকুল কুলবতী নারী॥"

ইত্যাদি গৌরচন্দ্র পদটির রচনা সুন্দর।

হরিচন্দন মুকুন্দদেব—ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি ছিলেন উড়িষ্যার শেষ হিন্দুরাজা। ইনি ১৫৬০-১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ইনি বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। মুকুন্দদেব বাংলার মেদিনীপুর এবং হুগলীর

ত্রিবেণী পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিলেন। আফগানদের পরাজিত করেই ইনি এই অঞ্চল জয় করেছিলেন।

হরিচরণ দাস—অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের শিষ্য। অচ্যুতানন্দের আদেশে তিনি অদ্বৈতপ্রভুর জীবনী 'অদ্বৈতমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবি স্বয়ং ছিলেন শ্রীহট্টের নবগ্রামের অধিবাসী। কবি যখন অদ্বৈত আচার্যের সান্নিধ্য লাভ করেন, তখন প্রভু বার্ধক্যগ্রস্ত। কবি আচার্যের মাতুল সম্পর্কীয় বিজয়পুরীর নিকট তাঁর বাল্য কথা শুনে তা কাব্যে লিপিবদ্ধ করেন। হরিচরণের অদ্বৈতমঙ্গলে কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়।

হরিদত্ত, কাণা—বাংলা মনসামঙ্গলের আদি কবি। খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এঁর আবির্ভাব ঘটে। এঁর রচিত মনসামঙ্গলের কোন আদ্যন্ত পুঁথি আজও পাওয়া যায় নি। কিন্তু বিভিন্ন কবির রচনার মধ্যে যে পদ কিংবা পদাংশসমূহ পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই ময়মনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত। এইজন্য ঐ অঞ্চলেই কবির বাসস্থান ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেন যে ময়মনসিংহ জেলায় 'দাস' হরিদত্তের ভণিতায় যে তিনখানি 'কালিকামঙ্গলে'র পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মূলীভূত কাব্যেরও স্রষ্টা এই কাণা হরিদত্ত। এই কালিকা মঙ্গল কাব্যে "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী"র অন্তর্গত সপ্তশতী অংশের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।

পরবর্তী কবি বিজয় গুপ্তের পুঁথিতে কাণা হরিদত্তের উল্লেখ আছে। যথা—

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু
ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গীত নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥"

হরিদত্ত, দাস—সপ্তদশ শতাব্দী বা তার কিছু পূর্বের একজন কবি। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'কালিকাপুরাণ'। ইহা একখানি সংস্কৃত কাব্যের বঙ্গানুবাদ।

হরিদাস ছোট—মহাপ্রভুর নীলাচলে বসবাসকালে ইনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এবং তাঁর সেবা পরিচর্যা করতেন। রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু যে বেড়াকীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন, ছোট হরিদাস তাতে যুক্ত ছিলেন। প্রকৃত ভক্ত হিসাবে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একদিন ভগবান আচার্য ছোট হরিদাসকে দিয়ে শিখি মাহিতীর ভগিনী মাধুরী বা মাধবী দেবীর কাছ থেকে উৎকৃষ্ট চাল আনিয়ে উত্তম রান্না করে মহাপ্রভুকে খাওয়ান। মহাপ্রভু

যখন অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে ছোট হরিদাসই মাধবী মাহিতীর কাছ থেকে চাল চেয়ে এনেছিলেন তখন তিনি জানিয়ে দিলেন যে ছোট হরিদাস যেন তাঁর কাছে না যান। এই কঠোর শাস্তির কথা শুনে ছোট হরিদাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। অনেক চেষ্টায়ও যখন মহাপ্রভুর মত পরিবর্তন হল না, তখন বৎসরান্তে একদিন রাত্রিশেষে হরিদাস নীলাচল ত্যাগ করে প্রয়াগ গেলেন এবং সেখানে ত্রিবেণী বক্ষে ঝাঁপ দিলেন। ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

হরিদাস (দ্বিজ)—বাঢ়ীয় ফুলিয়ার মুখটী নৃসিংহের সন্তান। এঁর নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের টেঞ্চা বৈদ্যপুরের সন্নিকটবর্তী কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে যে, মহাপ্রভু অপ্রকট হলে ভক্তপ্রবর হরিদাস প্রাণ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু মহাপ্রভু স্বপ্নে দর্শন দিয়ে এঁকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ ও বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। তদনুসারে হরিদাস বৃন্দাবনে গিয়ে শেষ জীবন ভজন সাধনে অতিবাহিত করেন। হরিদাসের আজ্ঞা অনুসারে এঁর শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ নামক পুত্রদ্বয় পরবর্তীকালে শ্রীনিবাসাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

হরিদাস "দ্বিজ"—ইনি "অশ্বমেধ পর্ব" রচনা করেছিলেন। পুথির লিপিকাল ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। হরিদাস সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগের লোক ছিলেন বলে অনুমিত হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য অথবা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কাব্যের শেষ ভণিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। "অভিমত সিদ্ধ মোর কর শ্রীনিবাস তোমার চরণে কহে দ্বিজ-হরিদাস।"

হরিদাস "দ্বিজ"—এর রচিত গ্রন্থের নাম 'মুকুন্দমঙ্গল'। এই কাব্য রচিত হয় ১৭০০-১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি ছিলেন মল্লভূমের অধিবাসী। এঁর পুথি এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য—এর ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাঁকে বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য ও রঘুনাথ শিরোমণির সতীর্থ বলে মনে করা হয়। হরিদাস একসময় নৈয়ায়িক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিরোমণির দীধিতি তর্কগ্রন্থের উপর গদাধর-রচিত টীকায় তার উল্লেখ আছে। হরিদাসও দীধিতির টীকা রচনা করেছিলেন। 'কুসুমাঞ্জলি'র কারিকাংশের উপর হরিদাস টীকা রচনা করেন। পক্ষধর মিশ্রের তিনখণ্ড আলোকেরও হরিদাস-রচিত টীকা পাওয়া যায়।

হরিদাস পণ্ডিত—অনন্ত আচার্যের শিষ্য। বৃন্দাবনে এঁর

বিশেষ মর্যাদা ছিল। বৃন্দাবনে ইনি গোবিন্দ-বিগ্রহ সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সুশীল, বদান্য ও মধুরভাষী ছিলেন। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' শ্রবণ করে ইনি পরম তৃপ্তিলাভ করতেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে চৈতন্যমহাপ্রভুর শেষ-লীলা বর্ণিত হয়নি বলে হরিদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তা লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

হরিদাস (যবন)—বর্তমান খুলনা জেলার (বাংলা দেশ) অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার বূঢ়ন পরগণার অন্তর্গত ভাটকলাগাছি গ্রামে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে এক উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে হরিদাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মনোহর চক্রবর্তী ছিলেন সুব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত। তাঁর মাতার নাম উজ্জ্বলা। হরিদাসের বয়স যখন দু'তিন বছর, তখন তিনি পিতৃমাতৃহীন হয়ে নিরাশ্রয় হন। এই সময় হবিবুল্যা কাজী নামে এক নিঃসন্তান বৃদ্ধ মুসলমান তাঁকে অপহরণ করে হাকিমপুরে নিয়ে গিয়ে পুত্রবৎ প্রতি-পালন করেন। মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার জন্য লোকে তাঁকে যবন হরিদাস নামে অভিহিত করে। শ্রীনিত্যানন্দ দাস-বিরচিত 'প্রেম-বিলাস' নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে :

"বূঢ়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে।
যবনত্ব প্রাপ্তি তার যবনায় দোষে।"

পালক পিতা কাজী সাহেবের চেষ্টায় হরিদাস শৈশবে আরবী, পারসী ও বাংলা ভাষায় সময়োচিত সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শিশুকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে ভাল-বাসতেন এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তাঁর আঠার বছর বয়সে পালক পিতা হবিবুল্যা কাজী তাঁর বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ করলে, একদিন রাত্রিকালে হরিনাম সম্বল করে গৃহ ত্যাগ করেন এবং বেনাপোল গ্রামের এক জঙ্গলে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তিনি প্রায় আট-দশ বছর ছিলেন এবং সর্বসময় জপ-যজ্ঞ করে কাটাতেন। সাধু বলে তাঁকে দেখতে এসে লোকে ফলমূল বাতাসা যে যা দিত সে সব তিনি হরিবোল বলে বালকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। সেই থেকে হরির লুটের সৃষ্টি হল। কিছুদিন পরে হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করে প্রথমে নবদ্বীপ ও পরে শান্তিপুরে এসে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। শিক্ষান্তে তিনি আচার্য অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। গঙ্গাগর্ভে এক গোঁফায় বসে তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। কিছুদিন পরে তিনি বেনাপোলে ফিরে গিয়ে নিজ ভজনকুটীরে বসে নামযজ্ঞ আরম্ভ করেন। তাঁর জপের মাধুর্যে বঙ্গদেশ আকুলিত হয়েছিল। হরিদাসই হরিনাম

জপের প্রথম প্রবর্তক। পরে শ্রীচৈতন্য দেব ইহা সমস্ত দেশ মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হরিনাম সংকীর্তনে দলে দলে লোককে যবন হরিদাসের অনুগামী হতে দেখে গোরাই কাজী ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে উঠলেন। তখন তিনি হরিদাসের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে নালিশ করলেন। তখন বিচারের জন্য হরিদাসকে হুসেন শাহের নিকট গৌড়ে কারারুদ্ধ করে আনা হল। তাঁকে হরিনাম ত্যাগ করার জন্য অনেক বলা হল। কিন্তু তিনি বললেন যে জীবন থাকতে তিনি হরিনাম ত্যাগ করতে পারবেন না। তখন তাঁকে বাজারে এনে প্রকাশ্যে চাবুক মারা হল। কিছুক্ষণ পরে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মৃত মনে করে তাঁকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হল। অচিরে পুনর্জীবন লাভ করে তিনি আবার হরিনাম জপ করতে শুরু করেন। এই সময় হরিদাস নবদ্বীপে গিয়ে গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে মিলিত হন। এবং জগাই-মাধাই উদ্ধার, কাজী দলন প্রভৃতি নবদ্বীপ লীলার প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে নাটকাভিনয়কালেও হরিদাস অংশ গ্রহণ করেন। তিনি নাটকের সূত্রধরের-কাজ করেন। তাছাড়া, 'কোতোয়ালে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাস নীলাচল গমন করেন। মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রাকালে তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এবং রাম-কেলিতে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হরিদাস নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে বসবাস করেন এবং একদিন তাঁর চরণে মাথা রেখে হরিনাম জপ করতে করতে পরলোক গমন করেন।

হরিদাসাচার্য, দ্বিজ—ইনি ছিলেন কাঞ্চনগড়িয়া-নিবাসী নবদ্বীপ-লীলাকালের কীর্তনীয়া ও চৈতন্যপার্ষৎ। মহাপ্রভুর নীলাচলে বসবাসকালে হরিদাসাচার্য মাঝে-মাঝে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করে আসতেন। এঁর দুই পুত্রের নাম গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পর হরিদাসাচার্য গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সাধন-ভজনের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেন। শ্রীনিবাসাদি যখন প্রথম বৃন্দাবনে, তখন ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছিলেন। ইনি শ্রীনিবাসকে গৌড়ে গিয়ে এঁর পুত্রদ্বয়কে দীক্ষা দান করাব জন্য আজ্ঞা করেছিলেন। দ্বিজ হরিদাস ছিলেন একজন পদকর্তা। 'পদকল্পতরু'তে এঁর চারটি ব্রজবুলি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া, এঁর অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নাম সংকীর্তন' (শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম)। এঁর অবস্থিতি-কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

হরিদেব—সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি। নিবাস

ছিল হাওড়া জেলায়। ইনি 'শীতলা-মঙ্গল' ও 'মনসামঙ্গল' কাব্যদ্বয় রচনা করেছিলেন।

হরিদেব দ্বিজ—দ্বিজ হরিদেব ও বলরাম নামক দুইজন কবি মিলে একসঙ্গে একখানি 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। দ্বিজ হরিদেবের এই কাব্যখানি ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল। কিছু কিছু পদ বলরামের রচনা। কেউ কেউ বলেন বলরাম ছিলেন দ্বিজ হরিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

হরিদেব বিদ্যানিধি—কৃষ্ণচন্দ্র রাজার পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ রামরুদ্র বিদ্যা-নিধির অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। ইনি বর্ধমান মহারাজার জ্যোতির্বিদ্ সভা-পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সময়ে সময়ে স্বীয় পাণ্ডিত্যের অসাধারণত্ব প্রদর্শন করে বর্ধমান রাজের নিকট থেকে বহু অর্থ ও জমি লাভ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

হরিনাথোপাধ্যায়—মিথিলা-নিবাসী খ্যাতনামা ন্যায়াচার্য। গঙ্গেশের পূর্ববর্তী মহাপণ্ডিতদের মধ্যে হরিনাথ মহামহোপাধ্যায়ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন। এঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী।

হরিনারায়ণ—সম্রাট আকবর কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার কানুনগো ভগবান রায়ের পুত্র। ভগবানের ভ্রাতা বঙ্গবিনোদের মৃত্যুর পর হরিনারায়ণ বঙ্গাধিকারী উপাধিসহ কানুনগোর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইতিহাসে হরি-নারায়ণের বহু সৎকার্যের উল্লেখ দেখা যায়। ইনি খাজুটি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে "হরিসাগর" নামে একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়েছিলেন। আজও তা বিদ্যমান। বর্ধমান জেলার বিখ্যাত পীঠস্থান ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা মাতার সেবাদির জন্য ষোলশত টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করে যান। এই সময় থেকেই এঁরা প্রকৃত বঙ্গাধিকারী নামে বাংলায় পরিচিত হয়ে উন্নতি-শিখরে আরোহণ করেছিলেন। এঁর অবস্থিতি-কাল সপ্তদশ শতাব্দী।

হরিপ্রিয়া (বা **নন্দরাম**)—ইনি পুরুষ হয়েও প্রকৃতিভাবে ভজন করতেন। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এঁর জন্ম শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে। এঁর রচিত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণমিশ্রচরিত'।

হরিবংশ বা **হিতহরিবংশ**—গৌড় ব্রাহ্মণ। রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা একাদশীতে সোমবারে এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ব্যাস মিশ্র। মাতার নাম তারাদেবী। এঁর রচিত গ্রন্থ—'চৌরাশিজি,' 'মহাবাণী' প্রভৃতি। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে এঁর তিরোধান হয়।

হরিবর্মা—পূর্ববঙ্গের বর্মরাজ বংশের জাতবর্মার পুত্র হরিবর্মা একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব করেন। সম্ভবত বিক্রমপুরেই তাঁর রাজধানী

ছিল। এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। ইনি প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইনি 'মহারাজাধিরাজ', 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক' প্রভৃতি রাজচক্রবর্তীদের উপাধি গ্রহণ করতেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবদেবভট্ট হরিবর্মার মহামন্ত্রী ছিলেন।

হরিবল্লভ দাস—ইনিই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দ্র°।

হরিভট্ট—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল ভক্ত। মহাপ্রভু প্রবর্তিত নীলাচলে সম্প্রদায়-কীর্তনে ইনি যোগ দান করতেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

হরিভদ্র—পাল-রাজ ধর্মপালের সমসাময়িক। ইনি 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র উপর 'অভিসময়ালঙ্কারাবলোক' নামে বিখ্যাত টীকা লিখেছিলেন। ধর্মপালের আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা রচিত হয়েছিল। ইহা রত্নভদ্র কর্তৃক তিব্বতীয় ভাষায়ও অনূদিত হয়েছিল। এ ছাড়া, হরিভদ্রের আরও কতকগুলি গ্রন্থ ছিল। তার মধ্যে 'স্ফুটার্থ', নামক টীকা, 'সঞ্চয়' টীকা, 'প্রজ্ঞাপারমিতা ভাবনা', 'পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর অবস্থিতিকাল নবম শতাব্দী।

হরি মৌলিক (হরি কাঙ্গিলাল)—বাংলার প্রসিদ্ধ বার ভুঁয়ার অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ জমিদার। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। চাঁদ রায়ের দেওয়ান ও সেনাপতি ছিলেন। চাঁদ রায় হরির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে এঁকে মৌলিক উপাধি ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিপগ্রাম মৌজা প্রদান করেন। পরে হরি মৌলিক নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে পরমভক্ত বৈষ্ণব হন।

হরিরাম আচার্য—রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এর পিতার নাম শিবাই আচার্য। গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে গোয়াস নামক গ্রামে ছিল এঁর নিবাস। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ণ। হরিরাম পরম পণ্ডিত ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজের নিকট ইনি দীক্ষালাভ করেন। আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতাব্দী। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শাখাভুক্ত। 'প্রেমবিলাসে' আছে,—

"হরিরাম আচার্য-শাখা পরম পণ্ডিত।
রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র ইহা জগতবিদিত॥
গঙ্গা পদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়।
তথায় গোয়াস গ্রাম তাঁহার আলয়॥"

ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর মতে হরিরাম আচার্য "সংকীর্তন-রস-লম্পট" ছিলেন। সুতরাং ইনি নিজেও পদ রচনা নিশ্চয়ই করে থাকবেন। ইনি সম্ভবতঃ "হরিরাম দাস' এই নামও এঁর পদে ব্যবহার করতেন। হরিরাম আচার্য ওরফে পদ-কর্তা হরিরাম দাসের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—

"শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য প্রিয়তম।
রামচন্দ্র কবিরাজ গুণ অনুপম॥
শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য।
সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্বকার্য॥"

হরিরাম (দ্বিজ)—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর দ্বারা যাঁরা প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রভাবিত হয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি হরিরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এঁর কাব্যখানি রচিত হয়। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চিতুয়া ও বরদার অধীশ্বর শোভাসিংহ কবির আশ্রয়দাতা বলে অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁর আশ্রয়ে থেকেই কবি কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। হরিরাম তাঁর কাব্যমধ্যে শোভাসিংহের নামে চণ্ডিকার প্রসাদ ভিক্ষা করেছিলেন। "অভ্রিজামঙ্গল নাম। বিরচিল হরিরাম শোভাসিংহে রক্ষিবে অম্বিকা।" এঁর কাব্যমধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনী অর্থাৎ কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী ও ধনপতি-খুল্লনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এঁর কাব্যে কবিত্বের পরিচয় না পাওয়া গেলেও ভাষার পরিপাট্য দেখা যায়।

হরিশ্চন্দ্র বসু—'চণ্ডীবিজয়' বা 'দেবীমঙ্গল' কাব্য-প্রণেতা। এঁর নিবাস ছিল আধুনিক রংপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রামে। কবি ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ। কাব্যের রচনাকাল ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী—(১৭৬২-১৮৩২ খ্রীঃ)—এঁর পূর্বনাম নন্দকুমার বিদ্যালংকার। পরে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন এবং হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে খ্যাত হন। ইনি ছিলেন রাজা রামমোহনের অনুবর্তী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁর গুরুর মতো। রামমোহন এঁর নিকট রীতিমতো তন্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এঁর গ্রন্থ 'কুলার্ণব' তন্ত্র 'মহানির্বাণ-তন্ত্রে'র উপর রচিত টীকা।

হরিহরানন্দ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা'র অধিবেশনেও যোগ দিতেন।

হরিহোড়—পাঠানদের শাসন-সময়ে নবদ্বীপের উত্তর বড়গাছি গ্রামে হরিহোড় নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ইনি ছিলেন কায়স্থ-কুল-সম্ভূত বিষ্ণুহোড়ের পুত্র। নদীয়া, বাগোয়ান, পাটলি, অগ্রদ্বীপ, সাতসইকা, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু পরগণা এঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও ঐশ্বর্যশালী হয়েছিলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। ইনি গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করতেন। এঁর পুত্রের নাম কৃষ্ণদাস। হরিহোড় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। হরিহোড়ের রাজসভাতেই কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন।

হরুঠাকুর—বিখ্যাত কবিওয়ালা

ও গীত-রচয়িতা। প্রকৃত পুরোনাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী বা দীর্ঘাড়ী। তবে বাংলার সর্বত্র হরুঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত। কলকাতার সিমুলিয়া-নিবাসী কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ীর পুত্র। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই হরুঠাকুর কবিতা ও সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি কবির দলে প্রবেশ করে গান বেঁধে দিতেন। পরে নিজেই এক কবির দল গঠন করেন। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন। সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করে তাতে সুর, রাগ সংযুক্ত করতেন। এঁর রচনা-কৌশল দেখে রাজা নবকৃষ্ণ এঁকে কবির দলগঠনে উৎসাহ দেন এবং আজীবন এঁর দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শেষ বয়সে হরুঠাকুর দল ছেড়ে মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ হন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়। এঁর সখীসংবাদ সংগীত অতীব মনোহর। নবকৃষ্ণ দ্র°।

হরেকৃষ্ণ আচার্য—শ্রীজীব-গোস্বামীকৃত শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের 'বালতোষণী' টীকা-প্রণেতা।

হরেকৃষ্ণ দাস—অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী। রাস-পঞ্চাধ্যায়ের পয়ারে অনুবাদক।

হরেকৃষ্ণ সিংহ—কান্দী বা পাইকপাড়া রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। ইনি বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সম-সাময়িক। ইনি উত্তমর্ণ ও রেশম ব্যবসায়ে অগাধ ধন-সম্পত্তি করেন। ইনি বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগী ছিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। হরেকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদের নবাবকে প্রচুর নজরানা দিয়ে বোয়ালিয়া প্রভৃতি কতকগুলি স্থান লাভ করেছিলেন। সেই থেকেই বোয়ালিয়া কান্দী রাজ-বংশের সুবৃহৎ সম্পত্তির অংশস্বরূপ।

হর্জর বর্মা—এঁর পিতার নাম প্রালম্ভ ও মাতার নাম জীবদা, ইনি সালস্তম্ভ-বংশসম্ভূত। নবম শতাব্দীর প্রথমের দিকে ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (বর্তমান আসাম) রাজা ছিলেন। এঁর অনুশাসনে ৫১০ গুপ্তাব্দ বা ৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এঁরই পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা বনমালা। "শ্রীমান্ হর্জরদেব সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের ন্যায়, প্রণত রাজগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে সর্ব-তীর্থবারি-পরিপূর্ণ মাঙ্গল্য রৌপ্য-কলসের জলের দ্বারা বণিগ্‌জন-পুরঃসর সদ্বংশজাত রাজপুত্রগণ কর্তৃক অভি-ষিক্ত হয়েছিলেন।"

হলওয়েল—১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর ডাবলিন্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। রিচমণ্ডের এক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তারপর হল্যাণ্ডে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। পরে রটেরডামে কেরানী নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে ঔষধের ব্যবসা শিক্ষার জন্য একটি হাসপাতালে প্রবেশ করেন।

১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিকিৎসকরূপে কলকাতায় আসেন। এখানে কয়েক বছর জাহাজে কাজ করে ঢাকার কুঠীতে কিছুদিন সার্জন মেজরের কাজ করেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইনি পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন এবং মেয়র কোর্টের অল্ডারম্যান্ নির্বাচিত হন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হাসপাতালের সার্জন নিযুক্ত হয়ে শীঘ্রই অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি এর পূর্বে দু'বার কলকাতার মেয়রের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে ফিরে যান। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েল কোম্পানী কর্তৃক জমিদারের পদে নিযুক্ত হয়ে পুনরায় কলকাতায় আসেন। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রান্ত হলে ইনিও অন্ধকূপে নির্যাতিত হন। তারপর শরীর ভগ্ন হওয়ায় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিলাতে প্রেরিত হন। যাত্রাকালে জাহাজে বসে ইনি অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিলাতে পৌছবার পর কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস এঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে ক্লাইবের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইনি সে পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে চতুর্থ সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সদস্য হন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইবের পর কয়েক মাসের জন্য অস্থায়ীরূপে গভর্নরের পদ প্রাপ্ত হন। ঐ বছরই ইনি অবসর গ্রহণ করে বিলাতে ফিরে যান। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েল মারা যান। ইনি নিজ ব্যয়ে অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষাকল্পে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এই মর্মরফলকে হত আটচল্লিশ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল। "Narrative", "Interesting Historical events relative to the Province of Bengal", "Mythology", "Losmogeny", "Fasts and Festivities of the Hindoos" প্রভৃতি হলওয়েলের রচিত গ্রন্থ। পরবর্তীকালে হলওয়েলের 'অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী' মিথ্যা বলে প্রমাণিত ও সম্পূর্ণরূপে এই স্মৃতিচিহ্নটি অপসারিত হয়েছে। এ কার্যে অগ্রণী ছিলেন বাংলার দুলাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

হলায়ুধ—বাৎস্যগোত্রীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র। এঁর মাতার নাম উজ্জ্বলা। ইনি প্রথমে ছিলেন বল্লালসেনের রাজপণ্ডিত পরে মহামন্ত্রী। পরে লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য এবং প্রৌঢ় বয়সে লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধ্যক্ষ ও মহাধর্মাধ্যক্ষ হন। ইনি ছিলেন ঐ যুগের অন্যতম যুগন্ধর পণ্ডিত এবং প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। হলায়ুধের অবস্থিতিকাল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি পশুপতি ও ঈশান নামে দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামোল্লেখ করেছেন। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা 'কর্মোপদেশিনী' নামেও পরিচিত।

এছাড়া, তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', শৈবসর্বস্ব ও 'পণ্ডিতসর্বস্ব'। 'দ্বিজনয়ন', 'শ্রাদ্ধপদ্ধতিটীকা' 'সংবৎসরপ্রদীপ', 'নবগ্রহমন্ত্রব্যাখ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও হলায়ুধের নামাঙ্কিত। এই সব গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব ছাড়া বাকীগুলি বিলুপ্ত।

হলায়ুধ নিজেই বলেছেন রাঢ় এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ করতেন না, বৈদিক ক্রিয়াকর্মের যথাযথ নিয়মও জানতেন না। সেইজন্য তিনি ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

শাসনকার্যের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ইনি রাজ্যকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। বল্লালসেনের নির্দেশে রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে স্থাপন এবং ঐ নগরীর রক্ষাদুর্গ একডালা নির্মাণে হলায়ুধের অবদান অসামান্য। বিক্রমপুর ও সপ্তগ্রাম এবং কলকাতা নগরীর ভিত্তি স্থাপন বল্লালসেন-হলায়ুধের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফল।

হাজি মহম্মদ—চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙালী (পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কবি। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। এঁর রচিত কাব্য 'নূরজামাল'। তাছাড়া, ইসলাম ধর্মবিষয়ক আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইনি রচনা করেছিলেন।

হাজী মহম্মদ মহসীন—মোহাম্মদ মহসীন, হাজী দ্র°।

হাতেম খাঁ—ইনি ছিলেন প্রথম জীবনে বীরভূমরাজ বাদি উজ্জমান খাঁর জনৈক বিচক্ষণ কর্মচারী। শুনা যায় ইনি নাকি রাজার জনৈক আত্মীয় ও সেনাপতি। বয়োবৃদ্ধিহেতু এঁকে রাজস্বসচিবপদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ ও সুচতুর ছিলেন। রাঘবপুরে রাঘবানন্দ রায় বিদ্রোহী হলে বীরভূম রাজা বিজ্ঞ, বিচক্ষণ হাতেম খাঁকে বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যসামন্তসহ হেতমপুরে প্রেরণ করেন। হাতেম কূটনীতির জাল বিস্তারপূর্বক রাঘব রায়কে বন্দী করেন। বীরভূমরাজ বৃদ্ধ হাতেম খাঁর দক্ষতায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে এই বিদ্রোহ দমনকার্যের পুরস্কারস্বরূপ এঁকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন এবং এঁরই উপর হেতমপুর দুর্গরক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। এই হাতেম খাঁর নামেই গ্রামের নাম হয়েছিল হাতেমপুর, বর্তমানে উহা হেতমপুর নামে পরিবর্তিত হয়েছে। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী।

হাফেজ খাঁ—বীরভূম জেলার হেতমপুরের শাসনকর্তা। এঁর প্রকৃত নাম ওসমান, দিল্লীর বাদশাহের প্রধানস্থ জনৈক সেনাপতির পুত্র। বাদশাহের এক কন্যা আমিনার সঙ্গে ওসমানের প্রণয় ঘটে। কিন্তু বিবাহের কোন সম্ভাবনা না থাকায় উভয়ে দিল্লী পরিত্যাগপূর্বক নানা স্থান অতিক্রম করে হেতমপুরে এসে উপস্থিত হন।

এবং সেখানকার শাসনকর্তা হাতেম খাঁর আশ্রয় লাভ করেন। ক্রমে হাফেজ খাঁ কার্যকুশলতা ও শীলতাগুণে হাতেম খাঁকে এতই মুগ্ধ করেন যে বৃদ্ধ হাতেম খাঁ এঁকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। পরে হাতেম খাঁর মৃত্যু হলে বীরভূমরাজ হাফেজ খাঁর উপর হেতমপুর দুর্গের সমস্ত ভার অর্পণ করেন। সম্ভবতঃ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে হাফেজ খাঁর জন্ম হয়েছিল। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

হা মি দ খা ন—দৌলত উজীর বাহরাম খানের লেখা 'লায়লী-মজনু'তে এঁর নাম পাওয়া যায়। লায়লী-মজনু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। এতে দৌলত উজীর লিখেছেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) প্রধান উজীর ছিলেন। তিনি বহু গুণে বিভূষিত এবং অদ্বিতীয় দাতা ছিলেন।

"পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হোসেন শাহাবর।
তান রত্ন সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েত শোভিত মনোহর॥
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদ খান
তাহার গুণের অন্ত নাই।
অন্নশালা স্থানে স্থান মস্‌জিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই॥"

হাম্বির মল্ল—বীর হাম্বির দ্র°।

হায়াৎ (বা হিয়াৎ) মামুদ—উত্তরবঙ্গের কবি। ইনি হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদ বাংলা পদ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে। এই অনূদিত কাব্যের নামকরণ করেন 'চিত্ত-উত্থান' বা 'সর্বভেদবাণী'। হায়াৎ মামুদের নিবাস ছিল ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্গত সুলজ বাগদুয়ার পরগণার ঝাড়বিশিলা গ্রামে। খুব সম্ভব কবির পিতা ছিলেন শাহা কবীর বা কবীরুদ্দিন। ঘোড়াঘাট সরকারের দেওয়ান ছিলেন এবং কবি বাগদুয়ার পরগণার কাজী ছিলেন। 'জঙ্গনামা' বা মহরম পর্ব কাব্যে কবি স্বীয় আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। ইহাই কবির প্রথম রচনা, রচনাকাল ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যটি মহাভারত-কাহিনীর আদর্শে লেখা। হায়াৎ মামুদের তৃতীয় কাব্য 'হিতজ্ঞানবাণী' ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এতে ইসলাম-শাস্ত্র অনুযায়ী তত্ত্ব-কথা বিবৃত করা হয়েছে। কবির চতুর্থ কাব্য 'আম্বিয়াবাণীতে' পয়গম্বরদের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের রচনাকাল ১৭৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

হা ল হে ড—ইংরেজ পুরুষ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড্ এদেশে এসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যে নিযুক্ত হন এবং পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চার্লস উইলকিন্সের সহায়তায় ইনি হুগলীতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'A Grammar of Bengal Language' একটি বাংলা

ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। চুঁচুড়ার ডাচ্ গভর্ণরের কন্যার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।

হালু মিঞা—অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। রচিত গ্রন্থ 'গাজীমঙ্গল'।

হাড় ওঝা বা হাড়াই পণ্ডিত—মুকুন্দ দ্র°।

হাড়িপা—জালন্ধরিনাথ দ্র°।

হিউ-এন-সাঙ—সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক। সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে এসে বাংলার নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বাঙালী জাতি সম্বন্ধে নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান। ইনি এঁর বিবরণীতে বাঙালীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য করে গিয়েছেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর মতে সমতটের (দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের) অধিবাসিগণ ছিলেন শ্রমসহিষ্ণু ও বিদ্যানুরাগী; তাম্রলিপ্তের অধিবাসিগণ ছিলেন দৃঢ় ও সাহসী, কিন্তু চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ; কর্ণসুবর্ণের অধিবাসিগণ ছিলেন সাধু, অমায়িক ও অধ্যয়নপ্রিয় এবং পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসিগণ ছিলেন শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহশীল। তাম্রলিপ্তিতে ইনি তিন বছর অবস্থান করেছিলেন। এখানে বহু বৌদ্ধ মঠ ও শ্রমণের ইনি বর্ণনা করে গিয়েছেন। বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল জ্ঞানস্পৃহা দেখে হিউ-এন-সাং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

হিকি, জেমস্ অগাষ্টাস—জাতিতে ইংরেজ। ভারতীয় সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে বিখ্যাত। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পত্র "হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট" নামে পরিচিত। ঐ বছর ২৯ জানুয়ারি উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে হিকি সম্ভবতঃ মুদ্রাকরের কাজ করতেন। এখানে এসে প্রথমে ইনি ব্যবসায় করতে আরম্ভ করেন এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেনার দায়ে কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর ইনি উপরিউক্ত পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইনি এদেশবাসীর পক্ষ সমর্থন করতেন না। এঁর অভিমত ছিল যে শাসকদের স্বার্থরক্ষার জন্য শাসিতদের স্বার্থহানি অন্যায় নয়। তবে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বিশেষতঃ হেষ্টিংস ও ইম্পেকে যথেষ্ট গালি দিতেন। কুৎসা প্রচারের অজুহাতে হিকির বেঙ্গল গেজেটের প্রচার বন্ধ করে দিলে হিকি "ইণ্ডিয়া গেজেট" নাম দিয়ে আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকাতেও ইনি পূর্বের ন্যায় গালি দিতে থাকেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে গভর্নর জেনারেল এঁর নামে দু' দফা নালিশ রুজু করায় ইনি গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে প্রেরিত হন। এঁকে প্রতি দফায় চল্লিশ হাজার করে টাকা জামিন দিতে বলা হয়। কিন্তু ইনি তা দিতে না পারায় এক বছর জেল ও দু'হাজার টাকা জরিমানা হয়। এর পর ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে হেষ্টিংস্

পুনরায় হিকির নামে নালিশ রুজু করে পাঁচ হাজার টাকা ড্যামেজের ডিক্রি পান। কিন্তু এই সব জরিমানার টাকা দিতে না পারায় হিকিকে কারাগারে থাকতে হয়।

হিকি, টমাস—একজন ইংরেজ চিত্রকর। ভারতে এসে কলকাতায় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'দি হিস্ট্রী অব পেন্টিং' এবং 'স্কাল্পচার ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট য়্যাকাউণ্টস' প্রকাশ করেন। তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্র কলকাতার রাজভবনে সংরক্ষিত আছে।

হিরণ্য দাস—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সপ্তগ্রাম অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার। ইনি 'মুলুকের মজুমদার' নামে অভিহিত হতেন। এঁর নিবাস ছিল হুগলী জেলার নিকটবর্তী চাঁদপুর বা চন্দনপুর গ্রামে। এঁর এক সহোদর ভ্রাতার নাম গোবর্ধন দাস। এঁরা ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। গৌরাঙ্গের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী এঁদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অদ্বৈত-শিষ্য যদুনন্দন আচার্যের নিকট এরা দীক্ষালাভ করেন। এঁরা অদ্বৈতপ্রভুর বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। বিখ্যাত চৈতন্যভক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন হিরণ্যদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র, গোবর্ধনের পুত্র।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলা থেকে জানা যায় যে হিরণ্য মজুমদারের উপর বাংলার তৎকালীন নবাব হোসেন শাহ সপ্তগ্রাম মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেছিলেন। সর্ত ছিল যে বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করে হিরণ্য বার লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দেবেন। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে:

"হিরণ্য গোবর্ধন দুই মুলুকের
মজুমদার।"

ঐ অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে:

"হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা
করিয়া।
বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ
লক্ষ।"

হুইলার—ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাউন্সিলের একজন সদস্য। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নরের অনুপস্থিতিবশতঃ সেণ্ট জন্ গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

হুজুরীমল—একজন পঞ্জাবী—প্রখ্যাত উমিচাঁদের নিকট-আত্মীয়। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার যুদ্ধের সময় ইনি ইংরেজ কোম্পানীর যথেষ্ট উপকার করেন। তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর ভেরেলষ্ট সাহেব হুজুরীমলের এই সহায়তার জন্য পুরস্কৃত করতে চাইলে, ইনি অন্য কোন পুরস্কার না নিয়ে কালীঘাটের মধ্যে বার বিঘা জমি গ্রহণ করেন। বহু বাজারের নিকটস্থ হুজুরীমল লেন এঁর নাম রক্ষা করছে।

হৃদয়রাম সাউ—একজন কবি। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হৃদয়রাম ধর্মমঙ্গল কাব্য

রচনা শেষ করেন। তাঁর পূর্বনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রামে। কবির পিতার নাম গোবিন্দ, মাতা মুকুতা, পিতামহ কমল। এঁরা জাতিতে শুঁড়ি। পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে কবি বাল্যে মাতুলালয়ে লালিত পালিত হয়েছিলেন। স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে হৃদয়রাম সিদিয়াদহ থেকে ঠাকুরের মূর্তি সংগ্রহ করে নান্নুরের দক্ষিণে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম উচকরণে গিয়ে 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন। হৃদয়রামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এঁর ভাষা সংস্কৃতবহুল ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

হৃদয়ানন্দ—ইনি ছিলেন প্রথমে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। একদিন গোরীদাস পণ্ডিত গদাধরের কাছ থেকে হৃদয়ানন্দকে ভিক্ষা করে নেন। তারপর তাঁকে বাসায় এনে বিদ্যাশিক্ষা করান এবং পরে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে পুত্রবৎ পালন করেন। হৃদয়ানন্দও সুশিক্ষিত হয়ে গুরু গৌরীদাস ও তৎ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হৃদয়ানন্দের অপূর্ব চৈতন্য-ভক্তি দেখে গুরু গৌরীদাস তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'হৃদয়-চৈতন্য'। শ্যামানন্দ বা দুঃখী কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন গমনের পূর্বে অম্বিকায় হৃদয়-চৈতন্যের নিকট দীক্ষা-লাভ করেছিলেন। হৃদয়-চৈতন্য বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। খেতুরির মহোৎসবে ইনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যোয়াকুলির মহোৎসবেও ইনি উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব—একজন অসাধারণ পণ্ডিত। ইনি গণিত ও জাতক উভয়বিধ জ্যোতিঃ-শাস্ত্রেই বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তদানীন্তনকালে হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণবের ন্যায় কৃতী জ্যোতির্বিদ বঙ্গে কেহই ছিলেন না। ভবানন্দ মজুমদার এই বিদ্যার্ণব মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান ও বিশ্বাস করতেন। এঁর রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "জ্যোতিঃসারসংগ্রহ"। ইনি অতি দীর্ঘজীবি ছিলেন। ভবানন্দের প্রপৌত্র মহারাজ রামজীবনের সময়েও ইনি নদীয়া রাজধানীর জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী।

হেজেস্, উইলিয়ম্—জাতিতে ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্নর বা এজেণ্টরূপে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এদেশে আসেন। কোম্পানীর বাণিজ্য বিষয়ক সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধান করাই ছিল এঁর কাজ। ইনি কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত একটি মন্ত্রণা-সভার দ্বারা পরিচালিত হতেন। জব্ চার্ণক, জন রিচার্ড, জন বেয়ার্ড প্রভৃতি এই সভার সদস্য ছিলেন। হেজেস্ ছিলেন কর্মক্ষম ও ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ, কিন্তু এঁর স্বভাবদোষে শেষে পদচ্যুতি

ঘটে। হেজেস্‌ যে একখানি রোজ-নামচা রেখে গিয়েছেন তা ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ।

হেজেস্‌, উইলিয়ম—ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় ইনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। হেস্টিংসের আদেশে ইনি উত্তর ভারতের এবং মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানের বহু দৃশ্যাবলী অঙ্কিত করে যশ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হন। ইনি বহু স্থান ভ্রমণ করে বহু চিত্র ও পাণ্ডু-লেখ প্রস্তুত করেন।

হেমচন্দ্র—মহাবাজ কুমারপালের গুরু। সেযুগে হেমচন্দ্রেব ন্যায় সর্ব-শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত আব কেউ ছিলেন না। সেজন্য তৎকালীন সমাজ কর্তৃক ইনি 'কলিকাল সর্বজ্ঞ' আখ্যায় ভূষিত হযেছিলেন। হেমচন্দ্র সমস্ত শাস্ত্র পাঠ কবে এবং সমুদয় সংস্কৃত শব্দ-সাগর মথিত কবে একখানি সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন। এঁবই নামে অভিধানখানির নামকরণ হয় 'হেমচন্দ্র'। এই অভিধানে এমন অনেক শব্দ আছে যা অমরকোষ প্রভৃতি অভিধানেও পাওয়া যায় না। রাধাকৃষ্ণ দেব তাঁর 'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থে প্রামাণ্য পুস্তকরূপে হেমচন্দ্রের বারবার উল্লেখ কবেছেন। ইনি দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। হেমচন্দ্র রচিত অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কুমারপালচরিত।'

হেমন্ত সেন—ইনি কর্ণাট হতে আগত এবং বাংলার গঙ্গাতীরে বস-বাসকারী সামন্ত সেনের পুত্র। ইনি খুব সম্ভবত রামপালের অধীনস্থ একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। হেমন্ত সেনই বাংলার সেনবংশের প্রথম রাজা। ইনি মহারাজাধিরাজ ও এঁর স্ত্রী যশোদেবী মহারাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এঁরই পুত্র বঙ্গাধিপ বিজয় সেন।

হেমলতা দেবী—বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা। পিতার জীবিতকালেই ইনি বৈষ্ণবসমাজে নেতৃত্বের অধিকারিণী হয়েছিলেন। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। এঁব নামে একটি রাগাত্মিকা পদ পাওয়া যায়। পদাংশটি এইরূপ,

"শুনহ রসিক রসের বাঁশি
বসের রতন আনন্দ হাসি।
হেমলতা কহে এইত সার
চাতুরি সমান নাহিক আর॥"

হেম সরস্বতী—সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে উত্তব-পূর্ব বঙ্গে, কামতা-কামরূপে ইনি নানা পুরাণকাহিনী নিয়ে বিবিধ পাঁচালী-কাব্য রচনা করেছিলেন। এঁর পিতা পশুপতি ছিলেন দরঙ্গেব রাজ। দুর্লভনারায়ণের মহাপাত্র। কবির মাতা দেবযানী, মাতামহ রুদ্র-সরস্বতী, অগ্রজ ধ্রুব।

হেম সিংহ—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ধমানে দামোদর নদের তীরে হেমসিংহ নামে ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করতেন। এঁর পুত্রের নাম ছিল বীরসিংহ।

হেয়ার, ডেভিড—(১৭৭৫-১৮৪২ খ্রীঃ)। কলকাতায় (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন) বসবাসকারী ইংরেজ ঘড়িব্যবসায়ী ও ঘড়ি প্রস্তুত-কারক। পরে তিনি ঘড়ির ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে এদেশের সামাজিক উন্নতি-বিধানে বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্ম-বিরোধী, ঈশ্বর-বিরোধী, ও খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী যুক্তিবাদী ও মানবপ্রেমিক। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন এবং আচার-আচরণে বাঙালী জীবনের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ ছিল। তাঁর সমস্ত ধন, সম্পদ ও জীবন এদেশে শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাই এদেশবাসীর নিকট তিনি মহামতি ডেভিড হেয়ার আখ্যায় সম্মানিত। শিক্ষাপ্রসারের জন্য যে কয়টি সংস্থা গঠিত হয়, তার প্রত্যেকটির সঙ্গেই তাঁর সংযোগ ছিল। কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তনেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান আছে। তখনই তিনি মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারের বিষয় চিন্তা করেছিলেন। তিনি নারী-শিক্ষারও সমর্থক ছিলেন। শিক্ষা ছাড়া আরও নানা বিষয়ে হেয়ার সাহেবের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। যেমন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা, বিদেশে ভারতীয় কুলীচালান বন্ধ আন্দোলন, সারা দেশে জুরী প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি।

হেস্টিংস, ওয়ারেন—এই ইংরেজ পুরুষ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানী হয়ে এদেশে আসেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কর্তৃক বন্দী হন। এঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী এঁকে সাম্রাজ্যের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাংলার গভনর হন। এঁরই কা ব সা জি তে জাল করার মিথ্যা অপরাধে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্যা র ফি লি প ফ্রান্সিসকে আহত করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যান। ভারতে থাকাকালে একাধিক অন্যায় কাযের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য বিলেতের পার্লামেন্টে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সাত বছর ধরে বিচারের পর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মুক্তিলাভ করেন। ইনি দুই বিবাহ করেছিলেন। ফলতায় বিবাহ করেন কাপ্তেন বুকাননের বিধবা পত্নী মেরীকে এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে দ্বিতীয় ব্যারনেস ইমহফ্‌কে বিবাহ করেন।

স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির ইনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। দেশীয় আইনানুসারে বিচারের জন্য ইনি পণ্ডিতদের সাহায্যে হিন্দু আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। এঁর শাসনকালে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়।

হোসেনকুলী খাঁ—বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার জ্যেষ্ঠতাত নোয়াজিস্ মহম্মদ এর প্রিয়পাত্র। নোয়াজিস্ নামে ঢাকার নবাব হলেও মহারাষ্ট্রীয় হাঙ্গামার সময় থেকে তিনি ঢাকায় পদার্পণ করেন নি। হোসেন্ কুলী খাঁই দেওয়ান হয়ে তাঁর নামে ঢাকায় রাজত্ব করতেন। খ্যাতনামা বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ এঁর পেস্কার ছিলেন। কালক্রমে হোসেনকুলী নোয়াজিসের গৃহে সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেন এবং এ কর্তৃত্ব অনেক দূর গড়ায়। আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নোয়াজিস্-পত্নী ঘসেটী বেগমের সঙ্গে হোসেনকুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সিরাজ-জননী আমেনা বেগমের নামেও শেষে ঐ কলঙ্ক রটে। সিরাজউদ্দৌলা এতে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। একদিন হাজি মেহেদীর গৃহে লুকায়িত হোসেন কুলীকে টেনে বার করে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

হ্যামিল্টন উইলিয়ম—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন চিকিৎসক। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতারূপে জব্ চার্ণকের পর উইলিয়ম হ্যামিল্টনের নামই উল্লেখযোগ্য। ইনি দিল্লীর বাদশাহ ফররুখসায়ারের চিকিৎসা করে কঠিন ব্যাধি হতে তাঁকে মুক্ত করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বাদশাহের কাছ থেকে ইনি বহু পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা কোম্পানীর হয়ে ইনি বাদশাহের কাছ থেকে বহু সুযোগ সুবিধা আদায় করেছিলেন। এঁরই চেষ্টায় ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কোম্পানীর প্রার্থিত ফারমান প্রাপ্ত হয় এবং সুতানুটী, গোবিন্দপুর, কলকাতা এই তিনটি গ্রাম ছাড়া আরও ছাব্বিশটি পল্লীর জমিদারীস্বত্ব খরিদের অনুমতি পাওয়া যায়। বাদশাহ এঁকে স্থায়ীভাবে রাজকীয় চিকিৎসকরূপে রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর ইনি মারা যান।

হ্যামিল্টন (কাপ্তেন),—এক ইংরেজ পুরুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতে আসেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে "A new account of the East Indies." নামে একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখে খ্যাতিলাভ করেন। এই গ্রন্থে তৎকালীন কলকাতার বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।